"বই মনের খাদ্য।
বেশি বেশি বই পড়ুন,
মনকে সুস্থ রাখুন।।"

মোঃ কবিরুল ইসলাম
(DMC K-69)

www.facebook.com/kabiruldmc
kabirul.dmc@gmail.com

উদ্বোধন

বর্ষসূচী

৫৫ম বর্ষ

(১৩৫৯ মাঘ হইতে ১৩৬০ পৌষ)

সম্পাদক

স্বামী শ্রদ্ধানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়

১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা—৩

বার্ষিক মূল্য ৪৲ প্রতি সংখ্যা ।৹

বর্ষসূচী—উদ্বোধন

(মাঘ, ১৩৫৯ হইতে পৌষ, ১৩৬০)

উদ্বোধন

ভক্তের প্রার্থনা

ত্বৎপাদপদ্মার্পিতচিত্তবৃত্তি-
ত্বন্নামসংগীতকথাসু বাণী।
ত্বদ্ভক্তসেবানিরতৌ করৌ মে
ত্বদংগসংগো লভতাং মদঙ্গম্॥

ত্বন্মূর্তিভক্তান্ স্বগুরুং চ চক্ষুঃ
পশ্যত্বজস্রং স শৃণোতু কর্ণঃ।
ত্বজ্জন্মকর্মাণি চ পাদযুগ্মং
ব্রজত্বজস্রং তব মন্দিরাণি॥

অঙ্গানি তে পাদরজোবিমিশ্র-
তীর্থানি বিভ্রত্বহিশত্রুকেতো।
শিরস্ত্বদীয়ং ভবপদ্মজাদ্যৈ-
র্জুষ্টং পদং রাম নমত্বজস্রম্॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ, ৪।১।৯১-৯৩)

হে রাম! আমার মনের যত চিন্তা, যত কল্পনা, যত আকাঙ্ক্ষা, আবেগ—সকলই যেন তোমার পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারি। আমার জিহ্বা যেন রত হয় তোমার নামগানে—তোমার মহিমা-কীর্তনে, হাত দুটি যেন ব্যাপৃত থাকে তোমার ভক্তগণের সেবায় আর আমার সারা অঙ্গে যেন লাভ করি তোমার দিব্য স্পর্শ।

চক্ষু অবিরাম দেখুক তোমার পাবন মূর্তিনিচয়, তোমার ভক্তবৃন্দকে, তোমার কৃপাবিগ্রহ শ্রীগুরুকে; কর্ণ শ্রবণ করুক তোমার পুণ্য-জন্ম-কর্ম-কাহিনী; পদদ্বয় অনবরত নিযুক্ত থাকুক তোমার মন্দিরসমূহ-পরিভ্রমণে।

হে গরুড়ধ্বজ নারায়ণ! তোমার শ্রীচরণধূলি-মিশ্রিত তীর্থসমূহে অবগাহন দ্বারা দেহ যেন আমার পবিত্র হয়, আমার মস্তক যেন শিব, ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণের সেবিত তোমার পদকমলে বার বার প্রণাম করিবার সৌভাগ্য লাভ করে।

কথাপ্রসঙ্গে

নববর্ষে

শ্রীভগবানের মঙ্গল ইচ্ছায় 'উদ্বোধন' তাহার লোকহিতব্রতী জীবনের চুয়াল্লটি বৎসর অতিক্রম করিল। নববর্ষের প্রারম্ভে আমরা 'উদ্বোধনে'র পাঠক-পাঠিকা লেখক-লেখিকা এবং হিতৈষি-মণ্ডলীকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি। বহুতর সমস্যাসঙ্কুল আজিকার পৃথিবীতে মানবের যথার্থ কল্যাণকর উচ্চাদর্শের নির্ণয় ও অনুশীলন একপ্রকার দুরূহ ব্যাপারই বলিতে হইবে। তবুও আমরা সাহস হারাইব না—কেননা, আদর্শের প্রতি স্থির দৃষ্টি এবং উহার লাভের জন্য অকুণ্ঠিত চেষ্টাই লক্ষ্যবিভ্রান্ত বিক্ষুব্ধ মানবগোষ্ঠীকে তাহার বহুকাম্য সত্য ও শান্তির পথে লইয়া আসিতে পারে। 'অরণ্যে রোদন' মনে হইলেও আমরা তাই নির্ভীক-ভাবে মানবকে সত্য-শিব-সুন্দরের বাণী শুনাইয়া চলিব, তাহার শাশ্বত স্বরূপের কথা মনে করাইয়া দিব, জাতিগত ধর্মগত সংস্কৃতিগত পার্থক্যের অন্তরালে বিশ্বের সকল নরনারীর মধ্যে যে নিবিড় ঐক্য সর্বকালে অনুস্যূত রহিয়াছে উহারই আবিষ্কারে ও উপলব্ধিতে উৎসাহিত করিব। 'উদ্বোধনের' প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'প্রস্তাবনা'য় যেমন বলিয়াছেন—"দ্বেষবুদ্ধিবিরহিত ও ব্যক্তিগত বা সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কুবাক্য-প্রয়োগে বিমুখ হইয়া সকল সম্প্রদায়ের সেবার জন্য আপনার শরীর অর্পণ" করিব।

উপনিষদে আছে (বৃহদারণ্যক, ১।৪।১৪) প্রজাপতি সমস্ত মানবমণ্ডলীকে গুণ এবং কর্মানুযায়ী ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভাগ করিয়া ভাবিলেন, কাজ তো শেষ হইল না; এই চারিবর্ণের বিবিধ প্রবৃত্তি, ব্যবহার এবং প্রচেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে কে? তখন—তচ্ছ্রেয়োরূপমত্যসৃজত ধর্মম্—মঙ্গলের পরম নিদান 'ধর্ম'কে সৃষ্টি করিলেন, উহাই চারিবর্ণের জীবনকে বিক্ষেপ হইতে, বিশ্লেষ হইতে, বৈক্লব্য হইতে ধরিয়া রাখিবে বলিয়া। 'ধর্ম' কি? উপনিষদের ঐ মন্ত্রেই ঘোষিত হইল—যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ—যাহাকে 'ধর্ম' বলি তাহার প্রকৃত রূপ হইতেছে 'সত্য'। মানুষ তাহার চিন্তায়, আকাঙ্ক্ষায়, আবেগে, আচরণে সর্বতোভাবে যেন সত্যকে অবলম্বন করে—সে যাহা নয় তাহা যেন কখনও সাজিতে না যায়, তাহার যাহা কাজ নয় উহা যেন কদাপি করিতে উৎসাহী না হয়। যে সংস্কার, রুচি ও শক্তি লইয়া মানুষ যেখানে দাঁড়াইয়া আছে উহাকেই সানন্দে মানিয়া লইয়া সেখানে দাঁড়াইয়াই সে যেন উহাদের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করে—ধীরে ধীরে উহাদিগকে বাড়াইয়া যায়, মহত্তর উদ্দেশ্যে রূপান্তরিত করে। ইহাই তাহার পক্ষে সত্য—ইহাই তাহার ধর্ম। নিজের অনন্ত শুভ সম্ভাবনায় দৃঢ় আস্থা রাখিয়া অপরের মঙ্গলে বাধা না জন্মাইয়া সেই সম্ভাবনাগুলিকে বিকাশ করিয়া তোলার নাম ধর্ম। নিজের সত্যকে ভুলিয়া বিশৃঙ্খলতায় গা ভাসাইয়া দেওয়ার নাম অধর্ম। অধর্মের প্রাদুর্ভাবে মানুষের জীবন, তথা সমাজের জীবন আর সামঞ্জস্যে বিধৃত থাকে না—টুকরা টুকরা হইয়া বিনষ্ট হয়।

ধর্মের উপরোক্ত শাশ্বত রূপ ও কার্য আমরা যেন বিস্মৃত না হই। মানবের ব্যষ্টিগত এবং সমষ্টিগত জীবনে ধর্মের সংরক্ষণ ও পরিপুষ্টি যেন সতত আমাদের লক্ষ্য হয়। আজিকার পৃথিবীর বহু-বিস্তৃত সংঘর্ষ ও দুর্দশার কারণ সত্যের নির্লজ্জ অমর্যাদা—অর্থাৎ ধর্মের অনাদর। মানুষ যাহা নয় তাহাই দেখাইবার জন্য

সে ব্যাকুল—যাহাতে তাহার ন্যায্য অধিকার নাই তাহাই গ্রাস করিতে সে অধীর। নিজে কেন্দ্রহারা হইয়া সে কেবলই অপরের কেন্দ্রে আঘাত হানিতেছে। তাহার নিজের গতি লক্ষ্যশূন্য—অপরের গতিকেও সে করিতেছে ব্যাহত। অতএব মানুষকে যাঁহারা ভালবাসেন তাঁহাদের প্রথম কর্তব্য মানুষকে তাহার এই বিভ্রান্তি হইতে রক্ষা করা—তাহার দৃষ্টি সত্যে নিবদ্ধ করিতে সাহায্য করা—তাহার জীবন ধর্মে কেন্দ্রীভূত করিতে বলা। তবেই মানুষ ঠিক ঠিক বাঁচিয়া থাকিবে—তবেই সে নিজের এবং সকলের যথার্থ সুখ আনিতে পারিবে।

বিশ্বপটভূমিতে ভারতীয় সভ্যতা

প্রায় ষাট্ বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যদেশে বেদান্ত-প্রচার করিয়া দেশে ফিরিয়া একটি বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—

"পূর্বে যাহা হয়ত হৃদয়ের আবেগে বিশ্বাস করিতাম এখন উহা আমার কাছে প্রমাণ-সিদ্ধ সত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্বে সকল হিন্দুর মত আমিও বিশ্বাস করিতাম—ভারত পুণ্যভূমি—কর্মভূমি। আজ আমি সকলের সমক্ষে দাঁড়াইয়া দৃঢ়তার সহিত বলিতেছি—ইহা সত্য সত্য! অতি সত্য! * * * যদি এমন কোন স্থান থাকে যেখানে মনুষ্যজাতির ভিতর সর্বাপেক্ষা অধিক ক্ষান্তি, ধৃতি, দয়া, শৌচ প্রভৃতি সদ্গুণের বিকাশ হইয়াছে —যদি এমন কোন দেশ থাকে যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক আধ্যাত্মিকতা ও অন্তর্দৃষ্টির বিকাশ হইয়াছে তবে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তাহা আমাদের মাতৃভূমি—এই ভারতভূমি। * * * অতি প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভাবের পর ভাবতরঙ্গ ভারত হইতে প্রসৃত হইয়াছে, কিন্তু উহার প্রত্যেকটিই সম্মুখে শান্তি ও পশ্চাতে আশীর্বাণী লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। জগতের সকল জাতির মধ্যে আমরাই কখন অপর জাতিকে যুদ্ধ-বিগ্রহের দ্বারা জয় করি নাই। * * * আমরা কখন বন্দুক ও তরবারির সাহায্যে কোন ভাবপ্রচার করি নাই। * * * লোকলোচনের অন্তরালে অবস্থিত, অশ্রুত অথচ মহাফলপ্রসূ, উষাকালীন ধীর শিশির-সম্পাতের ন্যায় এই শান্ত 'সর্বংসহ' ধর্মপ্রাণ জাতি চিন্তা-জগতে আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে।"

১৮৯৭ সালে—ইংরেজরাজ যখন ভারতের বুকে অটল পাহাড়ের মত জাঁকিয়া বসিয়া আছে, দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের চোখ যখন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বিভবের দিকে প্রায় ষোল আনাই ফিরিয়া রহিয়াছে, তখন ভারতবাসীকে জোর গলায় নিজেদের জাতীয় গৌরবের দিকে নিঃসঙ্কোচে তাকাইতে আহ্বান করা নিশ্চিতই দীপ্ত আত্মবিশ্বাস ও অনমনীয় সাহসের পরিচায়ক ছিল। স্বামিজীর পূর্বে বাংলাদেশে রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি এবং অন্যান্য প্রদেশেও কেহ কেহ জাতীয়-ঐতিহ্যবিস্মারক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা-দীক্ষার মাঝখানে ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির মহিমা-কীর্তন ও প্রচার করিয়াছেন, কিন্তু স্বামিজীই বোধ করি প্রথম বর্তমান কালের পটভূমিকায় ঐ সভ্যতার দূরপ্রসারী প্রভাবের কথা কম্বুকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন। শুধু অতীতের মহিমার উপলব্ধি নয়—ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীর মানব-সমাজের ঐ সভ্যতার উপর অপ্রতিরোধ্য মঙ্গল অবদান-সম্বন্ধে নিজেদের সচেতনতা ও প্রস্তুতি—বিশেষতঃ এই শেষেরটির প্রতি স্বামিজী বার বার আমাদিগকে অবহিত করিয়াছিলেন। ঐ একই বক্তৃতায় স্বামিজী বলিতেছেন—

"আবার এখান হইতেই তরঙ্গ ছুটিয়া সমগ্র জগতের ইহলোকসর্বস্ব সভ্যতাকে আধ্যাত্মিক জীবন প্রদান করিবে। অপরদেশীয় লক্ষ লক্ষ নরনারীর হৃদয়দগ্ধকারী জড়বাদরূপ অনল নির্বাণ করিতে যে অমৃতসলিলের প্রয়োজন, তাহা এখানেই বর্তমান। বন্ধুগণ, বিশ্বাস করুন, ভারতই জগৎকে আধ্যাত্মিক তরঙ্গে ভাসাইবে।"

স্বামিজী বিশ্বাস করিতেন, ভবিষ্যতের ঐ

বৃহৎ ঘটনার জন্য ভারতবাসীকে সক্রিয় ভাবে প্রস্তুত হইতে হইবে। 'যখন হয় হইবে' 'যদি হয় তো ভালই' এইরূপ মনোভাব তিনি চাহেন নাই। যেমন দেশের দারিদ্র্য, অশিক্ষা, পরাধীনতা দূর করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে বলিয়াছিলেন, তেমনই ভারতসংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচারের কাজও গভীর উৎসাহের সহিত সঙ্গে সঙ্গে শুরু করিয়া দিতে হইবে ইহাই ছিল তাঁহার অভিপ্রায়।

ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন বিজেতা জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি দেশের লোকের চক্ষু ঝলসাইয়া রাখিত—নিজেদের ঘরের অমূল্য সম্পদের দিকে তাকাইবার রুচিও ছিল না, উহার মর্যাদা উপলব্ধি ও রক্ষা করিবার সৎসাহসও হইত না। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বার বার জাতিকে এই যে আত্মচেতনার কথা শুনাইয়া গেলেন বিগত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ দেশের লোকের নিকট হইতে তাহার আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যায় নাই। বরং দেশের অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তি, অনেক প্রসিদ্ধ নেতা 'ধর্ম', 'আধ্যাত্মিকতা' এ সকল কথা শুনিলে এত দিন প্রকাশ্যে কটাক্ষ করাটাই ফ্যাসান্ মনে করিয়া আসিয়াছেন। ভারতের জাতীয় উন্নতির লক্ষ্য ভাবিবার সময় অনেকের নিকট সম্পূর্ণ পাশ্চাত্ত্য জাতিসমূহের অভ্যুদয়ের চিত্রই মনে পড়িয়াছে।

আজ কিন্তু স্বাধীন ভারতে এই আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে। দেশের মনীষিবৃন্দ এবং রাষ্ট্রনায়কগণের চিন্তাধারায় এবং বাক্যে স্বামিজীর পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলির প্রতিধ্বনি শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। সেদিন কলিকাতায় একটি বক্তৃতায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলিলেন—

"ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, অপরের উপর প্রভুত্ব-বিস্তারের জন্য ভারত কখনও বলপ্রয়োগ করে নাই, কিন্তু সকলের অন্তর অধিকার করিয়াছে। * * * ভারতবর্ষের মুনিঋষিরা অতীতে তাঁহাদের সাধনার দ্বারা ভারতীয় সংস্কৃতির যে অপূর্ব অবদান রাখিয়া গিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়া ভারতবাসী তাহা ভুলিতে বসিয়াছে। স্বাধীনতা-লাভের পর ভারতের সেই অতীত সত্য ও সুন্দরের ভাণ্ডার আজ আমাদের আহরণ করিবার সময় আসিয়াছে। আজ সারা পৃথিবী ভারতবাসীর সেই বাণী শুনিবার জন্য মুখ চাহিয়া বসিয়া আছে। ভারতের প্রেম ও মৈত্রীর আদর্শ ও বাণী সারা বিশ্বে পৌঁছাইয়া দিবার দায়িত্ব আজ আমাদের গ্রহণ করিতে হইবে।"

১৪ই ডিসেম্বর এলাহাবাদে একটি বক্তৃতায় ভারতবর্ষের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ঘোষণা করিলেন—

"যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ভারতের জগতকে অনেক কিছু দিবার আছে, আমি তাঁহাদের এক জন। ভারতের এই অবদান যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্পোন্নতি অথবা যুদ্ধ-বিজয় দ্বারা ঘটিবে ইহা আমার মনে হয় না। ভারতবর্ষ চিরকাল আধ্যাত্মিক সংপ্রাপ্তির উপরই জোর দিয়া আসিয়াছে। আমাদের ঋষিগণ কখনও ঐহিক বিভব, ক্ষমতা এবং মানযশের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন নাই—তাঁহারা সমাদর দিয়াছিলেন দুঃখ, ত্যাগ এবং সেবাকে।"

১৫ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লিতে সেন্ট টমাস শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ভারতের ধর্ম এবং 'সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে'র প্রভাব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, পড়িয়া আনন্দ হয়।

শিক্ষা-ব্যবস্থায় ধর্ম ও নীতি

ডিসেম্বর মাসে ভারতের অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন-উৎসব হইয়া গেল। বিশিষ্ট দেশনায়ক এবং শিক্ষাব্রতিগণ এই উপলক্ষে যে সব ভাষণ দিয়াছেন তাহাদের অনেকগুলিতে একটি বিষয় খুব সুস্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে—বর্তমান কালে ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে ধর্ম ও নৈতিক

উচ্চাদর্শ-অনুসরণের প্রয়োজনীয়তা-বোধ। বিদ্যার বিশুদ্ধ প্রাঙ্গণে আজকাল যে অশ্রদ্ধা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নৈতিক শৈথিল্য ব্যাপক ভাবে দেখা দিয়াছে, তাহাতে দেশের ভবিষ্যৎ যাহারা গড়িয়া তুলিবে, তাহাদের সম্বন্ধে সত্যই আশঙ্কা জাগে। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য সুনিয়ত দৃঢ় চরিত্রগঠন। জীবনের সকল ক্ষেত্রেই ইহার উপযোগিতা অনস্বীকার্য। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্ম ও নৈতিক আদর্শের অন্তর্ভুক্তি ঘটিলে বিদ্যার্থিগণের চরিত্র-গঠনে প্রচুর সহায়তা করা যাইবে, সন্দেহ নাই। তাই এই দিকে জোর দিবার কথা শিক্ষা-নায়কগণ বুঝিতে পারিতেছেন ও বলিতেছেন। আমাদের রাষ্ট্র 'ধর্মনিরপেক্ষ' বলিয়া এই আশু গুরুতর কর্তব্যটি হইতে সঙ্কুচিত হইবার কারণ আমরা দেখি না। কোন নির্দিষ্ট ধর্মমতের আচার-অনুষ্ঠান এবং বিশ্বাসসমূহ শিখাইবার প্রশ্ন উঠিতেছে না; ধর্মের যাহা সর্বজনীন, সার্বকালিক, সকলের পক্ষে কল্যাণকর চিরন্তন সত্য—যে চরিত্রনীতিগুলি উদার সত্য ও নিঃস্বার্থ বিশ্বহিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেগুলি সহজ করিয়া শিক্ষার্থি-শিক্ষার্থিনীগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে বাধা কি? সেগুলি হিন্দুর যেমন দরকার, মুসলমান-খ্রীষ্টান-পার্শীদেরও তেমনই দরকার। মনু বলিয়াছেন—

> ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
> ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্‌॥
>
> (মনু, ৬।৯২)

"সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তস্থৈর্য, অন্যায়পূর্বক পরধন গ্রহণ না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, বুদ্ধির নির্মলতা, আত্মজ্ঞান, সত্য, অক্রোধ—এই দশটি হইতেছে ধর্মের লক্ষণ।" ধর্মের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে কোন সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ আছে কি?

এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে হইতেছে। (৫ই পৌষ) নয়াদিল্লীতে প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী শ্রীশান্তিস্বরূপ ভাটনাগর তাঁহার সাম্প্রতিক রাশিয়া-ভ্রমণের অভিজ্ঞতাবর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, রাশিয়ায় সাধারণ জনগণের জীবনেও একটি উচ্চস্তরের নিয়মশৃঙ্খলা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়, যদিও অধিকাংশ লোকে ভগবান বা তথাকথিত ধর্মের বেশী ধার ধারে না। আমাদের মনে হয় সম্প্রদায়গত ধর্মের ধার না ধারিলেও ঐ দেশের নায়কগণ তাঁহাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন একটি আদর্শের সন্নিবেশ করিয়াছেন, যাহাতে মানুষের চরিত্রে মনুকথিত উপরোক্ত 'দশকং ধর্মলক্ষণম্‌'-এর অন্ততঃ কতকগুলি বিকশিত হইয়া উঠে।

ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণ্য

কিছুকাল পূর্বে কাশীতে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্র-প্রসাদ প্রায় দুই শত ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতকে নিজহস্তে পা ধোয়াইয়া, কপালে চন্দন মাখাইয়া, মালা পরাইয়া মিষ্ট এবং ১১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা দিয়া তাঁহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করিয়াছেন। প্রাচীন ভারতে রাজাদিগের ব্রাহ্মণকে পূজা ও মান দিবার কথা মনে পড়ে। ব্রাহ্মণকুলে জন্মিলেই বা উপবীত-ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না—ব্রাহ্মণের গুণ ও কর্ম জীবনে যিনি ফুটাইয়া তুলিতে পারেন তিনিই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। এই গুণ ও কর্মের বর্ণনা গীতায় দেখিতে পাই—

> শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
> জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্‌॥
>
> (গীতা, ১৮।৪২)

প্রাচীন ভারত এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা লক্ষিত একটি মহান আদর্শের 'ব্রাহ্মণ্যে'রই পূজা করিয়াছে, জন্মগত অধিকারের দাবী-বিঘোষক কোন শ্রেণী-বিশেষের পূজা করে নাই। আমাদের মনে হয়, রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও তাঁহার উপরোক্ত আচরণে এই 'ব্রাহ্মণ্যে'রই মর্যাদা দিয়াছেন। ভারত জাতিভেদ তুলিয়া দিতে পারে, কিন্তু

'ব্রাহ্মণ্য'কে ভুলিতে পারে না। স্বামী বিবেকানন্দ বার বার ব্রাহ্মণের উচ্চাদর্শের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সকলকেই ধীরে ধীরে ঐ আদর্শের অভিমুখে অগ্রসর হইতে হইবে; ইহাই ভারতীয় সমাজের লক্ষ্য।

ভারতীয় নারীর আদর্শ

ডিসেম্বরের শেষে কটকে নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে মহিলা-শাখার সভানেত্রী শ্রীমতী লীলা মজুমদার যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহা আমাদের বর্তমান আদর্শ-সংঘাতের দিনে বিশেষ অনুধাবনীয়। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, আমাদের স্ত্রীজাতির সমস্যা তাঁহারা নিজেরাই সমাধান করিবেন। পুরুষরা যেন জোর করিয়া কোন আদর্শ, মত বা আচরণধারা তাঁহাদের উপর চাপাইতে না যান। পুরুষদের কাজ হইবে তাঁহাদিগের শিক্ষা ও স্বাবলম্বনে সহায়তা করা। বর্তমান বিশ্বের পটভূমিতে সমস্ত দেশেই নারীগণ স্বকীয় আদর্শ, চরিত্ররীতি, কর্মপ্রণালী এবং পুরুষদের সহিত পারস্পরিক সম্বন্ধ-বিষয়ে সচেতন হইয়াছেন এবং আপন আপন পন্থা বাছিয়া লইতেছেন। সকল দেশের পন্থা কখনও এক হইতে পারে না। তাই ভারতীয় নারীসমাজের প্রগতি যে হুবহু আমেরিকা, রাশিয়া, চীন বা তুরস্কের নারীগণের অগ্রগতির অনুরূপ হইবে এরূপ চিন্তা করা অন্যায়। তাহাতে বরং অমঙ্গলই। শ্রীযুক্তা মজুমদার বলিয়াছেন—

"নারী-স্বাধীনতা মানে নয় শুধু ট্রামে-বাসে সিনেমায় গিয়ে পরে দোকানে-বাজারে অভিভাবক-শূন্য হয়ে বিচরণ করা। নারী-স্বাধীনতার মানে নয় শুধু স্কুলে কলেজে আপিসে আদালতে পুরুষদের সঙ্গে সমান আসনে বসবার অধিকার-লাভ করা। নারী-স্বাধীনতার মানে নয় শুধু পৈতৃক সম্পত্তির অংশ দাবী করা বা অযোগ্য স্বামীকে ত্যাগ করবার অধিকার পাওয়া। সহস্র নতুন আইন আমাদের নারী-স্বাধীনতা এনে দেবে না, যদি না আমরা সেই সঙ্গে পুরুষদের সঙ্গে সমান অংশে দায়িত্বের ভার গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকি; যদি না আমাদের নারীত্বের কর্তব্যগুলি স্বীকার করি।

* * * *

"পরমহংসদেব প্রায়ই 'অ-বিদ্যার' কথা বলতেন। সে মূর্খতার চেয়েও সাংঘাতিক। আমরা আপাততঃ অ-বিদ্যার কবলে পড়েছি। শূন্য ভাণ্ডকে শীতল জল দিয়ে ভরা যায়, অমৃত দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ ক'রে দেওয়া যায়। কিন্তু যে আধার আবর্জনা দিয়ে পূর্ণ থাকে তাকে নিয়েই গোলযোগ বাধে। আমাদের অ-বিদ্যা দূর না করলে বিদ্যার প্রতিষ্ঠা করব কোথায়?

* * * *

"আমাদের শিক্ষা তখনই ঠিক পথে প্রবাহিত হবে যখন তাদের সঙ্গে পরিচিত হবামাত্র তাদের ভারতবর্ষের কন্যা বলে চেনা যাবে; তখন তাদের চলাফেরায় কথা-বার্তায় কাজকর্মে ভারতবর্ষের নিজস্ব পরিচয়টুকু পাওয়া যাবে। নইলে আধুনিকা বলে যে গৃহকর্মে অনভ্যস্তা, বাক্‌চতুরা, প্রসাধনসুনিপুণা এক জাতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, যাদের হাবভাবে, আকৃতি-ইঙ্গিতে, কথাবার্তায়, পরস্পরের মধ্যে কোনও বৈশিষ্ট্য নেই, তারা আমাদের নবতম সম্পদ নয়। তারা প্লাষ্টিকের অলঙ্কারের মত সুশ্রী, বিদেশী আমদানী। আমাদের দেশের সত্যিকারের যে আধুনিকা সে বিলেত থেকে আমদানী হবে না, সে আমাদের চিরন্তন গাছটির নবতম শুভ্র কুসুমের মত আমাদের পুরোন রসে সঞ্জীবিত হয়ে নতুন আলোতে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠবে। সেই হবে আমাদের দেশের নবতম শ্রেষ্ঠতম পরিচয়।

গুরু গোবিন্দসিংহ

গত মাসে গুরু গোবিন্দসিংহের জন্মদিন শিখসমাজ নানাস্থানে পালন করিয়াছেন। এই অসামান্য হৃদয়বত্তা, প্রতিভা ও তেজস্বিতা-সম্পন্ন পুরুষ-প্রবরের জীবন, কর্ম ও বাণী শুধু শিখ-সমাজের নয়, হিন্দুসমাজেরও বিশেষভাবে আলোচনা করিবার প্রয়োজনীয়তা আছে। গোবিন্দসিংহ ছিলেন ধর্মগুরু, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত ধর্ম ছিল বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়, দুর্জয় সাহস, জ্বলন্ত বিশ্বাস ও পবিত্রতা এবং উদার একতার ধর্ম। ঐ ধর্ম মানুষকে মেরুদণ্ডহীন মিথ্যাচারী কাপুরুষ হইতে যথার্থ নির্ভীক সত্যসন্ধ খাঁটি মানুষে পরিণত করিত। আজ ভারতীয় জাতির ধর্মানুশীলনে এইরূপই শক্তিসঞ্চারের কথা আমাদের মনে রাখিতে হইবে।

স্বামিজীর সান্নিধ্যে

৺শচীন্দ্রনাথ বসু

(মহিষাদলের রাজার ম্যানেজার ৺শচীন্দ্রনাথ বসু কাশীতে তাঁহার বাল্যবন্ধু স্বামিজীর অন্যতম শিষ্য চারুবাবু (পরে স্বামী শুভানন্দ)কে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে এই স্মৃতিকথাগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। শচীন বাবু স্বামিজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। —উঃ সঃ)

বেলুড়, ভাড়াটিয়া মঠবাটী, নভেম্বর, ১৮৯৮।

স্বামিজী উপর হইতে নামিলেন। কিছু দিন আগে কাশ্মীর হইতে ফিরিয়াছেন। চেহারা অনেক কাল হইয়া গিয়াছে। প্রণাম করিলাম। সহাস্যবদনে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি শচীন, ভাল আছ তো?" কর্ণে যেন বীণাধ্বনি হইল। ঠাকুরঘরে চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে তাঁহার এক খুড়ী দেখিতে আসিয়াছেন ও এক জন বুড়ী ঝি—যে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছিল। অনেকক্ষণ কথা কহিয়া হলঘরে আসিলেন। আসিয়া কথায় কথায় কাশীর কথা উঠিল। আমাকে স্বামিজী খুঁটিনাটি সব জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। পূর্ববঙ্গে যাইবার খুব ইচ্ছা। কামাখ্যা যাইবেন। ব্রহ্মপুত্রের দৃশ্য দেখিবার ইচ্ছা। দুই তীরে কিরূপ পর্ব্বতশ্রেণী মেঘমালার ন্যায় দৃষ্ট হয়—তাহা দেখিতে সাধ হইয়াছে। আমি কতক কতক বর্ণনা দিলাম। স্বামিজী আমার সহিত বেশ সহৃদয় ব্যবহার করিলেন। বলিলেন—"আর লেক্‌চার ফেকচার দেব না। আর গোলমালে কাজ নেই বাবা, চুপ চাপ স্থিরধীর ভাবে কাজ চলুক।"

তাহার পর হরি মহারাজ আসাতে কাশ্মীরের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি (স্বামিজী) মাঝে মাঝে খুব আবেগপূর্ণ বর্ণনা দিতে লাগিলেন। হিমবাহের (glacier) বর্ণনা বড়ই হৃদয়গ্রাহী। পরে অমরনাথের কথা বলিতে তাঁহার বিশাল চক্ষু আরক্তিম হইয়া গেল। লর্ড ল্যান্সডাউন্ কাশ্মীর-সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলাতে বলিলেন—"খুবই ঠিক। সুইট্‌জারল্যাণ্ডে যা' সব চেয়ে চিত্তাকর্ষক দৃশ্য তা' দেখবার জন্য আলমোড়া ছাড়িয়ে যাবার দরকার হয় না। আলমোড়াতেই তা মিলবে। কাশ্মীরের তুলনা নেই।" তাহার পর অমরনাথে তাঁহার কিরূপে স্তবের ভাব আসিতে লাগিল তাহা বলিতে লাগিলেন। তুষাররাজি দেখিয়া কিরূপ অভূতপূর্ব্ব আনন্দ হইয়াছিল তাহাও বলিলেন। কহিলেন—"ঈশ্বর আছেন কিনা বলতে পারি না; কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্ম আছেন, আর দেবদেবী আছেন, তা সম্পূর্ণ জেনেছি।"

একজন বৃদ্ধ চাকর আসিয়া উপস্থিত হইল—স্বামিজীকে সে স্কুলে লইয়া যাইত। তাঁহাকে ৪্ টাকা দেওয়া হইল।

অপরাহ্নে নূতন মঠের বাড়ীতে বেড়াইতে যাওয়া হইল। জমির পশ্চিম দিকে বরাবর লোহার বেড়া দেওয়া হইয়াছে। ২।৩টা চালা বাঁধা হইয়াছে। কাঠের কাজ চলিতেছে। বেগুন গাছ, ঢেঁড়স গাছ, কুমড়া গাছ প্রভৃতি স্বামী অদ্বৈতানন্দজী লাগাইয়া গিয়াছেন। যে বাড়ী তৈরী হইয়াছে, তাহা মোটামুটি বেশ হইয়াছে। ঠাকুরঘর ও রান্নাঘরের জন্য একটা আলাদা দোতলা বাটী পশ্চিম দিকে প্রস্তুত হইতেছে। হরিপ্রসন্ন মহারাজ দিনরাত

পড়িয়া আছেন। স্বামিজী সহ বাটীর উপরে উঠিলাম। স্বামিজী গঙ্গার পানে তাকাইয়া একটু বাদে "বাচামগোচরমনেকগুণস্বরূপং···বারাণসীপুরপতিং ভজ বিশ্বনাথং" গান গাহিলেন। এইরূপে সন্ধ্যা হইল। শরৎ চক্রবর্তীর সহিত নৌকায় ফিরিলাম।

একদিন বাগবাজারে গেলাম। স্বামিজী বলরাম বাবুর বাড়ীর ছাদের উপর হাবুলের সহিত বেড়াইতেছিলেন—যে হাবুল খুব ভাল বাঁশী বাজাইতে পারে—ঠাকুরের ভক্ত, কাঁকুড়গাছির উৎসবে বাঁশী বাজায়। ও নাকি দূর সম্পর্কে স্বামিজীর দাদা হয়।··· স্বামিজী ছাদ হইতে নামিয়া হলে তাহাকে লইয়া গেলেন। প্রায় আড়াই ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল। ডাক্তার তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছিলেন।

রাস্তায় যাইতে যাইতে হাবুলের সহিত অনেক কথা হইল। বলিল, স্বামিজী তাহার জীবনের অনেক পরিবর্তন করিয়া দিলেন। ···স্বামিজী বলিয়াছেন, "দাদা, বাঙ্গালীর বৈরাগ্য হবে কি? ভোগ করতেই পেলে না; তুলাখ, চার লাখ টাকার উপর বসতেই পেলে না।··· বৈরাগ্য হবে কি করে? জার্মাণীর ভোগ শেষ হয়েছে; এইবার জার্মাণীর বৈরাগ্য হবে; তারপর আমেরিকা, ইংলণ্ডের পালা।"···

হাবুল বলিতে লাগিল, স্বামিজী তাহাকে তারপর বলিলেন, "দাদা, পরমহংস মশায় যা তোকে বলে গেছেন, তাই করে যা; যোগ-টোগের জন্য ঘুরিস নি (হাবুল নাকি যোগের চেষ্টায় ছিল); প্রাণায়ামের ক্রিয়া আপনি হয়ে যাবে।" স্বামিজীকে হাবুল জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভাই স্বামিজী, তুমি অমরনাথের রাস্তায় কেমন আনন্দ পেলে?" স্বামিজী বলিলেন, "দাদা, অতি grand! সেখান থেকে যাওয়া আসা অবধি আমার প্রাণ বড় শান্তির প্রয়াসী হয়েছে। আর work ভাল লাগছে না—একেবারে চুপ করতে ইচ্ছে হচ্ছে—একটা গুফার ভিতর থাকতে পারলেই বাঁচি। অমরনাথের মহাদেব আমার মাথায় ৮ দিন ৮ রাত্রি চড়ে বসেছিলেন। মাথায় বসে খুব হাসতেন। আমি বললাম, 'বাবা, আমার শরীরে রোগ-ভোগ হচ্ছে, আর তুমি হাসবে বই কি?' গুরু মহারাজের যে মূর্তি আমায় আমেরিকা যাবার আগে দেখা দিয়ে আমায় আমেরিকা যেতে আদেশ করেছিল, এবারেও সেই মূর্তি এসে আমাকে অমরনাথ যাবার আদেশ করেছিল। তাই গিয়েছিল।"···

মৃত ও জীবিত

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

লক্ষ লক্ষ হেরি নর-নারী,
তাহাদের ক'জন জীবিত?
প্রাণময় জীবদেহধারী
ঘুরে ফিরে তবু তারা মৃত।

শির যার ভেদি জনতারে
উর্ধ্বে উঠে জীবিত ত সেই।
ডুবে যারা জনপারাবারে
মৃত তারা' কিংবা মরিবেই।

মরিয়া গিয়াছে কত লোক
জীবিত রয়েছে তবু তারা।
চিরজীব তারা পুণ্যশ্লোক
নহে কাল-পারাবারে হারা।

জনতার উর্ধ্বে যারা রাজে
তাদেরো অনেকে যাবে মরি,
কেহ কেহ তাহাদের মাঝে
বেঁচে রবে চির দিন ধরি।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

স্বামী বাসুদেবানন্দ

১৯১৫ খৃঃ ৺জগদ্ধাত্রী-পূজার সময় আমরা বাকুড়া দুভিক্ষকেন্দ্র থেকে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের জন্য জয়রামবাটী যাই। একদিন মা বসে বসে আমাদের খাওয়াচ্ছেন, এক জন পরিবেশন করছেন। মা হাসতে হাসতে বলছেন, দেখ ঠাকুর এসেছেন, তাই তাঁর কৃপায় এই সব ছোট ছোট ছেলেদেরও জ্ঞান-চোখ খুলে যাচ্ছে। বাপ-মা ফেলে সব চলে এসেছে, কেমন ঠাকুরের কাজ করছে! নইলে ঐ সব সংসার কেউ ছাড়তে পারে? এখন দেখ আমরাই ওদের আপনার, আত্মীয়-স্বজন পর হয়ে গেছে।

এই সময় কয়েক জন ভক্তকে মা এক দিন বলছেন, যদি ঠাকুর না আসতেন, তিনি যদি অহৈতুকী কৃপা না করতেন, তা হলে কি কারুর সাধ্যি আছে যে এই মায়ার বন্ধন কাটে? তিনি নিজে কঠোর তপস্যা করে তার ফল জীবের কর্মফল-নাশের জন্য দান করলেন। দেখছ না, যে গাছে হয়ত বহু বছর পরে ফলফুল ফলত, সেই সব গাছে তিনি রাতারাতি ফলফুল ধরাচ্ছেন? জীবের পাপ-গ্রহণ কোরে তিনি কি কষ্টই না সহ্য কোরেছেন! সে গলার যন্ত্রণা দেখলে বুঝতে পারতে। কিন্তু লোকের কল্যাণের জন্য কথা বলতে ছাড়তেন না, বরং কেউ না এলে দুঃখিত হতেন।

* * *

একদিন (১৯১৮ খৃঃ) উদ্বোধনের গলি দিয়ে বিক্রীর জন্য 'ধারাপাত', 'প্রথম ভাগ', 'গোলোকধাম' ও 'ঘোড়দৌড়' খেলার ছক হেঁকে যাচ্ছে। রাধু বললে, হরিহরদা, ওকে ডাক, আমি গোলোকধাম, ঘোড়দৌড়ের ছক কিনব। ডাকলুম। মা ঘোড়-দৌড়ের ছক দেখে বললেন, এ আবার কি খেলা? রাধু বুঝিয়ে দিল, এ খেলার শেষটা ওঠা বড় কঠিন। মা দেখে চিন্তা কোরে একটু হেসে বললেন, সংসারেও এমনি; শেষ রক্ষেই রক্ষে। বেশ সারা জীবন চলে গেল, কিন্তু শেষটা অসুখ-বিসুখ, রোগভোগ, শোক-তাপ কত কি জ্বালা! ঠাকুরের কৃপা থাকলে শেষটাও বেশ উৎরে যায়। প্রারব্ধের শেষ কি না—অনেকে হাবুডুবু খায়। যারা ঠাকুরের শরণ নেয় তিনি তাদের প্রারব্ধ খণ্ডন কোরে দেন। তাঁর কত দয়া! তিনি কপালমোচন। তবে খুব যাদের প্রারব্ধ তাদের একটু টাল-মাটাল খাইয়ে তার পর ভোগ থেমে যায়।

এক জন ভক্তমহিলা গোলোকধামখানা খুঁটিনাটি কোরে দেখছিলেন। মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, মা, এই রকম সব লোক আছে নাকি? মা বললেন, আছে বৈ কি; যতক্ষণ অজ্ঞান, ততক্ষণ এই সব ভানুমতীর খেলা আছে। ঈশ্বর-দর্শন হলে এসব ছায়ার মত মিশে যায়। তখন এক ঈশ্বরই সত্য, আর সব মিথ্যা।

মহিলাটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, এই সব জায়গায় লোকে যায় কি করে? মা বললেন, স্থূল দেহের পাত হলে সূক্ষ্ম শরীরের কর্মের সংস্কার-অনুযায়ী ঐ সব ভাল-মন্দ লোকে গতি হয়। তাতে অজ্ঞানী জীব সূক্ষ্মশরীরের গতিটাই নিজের গতি বলে মনে করে। দেখনা, মন স্বপ্ন দেখে, তখন এই বাহ্য বাস্তব জগৎ ভুল হয়ে গিয়ে স্বপ্নজগৎটাই সত্য বলে হয়।

মহিলাটি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ঘুম ভেঙে

গেলে আবার আমরা জেগে উঠি। ওখানকারও ত ঘুম ভাঙে? মা বললেন, জাগ্রৎও যেমন সংস্কার, স্বপ্নও তেমনি সংস্কার, আবার পরলোকও তেমনি সংস্কার। জগতের সবই অনিত্য, তখন সংস্কারও অনিত্য, এক দিন না এক দিন ক্ষয় হবে, তখন ঘুম ভাঙবে।

ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, সংস্কার যদি ক্ষয় হয়, তবে আবার জন্ম হয় কেন?

মা বললেন, সংস্কার কি সোজা গা? অনন্ত জীবনের অনন্ত সংস্কার তোলা রয়েছে। একদল গেল তো আর এক দল আসে, রক্তবীজের বংশ!

ভদ্রমহিলা—তা হলে এর হাত থেকে রেহাই কি করে পাওয়া যাবে?

মা—সব বাসনা ত্যাগ কোরে যারা সচ্চিদানন্দ চায়, তারাই মুক্ত হয়ে গেল। বাসনাই এই সংস্কারগুলোকে জাগিয়ে তোলে।

ভদ্রমহিলা—এখন সচ্চিদানন্দে মতি হয় কি কোরে বলে দিন।

মা—তিনি যখন আকর্ষণ করেন তখনই কৃষ্ণে মতি হয়।

ভদ্রমহিলা—তিনি আমাদের টানছেন না কেন?

মা—তিনি স্বতন্ত্র পুরুষ। তাঁর লীলা কোন আইন-কানুনের বশ নয়। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন! তাঁর ইচ্ছা হলে মায়া আর জীবকে বন্ধন করে না। ঠাকুর বলতেন, তাঁর ছেলে-মানুষের স্বভাব। যে চায় না তাকে দিয়ে দিলে, যে চায় তাকে দিলে না!

ভদ্রমহিলা—তা হলে আমাদের কর্তব্য কি?

মা বললেন, তাঁর কৃপা প্রতীক্ষা কোরে থাকা। তাঁর আদেশ-পালন করা। তিনি তো যুগে যুগে এসে জীবকে কত উপদেশ দিচ্ছেন। কিন্তু পালন করে কে? এই ত চোখের সামনে ঠাকুরের ত্যাগবৈরাগ্য, সাধনভজন, উপদেশ দেখলে, শুনলে। এখন কর্তব্য ত তোমার নিজের মুঠোর মধ্যে। বলেছেন, 'একটাও করলে ভেসে যাবে।'

ভদ্রমহিলাটি মাকে প্রণাম করে বললেন,—যাই বলুন মা, আপনি কৃপা না কোরলে কিছুই কিছু নয়।

মা হাসলেন—বললেন, তোমাদের সব মঙ্গল হোক।

* * *

কপিল মহারাজের (স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ) অসুখ করায় (১৩২৫, বৈশাখ) মঠ থেকে আমাকে 'উদ্বোধনে' পূজা করতে পাঠান হলো। বলরামমন্দিরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজের দেহরক্ষার কিছু দিন পূর্বে (১৪ই শ্রাবণ, ১৩২৫) এক দিন সন্ধ্যারতির পূর্বে ঠাকুরঘরে (এখানেই শ্রীশ্রীমা থাকতেন) ধ্যান করছি, কিন্তু নীচে ভীষণ তর্ক বেধে গেছে যুদ্ধ-সম্বন্ধে। খুব অসুবিধা বোধ হতে লাগলো। কিছু দূরে মা বসে। রাধু এসে মাঝে মাঝে এটা সেটা প্রশ্ন করছে। বেলুড় মঠের সান্ধ্য নির্জনতা একেবারেই নেই, কিন্তু সামনে গুরু স্বয়ং। তথাপি মনে হচ্ছে 'এ কোথায় এলুম, এখানে যে ভয়ানক গোলমাল।' তখনই রাধু বলে উঠলো,—চল পিসিমা, জয়রামবাটী যাই। মা বলছেন, তা বললে কি হয়? হরিঠাকুর যখন যেখানে রাখেন তখন সেখানেই থাকতে হয়। আমার মনে ছ্যাঁক করে উঠলো, এ তো মা আমাকেই বলছেন, তাঁর ইচ্ছায় আত্মসমর্পণ কোরে সকল অবস্থায় সর্বংসহ হয়ে পড়ে থাকতে হয়। তখনি শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা মনে উঠলো, "ঘুঁটি সব ঘর না ঘুরলে চিকে ওঠে না।" মনে খুব ধিক্কার উঠলো,—সামনে গুরু, আর ভাবছি কোথায় যাব? আরতির পর শ্রীশ্রীমায়ের পদধূলি নিয়ে প্রার্থনা করলুম, মা, যেন সর্বাবস্থায় আপনার পাদপদ্মে অচলা ভক্তি থাকে। আপনার পাদপদ্ম যেন ভুলিয়ে দেবেন না। মা মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন।

'উদ্বোধনে' থাকা-কালীন শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের পুজার পর চরণামৃত নিতেন। একদিন বাগ-বাজারের ৬সিদ্ধেশ্বরীর চরণামৃত এসেছে। আমি ২টি পৃথক পৃথক পাত্রে কোরে তাঁর সামনে ধরলুম। তিনি দোতলার বারান্দায় রেলিংএর ধারে দাঁড়িয়ে (এখন সেখানে নাটমন্দিরের মত ছাত ও মেঝে হয়ে গেছে)। জিজ্ঞেস করলেন, ও দুটো কি? আমি বললুম, "একটিতে সিদ্ধেশ্বরীর চরণামৃত এবং আর একটিতে আমাদের ঠাকুরের চরণামৃত। বললেন, ও একই, তুমি মিশিয়ে দাও। আমি বললুম, আচ্ছা, কাল থেকে দেব। দেখলুম গম্ভীর হয়ে উঠলেন; বললেন, না, এখুনি আমার সামনেই তুমি মিশিয়ে দাও; আমি তখনই মিশিয়ে দিলুম, মা গ্রহণ করলেন। তারপর হাস্যমুখে সেই হাত আমার মাথায় বুলিয়ে দিলেন।

* * *

তখন 'উদ্বোধনে' ঠাকুরপূজা করি। সে দিন গুরুপূর্ণিমা; শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে বাতাস করছি, বেলা দশটা। মঠ থেকে সাধুব্রহ্মচারীরা ফল-পুষ্প-পত্রাদি নিয়ে শ্রীশ্রীমার পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্য এসেছেন। তাঁরা অঞ্জলি-অন্তে চলে গেলে মা কৃষ্ণলাল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেউ আমরুলি শাক্ এনেছে?—বলে হাসতে লাগলেন। বললেন,—দেখ, ঠাকুরের আকর্ষণ, তাঁর আকর্ষণে সব আসছে। সূর্যোদয়ে চাঁদও ম্লান হয়ে যায়, আবার পূর্ণিমায় কেবল বড় তারাগুলো দেখা যায়; চাঁদের আলোয় তারাও মিট মিট করে, কিন্তু সেই চাঁদ একটু সরে দাঁড়ায়, আর লোকে দেখে আকাশ-ভরা তারা।

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েদের কি হবে? এদের কি নিবেদিতাতেই শেষ হয়ে গেল?

মা বললেন,—তা কেন হবে মা? তারাও মুক্ত হবে। ঠাকুর কি শুধু পুরুষদের জন্য এসেছেন? মেয়েদের জন্যও এসেছেন। তারা কেউ কেউ তাঁর সঙ্গেই, তাঁর কাছ থেকেই এসেছে, কেউ কেউ মুক্ত হবার জন্য এসেছে, পরেও অনেকে আসবে। একটু একটু বাসনা আছে; নইলে জন্ম হবে কেন? কাকেও কাকেও তাঁর কাজের জন্য নিয়ে এসেছেন।

গোলাপ মা বললেন, শরতের কাছে শুনো, সুধীরা একদিন স্বপ্নে দেখলে, ঠাকুর একঘরে সভা কোরে বসে আছেন, নানান লোকজন —স্ত্রী-পুরুষ। সুধীরাকে বললেন, 'আমার একটু কাজ কোরে আসবি?' সে স্বীকৃত হলো, তখন বললেন, 'ঐ দরজাটা দিয়ে যা।' সে বললে, 'দরজা খুলে যেতেই দেখি এই সংসার'। (সুধীরা দেবীর দেহরক্ষার পর পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট ঐ কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি অনুরূপ কথাই বলেন।)

মা আবার বলতে লাগলেন,—কেউ কেউ জীবদুঃখে কাতর হয়ে এসেছে, দেখ কেমন ত্যাগী! একটু আধটু বাসনা আছে। জীবের প্রতি দুঃখ-বোধ থাকলেই জীবাদৃষ্ট গ্রহণ করতে হবেই—তাই জন্ম। কিন্তু জেনো সংসার-সমুদ্র অথৈ, কত হাতী এতে তলিয়ে গেল! খুব সাবধানে থাকতে হয়। গুরু কে? যিনি জীবের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান জানেন। তবে, এবার যারা ঠাকুরের কৃপার গণ্ডির মধ্যে এসে পড়েছে, তাদের শেষ জন্ম; তাদের আর ভয় নেই। ঠাকুরই কেমন কৌশল কোরে মায়ামুক্ত করে দেবেন; তিনি ঢেলা দিয়ে ঢেলা ভাঙেন। তাঁর কৃপায় মুক্ত হলে জীব নির্মল আকাশে পাখীর মত আনন্দে তাঁর মহিমা-গান কোরে কোরে বেড়ায়।...... শ্রীরামকৃষ্ণ-লোকের বিশ্রামই হলো ধ্যান।...... সেবার পরিশ্রমের মূল্য সেখানে বুঝতে পারবে।

(দুই)

স্বামী সিদ্ধানন্দ

১৯১৪ সালে শ্রীশ্রীমা বাগবাজারে 'উদ্বোধনে' মায়ের বাড়ীতে আমায় কৃপা করেন। পূজনীয় ব্রহ্মানন্দ মহারাজ আমায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট পাঠান। রাখাল মহারাজ তখন ৺কাশীধামে ছিলেন।

শরৎ মহারাজ খুব গম্ভীর পুরুষ। যাহা হউক, ভয়ে ভয়ে গিয়া তাঁহাকে বলিলাম, মহারাজ, আমার দীক্ষার বিষয় মাকে জানাতে বলেছেন। শরৎ মহারাজ বলিলেন, তুমি কাল আসনি কেন? তিনি তখনই কপিল মহারাজকে ডাকিয়া মহারাজের কথা মাকে জানাইতে বলিলেন। মা সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিলেন, ছেলেটিকে গঙ্গাস্নান করে আস্‌তে বলো। আমি গঙ্গাস্নান করিয়াই গিয়াছিলাম। মার কাছে যাওয়া-মাত্র বলিলেন, বেশ, রাখাল পাঠিয়েছে, আর কথা কি? আর তুমি ত আমাদের আপনার জন গা। দীক্ষার সময় আমার মনের অবস্থা ভাষায় প্রকাশ করিবার নয়। কেবল সে অভূতপূর্ব আনন্দের স্মৃতি সুস্পষ্ট রহিয়াছে। সেদিন কিছুই লইয়া যাইতে পারি নাই। পরদিন কিছু প্রণামী দিয়া মাকে দর্শন করিয়া আসিলাম। মন্ত্রে একটু সন্দেহ হওয়ায় মা ঠিক করিয়া দিলেন।

একদিন ভোরে 'উদ্বোধনে' মাকে প্রণাম করিতে গেলাম। ঐ সময় শরৎ মহারাজ প্রভৃতি ২।৪ জন সাধু মাকে প্রণাম করিতেছিলেন। শরৎ মহারাজের প্রণাম একটা দেখিবার জিনিষ ছিল। এমন ভাবটি, যেন প্রণামের সঙ্গে সর্বস্ব অর্পণ, আত্মসমর্পণ করিতেছেন! মাও প্রণাম করা-মাত্র চিবুক-স্পর্শ করিয়া ও মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

৺কাশী হইতে আর এক বার গিয়াছি। মা যেন বেশ চিন্তিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, লাটু ভাল আছে ত? আমি বলিলাম, হাঁ মা, ভাল আছেন। বিশেষ একটা কাজে আমি কলিকাতা আসিয়াছিলাম। মাকে বলিলাম, লাটু মহারাজের কাছে থাকা বেশ কঠিন। মা বলিলেন, লাটু কি কম গা? তখন (দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন) আমার কাছে কারুর আসবার হুকুম ছিল না; লাটু আসতো। লাটু আমার ময়দা-ঠাসা, বাজার-করা প্রভৃতি কাজ করে দিত। লাটুর কাছে থাক্‌লে তোমার কল্যাণ হবে।

এক বার লাটু মহারাজকে শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটী যাওয়ার কথা বলায় সন্তুষ্ট চিত্তে তিনি আমায় যাওয়ার আদেশ দিলেন। বলিলেন, গুরুস্থান, যাবে বৈ কি? শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির পূর্বেই তাঁহার শ্রীচরণে পৌছিলাম। মা খুব খুসী হইলেন। জন্মতিথি-দিবসে তাঁহার শ্রীচরণে ফুল দিয়া পূজা করিলাম। সে যে কি গভীর পরিতৃপ্তি তাহা বলিবার নয়। মার শ্রীচরণপূজার ও করুণা-দৃষ্টি স্মরণ করিয়া এখনও আনন্দ হইতেছে।

আর এক বার শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে জয়রামবাটীতে গিয়াছিলাম। মা খুব যত্ন করিয়া খাওয়াইতেন ও নিজেই এঁটো পরিষ্কার করিতেন; বারণ করিলে শুনিতেন না। বলিতেন, তোমরা আমার ছেলে। মা খবর লইলেন, শীতের জন্য বস্ত্র আছে কিনা। আছে বলিলাম। মা বলিলেন, অনেক ছেলেরা আনে না। শীতকাল— গরম কাপড় দরকার। একদিন মা মুড়ি ভাজিতেছিলেন। কাছে যাওয়া-মাত্র মা তখনই মুড়ি-জিলাপী খাইতে দিলেন।

বিদায় লইবার সময় মা একখানি কাপড় দিলেন। আমি কালীমামার নিকট গিয়া দেখাইতে তিনি উহা মাথায় জড়াইয়া লইতে বলিলেন।

৺কাশীধাম হইতে কলিকাতা যাওয়ার সময় জনৈক ভক্তকে লাটু মহারাজ বলিয়াছিলেন, আমার দক্ষিণেশ্বরের মা, আমার মা। তিনি ঐ কথা মাকে বলায় মা একটু হাসিলেন। লাটু মহারাজ মায়ের জন্য কাশী হইতে লোক সঙ্গে নূতন কপি, বেগুন ইত্যাদি পাঠাইয়া দিতেন। লাটু মহারাজ একদিন বলিয়াছিলেন, তোরা মাকে কি মনে করিস? মুখেই মা মা করিস্। অমন মাতৃভক্তি আমি চাই না। আমার মা লক্ষ্মী। আবার কখনও তিনি সীতা। মা আমার ভূত-ভবিষ্যৎ সব জানেন।

কাশীতে একদিন লাটু মহারাজ সহ ৺বিশ্বনাথ-দর্শনে যাইতেছিলাম। সে সময় মা কাশীতে একটি ভক্তের বাড়ীতে ছিলেন। রাস্তা হইতে ফিরিয়া লাটু মহারাজ বলিলেন, এখানে সাক্ষাৎ মা আছেন। লাটু মহারাজের সঙ্গে আমরা সকলে আগে শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে গেলাম। মাকে প্রণাম করার সঙ্গে সঙ্গে লাটু মহারাজের ভাব হইল। নীচে নামিয়া বলিলেন, প্রসাদ নিয়ে এস। মা প্রসাদ দিলেন।

বৈদিক সাহিত্যে কৃষি

অধ্যাপক শ্রীবিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য, এম্-এ

মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার খননকার্যের ফলে অবশ্য বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত সভ্যতাই যে প্রাচীনতম সভ্যতা নয়—তার অনেক আগে হ'তেই যে একটা সভ্যতা এই ভারতবর্ষেরই বুকের উপর জাঁকিয়ে রাজত্ব কোরেছিল এবং সেটা যে বৈদিক সভ্যতা হোতে উন্নত না হোলেও হীন নয়—এ ধারণার সৃষ্টি হোয়েছে। নবাবিষ্কৃত এই সভ্যতাকে প্রাগ্-বৈদিক ব'লে যাঁরা মনে করেন তাঁরা ধ'রে নেন যে, আর্যরা বাহির হতে এর অনেক পরে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু সমস্ত বৈদিক সাহিত্য তন্ন তন্ন কোরে ঘেঁটেও এমন একটা কথাও পাই নি, যার থেকে প্রমাণ করা যেতে পারে যে, আর্যরা বহির্দেশ হ'তে আমাদের দেশে এসেছিলেন। এ ধারণা আমাদের মনে সৃষ্টি করেছে ইংরেজরা, আর সেই ধারণা নিয়েই আমাদের দেশের ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখে গিয়েছেন। বস্তুতঃ 'আর্য'-শব্দ কৃষ্টিবাচক, জাতিবাচক নয়।

কিন্তু আমাদের সত্যকার ইতিহাসবধূকে বিলুপ্তির অন্তঃপুর থেকে টেনে আন্বার দায়িত্ব আমাদেরই—তার বিস্মৃতির অবগুণ্ঠনকে মোচন কোরে তাকে বিশ্বের দরবারে প্রতিষ্ঠিত করার কর্তব্যও আমাদেরই। মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার সভ্যতা খাঁটি বৈদিক সভ্যতা—নির্ভেজাল ভারতীয় সভ্যতা।

মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ যে উচ্চস্তরের সভ্যতার পরিচয় দেয় তা, একদিনে

নিশ্চয়ই গ'ড়ে ওঠে নি। একথা মার্শাল সাহেবও স্বীকার কোরেছেন, যখন তিনি বোলেছেন—"One thing that stands out clear and unmistakable both at Mohenjodaro and Harappa that the civilization revealed at these two places, is not an incipient civilization but one already ageold and stereotyped on Indian soil with *many millenia* of human endeavour behind it." সে সভ্যতার উৎসমুখে পিছন ফিরে চাইলে কতদূরে আমাদের দৃষ্টি যায় তাও বলা সহজ নয়। সে সভ্যতার ভাষা ও সাহিত্য নিশ্চয়ই বৈদিক সাহিত্যের ভাষা হতে ভিন্ন—আজও আবিষ্কৃত শীলমোহরগুলির পাঠোদ্ধার হয় নি। যে ভাষায় ও যে সাহিত্যে সেই সভ্যতার ইতিহাস বাঁধা ছিল তাও আজ লুপ্ত। বৈদিক সাহিত্য যে সভ্যতার ইতিহাস, সে সভ্যতা প্রাচীনতম নয়, তাহা মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পা-সভ্যতারই একটা অবিচ্ছিন্ন, হয়তো বা, উন্নততর ধারা—বৈদিক ঋষিদের পূর্বপুরুষরা এবং দেশবাসীরাই তার প্রতিষ্ঠাতা। এই অর্থেই উহা প্রাগ্-বৈদিক। উভয় সভ্যতার মধ্যে পথগত ব্যবধান আছে, উৎসগত ব্যবধান নেই। তবে ইতিহাস হিসাবে বৈদিক সাহিত্যকে প্রাচীনতম না বলে উপায় নেই—প্রাচীনতম ইতিহাস যা ছিল তা 'মৃতের স্তূপে'র (সিন্ধি ভাষায় প্রকৃত শব্দ 'মো অন্ জো দড়ো' এবং ইহার অর্থ 'মৃতের স্তূপ') মধ্যেই মরে গেছে। তবে ধারাগত অনবচ্ছিন্নতার জন্য তার কিছু কিছু কথা থেকে গিয়েছে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে—বেদের ঋষিরা স্মরণ করেছেন সে সভ্যতার প্রতিষ্ঠাতৃগণকে, তাঁদের বলেছেন 'পূর্বজ', 'পথিকৃৎ'।

সুতরাং ভারতীয় সভ্যতার প্রথম অধ্যায়ের কথা লিখতে বসলে আজ আর বেদ ছাড়া ঐতিহাসিকের কোনও অবলম্বন নেই। তার পূর্বের ইতিহাস বলবে মোহেন্জোদাড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসস্তূপ এবং আম্‌সি দেখে আমের আকারের অনুমান যতখানি করা চলে, সে ইতিহাসও আমাদের ততখানি পরিমাণেই খাঁটি হবে।

বর্তমান প্রবন্ধে আমি বৈদিক যুগে কৃষি কতখানি উন্নত ছিল, তারই আলোচনা করবো। মনে হয়, মোহেন্-জো-দাড়ো ও হরপ্পার যুগে কৃষির চাইতে বাণিজ্যের উপরই প্রাধান্য দেওয়া হোয়েছিল বেশী—মোহেন্-জো-দাড়ো হ'তে সিন্ধু-প্রদেশ ও বেলুচিস্থানের সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত 'সার্থবাহ-পথ' (Caravan route)-গুলি তারই সাক্ষ্য দেয়। তথাপি কৃষি তখন অনুন্নত ছিল না। মোহেন্‌জো-দাড়োতে গমের যে নমুনা (sample) পাওয়া গিয়েছে, সেগুলো বর্তমানেও পাঞ্জাবে যে শ্রেণীর গম উৎপন্ন হচ্ছে, সাক্ষাৎভাবে তারই পূর্বপুরুষ—বিশেষজ্ঞরাই এ কথা বোলেছেন। রুশ বৈজ্ঞানিকগণ এ কথাও স্বীকার কোরেছেন যে, এখনও পাশ্চাত্যদেশে যে গম জন্মায়, সেগুলো আফগানিস্থান, কাশ্মীর ও পাঞ্জাব থেকেই ওদিকে গিয়ে পড়েছে। তা ছাড়া মোহেন্-জো-দাড়োতে কাপড়ের টুক্‌রো ও সুতাকাটার অসংখ্য টেকো পাওয়া গিয়েছে। কৃষি অত্যন্ত উন্নত না হোলে কোনও জাতিই একসংগে অন্নবস্ত্রের সংস্থান করতে পারে না।

পাশ্চাত্য দেশে ভার্জিল রচিত "Gergic Circa' (খৃঃ পূঃ ৪০) কৃষিবিজ্ঞানের উপর প্রথম গ্রন্থ, এ কথা বোধ হয় খুব অত্যুক্তি নয়। তারপরে ১২৪০ খৃষ্টাব্দে Petrus Crescentius হ'তে আরম্ভ কোরে Van Helmont (১৬২৭), Jethro Tull (১৭৩১), Kulbel (১৭৪১), Priestley (১৭৭৫), Ingen Howz (১৭৭৯) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে Theodore de

Sanssure প্রভৃতি নব নব অবদানে কৃষিবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ কোরে তুলেছেন। নিজের দেশের ঐতিহ্যকে বড় কোরে দেখবার ও দেখাবার জন্য সভ্যতার সবক্ষেত্রে বর্তমান বিজ্ঞানের দানকে গায়ের জোরে অস্বীকার করা চলে না। তবু, আমরা কী হব বা কী হ'তে পারি তা জান্‌তে হ'লে আগে আমাদের বুঝতে হবে আমরা কী ছিলাম।

ঋগ্বেদ ১০।৩৪ সূক্তের একটি মন্ত্রে কৃষির মাহাত্ম্য বোধ হয় সর্বাপেক্ষা আবেগময়ী ভাষায় রূপ পেয়েছে। জুয়া খেলে সর্বস্বান্ত ও অনুতাপদগ্ধ কোনও জুয়াড়ীর মুখ দিয়েই ঋগ্বেদের ঋষি বিধান দিচ্ছেন—

অক্ষৈর্মা দীব্যঃ কৃষিমিৎ কৃষস্ব।
বিত্তে রমস্ব বহুমন্যমানঃ॥
তত্র গাবঃ কিতব তত্র জায়া
তন্মে বিচষ্টে সবিতায়মর্যঃ॥ (ঋ, ১০।৩৪।১৩)

—অর্থাৎ, 'হে কিতব, জুয়া খেলিও না। চাষ কর; তাতেই যা পাবে তাই বহু মনে কোরে সন্তুষ্ট থাক। স্ত্রী, গোধন প্রভৃতি সব কিছুই তা থেকেই হবে। সবিতা আমাকে এই কথাই বোলেছেন।' অথর্ববেদে আছে—

তে কৃষিং চ সস্যং চ মনুষ্যা উপজীবন্তি (৮।১৩।১২)

—অর্থাৎ, কৃষি ও শস্যের উপর নির্ভর কোরেই মানুষ বেঁচে থাকে। কৃষির অপরিহার্য অংগ—ফাল, কিষাণ, বলদ আর জল। তাই ঋগ্বেদের ঋষি প্রার্থনা করছেন—

শুনং ন ফালা বিকৃষন্তু ভূমিং শুনং কীনাশা
অভিযন্তু বাহৈঃ।
শুনং পর্জন্যো মধুনা পয়োভিঃ শুনাসীরা
শুনমস্মাসু ধত্তম্॥ (৪।৫৭।৮)

—অর্থাৎ, 'ফাল উত্তমরূপে জমি কর্ষণ করুক; কিষাণ বলদের সহিত সানন্দে চলিতে থাকুক; মেঘ উত্তম বৃষ্টিদান করুক; হল ও ফাল আমাকে আনন্দ দান করুক।' 'শুনাসীর' শব্দ হল ও ফালকেই (কর্ষণকালে লাংগলের যে অংশ ভূমধ্যে প্রোথিত হইয়া যায়) বুঝাইয়াছে। যজুর্বেদে ও অথর্ববেদেও সামান্য একটু ভাষার হেরফের কোরে ঐ একই প্রার্থনা দেখ্‌তে পাওয়া যায়—

শুনং সুফালা বিকৃষন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অভিযন্তু বাহৈঃ॥
শুনাসীরা হবিষা তোশমানা
সুপিপ্‌পলা ওষধীঃ কর্তনাস্মৈ॥
(যজু, ১২।৬৯)

ও

শুনং সুফালা বিতুদন্তু ভূমিং
শুনং কীনাশা অনুযন্তু বাহান্॥
(অথর্ব, ৩।৩৭।৫)

অথর্ববেদের একটি মন্ত্রেই বলদ, কিষাণ, হল, এমন কী বলদ চালাবার জন্য কিষাণের হাতে 'চাবুকে'রও উল্লেখ আছে। ঐ মন্ত্রেই 'লাংগল'-শব্দেরও উল্লেখ দেখা যায়—

শুনং বাহাঃ শুনং নরঃ শুনং কৃষতু লাংগলম্।
শুনং বরত্রা বধ্যন্তাং শুনমষ্ট্রামুদিংগয়॥ (৩।১৭।৬)

বলদ, কিষাণ ও লাংগল আনন্দের সংগে চাষ করুক। আনন্দের সংগে হল চালাও এবং চাবুক তোল।

আমাদের ভক্ষ্য ও পেয় কৃষিরই দান। তাই এ দুটিকে বলা হ'য়েছে 'কৃষির দুগ্ধ'—

যদশ্নাসি যৎ পিবসি ধান্যং কৃষ্যাঃ পয়ঃ॥
(অথর্ব, ৮।২।১৯)

ভূমি আমাদের মা, আমরা মায়ের দুগ্ধ পান কোরেই বেঁচে থাকি—

মাতা ভূমিঃ পুত্রোঽহং পৃথিব্যাঃ॥ (অথর্ব, ১২।১।১২)

ফাল জমিকর্ষণ করে অন্ন উৎপন্ন ক'রে। ঋগ্বেদের ঋষি বলছেন, পুরুষকার অবলম্বন কর, স্বহস্তে হলচালনা কর, অন্ন আপনা হতেই মিলবে। চলমান ব্যক্তি পদসাহায্যেই পথ

অতিক্রম করে। স্বাবলম্বী হও, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শেখ, অন্নের অভাব কখনই হবে না—

কৃষন্নিৎ ফাল আশিতং কৃণোতি

যন্নধ্বানমপবৃঙ্ক্তে চরিত্রৈঃ॥ (ঋ, ১০।১১৭।৭)

হল বা লাংগলের কথা জানা গেল। বলদে লাংগল টানিত তাহাও জানা গেল। এখন সাধারণতঃ আমরা যে সকল লাংগল দেখি তাহা দুইটি বলদের দ্বারাই বাহিত হয়; কিন্তু বৈদিক যুগে একটি লাংগল ছয়টি, আটটি এমনকী বারটি বলদে পর্যন্ত টানত। ইহা হতে তৎকালে প্রচলিত লাংগলের আয়তন কিছুটা অনুমান করা যেতে পারে। এই সব লাংগলকে 'ষড়্যোগ', 'অষ্টাযোগ', 'দ্বাদশাযোগ' বা 'ষড়্গব', 'অষ্টাগব' বা 'দ্বাদশগব' ব'লে উল্লেখ করা হোয়েছে। বাহুল্যভয়ে মন্ত্রগুলি উদ্ধৃত কোরলাম না, স্থাননির্দেশ কোর্‌লাম মাত্র—অথর্ব, ৮।৯।১৬; ৬।৯১।১; তৈ স, ৫।২।৫।২; শ ব্রা, ১৩।৮।২।৩ ইত্যাদি।

হলচালনার সময় কিষাণ হলের যে অংশ হাত দিয়া চাপিয়া ধরত তাকে বলা হোত 'ৎসরুঃ' (অথর্ব, ৩।১৭।৩)। কিষাণের হাতের চাবুককে বলা হোত 'তোদ', 'তোত্র', 'অষ্ট্রা' (ঋ, ৪।৫৭।৪; ৪।১৬।১১; ৬।৫৩।৯;) ফালের নামান্তর ছিল 'স্তেগ' (ঋ, ১০।৩১।৯; অথর্ব ১৮।১।৩৯)।

মানুষের বাঁচবার পক্ষে কৃষির অপরিহার্যতা ঋষিরা উপলব্ধি কোরেছিলেন। যজ্ঞানুষ্ঠানের দ্বারা তাঁরা শুধু স্বর্গের কামনাই করেন নি, বৃষ্টি ও কৃষির জন্যও প্রার্থনা জানিয়েছেন—

কৃষিশ্চ মে বৃষ্টিশ্চ মে জৈত্রং চ ম ঔদ্ভিদ্যং

চ মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। (যজুঃ, ১৮।৯)

অথর্ববেদেও রাজার বহু কর্তব্যের মধ্যে কৃষির উন্নতিসাধনকেও একটা কর্তব্য বোলে ধরা হোয়েছে—

নো রাজা নি কৃষিং তনোতু॥ (অথর্ব ৩।১২।৪)

কৃষি হ'তে তখনকার দিনে কী কী শস্য উৎপন্ন হোতো, তা জানা আমাদের পক্ষে খুব কষ্টকর নয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে দশ রকম শস্যের নাম পাওয়া যায় (৬।৩।২২)। বাজসনেয়ি-সংহিতায় বার রকম শস্যের নাম পাওয়া যায়—ব্রীহি, যব, মাষ, তিল, মুগ, খল্ব (ছোলা), প্রিয়ঙ্গু, অণু, শ্যামাক, নীবার, গোধূম ও মসূর,—

ব্রীহয়শ্চ মে যবাশ্চ মে মাষাশ্চ মে

তিলাশ্চ মে মুদ্গাশ্চ মে খল্বাশ্চ মে

প্রিয়ংগবশ্চ মে অণবশ্চ মে শ্যামাকাশ্চ

মে নীবারাশ্চ মে গোধূমাশ্চ মে মসূরাশ্চ

মে যজ্ঞেন কল্পন্তাম্। (বা, স, ১৮,১২)

ইহা ছাড়া বৈদিক সাহিত্যে অন্যান্য যে সব শস্যের নাম পাওয়া যায় নীচে তাদের মোটামুটী উল্লেখ ও স্থাননির্দেশ করা গেল—

কুল্মাষ—ছা উ, ১।১০।২; আম্ব—কাঠক স, ১৫।৫; তৈ স, ।১৮।১০।১; নাম্ব—শ ব্রা, ৫।৩।৩।৮; ধানা, ধান্য—ঋ, ১।১৬।২; ৬।১৩।৪; শাণী—অথর্ব, ৩।১৪।৫; গর্মুত—তৈ স, ২।৪।৪।১; গবেধুকা—শ ব্রা, ৫।২; উপবাক—বা,স, ২১।৩০; তির্য, তিল—অথর্ব, ৪।৭।৬; ২।৮।৩; প্রাশুক—শ ব্রা, ৫।৩।৩।২; মসূষ্য—তৈ ব্রা, ৩।৮।১৪।৬; সস্য—অথর্ব, ৭।২।১ ইত্যাদি।

হল জোতা হতে আরম্ভ কোরে ঘরে শস্য তোলা পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরগুলির উল্লেখ আছে—

যুনক্ত সীরা বি যুগা তনুধ্বং

কৃতে যোনৌ বপতেহবীজম্।

গিরা চ শ্রুষ্টিঃ সভরা অসন্নো নেদীয়

ইৎ সৃণ্যঃ পক্বমেয়াৎ। (ঋ, ১০।১০১।৩)

—লাংগল জোড়ো, যুগ (বলদের কাঁধে যে অংশ স্থাপিত থাকে) ঠিক কর, জমি প্রস্তুত করিয়া বীজ বপন কর। গান গাইতে গাইতে আমি প্রচুর ধান্য পাব এবং

ধান পাকলে আমার 'সৃণী' ('কাস্তে' বা 'হেঁসো, যা দ্বারা ধান কাটা হয়) উহার নিকট গমন করবে।

আবার

কৃষন্তো হ স্মৈব পূর্বে, বপন্তো, যন্তি লুনন্তো,
অপরে মৃণন্তঃ। (শ ব্রা, ১।৬।১।৩)

—কেহ হল চালনা করে, কেহ বীজ বপন করে (এদের বলা হ'য়েছে 'ধান্যাকৃৎ'—ঋ, ১০।৯৪।১৩), কেহ ধান কাটে আবার কেউ সেই ধান গাছ হতে ঝেড়ে পৃথক্ করে।

মাঠে ধান পাকলে কৃষক তা' কাস্তে বা হেঁসো দ্বারা কেটে এক স্থানে জড় করত; এই কাস্তে বা হেঁসোকে বলা হত 'সৃণী' বা 'দাত্র'। কাটা ধানগাছগুলি আঁটি বেঁধে রাখা হত। আঁটিকে বলা হত 'পর্ষ'। সমস্ত দিন মাঠে মাঠে ধান কেটে কৃষক তা জড়ো করে রেখেছে, ইন্দ্রের কাছে প্রার্থনা করছে যেন সে তা' ভোগ করতে পারে—

তবেদিন্দ্রাহমাশসা হস্তে দাত্রং চ নাদদে।
দিনস্য বা মঘবন্ সম্ভৃতস্য বা পুর্ধি যবস্য কাশিনা॥
(ঋ, ৮।৭৮।১০)

ঐ ধানের আঁটি ঘরে এনে পাথরের উপর আছাড় দিয়ে ধানগুলিকে গাছ হতে পৃথক করে লওয়া হত। ঐ পাথরকে বলা হত 'খল'। কিংবা 'খল' হয়তো কোনও বৃহৎ পাত্র ছিল, যার মধ্যে গাছগুলি রেখে পেষণ করলেই ধানগুলি আলাদা হয়ে যেত। 'চালুনি' দিয়ে ছাতু চালা হত (ঋ, ১০।৭১।২), চালুনিকে বলা হত 'তিতউ'। ধান কোটা হওয়ার পর কুলায় করে তা' ঝাড়া হত, যাতে তুষ ও খুদগুলি পৃথক্ হয়ে যায় (অথর্ব, ১২।৩।১৯)। এই কুলাকে বলা হত 'শূর্প'। বর্ষাকালে জন্মায় এমন একজাতীয় গুল্ম (বেত?) দ্বারা এই শূর্প তৈরী করা হত—এইজন্য একে বলা হয়েছে 'বর্ষবৃদ্ধ'। ঝাড়বার পর পরিষ্কার চাল বেরোল—এই চালকে বলা হয়েছে 'তণ্ডুল' (অ, ১০।৯।২৬)। এবং যে খোসাগুলি বেরিয়ে যায় তাকে বলা হত 'তুষ' (ঐ, ৯।১৬।১৬)। সতুষ ধানকে বলা হয়েছে 'অকর্ণ' এবং চালকে বলা হয়েছে 'কর্ণ' (তৈ স, ১।৮।৯৩)। চাল বেরোবার পর তাকে মেপে ঘরে তোলা হত। যে পাত্রে মাপা হত তাকে বলা হত 'উর্দর' (ঋ, ২।১৪।১১)।

ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রে কর্ষণোপযোগিতা ও উৎপাদিকা শক্তি-অনুসারে ভূমিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হোয়েছে—(১) আর্তনা (২) অপ্নস্বতী (৩) উর্বরা (ঋ, ১।১২৭।৬)। 'আর্তনা' ভূমিই বোধ হয় সবচেয়ে নিকৃষ্ট ছিল এবং এতে চাষ করা কষ্টসাধ্য ছিল ব'লেই এই রকম নাম দেওয়া হোয়েছে। সব জমিতেই চাষ করা হোত না; গোচারণের জন্য কতকগুলি জমিকে পতিত রাখা হোত। এই জমিকে বলা হত 'খিল' (অথর্ব, ৭।১১৫।৪)। এখনকার মত বোধ হয় তখনও প্রত্যেকের জমির পরিমাণের হিসাব রাখা হোত, কারণ জমি মাপার পদ্ধতি তখন প্রচলিত ছিল (ঋ, ১।১১০।৫)। যাঁরা জমির মাপজোপ-সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের বলা হোত 'ক্ষেত্রবিৎ' (ঋ, ১০।৩২।৫)।

জমির উর্বরতা-শক্তি বাড়াবার জন্য মাঝে মাঝে জমিতে চাষ বন্ধ করা হোত। কখনও বা একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্নরকম শস্যের চাষ করা হোত (তৈ স, ৫।৭।৩)। গোবর যে জমির একটা ভাল সার এ তথ্য তৎকালে অজ্ঞাত ছিল না এবং জমিতে গোবরের সারও দেওয়া হোত (ঋ, ১।১৬১।১০; অথর্ব, ১২।৪।৯; তৈ স, ৭।১।১৯।৩)।

ঋগ্বেদের নিম্নোদ্ধৃত মন্ত্রটি হ'তে জানা যায় যে, জমিতে জলসেচনের জন্য তখনকার লোকে নৈসর্গিক উপায়ের উপর নির্ভর করেই শুধু ব'সে থাক্‌তো না, কৃত্রিম উপায়ে নদী পর্যন্ত খাল খনন কোরে জমিতে জল আনা হোত—

যা আপো দিব্যা উত বা স্রবন্তি
খনিত্রিমা উত বা যাঃ স্বয়ংজাঃ ॥
সমুদ্রার্থা যাঃ শুচয়ঃ পাবকাঃ
তা আপো দেবীরিহ মামবন্তু ॥

(ঋ, ৭।৪৯।২)

এই মন্ত্রে জলকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হোয়েছে—(১) দিব্যা আপঃ—অর্থাৎ, বৃষ্টির জল। (২) খনিত্রিমা আপঃ অর্থাৎ যে জল খাল খনন করে আনা হত। (৩) স্বয়ংজা আপঃ—অর্থাৎ স্বভাবজাত ঝরণা ইত্যাদির জল। 'খনিত্রিমা আপঃ'-সম্বন্ধে Vedic Index-এর উক্তি এই প্রসংগে প্রণিধানযোগ্য—"Khanitrima apah, waters produced by digging, clearly refers to artificial water channels used for irrigation."

মোটামুটি বৈদিক যুগের কৃষি-সম্বন্ধে যেটুকু বিবরণ দেওয়া হল তাতে তৎকালীন কৃষিকে কোনও রূপেই নিম্নস্তরের বলা চলতে পারে না। বিশেষতঃ, এখন আমরা দ্বাদশবৃষ-বাহিত বৃহদায়তন লাংগলের কথা কল্পনাতেও আনতে পারি না। অনুসন্ধান করলে কৃষিসম্বন্ধীয় আরও অনেক তথ্যই উদ্‌ঘাটিত হতে পারে। এই বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করব।

বিশ্ব-দেউলের দেবতা

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

নুয়ে পড়া দেহ টেনে টেনে নিয়ে বৃদ্ধ অশীতিপর
গেল বছরেও গিয়াছিল রথে লাঠিতে করিয়া ভর।
বিগ্রহ যবে মন্দির হ'তে উঠাল রথের 'পরে,
গাঁথি মালা নানা গন্ধ-কুসুমে পরম ভক্তিভরে
সাজায়ে অর্ঘ্য নানা উপচারে পূজিয়া জগন্নাথে,
ভূমিতল হ'তে পদরজ লয়ে মাখিল আপন মাথে।
তারপর রথ হ'লে গতিমান রশিটি পরশ করি'
'জয় জগন্নাথ' ধ্বনিল আননে—পরাণ উঠিল ভরি'।
বরষের পরে আজি পুন এল রথযাত্রার দিন ;—
আজিকে বৃদ্ধ লাঠির ভরেও চলিতে শক্তিহীন।

ঢুকে গেছে দূর মন্দিরে গিয়া মাল্য অর্ঘ্য দান,
নাহি আর আশা রশি পরশের রথে যবে পড়ে টান।
বসতি তাহার পর্ণকুটিরে যাতায়াত-পথ পাশে—
না হ'তে প্রভাত রথযাত্রীর কোলাহল কানে ভাসে।
বৃদ্ধ তখন তনয়ে ডাকিয়া কহিল আবেগ-ভরে—
"অঙ্গন মোর পূত করে' রাখ গোময়ে লেপন করে।
আসিবেন এই অঙ্গনতলে দয়াল জগন্নাথ,
করিব বরণ পিতা ও পুত্র মোরা হয়ে একসাথ।"
ভাবিল তনয়—এ বাণী পিতার নিরাশ বেদনাময়।
ব্যথা পেয়ে তাই পিতারে সে ধীরে সুকোমল স্বরে কয়—
"বহুদূরে রহে ঠাকুরের রথ, কেমনে আসিবে হেথা ?
দুঃখ ক'রো না, বহিয়া তোমারে আমি নিয়ে যাব সেথা।"
শুনে কহে পিতা—"ভুল বুঝো না'ক, কোন ব্যথা নাই মনে,
বলেছি সত্য, রথে চড়ে' দেব আসিবেন এ অঙ্গনে।
গৃহ মোর জলসত্র হইবে, ঘড়া ভরে' রাখ জল;
ফিরিবে যখন নিদাঘ-শ্রান্ত ভক্ত যাত্রিদল,
তুষিব সবারে জলদানে আমি ক্লান্তি করিয়া দূর—
ভক্তিধারায় আজি তাহাদের প্রাণ মন ভরপূর।
পূরাতে বাসনা সেবা নিতে মোর ভক্তের হিয়া-রথে
দয়াল জগন্নাথ আসিবেন আজি এ সুদূর পথে।
যত গোপী তত কৃষ্ণ হলেন দ্বাপরে বৃন্দাবনে,
আজি হবে পুন সেই অভিনয় হেথা মোর অঙ্গনে।
অযুত ভক্ত-হিয়া মাঝে হেরি' অযুত জগন্নাথে
পুলকিত চিতে অঙ্গনভরা পদধূলি ল'ব মাথে।
ভক্তজনের পূত পদধূলি তাঁরি পদরজ মানি,
অচ্যুতধামে চলিবার পথে সেইতো পাথেয় জানি।
প্রতি মানুষের হিয়া মাঝে যদি তাঁর দেখা পাই তবে
চলিতে শক্তি নাই বলে' মোর কেন বল দুখ হবে?
মানুষের গড়া মন্দিরে মোর প্রয়োজন কিসে আর?
তাঁহারি রচিত বিশ্ব-দেউলে পেয়েছি যে দেখা তাঁর॥"

দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্পর্কে মনীষী রোমাঁ রোলাঁ (Romain Rolland) যে বইখানি লিখেছেন তার উপক্রমণিকায় আছে: কোন ধর্মকে অথবা ধর্মমাত্রকেই জানতে, বিচার করতে অথবা নিন্দা করতে হ'লে প্রথম প্রয়োজন অধ্যাত্ম-চেতনার ব্যাপারে নিজে গবেষণা করা। কথাটা খুব সত্য। অনেক লোক আছেন যাঁদের ধর্মভাব বলতে কিছু নেই। ধর্ম কিছুই নয়, একটা বুজরুগি-মাত্র—এই কথাটা প্রমাণ করবার জন্য সর্বদাই তাঁরা সচেষ্ট। যা তাঁরা বোঝেন না তাকে আক্রমণ করবার এ ধৃষ্টতা কেন?

আমরা যে জানিনে তার কারণ আমরা জানতে চাই নে। ঈশ্বরকে জান্‌বার জন্যে আমাদের মনে কৌতূহলের অভাব। ঠাকুর বল্‌তেন: প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কেমন ক'রে ভগবানকে পাবো। গুরু তাকে জলের মধ্যে চুবিয়ে ধরলেন। খানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে এনে বল্‌লেন, তোমার জলের ভিতর কি রকম হ'য়েছিল? শিষ্য বল্লে—যেন প্রাণ যায়। গুরু বল্লেন, এইরূপ ভগবানের জন্য যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ করবে। ঈশ্বরকে জানবার জন্য কোনই ব্যাকুলতা নেই, অথচ বল্‌বো ঈশ্বর নেই—এর কোন মানে হয় না। ঠাকুর বল্‌তেন, তিন টান এক হ'লে তবে তাঁকে লাভ করা যায়। বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি টান, সতীর পতিতে টান, আর মায়ের সন্তানেতে টান—এই তিন ভালোবাসা একসঙ্গে কেউ যদি ভগবানকে দিতে পারে তাহ'লে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। ঠাকুর ব্যাকুলতার উপরে বারংবার জোর দিয়েছেন। বলেছেন, ব্যাকুলতা থাকলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশীর ভাগ লোকেরই ভোগান্ত না হ'লে ব্যাকুলতা আসে কই?

কলম্বাস যে আমেরিকাকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন, সেও তো নূতন দেশকে জানবার জন্য তাঁর দুরন্ত কৌতূহলের জন্যে। যেখানে কোন নাবিক যেতে সাহস করে নি সেখানে যাবার জন্য অজানা সমুদ্রে তিনি তরী ভাসিয়ে দিলেন। কোন-কিছুর পরোয়া করলেন না। মাঝ দরিয়ায় নৌকাডুবি হতে পারে, সেই সঙ্গে নিজেরাও সমুদ্রের অতলে তলিয়ে যেতে পারেন এরকমের কোন দুশ্চিন্তা কলম্বাসকে নিরস্ত করতে পারলো না। বেরিয়ে পড়লেন তিনি। শুয়ে থাকা নয়, ব'সে থাকা নয়, দাঁড়িয়ে থাকাও নয়। দুনিয়ায় যারা বিপদ-বাধাকে তুচ্ছ ক'রে চল্‌তে পেরেছে, অজানার আকর্ষণে তাদেরই নব নব আবিষ্কার মানুষের সভ্যতাকে গৌরবের শিখর থেকে গৌরবের শিখরে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কলম্বাস রাতে আমেরিকার স্বপ্ন দেখতেন!

ঈশ্বরকে জানবার জন্যও এই রকমের একটা পাগলামি চাই। ঠাকুর বল্‌তেন, "মাগের ব্যামো হ'লে, কি টাকা লোকসান হলে, কি কর্মের জন্য লোকে এক ঘটী কাঁদে, ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বল দেখি!" ভৌগোলিক সত্যকে আবিষ্কার করবার জন্য যে চলার সাহস আমরা দেখেছি কলম্বাসের মধ্যে, আধ্যাত্মিক সত্যকে আবিষ্কার

করবার জন্য সমস্ত সুখ এবং আরামকে পিছনে ফেলে সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম পথে চল্‌বার সেই সাহস আমরা দেখেছি ভারতীয় সাধকদের মধ্যে যুগে যুগে। কঠোপনিষদে যম এই সত্যান্বেষণ থেকে নচিকেতাকে নিরস্ত করবার জন্য কত রকমের পার্থিব সুখের প্রলোভন দেখিয়েছেন! কিন্তু কোন প্রলোভনই ঋষিপুত্রকে তাঁর বজ্র-কঠোর সংকল্প থেকে বিচ্যুত করতে পারে নি। নচিকেতার যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে শ্রীরাম-কৃষ্ণের যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের যুগ-যুগান্তের ইতিহাসে (আমরা দেখেছি পরম সত্যকে জয় করবার জন্য) অভিযানের পর অভিযান। যা চরম সত্য, তাকে শুধু একটা দার্শনিক তত্ত্ব-হিসাবে জেনে তাঁরা খুশী থাকেন নি। যিনি সচ্চিদানন্দ তাঁকে চোখ দিয়ে দেখা চাই, তাঁর বাণী শোনা চাই কান দিয়ে, তাঁর অঙ্গের গন্ধ পেতে হবে নাসিকায়, সর্বাঙ্গ দিয়ে পেতে হবে তাঁর স্পর্শ। ভারতের সাধকেরা তাঁদের অধ্যাত্ম-চেতনায় পরম সত্যকে উপলব্ধি করেছেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতে এই উপলব্ধির কথা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কথামৃতে'র তৃতীয় ভাগে এক জায়গায় আছে: 'ঈশ্বরকে দেখা যায়,-আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি!"

ঈশ্বরকে সমগ্রভাবে জানবার জন্য দক্ষিণে-শ্বরের গঙ্গাতীরে আধ্যাত্মিক তীর্থযাত্রার যে চমকপ্রদ ইতিহাস তৈরী হয়েছে—তার বুঝি তুলনা নেই। ভৈরবী এসে কেমন ক'রে ঠাকুরকে তন্ত্রের সাধনায় দীক্ষা দিলেন, কেমন ক'রে স্নেহময়ী জননীর শুশ্রূষার দ্বারা ব্রাহ্মণী তাঁকে ধীরে ধীরে সুস্থ ক'রে তুললেন, কেমন ক'রে ধর্মজগতের নানা রহস্যের সঙ্গে একে একে তাঁর পরিচয় করালেন—সে সব কথা পড়তে পড়তে শরীর রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। তারপর উলঙ্গ সন্ন্যাসী তোতাপুরী কেমন ক'রে অদ্বৈতবেদান্তের পথে তাঁকে নির্বিকল্প সমাধির আনন্দ-পারাবারে পৌঁছে দিলেন, কি ক'রে বিচারের তরবারির দ্বারা মায়ের রূপকে দু'টুক্‌রো ক'রে অবশেষে আধ্যাত্মিক উপলব্ধির চরম শিখরে গিয়ে তিনি পৌঁছালেন—তার কাহিনীর কাছে আরব্যোপ-ন্যাসের কাহিনী হার মানে।

ঠাকুরের এই অধ্যাত্ম সাধনার তীর্থযাত্রার বিঘ্নসঙ্কুল ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে যে-কথাটি আমাদের মনে বারংবার জাগে তা হ'চ্ছে —পরম সত্যের পরিচয় পেতে গিয়ে কোথাও তিনি থামেন নি। তিনি ছিলেন ভক্ত। ভক্তের ভাবপ্রবণ হৃদয় নিয়ে তিনি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন ঈশ্বরের রূপের সাগরে ডুবে থাক্‌তে, তাঁকে স্পর্শ করতে, তাঁর জীবন্ত কায়াকে দু'বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরতে, তাঁর আনন্দ-সমুদ্রে ভাস্‌তে। তোতাপুরী যখন বল্‌লেন যিনি অরূপ, যিনি নির্গুণ তাঁর মধ্যে তনুমনকে নিঃশেষে ডুবিয়ে দিতে, তখন সেই অরূপের কঠোর সাধনায় ব্রতী থাক্‌তে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি। নাম এবং রূপের রাজ্যকে অতিক্রম ক'রে গিয়ে নির্বিকল্প সমাধির মধ্যে ডুব্‌ দিতে পারা কি সহজ কথা! যতবার তিনি সেই চেষ্টা করেন ততবারই মায়ের রূপ এসে তাঁকে বাধা দেয়। সেই আধ্যাত্মিক সংগ্রামের অদ্ভুত কাহিনী পড়তে পড়তে কেবলই মনে হয়: ঠাকুর ছিলেন চিরকালের পরিব্রাজক, চিরকালের পথচারী। তীর্থযাত্রার পথে শিখরের পর শিখর অতিক্রম ক'রে চ'লেছেন তিনি পরম-সত্যকে উপলব্ধি করবার সুতীব্র উন্মাদনায়। পুরাতনের জাবর কাট্‌বার কোন লক্ষণ নেই, অতীত নিয়ে পড়ে থাক্‌বার কোন জড়তা নেই। চলেছেন পরমসত্যের গৌরীশৃঙ্গকে আবিষ্কার

করতে গিরিচূড়ার পর গিরিচূড়াকে পেরিয়ে, উপত্যকার পর উপত্যকাকে পিছনে ফেলে। এক একটি চূড়াকে অতিক্রম করতে প্রাণান্ত হবার উপক্রম হয়েছে তবু পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবার নামটি নেই। ঠাকুর কথামৃতের মধ্যে বলেছেন: "আমায় সব ধর্ম একবার ক'রে নিতে হ'য়েছিল, —হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান;—আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত,—এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখ্‌লাম সেই এক ঈশ্বর,—তাঁর কাছেই সকলে আস্‌ছে,—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"

ঠাকুরের কণ্ঠে, সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী। পরম-সত্যের শিখরদেশে আরোহণ করেছিলেন তিনি নানাদিক থেকে, নানা পথকে অনুসরণ ক'রে। সত্য তাই বিভিন্ন মূর্তিতে তাঁর কাছে প্রতিভাত হ'য়েছিল। সাধারণ সাধকেরা খণ্ড সত্য নিয়ে পরিতৃপ্ত থাকেন। সত্যের যে-টুকু অংশ ধরা দিয়েছে তাঁদের দৃষ্টিতে তারই সঙ্গে তাঁদের জীবনব্যাপী কারবার। সেই আংশিক সত্য দিয়ে তাঁদের নিত্যনৈমিত্তিক কাজ যখন চলে যায় তখন দরকার কি 'সত্য' 'সত্য' ক'রে সুস্থ মনকে বড্ড বেশী ব্যস্ত করবার? তাঁরা আছেন নিজের নিজের কুঠুরিতে বন্দী হ'য়ে। বাড়ীর একতলায় দোতলায় আরও যে লোক আছে তাদের অস্তিত্ব-সম্পর্কে উদাসীন তাঁরা; প্রতিবেশীদের পদধ্বনি তাঁদের কানে যায় না। ঠাকুরের মধ্যে এই উদাসীনতা আমরা কখনও দেখিনি। যুগে যুগে দেশে দেশে আবির্ভূত হ'লেন যাঁরা স্বর্গের আলোতে প্রাণের প্রদীপকে জ্বালিয়ে নিয়ে,—পরম সত্যের অভ্রভেদী গিরিশিখরে উপনীত হবার জন্য যাঁরা করলেন সুকঠিন তপস্যা, গভীরসমুদ্রের তলায় ডুব দিয়ে যাঁরা সংগ্রহ ক'রে আনলেন আধ্যাত্মিক রাজ্যের দুর্লভ মণিমুক্তা, তাঁদের সাধনাকে ঠাকুর নিজের সাধনা ক'রে নিলেন। পরিব্রাজকের দণ্ডহাতে তিনি বাহির হ'লেন তীর্থযাত্রায় সত্যকে তার বিচিত্ররূপে দেখতে, সাধকের পর সাধকের ধর্মসাধনার নিগূঢ় রহস্যকে জান্‌তে। চল্‌লেন সাধনার পর সাধনার পথকে অনুসরণ ক'রে। বিরাম নেই, ক্লান্তি নেই, জড়তা নেই। তীর্থযাত্রার পর তীর্থযাত্রা সমাপ্ত ক'রে কি দেখ্‌লেন তিনি? দেখ্‌লেন সেই এক ঈশ্বর। তাঁর কাছে সকলই আস্‌ছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে। শুন্‌লেন শতাব্দীর পর শতাব্দীর কণ্ঠ থেকে উঠ্‌ছে বিচিত্র সুর আর সেই সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টি করছে এক মহাসঙ্গীতের ইন্দ্রলোক। কোন মতবাদের তিনি নিন্দা করলেন না, কোন ধর্মবিশ্বাসের প্রতি তিনি বক্রদৃষ্টিতে চাইলেন না। যতকিছু ধর্মবিশ্বাসের উদ্ভব হয়েছে কালে কালে দেশে দেশে, তাদের সকলের মূলে তিনি করলেন জলসিঞ্চন। তিনি স্বীকার করলেন দ্বৈতবাদকে, স্বীকার করলেন অদ্বৈতবাদকে, স্বীকার করলেন বিশ্বাসের প্রয়োজনকে, স্বীকার করলেন বিচারের প্রয়োজনকেও, স্বীকার করলেন সাকারবাদকে, স্বীকার করলেন নিরাকার ব্রহ্মকেও। পরস্পর-বিরোধী সুরগুলিকে তিনি মিলিয়ে দিলেন এক বিরাট ঐকতানের মধ্যে। বল্‌লেন, 'মিছরির রুটি সিধে ক'রেই খাও, আর আড় ক'রেই খাও, মিষ্ট লাগ্‌বে।'

হুইট্‌ম্যানের কবিতায় আছে:

My gait is no fault-finder's or
rejecter's gait,
I moisten the roots of all that
has grown.

এ যেন ঠাকুরের কথা!

পৃথিবীর ধর্মসাধনার ইতিহাসে ঠাকুর যা করলেন এবং যা বল্‌লেন, তার সত্যসত্যই কোন তুলনা নেই। নিন্দা নয়, কলহ নয়,—শ্রদ্ধা। ছিদ্রান্বেষণ নয়, নিজের বিশ্বাসের এবং আচরণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার চেষ্টার পিছনে যে অভিমান

প্রচ্ছন্ন থাকে—সেই আত্মাভিমান নয় ;—নম্রতা। দশ জনকে নিজের চেলা বানিয়ে গুরুগিরি করবারও কোন উদ্যম নেই। একজনের কথা উল্লেখ ক'রে গিরিশ ঠাকুরকে একবার বল্লেন : 'সে আপনার চেলা।' ঠাকুর উত্তরে বলেছিলেন : চেলা-টেলা নেই ; আমি রামের দাসানুদাস!' ঠাকুর ঐক্যে যেমন বিশ্বাস করতেন, তেমনি বিচিত্রতায়। তাঁর লীলার ভিতর সব বিচিত্রতা —এ তো ঠাকুরেরই কথা। ঈশ্বর যখন মানুষকে আলাদা আলাদা রুচি দিয়ে, প্রকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, তখন অপরকে আমার ছায়াতে ও প্রতিধ্বনিতে পর্যবসিত করবার ঔদ্ধত্য কেন? কেন মনে করবো, আমার মতের সঙ্গে যার মতের মিল হোলো না, সে নিশ্চয়ই ভ্রান্ত এবং আমিই ঠিক? কেনই বা মনে করবো আমার জীবন নিরর্থক এবং পরের অনুকরণ করা ছাড়া জীবনকে সফল করা সম্ভব নয়? ঈশ্বরের লীলাবৈচিত্র্যে বিশ্বাস না থাকলে এক ক্ষুরে সকলেরই মাথা কামানোর ইচ্ছা বলবতী হওয়া স্বাভাবিক, ভিন্ন-ধর্মাবলম্বী প্রতিবেশীর ধর্মবিশ্বাসে শ্রদ্ধা রাখা কঠিন। ফরাসী মনীষী মন্‌তাইন্‌ (Montaign) ঠিকই বলেছেন : "সাধারণ লোকে একটা ভুল ক'রে থাকে। নিজের সঙ্গে মিলিয়ে তারা অন্যের বিচার করে। আমি সে ভুল করি নে। অন্যেরা যেহেতু আমার থেকে স্বতন্ত্র সেই হেতু আমি তাদের আরও বেশী ভালোবাসি, আরও বেশী শ্রদ্ধা করি।" এ যেন ঠাকুরেরই কথা। রোমাঁ রোলাঁ 'রামকৃষ্ণের জীবনী'তে (The Life of Ramakrishna) ঠাকুরের এই বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ ক'রে লিখেছেন : His respect for and love of the personality of others, his dread of enslaving it went so far that he was afraid of being loved too dearly. He did not wish the tenderness of his disciples for him to bind them."

অনুবাদ : "অন্যদের ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা ছিল এমন গভীর, সেই ব্যক্তিত্ব পাছে শৃঙ্খলিত হয় তার আশঙ্কা ছিল এমন প্রবল যে, তিনি তাদের ভক্তির আতিশয্যকে একটু ভয়ের চোখেই দেখতেন। তিনি চাইতেন না তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে ভালোবেসে এক জায়গায় বাঁধা পড়ুক।"

আজকের দিনে ঠাকুরকে আমাদের ভারি দরকার আছে। প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে—সে পার্থক্য তো ঈশ্বরেরই সৃষ্টি। এ পার্থক্য না থাক্‌লে দুনিয়া বড়ো একঘেয়ে হয়ে যেতো। ঠাকুর একঘেয়েমিকে আদৌ পছন্দ করতেন না। বলতেন, "সে কি কথা! আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই। কখন ঝোলে, কখন ঝালে, অম্বলে, কখন বা ভাজায়। আমি কখন পূজা, কখন জপ, কখন বা ধ্যান, কখন বা তাঁর নামগুণগান করি, কখন বা তাঁর নাম ক'রে নাচি।" তিনি জান্‌তেন প্রতিটি মানুষেরই জীবন এমন কিছু যার মূল্য আছে, মর্যাদা আছে, সুষমা আছে। কাউকে বাদ দেওয়া যায় না, কাউকে উপেক্ষা করা চলে না। তিনি বলতেন, 'ঈশ্বরই নিজে সব হয়েছেন—যা কিছু দেখি ঈশ্বরেরই এক একটি রূপ।' বিড়ালকে ভোগের লুচি খাইয়ে দিয়েছিলেন। সেই জগন্মাতাই তো বিড়াল হ'য়েছেন। তর্ক করতে দেখে হয়ত হাজরাকে গালাগালি দিয়েছেন। মশারির ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে হাজরাকে প্রণাম ক'রে তবে আবার শুতে গেছেন। তাঁর অন্তরঙ্গদের মধ্যে যেমন চরিত্রবান জিতেন্দ্রিয় বিবেকানন্দ ছিলেন, তেমনি ছিলেন মদ্যপায়ী গিরিশ ঘোষও। ঠাকুর গিরিশ

ঘোষকে কখনও মদ ছাড়তে বলেন নি। মানুষের জীবনকে এই ভাবে গৌরব দান করতে পারা—হৃদয় কতখানি বিরাট হ'লে তবে এ সম্ভব! তিনি কখনো কাউকে বাঁধতে চান নি, চাপিয়ে দিতে চান নি কারও উপরে নিজের মতবাদ, চেলা তৈরীর দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিলো না কখনো। আমরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের যুগের মানুষ। আমরাও যেন মানুষ-মাত্রেরই জীবনকে গৌরব দান করতে পারি, প্রতিবেশী ভিন্নধর্মাবলম্বী হলেও তার ধর্মবিশ্বাসকে যেন শ্রদ্ধার চোখে দেখি, নিজেরা যেমন স্বাধীন ভাবে বাঁচ্‌তে চাই, অপরকেও যেন তার ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের মহিমার মধ্যে বাঁচ্‌তে দিই। সর্বশেষে ঠাকুরের মধ্যে যে সত্যের সন্ধানী তীর্থযাত্রীর রূপ দেখেছি—সেই রূপ আমাদের মধ্যেও ফুটে উঠুক। ঈশ্বর আছেন—খুড়ী-জ্যেঠীর মুখ থেকে শুনে এই আস্তিক্যবোধ পাওয়া এক কথা; কঠিন সাধনায় ঈশ্বরকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি ক'রে তাঁকে বিশ্বাস করা আর এক কথা। হুইট্‌ম্যান বলেছেন: No friend of mine takes his ease in my chair. ঠাকুরেরও একই কথা। আরাম-কেদারায় শুয়ে কেবল মালা জ'পে আর ঘণ্টা নেড়ে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা যাবে না। বই পড়েও আমরা তাঁকে পাবো না। কোন গুরুও হাত ধ'রে তাঁর কাছে আমাদের পৌঁছিয়ে দিতে পারবেন না। তাঁকে পেতে হ'লে আরাম-কেদারাকে ঠেলে ফেলে বেরিয়ে পড়তে হবে সাধনার ক্ষুরধার দুর্গম রাস্তায়। ব্যাকুলতা, বৈরাগ্য, নির্জনতা—এসব বাদ দিয়ে কে কবে ঈশ্বরকে পেয়েছে?

কর্মযোগ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

ভারতে আবহমান কাল থেকে মোক্ষোপায়রূপে তিনটী প্রধান সাধন স্বীকৃত হয়েছে—কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। অবশ্য এই তিনটী সাধন—কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ—পরস্পর-বিরোধী নয়, উপরন্তু অঙ্গাঙ্গিভাবে বিজড়িত—এই তথ্যটীও ভারতবর্ষে সর্বদাই সানন্দে পরিগৃহীত হয়েছে। অবশ্য এদের মধ্যে কোনটী সর্বশ্রেষ্ঠ, কোনটীই বা মুক্তির সাক্ষাৎ উপায়—এ নিয়ে যে ভারতীয় দর্শনে নানারূপ বাগ্‌বিতণ্ডা নেই, তা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, মতবিশেষে একটীকে অন্য দুটীর তুলনায় অধিক মূল্য দেওয়া হলেও, কোনোটীকেই কোনো মতবাদে সম্পূর্ণ নিষ্প্রয়োজন বলে পরিবর্জন করা হয়নি।

'কর্ম'-শব্দটীকে অভিধান-গ্রন্থাদিতে "যৎ ক্রিয়তে তৎ কর্ম",—যা করা হয়, তাই কর্ম—এই ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বেদের কর্মকাণ্ডাশ্রয়ী মীমাংসা-দর্শনের মতে, যাগ-যজ্ঞাদি বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপই 'কর্ম' বা 'ধর্ম'। সাধারণ ক্রিয়া বা বৈদিক ক্রিয়া-অর্থে, কর্ম তিন প্রকার—শারীরিক, বাচসিক ও মানসিক। শঙ্করাচার্য তাঁর ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই ভাবে

কর্মের সংজ্ঞা দিয়েছেন : "শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ কর্মশ্রুতিস্মৃতিপ্রসিদ্ধং ধর্মাখ্যম্" (১।১।৪)।

কর্মের দুটী লক্ষণ—"কর্তুঃ ক্রিয়াব্যাপ্যম্" ও "জন্যফলশালিত্বম্" (ক্রমদীশ্বর ও সারমঞ্জরী)। অর্থাৎ, লৌকিক ও বৈদিক প্রত্যেক কর্মেরই এক জন কর্তা থাকে, যিনি সেই কর্মের দ্বারা একটী পূর্বে অপ্রাপ্ত ফল লাভ করেন। এরূপে, প্রত্যেক কর্মেরই একটী অবশ্যম্ভাবী ফল থাকে। যে কর্ম কর্তার স্বেচ্ছা-প্রণোদিত ও বিচারবুদ্ধি-প্রসূত, সেই কর্মের জন্য কর্মকর্তা অবশ্যই নিজেই সম্পূর্ণ দায়ী। সেজন্য ন্যায়ের অমোঘ বিধানানুসারেই সেই কর্মের ফল কর্তাকে নিজেই ভোগ করতে হয়। ভোগব্যতীত কর্ম-ফলের নাশ হতে পারে না। এই হল ভারতীয় দর্শনের মূলভিত্তি সুবিখ্যাত 'কর্মবাদ'। কিন্তু একই জন্মে শত শত কৃত-কর্মের ফল-ভোগ সম্ভবপর নয় বলে, সেই সব অভুক্ত কর্মের ফল-ভোগের জন্য জীবকে পুনরায় সংসারে জন্মপরিগ্রহ করতে হয়। কিন্তু সেই নূতন জন্মেও সে স্বভাবতই পুনরায় নূতন কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাদের সব ফলভোগ পূর্ববৎ সম্ভবপর হয় না বলে তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয় —এই ভাবে, কর্ম ⟶ জন্ম ⟶ কর্ম ⟶ জন্মান্তরের প্রকোপে জীব ক্রমান্বয়ে বিঘূর্ণিত হয়; এরই নাম অনাদি 'সংসার-চক্র'। এরূপে 'কর্মবাদ' থেকে ভারতীয় দর্শনের আরেকটী প্রসিদ্ধ মতবাদ 'জন্ম-জন্মান্তরবাদের' উৎপত্তি। ভারতীয় দর্শনের মতে, এই সংসার-চক্র থেকে মুক্তি-লাভই মোক্ষের প্রথম সোপান; কিন্তু উপরি-উক্ত কর্ম ও জন্মের অবশ্যম্ভাবী পারম্পর্য-অনুসারে মোক্ষ ত সুদূর-পরাহত মনে হয়। এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতীয় দার্শনিকগণ কর্মের দ্বিবিধ ভেদের উল্লেখ করেছেন :—সকাম-কর্ম ও নিষ্কাম-কর্ম। ফল-ভোগের ইচ্ছা-সহকারে কৃতকর্মের নাম সকাম কর্ম, এদের বলা হয় 'কাম্য-কর্ম'। (যথা, নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তান-কামনায় পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন, এবং সেই কর্মের ফলস্বরূপ অভীষ্ট বস্তু নিজেই লাভ ও ভোগ করেন)। এরূপ সকাম কর্মের ফলই কর্মকর্তাকে বারংবার ভোগ করতে হয়; কারণ, পূর্বেই বলা হয়েছে, ভোগ ব্যতীত এরূপ কর্মের বিনাশ নেই, জীবের মুক্তিও নেই। কিন্তু ফলভোগেচ্ছাশূন্য, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম কর্মের ফল কর্তাকে ভোগ করতে হয় না, এবং তার ফলে জন্ম-জন্মান্তরও তার নেই। যথা, শাস্ত্রোপদিষ্ট তর্পণ প্রভৃতি নিত্য, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নৈমিত্তিক কর্ম, দান পরসেবা প্রভৃতি জন-হিতকর অনুষ্ঠান প্রভৃতি।

এই নিষ্কাম কর্মই মুক্তির অন্যতম সাধন বা সাধনাঙ্গ—অর্থাৎ, এই হল 'কর্মযোগ'। শঙ্করাচার্য তাঁর গীতাভাষ্যে কর্মযোগের এই সংজ্ঞা দিয়েছেন : "নিঃসঙ্গতয়া দ্বন্দ্বপ্রহাণপূর্বকমীশ্বরারাধনার্থে কর্ম-যোগে···" (২।৩৯)। অর্থাৎ, সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, শীত-গ্রীষ্ম, সুখ-দুঃখ, কৃতকার্যতা-অকৃতকার্যতা প্রমুখ সমস্ত দ্বন্দ্ব বা বিপরীত অবস্থার মধ্যেও স্থৈর্যসহকারে ঈশ্বরের আরাধনার জন্য কৃত কর্মই কর্মযোগ বা মোক্ষের উপায়।

কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানই ভারতীয় নীতিশাস্ত্রের প্রথম কথা। ভারতীয় তথা জগৎ-সভ্যতার প্রাচীনতম প্রতীক ঋগ্বেদেও এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। অবশ্য, এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, বৈদিক ক্রিয়াকলাপ বিশেষভাবে কর্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞাদি কর্ম প্রধানতঃ সকাম কর্ম; অর্থাৎ, দেবতাদের উদ্দেশ্যে অর্পিত হোম প্রভৃতির বিনিময়ে ঐহিক বা পারলৌকিক সুখভোগেচ্ছাই এই কর্মসমূহের কারণ। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেদে নিষ্কাম কর্মেরও বহু বিধান পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঋগ্বেদের

দশম মণ্ডলের ১১৭ সংখ্যক সূক্তটীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এই সমগ্র সূক্তটীতে দান ও পরহিতব্রতের অতি সুন্দর স্তুতি করা হয়েছে। যেমন, ঋষি বল্‌ছেন :—

"উতো রয়িঃ পৃণতো নোপ দস্যত্যুতাপৃণন্
মর্ডিতারং ন বিন্দতে।" (১০।১১৭।১)

"য আধ্রায় চকমানায় পিত্বোঽন্নবান্ সন্
রফিতায়োপজগ্মুষে।
স্থিরং মনঃ কৃণুতে সেবতে পুরোতো চিৎ স
মর্ডিতারং ন বিন্দতে॥" (১০।১১৭।২)

"মোঘমন্নং বিন্দতে অপ্রচেতাঃ সত্যং ব্রবীমি
বধ ইৎ স তস্য।
নার্যমণং পুষ্যতি নো সখায়ং কেবলাঘো ভবতি
কেবলাদী।" (১০।১১৭।৬)

"দানশীল পুরুষের ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না; যিনি দানবিমুখ, তাঁর সুখ নেই।"

"যিনি অন্নবান্ হয়েও ক্ষুৎক্লিষ্ট জনকে এবং গৃহে সাহায্যার্থ আগত দারিদ্র্যপীড়িত অতিথিকে নির্মম ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন, এমন কি, তাদের সম্মুখেই ভোগে লিপ্ত হন, তাঁর সুখ নেই।"

"যিনি দানবিমুখ, তাঁর অন্নলাভ ব্যর্থ—সত্যই এ তাঁর মৃত্যুরই তুল্য। তিনি দেবতাকেও দেন না, বন্ধুকেও দেন না। যিনি কেবল একাকীই অন্নভোজন করেন, তিনি কেবল পাপই ভোজন করেন।"

উপনিষদেও বহুস্থানে সকাম কর্মের ব্যর্থতা ও নিষ্কাম কর্মের উৎকর্ষ-সম্বন্ধে মনোরম বিবৃতি আছে। মুণ্ডকোপনিষদের এই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকটী ঔপনিষদ কর্মযোগের একটী সুন্দর প্রমাণ—

"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা
অষ্টাদশোক্তমবরং যেষু কর্ম।
এতচ্ছ্রেয়ো যেঽভিনন্দন্তি মূঢ়াঃ
জরামৃত্যুং তে পুনরেবাপিযন্তি॥"
(১।২।৭)

"যাতে হেয়, অশ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের বিবৃতি আছে, সেই অষ্টাদশাঙ্গ যজ্ঞরূপ ভেলা সমস্তই অদৃঢ়,—অর্থাৎ, সংসারসমুদ্র পার করতে অক্ষম। যে সব মূর্খ ব্যক্তি একেই শ্রেয়ঃ মনে করে প্রশংসা করে, তারা পুনরায় জরামৃত্যু প্রাপ্ত হয়।"

মহাভারতেও এই একই কর্মযোগের কথা বারংবার ঘোষিত হয়েছে। যথা :—

"তদিদং বেদবচনং কুরু কর্ম ত্যজেতি চ।
তস্মাদ্ধর্মান্ ইমান্ সর্বান্ নাভিমানাৎ
সমাচরেৎ॥" (বনপর্ব, ২।৭৪)।

"তস্মাৎ কর্মসু নিঃস্নেহা যে কেচিৎ পারদর্শিনঃ।"
(অশ্বমেধপর্ব, ৫১।৩২)

"কর্ম কর, কর্ম ত্যাগ কর—এই উভয়ই বেদাজ্ঞা। অতএব, অভিমানশূন্যভাবে এই সব কর্ম করবে।"

"সেহেতু, তত্ত্বদর্শিগণ নিষ্কামভাবে কর্ম করেন।"

ভারতদর্শনসার গীতায় কর্মযোগের পূর্ণতম, প্রকৃষ্টতম দ্যোতনা দৃষ্ট হয়। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষার্ধ এই কর্মযোগেরই শ্রেষ্ঠ বিবরণ। যুদ্ধবিমুখ অর্জুনের নিকট স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নিষ্কাম কর্মকে মোক্ষের উপায়রূপে উপদেশ দিচ্ছেন—

"কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্॥"
(২।৫১)

"সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মের ফলত্যাগ করে বা নিষ্কামভাবে কর্ম করে জন্মরূপ বন্ধ থেকে মুক্ত হন এবং সর্ব-উপদ্রব-রহিত ব্রহ্মপদ লাভ করেন।"

পরবর্তী ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ-সমূহেও নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠানকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাধনরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এমন কি, মীমাংসা-

দর্শনের মূল বিষয়বস্তু ধর্ম বা বেদের কর্মকাণ্ডে বিহিত যাগযজ্ঞাদি হলেও ক্রমশঃ এই মতবাদে স্বর্গের স্থলে মোক্ষ এবং সকাম কর্মের স্থলে নিষ্কাম কর্মই যথাক্রমে চরম লক্ষ্য ও তার উপায়-স্বরূপ বলে পরিগণিত হয়। বেদবিহিত কর্ম-সম্পাদন করতে হবে সম্পূর্ণ নিষ্কাম ভাবে, কোনোরূপ উদ্দেশ্যসিদ্ধি, এমন কি, স্বর্গলাভের জন্যও নয়। এরূপে পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টের মত, শত শত বৎসর পূর্বে মীমাংসকগণও 'কর্তব্যের প্রণোদনাতেই কর্তব্য-পালন' বা 'Duty for duty's sake'—এই সু-উচ্চ নীতি-প্রচার করেন।

বেদান্তদর্শনের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রত্যেকটীতেই কর্মযোগের উপর ন্যূনাধিক জোর দেওয়া হয়েছে। শঙ্করের মতে, স্বর্গের উপায়-স্বরূপ সকাম কর্ম ও মোক্ষের উপায়স্বরূপ জ্ঞান পরস্পরবিরোধী হলেও, সাধনমার্গে নিষ্কাম কর্মের মূল্য অল্প নয়; কারণ, শাস্ত্রোপদিষ্ট নিষ্কামকর্ম যথাবিহিত অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, এবং এরূপ নির্মল চিত্তেই কেবল ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হতে পারে। রামানুজ প্রমুখ অন্যান্য বৈদান্তিকদের মতেও কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান মুক্তির প্রথম সোপান। যথা, রামানুজের মতে নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম, এবং তৎপরে সপ্তসাধন—বিবেক (অশুদ্ধ পানাহার-বর্জন), বিমোক (বৈরাগ্য), অভ্যাস (পুনঃ পুনঃ অনুশীলন), ক্রিয়া (পঞ্চ যজ্ঞানুষ্ঠান), কল্যাণ (সত্য, সরলতা, দয়া, দান, অহিংসা, নির্লোভতা), অনবসাদ (মানসিক প্রফুল্লতা ও উৎসাহ), এবং অনুদ্ধর্ষ (চিত্তের স্থৈর্য)—চিত্তের নির্মলতা-সম্পাদন করে' ব্রহ্মকে জানবার ইচ্ছার উদ্রেক করে ও ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়ক হয়।

উপরের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণী থেকেই প্রতীয়মান হবে যে, কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্ম-সাধনই ভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম মূলমন্ত্র। ভারতীয় 'কর্মবাদের' ভুল অর্থ করে বিদেশী পণ্ডিতগণ কেহ কেহ সম্পূর্ণরূপে কর্মত্যাগকেই ভারতীয় আদর্শ বলে প্রচার করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, ভারতীয় দর্শনের মতে, একদিকে সকাম কর্ম যেমন সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাজ্য; অন্য-দিকে ঠিক তেমনি কর্মবিমুখতা, অলসতা ও নিশ্চেষ্টতাও সমভাবে নিন্দনীয়। সেজন্য কর্ম করবে, কিন্তু সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ, ফলভোগেচ্ছাশূন্য ভাবে—এই হল ভারতীয় কর্মযোগের মূল কথা। ভারতদর্শনসার গীতা সেই সুপ্রসিদ্ধ শ্লোকে অতি সুন্দর ভাবে এই তথ্যটী বুঝিয়ে বল্‌ছেন—

"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি॥" (২।৪৭)

'কেবলমাত্র কর্মেই তোমার অধিকার আছে, ফলে কদাপি নয়। সেজন্য সকাম কর্ম করে কর্মফলপ্রাপ্তির হেতু হয়ো না। অপরপক্ষে কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।'

এই জ্ঞানবান্, নিষ্কামকর্মীকেই গীতায় বলা হয়েছে 'স্থিতপ্রজ্ঞ', বা 'স্থিতধীঃ'। স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ বর্ণনা প্রসঙ্গে গীতা বল্‌ছেন—

'দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে॥' (২।৫৬)

"দুঃখে উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাহীন, লোভ-ভয়-ক্রোধহীন, মুনি বা মননশীল জ্ঞানীই স্থিতপ্রজ্ঞ।"

একটী সুন্দর উপমা দিয়ে গীতা এটী ব্যাখ্যা করছেন—

"আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী॥" (২।৭০)

অর্থাৎ, অসংখ্য নদ-নদী সমুদ্রে প্রবেশ করলেও সমুদ্র স্বয়ং উচ্ছ্বসিত বা চঞ্চল হয়ে ওঠে না। একই ভাবে, রূপরসাদি পার্থিব ভোগ্যবস্তু

ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষে প্রবেশ করে বিলীন হয়ে যায়, তাঁকে বিচলিত করতে পারে না।'

এরূপ নিষ্কাম কর্মযোগী, স্থিতপ্রজ্ঞ, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষ পৃথিবীর সর্বত্রই সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাকেই দর্শন ও উপলব্ধি করেন। জগতে বাস করেও তিনি জগৎকে পার্থিব ভোগের বস্তু বলে কদাপি মনে করতে পারেন না, কারণ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই তাঁর কাছে ব্রহ্মসত্তাময়। সেজন্য শুক্লযজুর্বেদ (৪০।১) এবং ঈশোপনিষৎ (১) বলছেন—

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

"জগতের সমস্ত চঞ্চল, চলনশীল বিষয়কে ঈশ্বরের দ্বারাই আচ্ছাদিত করতে হবে; ত্যাগের দ্বারাই ভোগ কর, কারো ধনে আকাঙ্ক্ষা করো না।"

এই ত্যাগের দ্বারা ভোগের আদর্শ ভারতেরই একান্ত নিজস্ব। একপক্ষে, সংসার সম্পূর্ণ ত্যাগ করে অরণ্যে বাস, অন্যপক্ষে সম্পূর্ণ সাধারণ গৃহি-জীবন যাপন—ভারতীয় দর্শনে এই উভয় পক্ষের একটি সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে যা অন্যত্র বিরল। জ্ঞান ও কর্মের এই সামঞ্জস্য বিশেষ করে গীতা ও ঈশোপনিষৎ প্রচার করেছেন। এর অর্থ হল এই যে, নিষ্কাম কর্ম-সাধনের পথে যে আত্মবিদ্ পরমপদ (গীতা ২।৫১), পরমা শান্তি, (২।৭১) ব্রাহ্মী স্থিতি (২।৭২) লাভ করেন, তাঁর অবশ্য আর কোনো কর্তব্য কর্ম নেই—

"আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে॥"
(গীতা, ৩।১৯)

কিন্তু, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, জনহিতের জন্য, তিনি সর্বদাই আসক্তিশূন্যভাবে কর্মে রত থাকেন—

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচার॥"
(গীতা ৩।১৯)

ঈশোপনিষৎ আরো স্পষ্ট করে বলেছেন :—

"কুর্বন্নেবেহ কর্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ।
এবং ত্বয়ি নান্যথেতোঽস্তি ন কর্ম লিপ্যতে নরে॥"(২)
"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥"(৯)
"বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥" (১১)

অর্থাৎ কেবল কর্ম করেই মনুষ্য শতবৎসর জীবিত থাকতে ইচ্ছা করুক, কিন্তু এই কর্ম হতে হবে সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে। যাঁরা কেবল অবিদ্যা বা কর্মের অনুসরণ করেন, তাঁরা গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করেন, আর যাঁরা কেবল জ্ঞানের অনুশীলন করেন, তাঁরা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করেন। কিন্তু যাঁরা কর্ম ও জ্ঞানকে পৃথক্ করেন না, তাঁরা কর্মের দ্বারা মৃত্যু অতিক্রম করে জ্ঞানের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

এই কর্মযোগ বা নিষ্কাম কর্মসাধন নানাবিধ নৈতিক সাধনের সমাহার। তার মধ্যে "পঞ্চ-মহাব্রত" প্রধান—অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য, অস্তেয়, অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাসাধন। এর প্রত্যেকটারই দুটো দিক্—negative বা নিষেধমূলক, ও positive বা বিধিমূলক। নিষেধে আরম্ভ; বিধিতে শেষ। যেমন, 'অহিংসা' বলতে প্রথমে বোঝায় হিংসার অভাব-মাত্র। কিন্তু পরে অহিংসা পরসেবারূপ ভাবরূপে চরমোৎকর্ষ লাভ করে। একই ভাবে 'সত্যের' অর্থ প্রথমে অসত্যভাষণ থেকে বিরতি; পরে সর্বকালে, সর্ব অবস্থায়, জীবন-বিনিময়েও সত্যভাষণ। 'ব্রহ্মচর্য' কেবল দৈহিক ভোগেচ্ছাই দমন করা নয়, সেই সঙ্গে আত্মিক, পারমার্থিক আকাঙ্ক্ষার অনুশীলন—কেবল জীবনের নিম্নদিকের পরিবর্জন নয়, উচ্চ দিকেরও পরিবর্ধন।

এরূপে, ভারতীয় দর্শনে কর্মযোগের স্থান অতি উচ্চে। এই যে 'Straight and narrow path of virtue', যাকে কঠোপনিষৎ বলেছেন :

"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ" (৩।১৪)—শাণিত ক্ষুরের ধারার মত দুর্গম পথ, তাই হল মুক্তির পথ। এই নীতির, নিষ্কাম কর্মের পথ ছাড়া অন্য পথ নেই। সেজন্য ভারতীয় দর্শন যে নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির জনক ও পরিপালক —একথা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। শ্রুতি বলেছেন—

"কলিঃ শয়ানো ভবতি সঞ্জিহানস্তু দ্বাপরঃ।
উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি কৃতং সংপদ্যতে চরন্।
চরৈবেতি চরৈবেতি।" (ঐতরেয় আরণ্যক)

"নিদ্রাই কলিকাল, জাগরণই দ্বাপর; দণ্ডায়মান হলেই ত্রেতা, ও চলতে আরম্ভ করলেই সত্যযুগ। অতএব কেবল চল্‌তেই থাক, কেবল চল্‌তেই থাক।"

চলার—অন্ধভাবে, বিভ্রান্ত ভাবে নয়—কিন্তু জ্ঞানের সঙ্গে, নিরাসক্তির সঙ্গে চলার এই সত্যযুগই ভারতের শাশ্বত আদর্শ।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

কে লয়েছ তুলি' পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়
কোন কূল-উষা চোখে তব জাগে ভেদি' ঘন এ-নিশায়!
চলো ল'য়ে চলো যেথা তব সাধ
বুঝি পথ চেয়ে অমল প্রভাত;
চিরবিমুক্ত তরণী আমার তব ধ্রুব-ইসারায়,
কে লয়েছ তুলি পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়!

প্রাণে জাগে আজি শত জীবনের বাঞ্ছিত এক আশা
তোমার পাবকমন্ত্র-ধারায় দাও তারে দাও ভাষা।
মাধুর্যে তব দীপ-দৃষ্টির
খোলো দ্বার খোলো নব সৃষ্টির;
ডাকে অন্তরে প্রাণের পেয়ালা সে অমৃতে ভরি,—আয়,
কে ল'য়েছ তুলি পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়!

ওগো বিমোহন, পরশ রতন, পরশি' তোমায়—ভুলি,
পলকে পলকে তব সম্বিৎ-সূর্য শিহরে দুলি।
বুঝি এ-মর্ত্যম্লান স্মৃতি-তটে
তব অনন্ত বাণী আসি' রটে;
আনন্দ তব স্বর্ণ-কুম্ভে সত্তার ভরি' ছায়,
কে লয়েছ তুলি' পারের তরীতে পারহীন দরিয়ায়!

ভারতীয় শিক্ষায় ভগিনী নিবেদিতার দান

স্বামী তেজসানন্দ

ভগিনী নিবেদিতা তাঁর বহুমুখী প্রতিভা, নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা, বিশাল হৃদয় ও সুদূরপ্রসারী তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে বাংলা-মায়ের স্নেহকোমল কোল আলো করে বসেছিলেন—ভারতের অন্তরের বাণীকে নূতন করে রূপ দিতে ও ভারত-ভারতীকে নবজাগরণের পথে অভিযান করবার প্রেরণা যোগাতে। তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা কতদূর সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, সে সম্বন্ধে স্বর্গীয় স্বনামধন্য আইন-ব্যবসায়ী—শ্রদ্ধেয় রাসবিহারী ঘোষ কলিকাতার টাউনহলে ভগিনী নিবেদিতার স্মৃতিসভায় আবেগময়ী ভাষায় বলেছিলেন, "If the dead bones are beginning to stir today, it is because the Sister Nivedita has breathed the breath of life into them." 'ভারতের মৃত শুষ্ক অস্থিপঞ্জরে আজ যে জীবনের স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে, ভগ্নী নিবেদিতা ওতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন বলেই তাহা সম্ভব হয়েছে।' পাশ্চাত্যভাবে অনুপ্রাণিত তথাকথিত শিক্ষিতসমাজ যখন ভারতের সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-ব্যবহারকে একটা মস্ত বড় কুসংস্কার বলে ঘোষণা করতে গৌরববোধ করত, সেই অন্ধকার যুগে হিন্দুর জীবন-দীপটি প্রজ্বলিত করে দুর্গম বন্ধুর পথে ধীরে অথচ দৃঢ়তার সহিত পথভ্রান্ত পথিককে পথ দেখিয়ে চলেছেন—মহিমময়ী নারী নিবেদিতা। সে মহাযাত্রায় ছিল গভীর আন্তরিকতা ও অফুরন্ত উৎসাহ, অপূর্ব আত্মনিবেদন ও মানব-কল্যাণ-চিকীর্ষা;—ছিল অসীম ধৈর্য ও দৃঢ়তা, নিষ্ঠা ও সেবার আনন্দ। তিনি বিদেশিনী হয়েও ভারত-মাতার আদরিণী কন্যা,—তাঁর জীবনভরা অকুণ্ঠ অবদানের তুলনা নেই। প্রতীচ্য সভ্যতায় গড়া জীবন নিয়ে তিনি কেমন করে ভারতের নর-নারীর শিক্ষার বেদীমূলে নিজেকে নিঃশেষে উৎসর্গ করেছিলেন,—ভারতের ইতিহাস তা গৌরবের সহিত স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ করে রেখেছে,—তাঁর 'নিবেদিতা'-নাম সার্থক হয়েছে।

ভারতীয় শিক্ষার আদর্শ-সম্বন্ধে ভগ্নী নিবেদিতা তাঁর সুপ্রসিদ্ধ "Hints on national education in India" গ্রন্থে বলেছেন,—কেবল শুষ্ক পুঁথিগত বিদ্যা ও ঘটনাপুঞ্জদ্বারা বুদ্ধিকে ভারাক্রান্ত করাকেই শিক্ষা নামে অভিহিত করা চলে না। শিক্ষা বলতে সেই প্রাণদ তথা জীবন্ত ভাবরাশিকেই বুঝায় যা বালক-বালিকার মন, বুদ্ধি, হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তিকে বিকশিত ও পরিমার্জিত করে তোলে। শুধু বুদ্ধির উৎকর্ষ দ্বারা যে শিক্ষা মানুষকে কেবল ধূর্ত বা চতুর করে,—যা শুধু জীবন-নির্বাহের পাথেয় সংগ্রহেরই উপায়মাত্র হয়ে দাঁড়ায়,—তা দ্বারা অনুকরণপ্রিয় একটি মর্কট গড়ে উঠতে পারে বটে, কিন্তু তা মানুষকে যথার্থ মানুষ করে না, তার অন্তর্নিহিত শৌর্য, বীর্য ও মনুষ্যত্বকে উদ্বুদ্ধ করে না। বুঝতে হবে, সে ক্ষেত্রে শিক্ষা ব্যর্থই হয়েছে। তিনি আবার বলেছেন,—

"Unless we strive for truth because we love it and must at any cost attain, unless we live the life of thought out of our own rejoicing in it, the great things of heart and

intellect will close their doors to us." —যে সত্যকে লাভ করলে আমাদের জীবনকে সরস ও আনন্দময় করে তোলা সম্ভব, সেই সত্যনিষ্ঠা ও সার্বভৌম চিন্তাশীলতা যে পর্যন্ত আমাদের শিক্ষার মূলমন্ত্র হয়ে না দাঁড়ায়, ততদিন আমাদের হৃদয় ও বুদ্ধির দ্বার কোন মহৎ কার্য ও উচ্চচিন্তার দিকে উন্মুক্ত হবে না।

নিবেদিতার পরিকল্পিত শিক্ষার পূর্ণ পরিণতি, —সেবায়, আত্মত্যাগে। "The will of the hero is ever an impulse to self-sacrifice. It is for the good of the people—not for my own good that I should strive to become one with the highest, the noblest and the most truth-loving that I can conceive." আত্ম-ত্যাগই প্রকৃত বীরহৃদয়ের চিরন্তন সঙ্গীত ও শাশ্বত প্রেরণা। এতেই মানুষকে এক নিমেষে অসীমের সঙ্গে অভিন্ন করে দেয়। বলা বাহুল্য, যে জাতি সর্বসাধারণের মাঝ থেকে এমনি করে হৃদয়বান, নিঃস্বার্থ প্রেমিক গড়ে তুলতে পারে, সে জাতির উন্নতি অনিবার্য,—তার শিক্ষা সার্থক। স্ত্রীপুরুষ-নির্বিশেষে সর্বসাধারণের শিক্ষা শুধু একটা শুভ কামনা বা কল্পনায় সীমাবদ্ধ না রেখে তাকে যেদিন একটা মহান কর্তব্য বা দায়রূপে স্বেচ্ছায় বরণ করতে পারবে, সেইদিন শিক্ষাব্রত উদ্‌যাপন সম্ভব হবে। জীবনের উচ্চচিন্তার দ্বার রুদ্ধ করা নরহত্যার চেয়েও গুরুতর অপরাধ। নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে জনসাধারণের শিক্ষায় আত্মোৎসর্গ করা সকলের প্রধান কর্তব্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। তাই নিবেদিতার ভাষায় বলতে হয়, "The education of all—the people as well as the classes, woman as well as man—is not to be a desire with us but lies upon us as a command. To close against any gates of higher life is a sin far greater than that of murder......there is but one imperative duty before us today. It is to help education by our lives if need be—education in the great sense as well as the little, in the little as well as in the big."

শিক্ষা-সম্বন্ধে নিবেদিতা আরও বলেছেন, "Education in India has to be not only national but nation-making."—শিক্ষা কেবল জাতীয়তা বোধ জাগাবে না, পরন্তু উহা জাতি-গঠনমূলকও হবে। জাতীয়তা-বোধকে কেন্দ্র করে শিক্ষা সুরু হলেই, দেশকে অন্তর দিয়ে ভালবাসা ও সেবা করা সম্ভব। তাই তিনি শিক্ষার প্রথম সোপানে আন্তর্জাতিকতাকে বড় একটা উচ্চ আসন দেননি। কারণ, তিনি বুঝেছিলেন যে স্বদেশপ্রীতির ভিত্তিভূমিতে দৃঢ় হয়ে দাঁড়াতে না পারলে, বা দেশের সংস্কৃতি ও আদর্শকে শ্রদ্ধা করতে না শিখলে, প্রথম হতেই শুধু আন্তর্জাতিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে সব দেখতে সুরু করলে তা দ্বারা স্বদেশের প্রতি প্রীতি জাগবে না—দেশবাসীর কল্যাণ সাধিত হবে না; বরং জাতীয়তাবোধের ভিত্তি শিথিল হয়ে যাবে। জ্ঞানবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন স্বাভাবিকভাবে অভিজ্ঞতার পরিধি বিস্তারলাভ করবে, তখন বিশ্বের প্রতি হৃদয় স্বতই উন্মুখ হয়ে উঠবে। পুঁথিপুস্তকের ভেতর দিয়ে আন্তর্জাতিকতা শেখাবার তখন আর প্রয়োজন হবে না।

বৃক্ষের শাখা-পল্লবের বিচিত্র বিস্তার ভেতরের প্রাণশক্তিকে অবলম্বন করেই হয়ে থাকে। মানবজীবনেও এ নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। শিক্ষা-বিষয়ে স্বীয় মন-বুদ্ধিকে স্বদেশী ভাবধারায় পরিপুষ্ট না করে

সেখানে প্রথমেই বিদেশী আদর্শে গড়ে তোলার চেষ্টা হয়, সেখানে অপরিচিতের গৃহে পথে কুড়ানো বালকের শিক্ষার মতই হয়ে থাকে তার জীবন। সেখানে কৃতজ্ঞতা থাকতে পারে, —উপকারীকে কর্তব্যবোধে সেবা করবারও প্রবৃত্তি জেগে উঠতে পারে, কিন্তু সেখানে স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমের প্রেরণার যে একান্ত অভাব তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বস্তুতঃ নিজের জীবন-ভিত্তি দৃঢ় হলেই বিদেশী শিক্ষা অঙ্গের ভূষণ হয়ে দাঁড়ায় এবং বিদেশী সভ্যতা ও সংস্কৃতির উৎকৃষ্ট ভাবসম্পদ গ্রহণ করে মানুষ তখন উদার ভাবাপন্ন হতে সমর্থ হয়। দেশের সার্বভৌম আদর্শ, ধর্ম ও দর্শন যা আমাদের সমাজ শরীর গঠনের অফুরন্ত উপাদান, তার প্রতি শ্রদ্ধাহীন হওয়ার ফলেই আমাদের নৈতিক ও সামাজিক জীবন এতটা নিম্নস্তরে এসে দাঁড়িয়েছে।

স্ত্রীশিক্ষা-সম্বন্ধে নিবেদিতার আদর্শ তাঁর গুরু স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শেরই অনুরূপ। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলেন যে, একটা জাতিকে যদি বাঁচতে হয় তবে স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ের সমবেত শিক্ষা ও শক্তির সাহায্যেই তাহা সম্ভব হবে। ক্ষুব্ধচিত্তে তিনি তাই বলেছেন—

"Here in India the woman of the future haunts us. Her beauty rises on our vision perpetually. Her voice cries out on us. Until we throw wide the portals of our life and go out and take her by hand to bring her in, the Motherland stands veiled and ineffective with eyes lost in set patience on the earth......Her sanctuary is today full of shadows. But when the womanhood of India can perform the great *arati* of nationality, that temple shall be all light, nay, the dawn verily shall be near at hand."—অজ্ঞতা ও কুসংস্কারে নিমগ্ন, বিধি-নিষেধের নির্মম কশাঘাতে জর্জরিত যে মাতৃজাতি যুগযুগান্তর ধরে মৃতকল্প হয়ে পড়ে রয়েছে, যেখানে প্রাণের স্পন্দন স্তব্ধীভূত হয়ে গেছে, সে মাতৃজাতির প্রকৃত শিক্ষার ব্যবস্থা না হলে, ভারতমাতার রুদ্ধদ্বার কখনও উন্মুক্ত হবে না। লাঞ্ছনামলিন নারী-জাতিকে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত করে আমরা যে দিন তাকে গৌরবাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হব, সেইদিন ভারতমাতার শতশতাব্দীর অজ্ঞান-অবগুণ্ঠন উন্মোচিত হবে,—প্রভাত-সূর্যের বিমল কিরণে মাতৃমন্দির উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে, —জাগরণের দিন ঘনিয়ে আসবে। তখনই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা এই ভারতভূমির বিশাল প্রাঙ্গণে আবার সহস্র নারীকণ্ঠে সেই উদাত্ত ঋক্‌মন্ত্র ও শৌর্যবীর্যগাথা ধ্বনিত হবে; রত্নপ্রসবিনী ভারতমাতার গর্ভে আবার ঘোষা, অপালা ও ইন্দ্রাণী; মৈত্রেয়ী, সীতা ও সাবিত্রী; —দুর্গাবতী, পদ্মিনী ও রাণী ভবানীর আবির্ভাব হবে। তাই নিবেদিতা প্রাচীন ভারতের নারীচরিত্রের অত্যুজ্জ্বল ও অতুলনীয় আলেখ্যকে বার বার লক্ষ্য করতে বলেছেন।

প্রাচীন ভারতের সাহিত্য ও ইতিহাসে নারীজাতির যে উজ্জ্বল আদর্শ বর্ণিত হয়েছে, তাকে সম্মুখে রেখে যদি স্ত্রীশিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা না হয়, তবে সে শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ ও ফলপ্রসূ হতে পারে না। তাই তিনি বলতেন, "There can never be any sound education of the Indian womanhood which does nor begin and end in exaltation of the national ideals of

womanhood, as embodied in her own history and heroic literature." তবে তিনি এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে এই বিপ্লবযুগে কেবল সনাতনপন্থী হয়ে শুধু প্রাচীনকে ধরে বসে থাকলেই চলবে না, বর্তমানের সঙ্গে প্রাচীন আদর্শকে সমন্বিত করে তাকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে হবে। নিবেদিতার ভাষায়,—"The national ideal of India of today has taken on new dimensions —the national and civic. Here also woman must undoubtedly be efficient ......In order to achieve the ideal of efficiency for the exigencies of the twentieth century, a characteristic synthesis has to be acquired."—আজ ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমবায়ে দেশময় যে শিক্ষামন্দির গড়ে উঠছে, যেখানে স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সকলকেই শ্রদ্ধার অর্ঘ্য সাজিয়ে পূজার আসনে বসতে হবে, নূতন আলোক-সংগ্রহের জন্য। ভগিনী নিবেদিতা ভারতে এমন স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন করতে চেয়েছিলেন যার সাহায্যে আমাদের মাতৃজাতি একদিকে যেমন পবিত্র, সংযত, নিঃস্বার্থ ও ধর্মপরায়ণা হবে, অপরদিকে তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রপরিচালনায় কুশলতা-অর্জন করে জাতীয় জীবনের পুষ্টিবিধান করতে সমর্থ হবে,—লক্ষ্যভ্রষ্ট জাতিকে পুনরায় কেন্দ্রস্থ, আত্মস্থ ও জীবন্ত করে তুলতে পারবে।

রাজগীর

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

অতীত যুগের স্মৃতি-বিজড়িত গিরিব্রজ আজও দাঁড়াইয়া আছে—পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে, তার অস্থি-পঞ্জর দেহে। মহাকালের যাত্রাপথে ইতিহাসের পট-পরিবর্তনে অতীত যুগের গিরিব্রজ কি করিয়া বর্তমান রাজগীরে রূপান্তরিত হইল, তাহার তাত্ত্বিক আলোচনা ইতিহাসের পাতায় নিবদ্ধ থাকুক। আমি শুধু বর্তমান রাজগীরকেই আলোচনা করিব পরিব্রাজকের দৃষ্টি লইয়া।

রাজগীরে আসিয়া আমি এক অতীত যুগের সন্ধান পাইয়াছি, যাহার একত্র সমাবেশ বাংলার এত নিকটে অন্য কোথাও নাই। সেইজন্য রাজগীর প্রত্নতাত্ত্বিকের নিকট, শিল্পীর নিকট, পরিব্রাজকের নিকট আজও বিস্ময়ে দাঁড়াইয়া আছে। এইখানে এক দিন নরোত্তম রাম বিশ্বামিত্র-সমভিব্যাহারে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন। মহাভারতের প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা জরাসন্ধ এইখানেই রাজত্ব করিতেন। তারপর ইতিহাসের দ্রুত পৃষ্ঠা উল্টাইয়া রাজগীরের স্বর্ণ-ইতিহাস আরম্ভ হয় বৌদ্ধযুগে—রাজা বিম্বিসারের রাজত্বকালে। এইখানেই ভগবান তথাগত কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগের সেই বেণুবন আজও পথের পাশে পড়িয়া আছে। জৈনগুরু মহাবীর এখানে কিছু দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। তদীয় শিষ্য-

সম্প্রদায় কর্তৃক পর্বতশীর্ষে নির্মিত মন্দিরগুলি তাঁহারই স্মৃতিকে জাগাইয়া রাখিয়াছে। তাই রাজগীর হিন্দুর, বৌদ্ধের, জৈনের মহাতীর্থ।

রাজগীর যাইবার দুইটি পথ আছে, একটি গয়া হইতে; অপরটি মেনলাইনে বক্তিয়ারপুর হইতে, বিহার-বক্তিয়ারপুর লাইট রেলওয়ে দিয়া। আমাদের প্রথম যাত্রা সুরু হয় গয়া হইতে। প্রায় ৭-৩০ মিঃ নাগাদ বাস ছাড়িল। কতকগুলি গঞ্জ, তন্মধ্যে ওয়াজিরগঞ্জ, নওয়াদা প্রভৃতি অতিক্রম করিয়া বাস চলিতে লাগিল—কখনও পাহাড়ের কোল ছুঁইয়া আবার কখনও ঝরণার পাশ দিয়া। গিরিয়ার নিকট আসিয়া একটি বালুকাময় নদীর পরপারে সুসংবদ্ধ পাহাড়ের শ্রেণী দেখিতে পাইলাম, ইহাই রাজগীরের পর্বতশ্রেণী। গিরিয়া আর একদিক হইতে উল্লেখযোগ্য। এইখানেই জৈনদের তীর্থস্থান পাবাপুরী অবস্থিত। এখান হইতে রাজগীর খুব নিকটে মনে হইলেও পথ অনেক ঘুরিয়া গিয়াছে। পূর্ণোদ্যমে ৪ ঘন্টায় প্রায় ৬৪ মাইল অতিক্রম করিয়া বিহার সরিফের নিকট বাস থামিয়া গেল। তখন ১১-৩০। রাজগীর যাইবার ট্রেন ১টার সময়।

যথাসময়ে রাজগীরগামী ট্রেন আসিল। অসীম বিস্ময়ে রাজগীরের পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিলাম। প্রথমেই দীপনগর ষ্টেশন। এই স্থানেই নালন্দার একটি গেট্ ছিল; বোধ হয় সেই হইতেই উহার নাম দীপনগর হইয়াছে। তার পরেই নালন্দা। নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ এখান হইতে দেড় মাইল দূরে। বাঁধান পথ চলিয়া গিয়াছে। ইহার পর শিলাও। এখানকার খাজা বিখ্যাত, এখান হইতে পাহাড়গুলি আরও স্পষ্ট ও সুন্দর দেখাইতেছিল। অপরাহ্নে পর্বত-শিখরে মন্দিরগুলি সূর্যালোকে প্রতিভাত হইয়া একটি অনির্বচনীয় ভাবের সমাবেশ করিয়াছিল। আমার ধারণা ছিল, রাজগীর পাহাড়-ঘেরা গ্রাম। ট্রেনটি যখন ধীরে ধীরে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন ভাবিলাম, হয়ত বা সুড়ঙ্গ-পথ দিয়া পাহাড়ের মধ্যস্থলে যাইবে, অথবা হিমালয়ান রেলের মত পাহাড় ঘুরিয়া ঘুরিয়া উঠিবে। কিন্তু আমাদের সব কল্পনা ভাঙ্গিয়া দিয়া গাড়ী যখন থামিয়া গেল, তখন চকিত হইলাম; জানালার বাহিরে মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম কাষ্ঠফলকে লেখা 'রাজগীর কুণ্ড'; বুঝিলাম গন্তব্যস্থল আসিয়া গিয়াছি। কিন্তু পাহাড় যদিও কাছে তবুও ত অনেক দূরে। সমতলবাসী, তাই পাহাড় এত নিবিড় ভাবে মনে স্থান করিয়াছে। মনটা তাই যেন কেমন দমিয়া গেল।

'সনাতন ধর্মশালা'র একটি দ্বিতল ঘরে আশ্রয় পাইলাম। এখান হইতে দূরের দৃশ্যগুলি বেশ সুন্দর। গিরিব্রজের এই অংশটাই বর্তমান রাজগীর—একখানি সুন্দর গ্রামমাত্র। গ্রামটি গড়িয়া উঠিয়াছে সমতলস্থানে, পুরাতন গিরিব্রজ হইতে দুই মাইল দূরে। যতই আমরা পুরাতন রাজগীরের দিকে অগ্রসর হইলাম, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হইলাম। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দুর্গ-প্রাকার দৃষ্টিগোচর হইল। বেশ চওড়া প্রাকার, প্রস্তরখণ্ড দ্বারা গঠিত। ইহাই অজাতশত্রু গড়। অজাতশত্রু যখন রাজগৃহে রাজত্ব করেন, তখন তিনি মূল রাজগৃহ হইতে আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া রাজধানীর সীমানা নির্দেশ করেন। তাই স্বাভাবিক পাহাড়-প্রাচীর ছাড়িয়া কৃত্রিম প্রাকার-নির্মাণ করিয়া নগর-রক্ষা করিতে হইয়াছিল। মনটা ফিরিয়া গেল হাজার বৎসর আগে, বিস্মৃত ইতিহাসের অন্তরালে। এক দিন এইখানেই হিন্দু বীরেরা ক্ষাত্রতেজে প্রখর হইয়া মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রাকারের উপর ঘুরিয়া নগর-রক্ষা করিত। কত বীর প্রাণবলি দিয়া জয়ের

কেতন শূন্যে উড্ডীন করিয়াছিল। তাহাদের পদচিহ্ন মিশিয়া আছে, প্রতিটি পাষাণের বুকে!

অপর পারে সুউচ্চ টিলার উপর বার্মিস টেম্পল। কবে ইহা প্রথম নির্মিত হয় জানি না; তবে ইহা খুব নূতন। যদিও temple, তবুও ইহা মূলতঃ বৌদ্ধদের আবাসিক স্থান। এইখানে আসিলে মনে হয় যেন গড়ের ভিতর চলিয়াছি—স্থানটা ঠিক দুর্গদ্বারের মত। দ্বার ছাড়িলেই খানিকটা নীচু জমি। নিকটেই সরকারী ডাকবাংলা এবং বিশ্রাম-নিবাস (Rest House) এইখানেই পথের একধারে বেণুবন। এখানে সন্ধ্যারাগে একদিন বাজিয়া উঠিত মাঙ্গলিক শঙ্খ। পুরনারীরা দীপহস্তে ভগবান তথাগতের আরাধনা করিতেন। অপরদিকে পাহাড়ের কোল ছুঁইয়া রহিয়াছে জাপানী মঠ জাপানী বৌদ্ধেরা এই মঠটি নির্মাণ করিয়াছিলেন।

এখান হইতে রাজগীরের শোভা অবর্ণনীয়। পাহাড়-ঘেরা গিরিব্রজের সমস্ত অংশটা এখান হইতে দৃষ্টিগোচর হয়। চারিদিকে পাহাড়, মাঝে সমতল স্থান। তার মাঝ দিয়া বিসর্পিল পথরেখা চলিয়া গিয়াছে বনানীর ফাঁকে ফাঁকে। সদর রাস্তা ছাড়িয়া অন্য রাস্তা দিয়া যাইলে একটি পাকা পুল পড়ে। উহা একটি শীর্ণকায়া নদীর উপর, নাম সরস্বতী; নিকটবর্তী পাহাড় হইতে বাহির হইয়াছে। এককালে ইহা দুই কূল বাহিয়া প্রবাহিত হইত; সেদিন হয়ত নদীকে কেন্দ্র করিয়া কত জনপদ গড়িয়া উঠিয়াছিল।

পুলটি পার হইয়া পাহাড়ের সিঁড়ি দিয়া প্রায় ৫০ ফুট উঠিলে কুণ্ডগুলির সমীপবর্তী হওয়া যায়। কতকগুলি ধারা একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আবার কতকগুলি প্রবলবেগে পড়িতেছে। এখানে সমস্ত প্রস্রবণই উষ্ণজল-সংযুক্ত। এককালে পাহাড়ের গা দিয়া জল ঝরিয়া যাইত; কিন্তু আজ শিল্পীর হাতে নবরূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। হয়ত কৃত্রিমতার মাঝে প্রকৃতিরূপকে খর্ব করা হইয়াছে। কুণ্ডগুলির সংলগ্ন লক্ষ্মী-জনার্দন ও সীতারামের মন্দির।

রাজগীর পঞ্চশৈলমালা দ্বারা বেষ্টিত। পাহাড়গুলির নাম যথাক্রমে—বিপুল, বৈভার, সোনাগিরি, উদয়গিরি ও রত্নগিরি। রত্নগিরির নিকট আর একটি ছোট পাহাড় আছে, ইহার নাম গৃধ্রকূট। রাজগীরের উত্তর তোরণ বৈভার ও বিপুলগিরি-মধ্যে অবস্থিত; দক্ষিণদ্বার সোনাগিরি ও উদয়-গিরির মধ্যে; পূর্ব তোরণ উদয়গিরি ও রত্নগিরির মধ্যে এবং পশ্চিমদ্বার সোনাগিরি ও বৈভার পাহাড়ের মধ্যে। ষ্টেশন হইতে যে পথটি দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়া পুরাতন রাজগৃহের দিকে গিয়াছে, তাহার বামে বিপুল, ডাইনে বৈভার পাহাড়। রাস্তাটি বিপুল পাহাড়ের পাদদেশ দিয়া যাইয়া পরে উদয়গিরি ও সোনাগিরির মাঝ দিয়া বানগঙ্গা গিরিপাশ অতিক্রম করিয়া গয়া জেলার দক্ষিণ প্রান্তে শেষ হইয়াছে। পথটি সত্যই চমৎকার। পাহাড়ী গৈরিক মাটির রাস্তা ধূলি আর প্রস্তরে সমাকীর্ণ। আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে; কখনও নদীর পাশ দিয়া, আবার কখনও ঘন বনানীর মাঝ দিয়া পাহাড়ের কোল ঘেঁষিয়া। চারিদিকে নিস্তব্ধতা; সমস্ত পুরী যেন মন্ত্রমুগ্ধ পাষাণে পরিণত হইয়াছে। বিদায়-গোধূলি-বেলায়, মায়াময় ছায়ার আবরণে, ধ্যানমগ্ন ধূসর গিরির পটভূমিকায়, গৃহাভিমুখী গাভীর টুং টাং শব্দ গিরি-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হইয়া সমস্ত মনে রহস্য মিশাইয়া দেয়।

প্রধান পথ ধরিয়া কিছু দূর যাইলে একটি শুষ্ক নদীবক্ষ অতিক্রম করিতে হয়—নাম গোমতী। বর্ষার প্রারম্ভে নদীতে প্রাণ সঞ্চারিত হয়, আবার শীতের শেষে নদী হারিয়ে যায় গিরিকন্দরে। নদীটি নিকটেই সরস্বতী-নদীতে মিশিয়াছে। এই দুইটি নদীর সংযোগস্থলে একটি উচ্চ টিলার

উপর রাজগিরির একমাত্র শক্তিমূর্তি অষ্টভুজা জালাদেবীর মূর্তি অবস্থিত। ইহারই অনতিদূরে সরস্বতী-নদীর তীরে রাজগীরের শ্মশান—অতীতে যেমন ছিল আজও তেমনি আছে।

এখান হইতে পাহাড়গুলি একটু দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমস্ত সমতল স্থানটি জঙ্গলাকীর্ণ। পথটি ধরিয়া আরও কিছুদূর অগ্রসর হইলে একটি সংযোগস্থলে আসা যায়। একটি রাস্তা পশ্চিম দিকে শোনভাণ্ডার অথবা ধনভাণ্ডারে যাইয়া শেষ হইয়াছে; অপরটি পূর্বদিক দিয়া যাইয়া পরে দক্ষিণ দিকে বাঁকিয়া বাণগঙ্গা পাশে আসিয়া শেষ হইয়াছে। এই সংযোগ-স্থলেই মনিয়ার মঠ অবস্থিত। প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত মূর্তি ও শিলালিপিই মঠের প্রতিভূস্বরূপ পড়িয়া আছে ইতিহাসবেত্তার গবেষণার ভাণ্ডার পূর্ণ করিবার জন্য। ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীন ভিত্তিই আজ মঠের স্মৃতি। এইখানে মহাভারতীয় যুগে নাগরাজ মণিভদ্রের আবাস ছিল; সেই হইতেই হয়ত মঠটির নামকরণ হইয়াছে। প্রাচীন কালে রাজগৃহে যে নাগপূজার প্রচলন ছিল তাহা নাগমূর্তি হইতে অনুমিত হয়। ইহার নিকটেই নির্মাল্য-কূপ—একটি বৃহদ্ব্যাস-যুক্ত অগভীর কূপ এবং নিকটেই যজ্ঞবেদী। রাজা জরাসন্ধ যখন যজ্ঞ করিতেন, তখন যজ্ঞে আহুত নির্মাল্য এই কূপে নিক্ষেপ করা হইত। সেই হইতে কূপটির নামকরণ হইয়াছে। কেহ কেহ কূপটির আকৃতি দেখিয়া ধারণা করেন যে, স্থানটিতে হয়ত বৌদ্ধযুগে মৃৎশিল্পালয় বা পটারী ওয়ার্কস্ ছিল এবং কূপটি মাটির বাসন পোড়াইবার জন্য ব্যবহৃত হইত। যাহা হউক, কূপটি যে প্রাচীন-স্মৃতিবিজড়িত—তাহা তাহার গাত্রে উৎকীর্ণ বাণাসুরমূর্তি, নাগমূর্তি, বুদ্ধমূর্তি এবং গণেশমূর্তি দেখিলে অনুমিত হয়। মূর্তিগুলি কালের প্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া গিয়াছে। বর্তমানে ইহা ১৯০৫ সালের প্রাচীন-স্মৃতি-সংরক্ষণ আইনের আশ্রয়ে রহিয়াছে। সেইজন্য সরকার বাহাদুর ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য উহার উপর একটি ছাউনী দিয়াছেন। সন্দেহের বশবর্তী হইয়া আমরা উহার মধ্যে নামিয়াছিলাম; শুধু পোড়া ছাই ছাড়া আর কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

মনিয়ার মঠ পার হইয়া পশ্চিমের রাস্তা ধরিয়া যাইলে পূর্বোক্ত সরস্বতী-নদীর উপর একটি ছোট পুল পার হইয়া বৈভার পাহাড়ের সমীপবর্তী হওয়া যায়। এখান হইতে অন্য একটি পথ বনের ভিতর দিয়া অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে, কাষ্ঠফলকে লেখা To Ranbhum. আমরা পথটি পশ্চাতে ফেলিয়া ধনভাণ্ডারের দিকে অগ্রসর হইলাম- স্থানটি খুব নিকটেই। বৈভার-পর্বতের পাদদেশে ধনভাণ্ডার গুহা অবস্থিত। গুহাটি স্বাভাবিক নয়; শিল্পীর নিপুণ হস্তের ছাপ ইহাতে রহিয়াছে। বেশ প্রশস্ত ঘর। প্রবাদ যে, রাজা জরাসন্ধের ইহা কোষাগার ছিল। ঘরটির সামনের দেওয়ালে পাথর কাটিয়া ছোট একটি জানালা করা হইয়াছে। অনুমান ইহা হয়ত টাকা লেনদেনের জন্য ব্যবহৃত হইত। কেহ ধারণা করেন, বৌদ্ধযুগে ইহা শ্রমণদের আবাসিক স্থানরূপে ব্যবহৃত হইত। এ ধারণা খুব অবাস্তব নয়। দেওয়ালে উৎকীর্ণ প্রাচীন লিপির আজও পাঠোদ্ধার হয় নাই। যেদিন হইবে সেদিন হয়ত এ রহস্যের উদ্‌ঘাটন হইবে। ছাদ পতনোন্মুখ হওয়াতে উহাকে ঠেস্ দিয়া রাখা হইয়াছে।

ধনভাণ্ডার হইতে ফিরিয়া আসিয়া রণভূমের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। বনের ভিতর দিয়া সামান্য পথরেখা, খুব হুঁসিয়ার না হইয়া চলিলে হারাইয়া যাইবার ভয়। কাঁটা-ঝোপের মধ্য দিয়া কোন রকমে পথ করিয়া প্রায় ১০ মিঃ

হাঁটিয়া রণভূম পাইলাম। প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের হইতে কোন স্মারকচিহ্ন এখানে নাই। সেইজন্য স্থানটি খুঁজিয়া লইতে বেশ অসুবিধা হয়। রাজা জরাসন্ধ নিত্য এখানে শরীর-চর্চা করিতেন। তাই মাটি ঠিক রাখিবার জন্য নিত্য এখানে দুধ ঢালা হইত। কাহিনী হয়ত অতিশয়োক্তি-দোষে দুষ্ট। কিন্তু চারিদিকে লাল কঙ্করময় মাটির মাঝে এইরূপ শুভ্রকান্তি মাটি নিশ্চয়ই বিস্ময় উৎপাদন করে। মাটি খুবই নরম; হাত দিয়া একটু ঘসিলেই গুঁড়াইয়া যায়। যাহা হউক পুণ্যভূমির মাটি সংগ্রহ করিয়া প্রধান পথ ধরিয়া মনিয়ার মঠে পুনরায় ফিরিয়া আসিলাম।

মনিয়ার মঠ ছাড়িয়া পূর্বদিকের রাস্তা ধরিয়া চলিলাম। দুই ধারে বন, তাহার মাঝ দিয়া পথ। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া একটি উন্মুক্ত স্থান পাওয়া গেল। স্থানটিতে একটি প্রশস্ত ঘরের প্রাচীন ভিত্তি রহিয়াছে। ইহা রাজা জরাসন্ধের কারাগার। একদিন এখানে কত সামন্তরাজ, শৌর্যে বীর্যে মদমত্ত রাজা বন্দিরূপে মৃত্যুর যূপকাষ্ঠে প্রহর গুনিয়াছিলেন। ভক্তের করুণ প্রার্থনা ভগবানকে ব্যথিত করিয়াছিল। তাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছিলেন মুক্তির দূত হইয়া সাম্য-প্রতিষ্ঠার জন্য। বিগতযুগে রাজা বিম্বিসার এখানে পুত্র অজাতশত্রুর বন্দিরূপে জীবনের শেষদিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতেও তিনি বিচলিত হন নাই। তিনি ত প্রাণ, মন, দেহ ভগবান তথাগতের চরণে সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেইজন্য এখান হইতে নাতিদূরে গৃধ্রকূট পর্বতে বিরাজিত ভগবান তথাগতের চরণ-দর্শন করিয়া ব্যথিত জীবনে প্রচুর শান্তি পাইতেন। এই প্রসঙ্গে ইতিহাসের আর একটি দৃশ্য মনে পড়িয়া যায়—আগ্রা দুর্গে বন্দী বৃদ্ধ শাহাজান; ব্যথিত জীবনের শান্তি—শুধু তুষারশুভ্র তাজমহল! এখান হইতে গৃধ্রকূট পাহাড়টি বেশ পরিষ্কার দেখা যায়। মৃত্তিকা-খননের ফলে এখানে ভূসংলগ্ন লোহার আংটি পাওয়া গিয়াছে, অনুমান ইহাতে বন্দীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখা হইত। এখানেও কোন স্মারক চিহ্ন নাই।

কারাগার হইতে আরও কিছুদূর যাইলে একটি পথের সংযোগস্থলে আসা যায়। উত্তরাভিমুখী রাস্তাটি গৃধ্রকূটের দিকে গিয়াছে। কাষ্ঠফলকে নির্দেশ To Gridhrakut. রাস্তাটি ধরিয়া প্রায় মাইলখানেক চলিলে গৃধ্রকূট পর্বতের পাদদেশে পৌছান যায় এবং আরও দেড় মাইল চড়াই-উৎরাই করিলে শিখরে উঠা যায়। পাহাড়টি খুবই ছোট। ইহার তিনদিকে রত্নগিরি ঘিরিয়া রাখিয়াছে। দক্ষিণদিকে অনেকখানি সমতলস্থান জঙ্গলাকীর্ণ। এইখানেই ছিল রাজচিকিৎসক জীবকের আম্রবন; যাহা বুদ্ধকে দান করিয়াছিলেন। পাহাড়ের গা কাটিয়া রাস্তা করা হইয়াছে, সমস্ত পথটি পাথর দিয়া বাঁধান। রাজা বিম্বিসার নিত্য এই পথ দিয়া ভগবান বুদ্ধের চরণবন্দনা করিতে যাইতেন। তাই এই পথ রাজপথ। রাস্তার দুইধারে দুইটি স্তূপ ছিল, দেখিতে শকুনির মত, অথবা উহার উপর শকুনি বসিত বলিয়া পর্বতটির নাম গৃধ্রকূট হইয়াছে। ইহার শিখরে অনেক-গুলি গুহা আছে। ভগবান বুদ্ধ এইখানে অনেকদিন সশিষ্য বাস করিয়াছিলেন। শিখরের নীচের দিকের গুহাগুলি অর্হৎদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল, এবং উপরের দিকে যে গুহার পাথর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা ভগবান বুদ্ধের। এইখানে তিনি সমতল স্থানে পদচারণা করিতেন এবং সমবেত

ভক্তমণ্ডলীকে উপদেশ দান করিতেন। একদিন যখন পদচারণা করিতেছিলেন, তখন দেবদত্ত উপর হইতে পাথর গড়াইয়া তাঁহাকে মারিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিল। এই গুহাটির উত্তর পশ্চিমে আনন্দের গুহা; যেখানে শকুনির ছদ্মবেশে মার ঝাপটা মারিয়া ভয় দেখাইত এবং ভগবান তথাগত নিজগুহা হইতে শিষ্যকে অভয়দান করিতেন। গুহাটি বর্তমানে ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে রসিক অশ্বত্থ ও বট তাহাদের মূল প্রবেশ করাইয়া রস-শোষণে প্রয়াসী হইয়াছে। মূলস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গে পাথর খসিয়া পড়িয়া অহিংস আন্দোলন করিতেছে। কিন্তু এ মূক প্রতিরোধের শেষ কোথায়?

প্রধান পথ ধরিয়া চলিলে নিকটেই shell inscription (ঝিনুক-লিপি)। উদয়গিরির পাদদেশে অনেকখানি আয়তাকার স্থান ঘিরিয়া রাখা হইয়াছে। এখানকার মাটি বেশ শক্ত এবং লাল রংএর এবং তাহাতে লিপি খোদিত আছে; তাহা ছাড়া রথ চলারও অনেক দাগ আছে। প্রবাদ, ভীমের সহিত জরাসন্ধের মল্লযুদ্ধ এইখানেই হইয়াছিল। লিপির আজও পাঠোদ্ধার হয় নাই। ইহার পার্শ্ব দিয়াই উদয়গিরি উঠিবার পথ। পাহাড়ের মাঝখানে একটি ডাকবাংলো আছে। এখানে পথটি বামে উদয়গিরি ও ডাইনে সোনাগিরি মধ্য দিয়া গিয়াছে এবং নিকটেই বাণগঙ্গা পাশ। এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সত্যই অবর্ণনীয়। জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড় চারিদিক হইতে ঘিরিয়া রাখিয়াছে—মাঝে মাঝে গভীর খাদ। সেই পথ দিয়া রজত-সূত্রের ন্যায় শীর্ণ নদী বাণগঙ্গা, ঝির্ ঝির্ গতিতে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, কখনও লাজে অবগুণ্ঠিতা, আবার কখনও হাস্যোজ্জ্বলা। বাণগঙ্গা নদীর উপর একটি পাকাপুল অতিক্রম করিলে বাণগঙ্গা পাশে পৌছান যায়। এখানে উদয়গিরি ও সোনাগিরি পরস্পর নিকটে আসিয়া পথটি সঙ্কীর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। পথ এখানে প্রায় শেষ হইয়াছে। পূর্বদিকে বিস্তীর্ণ বালুকাময় নদীর পরপারে গিরিয়া। এখানে রাজগীরের আর একটি বৈশিষ্ট্য দৃষ্টিগোচর হয়—পাহাড়ের উপর প্রাচীর। পাহাড়গুলি উঁচু নয়, তাই নগর-রক্ষা করিবার জন্য পাহাড়ের উপর পাথর দিয়া উঁচু এবং চওড়া প্রাচীর নির্মাণ করা হইয়াছিল। ইহা বৌদ্ধযুগের স্থাপত্য-শিল্পের একটা নিদর্শন। রাজগীরের সর্বত্রই এই ধরনের প্রাচীর আছে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাহা জঙ্গলে সমাকীর্ণ অথবা ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু এ স্থানে ইহা সুন্দর ভাবে রহিয়াছে।

রাজগীরের পাহাড়গুলিতে উঠা সত্যই একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট পাহাড়, কোথাও পথ নাই, শুধু পাথরের উপর দিয়া পথ করিয়া লইতে হয়, আবার কোথাও বা বাঁধান রাস্তা,—পাথরের সিঁড়ি করিয়া দেওয়া। সমস্ত শিখরেই জৈন মন্দির, ভগবানের নামে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরে কোথাও শুধু পদচিহ্ন, আবার কোথাও শুধু তীর্থঙ্করের মূর্তি রক্ষিত আছে। বনের ভিতর লম্বা লম্বা ঘাসের মধ্য দিয়া চলনামা পথে পাহাড়ে উঠানামা করিতে বেশ আনন্দ হয়। উদয়গিরি ও সোনাগিরিতে উঠিবার পথ খুব ভাল নয়। সবচেয়ে ভাল পথ বিপুলগিরিতে—শিখর পর্যন্ত সমস্ত পথটি সোপান-সংযুক্ত। বৈভার-পাহাড়ে উঠিবার রাস্তা কুণ্ডগুলির পার্শ্ব দিয়া। এখানে পথ বলিতে কিছুই নাই। অসংলগ্ন পাথরের উপর দিয়া উঠিতে হয়। খানিকটা উঠিলেই একটি শৃঙ্গের উপর সমতল স্থান পাওয়া যায়, এখানে জরাসন্ধ-কা-বৈঠক। ইহা watch tower-এর মত। এখানে অনেকগুলি গুহা আছে, ঐগুলি প্রহরীদের থাকিবার স্থান হিসাবে

ব্যবহৃত হইত। এখান হইতে রাজগীরকে ভালভাবে দেখা যায়; পটে আঁকা ছবির মত। আরও উপরে উঠিলে একটি পথ পাওয়া যায়। চড়াই পথে প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা হাঁটিয়া একটি সমতল স্থানে আসা যায়, ইহা আর একটি শৃঙ্গ। এখানে জৈন মন্দির আছে। মন্দিরের পাশ দিয়া একটি পথ চলিয়া গিয়াছে, কাষ্ঠফলকে নির্দেশ To Saptaparni Cave. পথ ধরিয়া কিয়দ্দূর যাইয়া প্রাচীন সপ্তপর্ণী গুহায় পৌঁছিলাম। বিরাট গুহা—ভিতরে জমাট অন্ধকার; সামান্য টর্চের আলো এ অন্ধকার ভেদ করিতে পারিবে না। পথ একটু নামিয়া পাষাণের মাঝে অদৃশ্য হইয়াছে। কাহিনী এ পথ গয়ার বৌদ্ধ মন্দির পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাসের কোন ভিত্তি নাই, শুধু অলীক প্রবাদ-মাত্র। এইখানে রাজা অজাতশত্রু প্রথম বৌদ্ধ মহাসংগীতি (মহাধর্মসভা) আহ্বান করেন। ইহাতে স্থবির মহাকশ্যপ সভাপতিত্ব করেন।

বর্তমান রাজগীরে প্রধান আকর্ষক বস্তুই হইল এখানকার উষ্ণ প্রস্রবণগুলি। সেইজন্য প্রস্রবণগুলি-সম্বন্ধে বিশদ ভাবে না বলিলে রাজগীরের বর্ণনা শেষ হয় না। এখানে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে। গঙ্গাযমুনাকুণ্ড, সপ্তর্ষিকুণ্ড, ব্রহ্মকুণ্ড,—এই তিনটি কুণ্ড বৈভার-পর্বতে। বিপুলপাহাড়ে কুণ্ডগুলির নাম সূর্যকুণ্ড, রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, সীতাকুণ্ড ও মকদমকুণ্ড। শেষেরটি মুসলমানদের জন্য। তন্মধ্যে বৈভারপর্বতের ঝরণাগুলি হইতে প্রবলবেগে জল পড়িতেছে এবং উষ্ণতাও বেশী; সেইজন্য স্নানার্থীর বেশী ভীড় হয়। প্রস্রবণগুলির নির্গমদ্বারে পাথরের মুখ বসান—কোনটিতে সিংহ, আবার কোনটিতে হস্তীর মুখ। এই প্রস্রবণগুলি হইতে অবিরাম ধারা পড়িতেছে। গঙ্গাযমুনা-ধারা দুইটি পৃথক ধারা। সপ্তর্ষি-কুণ্ডে সাতটি ধারা সাত জন ঋষির মুখ হইতে পড়িতেছে। ইহার প্রধান ধারা সাতটি ভাগে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে স্নানার্থীর সুবিধার জন্য। ব্রহ্মকুণ্ডটি একটি বর্গাকার জলাধার-মাত্র। তলা হইতে বুদ্‌বুদাকারে জল পড়িতেছে, আর তিন ফুট উঁচু হইতে একটি নির্গম-নল দ্বারা জল বাহির হইয়া যাইতেছে। এখানে একটি কাল পাথরের বিষ্ণুমূর্তি আছে। উষ্ণজল পাথরে দিলে ঠাণ্ডাজল পড়িতে থাকে। পাথরটি তাপ-শোষণ করিয়া লয়। ইহা কাল পদার্থের স্বভাবজাত গুণ। বিপুল পাহাড়ের কুণ্ডগুলির জল অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ। জলগুলির রাসায়নিক বিশ্লেষণে নিম্নলিখিত তথ্য পাওয়া গিয়াছে :—

প্রতি ১০০০০০ ভাগে

	ব্রহ্মকুণ্ড	সূর্যকুণ্ড	সপ্তধারা
খরতা	৫·৫	৫·৭৫	২·৭৫
ক্লোরিন্	·৯	·৯	·৪
অক্সিজেন	·০০১৮	·০০১৮	·০০৯
নাইট্রোজেন	·০১	·০২	·০১

প্রতি ১০০০০০ ভাগে

	মকদম কুণ্ড	রামকুণ্ড	সীতাকুণ্ড
খরতা	৫·০	২·৫	৪·৫
ক্লোরিন্	·৯	১·০	·৯
অক্সিজেন	·০০২	·০০২	·০০১৮
নাইট্রোজেন	·০২	·০৩	·০২

ইহা ছাড়া জলগুলিতে সালফেট্ ও লৌহ-গঠিত লবণ আছে এবং উহা পানের পক্ষে উপকারী। কুণ্ডগুলির পার্শ্বেই ইদের দরগা। এখানকার সমস্ত সম্পত্তি বিহার-সরিফের নবাবের। নবাব এই সমস্ত কুণ্ডগুলিতে স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু স্থানীয় হিন্দুরা ইহাতে বাধা দেওয়ায়

প্রথমে ছোট আদালতে মামলা দায়ের হয়। পরে উহা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়াইয়া যায়। পরিশেষে রফা হয় এবং একটি কুণ্ড নবাবকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কুণ্ডটির পূর্বে নাম ছিল ঋষ্যশৃঙ্গকুণ্ড; পরে পরিবর্তিত হইয়া উহার নাম মকদমকুণ্ড হইয়াছে। মকদম-নামক এক জন পীরের নামানুসারে ইহা হইয়াছে। কুণ্ডটির জল নাতিশীতোষ্ণ। এখানে চেয়াগের মেলার সময় খুব ভিড় হয়। তাহা ছাড়া জৈন পর্বগুলিতে দর্শনার্থীর ভিড় বেশী হয়।

রাজগীরে বায়ুপরিবর্তনকারীর মধ্যে বেশীর ভাগই বাতগ্রস্ত। উষ্ণ জলে স্নানে পীড়ার কিছু উপশম হয়। সেইজন্য অক্টোবর মাস হইতে এখানে কর্মচাঞ্চল্য জাগে এবং শীতের পরিশেষে সমস্ত গ্রামটি পূর্বাবস্থা-প্রাপ্ত হয়। এই সময়ে এখানে কিছু হোটেল গজাইয়া উঠে। সারা বৎসর লোক-সমাগম হয় না বলিয়া হোটেলের ব্যবসা ভাল জমে না। সেইজন্য ভ্রমণকারীদের সঙ্গে সমস্ত জিনিষপত্র লওয়াই ভাল। অবশ্য ঘর পাওয়া যায়। একটি সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়, পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ-পত্র এখানে পাওয়া যায়, তবে বেশীর ভাগই বিহার সরিফ হইতে লইয়া আসিতে হয়। চাষ-আবাদ হয়; তবে রবিশস্যই বেশী। নিকটেই নালন্দা মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ। সকালের ট্রেনে যাইয়া সন্ধ্যার ট্রেনে ফেরা যায়। দশটার পর যাওয়াই উচিত, কারণ মিউজিয়াম্ দশটার পর খোলে। বিহারসরিফ্ হইতে বাসে করিয়া গিরিয়ার নিকট নামিলে জৈনদের তীর্থস্থান পাবাপুরী পাওয়া যায়। এখানে জলমন্দির দেখিবার মত। বৃহৎ সরোবরের মাঝে মন্দির। রাজগীরের সমস্ত স্থানটি পরিভ্রমণ করিতে প্রায় এক সপ্তাহ সময় লাগে, সেইজন্য উপযুক্ত সময় হাতে রাখিয়া যাওয়াই ভাল।

কবীর-বাণী

("অব মৈঁ ভূলারে ভাঈ"-বাণীর অনুবাদ)

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

আমারে যখন ভুলেছিনু আমি
প্রিয় সদ্‌গুরু মোর,
কোথা মম পথ দেখালেন আসি
ঝরিল রে আঁখি-লোর!
আচার বিচার সকলি ছাড়িনু
ছাড়িনু তীর্থে স্নান
জগতে সবাই দেখিনু বিজ্ঞ
আমি শুধু অজ্ঞান!
ধূলায় লুটায়ে প্রণাম ভুলিনু
ভুলিনু ঘন্টানাড়া,
আসন-বেদীতে মূর্তি-নিচয়
করি নাই আমি খাড়া!

পূজা-অর্চনা করি নাই তথা
দিই নাই ফল-ফুল,
সকলে আমারে বাতুল ভেবেছে
নাহি যার সমতুল!
জপ-তপ আর কৃচ্ছ্রসাধনে
তৃপ্ত নহেন হরি,
ইন্দ্রিয়-নাশ বসন-বিরাগ—
তুচ্ছ ইহারে বরি!
দয়ালু চিত্তে যে পালে ধর্ম
সদা রহে উদাসীন,
সকল জীবেরে নিজসম জানে
প্রভুতে সে হয় লীন!

কহিছে কবীর—নীরবে থাকি যে
সহে সব অপমান,
সকল গর্ব দূর করি' রাখে—
তারই মেলে ভগবান!

শান্তি-গীতা

শ্রীউমাপদ মুখোপাধ্যায়

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে পুত্রবিয়োগবিধুর অর্জুনের শোকশান্তির জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার লিপিবদ্ধ সংগ্রহই 'শান্তিগীতা'। অধ্যাত্মজ্ঞান ব্যতীত শোকশান্তির দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠতর কোন উপায় নাই এবং ভারতবাসী ঐ জ্ঞানকেই তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্যরূপে স্বীকার করায়, সকল শোক অপেক্ষা অধিকতর মর্মপীড়াদায়ক পুত্রশোককে দূর করিতে হইলে ঐ জ্ঞানকেই সর্বপ্রধান অবলম্বন রূপে যে গ্রহণ করিতে হইবে তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিতেছেন মায়িকে সত্যবজ্জ্ঞানং শোক-মোহস্য কারণম্—অর্থাৎ মায়াময় মিথ্যা বস্তুতে সত্যবুদ্ধিই শোক ও মোহের একমাত্র কারণ। দেহাভিমান-জন্য তুমি মমতামুগ্ধ হইয়াছ মাত্র। কেবল তুমি নহ, মায়ামুগ্ধ জীবগণের প্রত্যেকেই এইরূপে নানাপ্রকার দুঃখভোগ করিতেছে। মায়ার এমনই প্রভাব যে অনাদি কাল হইতে জীব এই মিথ্যা সংসারকে সত্য জ্ঞান করিয়া উহাতে মুগ্ধ হইতেছে। জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায় দেহের বর্জন তো অবশ্যম্ভাবী, তথাপি অজ্ঞান মানুষ শোকাচ্ছন্ন হইয়া থাকে। দেহত্যাগ অবস্থান্তরপ্রাপ্তি-মাত্র, কর্মফল ভোগ করিবার জন্য পুনরায় জীব দেহধারণ করে, অতএব এজন্য শোক পরিত্যাগ করাই কর্তব্য। পুত্র যৌবনদশা প্রাপ্ত হইলে, তাহার বাল্যভাব না দেখিয়া পিতা কি শোক করেন?

সৃষ্টির পূর্বে সংমাত্রই বর্তমান ছিলেন, তখন দেশ, কাল, ভূত, ভৌতিকাদি কিছুই ছিল না। যখন তাঁহাতে মায়াশক্তি সক্রিয় হন, তখন তাঁহাতে মাল্যসর্পের ন্যায় এই জগৎ উদ্ভূত হয়। মাল্যাতে সর্পের যেমন অধ্যাস হয়, তেমনি সেই সতে জগৎ অধ্যস্ত হয়। মায়ার প্রভাবেই সেই সৎ ব্রহ্ম বিশ্বাকারে পরিদৃষ্ট হন। আত্মগত অজ্ঞানের ফলে তাহাতে এই সংসারের অধ্যাস হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান বা প্রকৃতি দুই ভাগে বিভক্ত। রজঃ ও তমোবিহীন শুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি মায়া-নামে এবং রজস্তমোদ্বারা অভিভূত মলিনসত্ত্ব-প্রধানা প্রকৃতি অবিদ্যা-নামে অভিহিত হন। গুণ ও শক্তিভেদে প্রকৃতিতে এই পার্থক্য উৎপন্ন হয়। উক্ত মায়াতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হইলে তাহাকে ঈশ্বর বলা হয়, যিনি মায়ার অধীশ্বর এবং সর্বজ্ঞত্বাদি-গুণযুক্ত। অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই জীব। মায়ার আধার যে শুদ্ধচৈতন্য, তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

জীবের স্বরূপ নিত্যমুক্ত আত্মা—নির্বিকার ও নিরঞ্জন। মমতা-পাশে আবদ্ধ হইয়াই তুমি আমার স্ত্রী, আমার পুত্র বলিয়া মূঢ়ের ন্যায় বিমুগ্ধ হইতেছ। তুমি দেহই নহ। তখন তোমার আবার পুত্র কি? এই শোকতাপ প্রভৃতি মনের ধর্ম, মন উহা কল্পনা করে ও স্বয়ংই উহাতে দগ্ধ হয়। তুমি মনও নহ, তুমি নিত্যশুদ্ধ নিত্যমুক্ত অসঙ্গ ও অবিকারী আত্মা। দৃশ্য বিষয় ও দ্রষ্টা ব্যক্তি পৃথক, এই ন্যায়ানুসারে দৃশ্য মন ও দ্রষ্টা তুমি পৃথক; কিন্তু অবিবেক-বশতঃ দৃশ্য-দ্রষ্টার অভেদ-জ্ঞানে আমিই মন

এইরূপ নিশ্চয় করিয়া আমি পুত্রশোকে দগ্ধ হইতেছি—এইরূপ মনে করিতেছ। মন অন্তঃকরণের সঙ্কল্পাত্মিকা বৃত্তি, বুদ্ধি উহার নিশ্চয়াত্মিকা বৃত্তি, চিত্ত অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তি; আর অভিমানাত্মিকা বৃত্তির নাম অহঙ্কার। অতএব অন্তঃকরণের বৃত্তি এই চারি প্রকার। ইহারা আত্মার দৃশ্য এবং আত্মা ইহাদের দ্রষ্টা। তুমি মনে তাদাত্ম্যাধ্যাস জন্য মনের শোকে নিজেকে শোকসন্তাপগ্রস্ত মনে করিতেছ। দেখ, সুষুপ্তি বা মূর্চ্ছাবস্থায় মন বিলীন হইলে শোকসন্তাপ থাকে না, জাগ্রদবস্থায় মন ক্রিয়মাণ হইলে তাহার ধর্ম শোকদুঃখাদি প্রকাশ পায়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহ মন মিলিত হইলে হয় মনোময় কোষ। শোকদুঃখ, ভয়, লজ্জা প্রভৃতি এই মনোময় কোষেরই হইয়া থাকে। তুমি অবিবেকবশতঃ মনের ধর্ম আত্মাতে আরোপ করিয়া শোকাকুল হইতেছ। আত্মার স্বরূপ জ্ঞাত হইলে মনের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাস দূরীভূত হয়—তখন মনোধর্ম শোকমোহ জীবকে ব্যাকুল করিতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলেন—'শোকং তরতি চাত্মজ্ঞঃ'। অতএব তুমি আত্মস্বরূপ অবগত হইতে যত্নবান হও।

কি প্রকারে আত্মজ্ঞান লাভ করা যায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন—

গুরুসেবাং প্রকুর্বাণো গুরুভক্তিপরায়ণঃ।
গুরোঃ কৃপাবশাৎ পার্থ লভ্য আত্মা ন সংশয়ঃ॥

অর্থাৎ, গুরুভক্তিপরায়ণ হইয়া গুরুসেবা করিলে গুরুর কৃপাবশে আত্মাকে লাভ করা যায়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। তৎপূর্বে বিবেক, বৈরাগ্য, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা, মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন হইতে হইবে। শান্ত, বিনীত ও শুদ্ধচিত্ত শিষ্য 'তত্ত্বমসি'-মহাবাক্যের সাধনরূপ বিচার গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিলে সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইতে পারেন। বুদ্ধি নির্মল হইলে তাহাতে বিবেকের উদয় হয়। কামনাশূন্য হইয়া ঈশ্বরের প্রীতিসাধন-মানসে স্বধর্ম পালন করিলে ও সমস্ত কর্ম ব্রহ্মে অর্পণ করিলে বুদ্ধি নির্মল হয়। বিবেক দ্বারা জগৎ মিথ্যা বোধ হইলে বৈরাগ্যের উদয় হয়। বিবেক-বৈরাগ্যবান ব্যক্তি স্ত্রীপুত্রাদিকে তাপদায়ক মনে করিয়া আত্মানন্দ-লাভে ব্যগ্র থাকেন। ভোগবাসনাকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া তিনি শমদমাদিসাধন-সম্পন্ন হন। বেদ ও গুরুবাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে বলে শ্রদ্ধা। এই সাধন ও শ্রদ্ধাপরায়ণ মুমুক্ষু ব্যক্তি শ্রীগুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবেন, কারণ—

জ্ঞানদাতা গুরুঃ সাক্ষাৎ সংসারার্ণবতারকঃ।
শ্রীগুরুকৃপয়া শিষ্যস্তরেৎ সংসারবারিধিম্॥

অর্থাৎ, গুরুই সাক্ষাৎ জ্ঞানদাতা এবং সংসার-সমুদ্র হইতে ত্রাণকর্তা। একমাত্র শ্রীগুরুর কৃপাবলেই শিষ্য সংসারবারিধি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। আত্মা সতত প্রাপ্তই আছেন; গুরুর উপদেশে অবিদ্যার আবরণ দূরীভূত হইলে তাঁহাকে প্রাপ্তবৎ জ্ঞান হয়।

এইবার আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ 'ত্বং'-পদের শোধন-প্রণালী বলিতেছেন। নেতি নেতি বিচার করিতে করিতে বাধের যে সীমায় উপনীত হওয়া যায়, সেই সকল বাধের সাক্ষী স্বপ্রকাশ বস্তুকে তুমি নিজের স্বরূপ বলিয়া অবগত হও। ইহাকেই 'ত্বং'-পদের শোধন বলা যায়। 'তৎ'-পদের শোধন-প্রণালী এইরূপ—জগৎকর্তৃত্ব, ঈশ্বরত্ব, সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত্বাদি লক্ষণ-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া দেশকালবস্তু-পরিচ্ছেদশূন্য, মায়ার অধিষ্ঠান, অজ, অবিনাশী, পূর্ণ, এক, অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া জান; ইহাকেই 'তৎ'-পদের শোধন বলা যায়। এক্ষণে 'অসি'-পদের দ্বারা শোধিত ত্বং-পদের লক্ষ্যার্থ অবিনাশী প্রত্যক্-চৈতন্যের

সহিত শোধিত তৎ-পদের লক্ষ্যার্থ অবিনাশী ব্রহ্মচৈতন্যের অখণ্ডরূপে ঐক্য অবধারণ কর। যেমন উপাধি ঘট পরিত্যক্ত হইলে ঘটাকাশই অখণ্ড মহাকাশরূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ ত্বং-পদের অবিদ্যাঘটিত অন্তঃকরণ-উপাধি ও তৎ-পদের মায়া-উপাধি পরিত্যক্ত হইলে অন্তঃকরণ-উপহিত প্রত্যকচৈতন্যই ব্রহ্মচৈতন্যরূপে প্রতীত হন। বিরুদ্ধধর্মবিশিষ্ট উপাধিদ্বয় ত্যক্ত হইলে এক অখণ্ড চৈতন্যই থাকিয়া যান। হে ফাল্গুনি, তুমি অবধারণ করিয়া মৌনাবলম্বন কর। জ্ঞানী ব্যক্তি এইরূপে স্বরূপে অবস্থিত হইয়া ব্রহ্মানন্দ-ভোগ করেন এবং প্রারব্ধবেগ পর্যন্ত উপাধিস্থ হইয়াও আকাশের ন্যায় উপাধির গুণ ও ধর্মে নির্লিপ্ত ও অসঙ্গ থাকেন এবং জীবন্মুক্ত-রূপে প্রারব্ধ কর্মভোগের দ্বারা ক্ষয় করিতে থাকেন। সেই জীবন্মুক্ত পুরুষকে পাপপুণ্য স্পর্শ করিতে পারে না; তাঁহার কর্তব্য কর্মও থাকে না; তিনি বিধি-নিষেধমুক্ত, তাঁহার শরীর পূর্বকৃত কর্মবশে, অর্থাৎ, প্রারব্ধের বশে পরিচালিত হইলেও তিনি সতত ব্রহ্মসুখসাগরে নিমগ্ন থাকেন।

মায়া কি পদার্থ অর্জুন ইহা জানিতে চাহিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—মায়া ব্রহ্মের অনাদি শক্তিবিশেষ। ইহা সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণময়ী ও মহাবলবতী। জগৎকার্যদ্বারা এই পরমাত্মশক্তি মায়া অনুভূতা হন। মায়াকে অনির্বচনীয়া বলা হয়। মায়া জগদুৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত থাকে এবং নামরূপে পরিণত হইয়া তাহাই জগদাকারে প্রকাশিত হয়। মায়া এমনই অঘটনঘটনপটীয়সী যে, উহা সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে প্রতীতি করায় এবং তাঁহারই আভাসে তাঁহাকে ঈশ্বর ও জীবস্বরূপে পরিণত করায়। জীবের যখন 'সোঽহং' জ্ঞান হয়, তখন তাহার নিকট আর মায়া থাকে না। অতএব মায়া অনাদিভাবে বিশ্বব্যাপিনী হইলেও জ্ঞান দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়; এইজন্য তাহাকে অসতী বলা হয়। মায়াতে আবরণ ও বিক্ষেপ-নামক দুই শক্তি আছে। বিক্ষেপশক্তি রজোগুণ-প্রধানা ও আবরণশক্তি তমোগুণপ্রধানা অবিদ্যা। আবার সত্ত্বগুণপ্রধানা বিদ্যারূপা মায়া জীবের মোহ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে স্বরূপজ্ঞান দান করেন। চৈতন্যই মায়ার আশ্রয়।

যেমন বালকগণের প্রীতির জন্য ধাত্রী গল্প-কল্পনা করেন, সেইরূপ বিচারশূন্য ব্যক্তিদের জন্য অধ্যারোপ-শ্রুতি জগৎসৃষ্টির গল্প বলিয়াছেন। ব্রহ্মের সত্যত্ব ও সৃষ্টির মিথ্যাত্ব প্রতিপন্ন করাই বেদের অভিপ্রায়। যেমন বায়ু-সংযোগে সমুদ্রে নামরূপবিশিষ্ট তরঙ্গ, ফেন ও বুদ্বুদাদির উদয় হয়, কিন্তু তাহা জল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নহে, সেইরূপ অধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যে মায়াপ্রভাবে নামরূপাত্মক এই জগৎ দৃষ্ট হয়, উহা ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য বস্তু নহে। জগৎকারণ মায়াই যখন মিথ্যা, তখন তাহার কার্য কখন সত্য হইতে পারে না। মায়া-উপহিত ঈশ্বরে মায়ার প্রভাবে 'একোঽহং বহু স্যাম্' এই সঙ্কল্পের উদয় হয়। মায়াশক্তি হইতে কালের উৎপত্তি হয়, উহার নাম মহাকাল। মহাকালের শক্তি মহাকালী—ইনিই আদ্যাশক্তি-নামে কথিতা হন। কালে সমস্ত উৎপন্ন হয়, কালে অবস্থিত থাকে এবং কালেতেই লয় পায়। যথা :—

কালেন জায়তে সর্বং কালে চ পরিতিষ্ঠতি।
কালে বিলয়মাপ্নোতি সর্বে কালবশানুগাঃ॥

সেই মহাকালে নিমেষ, পল, দণ্ড, দিবা, রাত্রি, মাস, বৎসর, যুগ, কল্প ইত্যাদি কল্পিত হয়। মায়াশবলিত ব্রহ্ম হইতে প্রথমে শব্দমাত্রাত্মক আকাশ উৎপন্ন হয়, তৎপরে স্পর্শমাত্রাত্মক বায়ু, রূপমাত্রাত্মক তেজ, রসমাত্রাত্মক জল ও গন্ধ-মাত্রাত্মক পৃথিবী এই পঞ্চ সূক্ষ্ম তন্মাত্রের

উৎপত্তি হয়। এই সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের তামসাংশ পঞ্চীকৃত হইয়া আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চ স্থূলভূত উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্ম পঞ্চভূতের প্রত্যেকের সত্ত্বাংশ হইতে এক এক জ্ঞানেন্দ্রিয়, যথা—আকাশের সত্ত্বাংশ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয়, বায়ুর সত্ত্বাংশ হইতে স্পর্শেন্দ্রিয়, তেজের সত্ত্বাংশ হইতে দর্শনেন্দ্রিয়, জলের সত্ত্বাংশ হইতে রসনা ও পৃথিবীর সত্ত্বাংশ হইতে ঘ্রাণ উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মভূতের মিলিত সত্ত্বাংশ হইতে অন্তঃকরণের উৎপত্তি হয়। প্রত্যেক সূক্ষ্মভূতের রজঃ-অংশ হইতে এক এক কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, যথা—আকাশের রজঃ-অংশ হইতে বাগিন্দ্রিয়, বায়ুর রজঃ-অংশ হইতে হস্ত, তেজের রজঃ-অংশ হইতে পদ, জলের রজঃ-অংশ হইতে উপস্থ, ও পৃথিবীর রজঃ-অংশ হইতে পায়ু উৎপন্ন হয়। পঞ্চভূতের মিলিত রজঃ-অংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি হয়। স্থূলভূত হইতে স্থূল ব্রহ্মাণ্ডাদি উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলে বুদ্বুদের ন্যায় অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মচৈতন্যে সমস্তই কল্পিত, স্বপ্নবৎ বিবর্তমাত্র। যেমন ধূম দ্বারা আকাশ মলিন হয় না, সেইরূপ মায়া ও মায়াকার্য দ্বারা ব্রহ্মচৈতন্য বিকৃত হন না। তাঁহাতে মায়ার লেশমাত্রও নাই, জগৎ নাই, জীব নাই, ঈশ্বর নাই, কেবল এক ব্রহ্মমাত্র আছেন। তাঁহাকে এক বলাও যায় না, দ্বিতীয় কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে কোন সংখ্যাবদ্ধ করা যায় না। তিনি উপমারহিত, এই জন্য ব্রহ্ম এইরূপ বা সেইরূপ বলা যায় না। তিনি ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহেন। তিনি আনন্দস্বরূপ, কারণ আত্মা হইতে প্রিয়তর বস্তু আর কিছুই নাই। আত্মা স্বপ্রকাশ হওয়া সত্ত্বেও অবিদ্যাবরণ-জন্য অপ্রাপ্তের ন্যায় বোধ হন। গুরুকৃপায় আত্মজ্ঞানের উদয় হইলে সেই প্রাপ্তবস্তুই যেন প্রাপ্ত হওয়া গেল এইরূপ মনে হয়।

ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ বলিয়া উক্ত হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্য বুদ্ধিগত হইয়া বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য নামে কথিত হন। তিনিই তোমার স্বরূপ। কিন্তু এই অবচ্ছেদ কল্পনামাত্র। কারণ, বুদ্ধির নাশে সেই অখণ্ড এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই সর্বদা স্বভাবতঃ পূর্ণভাবে থাকেন; ঠিক যেমন ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ ঘটনাশে এক মহাকাশরূপেই থাকে। অতএব বুদ্ধ্যবচ্ছিন্ন চৈতন্য-রূপ জীবত্ব কল্পিত ও মিথ্যা; স্বভাবতঃ অখণ্ড ব্রহ্মচৈতন্যই একমাত্র সত্য। যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ এক এবং অভিন্ন, তেমনি ত্বংপদের লক্ষ্য কূটস্থ চৈতন্য ও তৎপদের লক্ষ্য ব্রহ্মচৈতন্য এক ও অভিন্ন জানিবে। সেই উভয় পদের ঐক্য দ্বারা আপনাকে অখণ্ডরূপ জানিয়া ব্রহ্মময় হও। যেমন সহস্র সহস্র দীপে একই অগ্নি, তেমনি সকল দেহে একই আত্মা আভাত হন। আমার বিশ্বরূপ যাহা পূর্বে দেখিয়াছ, তাহাও মায়ামাত্র।

শান্তিগীতায় কর্মযোগ-সম্বন্ধেও একটি অধ্যায় আছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষগণের কর্তব্য বা অকর্তব্য কিছুই নাই; তাঁহারা বিধিনিষেধ-বর্জিত। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি লোকদৃষ্টিতে শরীরধারী হইলেও নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাতেই অবস্থান করেন। তিনি ভাবাভাব-বর্জিত, পরমার্থতঃ তিনি সকল প্রকার আচারের অতীত হইয়াও উপাধিদৃষ্টিতে আচারপরায়ণ। প্রারব্ধ কর্মের দ্বারা আত্মজ্ঞ ব্যক্তির শরীর পরিচালিত হয়। তিনি নানা বেশধারী হন। কখন ভিক্ষুবেশধারী, কখন নগ্ন, কখন বা ভোগে মগ্নভাবে অবস্থান করেন। তত্ত্বজ্ঞের কেহ গৃহস্থ, কেহ বানপ্রস্থী, কেহ মূঢ়বৎ, কেহ পণ্ডিত, কেহ সুন্দর বসনে বিভূষিত, কেহ চীরধারী, কেহ উন্মত্তপ্রায়, কেহ পিশাচতুল্য, কেহ বনবাসী, কেহ মৌনী, কেহ অতিবক্তা,

কেহ তার্কিক। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এইরূপ বিবিধভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করেন। বাহ্যলক্ষণ দেখিয়া তাঁহাদিগকে জানিতে পারা যায় না। বাহ্যলক্ষণের দ্বারা কখন অন্তর্ভাব জানা যায় না। প্রারব্ধকর্ম-জন্যই তত্ত্বজ্ঞগণের ভাবের পার্থক্য হইয়া থাকে। মুক্ত পুরুষের প্রারব্ধ কর্ম তাঁহাকে তাঁহার ফল ভোগ করাইয়া তাঁহার দেহের সহিত বিনষ্ট হয়। প্রারব্ধকর্ম, শরাসন হইতে নির্মুক্ত শর যেরূপ উহার লক্ষ্যকে ভেদ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না, সেইরূপ ভোগ সম্পাদন না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি শরীর ও প্রারব্ধকর্মের ভোগ মিথ্যা জানিয়া উহাতে বিমোহিত হন না, যেমন মানুষ স্বপ্নাবস্থার কর্মসমূহ মিথ্যা জানিয়া তাহাতে গুরুত্ব আরোপ করেন না। আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই কর্মত্যাগের অধিকারী। দুইটি মাত্র মানুষের অবলম্বন—এক কর্ম, দ্বিতীয় ব্রহ্ম। যিনি ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহার আর কর্ম থাকে না; এবং যিনি কর্মকে অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট হইতে ব্রহ্ম অনেক দূরে। অতএব হে অর্জুন, তুমি নিজেকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন জানিয়া অহঙ্কার ও তজ্জাত শোকমোহের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ কর।

মহানিগ্রন্থ

(পুরাতন জৈন কথা)

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

একদা মগধাধিপতি মহারাজ শ্রেণিক মণ্ডিকুক্ষি-নামক উদ্যানে ক্রীড়ার জন্য গমন করিলেন। নানাপ্রকার বৃক্ষলতায় সমাকীর্ণ, বহুপ্রকার প্রস্ফুটিত সুগন্ধ পুষ্পের দ্বারা সুশোভিত ও নানাজাতীয় পক্ষিগণের কূজনে মুখরিত হইয়া এই উদ্যান নন্দনবনের ন্যায় শোভা পাইতে ছিল।

মহারাজ শ্রেণিক ইতস্ততঃ পরিভ্রমণ করিতে করিতে বৃক্ষমূলে সুখাসনে উপবিষ্ট একজন তেজঃপুঞ্জমণ্ডিত শ্রমণকে ধ্যানস্থ দেখিতে পাইলেন। তাঁহার গৌরবর্ণ, সৌম্যমুখকান্তি, চিত্তাকর্ষক রূপ দেখিয়া তিনি মোহিত হইলেন। শ্রমণকে দেখিলেই ক্ষমা, নিঃস্পৃহতা ও অনাসক্তির মূর্ত প্রতীক বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্রেণিক সাধুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ ও বন্দন করিয়া নাতিদূরে ও নাতি-নিকটে উপবেশন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে আর্য, আপনার এখন পরিপূর্ণ যৌবনাবস্থা, আপনি এ সময়ে বিষয়ভোগ না করিয়া কেন এই কঠোর শ্রমণজীবন যাপন করিতেছেন? ইহার কারণ জানিতে আমি উৎসুক হইয়াছি, কৃপাপূর্বক বলুন। রাজার কথা শুনিয়া সাধু বলিলেন,—মহারাজ, আমি অনাথ, আমার প্রভু, রক্ষাকর্তা বা সুহৃৎ কেহ নাই,

তজ্জন্য আমাকে এই মার্গ-অবলম্বন করিতে হইয়াছে। শ্রমণের বাক্যে শ্রেণিক ঈষদ্হাস্য-সহকারে বলিলেন,—হে মহাত্মন্, আপনার-ন্যায় অপরূপ রূপলাবণ্যযুক্ত, তেজস্বী পুরুষের কোন রক্ষাকর্তা প্রভু নাই? হে সংযত, আমিই আপনার রক্ষাকর্তা হইব; আপনি আমার রাজ্যে নিবাস করিয়া যদৃচ্ছভাবে স্বজনাদি সহ সুখভোগ করুন। আমি আপনাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিব।

শ্রেণিকের বাক্য শ্রবণ করিয়া সংযত মুনি বলিলেন—হে মহারাজ, আপনি নিজেও অনাথ, স্বয়ং অনাথ হইয়া কি প্রকারে আমার রক্ষাকর্তা হইবেন? সাধুর অশ্রুতপূর্ব বচন শুনিয়া শ্রেণিক বিস্মিত হইয়া বলিলেন—হে মুনি, আমার হস্তী, অশ্ব, সৈন্যসামন্ত, পরিজনবর্গ, স্ত্রীগণ ও প্রজাসমূহ আছে। আমি এই সকলের অধীশ্বর। আমার ইঙ্গিত-মাত্রে ইহারা সকলেই আমার আদেশ-পালনে প্রস্তুত। তবে আমি কিরূপে অনাথ? আপনার কথার অর্থ কি? আপনি মিথ্যা উক্তি করিয়া আমাকে সম্মোহিত করিতেছেন কেন?

মুনি উত্তর করিলেন—হে রাজন্, আপনি অনাথ কাহাকে বলে তাহা জানেন না। লোকে কিরূপে অনাথ ও সনাথ হয় তাহা আমি বলিতেছি, স্থিরচিত্ত হইয়া শ্রবণ করুন। হে মহারাজ, প্রসিদ্ধ কৌশাম্বী-নগরীতে প্রভূত ধনশালী এক শ্রেষ্ঠী আমার পিতা ছিলেন। আমার মাতা, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা-ভগিনীগণ ও স্ত্রী ছিলেন। যৌবনকালে আমার অত্যন্ত তীব্র অস্থিবেদনা হয়; তাহাতে সমস্ত শরীরে ভীষণ দাহজ্বর হইয়াছিল। আমার কটিদেশে, হৃদয়ে ও মস্তকে ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় জ্বালাময় দারুণ বেদনা হইয়াছিল যাহা সহনশক্তির সীমার বহির্ভূত। আমার পিতা আমার জন্য মন্ত্র-চিকিৎসক, শস্ত্র-চিকিৎসক, ঔষধ-চিকিৎসক প্রভৃতি বহু বৈদ্যাচার্যগণকে আনাইলেন ও আমাকে নিরাময় করিয়া দিলে তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি প্রদান করিবার সংকল্প ঘোষণা করিলেন, কিন্তু কেহই আমার বিপুল বেদনার অল্পমাত্রও উপশম করিতে পারিল না। হে মহারাজ, ইহাই আমার অনাথতা। আমার মাতা, ভ্রাতা, ভগিনীগণ আমার কষ্টমোচনের জন্য যথাসাধ্য সেবা-শুশ্রূষা ও নানাপ্রকার দেব-দেবীর নিকট মানত করিলেন, আমার অনুরক্তা ও পতিব্রতা স্ত্রী দিবারাত্র অশ্রুমোচন করিয়া বক্ষঃস্থল ভাসাইয়া দিলেন, তিনি সর্বপ্রকার ভোগবিলাস পরিত্যাগ করিয়া আমার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু সমস্তই বৃথা হইয়াছিল। রাজন্, এমনই আমার অনাথতা! হে নৃপতি, এইরূপে দুঃসহ বেদনা সহ্য করিতে করিতে আমার মনে হইল যে, বিগত অনন্ত জন্মে এইরূপ উগ্র যন্ত্রণা হয়ত কতবার ভোগ করিয়াছি, কিন্তু ইহা রোধ করিবার কোন উপায় আমি এ পর্যন্ত উদ্ভাবন করি নাই এবং তজ্জন্য বারংবার এরূপ বেদনা ভোগ করিতে হইতেছে। আমার বেদনা যদি আজ রাত্রির মধ্যে চলিয়া যায়, তবে প্রত্যূষেই আমি গৃহসংসার-পরিত্যাগ করিয়া শ্রমণ-দীক্ষা গ্রহণ করিব এবং ভবিষ্যতে যাহাতে আর কখনও এরূপ তীব্র বেদনা ভোগ করিতে না হয়, তাহার জন্য উদ্যম করিব। হে মহারাজ, এইরূপ চিন্তা করিয়া শয়ন করিতেই আমি নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম এবং রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত বেদনা উপশান্ত হইয়া গেল।

পরদিন প্রভাতে আমি মাতা, পিতা প্রভৃতি স্বজনগণের আদেশ লইয়া গৃহত্যাগ করিলাম এবং শ্রমণ-ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ক্ষান্ত, দান্ত ও সর্বপ্রকার হিংসা হইতে মুক্ত হইলাম। এখন আমি নিজের ও অন্যান্য সকল প্রাণিগণের নাথ হইয়াছি।

হে মহারাজ, আত্মাই আমার বৈতরণী

নদী, আত্মাই আমার নরকস্থিত কণ্টকাকীর্ণ শাল্মলী বৃক্ষ, আত্মাই আমার কামদুঘা ধেনু এবং আত্মাই আমার নন্দনবন।

আত্মাই সুখ ও দুঃখের কর্তা এবং সুখ ও দুঃখের বিনাশকর্তা। আত্মাই দুরাচারে বা সদাচারে প্রবৃত্ত হইলে নিজের শত্রু ও মিত্র হয়।

তখন মহারাজ শ্রেণিক কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন,—হে জিতেন্দ্রিয় মহাতপোধন, আপনি আমাকে যথাযথভাবে অনাথতার স্বরূপ বিবৃত করিলেন। আপনার মনুষ্যজন্ম সফল হইয়াছে, অসাধারণ রূপলাবণ্য-প্রাপ্তি সার্থক হইয়াছে। হে মহানির্গ্রন্থ, আপনিই প্রকৃত সনাথ ও সবান্ধব; কারণ, আপনি তীর্থঙ্করগণের উপদিষ্ট ধর্ম দৃঢ়তার সহিত পালন করিতেছেন। হে মহর্ষি, আপনি নিজের ও অন্যান্য প্রাণিগণের নাথ, রক্ষাকর্তা ও মার্গোপদেশক হইয়াছেন। এইরূপ স্তুতি করিয়া মগধাধিপতি মহানির্গ্রন্থকে প্রদক্ষিণ ও বন্দন করিয়া স্বস্থানে গমন করিলেন এবং নির্মলচিত্তে ধর্মে অনুরক্ত হইলেন।

গান

শান্তশীল দাশ

বন্ধু, আমারে দিয়েছ বেদনা,
　　দিয়েছ যে আঁখিজল;
সেই তো আমার এই জীবনের
　　সার্থক সম্বল।

বেদনা আমার চিরসাথী সে যে,
　　তোমার প্রেমের দান;
সে বেদনা মোরে ধরণীর বুকে
　　করেছে যে মহীয়ান।

ধরণীর দান সে তো ক্ষণিকের,
চিরসাথী নয় সে চলা পথের;
দু'দিন সে থাকে, দু'দিনে হারায়,
　　সে যে চিরচঞ্চল।

হাসি-আনন্দ ক্ষণিকের দান,
নিমেষের মাঝে হ'য়ে যায় ম্লান;
বেদনা আমার চির-সুন্দর
　　তার মাঝে নাহি ছল।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের স্মৃতি-প্রসঙ্গ

(এক)

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

স্থান, ময়মনসিংহ—২১।১।১৬, শনিবার বৈকাল ৪টা। আজ অফিসে আসিয়া শুনিলাম, পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ শ্রীযুক্ত জিতেন দত্ত মহাশয়ের বাড়ীতে শুভাগমন করিয়াছেন। তাড়াতাড়ি তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অফিস হইতে বাহির হইলাম। মহারাজকে দর্শন করিবারজন্য মন বড়ই ব্যাকুল। জিতেন বাবুর বাড়ীর বৈঠকখানায় মহারাজের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলাম, কিন্তু পরে শুনিলাম, তিনি ভিতরে আছেন। আমি তখন বাড়ীর ভিতরে গিয়া মহারাজকে দর্শন করিলাম।

পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ হলঘরে বসিয়া সকল ভক্তদের উপদেশ দিতেছেন; যথা, —স্বামিজীর সেবাধর্মের কথা, নীচ জাতির উপর ঘৃণা রাখা উচিত নহে ইত্যাদি। উপদেশচ্ছলে হাতি ও পিপড়ের গল্প বলিলেন। এইবার পূজনীয় মহারাজ বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন, বাবুরাম মহারাজও সংগে চলিলেন। তাঁহারা নদীর পাড়ে বেড়াইতে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে অনেক ভক্তও চলিলেন। ইহাতে জিতেন বাবু বাধা দিলে বাবুরাম মহারাজ একটু রাগ করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, ওরা সাধুসঙ্গ করবে না? কেন বাধা দিচ্ছ? জীবনের এই ত মহৎ কাজ। কার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ হয়? সাধুসঙ্গ বড় দরকার। তোমরা ভক্তদের বাধা দিও না। পূজনীয় মহারাজ ও বাবুরাম মহারাজজী নদীর পাড়ে court এর নিকট আসিয়া দাঁড়াইলেন।

মহারাজ বাবুরামদা, দেখছ, কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর নদী, বেশ যায়গা! ছুর ছুর করে বাতাস বইছে। এসব দেখে আমার উদ্দীপন হচ্ছে।

বাবুরাম মহারাজ,—হবে বৈকি। বেশ যায়গা। ঠাকুর বলতেন, হৃদয়ের বাড়ী মাঠ আছে, তাই সেখানে থাকতে ভালবাসি। মাঠ দেখলে ভগবানের কথা মনে পড়ে।

মহারাজ—জয় গুরু, শ্রীগুরু!

বাবুরাম মহারাজ—হরিবোল, হরিবোল!

মহারাজ বিশ, একটা ভগবানের নাম কর না। কিরে, এত দেরী সয় না। অন্য আর একজন ব্রহ্মচারীকে বল্লেন, তুই বল না। তখন ব্রহ্মচারী একটি স্তব পাঠ করিলেন।

মহারাজ—এটা কোন দিক্? সকলে বলিলেন, উত্তরপূর্ব কোণ।

মহারাজ তখন প্রণাম করিলেন।

তৎপর আর একজন ব্রহ্মচারী স্তবপাঠ করিলেন। মহারাজ বলিলেন, এ সব যায়গায় সন্ধ্যা ও সকালে ধ্যান করা ভাল, মন পবিত্র হয়। ভগবানের নামই সত্য। আর যা দেখছ সব মিথ্যা। তাঁর উপর ভক্তি-বিশ্বাস, তাঁর গুণগান এই জীবনের কর্ম। এই সব কথাগুলি তিনি খুব ভাবাবেগে বলিতে লাগিলেন। ভক্তগণ তাঁহাকে প্রণাম করিতে আরম্ভ করিলে মহারাজ বারণ করিতে লাগিলেন। বাবুরাম মহারাজ বিনীত ভাবে বলিলেন, মহারাজ, তোমার এখন এই অবস্থা। ওরা একটু প্রণাম করে নিক্। (ভক্তদিকের দিকে চাহিয়া) এই সময় তোরা প্রণাম

করে নে। মহারাজ, তুমি একটু দাঁড়াও। সকলে প্রণাম করিলে মহারাজ সকলকে আশীর্বাদ করিতে করিতে বলিলেন, কালে দেখছি এই সব ছেলেরা দেবতা হয়ে যাবে। আবার সকলে নদীর পাড়ে বেড়াইতে আরম্ভ করিলেন। বাবুরাম মহারাজ আবেগপূর্ণ ভাষায় স্বামিজীর কথা, মহাবীর হনুমানের মত তাঁহার ভক্তি, ইত্যাদি সব বলিতে আরম্ভ করিলেন।

* * *

২৩৷১৷১৬, রবিবার

আজ সকাল সাড়ে সাতটার সময় জিতেন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। কিছু সময় নানা প্রসঙ্গের পর সুসঙ্গের মহারাজকে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলিলেন, দেখুন, আপনি গান-বাজনা করেন খুব ভাল কথা। এর মধ্য দিয়েও ভগবানের নিকট যাওয়া যায়। এই সুরই 'নাদব্রহ্ম'। তপস্যা করলে এই সব অনুভূতি হবে। মহারাজজী এই কথা এমন জোরের সহিত বলিলেন যে, উপস্থিত সকলের মনে উহা গভীর রেখাপাত করিল। আমি বলিলাম, মহারাজ, মন বড় চঞ্চল। ধ্যান-জপ হয় না। কি করলে ঐ বিষয়ে সাহায্য পাওয়া যায়? মহারাজ বলিলেন, দেখ্, খুব সকাল ঘুম হতে উঠবি এবং হাতমুখ ধুয়ে আসনে বসবি। মনকে শাসন করে বলবি, মন স্থির থাক, বাজে চিন্তা এখন করতে পাবে না। এইরূপ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মনকে বশে আনবি। দেখবি শীঘ্রই মন স্থির হয়ে যাবে, আর বাজে চিন্তা আসবে না। মস্ত হাতীকেও বশে আনা যায়, আর তুই মানুষ হয়ে নিজের মনকে বশে আনতে পারবি না? আমি কাউকে বেশী উপদেশ দিই না। এখন এই সব কথা নিয়ে জাবর কাট্। শ্রীশ্রীঠাকুর বলতেন, জাবর কাটতে হয়।

এই বার গানের আয়োজন হইতেছে, সকলেই প্রণাম করিয়া গান শুনিতে বৈঠকখানায় গেলেন। পাশের ঘরে পূজনীয় বাবুরাম মহারাজ ধ্যান করিতেছিলেন, তিনি বাহির হইয়া আসিয়া বীরেন বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—বীরেন, মহারাজ কাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন? বীরেনবাবু আমাকে দেখাইয়া দিলেন। বাবুরাম মহারাজ আমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, যা বাঙ্গাল, এবার তোর হয়ে গেল। মহারাজ বড় কাকেও উপদেশ দেন না, পরে বুঝবি। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনি খুব আশীর্বাদ করিলেন।

* * *

বৈকালে ৪টার সময় পুনরায় মহারাজদের দর্শন-মানসে জিতেন বাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। প্রণাম করিয়া বসিয়া রহিলাম। কিছুক্ষণ পরে মহারাজ বৈকালে বেড়াইবার জন্য বাহির হইলেন।

আমরা বাহির হইয়া আজ নূতন শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে আসিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজ আজ আশ্রমের উদ্বোধন করিবেন, তাই বহু লোকের ভিড়। রাত্রি তখন ৭টা হইবে; তুমুল জয়ধ্বনির মধ্যে তিনি ও বাবুরাম মহারাজ আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। মহারাজ নিজেই শ্রীশ্রীঠাকুরের আরাত্রিক করিলেন। তিনি আরতি করায় সকলের প্রাণে একটা বিমল আনন্দ হইল। মহারাজ বাবুরাম মহারাজকে কিছু বলিতে বলিলেন। বাবুরাম মহারাজ চমৎকার একটি বক্তৃতা দিলেন স্বামিজীর সেবাধর্ম-বিষয়ে। তাহার পর গান হইল। ২।৩ দিন পরে তিনি ঢাকাযাত্রা করিবেন। যাবার দিন স্থির হইল, তিনি রাত্রি ৮টার ট্রেনে রওনা

হইবেন ; আমি বৈকালে যাইয়া শ্রীচরণ-দর্শন করিলাম। আজ সকলের প্রাণে এক বিষাদের ছায়া ; জিতেন বাবুর ত কথাই নাই। যথাসময়ে মহারাজ সকলকে খুব আশীর্বাদ করিয়া একটি ফিটনে উঠিলেন। সংগে বাবুরাম মহারাজ ও অমূল্য মহারাজ। পূজনীয় মহারাজ আমাকে দেখিয়া বলিলেন, চলে আয় আমার সাথে। আমি উত্তর দিলাম, হাঁ, ষ্টেশন পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যাব। মহারাজ বলিলেন, না না, আমার গাড়ীতে আয়। আমি সংকোচ প্রকাশ করিলাম। ভাবিলাম, মহারাজের সংগে কি করিয়া যাই ? বাবুরাম মহারাজ তখন বলিলেন, মহারাজ ডাকছেন, ওঁর কথা শুনতে হয় ; তোর কোন সংকোচ করতে হবে না। অতঃপর ফিটনে পূজনীয় অমূল্য মহারাজের পাশে বসিলাম। মনে মনে ভয়, পাছে পা কোন প্রকারে মহারাজের গায়ে লাগে। আবার নিজকে ধন্য মনে করিতেছিলাম, এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে, মহারাজের এত সহজ সান্নিধ্য-লাভ করিলাম। যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌছান গেল। গাড়ী আসিবার সময় হইল। আমার দিদি গিয়াছিলেন ; তিনি মহারাজদিগকে প্রণাম করিলেন। মহারাজ দিদিকে বলিলেন,—মা, গাড়ী এসে গেল, সময় আর নেই ; তোমাকে এক কথার জ্ঞান দিয়ে যাচ্ছি। রোজ কথামৃত পড়। তবেই হবে। কথামৃতের মধ্যেই সমস্ত ধর্ম আছে।

এইবার তাঁহারা সকলে গাড়ীতে যাইয়া উঠিলেন। আমরা সকলে একে একে প্রণাম করিলাম। শ্রীশ্রীমহারাজও প্রাণ খুলিয়া সকলের জ্ঞান-ভক্তি হোক্ এইরূপ আশীর্বাদ করিলেন। ট্রেন ছাড়িয়া দিল ; বিষণ্ণ হৃদয়ে বাড়ী ফিরিলাম।

(দুই)

(১৯১৬, ২৭শে নভেম্বর, ত্রিবাঙ্কুরের আলওয়া শহরে ভক্তবৃন্দকে লক্ষ্য করিয়া প্রদত্ত)

শ্রীপি শেষাদ্রি কর্তৃক সংগৃহীত

তীর্থভ্রমণে অনেক উপকার। তীর্থস্থানে সাধুদর্শন ও সাধুসঙ্গ করবার সুযোগ পাওয়া যায়। তাছাড়া ঐ সময়ে সাংসারিক চিন্তাটা কম থাকে ; একটানা ঈশ্বরচিন্তা করা সম্ভব হয়।

কাশী পরম পুণ্যক্ষেত্র ; বহু সাধু, মহাপুরুষ বাস করেন। সাধুসঙ্গ করবার বিশেষ সুবিধা। ওখানে একটা নিরন্তর আধ্যাত্মিকতার প্রবাহ বোঝা যায়। গৃহীদেরও সাধন-ভজন করবার সব রকম সুবিধা আছে। ৺কাশীতে কিছুকাল বাস করা সকলেরই পক্ষে খুব ভাল।

বৃন্দাবনও কাশীর মত একটি পবিত্র তীর্থ-স্থান। বৃন্দাবনে রাতদিন ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন অনেক সাধু ও ভক্ত আছেন। সকলেরই অন্ততঃ একবার এই সব পবিত্র তীর্থদর্শন করা উচিত।

ঈশ্বরের নাম-জপ করা খুবই ভাল। তাতে চিত্ত শুদ্ধ হয়। নাম-জপের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্টের স্মরণও করা উচিত। এই স্মরণ-পূর্বক জপ খুব উপকারী। মনে অন্য চিন্তা রেখে শুধু মুখে নাম উচ্চারণ করলে কোন বিশেষ ফললাভ হয় না। অধিকারিভেদে ইষ্টদেবতা স্থির করে গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেন। অধিকারি-অনুসারে ইষ্টদেবতা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকেন। স্বয়ং জ্ঞানলাভ করবার আগে গুরুর উপদেশ-অনুসরণ করাই শ্রেয়। গুরুর উপদেশ যতই পালন করবে ততই হৃদয় নির্মল হবে।

গুরুর উপদেশ ব্যতীত সাধন করা প্রায়ই দুঃসাধ্য। অসামান্য মনোবলসম্পন্ন অতি বিরল কোন কোন লোকের পক্ষে হয়ত গুরুর প্রয়োজন তত নেই। কিন্তু গুরুর আশ্রয় নিয়ে সাধন করাই শ্রেয়স্কর; ত্রুটি-বিচ্যুতির ভয় থাকে না। কিন্তু গুরুলাভ না হওয়া পর্যন্ত অলস হয়ে বসে থাকা কোনও মতে উচিত নয়। সাধন করে যেতে হবে—যথাসময়ে গুরু নিজে এসে উপদেশ দেবেন।

নিষ্কাম কর্ম ঈশ্বরের কাছে পৌঁছুতে সাহায্য করে। স্ত্রী, সন্তান প্রভৃতি সকলকে ঈশ্বরের সম্পত্তি বলে জানবে। এই ভাব ঠিক ঠিক পোষণ করতে পারলে তোমাদের সমস্ত কাজই আপনা আপনি ঠিক হয়ে যাবে।

ধ্যান অভ্যাস করলে অনুভূতি হচ্ছে বলে তোমরা নিজেরাই প্রাণে প্রাণে বুঝতে পারবে। কেবল শাস্ত্রপাঠ ও বৃথা তর্ক করলে কোনও লাভ হয় না। ধ্যানে চিত্ত শুদ্ধ হবে; আর চিত্ত শুদ্ধ হলে ঈশ্বর-লাভ হবে। তোমাদের সমস্ত শক্তি ও পৌরুষ সাংসারিক বিষয়ের জন্যই তোমরা ব্যয় করছো। ঈশ্বর-ভজনের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করছো না। এই ভাবে জীবন ব্যর্থ করা উচিত নয়। ঈশ্বর-ভজনে ও ভক্তি-সাধনায় লেগে যাও। সময়ের অপব্যয় করো না। আমাদের জীবন তো ক্ষণ-স্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে ঈশ্বরের আরাধনাই আমাদের প্রধান কর্তব্য। কাজের মধ্যেও ঈশ্বরকে স্মরণ করবে। দিনের মধ্যে শুধু কোন একটা সময়ে ঘরের কোণে বসে চোখ বুজলেই যথেষ্ট নয়। তখন তো জাগতিক চিন্তাই তোমাদের মন অধিকার করে বসে থাকে।

দ্বৈতভাব থেকে সাধন আরম্ভ করাই প্রশস্ত। এই পথে কিছুদূর অগ্রসর হলে তোমরা আপনা আপনি সহজেই অদ্বৈতে পৌঁছুবে। ঈশ্বরকে প্রথমে বাহিরে দেখাই ঠিক; পরে তোমাদের অন্তরেও তাঁকে দেখতে পাবে। আনন্দের অনুভূতি না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানের অভ্যাস ছাড়বে না। সেই অবস্থা লাভ না করা পর্যন্ত দ্বৈত-ভাবই অবলম্বন করতে হবে।

সমাধি-অবস্থায় কেবলমাত্র ঈশ্বরকেই দেখতে পাবে। তখন মন ঈশ্বরময় হয়ে যাবে। সমাধির স্বরূপ-বর্ণনা করতে পারা যায় না।

সমালোচনা

Mysticism of the Tantras: ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্-এ, পিএইচ-ডি প্রণীত। প্রকাশক :—শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, এম্-এ, বি-এল্; ভারতী মহাবিদ্যালয়; ১৭০, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; পৃষ্ঠা—২১৬; মূল্য—৭৲ টাকা।

ভারতী মহাবিদ্যালয়ের উদ্যোগে অধ্যাপক ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক ইংরেজীতে প্রদত্ত 'শ্রীরামকৃষ্ণ বক্তৃতামালা' চব্বিশ অধ্যায়ে বিভক্ত বর্তমান গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে প্রথিতযশা দার্শনিক গ্রন্থকার তন্ত্রের মরমিয়াবাদ (mysticism) ও অধ্যাত্ম-দর্শনের বিভিন্ন দিক লইয়া গম্ভীর ও মনোগ্রাহী আলোচনা করিয়াছেন। তন্ত্র প্রধানতঃ সাধনশাস্ত্র হইলেও গভীর দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহার দার্শনিক তত্ত্ব লইয়া পূর্বে যথোচিত আলোচনা হয় নাই। কয়েক বৎসর হইল গ্রন্থকার তাঁহার বাংলা 'তন্ত্রালোক'-গ্রন্থে তান্ত্রিক দর্শনের

আলোচনা করেন। তন্ত্র-সম্বন্ধে শিক্ষিতমহলে নানাপ্রকার ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি উক্ত ভ্রান্তধারণা-নিরসনে বিশেষভাবে সহায়ক হইবে।

গ্রন্থকারের মতে এই জগৎপ্রপঞ্চের মূলে যে মহাশক্তি ক্রিয়া করিতেছে, তন্ত্র তাহাকে পরমতত্ত্ব বলিয়া স্বীকার করেন। ইহাই তন্ত্র-শাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য। এই পরমতত্ত্ব নিত্যমুক্ত এবং শান্ত হইয়াও অবিরাম গতিশীল। "তন্ত্র চরম সত্তার অদ্বয়ভাবের সহিত তাহার সৃষ্টিশীলতার সমন্বয়-সাধন করিয়াছে।" (১৫ পৃঃ) তন্ত্র একাধারে কলা ও বিজ্ঞান।

"আমাদের মূল সত্তার উপলব্ধি এবং তাহার সহিত জীবন, আলোক, জ্ঞান ও শক্তির মূল উৎসের যোগসাধন করিয়া আধ্যাত্মিক শক্তি-সঞ্চারের দ্বারা আমাদের সমগ্র জীবন ও সত্তার আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনের কৌশলই তন্ত্রের শিক্ষা।" (২২ পৃঃ) এই কারণেই তান্ত্রিক ধর্মে বিচারবুদ্ধি ও বিচারশীল প্রজ্ঞার সাহায্যে সত্য-লাভের চেষ্টা না করিয়া আমাদের অতিমানস সত্তাকে জাগ্রত করিয়া সত্যদর্শনের চেষ্টা করা হইয়াছে। তান্ত্রিক সাধনা মানুষের সুপ্ত শক্তি-সমূহকে প্রকটিত করিয়া তাহার মূল সত্তার আবরণ উন্মোচন করিয়া দেয়। তখন মানব-জীবনের প্রতিস্তরে অবিরাম দৈবজীবনের স্পন্দন অনুভূত হইতে থাকে। (৩৮ পৃঃ) তন্ত্র অলৌকিক দর্শন ও অনুভূতিকে উপেক্ষা করে নাই। পাতঞ্জল যোগদর্শনে অলৌকিক বিভূতি-গুলি আত্মসাক্ষাৎকারের পথে বাধা বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু তন্ত্র এই সকল অলৌকিক বিভূতিকে সাধনার সহায় বলিয়া মনে করে। তন্ত্রমতে উহা "(১) আমাদের সুপ্ত সত্তাকে বাহির করে; (২) আমাদের মানসস্তরের সহিত মহাজাগতিক শক্তিসমূহের যে মিল রহিয়াছে তাহা প্রকাশ করে; এবং (৩) আমাদের যে কেন্দ্রীয় সত্তা ঐ শক্তিগুলিকে পরিচালিত করিয়া আমাদিগকে প্রকৃতির দাসত্ব হইতে মুক্ত করে এবং আমাদের জীবনে দৈব-ইচ্ছা এবং দিব্যশক্তিকে ক্রিয়াশীল করিয়া তোলে, সেই সত্তার স্বরূপ প্রকাশ করে।" (৪৪ পৃঃ) তন্ত্রে অলৌকিক বিভূতির এই প্রকার উচ্চমূল্য স্বীকৃত হওয়ায় গ্রন্থকার অলৌকিকবাদের (occultism) আলোচনায় তিনটি অধ্যায় নিয়োগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বপ্নের অলৌকিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ফ্রয়েড্-এর স্বপ্নতত্ত্বের সহিত তন্ত্রের স্বপ্নতত্ত্বের তুলনা এবং ফ্রয়েড্-মতের অসম্পূর্ণতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পাতঞ্জলযোগ প্রধানতঃ জ্ঞানযোগ। তন্ত্র জ্ঞানমার্গকে অস্বীকার করে নাই। তান্ত্রিক যোগে জ্ঞান-সাধ্য মুক্তির সহিত শক্তির স্বতঃস্ফূর্ত লীলার সমন্বয় সাধিত হইয়াছে। অধ্যাত্মশক্তির গতিশীলতা, ভাগবতী ইচ্ছার সৃষ্টিধর্মকে তন্ত্র কখনও উপেক্ষা করে নাই। (৭৬ পৃঃ) এই বিষয়ে সাংখ্য-বেদান্তের সহিত তন্ত্রের পার্থক্য। তন্ত্রমতে মানবজীবনে মহাশক্তির লীলা প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহার সঙ্কীর্ণতা লোপ পায়; তখন অনন্ত সত্তার সহিত মানবজীবনের ঐক্য সাধিত হয় এবং ঐক্যানুভূতিরূপ জ্ঞানের বিকাশ হয়। তন্ত্র বেদান্তের ন্যায় ব্যষ্টিপুরুষের মুক্তিলাভে সন্তুষ্ট নহে; তাহার সহিত সমষ্টি-জীবনের আধ্যাত্মিক রূপান্তর-সাধনও ইহার লক্ষ্য। (১২৪ পৃঃ)

শেষের কয়েক অধ্যায়ে গ্রন্থকার কুণ্ডলিনী-রহস্য, শক্তি, নাদ এবং বিন্দুর তত্ত্ব, শব্দশক্তি ও মন্ত্র-রহস্য, অধ্যাত্মশক্তির আরোহ এবং অবরোহ, শক্তি ও কলা, দীক্ষাতত্ত্ব এবং তন্ত্রোক্ত ত্রিবিধ ভাব, অর্থাৎ আচারের বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

গ্রন্থকার আধুনিক কালের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক,—বিশেষভবে 'মিষ্টিক' দর্শনে বিশেষজ্ঞ।

যে গভীর মননশীলতা এবং দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে তিনি তন্ত্রতত্ত্বের ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে গ্রন্থখানি অনুসন্ধিৎসু পাঠক এবং তত্ত্বাভিলাষী সাধক উভয়ের পক্ষেই উপযোগী হইয়াছে। বিষয় দুরূহ হইলেও গ্রন্থের ভাষা স্বচ্ছ এবং সাবলীল। কিন্তু বহুসংখ্যক ছাপার ভুল পাঠকের চক্ষু ও মনকে পীড়িত করে। এরূপ উচ্চাঙ্গের গ্রন্থে এত মুদ্রণ-প্রমাদ বাঞ্ছনীয় নহে।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

মানবতার প্রাণশক্তি—রফিউদ্দীন প্রণীত। প্রকাশক: মহীউদ্দীন, জিলাপাড়া, পোঃ ও জেলা পাবনা, পূর্ব পাকিস্তান; পৃষ্ঠা—১০০; মূল্য—২।০ আনা।

প্রাচীন গ্রীক, প্রাচীন রোমক, প্রাচীন সেমিটিক, মধ্যযুগীয় আরব্য এবং বর্তমান ইউরোপীয়—এই পাঁচ সংস্কৃতির মনোজ্ঞ পরিচয়-গ্রন্থ। এই সকল সংস্কৃতির মধ্য দিয়া মানবতার প্রাণশক্তি কি ভাবে শিক্ষা-সমাজ-নীতি-দর্শনে, তথা ধর্মে অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহার তুলনামূলক ও তথ্য-বহুল আলোচনা প্রাঞ্জল ও সরস ভাষায় করা হইয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকে কেন লেখক আলোচ্য বিষয় হইতে বাদ দিলেন বুঝিলাম না।

মানুষ হলেও দেবতা বলি—শ্রীঅতুলানন্দ রায়, বিদ্যাবিনোদ, সাহিত্যভারতী প্রণীত। প্রকাশক—'অরোরা'র পক্ষে—শ্রীআশালতা রায়, মনোভিলা, দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা—৩০; ৫৫ পৃষ্ঠা; মূল্য—১।০ আনা।

মহাভারতের কয়েকটি গল্প ছেলেমেয়েদের জন্য সরস ভাষায় চিত্তাকর্ষক কল্পনা-সংযোগে লেখা। বর্ণনাগুলি লেখকের নিপুণ হাতে জীবন্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যত্বের যে উচ্চ আদর্শ গল্পগুলিতে নিহিত কিশোর মনে উহা বসাইয়া দিবার কৌশল লেখক জানেন দেখিলাম।

কৃষ্ণকুমারী (নাটক)—লেখক: শ্রীঅতুলানন্দ রায়, 'মনোভিলা', দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা, কলিকাতা—৩০; ৭৯ পৃষ্ঠা; মূল্য—১৷৵০ আনা।

মেবার-রাজকন্যা কৃষ্ণকুমারীর কাহিনী-অবলম্বনে এই বিয়োগান্ত নাটিকাখানি রচিত। মহাকবি মাইকেলও এই কাহিনী লইয়া তাঁহার বিখ্যাত 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' লিখিয়াছিলেন। আলোচ্য গ্রন্থের ঘটনা-নির্বাচন, সংলাপ এবং নাটকীয় সংগতি ভাল লাগিল। বাংলার নাট্য-সাহিত্যে বইখানি উপযুক্ত স্থান পাইবে আশা করি।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-সংবাদ—৭ই পৌষ (২২শে ডিসেম্বর) বাগবাজার শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন-কার্যালয়) পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ মহারাজের জন্মতিথি-উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। বিশেষপূজা, হোম, ভোগরাগ, ভজন-কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণাদি উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামী ওঙ্কারানন্দজী প্রায় দুই-ঘণ্টাকাল স্বামী সারদানন্দ মহারাজের তপস্যা ও সেবাময় পুণ্যজীবন-কথা আলোচনা করেন।

৯ই পৌষ (২৪শে ডিসেম্বর) সন্ধ্যায় বেলুড়মঠের নাটমন্দিরে যীশুখ্রীষ্টের সুসজ্জিত আলেখ্যের সম্মুখে তাঁহার পুণ্যাবির্ভাব-স্মরণে ভগবদ্ভজন, বাইবেলপাঠ ও তাঁহার জীবনী আলোচনা করা হয়। কলিকাতা উদ্বোধন-কার্যালয়ে এবং মঠ ও মিশনের আরও বহু কেন্দ্রে ঐদিন এই পবিত্র স্মরণোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব কাশীপুর উদ্যানবাটীতে শ্রীগিরিশ-

চন্দ্র ঘোষ প্রমুখ কয়েক জন গৃহস্থ ভক্তকে অভূতপূর্ব দিব্যাবেশে স্পর্শ এবং 'তোমাদের চৈতন্য হোক্' বলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন (শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ, ৫ম ভাগ, পরিশিষ্টে বিস্তারিত বিবরণ দ্রষ্টব্য)। এই ঘটনাটিকে 'ঠাকুরের কল্পতরু হওয়া' বলিয়া ভক্তেরা নির্দেশ করিতেন। গত ১৭ই পৌষ (১লা জানুয়ারী, ১৯৫৩) কাশীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে (উদ্যানবাটী) এই পুণ্যদিনের স্মরণে সারাদিনব্যাপী পূজা-পাঠ ভজন-কীর্তন-প্রসাদবিতরণাদি সহ 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বিকালে একটি জনসভায় প্রবীণ সাংবাদিক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সাহিত্যিক শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন এবং স্বামী সংস্বরূপানন্দ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন। কাঁকুড়গাছি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠেও (যোগোদ্যান) 'কল্পতরু উৎসব' অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

২৩শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) পৌষ কৃষ্ণা সপ্তমী তিথিতে বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের ৯১তম জন্মতিথি-উৎসব বহুল সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দিরে বিশেষ পূজাহোম প্রভৃতি, কঠোপনিষৎ-পাঠ ও ব্যাখ্যা এবং উচ্চাঙ্গের ভজন-সঙ্গীত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামিজীর সমাধি-মন্দিরেও বিশেষ পূজাদি নির্বাহ হয়। প্রায় পাঁচ হাজার ভক্ত নরনারী ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। বৈকালে মন্দিরের পূর্বদিকের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে একটি বৃহৎ জনসভায় আচার্য যদুনাথ সরকার (সভাপতি), শ্রীঅমর নন্দী এবং স্বামী ওঙ্কারানন্দজী স্বামিজীর জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে উদ্দীপনাপূর্ণ মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে জয়রামবাটী, কাটিহার এবং রাঁচিতে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসবের বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আগামী জন্মতিথি—আগামী ৩রা ফাল্গুন (১৫ই ফেব্রুয়ারী, রবিবার) ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে বেলুড়মঠে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম পুণ্যাবির্ভাব-তিথি উদ্‌যাপিত হইবে। পরবর্তী রবিবারে (১০ই ফাল্গুন) এই উপলক্ষে সর্বসাধারণের জন্য প্রতিবারের মত সারাদিনব্যাপী আনন্দোৎসব হইবে।

নিবেদিতা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব—সুবর্ণজয়ন্তী-পরিষদ কর্তৃক পরিকল্পিত সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান ২৫শে অগ্রহায়ণ (১১ই ডিসেম্বর) আরম্ভ হইয়া সমারোহের সহিত ২রা পৌষ (১৭ই ডিসেম্বর) সমাপ্ত হইয়াছে।

এই উপলক্ষে ১০ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের আশ্রম-বিভাগে শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, হোম ইত্যাদি অনুষ্ঠিত এবং নিম্নের পাঁচটি শ্রেণীর ৩১৯ জন ছাত্রীগণের মধ্যে পোষাক বিতরিত হয়।

১১ই ডিসেম্বর, সকাল সাড়ে ছয়টায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিভাগের প্রায় ৬০০টি ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীগণ ভগিনী নিবেদিতার সুসজ্জিত প্রতিকৃতিসহ শোভাযাত্রায় বাহির হন।

৯টার সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহ-সভাপতি পূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজীর সভাপতিত্বে উদ্বোধন-অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। প্রথমে ছাত্রীগণ বৈদিক স্তোত্র আবৃত্তি করিবার পর পূজনীয় সভাপতি মহারাজ ভগিনীর একখানি প্রতিকৃতির আবরণ-উন্মোচন করিয়া উহাতে মাল্যদান করেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের আশীর্বাণী পাঠ করেন; পরে তিনি তাঁহার অভিভাষণ দেন।

বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী শ্রীমতী যূথিকা রায়ের একটি সঙ্গীতের পর বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা শ্রীমতী রেণুকা বসু বিদ্যালয়ের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাস সংক্ষেপে পাঠ করেন।

শ্রীমতী বিজন ঘোষ দস্তিদারের 'বন্দে মাতরম্' গানে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসিগণ এবং কলিকাতার অনেক বিশিষ্ট সুধী ব্যক্তি ঐ দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ভগিনী নিবেদিতার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রভৃতি একটি কক্ষে সজ্জিত রাখা হয়। বেলা ১১টায় বিদ্যালয়ের ছাত্রীদিগকে পরিতোষ-সহকারে ভোজন করানো হয়।

অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় দিবসে বেলা ১১টা হইতে ৩টা পর্যন্ত ছাত্রীদিগের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা হয়। অপরাহ্ণ ৩৷৷০ টায় রাজ্যপাল-পত্নী শ্রীযুক্তা বঙ্গবালা মুখোপাধ্যায় শিল্প-প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। পুনর্বাসন-মন্ত্রী মাননীয়া শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের ৮টি শিল্প-প্রতিষ্ঠান এই প্রদর্শনীতে যোগদান করেন। ১৮ তারিখ পর্যন্ত বেলা ১২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত মহিলাদের জন্য প্রদর্শনী-বিভাগ খোলা রাখা হইয়াছিল।

ঐ দিন বিকাল ৪৷৷০ ঘটিকায় শ্রীযুক্তা অনুরূপা দেবীর সভানেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভা হয়। তিনি শ্রীশ্রীমা ও ভগিনী নিবেদিতার একত্রে তোলা একখানি সুবৃহৎ আলোকচিত্রের আবরণ উন্মোচন করিয়া মাল্য অর্পণ করেন। শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও কার্য আলোচনা করিয়া একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে শ্রীমতী মনীষা রায়, শ্রীমতী মীরা দাশগুপ্তা ও শ্রীমতী বাসনা সেন স্ত্রীশিক্ষা-বিষয়ে আলোচনা করেন। পরে সভানেত্রী তাঁহার ভাষণ দেন।

অনুষ্ঠানের তৃতীয় দিবস ১৩ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়ের বালিকাগণ কর্তৃক একটি বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১৪ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪½ ঘটিকায় ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে পশ্চিমবঙ্গের প্রদেশপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি সাধারণ সভা হয়। বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ভারতের রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ, উপরাষ্ট্রপতি ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কাট্‌জু, আইন-সচিব শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বিশ্বাস, স্বাস্থ্যসচিব, শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর, পশ্চিমবঙ্গের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুক্ত বিধানচন্দ্র রায়, মাদ্রাজের প্রধান মন্ত্রী শ্রীরাজগোপালাচারী এবং ডক্টর কালিদাস নাগ প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির শুভেচ্ছা ও বাণী পাঠ করেন। শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবী, স্বামী যতীশ্বরানন্দ, শ্রীযুক্তা সুভদ্রা হাকসার এবং মাননীয় রাজ্যপাল ভগিনীর জীবন ও কার্য-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন।

১৫ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে প্রাক্তন ছাত্রী সম্মেলন হয়। ভগিনী নিবেদিতার অতি পুরাতন ছাত্রী শ্রীযুক্তা সরলাবালা দেবীকে সভানেত্রীরূপে বরণ করা হয় এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীযুক্তা নির্ঝরিণী সরকার প্রধান অতিথির পদ গ্রহণ করেন। উভয়েই তাঁহাদের ছাত্রীজীবনের কথা স্মরণ করিয়া নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা ভারতের প্রতি ভগিনীর অপরিসীম প্রীতির কথা উল্লেখ করেন ও ভারতীয় রমণীগণের উন্নতিকল্পে তাঁহার অবদানের কথা জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণনা করেন।

এইদিন ছাত্রী ও অভিভাবিকাদের জন্য বিচিত্র অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হইয়াছিল।

১৬ই ডিসেম্বর, বৈকাল ৫½ ঘটিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ হলে 'ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-সেবা' বিষয়ে একটি আলোচনা-সভা অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্তা সুজাতা রায় সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেন এবং বক্তাদের মধ্যে ডক্টর রমা চৌধুরী, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, রেভারেণ্ড জন্ কেলাস, শ্রীযুক্ত কে এস্ সীতারাম, এবং ডক্টর মাখনলাল রায় চৌধুরী বিভিন্ন ধর্মের মাধ্যমে সমাজ-সেবার কথা বলেন।

উৎসবের শেষ দিন, ১৭ই ডিসেম্বর বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণে বিকাল ৫½ ঘটিকায় মহিলাদের জন্য একটি সঙ্গীত অনুষ্ঠান হয়। শ্রীমতী যূথিকা রায়, শ্রীমতী উৎপলা সেন, শ্রীমতী পূর্ণিমা ঘোষ প্রভৃতি ইহাতে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে ইহা বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য যে দার্জিলিংএ শ্রীযুক্তা আর্না ডরথি মজুমদারের উদ্যোগে ১৩ই ডিসেম্বর অপরাহ্ণ ৪টার সময়

ব্রাহ্মসমাজহলে ভগিনী নিবেদিতার স্মরণে একটি সভা এবং ঐ দিন সকালে ভগিনীর সমাধিতে সুবর্ণজয়ন্তী পরিষদের পক্ষ হইতে মাল্য অর্পণ করা হয়।

বাঁকুড়া শাখাকেন্দ্র—এই আশ্রমের ১৯৫১ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। মঠবিভাগে নিয়মিত ঠাকুরসেবাদি ছাড়া আলোচ্য বর্ষে ১৩০টি ধর্মালোচনাসভা এবং সাময়িক উৎসবাদিও অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পুস্তকাগারে ২৮০৭ খানি বই পাঠের জন্য বাহিরে দেওয়া হইয়াছিল। মিশন-বিভাগ :—৩টি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয়ে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ২০,৮১৩; পুরাতন রোগী—৪৯,১৭৩। বিবেকানন্দ হোমিওপ্যাথিক বিদ্যালয়ে ৮ জন ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়াছে। সারদানন্দ ছাত্রাবাসে ১২ জন ছাত্র ছিল। রামহরিপুর পরিবর্ধিত মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়ের ছাত্রসংখ্যা ২৪০। এতদ্ব্যতীত মিশনবিভাগ হইতে ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট রোগীদিগের মধ্যে কুইনাইন-বিতরণ, দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে আর্থিক সাহায্য এবং অগ্নিদাহ ও বসন্ত-রোগে সেবাকার্যও করা হইয়াছিল।

বিবিধ সংবাদ

ডক্টর ৺সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—গত ৩রা পৌষ (১৮ই ডিসেম্বর) প্রখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লক্ষ্ণৌতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। ডক্টর দাশগুপ্তের সমগ্র জীবনে অনলস অধ্যয়ন, অধ্যাপন ও গ্রন্থরচনাই একমাত্র লক্ষ্য ছিল। তিনি আবাল্য অসাধারণ মেধা ও ধীশক্তির পরিচয় দেন। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপক রূপে ডক্টর দাশগুপ্ত প্রভূত খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচিত চারখণ্ডে প্রকাশিত ভারতীয় দর্শনের সুবৃহৎ ইতিহাস তাঁহার অক্ষয় কীর্তি-স্তম্ভ। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসুস্থ শরীরেও তিনি এই গ্রন্থের পঞ্চমখণ্ড-রচনায় নিযুক্ত ছিলেন। আমরা এই অতন্দ্র জ্ঞানতপস্বীর লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি কামনা করি।

নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলন—৯ই পৌষ হইতে তিন দিন কটকে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টাবিংশতিতম অধিবেশন অপূর্ব সাফল্য ও উদ্দীপনার সহিত সমাপ্ত হইয়াছে। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ছিলেন মুখ্য সভাপতি। বাংলার এবং উড়িষ্যার বহু সুপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক এবং মনীষী সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রধান এবং বিভিন্ন শাখার সভাপতিগণের সুচিন্তিত ভাষণগুলি (যাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে) বাঙ্গালীমাত্রেরই অনুধাবনীয়। এই সম্মেলন বাংলা এবং উৎকলের সাংস্কৃতিক বন্ধন ও মৈত্রী দৃঢ়তর করিতে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে সন্দেহ নাই।

ভ্রম-সংশোধন—পৌষমাসের উদ্বোধনে 'অঞ্জলি' প্রবন্ধত্রয়ের প্রথমটির লেখকের নাম অসিতকুমার বিশ্বাসের স্থলে অজিতকুমার বিশ্বাস ছাপা হইয়াছে। এই ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

উদ্বোধনের পুরাতন গ্রাহক-গ্রাহিকাগণের গ্রাহকসংখ্যা পরিবর্তিত হইয়াছে। তাঁহারা অনুগ্রহপূর্বক এই নূতন সংখ্যা লক্ষ্য করিবেন।

উদ্বোধন

"যে রাম, যে কৃষ্ণ......"

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥

(স্বামী বিবেকানন্দ)

প্রেমের প্রবাহ যাঁর দুর্নিবার বেগে
আচণ্ডাল সবারে ভাসায়
লোকাতীত যিনি তবু লোক-হিত-পথে
রহিলেন মানব-সেবায়—

অতুল মহিমা যাঁর ব্যাপ্ত ত্রিভুবনে
জানকীর প্রাণ-প্রিয় রাম
নররূপে আসিলেন পরম দেবতা
ভক্তি-সীতা-বৃত জ্ঞান-ঠাম।

ধরিলেন বেশ পুনঃ অর্জুন-সারথি
থামে মহা-প্রলয়-গর্জন
কাটে ঘোর-তমোময়ী সুচির রজনী
টুটে অন্ধ-মোহের বন্ধন।

ছাপি রণরোল উঠে গীতা-সিংহনাদ
ললিত গম্ভীর গীত-ধ্বনি
যেই রাম যেই কৃষ্ণ প্রথিতপুরুষ
সেই আজি রামকৃষ্ণ গণি।

ফাল্গুনে

ফাল্গুন বাংলার ধর্মজীবনের একটি অতি পবিত্র, মধুর স্মৃতি বহন করিয়া আনে। চারিশত সপ্তষষ্টি বৎসর পূর্বের সেই ফাল্গুনী পূর্ণিমার সন্ধ্যা! হাটে বাটে নাগরিকগণের দোল-মহোৎসব চলিতেছে। এদিকে চন্দ্রগ্রহণ উপলক্ষে গঙ্গার তীরে স্নানার্থী নরনারীর ভিড়। শঙ্খ-ঘণ্টা বাজিতেছে, হরিনামের রোল উঠিতেছে। ধীরে ধীরে অন্ধকারের ছায়া পূর্ণচন্দ্রকে গ্রাস করিল। ভাবুক কবি বলিয়াছেন, গৌরচন্দ্রের উদয়ে পূর্ণচন্দ্রও যেন লজ্জা পাইয়া আত্মগোপন করিলেন।

অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন।
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কোন্ প্রয়োজন॥
এত জানি চন্দ্রে রাহু করিলা গ্রহণ।
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরিনামে' ভাসে ত্রিভুবন॥
(শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ১।১৩)

শচীদুলাল নবদ্বীপচন্দ্র নিমাইএর ক্রমবিকাশমান বাল্য, কৈশোর, যৌবনের রোমাঞ্চকর কাহিনী বাঙালী তাহার বহু কাব্যে, সঙ্গীতে, কথিকায় গাঁথিয়া রাখিয়াছে। তাহার পর নিমাই পণ্ডিত গয়ায় গিয়া কী ঝড়ের মুখে পড়িলেন—কী বন্যা ডাকিয়া আনিলেন—সর্বপ্লাবী অশ্রুর বন্যা—শান্তিপুরকে ডুবাইল, নদীয়াকে ভাসাইল, বাংলার সীমানা ছাড়াইয়া উৎকল, দাক্ষিণাত্য, কাশী বৃন্দাবনে আঘাত করিল। প্রায় পাঁচ শতাব্দী কাটিয়া গিয়াছে আজিও বাংলার বুকে সেই অশ্রু জীবনের সঞ্জীবনী সুধা হইয়া অতি-যত্নে সঞ্চিত আছে। আজও বাঙালীর প্রাণ হরিনামসংকীর্তনের শব্দে নাচিয়া উঠে—গৌর-চন্দ্রিকার মিনতিপূর্ণ আবাহন-সুর শুনিয়া তাহার চোখে ভাসিয়া উঠে সেই 'আউলের' ছবি—'কৃষ্ণ' ব্যতীত আর কিছু যিনি জানিতেন না, বলিতেন না, ভাবিতেন না,—বিদ্যা, ঐশ্বর্য, জাতির অভিমান-বর্জিত শুধু ভগবানের দাসরূপে এক অখণ্ড মানবগোষ্ঠী যিনি গড়িয়া তুলিবার উদ্দীপনা দিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য বাঙালীর অবিস্মরণীয় দেবতা। ফাল্গুনে তাঁহার ত্যাগ-ভাস্বর, প্রেম-সমুজ্জ্বল, সেবা-স্নিগ্ধ অলৌকিক জীবনের কথা গভীরভাবে স্মরণ করি।

* * *

১৪০৭ শকাব্দের ঠিক সাড়ে তিনশত বৎসর পরে ১৭৫৭ শকের ফাল্গুন। শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে পুনরায় এক দিব্য আবির্ভাব—বাঙলার 'নিমাই'-এর স্বর্ণ-স্মৃতির সহিত ভাবী বহু শতাব্দীর জন্য বাঙলার 'গদাই'-এর স্মৃতির সংযোজন। সাড়ে তিন শত বৎসরে ভারতের, তথা জগতের ইতিহাসে বহুতর পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল—ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের চিন্তা, কর্ম ও জীবনধারায় অচিন্ত্যপূর্ব বিপ্লব ঘটিয়া গিয়াছিল। তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর শ্রীচৈতন্য-জীবনের সহিত ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের বহুতর সাদৃশ্য সত্ত্বেও পার্থক্যও যে বিপুল হইবে ইহা স্বাভাবিকই। এই পার্থক্য কিন্তু বিভেদ নয়, বিকাশ-বৈচিত্র্য। মুদ্রার উপাদান স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্রই থাকে, তবুও নবাবী আমলের মুদ্রার গঠন ও ছাপ বাদশাহী আমলে আলাদা হইয়া যায়। কালের প্রয়োজনে মুদ্রার ছাপ বদলায়—যুগের প্রয়োজনে যুগ-সাধনা, যুগ-ধর্মের পরিবর্তন হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—'এবার ছদ্মবেশে আসা, যেমন জমিদার গোপনে কখনও জমিদারী দেখতে যায়, সেইরূপ।' কিন্তু ছদ্মবেশে শেষ পর্যন্ত আত্মগোপন করিতে পারিলেন কি? ধরা কি পড়িয়া যান নাই? রূপ, বিদ্যা এবং সর্ব-প্রকার ঐশ্বর্য ও বিভূতির প্রকাশ চাপিয়া রাখিলেও আত্মভোলা সরল পূজারী ব্রাহ্মণের ভিতর তাঁহার তিরোধানের কিছু কালের মধ্যেই দিগ্-দিগন্তরে শতসহস্র নরনারী তাঁহার ভিতর যুগের আধ্যাত্মিক আদর্শ খুঁজিয়া পাইল কি করিয়া? উদ্বেল ঈশ্বরপরায়ণতা, অপূর্ব ত্যাগ-বৈরাগ্য, বিশ্বাবগাহী সহানুভূতি এবং আশ্চর্য জীব-প্রেম শ্রীরামকৃষ্ণ-চরিত্রের মর্মকথা। সেই কথাই যেন ফাল্গুনে আমাদের সমস্ত চেতনায় ধ্বনিত হয়।

আমার ঠাকুর

শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

আমার ঠাকুর পাঠশালার পড়াও শেষ করতে পারেন নি, পড়ার ভয়ে পাঠশালা থেকে পালাতেন, স্কুলকলেজ-পুঁথির মুখ দেখেন নি···গেঁয়ো লোকের মতন ষ্টেশনকে বলতেন ইষ্টিশান···যতীন্দ্রকে বলতেন যতিন্দর···পণ্ডিত লোকের নাম শুনলে শিশুর মতন ভয় পেতেন···ইংরেজী যুগে চিনতেন না ইংরেজী হরফ··সাইকোলজী, ফিলসফি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কোন পুঁথির সঙ্গে হয় নি তাঁর কোন পরিচয়···মূর্খ বলে যে-যুগের শিক্ষিত লোকেরা তাঁকে করেছে উপহাস···আনন্দে হেসেছেন আমার ঠাকুর···

আমার ঠাকুর মহাজ্ঞানী···বিশ্বের সমস্ত বিদ্যা, সমস্ত বিজ্ঞান, সমস্ত তথ্য আর তত্ত্ব, বেদ-বেদান্ত, শাস্ত্র-তন্ত্র আমার ঠাকুরের বাণীতে পেয়েছে নব-জীবন···আমার ঠাকুরের স্পর্শে সমস্ত মৃত পুঁথি হয়েছে জীবন্ত আলো, আমার ঠাকুরের চেতনায় সমস্ত বিদ্যা স্বয়ম্বরা হয়ে দিয়েছে ধরা। আমার ঠাকুরের জ্ঞানের আলোয় জগতে আসছে নব-প্রভাত···সেদিনকার জগতের সমস্ত উপহাস আমার মূর্খ ঠাকুরের পায়ের কাছে আজ প্রণাম হয়ে পড়ছে লুটিয়ে।

আমার ঠাকুর অবিশ্বাসী যুগে নিজের জীবনের বাস্তবতায় প্রমাণ করে দিয়ে গিয়েছেন, জ্ঞান বাইরে থেকে আহরণ করবার জিনিস নয়, জ্ঞান হলো নিজের অন্তরের আবরণ-উন্মোচন।

(২)

আমার ঠাকুর সর্বত্যাগী, বৈরাগী, মহাসন্ন্যাসী। বৈরাগ্যের ঝড়ে উড়ে যায় আমার ঠাকুরের পরিধেয় বসন, মহারিক্ত দিগ্‌বসন আনন্দে নাচেন আমার ঠাকুর। আমার ঠাকুরের বৈরাগ্যের আগুনে নতুন করে মদন হয় ভস্ম···জ্বলে পুড়ে যায় "উমার কপোলে স্মিতহাস্য বিকশিতলাজ"···সে-বৈরাগ্যকে বরণ করতে স্বয়ং উমাকে আবার কঠোরতর তপস্যায় করতে হয় নূতন পুরাণের সৃষ্টি। আমার ঠাকুর সর্বাশ্রয়ী, আনন্দ-মত্ত মহাপ্রেমিক। আমার ঠাকুরের দুপায়ে নাচের তালে বাজে আনন্দের নূপুর; সে-আনন্দের স্পর্শে, জগৎ দেখেছে, কদম্ব-শিহরণ

জেগে উঠেছে বিশুদ্ধ মনে মনে। বৈরাগ্যের শ্মশানে আমার ঠাকুর স্বেচ্ছায় মহানন্দে রচনা করেন প্রেমের ফুল-বাসর, বিবাহের রাঙাচেলী আমার ঠাকুরের বিজয়-বৈজয়ন্তী।

বৈরাগ্য আর প্রেম আমার ঠাকুরের দুই হাতে দুই খঞ্জনী, একসঙ্গে বাজে নিশিদিন।

(৩)

জন্মসিদ্ধ আমার ঠাকুর রুদ্র-তপস্যায় যে-লোকে বাস করেন, সেখানে তিনি মহা-একক, সৃজনের আদিতে ব্রহ্ম যেমন ছিলেন একক। রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শের অতীত নিঃসীম সেই ধ্যানলোকে আমার ঠাকুর বিহার করেন দেহহীন সঙ্গহীন অনাদি অনন্ত জ্যোতিস্বরূপ···কোন কামনা, কোন বাসনা, কোন আকাঙ্ক্ষা, কোন বিষয়-সাধ স্পর্শ করতে পারে না আমার ঠাকুরের প্রদীপ্ত চেতনাকে। আমার ঠাকুর বালকের মতন ধূলায় লুটিয়ে কাঁদেন নিজের শিষ্যের বিরহে, গঙ্গার তীরের বাতাস ভারী হয়ে ওঠে আমার ঠাকুরের সাথী-খোঁজা কান্নায় ···স্নেহ-অন্ধ জননীর মত আমার ঠাকুর সযত্নে লুকিয়ে রাখেন মিষ্টান্ন নিজের হাতে শিষ্যকে খাওয়াবেন বলে··অপমানকারী সুরামত্তের ক্ষুব্ধ অভিমান দূর করবার জন্যে আমার ঠাকুর নিজে উপযাচক হয়ে রাত্রি-নিশীথে দশ মাইল পথ ভেঙ্গে যান অপমানকারীর দ্বারে···মানী লোকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে, নিজের জামার খোলা বোতাম দেখে ভীত সঙ্কুচিত হয়ে ওঠেন বালকের মত আমার ঠাকুর···

নির্বিকল্প সমাধির মহানিস্তব্ধ ধ্যানলোক থেকে প্রতিদিনের জীবনের সামান্যতম ব্যবহারিকতায় অনায়াসে নিত্য যাতায়াত করেন আমার ঠাকুর।

(৪)

চিরতপস্বী আমার ঠাকুর জন্মের প্রথম চেতনা থেকে নিয়ে এসেছিলেন অনায়াস ব্রহ্মচর্যের মহাবীর্য···তাই তন্ত্র-সাধনার যোনি-উপচার উল্লেখেই আমার ঠাকুর সমাধিতে চলে যান দেহস্পর্শের অতীতলোকে। ক্ষমাহীন কঠোরতায় আমার ঠাকুর নারীর ছায়া থেকে দূরে রাখতেন নির্বাচিত শিষ্যদের। নারীর মোহিনী মূর্তি আমার ঠাকুরের তন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে দেখা দেয় মাতৃ-মূর্তিতে।

মাতৃ-সাধক আমার ঠাকুর জগতে অদ্বিতীয় মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন নারীর জায়া-রূপকে। সর্ব-লজ্জা সর্ব-অপমান, সর্ব-লাঞ্ছনা, সর্ব-ক্ষুদ্রতা থেকে নারীত্বকে দিয়ে গিয়েছেন আমার ঠাকুর প্রতিদিনের প্রত্যক্ষ বাস্তবতায়, নিজের বিবাহিত

জীবনে যে-মর্যাদা, যে-গৌরব, যে-প্রেম, সমগ্র মানব-সভ্যতার ইতিহাসে নারী আর কখনো পায় নি সে-মহিমা। আমার সন্ন্যাসী ঠাকুরের তপস্যার ক্ষীরোদ-সিন্ধু থেকে জগতে জেগেছে নতুন করে মহালক্ষ্মীরূপা. নারী, সারদা-সরস্বতী··· সর্ব তপস্যা, সর্ব সাধনার শেষে আমার প্রেমের ঠাকুর ষোড়শী সহধর্মিণীর পূজায় আনন্দে অঞ্জলি দিয়েছেন সর্বসাধনার সিদ্ধিফল। দেহ-রতির ক্লান্ত চক্র-প্রবর্তন থেকে নারীকে উদ্ধার ক'রে আমার ঠাকুর করে গিয়েছেন নারীত্বের জীবন-আরতি।

আমার চিরসন্ন্যাসী ঠাকুর জগতে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন দিব্য প্রেমের পার্থিব মহিমা, আজন্ম ব্রহ্মচারী আমার ঠাকুর প্রতিদিনের ভালবাসায় রচনা করে গিয়েছেন আগামী দিনের নারী-প্রতিমা, নব-সীতা।

(৫)

আমার ঠাকুরের সামান্য স্পর্শে সে-এক নরেন্দ্রনাথ দত্ত হয় বিশ্ব-টলানো বিবেকানন্দ··বাঙালীর গরীব ঘরের রাখাল-কালী শরৎ-শশী আমার ঠাকুরের ছোঁয়ায় হয় জগৎ-আলো জ্যোতির শিখা···আমার ঠাকুরের চরণামৃতে মদ-মাতাল নিমেষে হয় সৃষ্টি-পাগল মন-মাতাল···আমার ঠাকুরের বাণীর বিদ্যুতে জড় পাথরের বুকে জাগে অমর চৈতন্য···আমার ঠাকুর কল্পতরু···

কাতরভাবে যখন প্রিয়তম শিষ্য পায়ে লুটিয়ে কেঁদে চাইলো আত্মমুক্তির আশীর্বাদ, সেই আমার কল্পতরু ঠাকুর রুদ্ররোষে তাকে স্বার্থপর বলে করলেন ভর্ৎসনা, কেড়ে নিলেন প্রিয়তম শিষ্যের গহন-সমাধির অর্জিত মহানন্দের বাসনা।

(৬)

আমার ঠাকুর ভগবানের কথা বলেন নি, ভগবান হয়েছিলেন···ধর্মচর্চা করেন নি, হয়েছিলেন ধর্ম। কাউকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে আমার ঠাকুর কোন সিংহাসনে বসেন নি, রচনা করেন নি কোন নতুন সিংহাসন···আমার ঠাকুর আনেন নি কোন একটী তরঙ্গের আন্দোলন, আমার ঠাকুর সর্ব-আন্দোলনময় সর্ব-তরঙ্গময় মহাসাগর। আমার ঠাকুর ইতিহাসের ভগ্নাংশ নন, সকল ভগ্নাংশের যোগফল। আমার ঠাকুর একটী জীবনে প্রত্যক্ষভাবে বাস করে গিয়েছেন সমগ্র মানব-সাধনার ইতিহাসকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তভাগকে স্পর্শ করে আমার ঠাকুরের অস্তিত্বের চেতনা সূর্যের মত আলোকিত করে তুলেছে সমস্ত অতীত শতাব্দীকে, আমার ঠাকুরের অস্তিত্বের ছায়ায় জন্ম নিচ্ছে আগামী কাল। দেশ-

কাল-ধর্মের ঊর্ধ্বে আমার ঠাকুরের জীবনে বিপুল বিশ্ব নীড়ের মত প্রত্যক্ষভাবে দিয়েছে ধরা।

নামহীন অখ্যাত এক গণ্ডগ্রামে একটা ছোট্ট বাগানের পাঁচিলের ভেতর, গুটিকতক দরিদ্র শিষ্যের মধ্যে, সংবাদ-পত্রের সংস্পর্শের বাইরে, লোকচক্ষুর অন্তরালে, সমসাময়িকদের উপেক্ষা আর অবজ্ঞার ঊর্ধ্বে, আমার নিঃসম্বল কপর্দ্দকহীন ঠাকুর কপর্দ্দকহীনতার প্রচণ্ড আনন্দে, নব-জাগরণ-মত্ত শতাব্দীর শত কোলাহল থেকে দূরে, আপনার মনে কাদা আর মাটী দিয়ে গড়ে গিয়েছেন শুধু গুটিকতক প্রদীপ, নিজের প্রাণের ফুৎকারে শুধু জ্বালিয়ে গিয়েছেন তাদের শিখা। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতন লোকেরও একদিনের জন্যে কৌতূহল জাগে নি, দক্ষিণেশ্বরের ঘাটে নেমে উঁকি মেরে দেখতে, যদিও সেই ঘাটের পাশ দিয়ে দিনের পর দিন নৌকো করে তিনি গিয়েছেন-এসেছেন। আমার গেঁয়ো ঠাকুরই উপযাচক হয়ে গিয়েছেন মানী লোকদের, গুণী লোকদের দরজায়, হাতজোড় করে বলেছেন, ওগো, শুনতে এসেছি তোমাদের কথা! আমার ঠাকুরের চিতাভস্ম নিয়ে যারা রাত জেগে ছিল, কেউ তাদের ডেকে দেয় নি সামান্য একটা থাকবার ঘর, ভিক্ষার অন্নে মানকচু-পাতা সেদ্ধ খেয়ে কেটে গিয়েছে তাদের দিন, পাড়ার লোকেরা গালাগাল দিয়ে, ঢিল ছুঁড়ে করেছে তাদের অভ্যর্থনা।

আজ দেশে-দেশান্তরে তাই নিয়ে রচিত হচ্ছে মহাকাব্য, মানবমনের মহাকাব্য।

(৭)

আমার ঠাকুর পরমহংস সন্ন্যাসী, কিন্তু পরেন না গেরুয়া। লালপেড়ে কাপড় পরেন, বার্ণিশ করা চটি জুতো পায়ে, গায়ে ফতুয়া, জামা, চাদর। বনে বা আশ্রমে ধুনি জ্বেলে গাছতলায় বাস করেন না, বাস করেন শান-বাঁধানো-মেঝে-ওয়ালা ইঁটের ঘরে, সে-ঘরে তক্তাপোষ আছে, তার ওপর আছে বিছানা এবং মশারি। আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর গৃহকে অরণ্য করেন নি, করেছিলেন মন্দির। সে-মন্দিরে আনন্দে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জীবন্ত অন্নপূর্ণাকে। যে-অনায়াস আনন্দে আমার ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধির বিশ্ববিহীন বিজনতায় বিচরণ করতেন, সেই অনায়াস আনন্দে আমার ঠাকুর পালন করতেন প্রতিদিনের সংসারের প্রতিটি তুচ্ছ কাজ। যেমন একান্তভাবে তিনি জানতেন জ্ঞানাতীত পরমতত্ত্বের প্রত্যেকটী ধাপ, প্রত্যেক ক্রিয়া-প্রক্রিয়া, তেমনি একান্তভাবে, তেমনি সম্পূর্ণভাবে তিনি জানতেন কোন্ রান্নায় কি ফোড়ন দিতে হয়, কি করে সল্‌তে পাকাতে হয়, ঘর-কন্নার প্রত্যেকটী খুঁটি-নাটি। গৃহিণীপনায় আমার সন্ন্যাসী ঠাকুর ছিলেন অদ্বিতীয়। দেশ-কাল-পাত্রের ঊর্ধ্বে

যিনি বিরাজ করতেন, সেই আমার ঠাকুর সামাজিকতায়, ভব্যতায় বাইরের প্রত্যেকটী লোকের সঙ্গে আচরণে রেখে গিয়েছেন ব্যবহারিকতার চরম আদর্শ। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে নিজের ভাইঝিকে মনে করে আমার ঠাকুর অজ্ঞাতসারে সহধর্মিণীকে বলেছিলেন, 'তুই', অজ্ঞাতসারেও সেই রূঢ় সম্বোধনের অপরাধে আমার ঠাকুর ছুটেছিলেন ক্ষমাপ্রার্থনার জন্যে। টাকার সংস্পর্শে আমার ঠাকুরের হাতের আঙুল আপনা থেকে যায় বেঁকে, অথচ বাজার থেকে শিষ্য যখন জিনিস কিনে আনে, জিজ্ঞাসা করেন, হাঁরে, ফাউ আনিস্ নি কেন? সর্বত্যাগী ঠাকুরের মুখে ফাউ-এর কথা শুনে লজ্জিত হয়ে পড়ে শিষ্য। লজ্জিত শিষ্যকে ভৎর্সনা করে বলেন আমার ঠাকুর, ভক্ত হবি তো, বোকা হবি কেন?

জীবনের দুই প্রান্তে দুই দুর্গম মেরু, পড়েছিল বিচ্ছিন্ন, সংযোগহীন · আমার ঠাকুরের জীবনে পেয়েছে তারা তাদের সংযোগ-আত্মীয়তা।

(৮)

আমার ঠাকুর মানব-গুরু, কিন্তু করেন নি গুরুগিরি। আমার ঠাকুর পেয়েছিলেন ভগবানকে কিন্তু ভোলেন নি মানুষকে। আমার ঠাকুর রাণী রাসমণির মন্দিরে থাকতেন, মন্দিরে পুরোহিতেরও কাজ করতেন কিন্তু তিনি মন্দির থেকে, পুরোহিত থেকে, পুঁথি থেকে উদ্ধার করেন ধর্মকে। আমার গেঁয়ো ঠাকুর আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎকে জানতেন না, আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ আমার গেঁয়ো ঠাকুরকেও জানে না…কিন্তু আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগৎ যে-জিনিস খোঁজ করছে, অথচ পাচ্ছে না, আমার গেঁয়ো ঠাকুর আধুনিক বৈজ্ঞানিক জগতের জন্যেই সেই পরমপদার্থকে অক্ষয়ভাবে নিজের জীবনে সঞ্চয় করে রেখে গিয়েছেন, মানবতা তার নাম। আমার চিরবৃদ্ধ ঠাকুর আধুনিকতার জন্মদাতা। এ-মানবতা মস্তিষ্ক-জাত অঙ্কের ফরমুলা নয়, যে-কোন নিয়মের বাঁধনে সমস্ত পৃথিবীর মানুষকে এক-শৃঙ্খলে বাঁধা নয়, এ-মানবতায় হবে মানুষের মনের নব-জন্ম, মানুষের ভেতরে যেখানে রক্ত-কণিকায় লুকিয়ে আছে বিভেদের বিষ, এ-মানবতা করবে তার সংশোধন, মানুষকে দেবে নতুন দৃষ্টি, দিব্য দৃষ্টি। জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবকে সেবা, আমার ঠাকুরের এই অমর উক্তিতে মস্তিষ্ক-ক্লান্ত ক্ষত-বিক্ষত ধরণী বৈজ্ঞানিক সাত্ত্বিকতার দম্ভের অন্তে পাবে সত্যিকারের মানব-ধর্মের সন্ধান, ল্যাবরেটরীর যন্ত্রপাতির বাইরে মানুষের চেতনায় খুঁজে পাবে পৃথিবীর নব-প্রভাতের সন্ধান।

আমার চিরবৃদ্ধ ঠাকুর অতি আধুনিক পৃথিবীর জন্মদাতা।

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-দশক *

স্বামী বিরজানন্দ

ব্রহ্ম-স্বরূপ সবার আদিতে মধ্যে অন্তে যাঁর প্রকাশ,
নিত্য-সত্য-অদ্বয়রূপে বিকার ছয়টি পায়গো নাশ।
বাক্যমনের অগোচর যিনি 'ইহা নয়' ভাবে চিন্তা যাঁর,
সেই দেবদেব শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরে নমি বারংবার॥ ১

সুরগণ-অরি দৈত্য বিনাশি নিবারেন যিনি দেবের ভয়,
সাধু-সজ্জন-অভীষ্টদাতা হরেন ভূভার দুঃখময়।
যুগে যুগে আসি আপন স্বরূপ-তত্ত্ব প্রকট হয়গো যাঁর,
সে পরমদেব ভগবান রামকৃষ্ণে করিগো নমস্কার॥ ২

যাঁহার বিধানে কর্মসূত্রে বদ্ধ নিখিল ভূতগণ,
জ্ঞান-কর্মের পুণ্য-পাপের ইতর-বিশেষ হয় সাধন।
সাক্ষি-স্বরূপ বুদ্ধি আলোকি সকল কর্মে বিকাশ যাঁর,
তিনিই তো দেব রামকৃষ্ণ প্রণতি রাখিনু স্মরণে তাঁর॥ ৩

সকল-জীব-দুষ্কৃত-নাশ-কারণ যিনিগো ভবেশ্বর,
স্বীকারি গর্ভবাস-দুঃখ বরিলেন এই দেহ নিগড়।
দিব্য জীবন যাপনে ধরায় লীলা-মহিমা ব্যক্ত যাঁর,
পরমেশ সেই রামকৃষ্ণে প্রণাম নিবেদি বারংবার॥ ৪

কাঞ্চন-ধূলি সমজ্ঞান যাঁর ত্যাজ্য-গ্রাহ্য-বিভেদ নাই,
জগদম্বিকা-শক্তি নারীতে মাতৃভাবনা রহে সদাই।
ভক্তি ও জ্ঞান, ভুক্তি-মুক্তি, শুদ্ধা-বুদ্ধি কৃপায় যাঁর,
প্রণমি শ্রীরামকৃষ্ণে গো পরমেশ্বরে সেই বারংবার॥ ৫

বহু ধর্মের মূলসত্যে হেরিলেন মহা সমন্বয়,
সকল মতের সিদ্ধ পথিক নাহিকো নিজের সম্প্রদায়।
অখিল-শাস্ত্র-মর্মদর্শী বাহিরে নিরক্ষর আকার,
সর্বজ্ঞানী যে সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে নমস্কার॥ ৬

* মূল সংস্কৃত হইতে শ্রীসুকুমার বসু কর্তৃক অনূদিত।

চারু-দর্শন সুকণ্ঠে যাঁর ধ্বনিল গো শ্যামা মায়ের গান,
প্রেম-উন্মাদ সংকীর্তনে ঈশ্বরভাবে বিভোর-প্রাণ।
যাঁহার মধুর কথা-অমৃতে শোক-সন্তাপ যায় গো যায়,
পরম দেবতা শ্রীরামকৃষ্ণ—অর্পিনু নতি তাঁহার পায়॥ ৭

চরণ-কমল-তনু-আভাসে হৃদয়ে মৈত্রী-শান্তি ছায়,
অনুরাগ-বাঁধা ভক্তে পরমার্থ-বিভব প্রসারি যায়।
দম্ভিত-জন-দর্প-বারণ বিশ্বের গুরু শঙ্কাহীন,
দেবতা-শ্রেষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবান মোর প্রণতি নিন॥ ৮

পঞ্চবর্ষ-বালক-স্বভাব এসেছেন সাজি পরমহংস,
সর্বলোক-রঞ্জনকারী সংসারমোহ করেন ধ্বংস।
জীবের জন্ম-ভীতি নাশেন পরম তৃপ্তি-সুখ-আগার,
দেবদেব প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণে নিবেদি প্রাণের নমস্কার॥ ৯

ধর্মের গ্লানি করিলেন দূর বারিলেন যত নিন্দ্যকর্ম,
সর্ব ধর্মে বিশারদ তবু আচরি চলেন লোক-ধর্ম।
সন্ন্যাসি-গৃহী সবার নিত্য সেব্য চরণ-পদ্ম যাঁর,
সর্ব-দেবতা-শিরোমণি প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণে নমস্কার॥ ১০

স্তোত্র-দশক প্রেম-ব্যঞ্জক পরম-দেবতা-মহিমাভরা,
নিত্য পাঠক যে জন তাহার সকল বিঘ্ন-দুঃখ-হরা।
জপ-যাগ-যোগ-ভোগৈশ্বর্য যদি বা কখনো সুলভ হয়,
রামকৃষ্ণে অনুরাগ-ভাব-ভক্তি সহজ-লভ্য নয়॥ ১১

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্র-দশক প্রকাশিত যথা-তূণকছন্দ
ভক্তি-সাধক স্তবসার এই রচিলেন যতি বিরজানন্দ॥ ১২

"আমার স্বভাব এই—আমার মা সব জানে।...ভক্তের অবস্থায়—বিজ্ঞানীর অবস্থায় রেখেছে।...এ অবস্থায় দেখি মা-ই সব হয়েছেন! সর্বত্র তাঁকে দেখতে পাই। কালীঘরে দেখলাম, মা-ই হয়েছেন। দুষ্টলোক পর্যন্ত—ভাগবত পণ্ডিতের ভাই পর্যন্ত।......মাকে কুমারীর ভিতর দেখিতে পাই বলে কুমারীপূজা করি।"—শ্রীরামকৃষ্ণ

ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়া

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্‌সি, বি-টি

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুণ্য জন্মতিথি ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়া। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আবির্ভূত পুণ্যশ্লোক সে মহামানবের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা তাই আমাদের ঐকান্তিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি।

সর্বভাব ও সর্বধর্মের সমন্বয়-বিগ্রহ তাঁর লোকোত্তর জীবনে ভারতীয় সংস্কৃতির বিবিধ বৈচিত্র্য যেভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে, ভাব-সাধনার অস্ফুট, প্রথম প্রকাশ থেকে তার অত্যাধুনিক অভিব্যক্তি পর্যন্ত—যুগে-যুগে লব্ধ ও আয়ত্তীকৃত তত্ত্বগুলো বিবর্তনক্রমের মর্যাদা রক্ষা করে যেরূপে তাঁতে স্তরে স্তরে রূপায়িত হয়েছে, একাধারে এমনটি আর কোথাও, পূর্বগ-কোন অবতার-প্রথিত পুরুষের জীবনেই সংঘটিত হয়নি। ভারতের বিশাল বিস্তৃত বক্ষে শত যুগ মন্বন্তর ধরে ধীরে ধীরে যত বিচিত্র আধ্যাত্মিক গবেষণাগার স্থাপিত হয়েছে, যত ধর্ম ও সাংস্কৃতিক কারখানা গড়ে উঠেছে—তাদের সকল বিভাগেই এমন পারদর্শী এবং তাদের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলোকে একই মূল অভিপ্রায় দ্বারা সন্নিবিষ্ট ও সংযুক্ত করে ভারতব্যাপী বিরাট যন্ত্রকে এক লক্ষ্যপথে চালিত করবার এমন দক্ষতাও আর কোথাও পরিলক্ষিত হয়নি। সীমাহীন আকাশগাত্রে বিচ্ছুরিত আলো-তরঙ্গসমূহ যেমন একটি ক্ষুদ্রাবয়ব আতসকাঁচের মধ্য দিয়ে মুহূর্তে এক কেন্দ্রে সংহত হয়ে অতি তীব্র উত্তাপ ও ঔজ্জ্বল্য লাভ করে—শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনরূপ যন্ত্রটির মধ্য দিয়েও তেমনি আর্যসভ্যতার সুদীর্ঘকাল-পরিব্যাপ্ত স্পষ্ট ও অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক ধারাগুলো সঞ্জীবিত ও সমন্বিত হয়ে নূতন অর্থ, মর্যাদা ও প্রাধান্য লাভ করেছে। আবার শুধু বিগত অতীতের কথাই নয়, দূর এবং অদূর ভবিষ্যতে জাতিগত ও ও ব্যক্তিগত জীবনের যত জটিল সমস্যা বাহ্যদৃষ্টিতে একান্ত অসমাধান-যোগ্য বলে প্রতীত, তাদেরও সমাধান-ইঙ্গিত এজীবনেরই যুগসাধনায় নিহিত রয়েছে। সে-ইঙ্গিত তাঁর খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম প্রভৃতি বহির্ভারতীয় এবং হিন্দু ভিন্ন অন্যজাতির ধর্মসাধনায় সিদ্ধিলাভরূপ অভিনব ব্যাপারের অন্তরালে অনুসন্ধান করলেই দেখ্‌তে পাওয়া যাবে। তাঁর সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ ও অভ্রান্ত দৃষ্টিতে তিনি যে দেখেছিলেন—সকল ধর্মপ্রবর্তকগণের জ্যোতিঘনতনু সাধনান্তে তাঁরই দেহে মিলিয়ে গেল, সকলধর্মের চরম পরিণতি একই সমরস জ্যোতিক্ষেত্রে সাধককে পৌঁছিয়ে দিল—জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যপ্রতিষ্ঠায় সেটি যেমন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, অনাগত ভাবী কালে হিন্দুধর্ম যে অদ্বৈতের ভিত্তিতে এবং অখণ্ড, অবিভাজ্য সত্যের দৃষ্টিতে সকল ধর্মকে নিজস্ব করবার পথে, অগ্রসর হবে তারও সুস্পষ্ট নির্দেশে মহিমময়। সুতরাং এ-কথা নিঃসংশয়ে বলা যাবে যে, একই আধারে গার্হস্থ্য-সন্ন্যাসের আদর্শ, কর্মজ্ঞান-যোগ-ভক্তির সমন্বয়-সমৃদ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর সমস্যা-সঙ্কুল আধ্যায়িকার আকস্মিক কোন ঘটনা নয়। পরন্তু, ঐতিহাসিক ক্রমপর্যায়ে অনাগত উত্তরকালে বিশ্ব-সংস্কৃতির গতিপথ-নির্ধারণে

সেটি একটি একটি সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত ঘটনা।

পূর্বগ অবতারগণের প্রত্যেকেই জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি কোন-না-কোন ভাবসাধনার চরমোৎকর্ষ নিজ জীবনে সাধন করে তারই গণ্ডীর মধ্যে কাজ করে গেছেন। কিন্তু সর্ব-বন্ধনবিনির্মুক্ত অথচ সর্বভাব-প্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের মত এমন সম্পূর্ণ, সর্বতোভদ্র, প্রতিনিধি-স্থানীয় জীবন জগতে আর কখনো আবির্ভূত হয়নি। এমন সকল দিকে, সর্বভাবে মুক্ত পুরুষই জগৎ ইতঃপূর্বে আর কখনো প্রত্যক্ষ করে নি। যে-বিশেষ পুরুষ-দেহটি ধারণ করে তিনি আমাদের এ-হাসি-কান্নার পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিলেন, যাঁর সার্ধ-তিনহস্ত-পরিমিত পরিধিকে আশ্রয় করে এবারে তাঁর বিচিত্র লীলা রূপায়িত হয়েছিল সে দেহের গণ্ডী এবং সাধারণ প্রকৃতিতেও তিনি নিজকে আবদ্ধ রাখেন নি। স্ত্রীভাবে সাধনকালে স্ত্রীজনোচিত অঙ্গ-বিকার তাঁতে পরিলক্ষিত হয়েছিল। হনুমানভাবে সাধন করবার সময় তদনুরূপ অঙ্গবিকৃতি তাঁতে পরিস্ফুট হয়েছিল। প্রেম ও করুণার অভাবনীয় প্রেরণায় সর্ব ভৌগোলিক পরিধি চূর্ণ করে বিগত কালের সকল অভিজ্ঞতা ও অনুভূতিকে অতিক্রম করে জীবজগৎ এবং উদ্ভিদ্‌জগতের সর্বপর্যায়ের সঙ্গে একাত্মানুভূতিতে তিনি মর্ত্যলোকে স্বর্গের ছায়া আকর্ষণ করেছিলেন। 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্‌' এ-তত্ত্ব তাঁর জীবনে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের মত সহজ হয়েছিল, স্বাভাবিক হয়েছিল। তাঁর আনন্দময়, অবাধ, মুক্তজীবনের চতুষ্পার্শ্বে কেবল একটিমাত্র গণ্ডী অদৃশ্য রেখায় অঙ্কিত ছিল বলে মনে হয়। সে-গণ্ডী বাঙ্গালা ভাষার, সে-গণ্ডী বঙ্গের জীবনধারার। দেখা যায়, বাঙলা ভাষার মাধ্যমকে তিনি আজীবন স্বীকার করেছেন ভাবপ্রকাশের যন্ত্ররূপে, সহায়রূপে। আবার বঙ্গ-সংস্কৃতির চিরাচরিত বিধি-বিধান-গুলোকেও মোটামুটি ভাবে তিনি মেনেই নিয়েছিলেন নিজের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজনাদিতে। বাঙলার বুকে আধুনিক কালে যে-দুই লোকোত্তর পুরুষের আবির্ভাব হয়েছে—তাঁদের উভয়েরই সম্পর্কে এ-মন্তব্য সমভাবে প্রযোজ্য। আমরা শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়ের কথা বলছি। অভিশপ্ত ও আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতির সম্মুখে আজ যে জীবন-মরণ সমস্যা নির্মম মূর্তিতে প্রকটিত তার অন্তরালে ঐটুকুই বোধ করি আশার একমাত্র ক্ষীণ জ্যোতিঃ-রেখা। 'অবিতথফলা হি মহাপুরুষাণাং ক্রিয়াঃ।'

অতএব, যে-দিক দিয়েই বিচার করি এ-বিচিত্র রহস্যময় জীবনটিকে যথার্থ ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে, বৈজ্ঞানিক মনোভাব নিয়ে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। শুদ্ধমাত্র কোন দেশবিশেষ বা জাতিবিশেষের আত্মিক ও মানসিক চেতনা জাগ্রত করবার জন্যই যে তিনি জন্মপরিগ্রহ করেছিলেন এ-কথা সর্বাংশে সত্য নয়। 'যত মত, তত পথ'-রূপ যে-সত্য ধর্মের একদেশদর্শী দোষ দূর করবার জন্য তিনি আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে সচরাচর কথিত হয়ে থাকে, সেও তাঁর অবদান-শতকের অন্যতম ভিন্ন আর কিছু নয়। পরন্তু ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত, জাতিগত ও অন্তর্জাতিগত ক্ষেত্রে এক নূতন জীবনদর্শনের প্রতিষ্ঠাকল্পে ধর্মের প্রয়োগ-কৌশলটি কার্যকর ভাবে প্রকাশ করে স্বর্গের দেবতা ও বনের বেদান্তকে আমাদের মাটির পৃথিবীতে সুখ-দুঃখের গৃহকোণটিতে আনয়ন করে তাকে একান্ত ভাবে আমাদের নিজস্ব সম্পদ্‌রূপে, অন্তরের বস্তুরূপে ফুটিয়ে তুলতে এবং সর্বোপরি 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'—এ-বাণীকে

জীবন্ত ও জাগ্রত করে তুলতেই যেন তিনি বিশেষভাবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। ধর্ম যে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কয়েকটি মামুলি নীতি-কথার সমষ্টি নয়, জীবনের সকল দিক্ ও পর্যায়কে বিধৃত করবার শক্তি যে সে সত্যি ধারণ করে, অনুভূতিই যে তার প্রাণ, ইহজীবনের ও পরজীবনের কল্যাণকল্পে ঠিক ঠিক প্রয়োগেই যে তার সার্থকতা—অতীতে ও বর্তমানে যোগসূত্র-স্থাপন করে এ-কালে তাই তিনি দেখিয়ে গেছেন। আমাদের জীবনের ঋজু-কুটিল যাত্রা-পথে আশার শুভ আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করে এ-সদানন্দময় পুরুষ নিরাশপ্রাণে কর্মের অভয় প্রেরণা জাগ্রত করেছেন।

বাক্-সর্বস্ব ও বহুলপ্রচার-বিশ্বাসী বর্তমান যুগে, যে-যুগে কার্যতঃ একখানা করে দশখানা প্রকাশে মানুষ নিয়ত ব্যাপৃত, মিথ্যা-সত্যমিশ্রিত প্রোপাগাণ্ডায় নিরন্তর ক্রিয়াশীল, সে-যুগে শুদ্ধ-মাত্র আচরণদ্বারা, উপলব্ধিদ্বারা সকল তত্ত্ব ও সত্যকে তিনি প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। বহুপ্রসঙ্গে, বহুজনকে তিনি বলেছেন—'ফুল ফুটলে ভ্রমর আপনি এসে জোটে। নিমন্ত্রণ পাঠিয়ে তাকে আর ডেকে আনতে হয় না।'··· কাজেই, আপনার অন্তর-কুসুমটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে, শোভন করে ফুটিয়ে তোলাই মানুষের সর্বোত্তম সাধনা। তা না করতে পারলে—লোকে তোমার কথা শুনবে কেন? তোমার কথা নেবে কেন? ···'মন মুখ এক করাই কলির সাধনা'—সেটি হলেই সত্যস্বরূপ ভগবান তোমার অন্তরে অধিষ্ঠিত হবেন, তোমার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হবেন।······

কোন বিশেষ ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে কখনো তিনি প্রকাশ করেন নি, কোন বিশেষ মতবাদও তাঁর নিজস্ব মত বলে চিহ্নিত হয়নি। পরন্তু, সকল দেশের জন্য, সকল কালের জন্য এক কালাতীত ও ভাবমুখ-স্থিত জীবনই তিনি যাপন করে গেছেন এবং তারই ভিত্তিতে এক সর্বমত-সমঞ্জস উদার সাম্যবাদ স্বতঃ প্রচারিত হয়েছে, প্রতিষ্ঠা-লাভ করেছে। তিনি বলেছেন,—'সবাই নিজের মতটাকেই বড় করে গেছে, যে সমন্বয় করেছে সেই তো লোক।' বলেছেন,—যে ক্ষুদ্র, অপরিসর, দুঃখ-সুখের কুক্ষিগত আমাদের দু'দিনের জীবন জন্ম-মৃত্যুর আবর্তে নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে, সেটিই জীবনের সবখানি নয়। তার পশ্চাতে আর এক শাশ্বত সুগভীর জীবনমন্দাকিনী কল্প থেকে কল্পান্তরে নিরবধি বয়ে চলেছে। ব্রহ্ম থেকে অভিন্নরূপে চির-অবিনশ্বর সে জীবন-প্রবাহের প্রকৃত অর্থানুভূতিতে, যথার্থ উপলব্ধিতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতি এক প্রীতিবদ্ধ মানব-সমাজ গঠন করতে পারে এবং যে-সকল পরস্পরবিরোধী ভাব ও চিন্তা জাতি থেকে জাতিকে, এক সম্প্রদায় থেকে আর এক সম্প্রদায়কে এতকাল ধরে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে, বিবদমান করে রেখেছে—তাদের সম্যক্ নিরাকরণে এক সুন্দর ও শান্ত নবযুগের উদ্বোধন ঘোষণা করতে পারে। তাই দেখা যায়,—তাঁর দেহত্যাগের অত্যল্পকাল মধ্যে চিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকা-নন্দের কণ্ঠোত্থিত অপূর্ব সমন্বয়বার্তা সমগ্র সভ্যজগতের চিন্তাক্ষেত্রে মুহূর্তে এক অচিন্ত্যপূর্ব আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। বহু কালান্তরে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ আজকের পৃথিবীতে দাঁড়িয়েও আকাশে কান পেতে তারই দূর প্রতিধ্বনি আমরা যেন শুনতে পাচ্ছি···

"If there is ever to be a universal religion it must be one which will have no location in place or time, which will be infinite like the God it will preach. . It will be a religion which will have no place for persecution or intolerance in its polity, which

will recognise divinity in every man and woman and whose whole scope, whose whole force will be centred in aiding humanity to realise its own true divine nature".

বস্তুতঃ, উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বস্তুতান্ত্রিক মতবাদের ভিত্তি মথিত করে মানব-ধর্মের নূতন স্বীকৃতিতে যে প্রবল ও ডাইনামিক্ ধর্মান্দোলনের সূত্রপাত হয়েছে সাম্প্রতিক কালে, যে আত্মসুখ-পরায়ণ, দানবীয় সভ্যতার প্রভাবে সমগ্র মানব-গোষ্ঠী আজ সম্মোহিত—তাকে বিধ্বস্ত করে, অপসারিত করে প্রেম ও পরার্থপরতার মন্ত্রে নূতন সংস্কৃতি ও সভ্যতা গড়ে তুলবার জন্য যে নূতন জীবন-দর্শন শনৈঃ শনৈঃ আত্মপ্রকাশে নিরত, শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবময় দিব্যজীবনটিই লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে অব্যর্থপ্রক্রিয়ায় তাকে নিয়মিত করছে। অন্ধজন হয়ত তাকে দেখ্তে পাচ্ছে না, কিংবা দেখেও স্বীকার করতে প্রস্তুত নয়, কিন্তু চক্ষুষ্মান মনীষিগণের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির সম্মুখে সে তথ্য আজ আর রহস্যাবৃত নয়, সন্দেহজড়িত নয়। সাহিত্য, দর্শন, শিক্ষা প্রভৃতি সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে আজ যে নব-চেতনা ও নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ক্রিয়াশীল তাদের প্রবাহ এবং মর্মার্থ বিশেষভাবে অনুধাবন করলেই সে-কথা নিঃসংশয়ে বোঝা যাবে।

আজ তাই দীর্ঘ কালান্তরে সমস্যাপীড়িত বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত আমরা প্রণতি জ্ঞাপন করি। একদা মানব-সভ্যতার স্বর্ণাভ উষায় যে-অশরীরী প্রগতির বাণী অনুপম ছন্দগাথার অবাচ্য সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ প্রথম ব্যক্ত করেছিল, যে-সুগভীর আনন্দোপলব্ধির মধ্য দিয়ে জীবনের চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি-লাভের অভ্রান্ত কৌশলটি সে ব্যক্ত করেছিল সভ্যতার উষাকালে···চলাই হ'ল অমৃতত্ব-লাভ, চলাই তার স্বাদুফল। সূর্যদেবতা সৃষ্টির আদি থেকে আজ পর্যন্ত চলার পথে কখনো থামেনি, কখনো বিশ্রামের অবকাশ গ্রহণ করে নি—তাই তো এত আলো, এত ঔজ্জ্বল্যের সমারোহ—অতএব এগিয়ে চল, এগিয়ে চল।···

সেই সুপ্রাচীন প্রগতি-বাণীর সুস্পষ্ট প্রতিধ্বনিই ধর্মের ডাইনামিক্‌রূপের মধ্য দিয়ে, অনলস সাধনা ও ভৌগোলিক পরিধি-নিরপেক্ষ উদার প্রেমদৃষ্টির মধ্য দিয়ে এ-যুগে নব-রূপে শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনালোকে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রেম-সম্পদে সমৃদ্ধ, ত্যাগদীপ্ত তাঁর অমোঘ জীবনী ও বাণী আজ তাই পূর্ব গোলার্ধের এক প্রান্ত থেকে পশ্চিম গোলার্ধের অপর প্রান্ত পর্যন্ত উন্মুখ ও পিপাসী মানবমনের সকল সংশয়-সমস্যার নিরাকরণোদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ফাল্গুনী শুক্লা দ্বিতীয়ার আজকের পুণ্যদিনে তাঁর নিশ্চিত শুভ-আশীর্বাদ কামনা করে আমরা তাই বলছি;··· হে মহাভাগ, হে যুগদেবতা—হিংসায় উন্মত্ত আজকের তমসাচ্ছন্ন পৃথিবীতে সার্থক হোক তোমার উদার ও সার্বভৌম বাণী। ভারতবর্ষের যা সাধনা, ভারতবর্ষের যা আরাধনা ও আধ্যাত্মিক সঙ্কল্প তা পূর্ণ হোক, পুণ্য হোক তোমার অভিনব দিব্যজীবনের মাধ্যমে। একদা···

রিক্তা এই ধরিত্রীরে পরিপূর্ণ করি,
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ কালে—
প্রাচীর আকাশপট বর্ণে উদ্ভাসিয়া
ঘটেছিল তোমার উদ্ভব।

তোমার প্রেমের ধারা, জাতি বর্ণ
না করি বিভেদ,
গোলার্ধের সর্ব প্রান্ত স্নিগ্ধ করেছিল—
অভিনব সাম্যমন্ত্র বিশ্বে প্রচারিয়া।

আজি তব জন্মতিথি জগতের দ্বারপ্রান্তে
ঋতুচক্র-আবর্তনে এসেছে আবার।
করি নমস্কার, করি নমস্কার!

তোমার পরমবাণী, অক্ষয়-সাধনা
চিন্তার অবাধক্ষেত্রে - অদৃশ্য, অমোঘ চিত্রে
ভাবিকাল-ইতিহাস করিছে রচনা।
তোমার জীবন-বেদ যুগ-ভাষ্য নিয়া—
ব্যক্ত হোক, হোক সব জানা—
ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়াতে—
এই মম রহিল প্রার্থনা।

গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

আবাল্য তাপস, আজীবন অনাসক্ত, চিরজীবন স্নেহ-শ্রদ্ধা-প্রেমময় গদাধর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী কি সন্ন্যাসী এ নিয়ে মতভেদ আছে। থাকবেও। তাঁর অপূর্ব জীবনাদর্শ বুঝবার শক্তি আমাদের নেই। বৃহস্পতির ন্যায়-জ্ঞানী স্বামী বিবেকানন্দ বলতেন, ঠাকুরকে সম্যক বুঝিনি ব'লেই তাঁর কথা বলতে ভয় পাই। কি জানি যদি আমার বলার অক্ষমতায় তাঁকে ছোট করে ফেলি।

ঠাকুর স্বামিজীকে বলতেন, সাক্ষাৎ সর্বত্যাগী শঙ্কর; বিবেক-বৈরাগ্যের গৈরিক পতাকা সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ঠাকুরকে বলতেন, ত্যাগীর বাদশা।

পাশ্চাত্য মনীষী রোমাঁ রোলাঁ, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের অন্যতম জীবনী-গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "The man whose image I here evoke was the consummation of two thousand years of the spiritual life of three hundred million people. He was a little village Brahmin of Bengal, whose outer life was set in a limited frame without striking incident...But his inner life embraced the whole multiplicity of men and Gods...."

—দু'হাজার বৎসর ধরে প্রগতিপরায়ণ ত্রিশ কোটি মানবাত্মার অক্ষুণ্ণ আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টার পূর্ণ বিকাশ। চরম স্ফুরণ। শেষ কথা।...বহু মত ও পথের মিলন-মন্দির। বহু রূপ রস রশ্মির মিলিত বিকাশ। আর্ত মানবাত্মার ডাকে যুগে যুগে যিনি আসেন, তিনিই এসেছিলেন হিন্দুর ধর্ম ও সমাজ-জীবনের এক সঙ্কটক্ষণে। কে তিনি, কেন আসেন জানি না, বুঝিও না। আমার মধ্যে হিন্দুরক্ত, আমার সংস্কার উদাত্ত কণ্ঠে বলে, তিনি আছেন, তিনি আসেন। যখনই যেখানে খড়্গ তুলে দাঁড়ায় দানব, তখনই সেখানে দেবমানব-রূপে নেমে আসেন তিনি আর্তকে বাঁচাতে, দানবকেও পথ দেখাতে, অখণ্ড আত্মার অগ্রগতি অব্যাহত রাখতে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় বিশৃঙ্খলতার ফলে সব চেয়ে বেশী ভেঙে পড়েছিল হিন্দুর গার্হস্থ্য-জীবন, হিন্দু জনসাধারণের ধর্মবিশ্বাস, ধর্মানুরাগ, সামাজিক নিষ্ঠা, আত্মসংযম। অযোধ্যার যে রাম লক্ষ্মণ ভরত হিন্দু গৃহীর ঘরে ঘরে সজীব ক'রে রাখতেন রামায়ণ, ধরার মেয়ে যে সীতা উঁচিয়ে রাখতেন হিন্দু-কৃষ্টির অনবনত পতাকা, পাশ্চাত্য দশাননের ভাঁওতায় হিন্দু ভুলে গেল তাঁদের জীবনাদর্শ, তাঁদের বিচিত্র আত্ম-বৈশিষ্ট্য, তাঁদের ঐতিহ্য। স্বধর্ম ছাপিয়ে স্ব-মত ও স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা হলো বড়। সবাই ভুলে গেল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদাত্ত নির্দেশ, স্বধর্মে নিধন শ্রেয়, পরধর্ম ভয়াবহ।

ভুলে গেল, জগন্মাতা মানে আমার-ই মা নয়, সবার-ই মা। ভগবান শুধু আমার-ই মন্দিরে নয়, রয়েছেন মসজিদেও, চার্চেও। ভুলে গেল যে প্রদীপ জ্বলে আলো দেয় সে তার নিজের অঙ্গ পুড়িয়ে ছাই করে পরের সেবায়।

আত্মবিস্মৃতির ফলে বিষিয়ে গেল হিন্দু-গৃহীর জীবন, ধ্বসে পড়লো গৃহের বনেদ। বিপন্ন মানবাত্মা আর্তনাদ ক'রে ডাকলো, 'ঠাকুর বাঁচাও!' বিপন্ন গৃহীর ডাকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এলেন

গৃহীকে দেখাতে জীবনাদর্শ, সন্ন্যাসীকে দেখাতে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ। গৃহীকে শেখাতে সহজ ধর্মানুরাগ, সন্ন্যাসীকে শেখাতে সহজ সাধনা। গৃহীকে শেখাতে আত্ম-উন্নয়ন, সন্ন্যাসীকে শেখাতে আত্ম-সংযম।

রাজর্ষি জনক, রঘুপতি রাম, কি পরমপুরুষ কৃষ্ণের মতোই বলবো, না বলবো চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে তাঁদের চেয়েও উচ্চাঙ্গের জীবনাদর্শ অনন্যসাধারণ জ্ঞানী, নিরক্ষর, নিঃসম্বল, গৃহী শ্রীরামকৃষ্ণ। অন্তরে অম্লান সন্ন্যাস, অপূর্ব অনাসক্তি সত্ত্বেও তিনি অকুণ্ঠ ভাবে জীবন যাপন করেছেন গৃহে, আদর্শ গৃহীর বেশে, সহজ গৃহস্থের পরিবেশে। অশান্ত গৃহীর সংসার-বিতৃষ্ণা দেখে বলেছেন, 'মাগ-ছেলেকে কি পাড়াপড়শীরা খেতে পরতে দেবে গা?' চরম বৈরাগ্যের স্তরে এসে জগন্মাতাকে বলেছেন, 'মা, আমার রসে বশে থাকতে দে মা। আমি শুকনো নীরস হতে চাই নে।'

গৃহী ভক্তদের বলেছেন, 'গৃহে থেকেই ডাক না। পাঁকাল মাছের মতো থাক। মাঝে মাঝে নির্জনে বসে তাঁর ধ্যান কর।'

কঠোরতম বৈদান্তিক সন্ন্যাসী ব্রহ্মজ্ঞ তোতা-পুরীর প্রিয়তম শিষ্য রামকৃষ্ণ, সর্বত্যাগী শঙ্করের পূর্ণ প্রতীক নরেন্দ্রের গুরু, স্বামী বিবেকানন্দের স্রষ্টা রামকৃষ্ণ, আবার তিনিই জননী চন্দ্রমণির আদরের দুলাল গদাই, কামারপুকুরে গৃহদেবতা রঘুবীরের আবাল্য পূজক গদাধর, ঝামাপুকুরের যজমানগৃহে প্রিয় পুরোহিত ছোট ভট্‌চাজ, দক্ষিণেশ্বরে ভবতারিণী শ্যামার পাগল পূজারী রামকৃষ্ণ, জানবাজারে রাসমণির অন্দর-মহলে রমণীর বেশে পরিহাস-চতুর রসিক 'বাবা', শ্রীশ্রীমা সারদামণি দেবীর প্রেমময় স্বামী।

পিতা-মাতার প্রতি রামকৃষ্ণের আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তির তুলনা নেই। সহোদর-সহোদরা, ভাইপো-ভাগ্নে, স্বজন-বান্ধবদের প্রতি তাঁর স্নেহ-মমতাও ছিল অপরিসীম। চিরজীবন সংসারীর সামাজিক কর্তব্য তিনি অকুণ্ঠ চিত্তেই পালন করেছেন। ভক্তদের মধ্যে কারও এসব গৃহীর কর্তব্যের ত্রুটি বা অবহেলার কথা শুনলে তিনি কঠোর ভাবে সমালোচনা করেছেন।

গৃহ-সংসারের প্রতি বীতরাগ হাজরা মহাশয় দক্ষিণেশ্বরে এসে ছিলেন। গীতা-ভাগবত পাঠ করতেন। সাধন-ভজনও করতেন। অন্তিম সময়ে হাজরার মা ঠাকুরের ভাইপো রামলালকে দক্ষিণেশ্বরে আসবার সময় অনেক ক'রে ব'লে দিলেন, রামকৃষ্ণকে ব'লো, হাজরাকে যেন ব'লে ক'য়ে একটিবার পাঠিয়ে দেয়। ওকে একটিবার দেখতে বড্ড সাধ হচ্ছে। রামকৃষ্ণ হাজরাকে ডেকে বললেন। হাজরা গেলেন না। কেঁদে কেঁদে পুত্রস্নেহ-কাতরা বৃদ্ধা হাজরার মা মারা গেলেন। শুনে চটে রামকৃষ্ণ বললেন, ...মা কেঁদে কেঁদে মরে গেল, ও আবার গীতা পড়ে, ধর্ম-সাধনা করে।

দেবমানব-জ্ঞানে পিতাকে শ্রদ্ধা করতেন রামকৃষ্ণ। ঠাকুরের পিতা পরম ভক্ত ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় 'শান্ত' ভাবে গৃহদেবতা রঘুবীরের সেবা করতেন। ক্ষুদিরামের একান্ত সেবায় প্রীত হয়ে নারায়ণ ক্ষুদিরামকে বাৎসল্য-ভাবেও তাঁর সেবা করবার সুযোগ দিয়েছিলেন। পিতার প্রসঙ্গ উঠলে রামকৃষ্ণ মৌন হয়ে যেতেন। এমনি গভীর ছিল পিতার প্রতি ভক্তি। ইষ্টের মতো তাঁর কথা যেন আলোচনার যোগ্য নয়। বহু উর্ধ্বে তাঁর স্থান।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও মাকে ছেড়ে, কামারপুকুর ছেড়ে অগ্রজ রামকুমারের সেবা ও সাহায্য করতে রামকৃষ্ণ কলকাতায় ঝামাপুকুরে আসেন। সে সময় সারা দিন যজমানদের বাড়ী পূজায় অক্লান্ত শ্রম করেও বাড়ী ফিরে স্বহস্তে রান্না ক'রে দাদাকে খেতে দিতেন,

নিজেও খেতেন। দাদার শ্রম লাঘব করতে ঘরকন্নার সব কিছুই ঠাকুর নিজের হাতে করতেন। বেদান্ত-সাধনার পর একবার সিহড়ে এলেন, ভাগ্নে হৃদয়ের মা হেমাঙ্গিনী দেবীকে দেখতে। রামকৃষ্ণের পিসতুত বড় বোন তিনি। গুরুজন। রামকৃষ্ণ পায়ের ধুলো নিতে গেলেন। হেমাঙ্গিনী দেবী সভয়ে পা সরিয়ে বললেন, 'ওকি ওকি ? তুই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ।' রামকৃষ্ণ হাসিমুখে বললেন, 'তুমি যে দিদি। গুরুজন।'

হেমাঙ্গিনী বলে ফেললেন, 'তবে বল্ আমি যেন তোর স্বরূপ দেখতে দেখতে মরি।'

রামকৃষ্ণ তেমনি হেসে বললেন, 'তা তুমি দেখতে চাও তো দেখবে। এখন তো পায়ের ধুলো দাও।'

ভাগ্নে হৃদয় ছিল ঠাকুরের আবাল্য সহচর। সিহড়ের বাড়ীতে দুর্গোৎসব করলো হৃদয়। বললো, 'মামা, তোমাকে যেতেই হবে সিহড়ে।' মথুরের বাড়ীতেও মায়ের পূজার সমারোহ। ঠাকুরকে ছাড়লেন না মথুর। মথুর ভক্ত। হৃদয় ভাগ্নে। মথুরকে সন্তুষ্ট করতে রামকৃষ্ণ সশরীরে রইলেন জানবাজারে। ভাগ্নের সাধ মেটাতে পূজার তিন দিন সূক্ষ্ম দেহে উপস্থিত থাকলেন সিহড়ে।

গুরুতর অপরাধের দরুন মথুরের ছেলে হৃদয়কে বা'র ক'রে দিলেন দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ী থেকে। ঢুকতে পেতো না হৃদয়। মাঝে মাঝে ফটকের বাইরে থেকে মামার সঙ্গে দেখা করতো। আক্ষেপে কাঁদতেন রামকৃষ্ণ হৃদয়ের জন্য। জগন্মাতাকে বলতেন, 'মা, ওর ভালো কোরো। ও আমায় পীড়ন করেছে খুব, সেবাও করেছে খুব।'

কেশবের অসুখ। শয্যাগত। দক্ষিণেশ্বরে আসতে পাবেন না কেশব। রামকৃষ্ণের মন কেমন করে। নিজেই যান কেশবের বাড়ী। কেশবের বাড়ী যাওয়ার পথে বাগবাজারে সিদ্ধেশ্বরী মায়ের বাড়ী গিয়ে মায়ের দোরে মাথা খুঁড়ে বললেন রামকৃষ্ণ, 'কেশবের ভালো কর মা। আমি তোমার ডাবচিনি দিয়ে পুজো দেব।' সরল বিশ্বাসে ঠাকুর-দেবতার চরণে এই কাতর মিনতি, এই মানত করা, এই তো চিরন্তন গৃহী মানব-মনের চরম পরিচয়!

রামকৃষ্ণের মাতৃভক্তি বর্ণনাতীত। অকপট মাতৃভক্তিই হয়ত তাঁর জীবনের অনন্যসাধারণ সাফল্যের প্রাণশক্তি। মহর্ষি ব্যাস বা বাল্মীকি কেউই এরূপ আদর্শ মাতৃভক্ত সন্তানের চরিত্র চিত্রণ করতে পারেন নি।

সাক্ষাৎ জগদম্বা-জ্ঞানে রামকৃষ্ণ মা'কে শ্রদ্ধা করতেন। অথবা জননীরই পূর্ণ বিকাশ তিনি দেখেছিলেন জগজ্জননীর মধ্যে। শৈশবে বৃদ্ধা জননীকে গৃহ-কর্মে সাহায্য করতেন রামকৃষ্ণ। বেদান্ত-মতে সাধনার পূর্বে আত্ম-তর্পণ ক'রে ব্রহ্মোপলব্ধির পরও প্রত্যহ নিদ্রাভঙ্গের পর প্রথম মায়ের পদধূলি মাথায় ও সর্বাঙ্গে মেখে কুশল-প্রশ্ন করতেন। কতবার বলেছেন, 'মা'কে দুঃখ দিলে ঈশ্বর-ফীশ্বর সব বিগড়ে যায়। অকারণেও মায়ের চোখে জল পড়লে ভগবান বিমুখ হন।'

শৈশবে এক দিন কামারপুকুরের অতিথিশালায় সমাগত সাধুদের সাধ মিটিয়ে পরিধেয় বসন ছিঁড়ে কৌপীন পরেছিলেন রামকৃষ্ণ। দেখে চন্দ্রমণির চোখে জল এলো। আদরের ছেলে তো! কোনও মা দেখতে পারেন না সন্তানের সন্ন্যাসি-বেশ। মা'কে কাতর দেখে বালক রামকৃষ্ণ তক্ষুনি কৌপীন ছেড়ে ফেলে বললেন, 'আর পরবো না মা, কেঁদ না তুমি।'

সতের আঠারো বছর বাদে, বেদান্ত-সাধনের পূর্বে সন্ন্যাসী গুরু তোতাপুরী বললেন, 'গৈরিক পরতে হবে···'

রামকৃষ্ণ বললেন, পারবো না। আমার মা রয়েছেন নহবত-ঘরে। গেরুয়া-পরা দেখলে মা কাঁদবেন। মাকে কাঁদাতে পারবো না।

মেজ ভাই রামেশ্বরের মৃত্যুর সংবাদ এলো দক্ষিণেশ্বরে। জননী চন্দ্রমণি তখন সেখানে। বৃদ্ধা শোক-তাপ-রোগজীর্ণা। রামকৃষ্ণের সে কী উদ্বেগ! মা কালীর মন্দিরে গিয়ে কাতর প্রার্থনা জানালেন যাতে জননী এই আঘাত সহ্য করবার মতো শক্তি পান। দিব্যজ্ঞানী যিনি তাঁরও মনে মায়ের জন্য কী শিশুর ব্যাকুলতা, আকুল কাতরতা!

সুদীর্ঘ ছ'মাস নিরন্তর অদ্বৈতভাবভূমিতে থেকে অসুস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। শরীর সারাতে এলেন দেশের বাড়ীতে কামারপুকুরে। সঙ্গে এলো হৃদয়, শক্তি-সাধনার গুরু ভৈরবী ব্রাহ্মণী।

জয়রামবাটী থেকে মামীকে নিয়ে এলো হৃদয়। প্রথম সজ্ঞানে শ্বশুরবাড়ী এসে দেব-দুর্লভ স্বামীকে দেখলেন পূর্ণযুবতী সারদামণি। রামকৃষ্ণ সাগ্রহে সযত্নে পত্নী সারদামণিকে শেখালেন, প্রদীপের সলতে পাকানো, গুরুজনদের সেবা করা, ঘর নিকানো, সাঁজের প্রদীপ জ্বালানো, ত্রি-সন্ধ্যায় ধুনো দেওয়া, শাঁক বাজানো, অতিথি-অভ্যাগতের সমাদর করা এই সব। সব-ই জানতেন তো রামকৃষ্ণ। দিনের পর দিন আদর্শ গৃহিনীর নিত্য কর্তব্য কর্ম নিজে-ই তিনি শেখালেন সরলা সহধর্মিণীকে। ব্রহ্মচারিণী ভৈরবীর ভালো লাগতো না এ-সব। এ কি! গৃহী সংসারীর মতো স্ত্রীর কাছে কাছে থাকা! স্ত্রীর সঙ্গে মেলামেশা! বললেন, রামকৃষ্ণ, এতে পতন হবে তোমার। সাবধান।

রামকৃষ্ণ স্বভাবসুলভ রসিকতায় বললেন, তাকি হয়! বুড়ি ছুঁয়েছি তো।

মথুর মারা গেছেন। রামকৃষ্ণ রয়েছেন তখনও দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরবাড়ীতে। হৃদয়কে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আপনভোলা রামকৃষ্ণের সেবা-যত্নের ত্রুটি হয়। গভীর রাত্রিতে এক দিন পিতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে এলেন সতী সাধ্বী সারদামণি। পথশ্রমে অবসন্না, গায়ে প্রবল জ্বর।

দেখেই রামকৃষ্ণ বললেন, এত দিনে তুমি এলে? আর কি আমার সেজ বাবু আছে যে তোমার সেবাযত্ন হবে?

মথুর নেই, রাণী রাসমণি নেই। ঠাকুরবাড়ীর তখনকার কর্তাদের এসব দিকে ওঁদের মতো টান নেই। রুগ্না স্ত্রীর জন্য, তাঁর ঔষধ-পথ্য, সেবা-যত্নের জন্য রামকৃষ্ণের সে কী দুশ্চিন্তা! রুগ্না পত্নী জগদম্বার জন্য মথুর এসে রামকৃষ্ণের পায়ে পড়েছিলেন। ভক্ত মথুরের কাতর প্রার্থনায় রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, যাও, তোমার স্ত্রী সেরে উঠবে। বাড়ী ফিরে মথুর দেখলেন, শয্যাগতা মুমূর্ষু জগদম্বা বিছানায় উঠে বসে বেশ কথা বলছেন। দু'দিনও দেরী হয়নি যাঁর মুখের কথা ফলতে, তিনি পারতেন তো নিমেষে সারদামণির রোগ সারিয়ে তাঁকেও সুস্থ করতে। তা নয়। প্রেমময় গৃহী স্বামীর মতো রুগ্না স্ত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করলেন অকাতরে। দেখে শুনে, দু'চার দিন থেকে সারদার পিতা দেশে ফিরলেন। গাঁ'ময় বলে বেড়ালেন, কে বলে জামাই আমার ছন্নছাড়া খামখেয়ালী? চোখে-ই তো দেখে এলাম হাজারে এক জন মেলে না এমন আদর্শ স্বামী।

সারদা সুস্থা হয়েছেন। নহবত-ঘরে শাশুড়ীর কাছে থাকেন। রামকৃষ্ণের ঘরে এসে তাঁর বিছানা পেতে দেন, পেটরোগা স্বামীর জন্য শুকতো, মাছের ঝোল রেঁধে দেন। সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালান, ধুনো দেন। স্বামীর ঘরে এটুকু সেটুকু করেই তাঁর তৃপ্তি। দূরে থেকে, ফাঁকে ফাঁকে দিনে রেতে

এক আধ বার স্বামীকে দেখেই তাঁর কী আনন্দ! সতী সারদার পায়ে পড়ে স্বয়ম্ভু শিব রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, দেখ, আমি জানি সকল রমণী-ই আমার জননী। তথাপি তোমার ধর্ম-সঙ্গত অধিকার আমি স্বীকার করতে বাধ্য। তুমি আমার স্ত্রী। এখন তুমি যা' বলবে আমি তা-ই করতে প্রস্তুত।

সারদাও সারদা-ই তো। নির্ধূম হোমানল। তাড়াতাড়ি পা সরিয়ে সারদা বললেন, আপনাকে জোর ক'রে সংসারী করবার ইচ্ছা আমার নেই। আমি কেবল কাছে থেকে আপনার সেবা করতে চাই। আপনার কাছে সাধন-ভজন শিখতে চাই। হলোও তাই। সারদামণি-ই হলেন রামকৃষ্ণের প্রধানা শিষ্যা। সেবায় মমতায় জননী, সাধনায় সহধর্মিণী, অগণিত ভক্ত সন্তানের পথ-নির্দেশ করতে লোকাতীত ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তিমতী বাণী। প্রাতঃস্মরণীয়া শ্রীশ্রীমা।

ওঁকার উচ্চারণ করতে করতে দেব-মানব শ্রীরামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। পরদিন স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ভক্ত তাঁর দেহ সংকার করলেন। হিন্দু বিধবার চিরাচরিত নিয়ম পালন করতে সতী শ্রীমা হাতের শাঁখা খুলে ফেললেন,...দেখলেন লোকাতীত লোকনাথ স্বামী সামনে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বলছেন, খুলছো কেন গা? আমিও মরিনি, তুমিও বিধবা নও। তোমার আমার সম্পর্ক তো জন্ম-জন্মান্তরের...অটুট, অবিচ্ছেদ্য।

হিন্দুর ঘরে ঘরে ওঁরাই তো স্মরণাতীত কাল থেকে চিরবরেণ্য সীতা-রাম।

শাশ্বত গৃহী ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ...শাশ্বতী গৃহিণী শ্রীশ্রীমা।

তুমি

শ্রীচিত্ত দেব

আমারি মাঝে রয়েছ তুমি
রয়েছ মন জানে
তবুও খুঁজি পাগল আমি
জানিনে কোন্‌খানে।
কোন্ গভীরে অন্ধকারে
কোন্ সে পদ্মতলে
দেখেছি মোর হরিণ-চোখে
তোমারি আলো জলে।
এ-নয় স্বপন, পরশ-রতন
পেয়েছি আমি কভু
তোমার সাথে মিলন পুনঃ
হবে না কিগো তবু!

তুমি কি শুধু প্রতিমা সেজে
নীরব হয়ে রবে
হৃদয় নিয়ে বেদনা দিয়ে
ছলনা সে-যে হবে!
হাত বাড়ালে পেতাম যদি
বাড়াইনি কি হাত
এমনি কত জবাবদিহি
ঘুম না-জানা রাত।
জানিনে ঘুমোই কিংবা জাগি
তোমারে মনে রেখে
এ-শুধু জানি আমারে তুমি
রাঙাও থেকে থেকে।
তোমার প্রেম-অনল-তাপে
আমি কি তলে তলে
মোমের মতো গলছি শুধু
দু'টি নয়ন জলে!

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী, কাব্যশ্রী

অখ্যাত আর অজ্ঞাত এক পল্লী-কুটীর মাঝে,
তুমি এসেছিলে স্বর্গের দ্যুতি ক্ষুদ্র শিশুর সাজে।
চন্দ্র-বয়ানে অপরূপ হাসি, দেহে লাবণ্য-জ্যোতি,
তোমারে অঙ্গে ধরিয়া জননী হলেন ভাগ্যবতী।

কেহ জানে নাই কোন্ শুভদিন সে দিন ধরার 'পরে,
জাগিয়া উঠিল এই নিখিলের আর্ত্ত মানব তরে!
দিকে দিকে শাঁক বাজেনি সেদিন, ওঠে নাই আগমনী,
গগন ভেদিয়া ওঠেনি স্বনিয়া তোমার জয়ধ্বনি!

সবার আড়ালে চুপে চুপে এলে আঁধারে জ্বালিয়া আলো,
রাঙায়ে তুলিলে দূর-দিগন্ত—দূরি' পুঞ্জিত কালো!
এই ধরণীর কত মূক প্রাণে দানিলে নূতন ভাষা,
নিরাশার ঘন তিমিরের মাঝে জাগালে মুক্তি-আশা!

সে দিন বিহগ কি সুরে গাহিল, প্রচারিল কোন্ বাণী!
সে দিন কানন-কুসুম-সুবাস কি বারতা দিল আনি'!
মন্দ-পবনে কি মধু ছন্দ ব'য়ে গেল দিকে দিকে,
উদয়-সূর্য কি আলো জাগালো স্বর্ণ-ছটায় লিখে!

কেহ বোঝে নাই, কেহ দেখে নাই, সে দিনের ইতিহাসে-
অলক্ষ্যে কোন্ শুভ ইঙ্গিত জাগিল বিশ্বাকাশে!
কেহ জানে নাই, সে কোন্ প্রকাশ, স্বরূপ দেখাবে ব'লে
নেমে এল এই ধরণীর বুকে—চন্দ্রাদেবীর কোলে!

কত না লীলার মাধুর্য-রসে ভ'রি পল্লীর গেহ,
কত না তৃষিত বক্ষে জাগালে প্রাণের নিবিড় স্নেহ!
আদরে যত্নে প্রীতি-মমতায় ক্রমে হ'য়ে বর্ধিত,
জীবনে জীবনে দিব্য-প্রেরণা করিলে সঞ্চারিত!

পিতা মাতা আর পল্লীবাসীর, কাহারো একার নহ,
তোমারে ডাকে যে আর্ত্ত-নিখিল পলে পলে অহরহ!
তোমারে খোঁজে যে তৃষিত পথিক, মরুমাঝে পথ-হারা,
নিরাশ হৃদয় কেঁদে কেঁদে ফিরে লভিতে করুণা-ধারা!

যে আলোর লাগি' আঁধার আকাশ চেয়ে থাকে অনিমেষে,
কমলের কলি করে প্রতীক্ষা বিরহ-কাতর বেশে,
যে আলোর লাগি' সৃষ্টি-প্রেরণা নীরবে দিবস গোণে,
তা'রি স্পন্দন করিল আঘাত তোমার দরদী মনে!

ছুটে গেলে তাই সুদূরের পানে ভেঙে দিয়ে খেলাঘর,
তুমি বিশ্বের, বিশ্ব তোমার, কেহ নহে তব পর!
প্রেমের প্রকাশ দেখাবে তুমি যে, সেই ত' তোমার ব্রত,
তাই ত এসেছ এ মহাভুবনে করুণাভারাবনত!

তোমার জীবনে ফুটায়ে তুলিলে' বিশ্বময়ীর লীলা,
চেতনা-দীপ্তি তাই ত লভিল কঠিন-প্রতিমা শিলা!
মৃত্যুঞ্জয়ী সাধনা তোমার শ্মশান-ভস্ম 'পরে,
শবের মাঝারে জাগাইল শিব, প্রাণ জাগাইল জড়ে!

লৌহ করিলে নিকষস্বর্ণ, তুমি যে পরশ-মণি,
নিঃস্বরে তুমি বুকে টেনে নিয়ে দেখালে রত্ন-খনি!
দ্বন্দ্ব-কলহ-হিংসার মাঝে দেখালে শান্তি-রূপ,
কামনা-কুটিল-মর্মে জ্বালালে প্রেমের পুণ্য-ধূপ!

মরু-মরীচিকা-ভ্রান্তি টুটিয়া দেখালে অমৃত-পথ,
আবিলতা মাঝে বহালে গঙ্গা, হে নবীন ভগীরথ!
ধর্মের তরে মানুষে মানুষে যে বিভেদ জেগে র'য়,
উৎপাটি তাহা, এ মহাভুবনে জাগালে সমন্বয়!

যে মহাসাধনা এ মহাভারতে জেগেছিল একদিন,
তা'রি আগমনী-গীতিতে সাধিলে তোমার হৃদয়-বীণ!
সত্য-জ্ঞানের পূত হোমানল জ্বালালে নূতন করি,
ধ্বনিয়া তুলিলে ঋকের মন্ত্র কম্বু-কণ্ঠ ভ'রি!

এই বিশ্বের মনোমন্দিরে প্রেমের আসনমাঝে,
চির-করুণার বিগ্রহ তব সুন্দর-রূপে রাজে!
শান্তির বাণী, মুক্তির বাণী ধ্বনিয়া নিরন্তর,
বিরাজিছ তুমি নিখিল-জীবনে, ছেয়ে আছ চরাচর!

নব ভারতের হে প্রাণ-পুরুষ, গাহি আজ তব জয়,
স্বর্ণযুগের করুক সূচনা তোমার অভ্যুদয়!
দাও বরাভয়, দাও শুভাশিস্, দাও ফিরে মঙ্গল,
অমৃতে কর নিখিল পূর্ণ—কর প্রাণ উজ্জ্বল!

কামারপুকুর

স্বামী সংস্বরূপানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম ও মধুর বাল্য ও কৈশোর-লীলার সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ এই কামার-পুকুর গ্রামখানির অধ্যাত্ম-সম্পদ্ অতুলনীয়। দক্ষিণেশ্বর ৺কালীমন্দির তাঁহার উগ্র তপোভূমি ও তেজোবিকিরণ-ক্ষেত্র এবং বেলুড়মঠ, তাঁহার নিজকথানুসারে,[১] নিত্য-লীলাকেন্দ্র — উভয় স্থানই গরিমা ও মহিমায় শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কামারপুকুর তাঁহার ব্রজধাম, মধুরিমা ও সুষমায় আপনভোলা, পাগলপারা। এই সরল অনাড়ম্বর আবেষ্টনে এই চিরসরল দেবশিশু যে অপূর্ব লীলাহিল্লোল তুলিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটির চিহ্ন অবিস্মরণীয় ভাবে হৃদয়ে ধারণ করিয়া এই গ্রামখানি রসলিপ্সু ও রসজ্ঞকে মুকমুখর আহ্বান জানাইতেছে। কৌটিল্যের কালকূটদগ্ধ মানব এই সরলতাতীর্থে স্নান করিয়া শান্তি লাভ করিবে, মাথার গুরুভার চিরতরে নিক্ষেপ করিয়া স্বস্তির শ্বাস ফেলিবে, আপন হৃদয়কুম্ভটি কানায় কানায় ভরিয়া লইয়া সমাজে অমৃতসিঞ্চন করিবে।

এই কামারপুকুরেই এই দেবশিশু ধনী কামারিণীর প্রাণের আকূতি পূর্ণ করিয়াছিলেন; ধর্মদাস লাহার, চিনু শাঁখারীর ও সীতানাথ পাইনের বাটীর মধুময় লীলাগুলি এই গ্রামেই অভিনীত হইয়াছিল; এইখানেই পাঠশালায় যাত্রাগান, পুঁথিপাঠ ও হনুমানকে কৃপাপ্রদর্শন করা হইয়াছিল; ইহার নিকটেই সেই আম্রকানন, সেই গোচারণভূমি, সেই মাণিকভবন যাহাদের রস রসিকের নিকট মূকবৎ আস্বাদ্য; এইখানেই ৺রঘুবীরের মালাগ্রহণ হইয়াছিল, এইখানেই তাম্বুলরঞ্জিত ওষ্ঠাধর ও চেলীপরিহিত বরবপু দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় সরল নরনারী কাতারে কাতারে দাঁড়াইয়াছিল—কত বলিব, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুঁথি' কয়টি চিত্র আঁকিতে পারিয়াছে? এই সব প্রেমাভিনয়ের জমাট-বাঁধা স্মৃতি এই পল্লীবালা আপন হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে—কি অপূর্ব ইহার সৌভাগ্য!

ইহাতেই কামারপুকুরের সৌভাগ্যের শেষ হয় নাই। উপরের স্মৃতিগুলি যেমন মধুর, তেমনি বড় করুণ এক স্মৃতি ইহা বক্ষে ধারণ করিয়া ধন্য হইয়া আছে। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীসারদামণি দেবীর জীবনের মর্মন্তুদ কাহিনীর। শ্রীরামকৃষ্ণ তখন স্থূলশরীর পরিত্যাগ করিয়াছেন; মায়ের

১ "নরেন আমাকে মাথায় ক'রে নিয়ে যেখানে রাখবে, আমি সেখানেই থাকব।"

বিরহ-ব্যথা হৃদয়ে গুমরিয়া উঠিতেছে; অন্নবস্ত্রের সংস্থানের কথা ভাবিতে ভুলিয়া গিয়াছেন তাঁহার সন্তানগণ; কেহই জানেন না মা'র দিনগুলি কি ভাবে যাইতেছে; আত্মীয়েরা উদাসীন, নির্মম; জননী ব্যথায় মূক, সাধনা ও তপস্যায় মৌন, জগৎকল্যাণ-চিন্তায় বিভোরা, সন্তানদের দুঃখপূর্ণ তপস্যায় ব্যথিতা ও প্রার্থনরতা, অনশন-অর্ধাশনে ক্ষীণ তনু ক্ষীণতরা—বুঝি বা বাল্মীকি-তপোবনে পরিত্যক্তা জনকনন্দিনীর দুঃখচিত্রও ম্লান হইয়া গিয়াছিল। ইহা এই কামারপুকুরেই শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘটিয়াছিল।

এই গ্রামখানি কোথায় এবং শ্রীরামকৃষ্ণের বাল্যকালে কিরূপ ছিল? আমরা স্বামী সারদানন্দের অমরলেখা হইতে উদ্ধার করিতেছি:

"হুগলি জেলার উত্তরপশ্চিমাংশ যেখানে বাকুড়া ও মেদিনীপুর জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে সেই সন্ধিস্থলের অনতিদূরে তিনখানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকটে অবস্থিত আছে। গ্রামবাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুররূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও, উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে পথিকের নিকট একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেজন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর-নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।...

"কামারপুকুর হইতে বর্ধমানশহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে।...গ্রামকে অর্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ৺পুরীধাম পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে।...

"কামারপুকুরের প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পূর্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দারুকেশ্বর নদের তীরবর্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আসিবার একটি পথ আছে। তদ্ভিন্ন উক্তগ্রামের প্রায় নয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এখানে আসিবার প্রশস্ত পথ আছে।

"১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ম্যালেরিয়া-প্রসূত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্বে কৃষিপ্রধান বঙ্গের পল্লীগ্রামসকলে কি অপূর্ব শান্তির ছায়া অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ হুগলী বিভাগের এই গ্রামসকলের বিস্তীর্ণ ধান্যপ্রান্তরসকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইত। জমির উর্বরতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকায় এবং নির্মলবায়ুতে নিত্যপরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীদিগের দেহে স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং মনে প্রীতি ও সন্তোষ সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। বহু জনাকীর্ণ গ্রামসকলে আবার কৃষি ভিন্ন ছোটখাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরূপে উৎকৃষ্ট জিলাপী, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত, আবলুষ কাষ্ঠনির্মিত হুঁকার নল (ইত্যাদি) নির্মাণ,...সূতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্য নানা শিল্পকার্যেও প্রসিদ্ধ ছিল।...

"গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজন এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশ প্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুখরিত হইয়া উঠে।...

"গ্রামে তিন চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে হালদারপুকুরই সর্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অনেক আছে।' তাহাদের কোন কোনটি আবার শতদল কমল, কুমুদ ও কহ্লারশ্রেণী

বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইষ্টকনির্মিত বাটির ও সমাধির অসদ্ভাব নাই। পূর্বে উহার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল।...গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও 'ভূতীর খাল' নামক দুইটি শ্মশান বর্তমান। শেষোক্ত স্থানের পশ্চিমে গোচরপ্রান্তর, মাণিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের উপভোগ্য আম্রকানন এবং দামোদর নদ বিদ্যমান আছে। ভূতীরখাল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদূরে উক্ত নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।"[২]

কিন্তু ১৮৬৭ হইতে শুরু করিয়া আজ পর্যন্ত ম্যালেরিয়া, কুটীর শিল্পের ক্রমাবনতি, শহরে কল-কারখানায় যোগ দিবার জন্য লোকের তথায় গমন, প্রাচীন গ্রাম্য শিক্ষার পরিবর্তে শহরে ইংরেজী শিক্ষায় অধিক অর্থাগম ইত্যাদি কারণবশতঃ কামারপুকুর অন্যান্য বঙ্গপল্লীর ন্যায় জনবিরল হইয়া আসিতেছে। ইহার ফলে পল্লীটি আরও হতশ্রী হইতেছে। লোক ও লোকের দরদ না থাকায় পুকুর ও সায়রগুলি মজিয়া গিয়াছে; ইহাতে শুধু যে পানীয় জলের অভাব হইয়াছে তাহা নহে, শস্যক্ষেত্রে জল-সেচন করিতে না পারায় খাদ্য-দ্রব্যও পূর্বের ন্যায় উৎপন্ন হইতেছে না। আনন্দোৎসব ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। বহু বাড়ী ও মন্দির এখন ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত হইয়াছে। এই বাহ্যিক শ্রীহীনতার সহিত অধিবাসীদিগের আন্তর দৈন্যও দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। অবনতির এই দুর্বার বেগ রোধ করিবে কে? এ কর্তব্য কাহাদের? তাঁহাদের, যাঁহারা এই গ্রামখানির চির প্রোজ্জ্বল অধ্যাত্ম-মহিমা বুঝিতেছেন, প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া ধন্য হইতেছেন।

সৌভাগ্যের বিষয় পরিম-রেখা (graph) আবার উঠিতেছে। যে দেব-মানবের জন্মে গ্রামের শাশ্বত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল, তাঁহাকেই অবলম্বন করিয়া উহা মেঘমুক্ত হইয়া আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। বৎসরাধিক কাল হইল শ্রীরামকৃষ্ণ ঠিক যে স্থানটিতে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন সেইখানে একটি ক্ষুদ্র মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার নিত্য পূজা-ভোগরাগাদি প্রবর্তিত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হইয়া পূজাদি পরিচালনার সহিত গ্রামের সর্বপ্রকার উন্নতির পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হইতেছে। দেশ-বিদেশের ভক্তগণ ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় আসিতে আরম্ভ করিয়াছেন, গ্রামের পূর্বাপর ইতিহাস শুনিয়া ও বিশিষ্ট স্থানগুলি দেখিয়া প্রেমাপ্লুত হইতেছেন, এবং এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ভারতের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সৌম্যস্নিগ্ধতা রক্ষা করিয়া নবীনের আশাকাঙ্ক্ষা কেমন করিয়া সর্বাঙ্গসুন্দর ভাগবত জীবন গড়িয়া তুলিবে সেই বিষয় চিন্তা করিতেছেন। ম্যালেরিয়া-নিবারণ-কার্য আরম্ভ হইয়াছে; হালদার পুকুরটির পঙ্কোদ্ধার কার্য শুরু হয় হয়; শিক্ষায়তন ও চিকিৎসালয়-স্থাপনের জল্পনা কল্পনা-রাজ্য অতিক্রম করিতে চলিয়াছে। এইরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে আদর্শ ও কর্মপদ্ধতি নির্ণীত হইয়াছে, কর্মিবৃন্দ আসিয়া জুটিয়াছেন, দেশবাসীর দৃষ্টি ও হৃদয় আকৃষ্ট হইয়াছে, রাষ্ট্রনায়করাও উদ্বুদ্ধ ও সচেষ্ট হইয়াছেন। কাজেই আমরা আশা করিতেছি, অচিরকাল মধ্যেই পল্লীটি সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিবে। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই ঋষিদৃষ্ট পূর্ণাবয়ব জীবনের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করিয়া ইহা একখানি আদর্শ গ্রাম হইয়া চতুর্দিকে শোভা ও সৌরভ বিস্তার করিবে।

তীর্থাবগাহী পাঠক, অরুণিমা ভেদ করিয়া সবিতা উঠিতেছেন, সাবিত্রী পাঠ করুন।

২ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, পূর্বকথা ও বাল্যজীবন, পৃ ২৮-৩০।

কামারপুকুর-যাত্রা

স্বামী—

(১)

চিন্ময় আনন্দধাম কামারপুকুর নাম
প্রাকৃত-ইন্দ্রিয়াতীত ভূমি।
দেহ-অভিমানী হয়ে কামনার বোঝা নিয়ে
কেমনে যাইবে মন তুমি ?
বৈকুণ্ঠ-অতীত স্তরে গোলোকের অভ্যন্তরে
শুদ্ধ মাধুর্যের লীলাধাম।
আপনি আপন-রস পান-অভিলাষ-বশ
যেথা লীলা করে পূর্ণকাম।
এক 'দুইরূপ' ধরে, পুন তাহা বহু করে
নানাভাবে করে আস্বাদন।
মহাভাগ্যবান যে-ই দরশন পায় সেই
অনুরাগে করি আরাধন।

(২)

এবে যশোমতী রাণী, সাজি ধনী কামারিণী,
পুত্রহীনা বিধবার বেশ।
বৎস তরে গাভী প্রায়, অতি ব্যাকুলিতা হায়,
উন্মাদিনী আলু থালু কেশ।
চক্ষু বহি প্রেমনীর, বক্ষ ভেদি স্নেহক্ষীর,
ঝরিতেছে বাৎসল্যের রসে।
পরকীয় পুত্ররতি স্নেহরস গাঢ় অতি,
সেই রস পিয়ায় গোপেশে॥

(৩)

ধূলায় ধূসরকায় ভূমে গড়াগড়ি যায়,
হামাগুড়ি দিয়া কভু চলে।
আবার দাঁড়ায়ে চলি, ভূমিতে পড়িছে ঢলি,
ধরণী ধরিছে বক্ষ খুলে।
ধরণী ধারণ যে-ই ধরাতলে লুটে সেই
দেহভার ধরিতে অক্ষম।
জননীর মুখ চেয়ে, কাঁদিছে ব্যাকুল হয়ে
নিজে নহে চলিতে সক্ষম!
দিগম্বর দীর্ঘকেশ বাল গোপালের বেশ
গলে শোভে বাঘনখ মালা
কটিতে কিঙ্কিণী সাজে, চলিতে মধুর বাজে,
পায়ে হাতে মনোহর বালা।
আধ আধ মিঠা বুলি, হাস্য নৃত্য বাহু তুলি
বালরূপে গঙ্গাধর খেলে।
যোগমায়া সংঘটন সহ সম শিশুগণ
'কামারপুকুরে' লীলাছলে।

(৪)

শ্রুতি ছাড়ি নিজদেশ, ব্রজে যার গোপীবেশ,
বৈশ্যবধূ সেথায় সেজেছে।
হালদার পুকুরেতে, জল আনিবার পথে,
কুম্ভকক্ষে আসিয়া মিলেছে।
গোপনে যতন করে, অতিশয় প্রেমভরে,
সুরস মিষ্টান্ন ফল মূল।
কতই মনের সাধে, এনেছে আঁচলে বেঁধে
গদাধরে খাওয়াতে আকুল॥

(৫)

পরমা প্রকৃতি যিনি, সাজি দীন কাঙ্গালিনী,
সৌম্য শান্ত পল্লীবালা-বেশ।
বস্ত্রে মুখ ঢেকে রাখে, কলসী বহিছে কাঁখে,
লম্বমান পৃষ্ঠে দীর্ঘ কেশ।
কভু ঢেঁকিশালে পশে, কভু বা রন্ধনে বসে
কভু মাজে ঘাটেতে বাসন।
আপনার গ্রাস লয়ে সন্তানের মুখে দিয়ে
মাতৃস্নেহ করে আস্বাদন।

(৬)

জাহ্নবী যমুনা এসে, কামারপুকুরে পশে
ক্ষীণ করি স্বীয় কলেবর।
লীলারস আস্বাদিয়া পুলকে পুরিছে হিয়া
নাচিয়া চলিছে আমোদর।
ত্যজিয়া ঐশ্বর্যরাশি যত দেবদেবী আসি
কামারপুকুরে বাস করে।
আম্রকাননের পাশে কেহ বা রয়েছে বসে
প্রেমলীলা দরশন তরে।

(৭)

বক্ষে ধরি পূর্ণ ইন্দু, চিন্ময় আনন্দসিন্ধু
কামারপুকুর শোভমান।
উথলিলে একবার সারা বিশ্ব একাকার
সর্বভেদ চির অবসান।
এমন আনন্দপুরে বাসনা রাখি অন্তরে
কেমনে পশিবে তুমি মন?
দাঁড়াইয়া পথধারে যাত্রিগণ-পায়ে ধরে
শুভাশিস্ করহ গ্রহণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অপূর্ব সমাবেশ*

স্বামী নির্বেদানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে যে সকল নানা ধর্ম ও ভাবের সমন্বয় ঘটিয়াছিল তাহাদের মধ্যে সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্য এই দুটি আদর্শের অপূর্ব সমাবেশটিকে সম্যক বুঝিয়া উঠা বোধ করি খুবই কঠিন। আমাদের বিশ্লেষণে অনেক সময়েই হয়তো আমরা এই লোকোত্তর পুরুষের উপর অবিচার করিয়া বসিতে পারি—আবার অনেক সময়ে আংশিক সিদ্ধান্তের দরুন আমাদের নিজেদেরই বিভ্রান্ত হইবার আশঙ্কা থাকে।

তোতাপুরীর নিকট আনুষ্ঠানিক সন্ন্যাস-ব্রত গ্রহণ করিবার পরও স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ দীর্ঘ সাত মাস জন্মভূমি কামারপুকুরে আত্মীয় পরিজনবর্গের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে বাস করিয়াছিলেন—ইহা প্রচলিত সন্ন্যাসজীবনের একটি ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। সন্ন্যাস-দীক্ষা অর্থেই আত্মীয় ও অনাত্মীয়ের মধ্যে সর্বপ্রকার পার্থক্য মুছিয়া দেওয়া—সংসারের সকল বন্ধন ছিন্ন হওয়া—নিজের জ্ঞাতি-কুটুম্ববর্গের প্রতি যাবতীয় বাধ্যবাধকতা চিরদিনের মত ত্যাগ করা। সন্ন্যাসীর জীবন সর্বসীমানির্মুক্ত একান্ত স্বাধীন জীবন আত্মীয়-প্রিয়জনের প্রাচীন সম্পর্কের স্মৃতিটুকু পর্যন্ত সেখানে রাখিবার কথা নয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের ক্ষেত্রে এ কথা অস্বীকার করা চলে না যে, তিনি সন্ন্যাসের উপরোক্ত সুপরিচিত আদর্শ ডিঙাইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজে অনুসরণ করিয়াছিলেন একটি সম্পূর্ণ অভিনব পন্থা। যে পারিবারিক বন্ধন নিজের হাতে একদিন ছিন্ন করিয়া আসিয়াছেন, হিন্দু-সন্ন্যাসী জীবন্মুক্ত হইলেও উহা আর কখনও স্বীকার করিতে যান না। শ্রীরামকৃষ্ণের গুরু তোতাপুরীর কথাই ধরা যাক। ভাবিতে পারা যায় কি যে এই কৃচ্ছ্রব্রতী নির্মায়িক সন্ন্যাসিপ্রবর স্বগ্রামে ফিরিয়া গিয়াছেন, আত্মীয়স্বজনের সহিত তাহাদেরই এক জন হইয়া মিশিতেছেন, তাঁহাদের

* লেখকের 'Sri Ramakrishna and Spiritual Renaissance' নামক ইংরেজী গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের অংশবিশেষ-অবলম্বনে।

সুখদুঃখের সহিত তাদাত্ম্যবোধ করিতেছেন? সন্ন্যাসী শ্রীরামকৃষ্ণকে কিন্তু এইরূপ আচরণ করিতে দেখিতে পাই একেবারে নিঃসঙ্কোচে, দ্বিধাশূন্যভাবে। আবার 'সংস্কারক'-রূপেই যে তিনি উহা করিয়াছিলেন তাহাও নয়। সন্ন্যাসীর আচারবৃত্ত-সম্বন্ধে একটি নূতন পথ প্রবর্তন করা নিশ্চিতই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, কেননা, তাঁহার সন্ন্যাসি-শিষ্যবর্গকে কখনও নিজের অনুসৃত ঐ অভিনব ধারায় চলিতে তিনি বলেন নাই। উহা শুধু একক তাঁহারই পথ, তাঁহারই সম্পূর্ণ স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক পথ। কিন্তু প্রশ্ন উঠে কেন তাঁহার নিজের ক্ষেত্রে এই স্বাতন্ত্র্য ?

কেহ হয় তো বলিবেন, সনাতনপন্থী সন্ন্যাসী-দিগের অপেক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের ভিতর মানুষের প্রতি দয়া-মমতা বেশী ছিল বলিয়াই তিনি তাঁহার নিজের উপর আত্মীয়-স্বজনের দাবী স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, তাঁহার হৃদয়টি ছিল খুবই কোমল এবং স্নেহপ্রবণ। আমরা জানি তিনি যখন তোতাপুরীর নিকট সন্ন্যাস নেন, তখন গোপনেই লইয়াছিলেন, পাছে গর্ভধারিণী জননী (তিনি তখন দক্ষিণেশ্বরে) উহা দেখিয়া প্রাণে কষ্ট পান। সকল বন্ধন কাটিয়া সন্ন্যাসীর জীবন বরণ করিতে যাইবার প্রাক্কালেও জননীর প্রসন্নতার জন্য এত চিন্তা!

তবুও কিন্তু এই 'দয়ামমতা'র যুক্তি দিয়া তাঁহার পূর্বোক্ত আচরণ বেশীদূর ব্যাখ্যা করা চলে না। কতকগুলি নির্দিষ্ট পারিবারিক সম্বন্ধ এবং গণ্ডীবদ্ধ একটি ক্ষুদ্র নরনারী-গোষ্ঠীর প্রতি তত্তৎ কর্তব্যসমূহ মানিয়া না লইয়াও কি তিনি বিশ্বের সকল মানুষের উপর নির্বিচারে করুণা প্রকাশ করিতে পারিতেন না? আর যদিই বা এই ক্ষুদ্র পরিবারগোষ্ঠীর সহিত সম্বন্ধ রাখিলেন, সাধারণভাবে সস্নেহ ব্যবহার এবং সহানুভূতিটুকু রাখিলেই কি যথেষ্ট হইত না? পুত্র বা স্বামীর তথা অন্যান্য আত্মীয়ের ভূমিকা গ্রহণ করিবার প্রয়োজন ছিল কি? ভগবান বুদ্ধ কিংবা শ্রীচৈতন্যদেবের মানবপ্রেম-সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ আছে কি? সিদ্ধিলাভ করিবার পর তাঁহাদের স্বজনবর্গের সহিত আচরণে কত ভালবাসা ও নম্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল কিন্তু কই, তাঁহারা তো গৃহী সাজিতে যান নাই। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণ যে সন্ন্যাসের সীমা লঙ্ঘন করিয়া-ছিলেন 'মানবিকতা'র যুক্তি দিয়া উহা ব্যাখ্যা করা কঠিন। ইহার কারণ-নির্ণয়ের জন্য বোধ করি আরও গভীরতর তথ্যে যাওয়া প্রয়োজন।

জগৎসংসারকে শ্রীরামকৃষ্ণ একটি সম্পূর্ণ নূতন চোখে দেখিতেন—যাহা অবিদ্যাগ্রস্ত সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, তোতাপুরীর ন্যায় সিদ্ধ পুরুষগণেরও দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বহুলাংশে পৃথক। তাঁহার নিকট 'নির্গুণ তত্ত্ব' এবং 'মায়িক জগৎ' উভয়ই ছিল সমান দিব্যসত্তায় ভাস্বর। জগৎ-অনুভূতির প্রবেশপথে এই বোধে অবস্থিত থাকিতেন বলিয়াই তিনি সন্ন্যাস ও গার্হস্থ্যজীবনের আপাত-বিরুদ্ধ রীতিদ্বয়কে একটি অবিভক্ত সামঞ্জস্যে সম্মিলিত করিতে পারিয়াছিলেন। এই অদ্ভুত এবং অভূতপূর্ব সমন্বয়ের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় উভয় আদর্শেরই একই প্রকার সুস্পষ্ট এবং পরিপূর্ণ বিকাশ। এই প্রসঙ্গে সেই চমৎকার ঘটনাটির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে মাতার মৃত্যুর পর একদিন তিনি গৃহস্থের প্রচলিত ধারায় জলে তর্পণ করিতে গিয়াছেন, কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও কিছুতেই উহা পারিলেন না। পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে নিবেদন করিবার জন্য করপুটে যেই জল নেন অমনি আঙ্গুলগুলি আপনা হইতে ফাঁক হইয়া গিয়া সমস্ত জল পড়িয়া যায়। হঠাৎ তাঁহার মনে

পড়িয়া গেল, সন্ন্যাসীর তর্পণে অধিকার নাই—তিনি যে সন্ন্যাসী। শ্রীরামকৃষ্ণে গৃহী এবং সন্ন্যাসী মিলিয়া এক হইয়া যাইবার একটি নিখুঁত ছবি এই ঘটনা হইতে পাওয়া যায়।

বিশ্বসংসারকে উহার নিখিল বৈচিত্র্যের সহিতই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন—কেননা উহাদের সব কিছুর মধ্যেই তিনি জগজ্জননীর লীলা দেখিয়া অসীম আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেন। তাঁহার অনুভব হইত যে, সেই রঙ্গময়ী মা-ই দিব্য-নাট্যে তাঁহার আত্মীয়স্বজন সাজিয়াছেন। তাই সেই নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদিগের সহিত লেনদেন রাখিয়া, তাঁহাদিগকে যথেচ্ছ স্বাধীনতা দিয়া দিব্য অভিনয়টির মাধুর্যকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে তাঁহার ছিল এত নিখুঁত যত্ন। জননী, সহধর্মিণী, ভাগিনেয়, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্রী—ইঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁহার চোখে বিভিন্নবেশ-ধারিণী মা-কালীই; অতএব ইঁহাদের সহিত সম্পর্কগুলি খুব স্বাভাবিক ভাবেই তিনি গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আদর্শ সন্ন্যাসী হইয়াও সুদক্ষ অভিনেতার মত গৃহস্থের মুখোস পরিয়া রঙ্গমঞ্চে নিজের ভূমিকা কী সুন্দরই না অভিনয় করিয়া গেলেন! তাঁহার নিকট হইতে যতটা আশা করা সম্ভবপর ততটাই নিঃসঙ্কোচ ভালবাসা, আন্তরিক মনোযোগ এবং অকুণ্ঠিত সেবা আত্মীয়গণ পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাই বলিয়া গৃহস্থের ভূমিকায় থাকিবার সময়ে এমন কিছু তিনি নিশ্চিতই করিতে পারিতেন না যাহা গৃহিসাজের অন্তরালবর্তী 'সন্ন্যাসী'কে কোন প্রকারে ম্লান করে। পূর্বোক্ত 'তর্পণ'এর ব্যাপারটিতেই ইহা দেখা গিয়াছে—সহধর্মিণীর সহিত তাঁহার আচরণের ক্ষেত্রেও ইহা আমরা দেখিতে পাইব। তাহা ছাড়া তাঁহার টাকা-পয়সা স্পর্শ করিতে না পারা, অর্থসঞ্চয়ের কল্পনায় স্বভাবগত বিতৃষ্ণা, ব্যক্তিগত সেবার জন্য মাড়োয়ারী ভক্তের নিকট হইতে দশ হাজার টাকা দান লইতে অস্বীকার, রহস্যচ্ছলেও তাঁহার মুখ হইতে কখনও কোন মিথ্যা বাহির না হওয়া, পাকা বিষয়ী লোকের সঙ্গে অত্যন্ত কষ্টবোধ, রমণীমাত্রে—এমন কি বেশ্যার ভিতরও সর্বদা জগন্মাতাকে দেখা এবং স্থূল ইন্দ্রিয়ভোগ-বিষয়ে চরম উদাসীনতা—এই সকল ঘটনা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করে যে, গৃহিবেশের অভ্যন্তরে তাঁহার হৃদয়টি চিরদিনের মত আরূঢ় ছিল সন্ন্যাসের উচ্চতম আদর্শে। এই ভাবে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস এই দুই বিপরীত জীবন-ধারার একটি অনুপম সমন্বয় এবং প্রত্যেকটি ধারাই স্বকীয় আদর্শের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়েই শ্রীরামকৃষ্ণের অদ্ভুত জীবনের এই ছাঁচ হইতে নিজ নিজ জীবন পূর্ণভাবে গড়িয়া লইতে পারিবেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ এবং দুই পুত্রকে পর পর হারাইয়া মাতা চন্দ্রমণি দেবীর শরীরমন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলে তিনি সংসারে একান্ত বীতস্পৃহ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে কনিষ্ঠপুত্রের নিকটে চলিয়া আসেন এবং ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শরীরত্যাগ পর্যন্ত নহবতের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণের শোকগ্রস্তা বৃদ্ধা জননীর প্রতি বিনম্রসেবা ও শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ আচরণ ছিল ঠিক একটি আদর্শ কর্তব্যনিষ্ঠ পুত্রের মতই। দক্ষিণেশ্বরে ভাগিনেয় হৃদয়ের প্রতিও তাঁহার ব্যবহার দেখিতে পাই সংসারের আর দশটি স্নেহশীল মাতুলেরই ন্যায়। ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালও কি তাঁহার নিকট খুল্লতাতের স্নেহভালবাসা এক বিন্দু কম পাইয়াছিলেন? মোট কথা, উচ্চ আধ্যাত্মিক ভূমিতে আরূঢ় হইয়াও পরিজনবর্গের সহিত তাঁহার সম্পর্কে একটুও অস্বাভাবিকতা

দেখিতে পাওয়া যায় না। জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর পর তাঁহার অধীর ক্রন্দনের কথাও মনে পড়ে। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহার ভিতরকার সন্ন্যাসী যেন সম্পূর্ণ লুকাইয়া আছে—গৃহীর ভূমিকাই সুপ্রকট।

কিন্তু তাঁহার সহধর্মিণীর প্রতি আচরণ একেবারেই অপূর্ব। ইতিহাসে উহার কোন তুলনা নাই এবং বলিতে গেলে উহা মনুষ্য-বুদ্ধির অগম্য। ইন্দ্রিয়সমূহকে সম্পূর্ণ বশে আনিয়াছেন এমন এক জন পুরাদস্তুর সন্ন্যাসীকে 'পতিধর্ম'-পালন করিতে কে কবে দেখিয়াছে বা শুনিয়াছে? এই অত্যাশ্চর্য সম্মিলনে যেন আমরা প্রত্যক্ষ করি দুটি বিপরীত মেরুর সংযোগ! অদ্ভুত দম্পতির বিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বয়ে বহিয়া যাইতেছে কামলেশশূন্য পবিত্রপ্রেমের স্নিগ্ধ ধারা—সর্বমালিন্যমুক্ত দুটি ভাস্বর আত্মার অতিলৌকিক মিলন!

একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদসেবা করিতে করিতে সারদা দেবী জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমাকে তোমার কি মনে হয়?" তৎক্ষণাৎ উত্তর আসিল—"যে মা মন্দিরে, যে মা এই শরীরের জন্ম দিয়েছেন আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন, তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সত্যই তোমাতে সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ দেখতে পাই।" কত সহজ ভাবে পরিণীতা ধর্মপত্নীর মধ্যে জগজ্জননীকে দেখিতেছেন; আবার গভীর রাত্রে তাঁহাকে পদসেবার অনুমতি দিয়া অকুণ্ঠিত ভাবে স্বামীর আসন গ্রহণ করিতেছেন! ভাবিতে গেলেও যেন শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, শ্রীরামকৃষ্ণের নিজকে জগন্মাতা হইতে অণুমাত্র পৃথক বোধ হইত না—অন্যথা সহধর্মিণীরূপে হইলেও সেই জগদম্বিকাকে পদস্পর্শ করিতে দেওয়া নিশ্চিতই তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য হইত। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট তিনি স্বয়ং তথা সমস্ত জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ড হইয়া গিয়াছিল বিশ্বপ্রাণা মহামায়ার একটি অখণ্ড অভিব্যক্তি। ১২৮০ সালের (১৮৭২ খৃঃ) জ্যৈষ্ঠা অমাবস্যা রজনীর সেই অদ্ভুত ঘটনাটির কথা মনে পড়ে। ফলহারিণী কালিকাপূজার সমস্ত উপচার দিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে কালীর সহিত অভিন্ন ভাবে তন্ত্রশাস্ত্রনির্দিষ্ট ষোড়শী পূজা করিলেন। আরাধ্যা দেবী সারদা অতীন্দ্রিয় ভাবাবেশে বাহ্যসংজ্ঞাহীনা—পূজক শ্রীরামকৃষ্ণও গভীর সমাধি-মগ্ন। স্থূলজগৎ অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রিয়মন-বুদ্ধির পারে নির্বিশেষ একত্বের ভূমিতে দিব্য-দম্পতির অপূর্ব আধ্যাত্মিক সম্মিলন!

কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবতীরূপে দেখা এবং পূজা করা সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবীকে স্ত্রীর আসনেও রাখিয়াছিলেন। কখনও কখনও ভক্তগণের বিশেষতঃ যাঁহারা গৃহী ও বয়স্ক তাঁহাদের নিকট রহস্যচ্ছলে তাঁহাকে বলিতে শুনা যাইত—"বলতে পার আমার আবার বিয়ে কেন? ভেবে দেখ দেখি এই দেহের যত্ন নেবার জন্যে ও (সারদাদেবী) যদি না থাকতো তা হলে আমার অবস্থা কি হত। এমন যত্ন করে কে আমাকে রেঁধে খাওয়াতো—আর আমার পেটে যা সয় বেছে বেছে এমন সব রান্না আলাদা করে করে দিত?" এখানে সারদা-দেবীকে তিনি দেখিতেছেন সেবাপরায়ণা সাধ্বী পত্নীরূপে। এই পত্নীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার ছিল কী মমতামাখা! তাঁহাকে নারীজাতির উচ্চাদর্শে গড়িয়া তুলিতে কী গভীরই ছিল তাঁহার আগ্রহ! আধ্যাত্মিক এবং সাংসারিক উভয় বিষয়েরই নানা খুঁটিনাটি একান্ত যত্ন এবং মনোযোগ সহকারে তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে সারদাদেবীর নিকটেও তিনি পাইয়াছিলেন অপরিমেয় বিশুদ্ধ ভালবাসা, ঐকান্তিক ভক্তি এবং অকুণ্ঠিত সেবা।

আবার যতই কেন অদ্ভুত মনে হউক না কেন, ইহাও সত্য যে সারদাদেবী শ্রীরামকৃষ্ণকে ভগবতী বলিয়া দেখিতেন। স্বামীর প্রতি এই অত্যদ্ভুত দৃষ্টি তিনি আজীবন রাখিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত আছে, শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর তিনি 'মা, আমাকে ছেড়ে তুমি কোথায় গেলে গো' বলিয়া শিশুর ন্যায় কাঁদিয়া উঠিয়াছিলেন। তথাপি সর্বক্ষণই তাঁহার পত্নীধর্মও ছিল অক্ষুণ্ণ। পতির দেহত্যাগের পর তিনি বৈধব্যের বসন পরিধান করিতে গিয়াছিলেন—অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণ দর্শন দিয়া নিষেধ করাতে উহা আর পরিতে পারেন নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদাদেবীর এই বিচিত্র সম্বন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করে। সর্বময়ী বিশ্বজননী, প্রেমময়ী পত্নী এবং স্নেহপাত্রী শিষ্যা—এই তিনের একটি সুসমঞ্জস সমন্বয় কিরূপ তাহা কি কেহ কল্পনা করিতে পারে? অপরদিকে জগদম্বা কালী, প্রাণপ্রিয় স্বামী এবং ধর্মজীবনের গুরু এই তিনটির সমাবেশ কি আমাদের ধারণায় আসে? বাস্তবিকই মানুষের বুদ্ধি এখানে হার মানে—ভাষাও উহা বর্ণনা করিতে অসমর্থ। বিভিন্ন বিচারকের দৃষ্টিকোণ অনুসারে অপ্রাকৃত, অমানব, অতিলৌকিক বা ঐশ্বরিক যে কোন সংজ্ঞাই দেওয়া যাক্ না কেন এই দিব্যদম্পতির অনুভবে যে অপূর্ব সামঞ্জস্য প্রকট হইয়াছিল ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র মানুষ কোন কিছু দ্বারাই তাহার যথাযথ ধারণা করিতে পারিবে না। একটি জিনিষ কিন্তু সুস্পষ্ট। তাঁহাদের এই অদ্ভুত দাম্পত্য সন্ন্যাসী এবং গৃহী উভয়েরই জন্য দেহলালসা-বর্জিত একটি বিশুদ্ধ জীবনলক্ষ্যের উপর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৃহীর আত্মসংযমের আদর্শ তথায় দিব্য পবিত্রতায় রূপান্তরিত—সন্ন্যাসীর জিতেন্দ্রিয়তা সকল প্রলোভনের ঊর্ধ্বে ভাস্বর বিদেহতায় সমুন্নীত!

কল্পতরু

শ্রীপ্রণব ঘোষ

ছায়া দাও,
তোমার নিভৃত শান্তি,
পল্লবে সবুজ কান্তি,
জীবনে জাগাও।
ছায়া দাও।

তৃষাদীর্ণ মাঠ হতে জীবনের চৈত্রঝড় আসে,
আকাশ আকুল হয়ে আগুনের দহন—নিঃশ্বাসে
দিক থেকে দিগন্তরে অন্ধ ধূলি মাতে।
রিক্ত—শ্যাম সেই সাহারাতে
তোমার পল্লব গায় দূরশ্রুত শ্রাবণের গান,
তোমার শাখায় শুনি কুসুমের সবুজ আহ্বান।
ছায়া দাও।
হে চির-চিন্ময়-তরু,
মরুর ঊষর বক্ষে শিকড়ে শিকড়ে,
যে গোপন সাধনায় মূক মাটি নড়ে,
অজেয় সে—সাধনার পথ-চলা দাও।
জানি সে-পথের প্রান্তে তোমারি আশ্রয়,
তোমারি পাতায় ছায়া-ফলে বরাভরা।
আতপহরণ বন্ধু, তোমারি আশায়
দিন দিয়ে দিন গাঁথি প্রাণের ভাষায়।
সকল আশ্বাস-শেষে অন্তহীন মরু,
জানে তুমি আছ মোর চির কল্পতরু।
তোমার নিভৃত শান্তি
পল্লবে সবুজ কান্তি
পরিপূর্ণতায় ফলে দাও ভরে দাও,
ছায়া দাও।

শ্রীরামকৃষ্ণের অতীন্দ্রিয়ত্ব

ডক্টর শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার, এম্‌-এ, পিএইচ্‌-ডি

শ্রীরামকৃষ্ণ-সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন, যথা—তিনি সর্বধর্মসমন্বয় করেছেন, জ্ঞান ও ভক্তিপথের ভেদ নষ্ট করেছেন ইত্যাদি। এ কথাগুলি কিন্তু সব সময়ে বিশেষ চিন্তা করে প্রকাশ করা হয় না। বস্তুতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন একটি নূতন জীবন—যেখানে অতীন্দ্রিয়ত্বের সহিত পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞানের মিলন হয়েছে। তিনি পুস্তকের ভাষায় কোন কথা বলেন নি। তাঁর স্বভাব তা ছিল না। যেমন অনুভব হত তেমনিই বলতেন। এইটি ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। নিজে ছিলেন পরম অনুভবিক পুরুষ, তাই এটা সম্ভব হত। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁর কথাবার্তা স্বামিজীর সহিত কথাবার্তা হতে বিভিন্ন রকমের। স্বামিজীকে বেদান্তাভিমুখে নিচ্ছেন, আর কেশব বাবুকে পরাভক্তি-অভিমুখে চালিত করছেন। আধার বুঝে তিনি উপদেশ দিতেন। এতবড় বিরাট তাঁর স্বরূপ ছিল যে, মানুষকে দেখলেই তার অন্তর বাহির দেখে নিতেন। এ দেখার জন্য তাঁর কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে হত না। দেখামাত্রই ভিতর বাহির এবং তার পারিপার্শ্বিক (environment) বুঝে নিতেন। সত্যিকার তিনি ছিলেন psychic; psychic লোকের স্বভাবই এই। পদার্থ সামনে পড়লেই তার স্বরূপ অন্তরে আপনা হতেই বিকশিত হয়ে ওঠে। এর জন্যে গুরূপদেশ বা বাইরের শিক্ষা কিছুই দরকার করে না। এই শক্তি ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের স্বাভাবিক। এজন্যে তাঁর সকলের সহিত ব্যবহার দেখে আশ্চর্য হতে হত। শ্রীপরমহংসদেবের এইরূপই শক্তি ছিল যে, তাঁর সামনে কিছু পড়লে আপনা হতে তার গূঢ় তথ্য মনে ভেসে উঠত। তার জন্যে বিশেষ কোন চেষ্টা করতে হত না। এই যোগশক্তি ধারণ ও প্রয়োগের যথার্থ অধিকারী খুবই বিরল। নিত্যগোপালের (পরে স্বামী জ্ঞানানন্দ অবধূত) ভিতর এই শক্তির স্ফুরণ হচ্ছে দেখে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে সাবধান করেছিলেন। নিত্যগোপালের সহিত একদিন যেতে যেতে দেখেন তাঁর শরীর দিয়ে আলোক নির্গত হচ্ছে। দেখেই তিনি নিত্যগোপালকে ঐ শক্তিবিস্তার করতে বারণ করেন। বললেন, তুমি কখনও এটা করো না। করলে তোমার শক্তি নষ্ট হয়ে যাবে, অপরেও ঠিক বুঝতে পারবে না। যে পর্যন্ত না দিব্য তেজোময় বিকাশ (psychic body) স্থিতিশীল হয় ততদিন তেজের বিকাশ ধরা বা ধরে চলা একেবারেই অসম্ভব। এই জন্যেই পাতঞ্জল দর্শনে বলা হয়েছে যে, বিভূতিযোগ হতে সব সময়ে দূরে থাকবে।

যাহোক জিনিসটা হচ্ছে এই, পরমহংসদেবের অন্তর্জীবনে এমন একটি সুন্দর স্ফুরণ হয়েছিল যাতে তিনি পদার্থের স্বরূপভূত প্রজ্ঞা আপনা হতে লাভ করতে পারতেন। এটা একরূপ যোগবিশেষ। পতঞ্জলি এই প্রজ্ঞাকে ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা বলেছেন। এই প্রজ্ঞাতে সত্য ধৃত হয় এবং তার স্বরূপের উদ্‌ঘাটন হয়। চিত্তের সমস্ত অবস্থাগুলি শুদ্ধভাবান্বিত না হলে এরূপ শক্তি বেশী দিন ধৃত হয় না। অবশ্য সমাধি হতে এ শক্তি আলাদা। সমাধি আরও উচ্চস্তরের।

তাতে জ্ঞান এবং নির্বিকল্প ভূমির পূর্বাবস্থাগুলি প্রকাশিত হয়। পতঞ্জলি-মতে চার প্রকার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল সাস্মিতা সমাধি। সাস্মিতা সমাধি স্থির হলে ধীরে ধীরে বিবেকখ্যাতি সমাধি হয়ে সর্বশেষে অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রাপ্ত হয়। সমাধি আরম্ভ হলেই পতঞ্জলি বলছেন— ঋতম্ভরা তত্র প্রজ্ঞা—সত্যকে ধারণ করে আছে যে প্রজ্ঞা তার বিকাশ হয়। এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞাই সাধকজীবনের শ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞা। এই প্রজ্ঞা লাভ হলে নানারূপ জ্ঞানের স্ফূর্তি হয়—যা অন্যরূপে সম্ভব নয়। পতঞ্জলির মতে যৌগিক সমাধির শ্রেষ্ঠতম লক্ষ্য অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি—তাতে আত্মজ্ঞান হয়। কিন্তু তার নীচেও অনেক সমাধি আছে—যাতে আজকালকার ভাষায় occult knowledge হয়। পরমহংসদেবের এই occult knowledge (অতীন্দ্রিয় জ্ঞান) স্বাভাবিক ছিল। তিনি কাউকে দেখলেই তার অন্তরের সব কথা জানতে পারতেন। ঐ ভাবে সূক্ষ্মজ্ঞানের তিনি ছিলেন পরম ভাণ্ডার। যখনই যিনি তাঁর কাছে গেছেন তাঁকে দেখেই তাঁর অন্তরজীবনের সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিতেন। স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী যোগানন্দ প্রভৃতি এর উদাহরণস্থল। আজকালকার দর্শনেতে এই occult knowledge এর স্থান ক্রমে ক্রমে হচ্ছে। কিন্তু পরমহংসদেবের মধ্যে সেটা ছিল সিদ্ধ। তিনি সত্যিকার সিদ্ধবিদ্যায় সিদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর পরম মহানুভবতা ছিল এরূপ জ্ঞানকেও তিনি উচ্চস্তর দিতেন না। এগুলি বিভূতির মধ্যে ফেলতেন। পদার্থের অন্তরে সূক্ষ্মশক্তিতে এরূপ জ্ঞান আবির্ভূত হয়। পরমহংসদেবের এই সূক্ষ্মশক্তির রাজত্বে ছিল পূর্ণ অধিকার, কিন্তু তিনি এইরূপ সিদ্ধির অধিকারী হয়েও তা তুচ্ছ করে ফেলে দিয়েছিলেন। সূক্ষ্ম জ্ঞানে তাঁর অধিকার-সম্বন্ধে সুন্দর একটি কথা আছে। তিনি একদিন মন্দিরে বসে মহাকালীর গান করছেন, রাণী রাসমণি নিকটে বসে শুনছিলেন। হঠাৎ তিনি রাণী রাসমণিকে মৃদু চপেটাঘাত করলেন, কেননা তাঁর অনুভব হল রাণী বিষয়ের কথা ভাবছেন। মায়ের কাছে সমস্ত বিশ্বের লোক অতি সামান্যই ছিল। সাধারণ নীতিজ্ঞানে তিনি এরূপ কাজ করতে পারতেন না। পরমহংসদেবের অবতারত্ব এই অতীন্দ্রিয় জ্ঞানকে নিয়েই।

সত্য যাঁরা অবতার হন সাধারণতঃ বলা হয় তাঁরা ঈশ্বরশক্তিতে আবিষ্ট হয়ে জগতে ভগবানের কথা বিকাশ করেন। সত্যি পরমহংসদেবের ভিতর এটা ছিল। তিনি কাউকে কাউকে কখনো দেখিয়েছেন তাঁর ভিতর মায়ের কৃপার ক্রিয়াশীলতা। স্বামী বিবেকানন্দের মত তীক্ষ্ণমেধাবী ও বিচারশীল মহা পণ্ডিতকে আসনে বসিয়ে পায়ের আঙ্গুলের দ্বারা মস্তিষ্ক স্পর্শ করে কুণ্ডলিনী জাগরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামিজী সেই অবস্থায় চিৎকার করে উঠেছিলেন মহাশক্তির স্পর্শে। এই যে কুণ্ডলিনী জাগরণ এও অতীন্দ্রিয় শক্তির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। যাঁদের এই শক্তি আসে তাঁরা যা ভাবেন তাই হয়— এবং যা স্পর্শ করেন তাতে দিব্যভাব অনুস্যূত হয়। এ জন্যই জগতে পরমহংসদেব এতভাবে পূজিত হচ্ছেন—কারণ তাঁর দিব্যভাবটি ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়ছে এবং ক্রিয়াশীল হচ্ছে। শক্তির এমনই খেলা যে তা ক্রমশঃ বর্ধিত হতে হতে বিশ্বকে আলোড়িত করে। এ শুধু শাস্ত্রের কথা নয়—আমরা পরমহংসদেবের জীবনে দেখতেও পাচ্ছি তাই। তাঁর শক্তি তাঁর শিষ্যদের দ্বারা প্রকাশিত হয়ে নূতন বিশ্ব সৃষ্টি করছে। এই জন্যই তিনি অবতার। সহস্র মানুষে যা সম্ভব হয় না ভগবৎশক্তি, অবতরণ করলে তা

আপনিই সম্ভব হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মহাবতার ছিলেন—তাই আজ সকলের ভিতরে তাঁর শক্তির স্ফূর্তি। তাঁকে চিন্তা করলেই মানুষ শান্ত ও বুদ্ধ হয়। একালে তাঁর শক্তি অদ্ভুত-ভাবে বিকশিত হয়েছে। যাঁরা ইদানীং ধর্মপথে অগ্রসর হয়েছেন জ্ঞানে হোক অজ্ঞানে হোক তাঁর শক্তিতেই তাঁরা ঊর্ধ্বগমন করছেন। প্রত্যেক অবতারের একটি কর্তব্য (mission) আছে—সেটা হচ্ছে এই—তাঁদের ধরে রাখলে অতি সহজে বড় বড় তথ্যের প্রকাশ হয় এবং মানুষের চিত্তটি নির্মল ও ভাস্বর হয়ে ওঠে। প্রত্যেক অবতারই বলতে গেলে Occultist, কেননা প্রত্যেকের ভিতর দিয়েই এইরূপ শক্তি বিকিরিত হয়, মানুষকে বহু সাহায্য করে এবং অতি সহজে ভক্তি, যোগ, জ্ঞানের স্পন্দন জাগিয়ে দেয়। এই ভাবেই শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি এই সমাজের ভিতরে স্থিত হয়ে সমাজকে উদ্ধার করছে এবং ধীরে ধীরে সমস্ত সমাজে ছড়িয়ে পড়ছে।

পরমহংস

শ্রীমাধুর্যময় মিত্র

নীর আর ক্ষীর একসাথে আছে মিশে
সৎ ও অসৎ বস্তুর সমাবেশে;
শুনেছি মানস-হংসের দল
ক্ষীরটুকু খায়, পড়ে থাকে জল,
শাশ্বত শ্রেয় বেছে নেয় তারা ক্ষণিকের প্রেয় হতে,
এই ধরণীর নীর-ক্ষীর-মেশা স্রোতে।

* * * *

সংসার হতে সার ও অসার সবটুকু তুমি নিলে
তাই কি তোমারে পরমহংস বলে?
শুচি অশুচির ক্ষুদ্র সীমায়
বাঁধিতে পারেনি বিরাট তোমায়,
ভবতারিণীরে মূর্ত দেখেছো বারবনিতারও মাঝে;
রূপে রূপে তুমি একই অপরূপে দেখেছো দিব্য সাজে।

ঘৃণ্য যাহারা সমাজে সদাই
তুমি তাহাদের ফেলে রাখ নাই
অবহেলাভরে দূরে একপাশে আবর্জনার মতো
কৃপার মলয়স্পর্শে করেছো চন্দনে রূপান্বিত।
আমি যে দেখেছি স্বরূপ তোমার
দ্রব করুণার অমিত আধার,
দুর্দম প্রেমে উদ্বেল তব হৃদয়ের দুই তীর—
প্রভেদ হারায়ে একাকার সেথা নিখিলের ক্ষীর নীর।

শ্রীশ্রীমা *

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী

আজকের এই মহিলা-সম্মেলনে যে মহীয়সী মহিলার সুমহান জীবনকথা আলোচনা করবার জন্যে তাঁর ভক্তজনেরা এখানে উপস্থিত হয়েছেন, ভাগ্যক্রমে তাঁদের মধ্যে উপস্থিত হ'তে পারবার সুযোগ পেয়ে নিজেকে যেমন ধন্য মনে করছি, তেমনি আশঙ্কিতও হচ্চি।

আশঙ্কাটা হচ্ছে অযোগ্য লোকের অযোগ্যতা প্রকাশ হয়ে যাবার।

অনধিকারী যদি অধিকার পায়, আনন্দের চাইতে আতঙ্কই বেশী হয় তার।

কথাটা মামুলি বিনয়ের কথা নয়, নেহাৎই খাঁটি কথা। নিজে তো জানি, নিজের যোগ্যতা কতোটুকু?

শ্রীশ্রীমায়ের কথা আমি কি বলবো? বলবার অধিকারই বা কোথায়? জীবনীগ্রন্থ পাঠ করে নিয়ে খানিকটা কাহিনী, কয়েকটা ঘটনা, আর কিছুটা তথ্য সংগ্রহ করে ফেলতে পারলেই কি মহান্ জীবনের জীবনকথা আলোচনা করবার অধিকার জন্মায়?

তথ্য সংগ্রহ করে করে যে জানা, সে কতোটুকু জানা?

বাছাই করা ভালো ভালো কয়েকটা কথা সাজিয়ে একটা প্রশস্তি রচনা করে পাঠ করবারই বা মূল্য কি? যদি—সেই মহৎ জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে যে সহজ সুন্দর জীবনদর্শন—তা'কে দেখতে না শিখি?

অমন একটি ভাবরূপ সত্তাকে উপলব্ধি করতে যে স্বচ্ছ অনুভূতির প্রয়োজন, সে অনুভূতির আভাসমাত্র কোথায় আমাদের এই সংসারবদ্ধ জড়চিত্তে?

অথচ—আপাতদৃষ্টিতে দেখতে গেলে শ্রীশ্রীমাও আমাদের, সংসারীই ছিলেন! রীতিমত সংসারী!

লোকে দেখতো—তিনি র'াধছেন বাড়ছেন, কুটনো কুটছেন, বাটনা বাটছেন। যেন এই সব তুচ্ছ গৃহকর্ম্মই তাঁর একান্ত কর্ত্তব্য। একমাত্র কাজ।

মা নিজে জানতেন না—তিনি কী! তিনি কে!

তাই তিনি সবাইকে বলতেন—"সর্ব্বদা কাজ করতে হয়, কাজে দেহমন ভালো থাকে। আমি যখন আগে জয়রামবাটী থাকতুম, দিনরাত কাজ করতুম।"

কথায় আছে—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না—প্রথম দিকে মায়ের ভাগ্যেও প্রায় সেই অবস্থাই ঘটেছিলো।

পরিবারের পাঁচ জনে তাঁকে 'সংসারবঞ্চিতা' বলে করুণা করেছে, 'দুঃখী' বলে আহা করেছে। আবার হেয় করতেও ছাড়েনি, পাড়ার লোকের বাড়ী বেড়াতে যাবার মুখ ছিলো না মার, গেলেই লোকে কথার ছলে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতো—'আ ছি ছি, শ্যামার মেয়ের ক্ষ্যাপা বরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে—'

কিন্তু মা ছিলেন সব কিছুতেই অবিচলিত।

ধৈর্য্য স্থৈর্য্য সহের প্রতিমা।

সেই নিতান্ত বালিকা বয়সেও ভুলেও কোনো দিন তিনি কপালে করাঘাত করে নিজের ভাগ্যকে ধিক্কার দেননি। অন্যের সুখ-সৌভাগ্য দেখে ক্ষোভের নিশ্বাস ফেলেন নি।

আবার পরবর্ত্তী জীবনে—

* শ্রীরামপুর মহিলা-সম্মেলনে পঠিত।

ঠাকুর যখন বলতেন—"যে মা মন্দিরে আছেন, সেই মাই নহবতে বাস করছেন, আবার তিনিই এখন আমার পদসেবা করছেন। সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলেই তোমাকে সত্য দেখতে পাই গো—"

তখনও মায়ের তেমনি অবিচল স্থৈর্য্য।

এহেন অপরূপ তত্ত্ব, এতোবড়ো বিপর্য্যয়ের বাণীও সেই অবিচলিত নম্রতাকে বিভ্রান্ত করে ফেলতে পারেনি।

ভেবে ধারণা করা যায় না, কতো প্রচণ্ড-শক্তির অধিকারিণী হলেই তবে এমন প্রচণ্ড তত্ত্বকে নিতান্ত অবলীলায় নিজের মধ্যে পরিপাক করে নেওয়া সম্ভব!

আজকালকার এই আড়ম্বরের যুগে, অতি প্রচারের যুগে, আত্মবিজ্ঞাপনের যুগে, ভেবে অবাক হয়ে যেতে হয়, কী সহজ সরল নিরাড়ম্বর আবরণের মধ্যে স্বচ্ছন্দে স্থান পেয়েছিলো সেই অসীম শক্তি!

মা সাধারণের রূপে অসাধারণ! চেষ্টাকরা ছদ্মবেশ নয়, সেই সহজ সাধারণ ভাবই মার নিজভাব।

ঘরের কোণের—মাটির প্রদীপের স্থির শিখার মতো নিঃশব্দ মহিমায় জ্বলেছে সেই এক অনন্ত জ্ঞানের শিখা।

কতো অজ্ঞান ব্যক্তি এসে সেই শিখায় জ্বালিয়ে নিয়েছে নিজেদের অন্ধকার জীবনদীপ! কতো কতো বিরাট পুরুষ অকপটে এসে মাথা নুইয়েছেন সেই অনায়াস মহিমার কাছে।

মনে হয়—বিষ্ণুপ্রিয়ার অসম্পূর্ণ রূপকে সম্পূর্ণ করে তুলতেই বুঝি শ্রীশ্রীমায়ের জগতে আবির্ভাব।

আমরা জানি—সংসারত্যাগী স্বামীর অভাগিনী স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া! পতিবিরহবিধুরা অশ্রুমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া!

"শচীমাতা কাঁদে ঘর ফেটে যায়,
বিষ্ণুপ্রিয়া দ্বারে পুতলির প্রায়,
দাঁড়ায়ে ললনা বিষণ্ণবদনা
বিন্দু বিন্দু অশ্রু পড়িতেছে পায়।"

বিষ্ণুপ্রিয়ার এই ছবিই শ্রেষ্ঠ ছবি!

যুগযুগ ধরে এই বিষাদপ্রতিমাখানির জন্যে ব্যথাহত ব্যাকুল মানব-হৃদয়ে সঞ্চিত হয়ে আছে—মমতা, সহানুভূতি, আক্ষেপ।

শ্রীশ্রীমায়ের এবারের লীলা সেই আক্ষেপ দূর করবার জন্যে।

এ লীলায় জগতের লোক দেখলো—নারী-রূপের সম্পূর্ণতা হচ্ছে মাতৃরূপে।

এই বিশ্বমাতৃরূপের নীচে কোন্ অতলে তলিয়ে গেছে সংসারসুখ-বঞ্চিতা, নিরুদ্ধ-যৌবনার বিষাদময়ী মূর্ত্তি!

আজ আমাদের মেয়েদের জীবনে কতো জটিলতা, কতো সমস্যা! মাঝে মাঝে মনে হয়—নারী-সমস্যাই বোধ করি এ যুগের প্রধান সমস্যা।

অস্থির অসন্তুষ্ট নারীজাতির জন্যে নিত্য নতুন আন্দোলন, নিত্য নতুন আয়োজন। আমরা অহরহ বলছি—আমরা আর মেয়েমানুষ হয়ে থাকতে চাই না, 'মানুষ' হতে চাই।

অতএব আমাদের 'মানুষ' করে তোলবার জন্যে দেখা দিচ্ছে কতো অজস্র পরিকল্পনা, রচনা করা হচ্ছে যতো—অদ্ভুত অদ্ভুত আইন!

কোন্‌টা গ্রহণীয়, কোন্‌টা বর্জ্জনীয়, এ নিয়ে তর্কের আর শেষ নেই।

কিন্তু চোখের সামনের এই স্থির সহজ বিরাট আদর্শের দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। বিচার করে দেখবার কৌতুহল পর্য্যন্ত নেই।

পুরণোকালের বাতিল ফ্যাসানকে আমরা আবার পরম আদরে ডেকে আনছি—শাড়ী

গহনা কেশবেশের মাধ্যমে, কিন্তু পুরণো আদর্শের দিকে তাকিয়ে দেখতে গেলেই শিউরে উঠে মূর্চ্ছা যাই।

সে আদর্শের দিকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিয়ে আমরা মহা উল্লাসে এগিয়ে চলেছি সমুদ্রপারের আলোর হাতছানিতে! কে জানে সেই অচেনা অজানা আলোর মহিমায় আমরা সত্যিই কোনোদিন উদ্ভাসিত হয়ে উঠবো, না সেই অগাধ সমুদ্রের অতলজলে আমাদের উল্লাস-যাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটবে?

এই ভোগবাদের যুগে ত্যাগের কথা মুখে আনাও ধৃষ্টতা।

ত্যাগের আদর্শ হাস্যকর - মৃত আদর্শ!

নির্লজ্জ সংগ্রামে জাগতিক সমস্ত সুখসুবিধে আদায় করে নেবো এই হচ্ছে আমাদের এখনকার মেয়েদের পণ!

মা বলতেন—"মেয়েদের লেখাপড়া শিখতে দাও, কিন্তু যে শিক্ষায় মেয়েরা লক্ষ্মীছাড়া বেহায়া হয়ে ওঠে, সে শিক্ষা তাদের দেওয়া উচিত নয়।"

কিন্তু একথা কি অস্বীকার করা যায়, আজকের দিনে মেয়েদের যা শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে, সে শিক্ষা লক্ষ্মীছাড়া বেহায়া হয়ে ওঠবারই শিক্ষা?

প্রত্যেক বিষয়ে পুরুষের সমান হবো—সেই 'হতে পারাটাই' নারীজীবনের চরম সার্থকতা, এর চাইতে শোচনীয় হাস্যকর আদর্শ আর কি হতে পারে?

অথচ এমনই অন্ধ হয়ে ছুটছি আমরা যে এই হাস্যকর দিকটা তাকিয়ে দেখবার হুঁশমাত্র নেই।

স্বভাবগত সৌন্দর্য্য শোভনতা লজ্জালালিত্য সবকিছু বিসর্জ্জন দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে জোর-করে দখল করে নেবো - পুরুষের দখলিকৃত জমি, এই হলো শেষ সাধনা!

এর উর্দ্ধে আর কিছু নেই!

পুরুষকে অতিক্রম করে যাবার যে শক্তি, সে শক্তিতে বিশ্বাস হারিয়েছি আমরা!

তবু মাঝে মাঝে আশা হয়, এ অশান্ত উত্তেজনা শেষ হয়ে যাবার দিন হয়তো আসছে!

জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের সমকক্ষ হতে হতে অদূর ভবিষ্যতে একদিন ক্লান্ত অতৃপ্ত নারী-সমাজ বুঝতে পারবে এই সাধনাই সাধনার শেষ কথা নয়!

যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে মামলা জেতার মতো, নারীচরিত্রের সমস্ত শালীনতা হারিয়ে পুরুষের অধিকৃত জমির ভাগ দখল করে অবশেষে সে দেখতে পাবে সেই জমির সীমানা কতোখানি! বুঝতে পারবে—আইনের প্যাঁচ কষে আদায় করে নেওয়া যে অধিকার, সে অধিকারের জোর কতোটুকু?

সেদিনের সেই আচারনিষ্ঠাহীন ত্যাগধর্ম্মহীন শ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত নারীসমাজ আবার মুখ ফিরিয়ে তাকাবে—ফেলে আসা পিছনের দিকে।

আবার আশ্রয় নেবে—সারদামণির আদর্শের স্নিগ্ধছায়ায়!

"ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন 'এর পর ঘরে ঘরে আমার পূজা হবে। আমার যে কত লোক তার কূলকিনারা নেই।' বলতেন, 'আমি ছাঁচ করে গেলুম, তোরা সব ছাঁচে ঢেলে তুলে নে।' ছাঁচে ঢালা মানে ঠাকুরকে ধ্যানচিন্তা করা। তাঁকে ভাবলেই সব ভাব আসবে।" —শ্রীশ্রীমা

শ্রীরামকৃষ্ণ ও শক্তিপূজা

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধি স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়াছে। বিভিন্ন পথ ও মতের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমে ধর্মসাধনার সার্বভৌম সত্য উপলব্ধি করিলেন। এত বিচিত্রভাবে সাধনার কি প্রয়োজন ছিল? ঈশ্বরলাভ অথবা অধ্যাত্ম-জীবনের চরম অনুভূতিই যদি তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহা হইলে জগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শন-লাভের পর, সর্বসংশয় ছিন্ন হইবার পরও তিনি বারম্বার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতে কঠোর তপশ্চর্যা করিলেন কেন? তাঁহার দিব্যজীবনের এই পরম অভিপ্রায়টি পূজ্যপাদ আচার্য স্বামী সারদানন্দজী 'লীলাপ্রসঙ্গে' অপূর্ব ভঙ্গীতে মানববুদ্ধিগ্রাহ্য ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার মধ্যে সর্বধর্মসমন্বয়ের মূর্ত বিগ্রহ দেখিয়াছিলেন, এবং সকল ধর্মই সত্য, ঈশ্বরলাভের বিভিন্ন পথমাত্র, শ্রীগুরুর এই বাণী ধর্মকলহ নিরসণকল্পে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সমসাময়িক জগৎ, বিশেষভাবে বহু ধর্মসম্প্রদায়-প্লাবিত ভারতের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ধর্মমত ও সাধনাকে বিকৃতির কলুষমুক্ত করিবার জন্যই যুগাবতাররূপে ঠাকুরের আবির্ভাব। ইহা আমাদের মত স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরও বুঝিতে বিশেষ কষ্ট হয় না। ঠাকুরের তো কথাই নাই, তাঁহার শিষ্য ও প্রশিষ্যগণের জীবন ও উপদেশের সহিত যাহাদের প্রত্যক্ষ পরিচয়-লাভের সৌভাগ্য হইয়াছে, তাঁহারাও নবযুগধর্মের রূপান্তর অনুভব করিয়াছেন। কি সে রূপান্তর?

শ্রীরামকৃষ্ণের মত যুগপ্রবর্তক মহাপুরুষগণ সমগ্র জগৎ ও মানবজাতির কল্যাণের জন্যই অবতীর্ণ হন। সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে রাখিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিচার করিতে গেলে একদেশদর্শী হইবার আশঙ্কাও থাকিয়া যায়। সেদিকে সতর্ক থাকিয়াও আমি বলিব, লোকোত্তরচরিত্র মহাপুরুষগণ যে জাতির মধ্যে, যে কালে, যে সামাজিক আবেষ্টনীর মধ্যে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাহাদের কল্যাণ-সম্বন্ধেও তাঁহাদের একটা বিশেষ অভিপ্রায় থাকে। অনন্তভাবময় ঠাকুরের মধ্যেও আমরা ইহা লক্ষ্য করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বের ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রতি দৃষ্টিপাত করা যাক। জরাজীর্ণ বৌদ্ধধর্ম, ভারতের প্রত্যন্তবাসী অনার্যদের দেবদেবী, ভূতপ্রেত, তাহাদের আচার নিয়ম উপাসনাপদ্ধতি আত্মসাৎ করিয়া সমগ্র গৌড়মণ্ডলে নানাশ্রেণীর উপাসকমণ্ডলী ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিল। যুক্তিহীন বেদ-বিরুদ্ধ এই সকল সম্প্রদায়কে যখন পৌরাণিক দেবদেবীর মাহাত্ম্য দ্বারা মুগ্ধ করিয়া ব্রহ্মণ্য-শক্তি নূতনভাবে বিন্যাস করিতে গেল, সেদিনের ইতিহাস খুব স্পষ্ট নয়। বৌদ্ধ দেবদেবীদের প্রতিষ্ঠা ভ্রষ্ট করিয়া পৌরাণিক (বৈদিক নহে) দেবদেবীদের সিংহাসনে বসাইতে গিয়া অনেক আপসরফা করিতে হইয়াছে। সামাজিক স্থিতি এবং লোক-সাধারণকে নীতি-ধর্ম দিবার জন্য সেই পদ্ধতির প্রয়োগের কোন বিবরণ নাই। প্রাচীন স্মৃতি বিশেষভাবে লোকসঙ্গীত ও মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে তাহার কিছুটা আভাস পাওয়া যায়। বাঙ্গলার ব্রাহ্মণগণ, বৌদ্ধ শ্রমণদের সরাইয়া সমাজে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টায়, আর্যসমাজের মূলভিত্তি চতুর্বর্ণ-বিভাগকেই

বর্জন করিলেন। বাঙ্গালী সমাজে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য দুই বর্ণই লোপ পাইল। একদিকে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ, অন্যদিকে অগণিত শূদ্র। সামন্ততান্ত্রিক রাজশক্তির সহায়তায় শূদ্রের সামাজিক অধিকার যেমন সঙ্কুচিত করা হইল, তেমনি ধর্মসাধনায়, পূজা-উপাসনায় ভক্তিতে গদগদ হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়া ছাড়া (তাহাও দূর হইতে) আর কিছুই রহিল না।

সমাজের যখন এই অবস্থা এই সময় আসিল ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান রাজশক্তি। এই বিপ্লব বাঙ্গালীর ধর্মসাধনায় ও সমাজের উপর কি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিল, তাহার কিছুটা পরিচয় গীতিকবিতা ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে পাওয়া যায়। স্বেচ্ছাচারী নূতন রাজশক্তির আশ্রয়ে ফকীর ও দরবেশরা ইসলাম প্রচার আরম্ভ করিলেন। এই সময়টা ধর্মের নামে জোর জবরদস্তির যুগ। ফলে স্ত্রী-দেবতাগণের জোর করিয়া পূজা আদায় করিবার দাবীর দৌরাত্ম্যে শৈব সাধনা এবং শান্তি ও ত্যাগের দেবতা, ভোগবিমুখ উদাসীন দেবতা শিব সরিয়া গেলেন,—তাঁহার বুকের উপর দাঁড়াইলেন রণচণ্ডী কালী। চণ্ডী ও মনসার প্রকৃতি অনেকটা মুসলমান রাজশক্তির মত। এঁরা ন্যায় অন্যায় মানেন না, এঁদের অনুগ্রহ-নিগ্রহ নীতির ধার ধারে না। দেবীদের ছলনা ও নিষ্ঠুরতার নিকট সমাজ মাথানত। ছোটকে বড়, দরিদ্রকে ধনী, ভিখারীকে রাজা করিতে যে আর কিছুই চাহে না, চাহে বলি, চাহে পূজা, সেই ভীষণার পদতলে মা মা বলিয়া লুটাইয়া না পড়িয়া উপায় কি? ইহলোকে সুখ ঐশ্বর্য প্রভুত্বের একমাত্র পথ শক্তিপূজা।

অন্যদিকে ঐহিক ও বৈষয়িকক্ষেত্রে অভ্যুদয়ের হতাশায় শূদ্রশক্তি ইসলাম গ্রহণ করিতে লাগিল এবং ইহলোকবিমুখ বৈষ্ণব সাধনার কান্ত ও দাস্যভাব অবলম্বন করিল। ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গলায় বেগবান প্রচারশীল ইসলামের পাশাপাশি শাক্ত ও বৈষ্ণবের সাধনধারা পরস্পরের বিরোধী হইয়া বহিতে লাগিল। শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব, মঙ্গলকাব্যের যুগ হইতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছে। বৈষ্ণবসাধনা এবং শক্তিসাধনা এই দুইএর বিকৃতির কথা সবিস্তারে বলিবার প্রয়োজন নাই। বিকৃতি কেমন করিয়া ঘটিল, তাহার আভাস মাত্র দিয়াই আমি ক্ষান্ত হইব, কেননা বিশদ বিশ্লেষণ আমার উদ্দেশ্য নহে। এবং এই আলোচনায় বৈষ্ণবের কান্তভাব অপেক্ষা শক্তিপূজার মাতৃভাবই আমার বক্তব্য বিষয়।

শক্তি-সাধনা ও শক্তি-পূজার একটা শাস্ত্রীয় দিক নিশ্চয়ই আছে। শিব ও শক্তির দার্শনিক তত্ত্ব যে বেদান্তের অদ্বৈত-সাধনার ভিত্তি এতো শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই বলিবেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টিতে শক্তিপূজার স্বরূপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। প্রকৃত কৌলের শক্তিসাধনা এবং বিষয়ীর ও লোক-সাধারণের শক্তিপূজা এক বস্তু নহে। শেষোক্ত শক্তিপূজাই দুর্বল বিধর্মী বিজিত বাঙ্গলায় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। এই শক্তি স্বেচ্ছাচারিণী নিষ্ঠুর, ইহাকে তুষ্ট করিবার পদ্ধতিও বীভৎস। ইনি উপযুক্ত বলি পাইলে জ্ঞাতিশত্রু বিনাশ করেন, প্রতিদ্বন্দ্বীকে নির্বংশ ও হীনবল করেন, রাজশক্তির মনকে অনুকূল করেন, এমন কি নরবলি পাইলে দস্যুদের পর্যন্ত সহায়তা করেন। সাধারণ লোকে দেখে এবং মনে করে অমুক নর-ঘাতক ভ্রষ্টাচারী চণ্ডী বা কালীপূজার ফলেই মুসলমান রাজশক্তিকে প্রসন্ন করিয়া রাতা-রাতি রাজা হইয়া বসিল। তখন সংসারে যাহারা পীড়িত বঞ্চিত, অথচ তাহাদের দুঃখদৈন্যের কোন ন্যায়ধর্মসঙ্গত কারণ নাই,

তাহারা ধরিয়া লইল, তাহাদের দুর্গতির কারণ দেবীর কোপ। স্তবপূজা বলিতে তাঁহাকে তুষ্ট করা ছাড়া আর কোন পথ নাই। সেই স্বামিজীর কথা—

"মুণ্ডমালা পরায়ে তোমায়, ভয়ে ফিরে চায়
নাম দেয় দয়াময়ী,
প্রাণ কাঁপে ভীম অট্টহাস, নগ্ন দিক্‌বাস,
বলে মা দানবজয়ী।
* * * ভক্তিপূজাচ্ছলে স্বার্থসিদ্ধি মনে ভরা।"

মুঘল পাঠান যুগে স্বেচ্ছাচারী রাজশক্তির যে নীতিধর্মহীন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ, তাহার মধ্যেও শক্তিরই প্রকাশ মানুষ দেখিল; ফলে দেবচরিত্র-গুলির মধ্যেও মানুষ একই শ্রেণীর বিভীষিকা দেখিতে লাগিল। ছলনাময়ী প্রতিহিংসা-পরায়ণা শক্তির পদতলে শিব ও ধর্মকে বলি দিয়া লৌকিক উপাসনা-পদ্ধতি কলুষিত হইয়া উঠিয়াছিল। শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সাধনধারাই রাজনৈতিক ও সামাজিক নানা কারণে আবিল হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দ্রিয়-ভোগমূলক কুৎসিত কদাচার ধর্ম-সাধনার অঙ্গ বলিয়া বিবেচিত হইত। ধর্মের গ্লানির এই পঙ্ক লইয়া পরস্পরের অঙ্গে নিক্ষেপ—পাঁচালী-গানে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব সর্বশ্রেণীর লোক উপভোগ করিত।

শাস্ত্রে শক্তি-সাধনার যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এবং অর্বাচীন যুগের তন্ত্র ও মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবদেবীদের যে ভ্রষ্টাচার এবং যথেচ্ছাচারের বিভীষিকা বর্ণিত হইয়াছে, তাহার রাশি রাশি আবর্জনার মধ্য হইতে সত্য-উদ্ধার সাধারণ মানুষের কাজ নহে। কুযুক্তি ও কুতর্কের নিরসন করিবার জন্য এই সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাব। হিন্দুর পূজাপদ্ধতির দুর্গতি দেখিয়া রাজা রামমোহন মূর্তিপূজা বর্জন করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বেদান্ত গ্রহণ করিয়া "আত্মা পরমাত্মার অভেদ চিন্তনরূপ মুখ্য উপাসনা" প্রচার করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ মূর্তিপূজাকে অবলম্বন করিয়াই স্তরে স্তরে চরম সত্যে পৌঁছিলেন। তাঁহার মূর্তি-পূজা প্রণালীবদ্ধ উপাসনা নহে; মাতাপুত্রের এক রহস্যময় লীলা-বিলাস। প্রথমে তন্ময় আত্মো-পলব্ধির পথে, পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে গুরুরূপে বরণ করিয়া যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠানের পথে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর দেখিলেন, ভক্তির দিক হইতে যিনি জগন্মাতা, জ্ঞানের দিক হইতে যিনি অঘটনঘটন-পটীয়সী মায়া, যোগের দিক হইতে তিনি বিশ্বের মূলীভূতা আদ্যা-শক্তি। শক্তিপূজা শক্তি-সাধনা ঠাকুরের সাধনা ও সিদ্ধির মধ্য দিয়া পুনরায় কলুষমুক্ত হইল। কামনা-বাসনা, ব্যক্তিগত ইষ্টলাভের স্বার্থান্ধ বুদ্ধির গণ্ডীর বাহিরে সচ্চিদানন্দময়ী মা প্রসন্না ও বরদা হইয়া দেখা দিলেন। বাঙ্গালীর ধর্ম-সাধনায় ভক্তিমার্গে যত আবিলতা, যত বিকৃত ভাবাবেগের উদ্‌ভ্রান্ত উচ্ছ্বাস প্রবলাকার ধারণ করিয়াছিল, ঠাকুরের বাহ্য ভক্তিভাব তাহাকে বাহির হইতে আঘাত না করিয়া, ভিতর হইতে নিরসন করিল। তত্ত্বজ্ঞ ইহার নিগূঢ় ব্যাখ্যা করিবেন। আমি অনধিকারী।

"আমার ভাব মাতৃভাব—সন্তানভাব। মাতৃভাব অতি শুদ্ধ ভাব, এতে কোন বিপদ নাই, কোন ভোগের গন্ধ নাই। ভোগ রাখলেই ভয়। মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা। 'তুমি মা, আমি তোমার ছেলে' এই শেষ কথা।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পুণ্যভূমি বাংলাদেশে এই দুই অবতার পুরুষের আবির্ভাব জগতে এক বিস্ময়কর ব্যাপার—মাত্র ৪৫০ বছর পরস্পরের ব্যবধান। একজন জন্মিয়াছিলেন বিদ্যাকেন্দ্র নদীয়া নগরে; —রূপে ও মাধুর্যে অনুপম; বিদ্বান, পণ্ডিত অধ্যাপক, অপরের জন্ম চারটী জেলার প্রায় প্রান্ত-সংলগ্ন হুগলী জেলার এক সামান্য দরিদ্র ব্রাহ্মণের ঘরে কামারপুকুর গ্রামে, বিদ্যায় সামান্য লিখন-পঠন-ক্ষম এবং দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত মা ভবতারিণীর মন্দিরে সামান্য বেতনভুক্ পূজারী। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের কথাই অনেকের মনে উদয় হইত। সর্বপ্রথমে ভৈরবী ব্রাহ্মণী প্রকাশ্যে পণ্ডিত সভায় নিতাইএর খোলে শ্রীগৌরাঙ্গ বলিয়া রামকৃষ্ণকে প্রচার করিলেন, বৈষ্ণব সমাজে সমাদৃত বৈষ্ণবচরণও তাহা স্বীকার করিয়া লইলেন এবং কালনার সুবিখ্যাত সিদ্ধবৈষ্ণব মহাজন ভগবান দাস বাবাজী রামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন—'ইনি শ্রীচৈতন্য-আসনে বসিবার যোগ্য।' ব্রাহ্মসমাজ-নেতারাও কেহ কেহ গৌরাঙ্গের সঙ্গে রামকৃষ্ণের তুলনা করিয়াছেন। শ্রীকেশবচন্দ্রের পরিচালিত 'ধর্মতত্ত্ব' পত্রিকায় স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়াছেন "আমরা চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষের জীবন পুস্তকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ইঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।" স্বয়ং বিবেকানন্দ স্বামিজী ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে স্বামী সারদানন্দের নিকট ঠাকুরের কৃপায় যে দিব্যানুভূতি অনুভব করিয়াছিলেন, সেই প্রসঙ্গে ভাবমগ্নভাবে গাহিলেন "প্রেমধম বিলায় গৌর রায়। গীত সমাপ্ত হইলে আপনমনে তিনি বলিতে লাগিলেন সত্য সত্যই বিলাইতেছেন। প্রেম বল ভক্তি বল, জ্ঞান বল মুক্তি বল গোরা রায় যাহাকে যাহা ইচ্ছা বিলাইতেছেন। কি অদ্ভুত শক্তি!" এই সব বলিতে বলিতে শেষে বলিলেন, "দক্ষিণেশ্বরের গোরা রায় সব করিতে পারেন।" গিরিশ বাবু বলিতেন, "চৈতন্যলীলা না লিখলে আমি ঠাকুরকে অবতার বলে বুঝতে পারতাম না।" কেন শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া কাহারও কাহারও মনে শ্রীগৌরাঙ্গের কথা মনে হইত? রূপে গুণে কোন মিল নাই, অথচ কোথায় সেই সৌসাদৃশ্য!

গঙ্গাতীরে ঠাকুর 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিয়া শেষে দুইটি পদার্থ এক মনে করিয়া জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে—বালক নিমাইকে শচীমাতা খই-সন্দেশ খাইতে দিয়া রন্ধন-গৃহে প্রবেশ করিয়াছিলেন। আসিয়া দেখেন, বালক নিমাই খইসন্দেশ ফেলিয়া দিয়া মৃত্তিকা ভক্ষণ করিতেছেন। শচীমা হায় হায় করিতে লাগিলেন। পুত্র নিমাই মাকে বলিলেন—তুমি এরূপ করছ কেন? তুমি তো আমাকে মাটি খাইতে দিয়াছ। তাহাতে শচীমা বলিলেন, 'একি—তোমাকে তো খই-সন্দেশ খাইতে দিয়াছি।' তখন বালক নিমাই উত্তর করিলেন—

খই-সন্দেশ আদি যত মাটির বিকার।
এহ মাটি সেহ মাটি কি ভেদ ইহার॥

গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ ইহার বীজসঞ্চারে বলিয়াছেন "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ"। শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় ও বিচারে ইহার পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাই।

স্পর্শে দর্শনে গৌরাঙ্গ যেমন ভাবসঞ্চার করিতেন ঠাকুরের দিব্য জীবনে ইহা বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয়।

সংকীর্তন ও অপূর্ব নৃত্য, দিব্যভাবে বাহ্যসংজ্ঞা-হারা—দুই জনের মধ্যেই দৃষ্ট হয়। পাণিহাটী উৎসবে, বলরাম-মন্দিরে, দক্ষিণেশ্বরে, অধর সেনের আলয়ে, রামচন্দ্রের গৃহে, বেলঘরিয়ায় ব্রাহ্মোৎসবে, মণি মল্লিক ও জয়গোপাল সেনের গৃহে যাঁহারা ঠাকুরের কীর্তন নৃত্য ও মুহুর্মুহু ভাব-সমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়াছেন—তাঁহারা অবাক বিস্ময়ে ভাবিয়াছেন, ইনি কি সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ ?

বৈষ্ণব দার্শনিক ও ভক্তেরা শ্রীগৌরাঙ্গকে খাঁটি দ্বৈতবাদি-রূপে প্রমাণ করিতে প্রয়াস পান এবং তাঁহাকে আচার্যশঙ্কর-বিরোধী মায়াবাদী অদ্বৈতবাদবিদ্বেষি-রূপে বর্ণনা করিয়া থাকেন। দুঃখের বিষয় তাঁহার এই সম্বন্ধে কোন রচনা বা গ্রন্থ নাই। সেই জন্য সার্বভৌমের সহিত বেদান্ত-বিচারের কথার চৈতন্য-ভাগবতে কোন উল্লেখ নাই। নীলাচলে শ্রীচৈতন্যসঙ্গী নিত্যানন্দ-শিষ্য বৃন্দাবনদাসের রচিত গ্রন্থে ইহার কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। চরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী বিচারের কিছু মর্ম প্রকাশ করিয়াছেন—তাহাতে দেখা যায় জীবজগৎ সবিশেষ ঈশ্বরের রূপ, ঈশ্বরে অচিন্ত্যশক্তিযোগে পরিণাম :

বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ।
দেহে আত্মবুদ্ধি—এই বিবর্তের স্থান॥

এইটি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সিদ্ধান্ত-বাক্য বলিয়া প্রকাশ। কাশীধামে প্রকাশানন্দকে এবং পুরীধামে সার্বভৌমকে তিনি ইহা বলিয়াছিলেন। অথচ তিনি নিজেকে মায়াবাদী সন্ন্যাসী বলিয়া কখনও কখনও পরিচয় দিয়াছেন এবং—

সিংহারি মঠে আইলা শঙ্করাচার্য-স্থানে।
মৎসতীর্থ দেখি কৈল তুঙ্গভদ্রায় স্নানে॥

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন "তিনি একরূপে নিত্য, একরূপে লীলা। বেদান্তে কি আছে? ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু যতক্ষণ 'ভক্তের আমি' রেখে দিয়েছেন ততক্ষণ লীলাও সত্য। 'আমি' যখন তিনি পুঁছে ফেলবেন, তখন যা আছে তাই আছে। কলাগাছের খোল ও মাঝ, বেলের শাঁস খোলা আর বীচিগুলো ফেলে দিলে বেলের ওজন পাওয়া যায় না।" তাই তিনি বলিতেন, "নিত্য বল্লেই লীলা আর লীলা বল্লেই নিত্য বোঝায়। তিনি জীবজগৎ হয়েছেন, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন—যখন নিষ্ক্রিয়, তখন তাঁহাকে ব্রহ্ম বলি।" মহাপ্রভু বোধ হয় এইরূপ মতপ্রচার করেছেন—ব্রহ্ম আর তাঁর অচিন্ত্যশক্তি। যুগধর্ম প্রেমভক্তি। ঠাকুরও বলিতেন, কলিযুগে নারদীয় ভক্তি।

শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস-গ্রহণের পরে নিজের পরিচয় দিতেন—'আমি মূর্খ।' শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন, 'আমি মূর্খোত্তম।' শ্রীগৌরাঙ্গ প্রার্থনা করিয়াছেন :

"ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥"

অর্থাৎ 'হে জগদীশ, আমি ধন জন সুন্দরী স্ত্রী বা কবিত্ব-শক্তি চাই না। হে ভগবান, শুধু চাই তোমাতে যেন জন্মে জন্মে আমায় অহৈতুকী ভক্তি থাকে।' কামনাশূন্য ভক্তিই অহৈতুকী বা শুদ্ধা ভক্তি। ঠাকুরের প্রার্থনা "মা, আমি তোমার শরণাগত, শরণাগত। দেহসুখ চাই না মা, লোকমান্য চাই না, অষ্টসিদ্ধি চাই না। কেবল এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়, নিষ্কাম, অমলা অহৈতুকী ভক্তি।"—একই সুর।

শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাভাবদ্যুতিশবলিত। শ্রীরাধাই মহাভাবময়ী প্রেমের পরাকাষ্ঠা। প্রেমের সর্বশ্রেষ্ঠ ঊর্ধ্ব স্তর গাঢ়তম অবস্থা, চরম অনুভূতির নাম

মহাভাব। প্রেমে—ভাবে, অশ্রুকম্প-পুলকাদির অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ বা বিকার। মহাভাবে উনিশ প্রকার লক্ষণ। এই মহাভাব দুই ভাবে প্রকাশ পায়। মাদন ও মোদন। রূপগোস্বামী উজ্জ্বল-নীলমণি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সর্বভাবোদ্গমোল্লাসী মাদনোঽয়ং পরাৎপরঃ।
রাজতে হ্লাদিনী সারো রাধায়ামেব যঃ সদা॥"

এই মাদনাখ্য মহাভাব একমাত্র জগতে প্রকাশ পাইয়াছিল। শ্রীবৃন্দাবনধামে শ্রীরাধায়, আর নদীয়ার শ্রীগৌরাঙ্গে। ব্রাহ্মণী ভৈরবী, সুপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ প্রভৃতি বৈষ্ণব ভাগবতগণ লক্ষণ মিলাইয়া দেখিতে পাইলেন সেই মাদনাখ্য মহাভাব—শ্রীরামকৃষ্ণে।

সাধারণ লোকে এই অপূর্বভাব শ্রীগৌরাঙ্গের ভিতর দেখিয়া বায়ুরোগ বলিয়া স্থির করিয়াই বিষ্ণুতৈল প্রভৃতির ব্যবস্থা করেন—ঠিক শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব দেখিয়া মথুর বাবু প্রভৃতি বায়ুরোগ সাব্যস্ত করিয়া কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসাধীনে রাখিয়াছিলেন—ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ভুল ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। এই মহাভাবই ভক্তিশাস্ত্রে ভগবত্তার পরিচায়ক। "স ঈশঃ অনির্বচনীয়প্রেমস্বরূপঃ।" এই প্রেমবিগ্রহের প্রেমরস আস্বাদন করিয়া ভক্তপার্ষদেরা জগতে ভগবানের অবতারত্ব প্রমাণ করেন। বাহ্যদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীগৌরাঙ্গের কোন মিল নাই—তেমনি স্থূল দৃষ্টিতে শ্রীগৌরাঙ্গে ও শ্রীরামকৃষ্ণে কোনও সাদৃশ্য নাই। কিন্তু সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহাদের প্রেমঘন মূর্তিতে—তাঁহাদের প্রেম-স্বরূপে—সেখানে, রাম, কৃষ্ণ, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরামকৃষ্ণ এক।

নমি তোমা রামকৃষ্ণ

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

সভ্যতার পাণ্ডুলিপি যুগান্তের কীট-কলুষিত;
সনাতন আর্যকৃষ্টি পরধর্ম-অনুকৃতি-বশে
বিকৃত ও ব্যাধিগ্রস্ত। জীবনের বহু-আকাঙ্ক্ষিত
শুদ্ধ আত্ম-পরিচয় অসম্ভব হয় অবশেষে।
কালকূটে কণ্ঠভরা: কল্পলোকে মুক্তিপথ খোলা;
সমষ্টির রুদ্ধশ্বাসে ব্যক্তি-তপঃ হয় দিশাহারা,
সেবার অকুণ্ঠ হাত মজ্জমান জীবনের ভেলা
রক্ষিতে আসে না ছুটে; আর্ত-ডাকে দেয় নাকো সাড়া

তখনি তো যুগে যুগে আবির্ভূত হও, নারায়ণ,
জাগাইতে সত্য-স্মৃতি। শতাব্দীর কালিমা-প্রলেপ
মুছে যায় কর-স্পর্শে, রুদ্ধ দ্বার হয় উদ্‌ঘাটন;
সাধ্যের সাক্ষাৎকারে সাধনার হয় সু-সংক্ষেপ।

তুমি সেই যুগন্ধর, মরুভূমে অমৃতের তরু,
নমি তোমা রামকৃষ্ণ, জগতের ক্ষেমভিক্ষু-গুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর মূলসূত্র

শ্রীরসরাজ চৌধুরী

এক জন নিরক্ষর দরিদ্র ব্রাহ্মণের আধ্যাত্মিক প্রভাব তাঁর মহাপ্রয়াণের পর আজ ৬৬ বছর যাবৎ ভারতের তথা সুদূর প্রতীচ্যের শিক্ষিত সমাজের মধ্যে অবধি ক্রমশই বিস্তার লাভ করছে। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও পাশ্চাত্ত্যের অন্যান্য দেশের অনেক মনীষী ও ধর্মপিপাসু ব্যক্তি আজ তাঁর ভাব ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নিজেদের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গী আমূল বদলে দিয়ে অনাবিল শান্তি অনুভব করছেন। ধর্মের ইতিহাসে ৬৬ বছর একটা মুহূর্ত বললেও অত্যুক্তি হয় না। তবে, এই স্বল্পকাল-মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবধারার এই সহজ বিস্তৃতির কারণ কি?

বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে বিংশ শতাব্দী বিজ্ঞানের যুগ এবং সামাজিক সংস্কার দিক দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় শূদ্রের অথবা গণ-প্রাধান্যের যুগ। ভারতে ও প্রতীচ্যে শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং তাদের দেখাদেখি অশিক্ষিতেরাও কোন মতবাদকে স্বীকার করার আগে যুক্তি, বিশ্লেষণ এবং বিজ্ঞান-বুদ্ধির কষ্টিপাথরে যাচাই করে দেখেন উহা সর্বজনীন, সার্বকালিক ও সার্বদেশিক কি না এবং এই বিশ্লেষণের দ্বারা এই মতবাদের একটা সংশ্লেষণ (synthesis) অথবা মূলসূত্রও (formula) আবিষ্কার করেন।

আজ যাঁরা উপনিষদের মূর্তপ্রতীক শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুপ্রাণিত, মনে হয়, তাঁরা তাঁর জীবনাদর্শ ও বাণীর মধ্যে এমনই একটি মূলসূত্র অনুভব করেন। তা হচ্ছে—ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে এবং সকল ধর্ম সত্য। প্রথমটি দ্বারা আধ্যাত্মিক জীবনে নিছক বিধি-নিষেধের গৌণত্ব ও মনের অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাধান্য এবং দ্বিতীয়টি দ্বারা এমনই মনের উদারতা-প্রসূত সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাভাব সূচিত হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ সরল ভাষায় বলেছেন :—

"তোমরা সংসার করছো, এতে দোষ নেই। তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে। (দেশবরেণ্য অশ্বিনী-কুমার দত্তকে) তোমরা ত' সংসারে থাকবে, তা একটু গোলাপী নেশা করে থেকো। কাজকর্ম করছ অথচ নেশাটি লেগে আছে।"

অর্থাৎ, ভগবানের দিকে একটু টান বা আকর্ষণ রাখতে হবে। এই গোড়ার কথাটি যে কেবল সংসারীর প্রতি প্রযোজ্য এবং তাকে ধর্মের দিকে একটু মনোযোগ দেওয়ার জন্য বলেছেন তা নয়। এই সামান্য কথাক'টির ভিতর মানুষের জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তনের ইঙ্গিত রয়েছে—জীবনকে ধর্মপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিবিধ ধর্মের আচারানুষ্ঠান ইত্যাদি পরের কথা। শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশকে বিংশ শতাব্দীতে আধ্যাত্মিক জীবনের বর্ণবোধ বলা যায়। বর্ণমালা আয়ত্ত হলে ক্রমে ক্রমে সাহিত্য-ইতিহাস-পাঠ সহজসাধ্য হয়, অথচ এই সাহিত্য বা ইতিহাসের ভিত্তি বর্ণমালা। শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর এই মূলসূত্রকে অবলম্বন করে ক্রমশঃ বেদান্তের উচ্চ হতে উচ্চতর ভূমিতে পৌছান যায়। তিনি বলেছেন সংসারে থেকেও ভগবান-লাভ করা যায়। আবার স্বামিজীর একটি বাণী শুনি—সংসার ছেড়ে সর্বত্যাগী না হ'লে আত্মসাক্ষাৎকার অসম্ভব। এই দু'টি

পরস্পর-বিরুদ্ধ নয়—ওদের মধ্যে ভগবানের দিকে আকর্ষণের মাত্রার (degree) প্রভেদ-মাত্র।

যাদের চৈতন্যোদয় হয়ে মনে শুভেচ্ছা জাগে তাঁদের প্রতি তাঁর উপদেশ এই রকম :

"কলকাতায় গেলাম···সবই পেটের জন্য দৌড়চ্ছে··· তবে দু-একটি দেখলাম ঈশ্বরের দিকে মন আছে।··· প্রধান কথা বিশ্বাস। বিশ্বাস হয়ে গেলে আর ভয় নাই···সংসার করবে, অথচ মাথায় কলসী ঠিক রাখবে, অর্থাৎ ঈশ্বরের দিকে মন ঠিক রাখবে।···কচ্ছপ জলে চড়ে বেড়ায়, কিন্তু তার মন আড়ায় পড়ে আছে।···দাসীর মত থাকে, সব কাজ-কম করে, কিন্তু দেশে মন পড়ে থাকে।···দেখেছ ত' দুর্গা-পূজায় জ্যোৎ (যাগ) প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হয়।"

উপরোক্ত উপদেশের অর্থ মনের মোড় ফিরানোর চেষ্টা। দিনে যতবার সম্ভব ভগবানকে স্মরণ করার চেষ্টা করা—তাঁর ভাবে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিভোর হয়ে থাকা নহে। কচ্ছপ বা দাসী সব সময়ই আড়া বা দেশের কথা ভাবে না—তবে যখন ভাবে তখনি একটু আকুলতা প্রকাশ করে। যাগপ্রদীপে কেউ বড় একটা পাহারা দেয় না—মাঝে মাঝে এসে দেখে জ্বলছে কিনা।

তারপর যখন আকর্ষণ বেড়ে যায় তখন মনের প্রধান চিন্তাই (dominating thought) হয় ভগবান। তখনকার চিন্তা মাঝে মাঝে নয় - তখন সমস্ত কাজ কর্মের উপায় ও উদ্দেশ্য একমাত্র আধ্যাত্মিক ভাবেই প্রণোদিত হয়। তাদের পেছনে থাকে একটি মাত্র আদর্শ ও চিন্তাধারা।

"ও দেশের ছুতোরদের মেয়েরা ঢেঁকী দিয়ে চিঁড়ে কাড়ে···সে হুঁশ্ রাখে যাতে ঢেঁকীর মুষলটা হাতের উপর না পড়ে···ছেলেকে মাই দেয়, ভিজে ধান খোলায় ভেজে নেয়, আবার খদ্দেরের সঙ্গে কথা কচ্ছে···ঈশ্বরে মন রেখে তেমনি সংসারে নানা কাজ করতে পার। কিন্তু অভ্যাস চাই, আর হুঁশিয়ার হওয়া চাই, তবেই দুদিক রাখা হয়!"

"একবারও যেন তাঁকে ভোলা না হয়, যেমন তেলের ধারা···"

"সংসারে থেকে সকল কাজ করো, কিন্তু দৃষ্টি রেখো যেন তাঁর পথ হতে দূরে না যাও।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণ মনকেই সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন।

"পায়ে বন্ধন থাকলে কি হবে, মন নিয়ে কথা। মনেই বদ্ধমুক্ত।···মন ধোপাঘরের কাপড়, যে রঙে ছোপাবে সেই রঙ হয়ে যাবে।

"সংসারে হবে না কেন? ঈশ্বর বস্তু আর সব অনিত্য—এইটি পাকা বোধ চাই।"

মনই আসল। ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণই মূলকথা। মনকে প্রাধান্য দিয়ে তিনি আরও বলেছেন :

"পূজা, হোম, যাগ যজ্ঞ কিছুই নয়। যদি তাঁর উপর ভালবাসা আসে তাহলে আর এসব কর্ম্মের বেশী দরকার নাই।

"আর দেখ, বেশী আচার করো না।···তাঁর নামে বিশ্বাস করো, তাহলে আর তীর্থাদিরও প্রয়োজন হবে না।"

"আর তুমি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের নিয়ে বেশী মাখামাখি করো না। ওদের চিন্তা দুপয়সা পাবার জন্য।"

"আমি জানি যে যদি কেউ পর্বতগুহায় বাস করে, গায়ে ছাই মাখে, উপবাস করে, নানা কঠোর করে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—কামিনী-কাঞ্চনে মন—সে লোককে আমি বলি ধিক্; আর যার কামিনীকাঞ্চনে মন নাই—খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।

"যে হবিষ্যান্ন করে কিন্তু ঈশ্বরলাভ করতে চায় না, তার হবিষ্যান্ন গোমাংস তুল্য হয়; আর যে গোমাংস ভক্ষণ করে, কিন্তু ভগবানকে লাভ করতে চেষ্টা করে, তার পক্ষে গোমাংস হবিষ্যান্ন তুল্য হয়।"

সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশে সাধন-পন্থার আরম্ভে শাস্ত্রাচারের কঠোর অনুশাসন ও বিধি-নিষেধের প্রাধান্য নেই। টিকি বা দাড়ি রাখা অথবা রুদ্রাক্ষ ও তুলসীমালা ইত্যাদি বাহিরের চিহ্ন অবান্তর। এই কারণেই শিক্ষিত সমাজে তাঁর এ সব উপদেশের এত আদর। ভারতে ও

পাশ্চাত্যে যাজকের বিধিনিষেধ মেনে নিতে আজকাল কেউ একটা রাজী নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের উপরোক্ত উপদেশগুলির সারমর্ম এই যে, মানুষ তার জীবনের সাংসারিক দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন করে মনটি মোটামুটি ভগবানের দিকে একটু ঘুরিয়ে রাখুক। যদি তাঁর দিকে আরও এগুতে চায় তার সেই আকর্ষণের মাত্রা বাড়িয়ে দেয় যেন। তার পর তিনিই ব্যবস্থা করবেন "যার পেটে যা সয়"। এই হচ্ছে শ্রীরামকৃষ্ণের মৌলিক নির্দেশ। রাজযোগ, যুক্তাহার, খৃষ্টধর্মমতে ভগবচ্চিন্তা (contemplation) ইত্যাদি তাদের জন্যেই যারা আধ্যাত্মিক পথে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছেন। তাঁদের কর্তব্যাকর্তব্য এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়।

এখন, এই আচার-বন্ধন-মুক্ত মনে স্বতই একটা উদার সার্বজনীন ভাব আসে। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন :

"হিন্দু মুসলমান খৃষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গাই যাচ্ছে। নিজের নিজের ভাবরক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে, ভগবান লাভ হবে।

"সব ধর্মের লোকেরা এক জনকেই ডাকছে—কেউ বলছে রাম, কেউ হরি, কেউ আল্লা, কেউ ঈশ্বর কেউ ব্রহ্ম। নাম আলাদা, কিন্তু একই বস্তু। 'ও হিন্দু, ও মুসলমান, ও খৃষ্টান', এই বলে নাক সিটকে ঘৃণা করো না। তিনি যাকে যেমন বুঝিয়েছেন। সকলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি জানবে। জেনে তাদের সঙ্গে মিশবে—যতদূর পার। আর ভালবাসবে।"

এই সর্বধর্মসমন্বয়ের মহাবাণী শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম জগতের কাছে প্রচার করেছেন এবং এই যুক্তিবাদের (rationalism) যুগে সকল দেশেরই শিক্ষিত সমাজ এই বাণীকে সাদরে গ্রহণ করবে ইহা খুবই স্বাভাবিক। আধ্যাত্মিক জীবনে মনই আসল, আচার-অনুষ্ঠান গৌণ। ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণ-উপদেশের গোড়ার কথা। বিশেষতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে এটি একটি মস্ত আশার কথা, কারণ পন্থা অতি সহজ, আচার-নিয়মের নাগপাশে আবদ্ধ নয়। আজ শ্রীরামকৃষ্ণবাণীর সর্বজনপ্রিয়তার ইহাই মূল কারণ।

প্রেমের ঠাকুর

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

দিগন্তরী অন্তরাগে নামলো যে সাঁজ দিনান্ত,
প্রেমের ঠাকুর ফিরলো ঘরে ঘর,
বজ্রপ্রাণী শঙ্খ বাজা – দেখ্ সে কেমন প্রশান্ত
কে বলে তা'য় ভয়াল-ভয়ঙ্কর !
বনাঞ্চলে ঐ সে প্রথম নামে,
গ্রামের পথে ঢুক্‌লো এসে গ্রামে,
ঢুক্‌লো শহর-নগর ভরি' ভুবন-পরম সে পান্থ,
পরমপ্রেমিক দেখ্ সে নটবর,
দিগন্তরী অন্তরাগে নামলো যে সাঁজ দিনান্ত,
প্রেমের ঠাকুর ফিরলো ঘরে ঘর।

কাজল বরণ সাঁজের আলোয় ঐ সে কেমন সুকান্ত,
ধন্য হরি, ধন্য মরি মরি,
ধন্য হরি ভবের হাটে—ধন্য সে মোর শ্রীকান্ত,
কৃপায় যাহার ভাসে জীবন-তরী।
তাহার যুগল চরণ-নূপুর হ'য়ে
বাজবি যদি থাক্‌রে স্মরণ লয়ে,
সুখের দিনে দেখ্‌বি নাকো দুঃখ-দিনের ক্ষীণান্ত,
দুঃখ-ব্যথা হানবে না আর শর,
দিগন্তরী অন্তরাগে নামলো যে সাঁজ দিনান্ত,
প্রেমের ঠাকুর ফিরলো ঘরে ঘর।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

(১)

জয় জয় রামকৃষ্ণ, জয় বুদ্ধ-শঙ্কর-গোরার
ভাব-ঘন রূপ ;
জয় বৈরাগ্যাভিষিক্ত জ্ঞান-মুক্তি ভক্তি-সুষমার
প্রত্যক্ষ স্বরূপ।
দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপে আসিয়াছ স্থাবা-পৃথিবীর
বিজয়-সম্রাট,
অসংখ্য হৃদয়মাঝে প্রতিষ্ঠিত ওগো প্রাচ্যবীর,
তব রাজ্যপাট।

(২)

মিলনের অগ্রদূত, তব কম্বু-কণ্ঠ-আবাহনে,
হে মহামহিম,
মিলেছে প্রাচীর সাথে অ-ছেদ্য অকুণ্ঠ আলিঙ্গনে
উদ্ধত পশ্চিম।
তুঙ্গ তুষারাদ্রি ভেদি, পথ বাঁধি দুর্গম কান্তারে
তোমার মহিমা,
বাঙ্গালার ক্ষুদ্র এক পল্লী হ'তে দেশ-দেশান্তরে
রচিয়াছে সীমা।

(৩)

ভব-মৃগতৃষ্ণিকার প্রশান্ত সম্বোধি-রত্নাকর,
তুমি সুনির্মল,
প্রপঞ্চের প্রাণান্তক অন্ধকারে জ্ঞান-দীপ্তিকর
ভানু সমুজ্জ্বল।
অসার-সংসার-সিন্ধু-আবর্তের সঙ্কট বিষমে
করিয়া বিরাজ,
নীর ছাড়ি ক্ষীর-সার কুড়ায়েছ অবলীলাক্রমে
তুমি হংসরাজ।

(৪)

জীবের মাঝেই শিব করিয়াছ প্রত্যক্ষ দর্শন
সেবাধর্ম-বলে,
তোমার অঙ্গনতলে হাসে নিত্য কাশী-বৃন্দাবন,
যমুনা উথলে।
স্বর্গ আসে ধর, দিতে চতুর্বর্গ করে বারে বারে
সাগ্রহ সন্ধান,
দেবতারা যুক্তকরে মানবস্থ-বিগ্রহ তোমারে
করে অর্ঘ্য দান।

(৫)

তোমার অক্ষরহীন অন্তরের নগেন্দ্র-কন্দরে
লভিয়া জনম,
প্রশান্ত প্রাঞ্জলীকৃত নবরূপে লহরে লহরে—
আগম, নিগম ;
তন্ত্র, বেদ, সংহিতার, বেদান্তের সুধাতরঙ্গিণী
অনন্ত ধারায়
নামিয়া এসেছে দুঃখ-পাপ-তাপ-জ্বালাকরালিণী
বিশ্ব-সাহারায়।

(৬)

"অভিন্ন — বিভিন্নধর্ম, মতবাদ, শ্রেণী, সম্প্রদায়, —
এক ভগবান্।
সহস্র তটিনীধারা এক মহাসিন্ধু-নীলিমায় --
লভে অবসান।"—
এ মহামন্ত্রের গুরু, কল্পতরু, প্রপন্ন-বান্ধব,
প্রেম-অবতার,
বিশ্বহিতে আবির্ভূত দেবস্তুত হে মহামানব,
করি নমস্কার।

অঞ্জলি

(এক)

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবিবেকানন্দ পাল, এম্‌-এ

গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা করি। তোমার কথামৃতের নৈবেদ্য সাজিয়ে তোমায় নিবেদন করি। কল্পতরু তুমি; তুমিই শিখিয়েছ তাঁর কাছ থেকে চাইতে হয়। ভক্তি করে প্রাণ দিয়ে চাইলে—চাইবার মত চাইলে, তবেই তো পাওয়া যায়।

"ভক্ত আমি এ অভিমান থাকা ভাল" তোমারই কথা। দীনবন্ধু দাদার দইয়ের ভাঁড়ের গল্প মনকে অভিভূত করে। ছোট ছেলে গোপাল। তার পাঠশালার গুরুমশাইয়ের পিতৃশ্রাদ্ধ। পড়ুয়াদের উপর ভার পড়লো কোনও না কোন জিনিষ দেবার। গোপালকে দিতে হবে দই। গোপাল বাড়ীতে এসে মাকে বললে। মা ছেলেকে আশ্বাস দেন, দীনবন্ধু দাদাকে জানাও, তিনিই ব্যবস্থা করে দেবেন। কোথায় তাঁর দেখা মিলবে? সব জায়গায়; ডাকার মত ডাকতে পারলেই তিনি দেখা দেবেন। পাঠশালায় যাবার পথে গোপাল তার দীনবন্ধু দাদাকে ডাকে। তিনি বলেন, দই মিলবে। গোপাল তাতে খুসী নয়। তাঁকে দেখে তাঁর হাত থেকে দইয়ের ভাঁড় নিয়ে ছাড়লে। গুরুমশাই দইয়ের ছোট্ট ভাঁড়টি দেখে রেগে আগুন। পিতৃশ্রাদ্ধের ব্যাপার, একি ছেলেখেলা? শেষ পর্যন্ত সেই ভাঁড়টুকু থেকেই বেরুলো দইয়ের অক্ষয় ভাণ্ডার। ভক্তের মান রক্ষা হলো।

সহজ সরলভাবে যা দেওয়া যায় তাই তো ভক্তি। শ্রীদাম-সুদাম শ্রীকৃষ্ণকে এঁটো ফল খাওয়াচ্ছে, আবার ঘাড়ে চড়ছে—এই ভাল লাগার, ভালবাসার ভিতর দিয়েই তাদের ভক্তি উথলে উঠছে। পণ্ডিত গীতার ব্যাখ্যা করছে, ভক্ত শুনছে, একবর্ণও বুঝছে না। কিন্তু ভগবানের কথা হচ্ছে—শুধু এই কথাটুকু জেনে কেঁদে আকুল—সে যে চোখের সামনে সব দেখেছে; অর্জুন, রণ-ক্ষেত্র, রথের উপর শ্রীকৃষ্ণ। ভগবানকে চোখের সামনে দেখে ভক্তিতে সে কেঁদে আকুল। পাণ্ডিত্যে যে দর্শন মিললো না, ভক্তিতে তা কত সহজে মিললো। ভক্তের মান রাখতে তার মনের মাঝে ধরা যে তাঁকে দিতেই হবে।

শুধু কি ধরা দেওয়া? প্রাণ দিয়ে ভালোবাসা। মায়ের মতন ভালোবাসা। মা যশোদার ভাব নিয়ে বালগোপালদের স্নেহ করা। রাখালকে দেখলে তোমার যশোদার ভাব হ'তো। রাখালের বাবা এসে অনুনয় করছেন বাড়ী ফেরবার জন্য। রাখাল বলছে, বেশ আছি। মাতৃস্নেহ পেয়ে বেশ থাকবে বৈকি। শুধু কি রাখাল? কীর্তন শুনতে শুনতে তার মাঝে উঠে এসে তোমার ভক্ত নারানকে নিজের হাতে মিষ্টি দিয়ে, তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে আদর করে বলছো, "জল খাবি?" মা ছাড়া আর কে এমনি ধারা করে বল? ছেলেকে খাবার দেবার ভার আর কাকেও দিয়ে কি মা নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? দই ও

তরমুজের পানা নরেন্দ্রনাথকে দিয়ে বলছো—"তুই এইটুকু খা।" ছেলেদের নিজের হাতে খাইয়ে কতই তৃপ্তি।

শুধু কি খাওয়ানো, আদর যত্ন করা? তারা যে তোমার নয়নের মণি। একদণ্ড না দেখলে চঞ্চল হয়ে উঠতে। ছটফট করতে। ব্যাকুল হয়ে মাকে কেঁদে কেঁদে বলতে, "মা, ভক্তদের জন্য আমার প্রাণ যায়, তাদের শীঘ্র আমায় এনে দে।" তাদের জন্য রাত্রে ঘুম নেই। মার কাছে আবদার করেছ, "মা, ওর বড় ভক্তি, ওকে টেনে নাও; মা, ওকে এখানে এনে দাও; যদি না সে আসতে পারে, তাহলে মা, আমায় সেখানে লয়ে যাও, আমি দেখে আসি।" তোমার সে মাতৃহৃদয়ের ব্যাকুলতার কথা কত বলবো? বাবুরাম মাঝে মাঝে এসে না থাকলে তুমি বলতে, "আমার মন ভারী খারাপ হবে।" আবার হরিবল্লভকে বলছো, "তোমায় দেখলে আনন্দ হয়।" কেউ না গেলেই খোঁজ করছে, "কিশোরী আসে না কেন? হরিশ আসে না কেন?" ভক্ত-বৎসল, ভক্তদের কথা তুমি কেমন করে ভুলবে? মাষ্টারকে বলছো, 'নারানকে তুমি টাকাটি দেবে।' বৃন্দাবনে রাখালের জ্বর, তুমি চণ্ডীর কাছে মানসিক করলে। আবার কেশব সেনের অসুখ শুনে সিদ্ধেশ্বরীর কাছে ডাব-সন্দেশ মানত করলে তুমি। মা ছাড়া এমন দরদ আর কার বল দেখি?

একদিকে তোমার এই মাতৃভাব, আর একদিকে তুমি ছোট ছেলেটির মতই তোমার মা ভবতারিণীর কাছে ছুটছো, এটা ওটা জানতে, কত কি আবদার জানাতে। 'মা' না হলে তোমার একদণ্ডও চলে না। ছোট্ট ছেলেটি যে! ছবি ও রোশনাই দেখে পাঁচ বছরের ছেলের মত আনন্দে হাততালি দিয়ে নেচে উঠছো, ভাবাবেশে বালকের মত ব্যবহার করছো! ডাক্তার মহেন্দ্র সরকার তোমায় বললেন, "তুমি child of nature" (স্বভাব-শিশু)। ভক্তের ভালবাসার জন্য ছোটটি হয়ে তাদের সঙ্গে খেলাধূলা, মান-অভিমান করতেই হবে যে। নইলে তারা আপন জন ভেবে ভালবাসবে কেন? ছুটে আসবে কেন? স্নেহের বাঁধনে বাঁধা পড়বে কেন?

তোমার দেওয়ার কি শেষ আছে? কথায়, গল্পে, গানে, লোককে হাসিয়েছ, কাঁদিয়েছ, জগৎকে মাতিয়েছ। আবার তারই মাঝে কত জ্ঞানের কথা ব'লেছ—কত কি শিখিয়েছ। আলো দেখিয়েছ। বাদুলে পোকা যে আলোয় পুড়ে মরে সে আলোর পানে নয়। মণির আলোর পানে। "মণির আলো খুব উজ্জ্বল বটে, কিন্তু স্নিগ্ধ আর শীতল। এ আলোতে গা পোড়ে না, এ আলোতে শান্তি হয়, আনন্দ হয়।" তুমি বলতে, আলো না জ্বালানো দারিদ্র্যের লক্ষণ। মনের আলো না জ্বালিয়ে আমি কি চিরদরিদ্র হয়ে থাকবো? মনের আলোর খবর না রেখে লণ্ঠন নিয়ে লোকের বাড়ী টিকে ধরাতে যাবো? অন্তরের মধ্যে তোমায় না দেখে কেবল বাইরেই ছুটোছুটি করবো?

তুমি ঠিকই বলেছ, "রাতদিন ফষ্টিনষ্টি করে সময় কাটাচ্ছ।" ঈশ্বরের দিকে মন ফিরিয়ে দাও। "যে নুনের হিসাব করতে পারে সে মিশ্রির হিসাবও করতে পারে।" বাইরে নয়; "তাঁকে ঘরে আনতে হয় আলাপ করতে হয়।" "খোঁজ খবর নিতে হয়; আমি খুঁজতেই তিনি বেরিয়ে পড়েন।" তবে-"মন মুখ এক করতে হবে। মনে অভিমান নিয়ে বলতে হবে··· তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, দেখা দিতে হবে।" "ভক্ত যেমন 'ভগবান না হলে থাকতে

পারে না, ভগবানও ভক্ত না হ'লে থাকতে পারেন না।" তোমার বৈকুণ্ঠের সিংহাসন ছেড়ে আমার হৃদয়-আসনে তোমায় আসতেই হবে। "ভক্তের হৃদয় যে ভগবানের বৈঠকখানা।" তুমি এসে তোমার বৈঠকখানায় জমকে বসো এই প্রার্থনা।

(দুই)

মানুষ রামকৃষ্ণ ও ভগবান রামকৃষ্ণ

শ্রীমায়া সেন

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ না ভগবান—এ বড় কঠিন ও জটিল সমস্যা। বাহিরে সাধারণ মানুষের মত হলেও মানুষের মাপকাঠি দিয়ে তাঁকে বিচার করা যায় না। সংসারে থেকেও তিনি সংসারী ছিলেন না …আবার বৈরাগী হয়েও বিবাগী ছিলেন না।

কাঞ্চনকে তিনি বিষজ্ঞান করতেন—এমন কি ঘুমন্ত অবস্থাতেও কেউ তাঁর গায়ে টাকা ছোঁয়ালে সেখানটা বিকৃত হয়ে যেত। এমনই ছিল তাঁর বিতৃষ্ণা। বৈরাগ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ 'কামিনীকাঞ্চন' ত্যাগে উৎসাহিত করলেও কামিনীকে "ঘৃণার পাত্রী," "নরকের দ্বার" ইত্যাদি বলে অভিহিত করেন নি। শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় আদিতে নারী, মধ্যে নারী এবং অন্তে নারী; আর এই নারীজাতি তাঁর কাছে মাতৃসমা। সকল নারীতে এমন কি পতিতা নারীতেও তিনি জগন্মাতাকে দর্শন করেছিলেন। তাই নারীপ্রতিষ্ঠিত মন্দিরে ভগবানের শ্রীমূর্তির প্রেমে ও পূজায় সারাজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। আপন পত্নীকেও তিনি মহাশক্তিজ্ঞানে পূজা করেছিলেন। মানবজাতির ইতিহাসে "যত্র নারী তত্র গৌরী'র সার্থকরূপ এমনটি করে আর কেউ স্থাপন করতে পারেননি। আমরা এতদিন যাঁদের সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে—শুধু ঊর্ধ্বে কেন… দেবতারূপে জেনেছি যেমন গৌতম বুদ্ধ, শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীচৈতন্য তাঁদের জীবনেও এমন দৃষ্টান্ত দেখিনি।

মহামায়ার যথার্থ পূজারী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্বয়ং মহাশক্তি পর্যন্ত হার মেনেছিলেন। তাই বিপুল ঐশ্বর্য বিভব যশ মান শ্রীরামকৃষ্ণ মহাকালীর কাছ থেকে পেয়েও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন—যা আমাদের সাধারণ মানুষের একান্ত কাম্য ও প্রার্থনীয় বস্তু। তাই টাকা এবং মাটীতে তিনি কোন প্রভেদ দেখেন নি। উভয়ই ছিল তাঁর কাছে অসার, তাই তিনি নিঃশেষে নির্মুক্ত হয়ে দুটিকেই গঙ্গায় ফেলে দিতে পেরেছিলেন।

আমাদের দেশের সাধক এবং সন্ন্যাসীদের মত শ্রীরামকৃষ্ণ নির্জন বনে বা পর্বতগুহায় গিয়ে ভগবৎসাধনা করেন নি—সকলের মাঝে থেকেও নিরন্তর ভগবৎপ্রেমে ডুবে গিয়েছিলেন। কলকাতার অনতিদূরে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছিল তাঁর সাধনার পীঠস্থান—লোকালয়ের বাহিরে নয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন সত্যের পূজারী। যা সত্য, তাই মঙ্গল এবং তাই সুন্দর। "সত্যং শিবং সুন্দরম্।" তাই একদিন যদু মল্লিকের বাড়ীতে যাওয়ার কথা প্রসঙ্গান্তরে ভুলে গেলেও

পরে অধিক রাত্রিতে সে কথা মনে উদিত হওয়ায় তাঁর বাড়ীতে গিয়ে তবে তিনি নিরস্ত হয়েছিলেন। দেহ-মন-ইন্দ্রিয়াদি ছিল তাঁর বশে—তাই কাহারো সকাম দানের জিনিষ অজ্ঞাতেও গ্রহণ করতে পারতেন না।

যে যুগে তিনি আমাদের মাঝে এসেছিলেন সে যুগ ধর্মনৈতিক ধ্বংসবাদের যুগ। সে যুগের আদর্শ ছিল—Read English, write English, talk English, speechify in English, think in English, dream in English. সেই পরম যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন খাঁটি দিশি বাংলার জয়ধ্বজা উড়িয়ে। বল্লেন, "চারিদিকে বড় গোলমাল; কিন্তু গোলমালেও মাল আছে। গোলটি ছেড়ে মালটি নেবে।" প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মিলনে আমাদের আধ্যাত্মিক সম্পদকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাই ব্রাহ্মনেতা শ্রীকেশবচন্দ্র সেন পর্যন্ত তাঁকে স্বীকার করেছিলেন। সাধারণ হয়েও তিনি ছিলেন অসাধারণ—তাই আমাদের মত বইয়ের বিদ্যা তাঁর করায়ত্ত না থাকলেও ছোটবেলা হতেই অনেকই কঠিন, জটিল এবং তথ্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক সমস্যার সমাধান করতে পারতেন।

তাঁর জীবন ছিল জ্ঞান, প্রেম, বৈরাগ্য, লোকহিত-চিকীর্ষা, উদারতার জমাট মূর্তি। জীবন ছিল তাঁর শান্ত কোন গতিবেগ, কোন আড়ম্বর, কোন বাহুল্য সেখানে স্থান পায়নি। তবুও কত গভীর, কত দ্যোতনাপূর্ণ ছিল তাঁর জীবন। সকল বিচার, নিন্দা-প্রশংসার উর্ধ্বে ছিলেন তিনি। তাঁর জীবন ভারতীয় সংস্কৃতি ও সাধনার মূলসুর যে আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগ, তারই অপরূপ এবং অভিনব মূর্চ্ছনায় উদ্ভাসিত। সাম্য, মৈত্রী এবং করুণা এই ত্রিবেণীর সঙ্গমস্থল ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই প্রেম-করুণার মন্দাকিনী-ধারা তাঁর অন্তর হতে নিঃসৃত হয়ে চরম অধর্মের বারিপ্রবাহকে নষ্ট ক'রেছিল।

যে শতাব্দীতে তিনি এসেছিলেন কয়েক জন ভাগ্যবান ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই তাঁকে চেনেননি। যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে তাঁর যুগে ১২ জন ঋষি ছাড়া আর সকলেই দাশরথি বলে জেনেছিল। স্বামিজী নিজেই বলেছেন—'Nineteenth Centuryর শেষ ভাগে universityর ভূতব্রহ্মদত্যিরা তাঁর জীবদ্দশায় ঈশ্বর বলে পূজা ক'রেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মানুষ না ভগবান এর বিচার মনে। কতটুকুই বা আমরা তাঁকে জানি! তবে আজ বিশ্ব-সভায় দৃক্‌পাত করলে দেখি যে, সারা জগৎ তাঁকে মেনে নিয়েছে, স্বীকার ক'রে নিয়েছে যে তিনি সাধারণ মানুষের উর্ধ্বে—তিনি সাক্ষাৎ শ্রীভগবান।

পাওয়া ও না-পাওয়া

ডাঃ শচীন সেনগুপ্ত

তোমায় পেয়েছি আমি
　　তাহা ঠিক নয়,
তোমায় পাইনি কভু
　　সেও ঠিক নয়।

যেটুকু পেয়েছি তাহা
　　হীরক-কণিকা;
যেটুকু পাইনি প্রিয়
　　সে তো মরীচিকা

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য—মিশন ২৪ পরগনার ১০টি ইউনিয়নে ৪ঠা জুন (১৯৫২) হইতে ১৫ই ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সেবাকার্য করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল:

বিতরিত খাদ্যশস্যের পরিমাণ: চাউল ৯৮০৫।৬।০/০; আটা ৯,৪৫৪ মণ। অন্যান্য খাদ্য: গুঁড়া দুধ—৪৪৫ পাউণ্ড; বিস্কুট—৯০ পাউণ্ড; Multipurpose Food—৪,৬৪৪ পাউণ্ড।

বস্ত্র: নূতন ধুতি—১৫৭৩ খানা; নূতন শাড়ী ৩,৩১৭ খানা; হাফ্ প্যান্ট—১৫০০; নূতন সার্ট—১২১৯টি; নূতন ফ্রক—৭৮২; গামছা—২৬৭ খানা; নূতন চাদর—২০১; নূতন মার্কিন্ কাপড়—১৭৫৫ গজ; অন্যান্য গাত্রাবরণ—৬১; পুরাতন কাপড় ও জামা—৪০০। উপরোক্ত খাদ্য ও বস্ত্র ব্যতীত পীড়িতদিগের মধ্যে ঔষধও বিতরিত হইয়াছিল।

সাহায্য-প্রাপ্তদিগের সংখ্যা:

বয়স্ক নরনারী—২,৭৪,৯৮১

বালক-বালিকা—৩,৫৮,২৭৯

রায়লসীমায় মিশন ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ২৩শে জানুয়ারী পর্যন্ত ৫১,৪২৫ মণ গম এবং কিঞ্চিন্ন্যূন ৮,৬০০ মণ চাউল বিতরণ করিয়াছেন। এই অঞ্চলের সেবাকার্য বর্তমানে শুধু কাড্ডাপা জেলায় সীমাবদ্ধ আছে।

বরাহনগর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে স্বামিজীর স্মৃতি-উৎসব—এই উৎসব পাঁচ দিন ব্যাপিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। উৎসবের প্রথম দিবসে (২৩শে পৌষ) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ স্বামিজীর একটি ১২½ ফুট দীর্ঘ পরিব্রাজক-মূর্তির আবরণ উন্মোচন ও উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর দ্বারোদ্ঘাটন করেন। এই প্রদর্শনীতে স্বামিজীর জীবন কয়েকটি চিত্র-সাহায্যে প্রদর্শিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন শাখার শিল্প ও কৃষিজাত দ্রব্যাদিও দেখানো হইয়াছিল।

উৎসবের চতুর্থ দিবসে মাননীয় রাজ্যপাল ডক্টর শ্রীহরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় উৎসবক্ষেত্র প্রদর্শন ও স্বামিজীর উদ্দেশে তাঁহার শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। শিক্ষামন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীবিনয় সেনগুপ্ত, ডাঃ অশোক দত্ত, অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য, অধ্যাপক কাজি আবদুল ওদুদ, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য, শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসজনীকান্ত দাস, ডাঃ দুঃখহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ বক্তাগণ বিভিন্ন দিনে স্বামিজীর জীবন ও বাণী আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিশ্বশ্রী শ্রীমনতোষ রায় ও তাঁহার সম্প্রদায়ের বিচিত্র অঙ্গসৌষ্ঠব প্রদর্শন যুবক-সম্প্রদায়ের বিশেষতঃ ছাত্র-সমাজে বহুল ভাবে আদৃত হয়। কয়েক জন বিখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীর কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত এবং শেষ দিবস আন্দুল সম্প্রদায়ের বিখ্যাত কালীকীর্তন সকলেরই উপভোগ্য হইয়াছিল।

পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মোৎসব—গত ২৩শে পৌষ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মবার্ষিকী বিশেষ উৎসাহের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়াছে। সকালে বিশেষ পূজা, ভজন, ও স্বামিজীর প্রিয়গ্রন্থ কঠোপনিষদ্ হইতে পাঠ, এবং মঠাধ্যক্ষ স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ কর্তৃক স্বামিজীর জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর দ্বিপ্রহরে সাত শত ভক্তের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় বিহার-রাজ্যের রাজ্যপাল শ্রীআর আর দিবাকর আশ্রম পরিদর্শন করেন। রাজ্যপাল হিন্দিতে স্বামিজী-সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ ভাষণ দেন।

মাদ্রাজে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—বিগত ২৩শে এবং ২৭শে পৌষ (৭ই ও ১১ই জানুয়ারী) মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের একনবতিতম শুভ জন্মোৎসব মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন পূজা, বেদপাঠ, ভজন, হোম প্রভৃতি এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা হয়।

দ্বিতীয় দিবস, রবিবারে ৮০ জন উচ্চশিক্ষিত যুবক প্রায় ২ ঘণ্টায় স্বামিজীর সমগ্র রচনাবলী পড়িয়া শেষ করেন। পাঠের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের উপস্থিতিতে সকলেই প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনা পাইয়াছিলেন। পাঠান্তে দক্ষিণভারতের বিভিন্ন আশ্রম হইতে আগত পাঁচ জন প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামিজীর বাণীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় স্বামী তুরীয়াত্মানন্দের 'হরিকথা' সমবেত শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিশেষ আনন্দ দান করে। অতঃপর ৫॥০ ঘটিকায় স্যার সি পি রামস্বামী আয়ারের সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। উহাতে সঙ্ঘের পূজ্যপাদ সভাপতি মহারাজও কিছুক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীসত্যনারায়ণ রাও, ভূতপূর্ব প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ডাঃ পি সুব্বারায়ন্, বিশিষ্ট ব্যবহারজীবী শ্রীচন্দ্রশেখরন্ এবং হলিউড বেদান্ত-কেন্দ্রের ব্রহ্মচারী জন্ ইয়েল যথাক্রমে তেলেগু, তামিল ও ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে স্বামিজীর জীবনী ও বাণী-সম্বন্ধে সুললিত ভাষণ দেন।

রাঁচিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব—গত ২৩শে পৌষ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব-উপলক্ষ্যে স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামিজীর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য-নিবেদনের জন্য বিপুল জনসমাগম হয়। পূর্বাহ্ণে মঙ্গলারতি, সঙ্গীতানুষ্ঠান, বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। সমাগত ভক্তবৃন্দ ও দরিদ্রনারায়ণের মধ্যে প্রসাদ-বিতরণের পর আশ্রম-প্রাঙ্গণে বিশেষরূপে নির্মিত মণ্ডপে পুষ্পমাল্যশোভিত স্বামিজীর প্রতিকৃতির সম্মুখে স্বামী শান্তানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে অপরাহ্ণে একটি সভা হয়। স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় হিন্দিভাষায় এবং অধ্যাপক শ্রীসরোজকুমার বসু বাংলায় স্বামিজীর পবিত্র জীবনকথা ও বাণী-সম্বন্ধে আলোচনা করেন। পরিশেষে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ স্বামিজীর নরনারায়ণবাদ-সম্বন্ধে ভাষণ দেন।

স্বামী হরিহরানন্দের দেহত্যাগ—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী স্বামী হরিহরানন্দজী (বিশ্বরঞ্জন মহারাজ) গত ১৫ই মাঘ (২৯শে জানুয়ারী) ৭১ বৎসর বয়সে পক্ষাঘাত-রোগে বেলুড়মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি ১৯০৩ সালে মঠে যোগদান করেন এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। মঠ ও মিশনের ঢাকা ও মেদিনীপুর কেন্দ্রের পরিচালনা এবং আরও নানাক্ষেত্রে তিনি সঙ্ঘের অকুণ্ঠিত সেবা করিয়া আসিয়াছেন। তপস্যা ও সেবানিষ্ঠ, উন্নত-চরিত্র এই অমায়িক সর্বজনপ্রিয়

প্রবীণ সন্ন্যাসীর দেহমুক্ত আত্মা আত্যন্তিক শান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জনশিক্ষা-প্রচার—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জনশিক্ষা-বিভাগ কর্তৃক হুগলী এবং চব্বিশপরগনা জিলার কয়েকটি গ্রামে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে মোট ১৯টি, জানুয়ারী মাসে ৪টি এবং ফেব্রুয়ারী মাসের ৮ তারিখ পর্যন্ত ৩টি ভ্রাম্যমাণ শিক্ষাপ্রচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ ম্যাজিক লণ্ঠন ও সবাক্-চিত্রযোগে গ্রামের উন্নতি, স্বাস্থ্যনীতি, সমাজসেবা এবং অসাম্প্রদায়িক ধর্ম-সম্বন্ধে জনগণকে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। অনুষ্ঠান-গুলিতে শ্রোতৃমণ্ডলীর সংখ্যা ৩০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত হইয়াছিল।

বালিয়াটি (ঢাকা) শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ—গত ২৩শে পৌষ পূর্বপাকিস্তানের গ্রাম-অঞ্চলের এই পুরাতন আশ্রমটিতে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথি প্রভৃত উৎসাহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজা, ভজন এবং দরিদ্রনারায়ণ-সেবা উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্থানীয় হিন্দু অধিবাসিবৃন্দ ব্যতীত অনেক মুসলমান ভ্রাতাও আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম—সম্প্রতি মালদহে মঠ ও মিশনের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজের পদার্পণ শহরে এবং সন্নিহিত গ্রামাঞ্চলে ধর্মপিপাসু নরনারীগণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যারতির পর আশ্রমে মহারাজজী উপস্থিত সকলকে সহজ ও মর্মস্পর্শী ভাষায় ধর্মের মূলতত্ত্ব—সত্য, সরলতা, পবিত্রতা, ভগবদ্‌বিশ্বাস, ভক্তি ও অনাসক্ত কর্ম-যোগ-সম্বন্ধে উপদেশ দান করিতেন।

গত ২৩শে পৌষ যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের শুভ জন্মতিথি-উপলক্ষে অপরাহ্ণে প্রসিদ্ধ শিক্ষাবিদ্ পশ্চিম বঙ্গের বিধান পরিষদের সভাপতি ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় প্রায় তিন সহস্র নরনারীর সম্মুখে স্বামিজী কর্তৃক ভারতের মৃতপ্রায় দেহে প্রাণসঞ্চারের ইতিবৃত্ত তাঁহার স্বভাবসুলভ প্রাণস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত করেন। ২৪শে পৌষ, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক শ্রীযতীন্দ্র-নাথ গাঙ্গুলী মহাশয়ের সভাপতিত্বে ছাত্রছাত্রীদের বক্তৃতা, আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ এবং ক্রীড়া ও প্রবন্ধ-প্রতিযোগীদিগের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৯ই মাঘ পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্র-কুমার মুখার্জি আশ্রম-সংলগ্ন বিবেকানন্দ বিদ্যা-মন্দিরের নবনির্মিত গৃহ ও ছাত্রদের নিজ হাতে তৈরী কুটিরশিল্প-প্রদর্শনীর দ্বারোদ্‌ঘাটন এবং মিশন-প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ বাস্তুহারা পল্লীটি পরিদর্শন করেন।

উদ্বোধনের প্রচ্ছদপট

বর্তমান বর্ষের প্রথম (মাঘ) সংখ্যা হইতে উদ্বোধনের প্রচ্ছদপটে যে চিত্র দেওয়া হইতেছে উহা কামারপুকুরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মস্থানের উপর নবনির্মিত মন্দিরের। পিছনে একদিকে শ্রীশ্রীঠাকুরের পৈতৃক গৃহের একখানি ঘর এবং অপরদিকে তাঁহার স্বহস্তরোপিত আম্রবৃক্ষ দেখা যাইতেছে। মন্দিরটির পরিকল্পনা করেন শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে নলিনীরঞ্জন সরকার - কর্মবীর নলিনীরঞ্জন সরকারের মৃত্যুতে বাংলার রাজনৈতিক ও ব্যবসাক্ষেত্র হইতে একটি বলিষ্ঠ শক্তির অভাব হইল। যে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়, অকুণ্ঠ অধ্যবসায়, মেধা ও অনবনমিত কর্মশক্তি-প্রভাবে তিনি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালীমাত্রেরই বিশেষ অনুকরণীয়। আমরা বাঙ্গলার এই সুসন্তানের পরলোকগত আত্মার শান্তি-কামনা করি।

কলিকাতা বিবেকানন্দ সোসাইটি—গত পৌষ ও মাঘ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সোসাইটি-ভবনে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী সারদাদেবী এবং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পার্ষদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ, স্বামী সারদানন্দ এবং স্বামী অদ্ভুতানন্দ মহারাজের বাৰ্ষিকী স্মৃতিপূজা-উপলক্ষে বিশেষ বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। সোসাইটির সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা-সভায় পণ্ডিত শ্রীহরিদাস বিদ্যার্ণব 'গীতা', অধ্যাপক শ্রীগোকুলদাস দে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' এবং শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' ও 'বিবেকানন্দের ভারতীয় বক্তৃতামালা' ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করেন। সোসাইটির উদ্যোগে ১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারী) কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ-প্রসঙ্গে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেন যে, সমগ্র বিশ্বের চিন্তারাজ্যে আজ ভাব ও আদর্শের এক দ্বন্দ্ব চলিতেছে এবং সেই দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য বিশ্ববাসী সাগ্রহে ভারতের দিকে চাহিয়া আছে। কিন্তু ভারত আজ নিজেই প্রস্তুত নহে, তাই বিশ্বের ভাবরাজ্যের নেতৃত্ব গ্রহণ করা তাহার পক্ষে সম্ভব নহে। সুতরাং ভারতকে আজ জগতের পথপ্রদর্শকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতের নব-জাগরণের বিপ্লবী নায়ক স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শের প্রচার হওয়া দরকার।

শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত বলেন যে, ভারতকে জানিতে হইলে, আধুনিক ভারতের নব-জাগরণকে জানিতে হইলে বিবেকানন্দকে জানিতে হইবে। ভারতবাসী আজ এমন এক পর্যায়ে আসিয়া পৌঁছিয়াছে যে, স্বামিজীর প্রদর্শিত পথে না চলিলে ভারত অচিরেই প্রাচীন মিশর, গ্রীস, প্রভৃতির ন্যায় বিস্মরণের পথে মিলাইয়া যাইবে।

অধ্যাপক শ্রীনির্মলকুমার বসু, অধ্যক্ষ শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ, স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং অধ্যাপক ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্তও সুচিন্তিত এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দিয়াছিলেন।

মথুরাপুর (২৪ পরগনা) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে গত ২২শে অগ্রহায়ণ (৮ই ডিসেম্বর) শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর শুভ আবির্ভাব-উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। বিশেষপূজা, ভোগরাগ, প্রসাদ-বিতরণ, কালীকীর্তন প্রভৃতি উৎসবের অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে একটি জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতময় জীবনের মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

গত ২৩শে পৌষ (৭ই জানুয়ারী) হইতে ২৭শে পৌষ পর্যন্ত আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসবও বিবিধ চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠানের মধ্যে

উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষ্যে একটি জনসভায় স্বামিজীর দিব্য জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী আলোচনা হয়।

বারাসতে স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা—গত ২৮শে অগ্রহায়ণ (১৪ই ডিসেম্বর) পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী মহারাজের (মহাপুরুষ মহারাজ) বারাসতস্থ জন্মস্থানে ভক্তগণের উৎসাহে তাঁহার জন্ম-দিবস প্রতিপালিত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে তাঁহার জন্মস্থানের উপর নির্মিত শ্রীশ্রীঠাকুরঘরের প্রতিষ্ঠা হয়। বিশেষপূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম, প্রসাদবিতরণ প্রভৃতি উৎসবের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। এতদ্ভিন্ন শ্রীশ্রীরামনাম-সংকীর্তন ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা-কীর্তন বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। সুসাহিত্যিক শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীমণিমোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ভক্ত শ্রীশ্রীমহাপুরুষ মহারাজের জীবনী আলোচনা করেন। বেলুড় মঠের কয়েক জন সন্ন্যাসীও উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন।

নবদ্বীপ শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সমিতি—গত ২০শে পৌষ এই প্রতিষ্ঠানে স্বামিজীর একনবতিতম জন্মোৎসব সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। প্রাতঃকালে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ অবৈতনিক পাঠশালা ও সারদাদেবী বিদ্যাপীঠের বালক-বালিকাবৃন্দ কর্তৃক স্তোত্রপাঠ, উষাকীর্তন, মঙ্গলারতি, পূজা-হোম ও মধ্যাহ্নে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়। অপরাহ্নে শ্রীচারুচন্দ্র পাকড়াসী ভাগবত-শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌরোহিত্যে একটি সভায় বালকবালিকাগণের লিখিত প্রবন্ধ ও কবিতা-পাঠ এবং স্বামিজীর জীবনী ও বাণী আলোচিত হয়।

আজমীঢ় শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—গত ২২শে অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীমায়ের শুভ-জন্মতিথি-উপলক্ষে এই প্রতিষ্ঠানের নবনির্মিত মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়। সায়ংকালে একটি জনসভায় স্থানীয় সনাতন ধর্মসভার প্রধান শ্রীহনুমানপ্রসাদজী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীমার অলৌকিক চরিত্রকে সর্বত্যাগী শঙ্কর ও উমা হৈমবতীর দিব্যাদর্শের সহিত তুলনা করিয়া বলেন যে, বিদ্যালয়গুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করিলে ছাত্রছাত্রীদের নৈতিক চরিত্রগঠনের প্রভূত সহায়তা হইবে। আজমীঢ় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় বক্তৃতা-প্রসঙ্গে বলেন যে, আইন-অমান্য আন্দোলন-হেতু কারাবাস-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-গ্রন্থাবলী পাঠের দ্বারা তাঁহার নিজের জীবন অত্যন্ত প্রভাবিত হইয়াছে। তাঁহার মতে শ্রীসারদাদেবীর পূত অনাড়ম্বর জীবন আমাদের নারীজাতির আদর্শস্থল; ধনি-নির্ধন, উচ্চ-নীচ সকলেই তাঁহার সাধন-সম্পদ দ্বারা ধন্য হইয়াছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের জন্মোৎসব-উপলক্ষে গত ২৩শে পৌষ আশ্রম-ভবনে পূজা, পাঠ, ভোগরাগ, ভজন ও আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। ২৭শে পৌষ স্থানীয় বাঙালী ধর্মশালার প্রাঙ্গণে সর্বসাধারণের জন্য আহূত একটি জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাউ উপাধ্যায় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, ভারতে জাতীয়তার কর্ণধার গান্ধীজী যে দীন-হীনদের জন্য কর্ম করিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রেরণাদাতা স্বামিজীই। কারণ, তিনিই 'দরিদ্রনারায়ণ' বাণীর উদ্গাতা বা স্রষ্টা।

৺গিরীন্দ্রনাথ রায়—আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের একনিষ্ঠ ভক্ত ও হিতৈষী বন্ধু নড়াইলের অন্যতম জমিদার শ্রীগিরীন্দ্রনাথ রায় গত ২৮শে অগ্রহায়ণ হৃদ্‌রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মিশনের বরাহনগর শাখা-কেন্দ্রের সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ড তাঁহাদেরই দান। দীর্ঘ ২৫ বৎসর ধরিয়া তিনি এই আশ্রমের সম্পাদক ছিলেন এবং সর্বপ্রকারে উহার সেবায় আত্মনিয়োগ

করিতেন। এই সদাশয় ভক্ত ও কর্মীর লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

শালিপুর (কটক) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে 'কল্পতরু'-উৎসব-উপলক্ষে পূজা, হোম, রামনাম-কীর্তন এবং ঠাকুরের লীলামৃত-পাঠ অহোরাত্র চলিয়াছিল।

আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের জন্মতিথিতেও পূজাদি, দরিদ্রনারায়ণসেবা এবং শিশুদিগের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ করা হইয়াছিল। একটি জনসভায় আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রীচন্দ্রশেখর মিশ্রশর্মা স্বামিজীর জীবনী ও শিক্ষা-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-বার্ষিকী স্থানীয় অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুবৃন্দের উৎসাহে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিশেষ পূজার্চনা, ভজন, কীর্তন এবং আলোচনা উৎসবের অঙ্গ ছিল। শেষোক্ত উৎসবে সুপরিচিত ধর্মব্যাখ্যাতা শ্রীরমণী-কুমার দত্তগুপ্ত সভায় পৌরোহিত্য করেন। শ্রীমতী সুধীরা মজুমদার ও শ্রীরবীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় স্বামিজীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে ভাষণ দিয়াছিলেন।

পরলোকে দেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর মন্ত্রশিষ্য, উদ্বোধনের পুরাতন লেখক, শিক্ষাব্রতী শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় গত ২রা মাঘ ৬৫ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে ইষ্টনাম উচ্চারণ করিতে করিতে পরলোকগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল চেতলা হাইস্কুলে শিক্ষকতা-ব্যপদেশে নির্ভীক উন্নত চরিত্রের জন্য তিনি শিক্ষক ও ছাত্রগণের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময় হইতে বরাবর নিজহাতে কাটা সুতার কাপড় পরিতেন। দেবেন্দ্র বাবুর লিখিত চণ্ডী ও গীতার আলোচনা-গ্রন্থদ্বয় সুধীসমাজে আদৃত হইয়াছে। আমরা এই অনাড়ম্বর কর্মযোগীর আত্মার শান্তি কামনা করি।

স্বামী ব্রহ্মানন্দের স্মরণোৎসব—পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের জন্মস্থান সিকরাকুলীন গ্রামে তাঁহার শুভ জন্মতিথিতে (৪ঠা মাঘ) স্থানীয় শ্রীগোলোকবিহারী ঘোষের আগ্রহে এবং কলিকাতার কতিপয় ভক্তের উৎসাহে সারদিনব্যাপী পূজা, পাঠ, ভজনাদি সহ আনন্দোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়া ছিল। বেলুড় মঠের কয়েক জন সন্ন্যাসীও এই অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন।

দক্ষিণ কলিকাতায় শ্রীশ্রীমায়ের জন্মোৎসব—৮০।১এ, ল্যান্সডাউন রোডস্থিত শ্রীসারদা আশ্রমে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভাবির্ভাব-স্মরণে ১৭ই মাঘ (৩১শে জানুয়ারী) হইতে ২২শে মাঘ (৫ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

প্রথম দিন আশ্রমবাসিনীগণ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদি করেন। ভজন-কীর্তনাদিতে ঐদিন আশ্রম-প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকে। প্রায় ৮০০ শত মহিলাকে প্রসাদ দেওয়া হয়।

দ্বিতীয় দিবস, রবিবার বৈকাল ৪ ঘটিকায় আশ্রম-প্রাঙ্গণে একটি সাধারণ সভার অনুষ্ঠান হয়। এই সভায় পৌরোহিত্য করেন বিচারপতি শ্রীযুত কমলচন্দ্র চন্দ্র। বিভিন্ন বক্তা শ্রীশ্রীসারদা দেবীর পুণ্য জীবনের বিভিন্ন দিক্-সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

তৃতীয় দিবস অধ্যক্ষা ডক্টর রমা চৌধুরীর নেত্রীত্বে একটি মহিলা-সভার অনুষ্ঠান হয়। সম্পাদিকা বাণী দেবী আশ্রমের কার্য-বিবরণী পাঠ করেন। উৎসব-উপলক্ষ্যে 'দেবেন্দ্রনাথ-স্মৃতি-ফণ্ড' হইতে ছাত্রীদের মধ্যে 'শ্রীশ্রীসারদাদেবী ও আধুনিক নারী'-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রতি-যোগিতার পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অতঃপর বিভিন্ন বক্ত্রী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী আলোচনা করেন।

উৎসবের চতুর্থ ও পঞ্চম দিবসে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিকৃতির সম্মুখে আশ্রম-বালিকাগণ কর্তৃক 'শবরীর প্রতীক্ষা' অভিনয়, সঙ্গীতানুষ্ঠান এবং শ্রীশ্রীসারদালীলা-সঙ্কীর্তনের আয়োজন করা হইয়াছিল।

ষষ্ঠ দিনে অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজের এই উৎসব-উপলক্ষ্যে প্রেরিত আশীর্বাণী ও শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম প্রাচীন সন্ন্যাসী শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য স্বামী প্রেমেশানন্দজীর শুভেচ্ছাপত্র পাঠ করিয়া সকলকে শুনান হয়। পরে আমেরিকান ভক্ত লুইস্ দম্পতীর ব্যবস্থাপনায় ও সৌজন্যে একটি চলচ্চিত্রে বলীদ্বীপের হিন্দু মন্দির ও প্রাকৃতিক দৃশ্যসমূহ এবং দক্ষিণেশ্বর ও বেলুড় মঠের চিত্রাবলী প্রদর্শিত হয়।

দরং (তেজপুর) শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম—এই প্রতিষ্ঠানে শ্রীশ্রীমা এবং স্বামী বিবেকানন্দের পুণ্যজন্মতিথি-উপলক্ষ্যে আনন্দোৎসব সমারোহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে। আলোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় একাডেমী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীপদ্মেশ্বর বর ঠাকুর। প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীহেমন্তকুমার গাঙ্গুলী। ছাত্রগণের মধ্যে স্বামিজীর জীবন ও বাণী অনুশীলন করিবার খুব উৎসাহ লক্ষিত হয়। 'সমাজসংস্কারক স্বামী বিবেকানন্দ' বিষয়ক প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠস্থান লাভ করিয়াছেন শ্রীমতী আরাধনা বসু।

আমেদাবাদে বিবেকানন্দ-জয়ন্তী—২৭শে পোষ, স্থানীয় শ্রীবিবেকানন্দমণ্ডলী পাঠচক্র সকাল হইতে রাত্রি ১১টা পর্যন্ত ব্যাপী বিভিন্ন কার্যক্রমযুক্ত এই জয়ন্তী-উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃপাশঙ্কর পণ্ডিত ও শ্রীজয়ন্তীলাল ওঝা স্বামিজীর সেবা ও ত্যাগ-বিষয়ে প্রবচন করেন।

কামারপুকুরের উন্নতিকল্পে আবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামের যে সকল বস্তু ও স্থান তাঁহার বাল্য-জীবন ও বিবিধ লীলার সহিত জড়িত, তাহাদের সংরক্ষণের গুরু দায়িত্ব রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জন্মস্থানের উপর তাঁহার মর্ম্মর বিগ্রহসহ চুনার পাথরের রমণীয় স্মৃতি-মন্দিরটি ও শ্রীশ্রীরঘুবীরের মন্দির দ্বারা এই স্থানের সৌন্দর্য্য ও প্রশান্ত গম্ভীর ভাব অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত দূরাগত ভক্তগণের সুবিধার জন্য একটি অতিথিভবনও নির্ম্মিত হইয়াছে। কিন্তু এখনও অনেক করণীয় বিষয় রহিয়াছে। যথা—প্রাচীন হালদার পুকুরের পঙ্কোদ্ধার, আশ্রম পরিচালিত দাতব্য চিকিৎসালয়টির জন্য একটি গৃহ, আশ্রমের প্রাথমিক বিদ্যালয়টিকে একটি আদর্শ বুনিয়াদি শিক্ষায়তনরূপে গঠন, শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্য সেবা-পূজার সুব্যবস্থা এবং ম্যালেরিয়া-জর্জ্জরিত গ্রামখানির স্বাস্থ্যোন্নতি; আশ্রমটির আর্থিক স্থায়িত্ব-বিধানও প্রয়োজন। এই সকল কার্য্য প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ। সহৃদয় দেশবাসীর দৃষ্টি এই দিকে আমরা আকর্ষণ করিতেছি। নিম্নলিখিত ঠিকানায় সাহায্য সাদরে গৃহীত হইবে। ইতি

নিবেদক
স্বামী বগলানন্দ
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও
সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন,
পোঃ কামারপুকুর, জেলা হুগলী।

উদ্বোধন
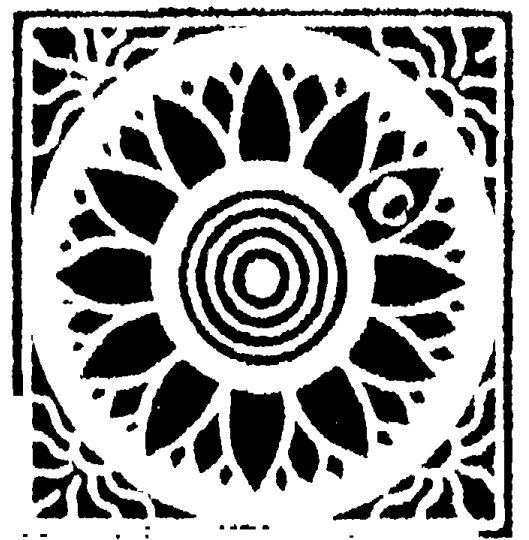
বিচিত্র জীবন-প্রহসন

ভোগা ন ভুক্তা বয়মেব ভুক্তা-
স্তপো ন তপ্তং বয়মেব তপ্তাঃ।
কালো ন যাতো বয়মেব যাতা-
স্তৃষ্ণা ন জীর্ণা বয়মেব জীর্ণাঃ॥

নিবৃত্তা ভোগেচ্ছা পুরুষবহুমানোঽপি গলিতঃ
সমানাঃ স্বর্যাতাঃ সপদি সুহৃদো জীবিতসমাঃ।
শনৈর্যষ্ট্যুত্থানং ঘনতিমিররুদ্ধে চ নয়নে
অহো মূঢ়ঃ কায়স্তদপি মরণাপায়চকিতঃ॥

(বৈরাগ্যশতকম্)

কত না আশা-উৎসাহ লইয়া সংসারের সুখ-ভোগ করিতে গিয়াছিলাম, জীবনের সন্ধ্যায় আজ হিসাব-নিকাশ করিতে বসিয়া দেখিতেছি, সংসারকে তো আমরা ভোগ করিতে পারি নাই—সংসারই আমাদিগকে মনের সাধে গিলিয়া উপভোগ করিয়াছে। কোথায় আমাদেরই করিবার কথা ছিল তপ—ঘটিল বিপরীত, আমরাই সারাজীবন সন্তপ্ত হইয়া মরিয়াছি। কালকে আমরা অতিক্রম করিতে পারি নাই—কালই আমাদিগকে ঠেলিয়া ঠেলিয়া মৃত্যুর দরজা পর্যন্ত লইয়া আসিয়াছে। দুরন্ত বিষয়-তৃষ্ণা তো একটুও জীর্ণ হইল না—আমাদিগকেই চরম জীর্ণ করিয়া ছাড়িল!

ইন্দ্রিয়ের ভোগ-ক্ষমতা শিথিল হইয়াছে, উত্তুঙ্গ পৌরুষের এত যে দম্ভ-খ্যাতি তাহাও স্তিমিত-প্রায়, সমবয়সী প্রাণসম সুহৃদবর্গ একে একে পৃথিবীর পরপারে চলিয়া গিয়াছেন, জরাগ্রস্ত শরীরকে আজ অতি সন্তর্পণে লাঠিতে ভর দিয়া তুলিতে হয়, চোখের দৃষ্টিও লুপ্তপ্রায়। জীবন-রঙ্গ-নাট্যের শেষ দৃশ্য অভিনীত হইতেছে, যবনিকা পড়িতে সামান্যই বিলম্ব—কিন্তু তবুও হায় বাঁচিবার কী দুর্বার তৃষ্ণা! এই পৃথিবী যে ছাড়িয়া যাইতে হইবে ভাবিতে গেলেও সারা দেহ যেন শিহরিয়া উঠে।

কথাপ্রসঙ্গে

যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে

ঢাকুরিয়া লেকে একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেন। একখানি বেঞ্চে একটি ভদ্রলোক ও একটি মহিলা বসিয়া গল্প করিতেছেন। নিকটে বড় বেশী কেহ নাই। অপর পাড় হইতে একটি ১৪।১৫ বৎসরের স্কুলের ছেলে তাহার সমবয়সী সাথীকে উঁহাদের দেখাইয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্যঙ্গ করিয়া উঠিল—"দেখ্ দেখ্ হাবু, একজোড়া কপোত-কপোতী।" প্রত্যক্ষদ্রষ্টা বৃদ্ধ দেশবরেণ্য মনীষী স্যার যদুনাথ সরকার। তাঁহার চোখে দেখা আর একটি ঘটনা:—নৈহাটিতে গিয়াছেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিবার্ষিকী উপলক্ষে। দেখিলেন ছোট ছোট ছেলেদের (বয়স সকলেরই বারো বৎসরের কম) অসম্ভব ভিড়; হৈ-হল্লা করিতেছে—আগে যাইবার জন্য চিৎকার, ঠেলাঠেলি করিতেছে। খবর লইয়া জানা গেল, তাহারা শুনিয়াছে বঙ্কিম-স্মৃতিবার্ষিকীতে কলিকাতার কোন ত্যক্ত-ভর্তৃকা অভিনেত্রী আসিবেন এবং রাজ্যপালের সামনে নাচগানাদি হইবে! সংবাদটি ছিল অবশ্য একটি গুজব।

'বিবেকানন্দের পদাঙ্কে'-সংজ্ঞক একটি ইংরেজী প্রবন্ধে (Hindusthan Standard, ৭ই জানুয়ারী) স্যার যদুনাথ নারীজাতির প্রতি আমাদের বর্তমান দৃষ্টিভঙ্গীর আলোচনা-প্রসঙ্গে ঐ ঘটনা দুটির উল্লেখ করিয়াছেন। আজীবন শিক্ষাব্রতী এবং দেশের ইতিহাস ও সংস্কৃতির গবেষণায় আত্মনিয়োগপর এই জ্ঞানতপস্বী জীবনের সন্ধ্যায় জনসাধারণের নৈতিক মানসম্বন্ধে যে বেদনা-মাখা কথাগুলি বলিয়াছেন, তাহা স্বতই হৃদয়কে স্পর্শ করে।

সর্বোপরি একটি জিনিসের জন্য বিবেকানন্দকে আজ আমাদের স্মরণ করা কর্তব্য—নারীতে তাঁহার মাতৃপূজা। মানুষের প্রত্যেকটি সমাজে মাতাই যে উহার জীবন এবং উন্নতির নিদান ইহা কি আমরা ভুলিতে পারি? * * যে জাতিতে নারীকে কতকগুলি হৃদয়হীন বিবেচনা-শূন্য লোকের সাময়িক ভোগসুখের যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া মনে করা হয়, সে জাতির পরিণাম ধ্বংস কিংবা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়—নৈতিক অধঃপতন এবং ব্যাধির অতল গহ্বরে পতন। ইহা জীব-বিজ্ঞানের সত্য, শুধু ধর্মের মতবাদ-মাত্র নয়। কিন্তু আজ ভারতে তথা বাহিরের বিশ্বেও স্ত্রীজাতির প্রতি জনগণের কি দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় পাই? * * আমাদের সাহিত্য, চারুকলা, চলচ্চিত্র, বাহারী প্যারেড্, রূপ-প্রতিযোগিতা—সব কিছুই মানুষের একটি মাত্র জৈবিক প্রবৃত্তিকে উদ্দীপ্ত করে—ইতরপ্রাণীর সহিত যে প্রবৃত্তির সে অংশীদার। কোন বয়সই বাদ যায় না। স্কুলের কিশোর—কলেজগামী তরুণ—অফিসের এবং কারখানার যুবক—প্রত্যেকেরই চোখের সামনে প্রকাশ্যে তুলিয়া ধরা হইতেছে স্ত্রীলোকের নির্লজ্জ প্রলোভনময় দৈহিক আকর্ষণ।

এই দূষিত দৃষ্টি যে আমাদের সমাজের নিম্নতম শ্রেণীতেই আবদ্ধ তাহা নয়। স্ত্রীলোকের প্রতি এই সাধারণ অমর্যাদা, মাতৃজাতির শুচিতার প্রতি এই অনাস্থা—তথাকথিত 'ভদ্রলোক'দিগের মধ্যেও সংক্রমিত হইতেছে। তাঁহাদের বেপরোয়া কথাবার্তা লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যায়। অশ্লীল পরিহাসকে অনেক সময় বুদ্ধির প্রাখর্য বা প্রাচীন কুসংস্কার-মুক্তি বলিয়া তারিফ করা হইয়া থাকে।

আমাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়গণের নৈতিক জীবনের বলিষ্ঠতার জন্য আচার্য যদুনাথ সরকার জাতির কল্যাণকামিগণকে অবহিত হইতে বলিয়াছেন। এই সর্বগ্রাসী নৈতিক সঙ্কটের বিরুদ্ধে প্রত্যেকে

নিজ নিজ সীমায়িত ক্ষেত্রে তাঁহার সকল প্রভাব বিস্তার করিতে হইবে।

আর সুনীতি ও শুচিতার প্রতিষ্ঠার জন্য এই অভিযানে বিবেকানন্দের জীবন হইবে ধ্রুব পথ-নির্দেশক দীপ্তিমান আলোক-স্তম্ভ। পাশবিকতাকে কখনও আমরা দেব-তীর্থের স্থান অধিকার করিতে দিব না। 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' ইহা যেন আমরা না ভুলি।

নারীজাতিকে যাহাতে আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা করিতে শিখি, সেজন্য স্বামিজী আমাদের যুবকগণকে লক্ষ্য করিয়া যে সকল অগ্নিময়ী বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেগুলি সত্যই গভীর ভাবে অনুধাবনীয়। 'যত্র নার্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ' মনুসংহিতার এই বাক্য পরিবারে ও সমাজে বাস্তব ভাবে ফুটাইয়া তুলিতে তিনি আমাদিগকে বার বার আহ্বান করিয়াছিলেন। বর্তমান জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নারী অবশ্যই পর্দানশীন হইয়া লুকাইয়া থাকিবেন না—শিক্ষায়, কর্মে, সামাজিক অগ্রগতিতে তাঁহারা পুরুষের পাশে পাশে আগাইয়া যাইবেন, কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিতে নারীকে মাতৃত্বের যে বিশুদ্ধ মর্যাদা দেওয়া হইয়াছে সেই সুমঙ্গল প্রশান্ত মহিমার স্থান হইতে তাঁহাকে নীচে নামাইয়া আনিবার দুর্বুদ্ধি যেন আমাদের কখনও না হয়। স্বামিজী বলিতেছেন,—

"আমেরিকা ইউরোপে কি দেখছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা। তবু এরা অজান্তে পূজা করে; কামের দ্বারা করে। আর যারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করবে, তাদের কি কল্যাণ না হবে?"

"স্ত্রী-জাতির প্রতি ন্যায্য সম্মান দিয়াই সব জাতি বড় হইয়াছে। যে দেশ বা জাতি এই শ্রদ্ধাদানে বিমুখ তাহারা কখনও উন্নতি করিতে পারে নাই—ভবিষ্যতেও পারিবে না। আমাদের জাতির যে এত অধোগতি হইয়াছে তাহার প্রধান কারণ এই যে শক্তির এই জীবন্ত প্রতিমূর্তিগণকে আমরা যথাযথ মর্যাদা দিই নাই। * * * প্রকৃত শক্তি-উপাসক কে জানো কি? যিনি জানেন বিশ্বপ্রকৃতিতে ঈশ্বর সর্বব্যাপিনী শক্তিরূপে বিরাজিত—আর ইহা জানিয়া যিনি রমণীর ভিতর সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখিতে পান।"

"নারী হইতেছেন জগন্মাতার জীবন্তমূর্তি। ইহার বাহ্যিক প্রকাশ ইন্দ্রিয়সমূহের আকর্ষণরূপে পুরুষকে উন্মত্ত করে—কিন্তু ইহারই আন্তর বিভূতি—জ্ঞান-ভক্তি-বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি মানুষকে করে সর্বজ্ঞ, সিদ্ধ-সঙ্কল্প এবং ব্রহ্মবিজ্ঞানী।"

অস্পৃশ্যতা, জাতিভেদ এবং গণতন্ত্র

জানুয়ারী মাসের Calcutta Review পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে 'জাতিভেদ ও গণতন্ত্র' নামক নিবন্ধে স্বাধীন ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিভেদের বর্তমান অবস্থার বিশ্লেষণ করা হইয়াছে। লেখকের মতে:—"হিন্দুসমাজের সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত জাতিভেদপ্রথা ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসে বরাবর ঐ সমাজের একটি অন্তর্নিহিত দুর্বলতার নিদান হইয়া আসিয়াছে। শুধু চতুর্বর্ণ আর এখন নাই—অসংখ্য জাতি-উপজাতিতে সমাজ বহুধা বিভক্ত। ফলে হিন্দুসমাজের প্রধান ধারা দেখি ঐক্য নয়—বিচ্ছিন্নতা। মুসলমান-রাজত্বের বিভিন্ন সময়ে এক একটি ধর্ম-আন্দোলন জাতিভেদ অস্বীকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে, কিন্তু এই প্রচেষ্টা সমাজের উপরিভাগেই কিছু দাগ কাটিয়াছে মাত্র—বিভেদের মূলকে বিনষ্ট করিতে পারে নাই। ব্রিটিশ শাসনের পাশ্চাত্ত্যভাব ও আদর্শের সংঘাতে জাতিভেদপ্রথা কিছুটা ধাক্কা খাইয়াছিল, কিন্তু পরে যাঁহারা উহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেই সনাতন হিন্দুসমাজ হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়া নূতন সমাজ গঠন করিতে হইয়াছিল। * * স্বামী বিবেকানন্দ এবং পরে মহাত্মা গান্ধী অস্পৃশ্যতার তীব্র প্রতিবাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন। অনেকে

তাঁহাদের এই ভাবধারাকে বিজাতীয় বলিয়া নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু উভয়ের শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সেই নিন্দুকগণ বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

"স্বামী বিবেকানন্দ অবশ্য তাঁহার স্বল্পপরিমিত জীবনে অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে অভিযানের কাজ সম্পূর্ণ করিয়া যাইতে পারেন নাই – কিন্তু মহাত্মা গান্ধী দীর্ঘকাল ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়া অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণের বাণী দিকে দিকে প্রচার করিতে পারিয়াছিলেন। জাতিভেদ-প্রথা না হইয়া অপর যে কোন রীতিনীতি হইলে মহাত্মা গান্ধীর ঐ দূর-প্রসারী প্রচারের প্রবল অভিঘাতে উহা চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, কিন্তু অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর ধরিয়া হিন্দুসমাজের দৈনন্দিন জীবনে যে প্রথা দৃঢ়মূল হইয়া বসিয়া গিয়াছে, সেই প্রথাকে বিনষ্ট করা কঠিন বটে!

"স্বাধীনতা লাভ করিবার পর আশা করা গিয়াছিল, দেশবাসীর মনেরও স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাইবে এবং বহু শতাব্দী যে সকল সামাজিক আচার মানুষের মনকে শৃঙ্খলিত করিয়া রাখিয়াছিল সেগুলির অবসান ঘটিবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় উল্টা প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। আমাদের গণতান্ত্রিক শাসন জাতিভেদপ্রথার শক্তিকে যেন বাড়াইয়া দিয়াছে।... গত সাধারণ নির্বাচনের সময় দেশের কোন কোন অঞ্চলে ভোট দেওয়া হইয়াছে উচ্চ-নীচ জাতি বিচার করিয়া। দেশের লোকের চিন্তা ও কর্মধারা যদি এই ভাবেই চলিতে থাকে, তাহা হইলে গণতন্ত্রের মৃত্যু অনিবার্য এবং জাতীয় ঐক্যও একটি স্বপ্নই রহিয়া যাইবে।"

লেখকের উক্ত আলোচনা পড়িয়া মনে হয়, তিনি অস্পৃশ্যতা এবং জাতিভেদ-প্রথাকে এক পর্যায়ে ফেলিয়াছেন। আমাদের মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দ এবং গান্ধীজী যে উদ্যত দণ্ড তুলিয়াছিলেন উহা অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধেই। বর্ণবিভাগের বর্তমান বিকৃত এবং বহুশাখান্বিত ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ সমর্থন না করিলেও উহার উপর তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা সহিষ্ণু ছিল। অস্পৃশ্যতার সর্বপ্রকার অভিব্যক্তি নির্মমভাবে বিনাশ করিতে হইবে, কিন্তু হিন্দুসমাজের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণ-বিভাগকে চেষ্টা করিতে হইবে বৈদিকযুগের প্রথম প্রবর্তনার কল্যাণকর বৈজ্ঞানিক ভাবটিকে ফিরাইয়া আনিতে—ইহাই তাঁহাদের অভিপ্রায় ছিল। জাতিভেদ-সম্পর্কে স্বামিজীর নিম্নোক্ত কথাগুলি অনুধাবনীয়ঃ—

"এমন কোন দেশ পৃথিবীতে দেখি না যেখানে জাতিভেদ নাই। ভারতে বরং জাতি হইতে শুরু করিয়া পরে আমরা এমন এক অবস্থায় হাজির হই যেখানে জাতি নাই। আমাদের জাতিপ্রথাটি এই নীতির উপরই বরাবর দাঁড়াইয়া। ভারতীয় ধারণা হইতেছে—প্রত্যেককেই ব্রাহ্মণত্বে উপনীত করা—কেননা আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি ও ত্যাগসম্পন্ন ব্রাহ্মণই মনুষ্যত্বের আদর্শ।"

"য়ুরোপীয় সভ্যতার উপায় হইতেছে তরবারি—আর্যগণের ক্ষেত্রে বর্ণবিভাগই হইতেছে সভ্যতার সোপান—অর্থাৎ বিদ্যা এবং সংস্কৃতি-অনুযায়ী ব্যক্তিকে ধীরে ধীরে উচ্চস্তরে উঠাইয়া লওয়া। য়ুরোপে সর্বত্র নীতি হইতেছে সবলের জয় এবং দুর্বলের মৃত্যু। ভারতভূমিতে কিন্তু প্রত্যেকটি সামাজিক নিয়ম দুর্বলের রক্ষার জন্য। ইহাই আমাদের বর্ণধর্মের আদর্শ। উহার উদ্দেশ্য হইতেছে সমস্ত মানবসমাজকে ধীরে, মৃদুভাবে মহান দেব-মানুষে উন্নীত করা—যে মানুষ সম্পূর্ণ অহিংস, সংযত, প্রশান্ত, পূজার্চনাশীল, পবিত্র ও ধ্যাননিষ্ঠ।"

"জাতিপ্রথা চলিয়া যাওয়া উচিত নয়—শুধু উহার একটু অদল-বদল দরকার।...মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ হইবেই—কিন্তু ইহার অর্থ ইহা নয় যে, ভোগাধিকারের তারতম্য থাকিবে।

"উহা ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। জেলেকে যদি বেদান্ত শিখাও তো সে বলিবে,—'তুমি দার্শনিক আর আমি জেলে—কিন্তু তুমিও যে মানুষ আমিও তাহাই। তোমার ভিতর যে পরমাত্মা আমার মধ্যেও তিনি।' আমরা চাই

ইহাই। কাহারও জন্য বিশেষ অধিকার নয়—সকলের জন্য সমান সুযোগ।

"যাহারা ইতিপূর্বেই উঁচুতে আছে তাহাদিগকে নীচে টানিয়া আনিয়া, পানাহারের স্বেচ্ছাচারিতা দেখাইয়া কিংবা অধিকতর ভোগের জন্য নিজেদের সীমার বাহিরে লাফাইয়া গিয়া জাতি-সমস্যার সমাধান হইবার নয়। সমাধান হইবে যদি আমরা প্রত্যেকে আমাদের বৈদান্তিক ধর্মের অনুশাসনগুলি পরিপূর্ণ করিয়া আধ্যাত্মিকতা এবং আদর্শ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারি। * * * ব্রাহ্মণই হও কিংবা নিম্নতম চণ্ডালই হও এই দেশের প্রত্যেকের উপরই পূর্বপুরুষগণ একটি বিধান ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন—অবিরত তোমাদিগকে উন্নতিলাভ করিতে হইবে—প্রত্যেককে আদর্শ ব্রাহ্মণ হইবার জন্য প্রযত্ন করিতে হইবে।

"নানা জাতির মধ্যে কলহ করিয়া কোন লাভ নাই। ইহাতে বরং আমাদিগকে আরও বেশী বিচ্ছিন্ন, দুর্বল এবং অধঃপাতিত করিবে। * * ব্রাহ্মণদিগের কাছে আমার এই সনির্বন্ধ মিনতি তাঁহারা যেন ভারতের সনাতন আদর্শ ভুলিয়া না যান। প্রথমতঃ নিজ চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ অপরকে সেই পর্যায়ে উন্নয়ন—এই দুইটি দ্বারা তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণত্বের দাবী প্রমাণ করিতে হইবে। * * মুরুব্বিয়ানা বা প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের কুসংস্কার ও ভণ্ডামীমাখা অহঙ্কারের ভাবে নয়—যথার্থ সেবার ভাবে চতুষ্পার্শ্বস্থ অব্রাহ্মণদিগকে তুলিয়া লইয়া আপনাদের পৌরুষ ও ব্রাহ্মণত্ব প্রদর্শন করুন। * * * ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলি, সবুর কর, সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইও না। * * তোমরা নিজেদের দোষেই কষ্ট পাইতেছ। কে তোমাদিগকে আধ্যাত্মিকতা এবং সংস্কৃতশিক্ষা অবহেলা করিতে বলিয়াছিল? * * খবরের কাগজে বৃথা লেখালেখি এবং কলহে সময় নষ্ট না করিয়া, সময়, শক্তিটা ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদীক্ষা আয়ত্ত করিতে লাগাও তো—দেখিবে কার্য সিদ্ধ হইবে।"

উপরোক্ত উদ্ধৃতি হইতে বুঝা যায় স্বামিজী বর্ণ-বিভাগের মূল উদ্দেশ্যটির দিকে আমাদিগকে বিশেষ করিয়া অবহিত হইতে বলিতেছেন। ঐ উদ্দেশ্যটি ভুলিবার জন্যই জাতিপ্রথার নিন্দিত অপপ্রয়োগগুলি হিন্দুসমাজের অবর্ণনীয় ক্ষতি-সাধন করিয়াছে। তবে এই প্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, স্বামিজী চতুর্বর্ণের মধ্যে শাখা-উপশাখা যত কম হয় তাহারই পক্ষপাতী ছিলেন।

স্বামিজী ও ভারতের গণশক্তি

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের গত পাঁচ বৎসরের কার্যাবলী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীসুবোধ ঘোষ 'জনসেবক' পত্রিকায় (২৬শে জানুয়ারী) একটি প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,—"প্রজাতন্ত্র-ভারতে সাধারণ মানুষ তার মানবিক অধিকার লাভ করেছে। ... ... মনে হয় স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন বুঝি সফল হতে চলেছে। 'এক মুঠো ছাতু খেতে পেলে ত্রিলোকে এদের শক্তি ধরবে না'—ভারতের গণশক্তির এই বিরাট আত্মপ্রকাশের রূপ কল্পনা করতে পেরেছিলেন কর্মযোগী সন্ন্যাসী।"

সত্য, কিন্তু একটি কথা আমাদের ভুলিলে চলিবেনা যে সাধারণ মানুষকে মানবিক অধিকার দেওয়া মানে তাহাকে শুধু নির্বাচনে ভোটদানের অধিকার দেওয়া নয়। জীবনযাত্রার মান তেমনই নিম্নতম ধাপে পড়িয়া রহিল, ক্ষীণ শিক্ষার আলোক তেমনই মিট্ মিট্ করিতে লাগিল—অথচ ঘরে বাহিরে আমরা প্রচার করিয়া বেড়াইলাম আমরা সকলকে সমান অধিকার দিয়াছি (যে কোন বড় লোক বা মানী লোকের সহিত তাহাদের সমান ভোট দিবার যোগ্যতা আছে!)—ইহা একটি নিদারুণ পরিহাস—অন্ততঃ স্বামী বিবেকানন্দ বাঁচিয়া থাকিলে তাহাই বলিতেন। তাঁহার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া সুবোধ বাবু যথার্থই বলিয়াছেন,—"বর্তমান ভারতের নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ মানুষই হলো জাতীয় যোগ্যতার প্রধান বাহক ও রক্ষক এবং শক্তির আধার। শুধু সুযোগের এবং অধিকারের অভাবে সে শক্তি কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।" প্রায়

ষাট বৎসর পূর্বে স্বামিজী যখন এই 'নিরক্ষর ও দরিদ্র সাধারণ মানুষের' উন্নয়নের কথা বলিয়াছিলেন তখন ভারত ছিল পরাধীন। বিদেশী শাসকবর্গের নিকট হইতে সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবার আশা না রাখিয়া তিনি এই গুরু কর্তব্যের ভার লইতে ডাকিয়াছিলেন দেশের যুবকগণকে, শিক্ষিত সম্প্রদায়কে। যাহাদের পরিশ্রমে ও অর্থে ধনী ও শিক্ষিতের তথা কথিত সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাদিগের মোটা ভাতকাপড়, বাসস্থান, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষার জন্য কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করা 'বড়' এবং 'ভদ্র' লোকদিগের শুধু নৈতিক কর্তব্য নয়—অপরিহার্য ধর্ম; উহা না করাটাই ঘোরতর অন্যায়।

আজ স্বাধীন ভারতে গণশক্তির কথা অনেকে বলিতেছেন বটে কিন্তু তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গী বহুক্ষেত্রে এক অদ্ভুত বিকৃতরূপ পরিগ্রহ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। তাঁহারা যেন বলিতে চান, গণ-উন্নয়নের বোঝা শুধু সরকারের—আমাদের নিজেদের কিছু করিবার নাই—আমরা শুধু সরকারের ভুলত্রুটি বাতলাইয়া চলিব! আজ কর্মীর অপেক্ষা কর্ম-তদারকের সংখ্যাই যেন অধিক। যে শিক্ষিত যুবকগণকে স্বামিজী কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কৃষক-শ্রমিকদের দরজায় দরজায় গিয়া শিক্ষার আলোক বহন করিতে বলিয়াছিলেন, অনেক সময়ে সংশয় জাগে—সেই যুবকদের কৃষক-শ্রমিকে সহানুভূতি পর্যবসিত হইতেছে শুধু রাজনৈতিক বাগ্‌বিতণ্ডায়। মনে হয়, আজ রাজনীতির প্রবণতা কিছু কমাইয়া গণ-দরদী উৎসাহী দৃঢ়চরিত্র যুবকগণের নূতন 'স্লোগান্' হওয়া উচিত—'সেবা'।

পাশ্চাত্ত্য দেশের তুলনায় ভারতের কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী পুঁথিগত লেখাপড়া না জানিলেও যে অনেক বেশী সুসভ্য ইহাতে স্বামিজীর সন্দেহ ছিল না। তাহাদের ধৈর্য, প্রীতি, কার্যদক্ষতা, স্বার্থশূন্যতা, ভগবদ্বিশ্বাসের তিনি ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। শুধু প্রয়োজন আমাদের দীর্ঘকালের পুঞ্জিত অবহেলার আচ্ছাদন তুলিয়া লইয়া বাস্তব সহানুভূতির সহিত তাহাদের একটু চোখ খুলিয়া দেওয়া। ভারতের গণশক্তির জাগরণ এবং অভ্যুদয়ের জন্য এটুকু কি আমরা পারিব না?

নির্বেদ

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, বি-এ

দিয়াছিলে অনুরাগে সরস হৃদয়,
তোমার কি দোষ প্রভু? তুমি দয়াময়।
মান-যশ-করিবারে ভোগ,
আমি মূঢ় করিয়াছি তাহার নিয়োগ।
ঊর্ধ্বপানে চাই নাই কভু,
তুমি বাসিতেছ বসি দেখি নাই প্রভু।
করিয়াছি জীবনের ব্রত
যারে আমি, এতদিনে বুঝিয়াছি তার মূল্য কত।

জীবন-সায়াহ্নে হায়, বুঝিলাম আজ
প্রতিষ্ঠা শূকরী-বিষ্ঠা, ভ্রান্তি স্মরি পাই বড় লাজ।
তোমার নিদেশ প্রভু করিয়াছি হেলা
তোমারে ভুলায়ে দিল লেখালেখা খেলা।
তোমারে দিতাম যদি অনুরাগে সরস হৃদয়
হারাতে হ'ত না তবে আজিকে আশ্রয়।

স্বামিজীর সান্নিধ্যে

৺শচীন্দ্রনাথ বসু

(স্বর্গত লেখকের কতকগুলি পুরাতন পত্র হইতে সঙ্কলিত। এই সঙ্কলনের কিয়দংশ মাঘ-সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে।—উঃ সঃ)

গত সোমবার (৬ই নভেম্বর, ১৮৯৮) বাগবাজার যাইয়া দেখি রাখাল মহারাজ বসিয়া তামাক খাইতেছেন—বেলা তখন ১॥ টা। বলিলেন,—"স্বামিজী এই মাত্র ৫।৭ মিনিট হল বিদেশিনী স্ত্রী-ভক্তদের সঙ্গে মঠে গেলেন।"··· ঠাকুরের কৃপায় তখনই একখানি নৌকা আসিয়া পড়িল, চড়িয়া বসিলাম। ১ ঘণ্টার মধ্যেই মঠে পৌঁছিলাম, স্বামিজীর নৌকা ২০ মিনিট আগে গিয়াছে; তাঁহারা পৌঁছিয়াই নূতন মঠের জমি দেখিতে গিয়াছেন।···বেলা চারটার সময় স্বামিজী মিসেস্ বুল, মিস্ ম্যাকলাউড্ প্রভৃতির সহিত আসিলেন। মেয়েরা নূতন মঠ দেখিয়া খুব খুসী হইয়াছেন। বুল্ আর ম্যাক্লাউড্ ২রা ডিসেম্বর আমেরিকা যাত্রা করিবেন। স্বামিজী ৪।৫ মাস পরে যাইবেন লণ্ডন হইয়া। স্বামিজীর সহিত এক নৌকায় ঘোরা গেল। তিনিই আমাকে ডাকিয়া লইলেন। নৌকায় কেবল আমরা পাঁচ জন। স্বামিজীর সহিত মেয়েরা নানাবিধ প্রসঙ্গ করিতে করিতে চলিলেন। সন্ধ্যার সময় ঘাটে পৌঁছান গেল। চিৎপুরের ট্রামে তিন জন উঠিলেন—এস্‌প্লানেডে কোন বোর্ডিং হাউসে আছেন। স্বামিজী ও আমি বাগবাজারে আসিলাম। তাঁহার শরীর ডাক্তার আর এল্ দত্তের গুণে অনেক ভাল; low dietএ থাকিয়া অনেক উপকার পাইয়াছেন। হলঘরে (বলরাম বাবুর বাড়ীর) বসিলেন, আমরাও বসিলাম—কেবল আমি ও রাখাল মহারাজ। কিছু পরে শরৎ চক্রবর্তী আসিল। নানাবিধ কথা হইতেছে, এমন সময় সারদা মহারাজ টলিতে টলিতে আসিয়া হাজির—জ্বর হইয়াছে।

স্বামিজী যখন আলমোড়াতে তখন হইতে ত্রিগুণাতীত মহারাজ তাঁহাকে বার বার চিঠি লেখেন—ভাই, আমি work করিব—তুমি আমাকে ২০০০৲ টাকা দাও, আমি প্রেস করিব, কাজ চালাইব। স্বামিজী তাঁহাকে ১০০০৲ টাকা দিয়াছেন, বাকী ১০০০৲ টাকা ধার করিয়াছেন। মাসে ১০৲ টাকা সুদ লাগে। ১৫০০৲ টাকায় দুটি বেশ ভাল প্রেস কিনিয়াছেন, কিন্তু কিনিলে কি হইবে? কোন কাজ নাই; ঠায় বসিয়া আছেন; বড় বাজারের এক গুদামে ৮৲ টাকা ভাড়া দিয়া রাখা হইয়াছে। সুধীরের রাজযোগ[১] বইখানি ছাপাইবার সঙ্কল্প হইয়াছে; কিন্তু পয়সা নাই, কাগজ আসিবে কোথা হইতে?···আমি একবার ত্রিগুণাতীত মহারাজকে বলিয়াছিলাম, "মহারাজ, ও কাজ (প্রেসের কাজ) বড় nefarious; (হীন) আপনার কর্ম নয়। অপর লোকের করা উচিত।" তখন ভারী spirit; বলিলেন, "না, any work is sacred. আমি কাজ পেলে খুশী; কাজ করতে আমি নারাজ নই।" আমি চুপ করিয়া গেলাম। এখন রোজ ৬টার সময় প্রেসে যান; সেই খানেই খাওয়া-দাওয়া হয়; আর আসেন রাত ৭টার পর। রোজ সন্ধ্যার পর জ্বর হয়।

স্বামিজী ও রাখাল মহারাজ একসঙ্গে ত্রিগুণাতীতজীকে অভ্যর্থনা করিলেন,—"কি বাবাজী, এস, আজকের খবর কি? প্রেসের কতদূর? বল, বল! বস, বস!"

ত্রিগুণাতীত—(নাকি সুরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে)—"আঁর ভাই, আঁর পারি নি—ও সব কাঁজ কি আঁমাদের পোঁষায় ভাই?···

১ স্বামিজীর ইংরেজী রাজযোগের অনুবাদ।

সারাদিন 'তীর্থি'র কাকের মতন বসে থাকতে হয়; না আছে একটা কাজ, না আছে কিছু। একটা job work পাওয়া গেছে, তাতে কি হবে? ৷৷০ আনা বড় জোর পাওয়া যাবে। আমি প্রেস বিক্রী করে ফেলার চেষ্টা করছি।"

স্বামিজী—"বলিস কি রে? এরই মধ্যে তোর সব সখ মিটে গেল? আর দিন কতক দেখ্। তবে ছাড়বি। এই দিকে প্রেসটা নিয়ে আয় না—কুমারটুলীর কাছে; আমরা সকলে দেখতে পেতুম।"

ত্রিগুণাতীত—"না ভাই, সেইখানেই থাক্; দিনেক ছদিন দেখা যাক্। ১৫।২০৲ টাকা লোকসান করে বেচে দেব।"

স্বামিজী—"ও রাখাল, বলে কি? ওর যে খুব trial হ'ল দেখছি। তোর এরই মধ্যে সব গুঁড়িয়ে গেল! patience (ধৈর্য) রইল না!"

এই কথা বলিতে বলিতে স্বামিজীর চক্ষু ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তিনি সুপ্তোত্থিত সিংহের ন্যায় উঠিয়া বসিলেন ও গর্জিয়া বলিলেন, —"বলিস কি রে? দে, প্রেস্ বিক্রী করে দে। আমার টাকার ঢের দরকার আছে। এই বেলা বিক্রী কর—১০০।১৫০৲ টাকা লোকসান ক'রেও বেচে ফেল্।…কাজের নামটি হলেই এদের সব বৈরাগ্যি উপস্থিত হয়—'আঁর ভাঁই পাঁরি নিঁ —ওঁ সঁব কাঁজ কি আঁমাদের?' কেবল খেয়ে খেয়ে ভুঁড়ি উপুড় করে শুয়ে থাকতে পারে। যাদের কোন কাজে patience নেই, তারা কি মানুষ?…তুই তিন দিন এখনও প্রেস করিস নি। যাঃ যাঃ তোকে ঢের experiment (পরীক্ষা) হয়েছে—তোর বড় আম্বা হয়েছিল। কে তোকে প্রেস করতে সেধেছিলো? তুইই তো আমাকে লিখে লিখে টাকা আনালি। নিয়ে আয় না তুই তোর প্রেস এখানে, সেখানে রাখবার তোর মানে কি? আর এই তোর জ্বর জ্বর হচ্ছে, তুই শরীরটা দেখছিস্ না!"

ত্রিগুণাতীত—"৮৲ টাকা ভাড়া দিতে হবে—এক মাসের এগ্রিমেণ্ট হয়েছে।"

স্বামিজী—"দূর দূর, ছিঃ ছিঃ! এ বলে কি! এ সব লোক কি কোন কাজ করতে পারে? ৮৲ টাকার জন্যে পড়ে আছিস্? তোদের এ ছোটলোক্পনা কিছুতেই যাবে না! তুই আর হরমোহনটা সমান। তোদের কখন কোন business (ব্যবসায়) হবে না—সেও এক পয়সার আলু কিনতে পঞ্চাশ দোকান ঘুরবে আর ঠকে মরবে।……দে প্রেস আমাদের মঠে পৌঁছে —আমাদেরও ত একটা প্রেস চাই। দেখ, কত lecture (বক্তৃতা) দিয়েছি, কত লিখেছি; তার অর্ধেকও ছাপা হ'ল না। তুই আমাকে work দেখাস্? রাখাল, মনে কর, সে আজ কত দিনের কথা—আজ সে ১২।১৩ বৎসরের কথা—সেই গঙ্গার ধারে বসে আমরা কয় জনে তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁদছি। আমি বললাম,—'তাঁর অস্থি গঙ্গার ধারে রাখা উচিত, গঙ্গার ধারেই মন্দির হওয়া উচিত; কারণ, তিনি গঙ্গার ধার ভালবাসতেন।…আমার কথা শুনল না। তাঁর চিতাভস্ম নিয়ে কাঁকুড়গাছির বাগানেতে রাখল। আমার প্রাণে বড় ব্যথা বেজেছিল। রাখাল, মনে কর আমি কি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আজ বার বছর bull dog-এর মতন সেই idea নিয়ে তামাম দুনিয়া ঘুরেছি; একদিনও ঘুমোই নি। আজ দেখ্ তা সফল করলাম। সেই idea (ভাব) আমাকে একদিনও ছাড়ে নি। * * * এ জাতের কি আর উন্নতি আছে?"

ত্রিগুণাতীত—"ভাই, তোমার brainটি (মস্তিষ্কটি) কেমন! তোমার brainটি আমায় দিতে পার?"

এই কথায় খুব হাসি পড়িয়া গেল, কারণ, বলিবার তারিফ ছিল। পরে ত্রিগুণাতীত বলিলেন, এ জ্বরের উপর সকালে একটু সাবু খাইয়াছিলেন; এ বেলা এক সের রাবড়ী, আধসের কচুরী ও তদুপযুক্ত তরকারী আহার করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া স্বামিজী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"শালা! তোর stomachটা দে দেখি—দুনিয়াটার চেহারা একেবারে বদলে দি। লাহোরে সুরজলাল বলেছিল, 'স্বামিজী, তোমায় নানকের brain, আর গুরুগোবিন্দের heart (হৃদয়) এসে গিয়েছে—কেবল জগমোহনের (খেতড়ীর রাজ-দেওয়ান) মত পেটটি চাই'।"……

কঠোপনিষৎ

বনফুল

[বাজশ্রবার পুত্র উদ্দালকি আরুণি গৌতম স্বর্গ-কামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। দানের দক্ষিণার জন্য নীয়মান গাভীগুলিকে দেখিয়া উদ্দালকের অল্পবয়স্ক পুত্র নচিকেতার মনে যে সব কথা জাগিয়াছিল তাহারই বর্ণনা দিয়া কঠোপনিষৎ আরম্ভ হইয়াছে। উদ্দালক যখন সর্ব্বস্ব দান করিতেছেন তখন নচিকেতার মনে হইয়াছিল যে তাঁহাকেও দান করা হইবে। কাহার হস্তে তাঁহাকে প্রদান করা হইবে এই কথা পিতার নিকট বারবার জানিতে চাওয়ায় পিতা বিরক্ত হইয়া বলেন, তোমাকে যমকে দিব। নচিকেতা যমালয়ে যান এবং যমের সহিত তাঁহার যে কথাবার্ত্তা হয় তাহাই কঠোপনিষদের বিষয়বস্তু। প্রথম প্রথম বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে ভাবিয়া এই ভূমিকাটুকু লিখিলাম। শ্লোকগুলি কবিতায় অনুবাদ করিয়াছি। যথাসাধ্য মূলানুগ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি বলিয়া ছন্দকে নানাভাবে পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে।]

প্রথম অধ্যায়

প্রথম বল্লী

বাজশ্রবার পুত্র যজ্ঞ-ফল-কামনায় সর্ব্বস্ব দিলেন ;
তাঁর পুত্র নচিকেতা নাম
সুকুমার সে বালক নীয়মান গাভীগুলি হেরি
শ্রদ্ধাভরে চিন্তা করিলেন
কিবা এর দাম ?
তৃণ জল আর কভু খাবে না যাহারা
নিরিন্দ্রিয় যারা দুগ্ধ-হারা
তাহাদের দান করি নিরানন্দ লোকে
ঘটে পরিণাম ॥ ১-৩ ॥

আমারে দিবেন কারে ? - শুধান পিতারে ;
দ্বিতীয় তৃতীয় বারে
তোমারে যমকে দিব—ক'ন পিতা তারে ॥ ৪ ॥

[এই কথা শুনিয়া নচিকেতা চিন্তা করিলেন]

অনেকের মধ্যে আমি হয়েছি প্রথম
অনেকের মধ্যে আমি হয়েছি মধ্যম
না জানি আমারে দিয়া
কোন কার্য্য সাধিবেন যম ॥ ৫ ॥

[পুত্রকে এই কথা বলিয়া উদ্দালক সম্ভবতঃ অনুতপ্ত হইয়া মত পরিবর্ত্তন করিতে চাহিতেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী এই শ্লোক হইতে মনে হয় পিতা পাছে সত্যভ্রষ্ট হ'ন তাই নচিকেতা তাঁহাকে বলিতেছেন]

যথাক্রমে পূর্ব্বাপর আলোচনা করি
দেখ পিতা, শস্যসম জীর্ণ হই মোরা
শস্যসম পুনরায় নব-জন্ম ধরি ॥ ৬ ॥

[ইহার পর পিতা তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। যম বাড়িতে ছিলেন না। তিন দিন পরে যখন তিনি প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন তখন যমের আত্মীয়গণ যমকে বলিলেন]

ব্রাহ্মণ অতিথিরূপে গৃহেতে আসেন
অগ্নির মতন
তাই তাঁর শান্তি লাগি বিবিধ যতন
বৈবস্বত পাদ্য অর্ঘ্য কর আনয়ন ॥ ৭ ॥

প্রত্যাশা, আকাঙ্ক্ষা আর সুসঙ্গ-গৌরব
প্রিয়বাক্য, দান ধ্যান, পুত্র পশু সব
সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় অল্পবুদ্ধি সেই দুর্ভাগার
অভুক্ত ব্রাহ্মণ গৃহে যার ॥ ৮ ॥

[যম তখন নচিকেতাকে যথাবিধি সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিলেন]
তিন রাত্রি মোর গৃহে অনশনে করিয়াছ বাস
সম্মানিত অতিথি ব্রাহ্মণ
তোমারে প্রণাম করি, আমার কল্যাণ কর,
তিন বর করিব অর্পণ
কহ কিবা চাও ॥ ৯ ॥

[নচিকেতা উত্তর দিলেন]
উৎকণ্ঠা না রহে যেন পিতা গৌতমের*
তুমি ছেড়ে দিলে গৃহে ফিরিব যখন
চিনিয়া আমারে যেন অক্রোধ প্রসন্ন মনে
অভ্যর্থনা করেন তখন
প্রথমেই এই বর দাও ॥ ১০ ॥

[যম বলিলেন]
পূর্ব্ববৎ হবে জেন ঔদ্দালকি আরুণির স্নেহ পুনরায়
আদেশে আমার
ক্ষোভ রহিবে না চিত্তে আর
সুখনিদ্রা হবে রজনীতে মৃত্যু-মুক্ত দেখিয়া তোমায়।

[এইবার নচিকেতা দ্বিতীয় বর প্রার্থনা করিলেন]
স্বর্গে যম তুমি নাই নাহি কোন ভয়
জরায় ডরে না কোন লোক
অতিক্রমি ক্ষুধা তৃষ্ণা শোক
স্বর্গলোক চিরানন্দময় ॥ ১২ ॥

হে মৃত্যু, তুমিই জান সেই অগ্নিরূপ
যেই অগ্নি সে স্বর্গ-কারণ
যে স্বর্গে অমৃত লভে স্বর্গকামিগণ
আমার দ্বিতীয় বরে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে জানাই প্রার্থনা
কহ মোরে তার বিবরণ ॥ ১৩ ॥

* ঔদ্দালকি আরুণির আর এক নাম।

[যমের উত্তর]
স্বর্গের কারণ-ভূত অগ্নির স্বরূপ সবিশেষ জানি নচিকেতা
কহিতেছি হও অবহিত
অনন্ত লোকের পথে ইহাকেই জানিও আশ্রয়
মর্ম্ম এর গুহায় নিহিত ॥ ১৪ ॥

সৃষ্টির আদি অগ্নির কথা কহিলেন তারে যম
অগ্নি-চয়নে যত ইঁট চাই আরও আছে যে নিয়ম
শুনি সব কথা নচিকেতা পুন আবৃত্তি করিলেন
তুষ্ট হইয়া যমরাজ তাঁরে পুনরায় কহিলেন ॥১৫॥

তোমারে আর এক বর দিব পুনরায়
প্রীতিভরে কহিলেন যম মহাত্মন
এই অগ্নি তব নামে প্রসিদ্ধ হইবে
বহুরূপী এই মাল্য করহ গ্রহণ ॥ ১৬ ॥

তিনের সহিত যিনি সম্বন্ধ রাখিয়া
নাচিকেত এই অগ্নি তিন বার করেন চয়ন
তিন-কর্ম্ম-কৃতী সেই জন
জন্ম মৃত্যু করি উত্তরণ
উপলব্ধি করি' সেই ব্রহ্মজাত পূজনীয় দেবে
পরম শান্তিরে শেষে করেন বরণ ॥ ১৭ ॥

তিনবার নাচিকেত অগ্নি-সেবাকারী
তিনের রহস্য জানি সেই সেবা করিবেন যিনি
পূর্ব্বেই মৃত্যু-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া
উপভোগ করিবেন শোকাতিগ স্বর্গলোক তিনি ॥ ১৮ ॥

দ্বিতীয় বরেতে তুমি প্রার্থনা করেছ যাহা
সে স্বর্গ-অগ্নির কথা নচিকেতা কহিনু তোমারে
এ অগ্নি তোমারই নামে প্রসিদ্ধ হইবে লোকমাঝে
তৃতীয় বরেতে কহ কি চাহ এবারে ॥ ১৯ ॥

[নচিকেতা বলিলেন]

মৃত্যুর পরে আছে সংশয় সদাই

কেহ বলে থাকে কিছু কেহ বলে নাই

হে যম, তৃতীয় বরে আজিকে তোমার মুখে

সত্য কথা শুনিবারে চাই ॥ ২০ ॥

[যমের উত্তর]

সৃষ্টিকালে দেবগণও ছিলেন সংশয়াকুল

অতি সূক্ষ্ম এই তত্ত্ব জটিল দুর্বোধ

অন্য বর চাও তুমি ত্যাগ কর এ প্রার্থনা

নচিকেতা করিও না বৃথা উপরোধ ॥ ২১ ॥

[নচিকেতা]

দেবগণ নিশ্চয়ই ছিলেন সংশয়াকুল

তুমিও বলিছ ইহা নহে সুবিজ্ঞেয়

তাহলে ইহার তুল্য অন্য কোন বর নাই

তুমি ছাড়া বক্তাও নাহি অন্য কেহ ॥ ২২ ॥

[যম]

শতজীবী পুত্র পৌত্র করহ প্রার্থনা

পশু হস্তী অশ্ব স্বর্ণ দিব চাও যত

বিশাল রাজত্ব লও—

নিজ আয়ু চাহ ইচ্ছা মত।

এর তুল্য অন্যবর যথা ইচ্ছা, নচিকেতা, করহ প্রার্থনা,

লও বিত্ত, অমরত্ব, রাজা হও বিশাল রাজ্যের,

পূর্ণ কর সকল কামনা,

মর্ত্ত্যলোকে দুর্ল্লভ যা' সেই সব কাম্য বস্তু

যাহা ইচ্ছা মাগ মোর কাছে

ওই যে রথের পরে বাদ্য যন্ত্র সহ

রমণীরা আছে

মনুষ্যের আয়ত্তের অতীত ইহারা,

মোর বরে ভোগ কর ইহাদেরও পরিচর্য্যা-সুখ

মৃত্যু-বিষয়েতে শুধু, নচিকেতা, হ'য়ো না উৎসুক।

॥ ২৩-২৫ ॥

[নচিকেতা]

অনিশ্চিত মৃত্যুশীল এই সব ভোগ্য বস্তু

জীর্ণ করে ইন্দ্রিয়ের শক্তি আর সুখ

জীবনই তো ক্ষণস্থায়ী; বাহন বা নৃত্য-গীত

চাহি নাকো,—তোমারই থাকুক ॥ ২৬ ॥

বিত্ত লভি তৃপ্ত কভু হয় না মানব

পেয়েছি দর্শন যবে বিত্ত লাভও হবে এর পর

যতদিন প্রভু তুমি, জীবনও রহিবে মোর

আমি কিন্তু চাই ওই বর ॥ ২৭ ॥

অধঃস্থ পৃথিবীবাসী জরাশীল কোন ব্যক্তি কহ

অজর অমৃতলোকে আসি একবার

লভিয়া প্রকৃষ্ট জ্ঞান রূপ-রতি-প্রমোদ চিন্তিয়া

অতি দীর্ঘ জীবনেতে সুখ পাবে আর ॥২৮॥

যেই পরলোক-তত্ত্ব সংশয়েতে ঘেরা

মহতী সে তত্ত্বকথা কহ মোরে এ মোর প্রার্থনা

নিগূঢ়ের মর্ম্ম-মাঝে নিহিত যে বর

তাহা ছাড়া নচিকেতা অন্য কিছু করে না কামনা ॥ ২৯ ॥

প্রথম বল্লী সমাপ্ত

(ক্রমশঃ)

"সংস্কৃত ভাষার 'শ্রদ্ধা' কথাটী বুঝাবার মত শব্দ আমাদের ভাষায় নেই। উপনিষদে আছে, ঐ শ্রদ্ধা নচিকেতার হৃদয়ে প্রবেশ করেছিল। 'একাগ্রতা' কথাটির দ্বারাও শ্রদ্ধা কথার সমুদয় ভাবটুকু প্রকাশ করা যায় না। বোধ হয় 'একাগ্র-নিষ্ঠা' বল্লে সংস্কৃত শ্রদ্ধা কথাটার অনেকটা কাছাকাছি মানে হয়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

স্বামী ঈশানানন্দ

১৩২৬ সাল। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শ্রীশ্রীমায়ের কলিকাতা রওনা হইবার দিন স্থির হইতেছে। সংবাদ পাইয়া শিবুদা (শ্রীশ্রীঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশিবরাম চট্টোপাধ্যায়) কামারপুকুর হইতে তাঁহার সহিত সাক্ষাতের জন্য বেলা প্রায় ১২টায় জয়রামবাটী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মাকে প্রণাম করিয়া শিবুদা পাশেই দাঁড়াইয়া আছেন। কুশল-প্রশ্নাদির পর মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—সকাল সকাল না এসে এত দেরী করে এলি কেন শিবু? শিবুদা বলিলেন,—ছোট বেলা, খুড়ীমা, আর রঘুবীরের পূজা ভোগ সব সেরে আসতেই দেরী হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পর আমাদের সহিত শিবুদার আহারান্তে মা বলিলেন,—শিবু, এখন ওদের ঘরেই বিশ্রাম কর, বেলা পড়লে যাওয়ার সময় রঘুবীরের জন্য ফল মিষ্টি বেঁধে দেব, নিয়ে যাবি। শিবুদা বলিলেন,—রঘুবীরের জন্য ফল মিষ্টি যা দেবে, নিয়ে যাব, তবে আজ আর যাব না। আজ খুড়ীমা, তোমার কাছেই থাকব; কাল সকালে যাব। মা বলিলেন,—কি করে থাকবি? বাড়ীতে রঘুবীর-শীতলার সন্ধ্যারতি পূজাদি আছে, তার কি হবে? শিবুদা বলিলেন,—তা খুড়ীমা, সে সব সেরেই এসেছি। আজ এখানে থাকব বলে পূজার পর আরতি করে, ঠাকুরদের লেপ কাঁথা ঢাকা দিয়ে রাত্রের শয়ন দেওয়া সেরেই আস্‌ছি। কাল সকালে গিয়ে শয়ন থেকে তুলে পূজা করব। মা শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলেন,—সে কিরে! তোরা থাকতেই যদি রঘুবীর-শীতলার পূজা এই ভাবে হয় তবে পরে ছেলেরা কি করবে? কি ভাবে কি হবে? শিবুদা বলিলেন,—তা হোক্, একদিন ত? আজ তোমার এখানে না থেকে যাব না, খুড়ী মা। ইহা বলিতে বলিতে শিবুদা আমাদের ঘরে আসিয়া তামাক খাইতে বসিলেন। শ্রীশ্রীমাও আর কিছু বলিলেন না। কিছু পরে শিবুদা দুপুরের বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়িলেন।

ইতোমধ্যে মা কতকগুলি ফল ও কিছু শাকসব্জী ইত্যাদির একটি ছোট পুঁটুলি বাঁধিয়া বেলা তিনটা নাগাদ শিবুদাকে ডাকিয়া আমাকে বলিলেন,—ওই পুঁটুলিটি নিয়ে শিবুর সঙ্গে নদী পার হয়ে অমরপুর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এস। শিবুদাকে বলিলেন,—রঘুবীরকে শয়ন থেকে তুলে আবার সন্ধ্যারতি করে শয়ন দিগে যা, ও যা করেছিস্, যেন দুপুরের বিশ্রাম হলো। চিন্তা কি, দক্ষিণেশ্বরে যাবিতো, তখন দেখা হবে। শিবুদা বিশেষ আর আপত্তি না করিয়া মাকে প্রণাম করিলেন এবং সাশ্রুনয়নেই আমার সহিত যাত্রা করিলেন। আমি শিবুদাকে অমরপুর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আসিয়া দেখিলাম, মা কাপড়-চোপড় কাচিয়া কুটনা লইয়া বসিয়াছেন। আমিও হাত পা ধুইয়া মার কাছেই বসিয়া আছি, এমন সময় শিবুদা পুঁটুলিটি বগলে ও

লাঠি হাতে সেখানে উপস্থিত হইলেন। বারান্দায় সে সমস্ত নামাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন। শ্রীশ্রীমাও বঁটীটি রাখিয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়াছেন। শিবুদা মার শ্রীচরণ হইতে মাথা তুলিতেছেন না; কাঁদিতেছেন, আর বলিতেছেন,—মা, আমার কি হবে বল, তোমার কাছে শুনতে চাই। মা বলিলেন,—শিবু, ওঠ্, তোর আবার ভাবনা কি? ঠাকুরের অত সেবা করেছিস, তিনিও তোকে কত ভালোবেসেছেন, তোর চিন্তা কি? তুই ত জীবন্মুক্ত হয়ে আছিস্। পরস্পরের ঐ অবস্থা দেখিয়া আমিও স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

তখন শিবুদা বলিলেন, মা, আপনি আমার ভার নিন, আর আপনি যা বলেছিলেন, আপনি তাই কিনা বলুন। মা যতই শিবুদার মাথা ও চিবুকে হাত দিয়া সান্ত্বনা দিতেছিলেন, শিবুদা ততই অশ্রু বিসর্জন করিয়া বলিতেছিলেন,—বলুন, আপনি আমার সমস্ত ভার নিয়েছেন? আর বলুন আপনি তাই কিনা। শ্রীশ্রীমা এই ব্যাপারে একটু বিব্রত ও বিচলিত হইয়া পড়িলেও শিবুদার দৃঢ় ভাব ও ব্যাকুলতায় মুগ্ধ হইয়া ধীরে ধীরে শান্ত ও গম্ভীর ভাবে তাঁর মাথায় হাত দিয়া বলিলেন,—হাঁ, তাই। শিবুদাও তখন হাঁটু গাড়িয়া তাঁহার চরণে মাথা রাখিয়া গদ্‌গদ্ হইয়া আবৃত্তি করিলেন—সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে।

প্রণামান্তে উঠিয়া শিবুদা চোখের জল মুছিলেন। মা তাঁহার চিবুক ধরিয়া চুমা খাইলেন। আনন্দোজ্জ্বল মুখে শিবুদা পুঁটুলী ও লাঠী লইয়া রওনা হইবার উপক্রম করিলেন। মা বলিলেন,—পুঁটুলীটি ববদাকে দাও, ও অমরপুর পর্যন্ত পৌছে দিয়ে আসবে। আমি শিবুদার হাত হইতে উহা লইয়া পশ্চাতে পশ্চাতে চলিয়াছি। গ্রাম অতিক্রম করিয়া মাঠে গিয়া পড়িলে শিবুদা বেশ প্রফুল্লমনে আমাকে বলিলেন, ভাই, মা সাক্ষাৎ কালী, উনিই 'কপালমোচন' ওঁর কৃপাতেই মুক্তি, বুঝলে?

শিবুদাকে অমরপুর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া যখন ফিরিয়া আসিলাম, তখন বেশ সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার সকল কাজ সমাপনান্তে মায়ের ঘরে চিঠি পড়িয়া শোনাইতে গিয়াছি। ভাবিয়াছিলাম, আজ মা হয়ত শিবুদার ওই বিষয়ে কিছু কথা তুলিবেন, কিন্তু মা একটি কথাও বলিলেন না। মনে হইল, যাহা ঘটিয়াছে তাহা যেন তাঁহাদের একটি ঘরোয়া ব্যাপার!

(দুই)

শ্রীমতী শৈলবালা মান্না

পঁয়ত্রিশ বৎসর আগে আমি যেবার প্রথম শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন পাই, তখন আমার বয়স মাত্র চৌদ্দ। সবে বিয়ে হয়েছে। শ্রীশ্রীমায়ের নিকট থেকে দীক্ষা পাব আশা করেছিলাম—কিন্তু সেবার মা দেন নি; বলেছিলেন, পরে হবে। তারপর সত্যই সেই শুভ দিন উপস্থিত হল। মা আমার অভিভাবকদের লিখেছিলেন, এবার বৌমাকে নিয়ে এস, দীক্ষা হবে। তদনুযায়ী যথাসময়ে কলকাতা এসে দীক্ষা নিয়ে ফিরে গিয়েছিলাম।

পরে একবার তাঁকে কলকাতায় দর্শন করতে এসে হৃদয়ের আবেগে বলেছিলাম, মা, এ

হতভাগিনীকে কি দয়া হবে না, মা? হতভাগিনী শব্দটি শুনে মা মনে কষ্ট পেলেন। বললেন, আচ্ছা বল দিকিনি, তোমার বাপের বাড়ীতে তো অনেকেই আছেন, শ্বশুরবাড়ীতেও কত লোক রয়েছেন, কিন্তু তাঁদের কয় জন ঠাকুরের পদাশ্রয়ে আসতে পেরেছেন? তোমার কত অল্পবয়সে ঠাকুরের চরণে মতি হয়েছে। পূর্বজন্মের সুকৃতি না থাকলে কি এমন হতে পারতো? 'হতভাগিনী' মুখে এনো না, মা। বল যে, আমি ধন্য, আমি লক্ষ্মী—সেই জন্যে ঠাকুর এত অল্পবয়সে কৃপা করেছেন। ঠাকুরকে চিন্তা করবে—আর নিজেকে কথনো ওরকম ভাববে না।

আর একবার মায়ের কাছে আসি খুব শোকগ্রস্তা হয়ে। সেবার আমার প্রথম খোকাটি মারা যায়। মা সব শুনে খুব দুঃখিত হলেন। সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ কোরোনা বৌমা, ও একজন ভক্ত তোমার পেটে এসেছিল। বেশী দিন তো পৃথিবীতে ওর থাকার কথা নয়, তাই চলে গেল।

আর একবার কলকাতায় মায়ের কাছে এসেছি। আবেগভরে তাঁর শ্রীপাদপদ্ম সেবা করছি। গোলাপমা একটু পরে সেখানে এসেছেন। দেখে হেসে বললেন, বৌমা, তুমি একাই যদি মায়ের সমস্ত পায়ের ধূলো নিয়ে যাও তো আমাদের জন্যে কি থাকবে? মা শুনে খুব হেসে উঠলেন। বললেন—না গো, বৌমাটি বেশ ভক্তিমতী। আহা করুক। অল্পবয়সে ভাল মতিগতি হয়েছে। ঠাকুরের পাদপদ্মে অচলা ভক্তি হোক্।

(তিন)

শ্রীমতী—

বিবাহের প্রায় তিন বৎসর পরে দেখিলাম স্বামী পূজা-অর্চনার দিকে খুব মন দিয়াছেন—কোথায় যেন কিসের একটা সন্ধান পাইয়াছেন। কৌতূহলবশে এক দিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম। কিন্তু স্বামী কথাটা চাপিয়া গেলেন। বলিলেন,—"তোমার এসব জেনে দরকার কি? আমি যেখানে যা পাই না কেন তোমার শুনে কোন লাভ নেই।" আমার মুখ বন্ধ হইল বটে, কিন্তু মনের জিজ্ঞাসা থামিল না। কখন কখন ঐ জিজ্ঞাসা একটি অব্যক্ত ব্যাকুলতার রূপ লইয়া সমস্ত প্রাণকে অস্থির করিয়া তুলিত। এক দিন স্বপ্নে দেখিলাম নদীতে স্নান করিতেছি—একটি শ্যামবর্ণা যুবতী উপরে দাঁড়াইয়া। যুবতী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুই কি তোর ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিস?" আমি বলিলাম,—"আমার মন্ত্র হয় নাই—ইষ্টদেবতা কে জানি না।" তখন মেয়েটি আমাকে জলে ডুব দিতে বলিলেন। ডুব দিলে ভগবানের একটি নাম শুনাইলেন। ঐ স্বপ্নে পাওয়া নাম জপ করিয়া প্রাণে কিছু শান্তি পাইলাম। আট বৎসর কাটিয়া গেল।

স্বামী কলিকাতা হইতে একবার দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন। একদিন লক্ষ্য করিলাম ডাকে একখানি চিঠি আসাতে উহা ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া পড়িতে লাগিলেন। চিঠিখানি পরে তাঁহার পকেট হইতে লইয়া পড়িলাম। ঠিকানা দেখিলাম—জয়রাবাটী গ্রাম-আনুড় পোঃ—লিখিতেছেন—'তোমাদের মাতাঠাকুরাণী'। এতদিন পরে মাকে আবিষ্কার করিয়া কী যে আনন্দ হইল তাহা বলিয়া বুঝাইতে পারি না। তাঁহাকে পত্র দিলাম। দয়াময়ী উত্তরও দিলেন। সেই অবধি প্রাণ ছটফট করিত কি করিয়া

তাঁহার শ্রীচরণপ্রান্তে উপনীত হইব,—তাঁহার কৃপা লাভ করিব।

১৩২৬ সালের আশ্বিনের ঝড়ে সমগ্র যশোহর খুলনা জেলায় নিদারুণ বিপর্যয় উপস্থিত হইয়াছিল। আমাদের দেশের বাড়ীঘর উড়াইয়া লইয়া যায়। বাধ্য হইয়া স্বামী আমাদিগকে কলিকাতা লইয়া আসিলেন। আমার 'শাপে বর' হইল—কেননা এখন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার সুযোগ পাইব। কিন্তু কলিকাতা আসিয়া শুনিলাম, শ্রীশ্রীমা জয়রামবাটীতে আছেন—ফাল্গুন মাসে আসিবেন। তখন কার্তিক চলিতেছে।

ফাল্গুনের মাঝামাঝি মা আসিলেন। স্বামী সংবাদ দিলেন, মেয়েদের দর্শন দিবেন, পুরুষদের নিষেধ। পরের দিনই সকালে বেলা ৯টায় উদ্বোধনের বাড়ীতে পৌছিলাম। মন আনন্দে ভরপুর। একজন সন্ন্যাসী বলিলেন,—"আসুন উপরে।" সিঁড়ি দিয়া উঠিবার সময় টের পাইলাম, আমার সমস্ত শরীর থর থর করিয়া কাঁপিতেছে। উপরে উঠিয়া দেখিলাম, মা সিঁড়ির দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। একটি পা চৌকাঠে—একখানি হাত দরজার উপরে। তাঁহার শ্রীচরণে মাথা রাখিয়া প্রণামান্তে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলাম,— "আপনি কি আমাদের মা?" করুণাময়ী হাসিয়া বলিলেন,—"হাঁ, আমিই তোমাদের মা। ঘরে এসো।" কাছে বসাইয়া কয়েকটি কথা বলিলেন।

সাতদিন পরে আবার গিয়াছি। দীক্ষা প্রার্থনা করিলাম। বলিলেন,—"আচ্ছা, হবে এখন পরে।" একদিন তাঁহাকে বলিলাম,—"মা, আমার দীক্ষা হয়নি শুনে লক্ষ্মীদিদি বলেছেন—'মায়ের শরীর খারাপ, সুস্থ না হলে হবে না। তা আমিও দিতে পারি'।" শুনিয়া মা বলিলেন,—"না, না, আমিই তোমাকে দেব। স্বামি-স্ত্রীর এক গুরু করতে হয়।" মায়ের একটি ব্রহ্মচারী সেবক মায়ের শরীর অসুস্থ বলিয়া তাঁহার সহিত কথা কহিতে নিষেধ করিতেন। একদিন মা তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন,—"থাম না বাপু, ও যে দূর দেশ থেকে এসেছে।"

প্রত্যুষে গঙ্গাস্নান করিয়া মায়ের বাড়ী যাইতাম। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন ঐরূপ যাইতেই দেখি শ্রীশ্রীমা প্রথম দিনের মত দরজায় দাঁড়াইয়া আছেন। ডানদিকের ঘর দেখাইয়া বলিলেন,—"এসো এই ঘরে।" (সেদিন ব্রহ্মচারীটিকে দেখিতে পাইলাম না।) দুটি আসন পাতিয়া একটিতে আমাকে বসিতে বলিলেন— অপরটিতে নিজে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, —"স্বপ্নে কিছু পেয়েছিলে কি?"

আমি।—হাঁ, মা, পেয়েছিলাম। কিন্তু তা নাকি কাউকে বলতে নেই?

মা।—আমাকে বলতে আছে। আর কাউকে বলতে নেই।

নয় বৎসর আগে উপরোল্লিখিত স্বপ্নবৃত্তান্ত তাঁহার গোচর করিলাম। * * * মা বসিয়া আছেন। আমিও বসিয়া। মনে হঠাৎ খুব দুঃখ হইল। আমার দিদিমার দীক্ষাগ্রহণ পূর্বে দেখিয়াছিলাম। কত জিনিসপত্রের আয়োজন—কত অনুষ্ঠানাদি। আর আজ মা আমাকে এত অনাড়ম্বরভাবে এত সংক্ষিপ্ত একটি মন্ত্র দিয়া বিদায় করিতেছেন! তবে কি মা আমাকে অপাত্রজ্ঞানে ফাঁকি দিলেন? কিছুক্ষণ বাদে অন্তর্যামিনী বলিতেছেন,—"যাও বউমা, ঠাকুর-প্রণাম করে এসো। ভেবো না। এতেই সব পাবে।" নিমেষে সমস্ত সন্দেহ-বিষাদ তিরোহিত হইল। ঠাকুর প্রণাম করিয়া, প্রসাদ লইয়া পরিপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে ফিরিলাম।

বেনেদেতো ক্রোচে

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্-এ

গত নভেম্বর মাসের ২০শে তারিখে বর্ত্তমান ইটালীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষী বেনেদেতো ক্রোচে (Benedetto Croce) ৮৬ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ক্রোচে যে কেবল বর্ত্তমান ইটালীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তাহা নয়, বর্ত্তমান যুগের ধুরন্ধর দার্শনিকগণের মধ্যে তিনি অন্যতম। তাঁহার চিন্তাধারার মৌলিকতা এবং দর্শন ও রসতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিনব দৃষ্টিভংগী বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় দর্শনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে তাঁহার জন্ম। তাঁহার প্রথম জীবনে এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে তাঁহার পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্য সকলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। আর্থিক অবস্থা সচ্ছল থাকায় তাঁহাকে জীবিকার জন্য কোনও চাকুরী বা ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতে হয় নাই। এ জন্য তিনি তাঁহার সমস্ত সময়ই অখণ্ড মনোযোগের সহিত সাহিত্য এবং দর্শন-শাস্ত্রের চর্চ্চায় নিয়োজিত করিতে পারিয়াছিলেন। বহু বৎসর যাবৎ তিনি 'La critica' নামক সাহিত্য, ইতিহাস এবং দর্শনের সমালোচনামূলক দ্বৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। নব্য ইটালীর সাংস্কৃতিক সংগঠনে তাঁহার দান অতুলনীয়।

রাজনীতিতে ক্রোচে ছিলেন উদারপন্থী। তাঁহার মতে দর্শন-শাস্ত্র এবং ইতিহাস এক ও অভিন্ন। ইতিহাস কেবল ঘটনার ধারাবাহিক বিবৃতি নহে, বিচারশীল দৃষ্টিতে ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাই ইতিহাস। এই দৃষ্টিকোণ হইতে তিনি ইতালীর সাম্প্রতিক ইতিহাস-সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তক এবং ক্রোচের রাজনীতি মুসোলিনী-সরকার সুনজরে দেখেন নাই। মুসোলিনীর অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে এক বৎসরের জন্য তিনি ইতালীর শিক্ষামন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশের মধ্যে তিনি এই পদের যোগ্যতম ব্যক্তি হইলেও মুসোলিনী তাঁহাকে কোনও পদ দেন নাই। ১৯১৪ খৃঃ অব্দেও মনীষী বারট্রাণ্ড রাসেল এবং রোমাঁ রোলাঁর ন্যায় তিনি ইউরোপীয় মহাযুদ্ধের বিরোধিতা করেন। ফলে তাঁহাকে দেশের তদানীন্তন শাসক-শ্রেণীর বিরাগভাজন হইতে হইয়াছিল। দেশের নানাপ্রকার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যেও ক্রোচে কিন্তু স্বীয় মত ও পথ হইতে বিচলিত হন নাই।

ক্রোচের দর্শন

ক্রোচে বিজ্ঞানবাদী এবং তাঁহার বিজ্ঞানবাদ অনেকাংশে হেগেলীয় বিজ্ঞানবাদের অনুগামী। হেগেলের ন্যায় তাঁহার মতেও সত্য বা তত্ত্ব-পদার্থ জ্ঞান-স্বরূপ। তাঁহার মতেও ঐতিহাসিক জগৎ সেই জ্ঞানরূপ অধ্যাত্মতত্ত্বের ক্রমবিকাশ। কিন্তু হেগেল এই অধ্যাত্মতত্ত্বে একটা তুরীয় (transcendent) অবস্থা স্বীকার করেন এবং তাহাকেই সত্যের পারমার্থিক এবং সর্ব্বোচ্চ অবস্থা বলিয়া মনে করেন। তাঁহার মতে অধ্যাত্মতত্ত্ব (reason) স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাত্মক (universal); তাহার মধ্যে কোনও অপূর্ণতা নাই। এক এবং অসীম হইয়াও এই তত্ত্ব বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিতেছে এবং তাহার ফলেই জগৎ-ইতিহাস রচিত হইতেছে। তত্ত্বপদার্থ যদি স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং সর্ব্বাত্মক হয়, তাহা হইলে তাহার আবার

আত্মপ্রকাশের তাৎপর্য্য কি? হেগেলীয় দর্শনে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। ব্র্যাড্‌লি-প্রমুখ হেগেলের অনুগামী দার্শনিকবৃন্দ অধ্যাত্মতত্ত্বের অখণ্ড নির্ব্বিশেষ সত্তাকেই তাহার পারমার্থিক স্বরূপ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জগদ্ব্যাপার অধ্যাত্মতত্ত্বের ভান (appearance)-মাত্র। ক্রোচে কিন্তু জ্ঞান বা অধ্যাত্মতত্ত্বের কোনও তুরীয় সত্তা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে মানবমনের সমস্ত জ্ঞানানুভবই সত্য। সুতরাং তত্ত্বপদার্থ মানুষের মনে অন্তর্নিহিত (immanent)। জ্ঞান বা চৈতন্য মনের ধর্ম্ম, অর্থাৎ মনকে তাহার জ্ঞান হইতে পৃথক করা যায় না। এই জ্ঞান আবার কোনও স্থিতিশীল নির্ব্বিকার পদার্থ নহে। ইহা ক্রিয়াশীল গতিশীল অনুভূতি। অন্যভাবে বলা যায় যে, মনন-ক্রিয়াই জ্ঞান এবং মন, চৈতন্য এবং জ্ঞান একার্থক শব্দ। সুতরাং ক্রোচের মতে এই সৃষ্টিশীল মনই সত্য এবং এই মনের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যানই দর্শন। আবার সৃষ্টিধর্ম্মী মনের সৃষ্টিই ইতিহাস। এই অর্থে দর্শন এবং ইতিহাসের অভিন্নতা প্রতিপন্ন হয়।

ক্রোচের মতে মন অবিরাম ক্রিয়াশীল। মন এবং তাহার ক্রিয়া পৃথক নহে। মনন-বৃত্তিই মন। এই মননবৃত্তি আবার জ্ঞান ও এষণা (thought and will) ভেদে দুই প্রকার। জ্ঞানবৃত্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার বোধ বা অনুভব এবং এষণাবৃত্তি হইতে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। জ্ঞানবৃত্তির আবার দুইটী ক্ষণ বা স্তরভেদ আছে। প্রথম স্তরকে ঈক্ষণ (intuition) এবং দ্বিতীয় স্তরকে বুদ্ধি (intellection) বলা যাইতে পারে। ঈক্ষণ-ক্রিয়ার দ্বারা মন প্রথমতঃ বিশুদ্ধ রূপ (image) সৃষ্টি করে। বুদ্ধি-বৃত্তির ফলে বিশুদ্ধ প্রত্যয় (concept) বা সাধারণ ধারণার উদ্ভব হয়। মনের এই ঈক্ষণ-ক্রিয়া রসশাস্ত্র বা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের (Aesthetics) প্রধান উপজীব্য এবং বুদ্ধির সৃষ্টি যে প্রত্যয় তাহাই যুক্তিবিদ্যা বা ন্যায়শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

ঠিক এই ভাবে এষণারও দুইটী ক্ষণ বা স্তরভেদ নির্দ্দেশ করা যায়। প্রথম স্তর স্বার্থৈষণা; ইহা কর্ত্তা ব্যক্তির স্বকীয় উদ্দেশ্য-সাধনে প্রবৃত্ত হয়। দ্বিতীয় স্তর পরার্থৈষণা; ইহার ফলে মানুষ সমাজের কল্যাণে বা জগতের কল্যাণে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। স্বার্থৈষণা অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয় এবং পরার্থৈষণা নীতিশাস্ত্রের বিষয়বস্তু। সুতরাং মননক্রিয়ার এই চারিটি স্তরভেদে দর্শনশাস্ত্রেরও চারিটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (Aesthetics), বুদ্ধিশাস্ত্র (Logic), অর্থশাস্ত্র (Economics) এবং নীতিশাস্ত্র (Ethics)—দর্শনশাস্ত্রের এই চারিটি অংশ।

মনন-ক্রিয়ার পূর্ব্বোক্ত চারি স্তরের মধ্যে একটি নির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক বিদ্যমান আছে। ক্রোচে বিশেষ সূক্ষ্মদৃষ্টিতে এই সম্পর্ক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

মনন-ক্রিয়াকে প্রথমতঃ জ্ঞান এবং এষণা এই দুই স্তরে ভাগ করা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে এষণা জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। জ্ঞান ছাড়া কোনও এষণা অর্থাৎ সংকল্প বা ইচ্ছা হইতে পারে না। সুতরাং এষণার স্তরে জ্ঞানবৃত্তি অনুস্যূত থাকে। জ্ঞানের সৃষ্টি সংকল্প-সঞ্জাত কার্য্যে পরিণতিলাভ করে। জ্ঞানবৃত্তি কিন্তু এইরূপে এষণার অপেক্ষা রাখে না। যদিও সংকল্পের মধ্যে জ্ঞানের পূর্ণ পরিণতি ঘটে, তাহা হইলেও সংকল্পের পূর্ব্বে সংকল্প-নিরপেক্ষ (এষণা-নিরপেক্ষ) জ্ঞানের উদয় হওয়ায় কোনও বাধা নাই।

জ্ঞান ও সংকল্পের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান জ্ঞানবৃত্তির প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরের মধ্যেও

অনুরূপ সম্পর্ক বর্ত্তমান আছে। বুদ্ধির ক্রিয়া ঈক্ষণ-ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। ঈক্ষণ ছাড়া বুদ্ধি-বৃত্তির কোনও ক্রিয়ার উপলব্ধি হয় না। বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা যে সকল প্রত্যয়ের অনুভব হয় ঈক্ষণসৃষ্ট 'রূপ'ই (image) তাহার অবলম্বন। অর্থাৎ রূপ-সমূহকে অবলম্বন করিয়াই এই সাধারণ প্রত্যয়-সমূহ আমাদের জ্ঞানগোচর হয়। ঈক্ষণ কিন্তু বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল নহে। বরং ইহা সম্পূর্ণভাবে বুদ্ধি-নিরপেক্ষ বলিয়াই বিশুদ্ধ অবিকৃত রূপ-সমূহের (pure images) সৃষ্টি করিতে পারে।

ঈক্ষণতত্ত্বের বিশ্লেষণমূলক ব্যাখ্যা ক্রোচের দর্শনের একটি মৌলিক ও বিশিষ্ট অবদান। ক্রোচে দার্শনিক অপেক্ষা সৌন্দর্য্যতত্ত্বের অন্যতম ভাষ্যকার হিসাবে পণ্ডিত-সমাজে সমধিক প্রসিদ্ধি-লাভ করিয়াছেন। এই ঈক্ষণক্রিয়ার স্বরূপ বিশ্লেষণের উপরেই তাঁহার সৌন্দর্য্যতত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত।

ক্রোচের মতে আমাদের মানসজগতের বাহিরে সত্য বলিয়া আর কোনও পদার্থের অস্তিত্ব নাই। সৃষ্টিধর্ম্মী মন নিজেই নিজের জ্ঞেয় বিষয় সৃষ্টি করে। কাণ্টের মতেও জ্ঞানের বিষয়বস্তু অনেকাংশে বুদ্ধির সৃষ্টি। কিন্তু কাণ্ট জ্ঞানের অতীত একটি বস্তুসত্তা (thing-in-itself) স্বীকার করেন। ইহা যেন জ্ঞানরাজ্যের অপর প্রান্তে থাকিয়া জ্ঞানের বিষয়-বস্তুর জন্য মালমসলা সরবরাহ করে। এই মালমসলাই ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির ক্রিয়ার ফলে রূপান্তরিত হইয়া জ্ঞানের বিষয়ে পরিণত হয়। ক্রোচে কিন্তু জ্ঞানাতীত কোনও বস্তুসত্তা স্বীকার করেন না। ঈক্ষণ-ক্রিয়ার দ্বারা মন নিজ অনুভবের বিষয় নিজেই সৃষ্টি করে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের প্রাথমিক সংবেদনের (sensation) উপর নির্দ্দিষ্ট আকার (form) চাপাইয়া ঈক্ষণবৃত্তি বিবিধ রূপ (image) সৃষ্টি করে। রূপ ঈক্ষণেরই প্রকাশ। ঈক্ষণক্রিয়া স্বরূপতঃ সৃষ্টিধর্ম্মী এবং প্রকাশধর্ম্মী। সুতরাং অপ্রকাশিত ঈক্ষণ অসম্ভব। এই কারণে কাব্য ও শিল্পসৃষ্টির মূলে রহিয়াছে ঈক্ষণবৃত্তি। ঈক্ষণ অন্তরের অব্যক্ত অনুভূতি-সমূহকে রূপদান করে। অন্তরের সৃষ্টি ও তাহার প্রকাশেই কবির কবিত্ব এবং এবং শিল্পীর রসসৃষ্টি। রসমাত্রই ঈক্ষণের প্রকাশ। এই মূল রসোপলব্ধিকে পরে শিল্পী রং-রেখা প্রভৃতির সাহায্যে রূপদান করেন; কিন্তু উহা রসের গৌণ বহিরাবরণ-মাত্র। অন্তরের প্রকাশই রসের স্বধর্ম্ম। ক্রোচের এই মত রসশাস্ত্রে 'প্রকাশাত্মক রসতত্ত্ব' (expressionist theory of art) নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

ঈক্ষণ-বৃত্তির দ্বারা মন এই যে রূপসমূহ প্রকাশ করে তাহারা কিন্তু স্বলক্ষণ, অর্থাৎ তাহারা স্বস্বরূপেই প্রকট হয়, বুদ্ধিবৃত্তির প্রভাব হইতে তাহারা মুক্ত। তাহাদের অবিকৃত ভাবে প্রকাশ করাতেই মনের আনন্দ। জ্ঞানবৃত্তির প্রথম স্তরে রূপ-সৃষ্টির এই আনন্দ প্রত্যেক মানুষই অনুভব করে। সুতরাং মানুষ-মাত্রই মূলতঃ কবি বা শিল্পী।

জ্ঞানবৃত্তির দ্বিতীয় স্তর বুদ্ধি। ঈক্ষণের দ্বারা যেমন বিশুদ্ধ রূপের অনুভব হয়, বুদ্ধির দ্বারা সেইরূপ শুদ্ধ প্রত্যয়ের (pure concept) অনুভব হয়। এই শুদ্ধ প্রত্যয় আমাদের সমস্ত অনুভবের মূলেই বিদ্যমান থাকে। সুতরাং তাহারা সর্ব্বাত্মক (universal) এবং সত্য। গুণ (quality) এইরূপ একটি শুদ্ধ প্রত্যয়। কারণ গুণ ছাড়া আমরা কোনও বিষয়ের চিন্তা করিতে পারি না। অতএব গুণ সর্ব্বাত্মক এবং আমাদের সমস্ত অনুভবের মূলে বর্ত্তমান থাকায় ইহা বাস্তব সত্য। যুক্তিশাস্ত্র এইরূপ শুদ্ধপ্রত্যয় লইয়া আলোচনা করে। সাধারণতঃ আমরা যে সকল বিষয়ের জ্ঞান লাভ করি তাহাদের মধ্যে

রূপ ও প্রত্যয় মিলিত থাকে। ঈক্ষণের দ্বারা রূপ এবং বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা প্রত্যয়ের অনুভব হয়। অনেকগুলি বস্তুর অনুভব হইতে তাহাদের কোনও একটি সাধারণ গুণ বা লক্ষণকে পৃথক ভাবে চিন্তা করিয়া তাহাকে প্রত্যয় নাম দেওয়া যায় না। কার্য্যতঃ আমরা অনেক সময়ে এইরূপ ভাবে বস্তু হইতে তাহার গুণকে পৃথক বলিয়া চিন্তা করি। এইরূপ চিন্তাকে ক্রোচে প্রত্যয়াভাস (pseudo-concept) বলিয়াছেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান এইরূপ প্রত্যয়াভাস লইয়া আলোচনা করে। এ জন্য বিজ্ঞান বাস্তব সত্য হইতে বিচ্ছিন্ন। বিজ্ঞান সত্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া আলোচনা করে, দর্শনশাস্ত্র সত্যকে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করে।

মনের দ্বিতীয় বৃত্তি এষণা। এষণা হইতে আমাদের যাবতীয় ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়। ক্রোচের মতে নিষ্ক্রিয় এষণা বলিয়া কিছু নাই। এষণা-মাত্রই কার্য্য, এবং কার্য্যমাত্রই এষণা। ক্রোচের মতে জগৎ যখন তত্ত্বতঃ বিজ্ঞানময় (spiritual) তখন জগতের সকল প্রকার গতি এবং কার্য্যই এষণা। স্বার্থ এবং পরার্থভেদে কার্য্যের দুইটী স্তর। ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য লোকে যে কার্য্য করে তাহা স্বার্থৈষণা। কিন্তু মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সুতরাং মানুষ হিসাবে সে পরার্থে কার্য্য না করিয়া পারে না। পরার্থ-সাধনের দ্বারা তাহার নীতিবোধ চরিতার্থ হয়। জ্ঞান যেরূপ কার্য্যের মধ্যে অনুস্যূত থাকে, স্বার্থও সেইরূপ পরার্থের মধ্যে অনুস্যূত হয়। সেইজন্য পরার্থ-সাধনে মানুষ পরম আনন্দলাভ করে। পরার্থ-সাধনের মধ্যে ব্যষ্টি মানুষের সহিত সমষ্টি মানুষের একাত্মতা সম্পাদিত হয়।

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে ক্রোচের দর্শনের বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। আমরা উহার কয়েকটি মূল সূত্রের উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলাম। সমালোচকের দৃষ্টিতে এই দর্শনের সকল অংশ যুক্তিসহ বলিয়া মনে হইবে না; দর্শন-শাস্ত্রের বহু মূল সমস্যার সমাধানও হয়ত ইহাতে মিলিবে না। তাহা হইলেও ক্রোচের চিন্তা-ধারার মৌলিকতা এবং চমৎকারিত্ব আধুনিক দর্শনের ইতিহাসে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইটালীয় বিজ্ঞানবাদের বিভিন্ন ধারা তাঁহার দর্শনে সংহত এবং কেন্দ্রীভূত হইয়া নূতন আকারে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

শুধু আঁখিজলে বিরচি অর্ঘ্য, যদি এ কামনা তব
জ্বালাব না যামি প্রদীপ-শিখায়, সুন্দর অভিনব।
আরতি আমার অশ্রুর সাজে
রবে সুনিথর সঙ্গীত-মাঝে,
তোমারি দানের গহন-গানের মূর্চ্ছনে সাধি' লব।
পন্থায় তব যদি মোরে চাও ভরি' অনন্ত-কাল,
জানিব তুমিই রহি মাঝে মোর কাটিবে নিশীথজাল।
না হ'লে উদয়-আলো-উন্মেষ
শুধাব না এর আছে কি না শেষ,
শুধু চরণের অবিশ্রান্ত অনাহত লব তাল।

অতল দহনে দহিয়া আমায় চাও যদি জ্বালিবারে
যুগ-যুগান্ত পার হ'য়ে চলি—সে তোমার অভিসারে।
লভি' চুম্বন তব বহ্নির
সার্থক মানি নয়নের নীর,
অঙ্গুলি-শিখা লয় তুলি' তব সুনিভৃত মোর তারে।

শিবক্ষেত্র কাঞ্চীপুরম্

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

ছেলেবেলা হ'তে আমরা বহু জিনিস শুনি, পড়ি বা দেখি। পরজীবনে তাদের অধিকাংশই মনে থাকে না, স্মৃতির অতল গর্ভে কোথায় যেন তারা নিঃশেষে তলিয়ে যায়, কিন্তু সে সব শ্রুত, পঠিত বা দৃষ্ট বিষয়গুলির মধ্যে দু চারটি মনের ওপর গভীর রেখাপাত করে এবং স্মৃতিপটে সদা জাগরূক থাকে।

যাই হোক্, ছেলেবেলায় একটা গান শুনেছিলাম 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাশী কাঞ্চী কেবা চায়…'। বহুকাল অতীত হয়ে গেলেও গানের এ লাইনটি কখনও ভুলতে পারিনি। অবশ্য যখন শুনেছিলাম তখন কোথায় কাশী, কোথায় কাঞ্চী সে সম্বন্ধে কোনও ধারণাই ছিল না। অর্থ বোধগম্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেন জানি না ঐ সব স্থানগুলি দর্শনের তীব্র বাসনা হয়। ঈশ্বরানুগ্রহে গয়া, কাশী, গঙ্গা-দর্শনে ধন্য হই, কিন্তু প্রভাস ও কাঞ্চীদর্শনের সম্ভাবনা যেন অনুসরণকারী ব্যক্তির ছায়ার মত কেবল পিছিয়েই যেতে থাকে। কিঞ্চিদধিক এক বৎসর পূর্বে সত্যসত্যই শুভ সুযোগ এসে পড়ল; এক বন্ধুর সাদর আহ্বানে কাঞ্চীদর্শনের জন্য গত ২৫শে অক্টোবর সকালে তাঁর মোটর-গাড়ীতে উঠে বসলাম। মাদ্রাজ শহর থেকে এই ঐতিহাসিক শহর ও প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান মাত্র ৪৭ মাইল দূর। মাদ্রাজের এগ্‌মোর রেলষ্টেশনে গাড়ীতে উঠে চিঙ্গলপুট জংশনে গাড়ী বদল করে কাঞ্চীতে যাওয়া যায়। তা ছাড়া মাদ্রাজ শহর হতে রোজ একাধিক মটরবাসও কাঞ্চী যাতায়াত করে—বরাবর পিচের রাস্তা। আমাদের গাড়ী পুণামালী হাই রোড্ ধরে চল্‌তে লাগল। বন্ধু নিজেই গাড়ী চালাচ্ছিলেন। চওড়া রাস্তার দুপাশে সবুজ ধানের ক্ষেত। ভোরের মৃদুমন্দ বাতাসে ইতস্ততঃ সঞ্চালিত ধানের শীষগুলি বেশ নয়নাভিরাম দৃশ্য সৃষ্ট করছিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শ্রীপেরম্বুদুরে এসে পৌছলাম। এই স্থানটি মাদ্রাজ হতে ২৫ মাইল—বিশিষ্টাদ্বৈত-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক উদারহৃদয় শ্রীশ্রীরামানুজাচার্যের এটি জন্মভূমি। অল্পদিন পূর্বেই এই মহাপুরুষের জন্মস্থানের ওপর একটি মন্দির এবং তৎসংলগ্ন বেশ প্রশস্ত নাটমন্দির তৈরী হয়েছে। নাটমন্দিরের সাম্‌নেই সু-উচ্চ গোপুরম্-সমন্বিত আদিকেশব পেরুমলের খুব প্রাচীন মন্দির। সত্বর কাঞ্চী-দর্শনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকায় আমরা মনে মনে দেউলের দেবতা ও শ্রীরামানুজকে প্রণাম জানিয়ে তাঁদের এলাকা ছাড়িয়ে অগ্রসর হলাম। কয়েক মাইল যাওয়ার পরই ২।৩টি খুব উঁচু মন্দিরের গোপুরম্ দেখতে পেয়ে আমরা ভৌগোলিক জ্ঞান হ'তে ঠিক করলাম যে, উহাই কাঞ্চীপুরম্—আমাদের অদ্যকার গন্তব্যস্থল। প্রায় ১৫।১৬ মাইল দূর থেকে ঐ গোপুরম্ দেখা গেল, কাজেই ঐগুলি কত উঁচু সহজেই অনুমেয়। অবশ্য পাহাড়ী সমতলক্ষেত্র বলে বড় গাছপালা সামনে বিশেষ ছিল না। প্রায় ৪৫ মাইল সোজা যাওয়ার পর বাঁ দিকে মোড় নিয়ে মাত্র আড়াই মাইল এসেই আমরা শহরে প্রবেশ করলাম। এখানেও শ্রীরামকৃষ্ণ-মঠ আছে, তথায় স্বামিজীদের পূর্বেই খবর

দেওয়া ছিল। খোঁজ-খবর নিয়ে আমরা আশ্রমের শান্ত-শীতল ক্রোড়ে এসে যখন পৌছলাম তখন ঘড়িতে বেজেছে সাড়ে ন'টা। আশ্রমটির পরিবেশ অতি সুন্দর। কোনও ভক্ত-প্রদত্ত বাড়ীতে আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত। শহরের মধ্যে সব চেয়ে বড় লাইব্রেরী ও পাঠাগার আশ্রম-কর্তৃপক্ষ পরিচালনা করেন—সেজন্য সকাল-বিকাল বহু পাঠকের সমাগম হয়। দুজন সন্ন্যাসী স্থায়ী ভাবে আশ্রমে আছেন এবং অবসরপ্রাপ্ত ২।৩ জন বয়স্ক ভক্তও জীবনের শেষ সময়টুকু পবিত্র আবহাওয়ায় ও সাধুসঙ্গে কাটাবার উদ্দেশ্যে আশ্রম-বাস করছেন।

এই সুপ্রাচীন তীর্থক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ও মাহাত্ম্য এস্থানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ইংরেজীতে এই শহরের নাম Conjeevaram. হিন্দুরাজত্বকালে ইহা পল্লব ও চোল-বংশের রাজধানী ছিল—জৈনরাও কোন সময়ে এই শহর দখল করেন এবং এখনও তাঁদের কারুকার্যের ভূরি ভূরি নিদর্শন বর্তমান।

কথিত আছে, ভারতবর্ষে সাতটি প্রসিদ্ধ পবিত্র শহর আছে—যাদের বলা হয় সপ্তপুরী। এদের মধ্যে কাশী, হরিদ্বার ও অবন্তী এই তিনটি শিবক্ষেত্র; অযোধ্যা, মথুরা ও দ্বারকা বিষ্ণুক্ষেত্র; কিন্তু কাঞ্চী আরও বিখ্যাত যেহেতু ইহা একাধারে শিবক্ষেত্র ও বিষ্ণুক্ষেত্র। শহরের দুই অংশ—যেদিকে শিবমন্দির তার নাম শিবকাঞ্চী এবং যেদিকে বিষ্ণুমন্দির তার নাম বিষ্ণু-কাঞ্চী। বিভিন্ন সময়ে এ শহরে যে শৈব, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ছিল তার প্রচুর দৃষ্টান্ত আজও বর্তমান। বিভিন্ন যুগের শত শত শিলালিপি এখনও মন্দিরমধ্যে বর্তমান। কথিত হয়, কোনও সময়ে এই শহরে ১০৮টি শিবমন্দির এবং ১৮টি বিষ্ণুমন্দির ছিল—এছাড়া অন্যান্য মন্দিরের সংখ্যাও ছিল অনেক। শহরের মধ্যস্থলে বাস করতেন ব্রাহ্মণরা এবং উপকণ্ঠে ছিল রাজপ্রাসাদ এবং ব্রাহ্মণেতর বর্ণের বসতি। যে শহরে এতগুলি দেবালয়, তথায় ধর্মভাব যে কত প্রবল তা ধারণা করা কষ্টসাধ্য নয়।

প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক হুয়েন সাঙ খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কাঞ্চী পরিদর্শন করেন। তাঁর বিবরণে পাওয়া যায় যে, ছয় মাইল পরিধি-বিশিষ্ট কাঞ্চী তখন সমগ্র দ্রাবিড় দেশের রাজধানী ছিল। তাঁর মতে সাহসিকতায়, পাণ্ডিত্যে ও আধ্যাত্মিকতায় এখানকার লোক ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোকের চেয়ে উন্নততর ছিল। তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রবল প্রভাব ছিল এই শহরে। পরে শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজের আবির্ভাব ও প্রচারের ফলে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব প্রায় একেবারেই লোপ পায় এবং তার স্থান অধিকার করে শৈব ও বৈষ্ণবধর্ম। শ্রীশঙ্কর নিজে কাঞ্চীতে মঠ স্থাপন করেন এবং সে মঠের নাম দেন 'কামকোটি-পীঠম্'। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই মঠ কুম্ভ-কোণম্-এ স্থানান্তরিত হয়, কিন্তু এখনও কাঞ্চীর বিখ্যাত কামাক্ষী মন্দিরে আদি শঙ্করাচার্যের মূর্তির নিয়মিত পূজাদি হয়। কন্যাকুমারী, রামেশ্বর প্রভৃতি পরিদর্শনান্তে শ্রীশঙ্কর সমগ্র দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্র কাঞ্চীতে উপনীত হন এবং তদানীন্তন চোল রাজা রাজসেনার সাহায্যে বিষ্ণু ও শিব কাঞ্চীর সবচেয়ে বিখ্যাত বরদরাজ ও একাম্বরনাথের মন্দির সংস্কার করেন এবং কামাক্ষীদেবীর মন্দিরকে কেন্দ্র করে সমগ্র শহরটি পুনর্গঠিত করেন। কথিত আছে, দেবী আগে পর্বত-গুহায় থাকতেন এবং রোজ রাতে ভয়ঙ্কর মূর্তি ধরে শহরে এসে ভীতিপ্রদর্শন, হত্যা

প্রভৃতি নানারূপ অত্যাচার ও উৎপাত করতেন। শ্রীশঙ্কর এক রাতে তাঁর সম্মুখীন হন এবং তাঁর অসীম শ্রদ্ধা, অমিত তেজ এবং অতুলনীয় জ্ঞানের প্রভাবে দেবীকে সংহার মূর্তি ত্যাগ করিয়ে কৃপাময়ী বরাভয়া কামাক্ষী-মূর্তিরূপে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করেন। শহরবাসীর আতঙ্ক শঙ্করের কৃপায় চিরতরে দূরীভূত হয়। তদবধি দেবী কামাক্ষী সেই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারূপে লক্ষ লক্ষ ভক্তসন্তান কর্তৃক অশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত পূজিতা হচ্ছেন। দেবীর পুরোভাগে অষ্টলক্ষ্মীচিহ্নযুক্ত দেবীযন্ত্র শ্রীশঙ্কর কর্তৃক স্থাপিত হয়।

পূর্বেই বলেছি শহরে অনেকগুলি মন্দির। তন্মধ্যে শিবকাঞ্চী বা বৃহৎকাঞ্চীতে শ্রীএকাম্বরনাথ, শ্রীকামাক্ষীদেবী, ও শ্রীসুব্রহ্মণ্য (কার্তিকেয়)—এঁদের মন্দির এবং বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজের মন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান হতে সহস্র সহস্র যাত্রী এখনও এই মন্দিরগুলি দর্শন করে অপার আনন্দ পেয়ে থাকেন। বছরে দুবার খুব বড় উৎসব হয়, তখন অগণিত লোক-সমাগম হয়ে থাকে।

আমরা শ্রীরামকৃষ্ণমঠে শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করে প্রথমেই বিষ্ণুকাঞ্চী বা ক্ষুদ্রকাঞ্চী দর্শনে গেলাম। আশ্রম হতে একজন পরিচালক আমাদের সঙ্গে এলেন। বিরাট গেট দিয়ে মন্দির-প্রাঙ্গণে ঢুকেই বামদিকে এক পুকুরে গিয়ে তার জল স্পর্শ করলাম। শুনেছি তীর্থদর্শনে গেলে যেখানে যে আচার ও রীতি তা মেনে চলতে হয়—কাজেই পুকুরের জল স্পর্শের অযোগ্য হলেও অনেকে ভক্তিভরে সেই জলেই আচমন করছেন দেখলাম। পুকুরের উপরই একটি সুবৃহৎ মণ্ডপ—এখানে যজ্ঞাদি হয়। এই মণ্ডপের পাথরের পোস্ট-গুলির কারুকার্য অতুলনীয়। একই পাথরের বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন প্রকারের দেবদেবীর সুন্দর মূর্তি, কোথায়ও বা পাথরের শিকল, কোথায়ও রামায়ণ-মহাভারতের দৃশ্য-বিশেষ ক্ষোদিত হয়েছে, মোটের ওপর পাথরের ওপর এত সুন্দর ও সম্পূর্ণ কারুকার্য পূর্বে আর কখনও কোথায়ও দেখবার সুযোগ হয়নি। খুব তাড়াতাড়ি এসব দেখে নিয়ে আমরা মন্দিরের ভেতর গেলাম—প্রথমেই নৃসিংহমূর্তি। সেখানে পূজা দেওয়ার পর মন্দিরের পেছন দিকে কতকগুলি সিঁড়ি অতিক্রম করে ওপরে শ্রীশ্রীবরদরাজের মন্দির। হস্তিগিরি নামে খুব ছোট একটি পাহাড়ের ওপর এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত। বিরাট চতুর্ভুজ নয়নাভিরাম পাথরের বিষ্ণুমূর্তি। পূজার জন্য আমরা নারিকেল, তুলসী, ফুল, ধূপ, মালা ও কর্পূর সঙ্গেই নিয়েছিলাম। চার আনা পয়সা দিলেই পুরোহিত যাত্রীর পক্ষ থেকে ১০৮ বার মন্ত্র পড়ে দেবতার পূজা করেন। সাধারণতঃ তুলসীপাতা দিয়েই পূজা হয়। পূজান্তে কর্পূর আরতি হল—তারপর প্রসাদী টোপর (ধাতু-নির্মিত) সব যাত্রীর মাথায় ছোঁয়ালেন। বেশ ভক্তিমান পুরোহিত ৩।৪ জন রয়েছেন; পয়সার কোনও চাহিদা নেই। পূজার হার সরকার বেঁধে দিয়েছেন, পাণ্ডার অত্যাচারও বিশেষ নেই দেখে আনন্দ হল। মন্দিরের আবহাওয়া, শ্রীমূর্তি ও পূজা বেশ লাগল। কিছুক্ষণ জপাদি করে চতুর্দিকে সুপ্রশস্ত বারান্দা দিয়ে প্রদক্ষিণ করা হল। বারান্দার এক কোণে একটু ঘেরা যায়গা—সেখানে ছাদের (ceiling) সংলগ্ন রয়েছে একটি সোনার গিরগিটি; প্রায় ১ ফুট লম্বা। উহা স্পর্শ করবার জন্য একটা মইও কড়িকাঠের সঙ্গে লাগানো রয়েছে—একজন পুরোহিত আছেন, স্পর্শ করবার জন্য এক আনা পয়সা দিতে হয়

এবং স্পর্শ করলে যত পাপ এ পর্যন্ত করা হয়েছে সব থেকে নাকি মুক্ত হওয়া যায়। মাত্র এক আনা দিয়ে সব পাপের হাত থেকে মুক্ত হতে আর ইচ্ছা হল না—দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম।

তারপর আমরা এলাম শ্রীশ্রীএকাম্বরনাথের মন্দিরে—বরদরাজের মন্দির হ'তে ইহা প্রায় ৩ মাইল। সামনে ২১০ ফুট উঁচু গোপুরম্—গগনবিদার চূড়া দেখতে বেশ সুন্দর। দক্ষিণ ভারতের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা উঁচু গোপুরম্। কলকাতার মনুমেণ্টের চেয়েও উঁচু। উপরে উঠ্‌বারও বন্দোবস্ত আছে। কিন্তু এদিকে প্রায় বারটা বাজে, মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে এই ভয়ে আর ওপরে ওঠা হ'ল না। মন্দির-প্রাঙ্গণে বাম দিকে সহস্র থাম (পোষ্ট)-বিশিষ্ট একটি মণ্ডপ। ইহার এক অংশ ভেঙ্গে যাচ্ছে। বাইরে থেকে মন্দির এত বড় মনে হ'ল না। কিন্তু ভেতরে গিয়ে দেখি বিরাট ব্যাপার। কয়েক বছর আগে লক্ষ্মীর বরপুত্র এক চেটিয়ার ৪৫ লক্ষ টাকা খরচ করে মন্দিরটি মেরামত করে দিয়েছেন। কাজেই, কত বড় ও প্রশস্ত মন্দির সহজেই অনুমেয়। অনেক দূর থেকেই দেবাদিদেব মহাদেবের পুষ্প ও বিল্বাচ্ছাদিত লিঙ্গ দেখা গেল—চারিদিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং শান্ত জমজমাট ভাব। সহজেই মন স্থির হয়ে আসে। এই মন্দিরের পবিত্র গম্ভীর পরিবেশই সব থেকে ভাল লাগল। বালির লিঙ্গ, কাজেই জল দিয়ে পূজা বা অভিষেক (স্নান) হয় না। ফুল, বেলপাতা, চন্দন, মালা প্রভৃতি দিয়ে জগৎপিতার পূজা হয়। পূর্বের ন্যায় নারিকেল, ফুল, ইত্যাদি দিয়ে ১০৮ বার অর্চনা হল। কর্পূর-আরাত্রিকান্তে আমরা ভস্মপ্রসাদ ধারণ করে পরম তৃপ্তি লাভ করলাম। মন্দিরের পেছন দিকে ১৫০০ বছরের পুরাণো এক বিরাট আমগাছ। এত মোটা গুঁড়ি পূর্বে কখনও দেখি নি। চারিদিকে বাঁধানো ও ঘেরা। এখনও প্রচুর আম হয়। কথিত আছে, এই আম গাছের নীচে বসেই মা পার্বতী শিবের কঠোর আরাধনা করেছিলেন এবং শিবও সন্তুষ্ট হয়ে এখানেই তাকে দর্শন দিয়েছিলেন। বেগবতী নদীর তীরে এই স্থানটি। সেখানে বালি প্রচুর, কাজেই মাটি না পেয়ে দেবী পার্বতী বালিরই শিবলিঙ্গ গড়িয়ে পূজা করতেন। মায়ের গড়া সেই লিঙ্গই নাকি এখন পূজিত হচ্ছেন। বিরাট এবং স্মৃতিবহনকারী আমগাছটি রক্ষার ভার এখন ভারত সরকার গ্রহণ করেছেন। এখানে যাত্রীর ভীড় খুব কম থাকায় বেশ ভালভাবে অনেকক্ষণ ধরে দর্শন করা গেল। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় এখানে শিবলিঙ্গ অপরে স্পর্শ করতে পারে না বা গর্ভমন্দিরে কাহারও প্রবেশাধিকার নেই। একটু দূর থেকেই আমরা দর্শন করলাম। মহাদেবের একটি বিরাট রূপার রথ আছে। ৩০।৪০ ফুট উঁচু। ৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অনেক দিন আগে উহা নির্মিত হয়েছিল। বছরে একবার একাম্বরনাথের উৎসব-বিগ্রহ ঐ রথে চড়িয়ে মন্দির প্রদক্ষিণ করানো হয়। দাক্ষিণাত্যের সব মন্দিরেই দেবতার দুইটি বিগ্রহ থাকে—একটি আসল বিগ্রহ, আর একটি ধাতু-নির্মিত উৎসব-বিগ্রহ। আসল বিগ্রহ কখনও স্থানান্তরিত হন না।

বারংবার ভোলানাথকে অন্তরের প্রণতি জানিয়ে বিদায়গ্রহণ করলাম। মন্দিরের জমাটভাব মনের ওপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

তারপর আমরা কাঞ্চীর অধিষ্ঠাত্রী কামাক্ষীদেবীর মন্দির দর্শন করে ধন্য হলাম। একাম্বরনাথের মন্দিরের কাছেই ইহা অবস্থিত। মায়েরও ঐরূপ একটি রূপার বড় রথ আছে।

মায়ের কথা পূর্বেই বলেছি। যথারীতি পূজাদি দিয়ে এবং মাকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে সুব্রহ্মণ্যদেবের (কার্তিকের) মন্দির দর্শন করে প্রায় ১টার সময় আশ্রমে ফিরলাম। প্রসাদ-গ্রহণের পর একটু বিশ্রামান্তে বামনাবতারের মন্দির-দর্শনে গেলাম—আশ্রমের নিকটেই। অসময় হলেও পুরোহিত আমাদের জন্য মন্দির খুলে দিলেন—প্রায় একতলা সমান উঁচু কালপাথরের বিরাট বামনাবতারের মূর্তি। তাঁর এক পা স্বর্গের দিকে, আর এক পা পৃথিবীর ওপর এবং তৃতীয় পদ বলিরাজার মাথার ওপর। ভূমি-সংলগ্ন বলিরাজার মাথাটাই কেবল দেখা যায়। বলিরাজার দর্পচূর্ণ করবার জন্য ভগবান তাঁর কাছে মাত্র ত্রিপাদ-পরিমাণ ভূমি চেয়েছিলেন। দুই পায়ে স্বর্গ ও মর্ত আচ্ছাদন করে ফেলেন। তৃতীয় পদ রাখবার যায়গা না থাকায় বলিরাজা তাঁর মাথা এগিয়ে দেন এবং মাথার উপরই উহা স্থাপিত হয়।

শহরে দর্শনযোগ্য আরও বহু মন্দিরাদি রয়েছে; কিন্তু এ কয়টি, বিশেষ করে প্রথম মন্দির তিনটি, তন্মধ্যে আবার শ্রীশ্রীএকাম্বরনাথের মন্দির দর্শন করেই আমাদের হৃদয় পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। নানাস্থান দর্শন করে সে ভাব ভাঙ্গতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। এদিকে আবার ফিরবারও সময় হ'য়ে এসেছিল, কাজেই শ্রীএকাম্বরনাথ, ৺কামাক্ষীদেবী ও শ্রীবরদরাজের উদ্দেশে বার বার প্রণাম জানিয়ে আমরা বিদায় নিলাম এবং রাত ৮টায় মঠে এসে পৌছলাম। অল্প সময়ের জন্য হলেও এ পবিত্র স্মৃতি ভুলবার নয়। তীর্থদর্শনের প্রয়োজনীয়তা ও তীর্থ-মাহাত্ম্য সত্যই অস্বীকার করা যায় না। মনকে অন্য রাজ্যে নিয়ে যাওয়ার এরূপ সহজ পন্থা বোধ হয় কমই আছে।

বর্ষ-বিদায়ে

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

এত সমারোহ, এ সাজসজ্জা,
আর নাহি ভাল লাগে,
অস্তাচলে যে চলিয়াছে রবি
বিদায়ী লোহিত রাগে।
কবে রাজসূয় হয়ে গেছে শেষ—
মিলায়ে গিয়াছে শানায়ের রেশ,
ম্লান মণ্ডপে শুকানো পাতার
মৃদু মর্মর জাগে।

সেই রথ, সেই গাণ্ডীব তূণ,
নিতি সেই অভিযান,
আকর্ষণ যে হারায়েছে তার
হাঁপায়ে উঠিছে প্রাণ।

পাণ্ডুর ছায়া ঢাকিছে অবনী,
শ্রবণে পশিছে আহ্বান-ধ্বনি—
দুর্গম মহাপ্রস্থান পথ
হাতছানি দিয়া ডাকে।

দীর্ঘ হয়েছে অতিথির স্থিতি
আর থাকা নাহি সাজে,
চৈত্রের মেলা ভাঙিয়া যেতেছে
হেথা রহি কোন্ কাজে?

ময়দানবের প্রসাদ বিমল,
জমিতেছে তাহে শৈবাল-দল,
মলিন ধূলির স্তর পড়িতেছে
বাসি-কুঙ্কুম-ফাগে।
আর নাহি ভাল লাগে।

চতুঃষষ্টিকলা

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

বহু প্রাচীনকাল হইতে ভারতবর্ষে নানাবিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হইয়াছে। ইহা আমরা ভারতীয় দর্শন-কাব্য-সাহিত্যাদির আলোচনা হইতে জানিতে পারি। ভারতীয় নানাবিদ্যা যখন উন্নতির চরম শীর্ষে আরূঢ়, তখন কলাবিদ্যাও পূর্ণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। যে কোন সভ্য-জাতির পক্ষে ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, অধ্যাত্মবিদ্যা, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে কলাবিদ্যাও বিশেষ উন্নতিলাভ করিয়াছে। কিন্তু বর্তমান যুগে এই সকল বিষয়ের চর্চা না থাকায় অনেক তথ্য আমাদের অজ্ঞাত রহিয়াছে। বাৎস্যায়ন-রচিত 'কামসূত্রে' এই চতুঃষষ্টিকলা-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা পাওয়া যায়। তদ্ব্যতীত শুক্রনীতি-সার, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে কলা-বিষয়ক বহু কথা জানিতে পারা যায়। শুক্র-নীতিসারে ক্রিয়াত্মক ভাবে অনুষ্ঠীয়মান যে অংশ তাহাই কলা নামে প্রসিদ্ধ। বিদ্যার দুই ভাগ বলা হইয়াছে—জ্ঞান ও ক্রিয়া; এই ক্রিয়া-অংশই কলাবিদ্যার অন্তর্গত। মহাভারতেও এই কলাবিদ্যার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, গর্গ উবাচ—চতুঃষষ্ট্যঙ্গমদদৎ কলাজ্ঞানং মমাদ্ভুতম্—

বিদ্যা হ্যনন্তাশ্চ কলাঃ সংখ্যাতুং নৈব শক্যতে।
বিদ্যা মুখ্যাশ্চ দ্বাত্রিংশচ্চতুঃষষ্টিঃ কলাঃ স্মৃতাঃ ॥
যৎ সৎ স্যাৎ বাচিকং সম্যক্‌কর্ম বিদ্যাভিসংজ্ঞকম্।
সক্তো মূকোঽপি যৎ কর্তুম্ কলাসংজ্ঞস্তু
তৎ স্মৃতম্ ॥

(মহাভারত, আনুশাসনিকপর্ব, ১৮ অধ্যায়)

চৌষট্টি প্রকার কলা কি কি এবং তাহার প্রয়োগ কি প্রকার তাহা এই প্রবন্ধে আলোচিত হইতেছে—

(১) গীত—স্বরগ, পদগ, লয়গ এবং চেতোঽবধানগেয়, এই চারি প্রকার গীত। সঙ্গীত-চিন্তামণি, সঙ্গীত-রত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থে এই গীতবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) বাদ্য—ঘন, বিতত (আনদ্ধ), তত ও সুষির এই চতুর্বিধ বাদ্য কাংস্য, (ঢক্কা) পুষ্কর, তন্ত্রী ও বেণু দ্বারা যথাক্রমে বাদিত হয়। বীণাপ্রকাশ-গ্রন্থে এই বিষয় বিশেষ-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

(৩) নৃত্য—করণ, অঙ্গহার, বিভাব, ভাব, অনুভাব ও রস, সংক্ষেপতঃ নৃত্য এই ছয় প্রকার। পুনরায় নৃত্যকে দুই ভাগে ভাগ করা হইয়াছে—নাট্য ও অনাট্য। স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালে নিবাসকারীদের কৃত ব্যাপারের অনু-করণই নাট্য। ইহাই বর্তমান নাটকাভিনয়ে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তদ্বিপরীত অনাট্য, যাহা নর্তকের আশ্রিত। অন্যান্য শাস্ত্রে নৃত্যবিশেষ বোঝাইবার জন্য পৃথক্ ভাবে নাট্যকলা বলা হইয়াছে।

(৪) আলেখ্য—রূপের বিশেষত্ব, প্রমাণ, ভাব ও লাবণ্যযোজন, সাদৃশ্য এবং বর্ণিকাভঙ্গ (নানারঙের চিহ্নদ্বারা বর্ণের উৎকর্ষ প্রতিপাদন জন্য শ্রেণীপূর্বক রঙ্ বিন্যাস করাকে বর্ণিকা-ভঙ্গ বলে)—এই ছয় প্রকার চিত্রযোগ। এই

চিত্রযোগ চিত্তবিনোদনের হেতু এবং অপরের অনুরাগের জনক। এই চারিটি বিষয় গান্ধর্ব-শাস্ত্র ও চিত্রশাস্ত্রে বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

(৫) বিশেষকচ্ছেদ্য—তিলককাটা ; বিশেষক ললাটের তিলক। পূর্বে ভূর্জপত্র কাটিয়া তিলক-রচনার প্রথা ছিল। কেবলমাত্র ভূর্জপত্র নহে, আরও উপকরণ ছিল। ললাটের তিলক প্রধান বলিয়া তাহার নামই এখানে উল্লেখ করা হইল, এই কলারই অপর নাম পত্রচ্ছেদ্য। কেবল ললাটে নহে, কপালেও এই পত্রচ্ছেদ্য রচিত হইত। প্রাচীন কালে এই শিল্প অত্যন্ত উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। প্রসিদ্ধ কলাকুশল বৎসরাজ এই তিলক-রচনায় অদ্বিতীয় ছিলেন।

(৬) তণ্ডুলকুসুমবলিবিকার—অখণ্ড তণ্ডুল দ্বারা পদ্মাদি-রচনা, বিনাসূত্রে কুসুমাবলী দ্বারা ভূতলে লতাপ্রতান নির্মাণ, তণ্ডুলাদিচূর্ণ দ্বারা আলিপনা দেওয়া, কুসুমরসে তাহার রঞ্জন—এই সকল শিল্প ইহারই অন্তর্গত।

(৭) পুষ্পাস্তরণ—বাসগৃহে বা উপাসনা-গৃহাদিতে নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা যে শয্যারচনা করা হয় তাহা এই শিল্পের অন্তর্গত। ইহার অপর একটি প্রকার-বিশেষের নাম পুষ্পশয়ন। এমন কৌশলে এই পুষ্পবিন্যাস হইত, যাহা দেখিলে শুভ্রবসনাচ্ছাদিত সোপধান পুরু বিছানা বলিয়া বা নানাবর্ণের উৎকৃষ্ট গালিচা বলিয়া ভ্রম হইত।

(৮) দশনবসনাঙ্গরাগ—দশনরঞ্জন, বসনরঞ্জন ও অঙ্গরঞ্জন শিল্প। ইহা রঞ্জনশিল্প-নামেই অভিহিত। ইহার মধ্যে অঙ্গরাগ, কুসুমাদিদ্বারা অঙ্গমার্জন। বিলাসিনীদের দশনাদিসংস্কার অত্যন্ত অভীপ্সিত।

(৯) মণিভূমিকা-কর্ম—ঘরের মেঝে মণিময় করিবার অর্থাৎ মুক্তা বা মরকতাদি মণিদ্বারা শীতল মেঝে তৈরী করিবার শিল্প।

(১০) শীত-গ্রীষ্মাদি-ভেদ-অনুসারে রক্ত (অনুরাগসম্পন্ন) বিরক্ত (বিরাগসম্পন্ন) ও মধ্যস্থ (উদাসীন)-অভিপ্রায়বশতঃ আহারের পরিণাম বুঝিয়া শয্যারচনা করা ; অর্থাৎ, শয়নকারীর তাৎকালিক মনের ভাব বুঝিয়া তদনুরূপ শয্যা প্রস্তুত করার বিধান বুঝাইতেছে।

(১১) উদকবাদ্য—জলে করতাড়নাদি করিয়া তাহা হইতে মৃদঙ্গ-প্রভৃতি বাদ্যধ্বনি উৎপাদন। বর্তমানের জলতরঙ্গাদি বাদ্য এইরূপ।

(১২) উদকাঘাত—করতলদ্বয় পিচ্‌কারির ন্যায় করিয়া তাহার দ্বারা অন্যের গাত্রে জলক্ষেপ। এই নিক্ষিপ্ত জলধারার স্থিরলক্ষ্যতা, বেগাধিক্য বা দূরগামিত্বের তারতম্যে এই শিক্ষার উৎকর্ষ ও অপকর্ষ স্থির হয়। ইহাকে ক্বচিৎ জলস্তম্ভ নামে ব্যবহৃত হইতে দেখা যায়।

(১৩) চিত্রযোগ—নানাপ্রকারে পরের অনিষ্ট-সাধন করা, একেন্দ্রিয়পলিতীকরণ ইত্যাদি। যেমন, কোন এক স্ত্রীলোক পতিসুখে সুখী আছেন, কিন্তু তাঁহাকে তাঁহার পতির সহিত বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে তাঁহার পতি আর তাঁহাকে কখনই ভালবাসিবেন না ; সুতরাং তাঁহার দুর্ভাগ্যের আবির্ভাব হইবে। একেন্দ্রিয়পলিতীকরণ হইতেছে কোন একটি ইন্দ্রিয়ের ব্যাঘাত জন্মাইয়া দেওয়া। যেমন, অন্ধ বা উন্মত্ত করিয়া দেওয়া ইত্যাদি। ইহা ঔষধ-প্রয়োগে সম্পাদিত হয়। এগুলি ঈর্ষ্যাবশতঃ পরের অহিত-সাধনার্থে ব্যবহার্য। কিন্তু ইহা কৌচুমার যোগমধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। কুচুমার* ইহাদের উল্লেখ করেন নাই।

(১৪) মালাগ্রথন-বিকল্প—বিভিন্ন প্রকার মালা-গাঁথা শিল্প।

(১৫) শেখরকাপীড়-যোজন—ইহাও গ্রথন-বিশেষ, কিন্তু যোজনরূপে কলান্তর। শিরোভূষণের

* কুচুমার একজন প্রাচীন কামশাস্ত্র-প্রণেতা।

ন্যায়, অর্থাৎ সিঁথি, পানফুল, তারা, প্রজাপতি ইত্যাদির ন্যায় সমানভাবে শিথাস্থানে পরিধাপন-যোগ্য শেখরক এবং মণ্ডলাকারে গ্রথিত কাঠির সাহায্যে পরিধাপনযোগ্য আপীড় নানাবর্ণের পুষ্পদ্বারা বিরচন। এই দুইটি নাগরের প্রধান নেপথ্যাঙ্গ। টুপি, পাগড়ী ইত্যাদি অলঙ্কারকরণ।

(১৬) নেপথ্য-প্রয়োগ—দেশকাল ও পাত্র-বিবেচনায় উপযুক্ত বেশভূষা ও তাহার সন্নিবেশ। ইহাই রঙ্গরচনা বা অভিনেতাদিগকে সাজান।

(১৭) কর্ণ-পত্রভঙ্গ—হস্তিদন্ত ও শঙ্খাদি দ্বারা অলঙ্কারের জন্য কর্ণপত্র-বিশেষ নির্মাণ-শিল্প। প্রাচীনকালে হস্তিদন্ত ও শঙ্খদ্বারা বহু সূক্ষ্ম অলঙ্কারাদি নির্মিত হইত।

(১৮) যথাশাস্ত্র বিধানানুসারে নানাবিধ গন্ধ-দ্রব্যের প্রস্তুতি। বরাহমিহির-রচিত বৃহৎসংহিতা-গ্রন্থের ৭৭ অধ্যায়ে গন্ধযুক্তির অনেক কথা আছে। তাহার মর্মার্থ এই যে, একলক্ষ চুয়াত্তর হাজার সাতশত কুড়ি প্রকার গন্ধদ্রব্য প্রস্তুতি-প্রণালী এই গন্ধযুক্তির ,অন্তর্গত। আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রেও এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা দেখিতে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্যোপনিষদে দেখা যায়, ব্রহ্মবিদ্যার জন্য দেবর্ষি নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকট উপস্থিত। সনৎকুমার নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কি কি বিদ্যা অবগত আছ? তুমি যাহা জান না তাহার উপদেশ দিব।' নারদ যে যে বিদ্যার উল্লেথ করিলেন তাহার মধ্যে দেবজন বিদ্যা আছে—"দেববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাং ভূতবিদ্যাং ক্ষত্রবিদ্যাং নক্ষত্রবিদ্যাং সর্পদেবজনবিদ্যামেতদ্ভ-গবোঽধ্যেমি।" (ছাঃ উঃ, ৭।১।২)

(১৯) ভূষণযোজন—অলঙ্কারযোগ, ইহা দ্বিবিধ —সংযোজ্য ও অসংযোজ্য। সংযোজ্য—মণিমুক্তা-প্রবালাদি দ্বারা কণ্ঠহার, চন্দ্রহার প্রভৃতি। অসংযোজ্য—কটক, কুণ্ডল ইত্যাদি।

(২০) ঐন্দ্রজাল—ইন্দ্রজাল-বিদ্যার প্রভাবে বিবিধপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার-প্রদর্শন।

(২১) কৌচুমার-যোগ—সৌন্দর্যাদির বৃদ্ধির উপায়-প্রয়োগ। কুরূপাকে সুরূপা করিয়া দেখান, সুরূপাকে অরূপা করিয়া দেখান, বিরক্তকে অনুরক্ত করা ইত্যাদি। যাহা অন্য উপায়ে অসাধ্য তাহা এই শিল্প জানিলে অতি সহজে করা যায়।

(২২) হস্তলাঘব—সর্বকর্মেই হস্তের লঘুতা। ইহার ফলে ঘুঁটিবাজী, তাস-উড়ান প্রভৃতি হইয়া থাকে।

(২৩) বিচিত্রশাকযূষভক্ষ্যবিকারক্রিয়া—পান, রস, রাগ ও আসবের যোজন। ইহা নামতঃ ভিন্ন হইলেও একই কলা; সর্ববিধ পানাহার-প্রস্তুতির উপদেশ এই কলাতে আছে। একই কলা দুই ভাগে বিভক্ত; প্রথমতঃ ব্যঞ্জন, ঝোল (যূষ), মিষ্টান্ন, অন্নপিষ্টকাদি প্রস্তুতি-বিষয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ সরবৎ, সির্কা, চাট্‌নী এবং বিবিধ সুস্বাদু আসব (মদ্য) প্রভৃতি প্রস্তুতি-বিষয়ের উপদেশ। একপ্রকার পানাহার পাকসাপেক্ষ। অন্যপ্রকার পাকনিরপেক্ষ। আহার চতুর্বিধ—চর্ব্য, চূষ্য লেহ্য ও পেয়। তদনুসারে একই কলা দ্বিধা-বিভক্ত করিয়া বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে চর্ব্য, চূষ্য প্রথমভাগে এবং লেহ্য ও পেয় দ্বিতীয় ভাগে বলা হইয়াছে।

(২৪) সূচীবাণ-কর্ম—সূচীদ্বারা যে সন্ধান-করণ (যোড়া দেওয়া) তাহাকে সূচীবাণকর্ম বলে। ইহা তিন প্রকার যথা—সীবন, উতন ও বিরচণ। সীবন—জামা প্রভৃতি সেলাই, উতন—রিপুকরা, বিরচন—কাঁথা, লেপ, তোষক ইত্যাদি। কাপড়ে ফুলকাটা প্রভৃতি বিরচন-মধ্যে পরিগণিত হয়।

(২৫) সূত্রক্রীড়া—নালিকা-মধ্যে সূত্রের সঞ্চার ও তাহাকে অন্যথা প্রদর্শন। ছেদন করিয়া, দগ্ধ করিয়া আবার সেই সূত্রকে

অচ্ছিন্ন ও অদগ্ধভাবে দেখান ব্যক্তিবিশেষ। তাহা অঙ্গুলিবিন্যাস দ্বারা সম্পাদিত হয়।

(২৬) বীণাডমরুকবাস্ত—বাদিত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইলেও বাস্তমধ্যে তন্ত্রীবাস্তই প্রধান। তাহার মধ্যে আবার বীণাবাস্ত অন্যতম। ডমরুর আবশ্যক, সেইজন্য এইস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

(২৭) প্রহেলিকা—কবিতায় গোপনীয় অর্থের পরিজ্ঞান। এক কথায় হেঁয়ালি-রচনা বলা যাইতে পারে।

(২৮) প্রতিমালা—ইহা অন্ত্যাক্ষরিকা নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ক্রীড়ার্থ ও বীজচালনার্থ ব্যবহার করা হয়। প্রত্যেক শ্লোকে যেখানে ক্রমানুসারে অন্তিম অক্ষরের সন্ধান করিয়া পরস্পর শ্লোক পাঠ করা যায়, তাহাকে প্রতিমালা কহে।

(২৯) দুর্বাচকযোগ—দুরুচ্চারণীয় শব্দ ও দুর্বোধ অর্থযুক্ত শ্লোকাদি ব্যবহার। যেমন কাব্যাদর্শে—

দংষ্ট্রাগ্রদ্ধ্যা প্রাগ্ যো দ্রাকক্ষামন্বন্তঃস্থামুচ্চিক্ষেপ।
দেবক্রুটক্ষিদ্দ্বতিকস্তত্যো যুষ্মান্ সোহব্যাৎ
সর্পাৎ কেতুঃ॥

এতদ্ব্যতীত প্রাচীন তাম্রফলকাদি হইতে শ্লোকাদির উদ্ধারও দুর্বাচকযোগের অন্তর্ভুক্ত।

(৩০) পুস্তকবাচন—রসময় কাব্যাদির রসভাব-সমুদ্রেক-হেতু শৃঙ্গারাদিরসের স্বরবিন্যাসপূর্বক গান করিয়া বাচন। কথকতা এই শিল্পের অন্তর্গত।

(৩১) নাটিকাখ্যায়িকা-দর্শন—নাটকের অভিনয় ও আখ্যায়িকার্থের নিপুণভাবে বর্ণনা। গদ্যপদ্যাত্মক কাব্যের মধ্যে নাটক বহুপ্রকারে বিবৃত হইয়াছে। নাটকভেদে দশটি রূপক—নাটক, অঙ্ক, বীথী, প্রকরণ, ঈহামৃগ, ডিম, ভাণ, ব্যায়োগ, সমবকার এবং প্রহসন। এইগুলি নাটকের প্রকারভেদ।

(৩২) কাব্যসমস্যাপূরণ—এই বাক্যে সমস্যা-পদ সিদ্ধ হয়। যথা কাব্যাদর্শে—"আশ্বাসঞ্জনয়তি রাজমুখ্যমধ্যে" এই পাদটি উদ্যোগপর্বের বিষ্ণুযান-বিষয় অবলম্বন করিয়া অন্য তিনটি পাদদ্বারা সংগ্রথিত করিতে হইবে :

দৌত্যেন দ্বিরদপুরং গতস্য বিষ্ণোঃ
বন্ধার্থং প্রতিবিহিতস্য ধার্তরাষ্ট্রৈ।
রূপাণি ত্রিজগতি ভূতিমন্তি রোষাৎ
আশ্বাসঞ্জনয়তি রাজমুখ্যমধ্যে॥

এখানে বিষ্ণুর বন্ধনার্থ দুর্যোধনাদি দুর্বুদ্ধিগণ একত্র মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিয়াছিলেন, কিন্তু সমাগত জনের মধ্যে যতিপাদবাচ্য রামকর্ণাদির এবং রাজমুখ্য বাহ্লীক প্রভৃতির মধ্যে দৌত্য-কর্মের সাধনার্থ হস্তিনায় গত কৃষ্ণের লোকত্রয়ে যে সকল ভূতিমান দেহ বিরাজিত ছিল, তাহা সে স্থলে শীঘ্র হইয়াছিল, অর্থাৎ বিশ্বরূপ প্রকটিত হইয়াছিল।

(৩৩) পট্টিকা-বেত্রবাণবিকল্প—পট্টিকা, ছুরিকা, পট্টিকার বেত্র দ্বারা বাণবিকল্প ; খট্টার বা আসন প্রভৃতির বেত্রদ্বারা বাণবিকল্প বয়নপ্রক্রিয়া-বিশেষ।

(৩৪) তর্ক্ষুকর্ম—কুন্দকর্ম, কোন দ্রব্যের অপাকরণ (মলনিবারণ, ক্ষুদ্রীকরণ) ইত্যাদি কার্যে এই শিল্পের প্রয়োজন। কিংবা কার্পাস তুলা হইতে সূত্র-নির্মাণের জন্য ব্যবহার্য।

(৩৫) তক্ষণ—শয্যা ও আসনাদি-নির্মাণার্থ ব্যবহার্য।

(৩৬) বাস্তুবিদ্যা—গৃহনির্মাণ-কার্য, ইহাই বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারিং বলিয়া অভিহিত।

(৩৭) রূপ্যরত্ন-পরীক্ষা—ধাতব মুদ্রাদির কৃত্রিমতা অকৃত্রিমতাদি-পরীক্ষা।

(৩৮) ধাতুবাদ—স্বর্ণরৌপ্যাদিযোজনা, মৃত্তিকা প্রভৃতির পরিজ্ঞান।

(৩৯) মণিরাগাকরজ্ঞান—স্ফটিকাদি মণির রঞ্জন-বিজ্ঞান।

(৪০) বৃক্ষায়ুর্বেদ—বৃক্ষচিকিৎসা ও বৃক্ষরোপণাদি বিদ্যা।

(৪১) মেষকুক্কুটলাবকযুদ্ধবিধি—ক্রীড়ার্থ পরস্পর যুদ্ধশিখান।

(৪২) শুকসারিকা-প্রলাপন—শুক ও সারিকাকে মানুষের ভাষায় পড়াইতে শিখাইলে তাহারা অতি সুন্দরভাবে তাহা আয়ত্ত করিতে পারে।

(৪৩) উৎসাদনে ও কেশমর্দনে কৌশল—উৎসাদন, অঙ্গসংবাহন, কেশমর্দন, বেণীবন্ধন প্রভৃতি। মর্দন দ্বিবিধ—হস্তদ্বারা ও পদদ্বারা। যাহা পদদ্বারা সম্পাদিত হয়, তাহাকে উৎসাদন বলে। আর যাহা হস্তদ্বারা নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে কেশমর্দন বলে। তদ্ভিন্ন অন্য অবশিষ্ট অঙ্গে যে মর্দন করা হয় তাহাকে সংবাহন বলে।

(৪৪) অক্ষরমুষ্টিকা-কথন—অক্ষরগোপন, বর্ণের সাঙ্কেতিক বিন্যাস। ইহা দুই প্রকার—সাভাসা ও নিরাভাসা। তন্মধ্যে সাভাসা—অক্ষরমুদ্রা নামে ব্যবহৃত হয়। এখন সর্টহাণ্ড নামে এই শিল্প পরিচিত।

(৪৫) ম্লেচ্ছিতবিকল্প—যাহা সাধুশব্দ দ্বারা গ্রথিত হইয়াও অক্ষরের কুটিলবিন্যাসে অস্পষ্টার্থ, তাহাকে ম্লেচ্ছিত বলা হয়। ইহা গূঢ় বস্তু জানাইবার সঙ্কেতবিশেষ। (মহাভারতে এই বিষয়ে উল্লেখ দেখা যায়। মহাভারত, আদিপর্ব, বারণাবত-গমন, ১৪৫ অধ্যায়)

(৪৬) দেশভাষা-বিজ্ঞান—নানাদেশীয় ভাষাজ্ঞান। কোন বস্তুর বিষয় সাধারণের নিকট অপ্রকাশ্য হইলেও তাহাদিগের নিকটেই তাহা অন্য ব্যক্তিকে জানাইতে হইলে বা তদ্দেশীয়ের সহিত ব্যবহার করিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাজ্ঞান আবশ্যক।

(৪৭) পুষ্পশকটিকা—কোন পুষ্পের নাম করিতে বলিলে প্রশ্নকর্তা যে পুষ্পের নাম করিবে সেই পুষ্প-অনুসারে তাহার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের শুভাশুভফল নির্দেশক শাস্ত্র হইতে শুভাশুভ ফল বলিবার জন্য সেই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়।

(৪৮) নিমিত্তজ্ঞান—যে কোন নিমিত্ত অবলম্বন করিয়া প্রশ্নকর্তার জিজ্ঞাস্য বিষয়ের শুভাশুভ বলিতে পারা। ইহা ফলিত জ্যোতিষের অন্তর্গত।

(৪৯) যন্ত্রমাতৃকা—ইহার প্রণেতা বিশ্বকর্মা। ইহাতে দুই প্রকার যন্ত্রের কথা কথিত হইয়াছে। সজীব যন্ত্র— রথ, শকট, তৈল যন্ত্র ইত্যাদি গো, মহিষ, অশ্বাদি দ্বারা পরিচালিত এবং নির্জীব যন্ত্র—বায়ুবেগে, স্রোতবেগে, বাষ্পবেগে ও তড়িদ্বেগে যে সকল যন্ত্র পরিচালিত হয়; যেমন, রণতরী, ব্যোমযান, পুষ্পক, আগ্নেয় রথ, তরণী ইত্যাদি।

(৫০) ধারণমাতৃকা—শ্রুতগ্রন্থের ধারণার্থ শাস্ত্রবিশেষ—

যস্তু কোষস্তথা দ্রব্যং লক্ষণং কেতুরেব চ।
ইত্যেতে ধারণাদেশাঃ পঞ্চাঙ্গরুচিরং বপুঃ ॥

যাহাতে পাঁচ প্রকার বিষয় কথিত হইয়াছে, যাহা জানিলে একবার যে কোন গ্রন্থ শুনিতে পাওয়া যায় তাহার আর বিস্মরণ হইতে পারে না।

(৫১) সংপাঠ্য—সহযোগে পঠন। ক্রীড়া বা বাদের জন্য মিলিত ভাবে পাঠ।

(৫২) মানসী—মনে মনে চিন্তা, তাহা দৃশ্যবিষয় ও অদৃশ্যবিষয়-ভেদে দ্বিবিধ। কেহ ব্যঞ্জন অক্ষরদ্বারা পদ্ম ও উৎপলাদির আকৃতি নির্মাণ করিয়া যথাস্থানে অনুস্বার ও বিসর্গ যোগদ্বারা তাহার অর্থ না বলিয়া একটি শ্লোক বলিল। অন্য ব্যক্তি তাহার মাত্রা, সন্ধি-সংযোগ, অসংযোগ ও ছন্দে বিন্যাসাদি করিয়া অভ্যাসবশতঃ মিতাক্ষরের ন্যায় পাঠ করিবে। ইহাকে দৃশ্যবিষয়া বলে; কারণ, দেখিয়া পাঠ করা হয়। শ্লোকবিন্যাস-

ক্রমে পাঠ করিলে অদৃশ্যবিষয়া বলে। ইহার অন্যনাম আকাশমানসী।

(৫৩) কাব্যক্রিয়া—সংস্কৃত, প্রাকৃত, অপ-ভ্রংশ কাব্য করা।

(৫৪) অভিধান-কোষ—উৎপলমালা, অমর-কোষ ইত্যাদি।

(৫৫) ছন্দোজ্ঞান—পিঙ্গলাদি-প্রণীত ছন্দো-গ্রন্থের জ্ঞান।

(৫৬) ক্রিয়াকল্প—কাব্য করিতে জানা; অলঙ্কার-বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করা।

(৫৭) ছলিতকযোগ—ইহা পরব্যামোহার্থ প্রযোজ্য। এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে যে, অন্যরূপ দ্বারা বিশেষ ভাব প্রকাশ করিয়া দেবতা ও অন্য ব্যক্তিতে প্রয়োগ দ্বারা উপভোগ করা হয় তাহাকে ছলিতক বলে। যথা শূর্পনখা দিব্যরূপ ধারণ করিয়া বিচরন করিয়াছিল। আর ভীমসেনও ছলিতকযোগ জানিয়াই কীচকের নিকট স্ত্রীরূপে প্রতীয়মান হইয়াছিলেন।

(৫৮) বস্ত্রগোপন—বস্ত্রদ্বারা অপ্রকাশ্য দেশের অংশ কৌশলে সংবরণ করা। বিশাল বস্ত্রের সম্বরণাদি দ্বারা অল্পীকরণ। ইহাকেই গোপন বলা যায়।

(৫৯) দ্যূতবিশেষ—ইহা নির্জীব দ্যূতবিধান, তাহার মধ্যে প্রাপ্তি আদি পঞ্চদশ অঙ্গ দ্বারা যে মুষ্টিক্ষুল্লকাদি দ্যূতবিশেষ। ইহা তাসখেলা প্রভৃতি।

(৬০) আকর্ষক্রীড়া—পাশক্রীড়া ইহারই অপর নাম।

(৬১) বালক্রীড়নক—গৃহকন্দুক (যাহা এখন বল ও ফুটবল খেলা নামে অভিহিত হয়), কৃত্রিম পুস্তকাদি দ্বারা যে সকল বালকদের ক্রীড়নক।

(৬২) বৈনয়িকী বিদ্যা—আচারশাস্ত্র; হস্তী, ঘোটক, সিংহ, ব্যাঘ্রাদি জন্তুকে শিক্ষা দ্বারা বিনীত করিতে পারা যায়। ইহা বর্তমানে সার্কাস্‌রূপে পরিগণিত।

(৬৩) বৈজয়িকী-বিদ্যা—ইহার ফল বিজয় লাভ করা। ইহা দুই প্রকার যথা—দৈবী ও মানুষী। তন্মধ্যে দৈবী বৈজয়িকী বিদ্যা অপরাজিতাদি তন্ত্রোক্ত বিবিধ প্রকার দ্রষ্টব্য। আর মানুষী সংগ্রাম প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্রবিদ্যা, যুদ্ধবিদ্যা।

(৬৪) বৈয়াসিকী বিদ্যা—ইহার অর্থ শরীরকে ইচ্ছানুসারে কার্যক্ষমকরণ। মৃগয়াদি ইহারই একটি অঙ্গমাত্র।

এই কলাবিদ্যা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ভারতীয় কলাবিদ্যার মধ্যে প্রায় সকল বিদ্যাই অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। আজ আমরা বিদেশীয় নানা নামে ভূষিত যে সকল fine artsএর কথা শুনিতে পাই তাহার সকলই এই কলা বিদ্যায় অভিহিত হইয়াছে। কেবলমাত্র যে দর্শন, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে ভারত উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহা নহে; কলাবিদ্যাও প্রাচীনযুগে চরম উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল। আজ ভারত স্বাধীন হইয়াছে; ভারতবাসী শিক্ষায়, দীক্ষায় শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, কাব্যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতিগণের অন্যতমরূপে পরিগণিত হইবে, সন্দেহ নাই। ভারতবাসী যদি তাহার সংস্কৃতির সম্পদ-বিষয়ে যথার্থ অবগত হয়, তবেই ইহা সম্ভব হইবে। কলাবিদ্যার পূর্ণ পরিজ্ঞান লাভ করিয়া তাহার প্রয়োগ করিলে শিক্ষাজগতে অভিনব বৈচিত্র্য দৃষ্ট হইবে। সকলকেই যে এক শিক্ষা-পদ্ধতিতে শিক্ষিত হইতে হইবে এমন কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম না রাখিয়া যদি শিক্ষা-বিষয়ে কলাবিদ্যা বহুলভাবে প্রবর্তিত হয় তবে জাতির বিভিন্ন-মুখী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যাইবে। মাত্র বিধিবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত না হইয়াও দেশের জনগন কলাবিদ্যার প্রভাবে নানা উপায়ে জীবিকা-অর্জনও করিতে পারিবে।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি

ইডা আন্‌সেল

[হলিউড বেদান্ত কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত Vedanta and the West পত্রিকার সৌজন্যে। শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত]।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে স্বামী তুরীয়ানন্দ কর্তৃক আমেরিকায় প্রথম বেদান্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠার একমাত্র জীবিত প্রত্যক্ষ-দ্রষ্টা হিসাবে আমাকে কিছু লিখতে অনুরোধ করা হয়েছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী তুরীয়ানন্দ। দ্বিতীয়বার আমেরিকায় যাবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ এঁকে সঙ্গে যেতে অনুরোধ করেন যাতে আমেরিকায় তাঁর সহকারী রূপে কাজ করতে পারেন। প্রথমে স্বামী তুরীয়ানন্দ ভারত ত্যাগ ক'রে সেখানে যেতে অস্বীকার করেন, কিন্তু শেষে যখন স্বামিজী তাঁকে মিনতি করে বললেন, "হরি ভাই, একা আমি খাটতে খাটতে মরে যাচ্ছি—তুমি কি একটু সাহায্য করবে না?" তখন তিনি যেতে সম্মত হলেন।

১৮৯৯ সালের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ কালিফোর্ণিয়ায় আসেন এবং লস্ এন্‌জেলেস্ শহরে বক্তৃতা দেন। কখনও কখনও তিনি মিড (Mead) ভগিনীত্রয়ের বাড়ীতে থাক্‌তেন। এঁদেরই একজন হচ্ছেন মিসেস্ এলিস্ হান্‌সবারো। স্বামিজীর কাজে সাহায্য করার জন্য তিনি তাঁর সঙ্গে স্যান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে আসেন। ডক্টর বি, কে, মিল্‌স্ এর ইউনিটেরিয়ান্ চার্চে স্বামিজীর কয়েকটি বক্তৃতা হয়। এইসব ভাষণে খুব একটা উৎসাহের সাড়া পড়ে যায় এবং স্বামিজী অক্‌ল্যাণ্ড, আলামেডা এবং সান্‌ফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে পর পর অনেকগুলি বক্তৃতা দেন। প্রধানতঃ তিনি আলামেডায় 'হোম্ অব ট্রুথ্' এ থাকতেন। সানফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে একটি ছোট দল গ'ড়ে ওঠে। এঁরা ওখানে থাক্‌বার জন্য স্বামিজীর কাছে প্রার্থনা জানান। কিন্তু স্বামিজী তখন ভারতে ফিরে আস্‌তে অত্যন্ত উদ্‌গ্রীব। তিনি বললেন,—"আমি এমন একজন হিন্দু সন্ন্যাসীকে তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব যাঁর জীবনটি তোমরা দেখতে পাবে আমার উপদেশ-গুলির প্রত্যক্ষ মূর্তি।" তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে মনে করেই এই কথা বলেছিলেন। তুরীয়ানন্দজী তখন নিউইয়র্কে স্বামী অভেদানন্দকে সাহায্য করছেন।

যাহোক স্বামী তুরীয়ানন্দ যখন আমাদের কাছে এলেন আমরা কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর ঐ উক্তি তাঁকে বলি। তিনি উত্তর দিলেন,—"আমি হচ্ছি একটি ছোট্ট ডিঙ্গি, বড় জোর দু তিন জন লোককে পার করে দিতে পারি, কিন্তু স্বামিজী হচ্ছেন একটি বিরাট জাহাজ; বিপুল সংসার-জলধিতে হাজার হাজার লোকের তিনি কর্ণধার হতে পারেন।"

স্বামী তুরীয়ানন্দকে ডেট্রয়েটে রেখে বিদায় নেবার সময় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁকে যে শেষ উপদেশ দিয়ে যান সে কথাও তিনি আমাদের বললেন,—"ভারতকে ভুলে যাও। ঐ অঞ্চলে গিয়ে আশ্রমটি গড়ে তোল। বাদ বাকী মা সম্পূর্ণ করে দেবেন।" পরবর্তী কালে স্বামী

তুরীয়ানন্দ বলেছিলেন যে, তিনি স্বামিজীর একটি কথা রাখতে পারেননি—ভারতকে ভুলে যাওয়া।

স্বামী তুরীয়ানন্দ স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কোতে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। এই সময়ে সকালে তিনি ধ্যানশিক্ষা দিতেন। সঙ্কল্পিত কাজের কোন্ দিক্‌টা আগে হাত দেওয়া হবে এই নিয়ে সকলের সঙ্গে তখন বিশেষ আলোচনা চলে। শহরের বহু লোক যেখানে আসতে পারে সেই রকম একটা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে কিংবা কতিপয় খুব নিষ্ঠাবান্ ও আগ্রহশীল ধর্মজীবনলাভেচ্ছুর উপকারের জন্য শহর থেকে দূরে একটি আশ্রম শুরু করা হবে? স্বামী তুরীয়ানন্দ মনোযোগ-সহকারে সব রকম আলোচনা শুনে ঠিক করলেন, প্রথমে আশ্রমটাই হওয়া চাই। বললেন,—"মা প্রসন্না হয়েছেন।" সুতরাং ঠিক হল যে মিস্ বুক* আর মিস্ লিডিয়া বেল (Lydia Bell) আশ্রম স্থাপনের প্রস্তাবিত স্থানে কিছুদিন আগেই যাবেন এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি সব করে ফেলবেন।

অল্প বয়সে স্বাস্থ্যহানির দরুন স্বাভাবিক সর্বরকম কার্যক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি তেইস বছর বয়সেই একরকম অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিলাম। শরীর ছিল খুব কৃশ। কিন্তু এসব অযোগ্যতা সত্ত্বেও আমি আশ্রমে যাবার জন্য স্বামী তুরীয়ানন্দের কাছে অনুমতি চাইলাম। আমার দিকে চেয়ে স্নেহভরে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—"তুমি যেতে চাইছ কেন?"

আমি বললাম,—"মাখন হব বলে।"† তিনি খুব খুশী হয়ে উত্তর দিলেন,—"তুমি যেতে পার তোমার মা যদি অনুমতি দেন। আর দৃঢ় অধ্যবসায় যদি থাকে তো 'মাখন' হয়ে যেতে পার।"

বর্তমানে কয়েকঘন্টার মধ্যেই মোটরকারে স্যানফ্র্যানসিস্‌কো থেকে শান্তি আশ্রমে যাওয়া যায়। কিন্তু আমি বলছি ১৯০০ খৃঃর কথা। তখন রেলগাড়ীতে যেতে হত স্যান্ জোস্ (San Jose); তারপর চারঘোড়ার গাড়ীতে করে মাউন্ট্ হ্যামিল্টন্ পর্যন্ত—সেখান থেকে ২০ মাইল একটা সরু পার্বত্য পথ ধরে নিজেদের যানবাহনে স্যান্ এন্টন্ ভ্যালিতে পৌছুতে হত।

একদিন আমাদের দলটি বিকেলের দিকে স্যানফ্র্যান্‌সিস্‌কো ছাড়েন—রাতে স্যান্-জোসের একটা ছোট হোটেলে কাটিয়ে ভোর চারটার সময় পাহাড়ের অভিমুখে রওনা হওয়া গেল। দলের সকলেই ছিলেন খুব আমোদপ্রিয় ও উৎসাহী। সারা মনঃপ্রাণে এঁরা ভ্রমণটিকে উপভোগ করছিলেন। যতই এগিয়ে যাচ্ছিলাম পথের দৃশ্য ততই মনোরম এবং পরিবর্তিত হচ্ছিল। সুদৃশ্য গ্রামঅঞ্চলের ভিতর দিয়ে চওড়া রাস্তাটি চলে গেছে। কোথায়ও গোলাবাড়ী, কোথাও ফলের বাগান—এরই মধ্যে দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে লাগ্‌লাম। দুবার পথে ঘোড়া বদল করা হ'ল। বেলা দুটোয় মাউন্ট্ হ্যামিল্টনের শিখরস্থিত লিক অবজারভেটরীতে পৌছানো গেল। এখানে আশানিরাশার একটি প্রকাণ্ড

* মিস্ মিনি সি বুক (Minnie C Booke)। সান্ অ্যান্টন ভ্যালিতে একখণ্ড জমি ইনি স্বামী বিবেকানন্দকে দিতে চেয়েছিলেন একটি আশ্রম-প্রতিষ্ঠার জন্য।

† পূর্বে একটি বক্তৃতায় স্বামী তুরীয়ানন্দ আত্মানুভূতির ব্যাখ্যান প্রসঙ্গে আমাদের বলেছিলেন—দুধের ভিতর যেমন মাখন আছে কিন্তু মন্থন না করলে তা পাওয়া যায় না, সেই রকম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছেন তাঁকে ধ্যান-সহায়ে প্রত্যক্ষ করতে হয়। 'মাখন হওয়া' মানে আমি আত্মজ্ঞানলাভ করা বুঝাতে চেয়েছিলাম।

বন্দ আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিল। আমাদের দলে সবশুদ্ধ নয় জন লোক—সঙ্গে তাঁবু, খাদ্যসামগ্রী এবং অন্যান্য জিনিসপত্রও প্রচুর। কিন্তু দেখলাম আমাদের জন্যে রয়েছে গদি'ওয়ালা দুটি সিট্‌যুক্ত ছোট্ট একখানা গাড়ী, চারটি খচ্চর টান্‌ছে। স্যান্ এ্যান্টন্‌ভ্যালির অধিকাংশ জমির মালিক মিঃ পল্ গারবার গাড়ীটির চালক। তিনি বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁর গাড়ীতে ছোট একটা পুঁট্‌লী পর্যন্ত নেওয়া যেতে পারে না। পাহাড়ের অন্যদিকে আমাদের গন্তব্য স্থানের দিকে চেয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে খুব চিন্তান্বিত দেখা গেল। তাঁর নৈরাশ্য দেখে মিসেস্ আগ্‌নাস্‌ষ্ট্যান্‌লি এগিয়ে এলেন এবং তাঁর কোলের উপর নিজের টাকার থলিটি উজাড় করে তাঁকে ভর্ৎসনার সুরে বল্‌লেন—"একটা শিশুকেও যে বিশ্বাসটুকু রেখে চল্‌তে হয় আপনার দেখছি সেটুকুরও অভাব।" তুরীয়ানন্দজী অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উত্তর দিলেন,—"তুমি আমার মা, তোমার নাম দিলুম 'শ্রদ্ধা'।"

অবজারভেটরি থেকে কোন গাড়ী ভাড়া পাওয়া সম্ভবপর হল না। কিন্তু তাঁরা দুটো ঘোড়া ধার দিলেন। সুতরাং দলের দুজন লোক—একজন হচ্ছেন মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লি, আর একজন ডাঃ এম্ এইচ্ লোগান্—ঘোড়ায় উঠ্‌লেন। বেচারি মিঃ জর্জ রুরব্যাক্ চাপলেন তাঁর বাইসিক্‌লে (বাইসিক্‌ল্‌টি লটবহররূপে যাবার কথা ছিল)। দলের বাকী কয়জন কোনও মতে পূর্বোক্ত গাড়ীতে উঠে প'ড়লেন। স্বামী তুরীয়ানন্দ, চালক এবং দুজন মহিলা বসলেন সিট্‌এ। অবশিষ্ট আমরা তিন জন উঁচুর দিকে পা তুলে গাড়ীর মেঝেতে বসলাম। দুজনকে দুপাশে জাপটে ধরে মাঝখানে আমি বসেছিলাম। ওঁরা দুজন আবার গাড়ীর দুটো পাশ চেপে ধ'রে চ'ল্‌ছিলেন। নীচের দিকে নাম্‌তে একটু বেশ আরাম লাগ্‌ছিল, কিন্তু উপরে উঠ্‌বার সময় সাথী দুজনকে জোরে জড়িয়ে ধর্‌তে হচ্ছিল। সরু রাস্তা—ধূলোয় ভর্তি। মাঝে মাঝে গভীর খাদ। চাষ-আবাদহীন আরণ্য অঞ্চল। কিন্তু চারিপাশে নিবিড় সৌন্দর্য। খুবই গরম লাগছিল, জলও পথে নেই। অত্যন্ত গম্ভীরভাবে নীরবে বসে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। কথাবার্তা চল্‌ছিল খুব কম। বিকেলের শেষাশেষি মিসেস্ ষ্ট্যান্‌লি গরমে মূর্ছিতা হ'য়ে ঘোড়া থেকে প'ড়ে গেলেন। কিছুক্ষণ খুব উত্তেজনা চল্‌লো। অবশেষে তাঁর সংজ্ঞা এলো। স্বামিজী তাঁকে গাড়ীতে তুলে বসাতে বললেন। নিজে উঠলেন ঘোড়ায়। অবশেষে বাদামী রংএর একটি ঘোড়ায় সোজা-ভাবে উপবিষ্ট গেরুয়াবর্ণের রেশমী স্যুট পরিহিত স্বামী তুরীয়ানন্দকে পুরোভাগে নিয়ে আমরা গন্তব্য স্থানে পৌছুলাম।

জায়গায় পৌছে আমাদের খুশীর অন্ত নেই। কিন্তু আসার পরই আর এক সমস্যা দেখা দিল। কয়েক বছর মিস্ বুক্ তাঁর এই নিভৃত বাড়ীটিতে আসেন নি। অনেক জিনিস-পত্র সরিয়ে ফেলা হ'য়েছে। মিঃ গারবারের সাহায্যে দুই জন মহিলা সমস্ত উপত্যকাটা ঘুরে কিছু কিছু আসবাবপত্র সংগ্রহ করে ফিরে এলেন। পরিত্যক্ত কয়েকটি কেবিন থেকে এসব সংগৃহীত হল। রাতের খাবার হল ভাত আর লাল চিনি। খেয়ে নিয়ে আমরা আগুনের পাশে গোল হ'য়ে বসলাম। স্বামী তুরীয়ানন্দজীর সুমিষ্ট গম্ভীর কণ্ঠনিঃসৃত সংস্কৃত মন্ত্রগুলো শুনতে শুনতে আমরা সব কষ্ট ও ক্লান্তি ভুলে গেলাম। মন্ত্রের ভাবার্থ :-

"সেই পরম পুরুষ যিনি এই বিরাট বিশ্ব সৃষ্টি ক'রেছেন—তাঁরই জ্যোতির্ময় সত্তার আমরা ধ্যান করি। তিনি আমাদের অন্তরকে আলোকিত করুন।"

একটা গভীর প্রশান্তি আমরা অনুভব করতে লাগলাম। স্নিগ্ধ বাতাস মৃদুভাবে বইছিল। ঘন কাল রাত। উজ্জ্বল তারাগুলি যেন নুয়ে প'ড়ছিল আমাদের কাছে। ফেলে আসা অতীতের বিয়োগান্ত মুহূর্তগুলি—আর মূঢ় আমোদ-প্রমোদের ক্ষণগুলি সব যেন অস্পষ্ট স্বপ্নের মত নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেছে—আর এই মুহূর্তেই যেন আরম্ভ হয়েছে আমাদের নূতন জীবন!

(ক্রমশঃ)

দর্শন ও ধর্ম

(হিন্দুর দৃষ্টিভঙ্গীতে)

স্বামী নিখিলানন্দ

সংস্কৃত দর্শন-শব্দ দৃশ্‌ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন। ইহার অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। দৃশ্‌ধাতুর অর্থ 'দেখা'। সুতরাং হিন্দু-ঐতিহ্যে দর্শন মানে তত্ত্বের অবান্তর বিবৃতি, অথবা বুদ্ধি দ্বারা তত্ত্ববোধের প্রচেষ্টা-মাত্র নহে। ইহার অর্থ দেখা, তত্ত্বের অনুভব এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবনে ইহার প্রয়োগ। পাশ্চাত্য চায় তত্ত্বকে বুদ্ধিগম্য করিতে, প্রাচ্য চায় তত্ত্বে আপনাকে পরিণত করিতে।

সংস্কৃত 'ধর্ম'-শব্দ প্রায়ই 'রিলিজনে'র প্রতিশব্দ-রূপে ব্যবহৃত হয়। ধর্ম ধৃ-ধাতু হইতে নিষ্পন্ন; ধৃ-ধাতুর অর্থ ধারণ করা। সুতরাং ইহার তাৎপর্য ইংরেজী রিলিজন্‌-শব্দের তাৎপর্য হইতে ব্যাপক-তর। ধর্ম প্রাণীকে ক্রমবিকাশের পথে ধারণ করে, রক্ষা করে। ধর্ম আভ্যন্তর নিয়ামক, বস্তুর সত্তাস্বরূপ; ধর্ম ব্যতীত বস্তুর বর্তমান সত্তা সম্ভব হইত না। যেমন, অগ্নির ধর্ম দহন, জলের ধর্ম প্রবহণ এবং অশ্বের ধর্ম হ্রেষাদি। বৃশ্চিক, ব্যাঘ্র, যোদ্ধা, বণিক্‌, সাধু—সকলেই স্ব স্ব স্বাভাবিক ক্রিয়াব্যবহারে নিজ নিজ 'ধর্মের' অনুবর্তন করে। হিন্দু ধর্মশাস্ত্রকারগণ 'গৃহস্থের ধর্ম,' 'সন্ন্যাসীর ধর্ম' নির্দিষ্ট করিয়াছেন; পরধর্ম যতই মনোরম হউক উহা অনুসরণীয় নয়।[১] ইহাই তাঁহাদের সাবধান বাণী। স্বধর্মের সম্যক্‌ একনিষ্ঠ অনুষ্ঠান দ্বারা মানুষ পরমমঙ্গলময় আপ্তব্যকে জীবনে লাভ করে।[২] ক্রমোন্নতির পথে মানুষ ভগবৎসত্তা-সম্বন্ধে অবহিত হয় এবং তাঁহাকে উপলব্ধি করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়ে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা বলেন, যথাসময়ে সর্বপ্রকার পার্থিব কর্মানুষ্ঠানকে ত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শরণাগতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম।[৩]

উপনিষৎ-সম্মত তত্ত্বজিজ্ঞাসার ক্রম হইল—উপযুক্ত গুরু-সন্নিধানে শাস্ত্রবাক্যের শ্রবণ, প্রাপ্ত গুরূপদেশ-অনুধাবনের জন্য যুক্তি-প্রয়োগ এবং অনুভবের সাহায্যে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য-স্বরূপ তত্ত্বের সাক্ষাৎকার।[৪]

বেদাদি শাস্ত্রে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণের অনুভূতির কথা লিপিবদ্ধ; ব্রহ্মজিজ্ঞাসু তাঁহাদের উক্তিকে সিদ্ধান্তমুখী সাময়িক অনুমান বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন। ব্রহ্ম দেহাদি-ব্যতিরিক্ত, মন-আদি ব্যতিরিক্ত; সুতরাং যুক্তিগম্য নন। যুক্তির ভিত্তি হইল ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষজন্য জ্ঞান এবং এই ইন্দ্রিয়জ অনুভবের উপরই যুক্তির নির্ভর। দেখিতে হইবে, শাস্ত্রব্যাখ্যা যেন যুক্তিবিরোধী না হয়। তত্ত্ব-সম্বন্ধে একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া শাস্ত্রবাক্যকে

১ "শ্রেয়ান্‌ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ।।"
(গীতা, ৩।৩৫)

২ "স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।"
(গীতা, ১৮।৪৫)

৩ "সর্বধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।।"
(গীতা, ১৮।৬৬)

৪ "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ।" (বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ২।৪।৫)

অবিচারপূর্বক স্বীকার করা মানুষকে প্রায়ই এক-দেশদর্শী ধর্মান্ধ করিয়া তোলে।[৫]

কিন্তু বিচারও প্রায়ই আমাদের ভোগেচ্ছার যৌক্তিকতা-প্রদর্শনে পরিণত হয়। প্রায়ই দেখা যায়, যাহা আমরা প্রমাণ করিতে চাই, তাহাই আমরা প্রমাণ করি। যুক্তি ভাবাবেগের সহজলভ্য যন্ত্রস্বরূপ। বিরাট বিশ্বরহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে যুক্তি যে পর্যাপ্ত নহে, তাহা আজকাল কোন কোন আধুনিক জড়বিজ্ঞানীও স্বীকার করেন। এতদ্ভিন্ন যুক্তিলব্ধ জ্ঞান প্রত্যক্ষ নয়। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান বহুত্বের বোধকে বিনাশ করিতে পারে না। এই বহুত্বের আভাস প্রত্যক্ষ; বেদান্তিগণের মতে ইহা অবিদ্যা-সৃষ্ট। হিন্দু দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসুকে আর একপ্রকার অনুভূতির অনুশীলন করিতে হইবে—ইহাকে বলে অপরোক্ষানুভূতি। এই প্রত্যক্ষানুভব ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভর করে না। এই প্রকার অপরোক্ষানুভূতিতে ইন্দ্রিয়গণের বৃত্তি থাকে না। ইন্দ্রিয় দ্বারা লব্ধ জ্ঞান ইন্দ্রিয়াকারিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান আপেক্ষিক।[৬]

সকল হিন্দু দার্শনিকগণের অভিমত, প্রত্যক্ষানুভবই ব্রহ্মসত্তার চরম প্রমাণ।[৭] কিন্তু এই অনুভূতি শাস্ত্রপ্রমাণ বা যুক্তি-বিরোধী হইবে না। সংক্ষেপে বলিতে গেলে শাস্ত্র, যুক্তি ও অনুভবের ভিত্তিতেই কোন সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ হইতে পারে; যেমন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কোন আইন কংগ্রেস, শাসনবিভাগ এবং সুপ্রীম কোর্টের অনুমোদন দ্বারাই বিধিবদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রত্যক্ষানুভব লাভ করিবার জন্য হিন্দু দার্শনিকগণ যে উপায় অবলম্বন করেন, তাহা যোগনামে অভিহিত। যোগোক্ত নিয়ম প্রধানতঃ—শম-দম, অনাসক্তি এবং চিত্তের একাগ্রতা। যোগাভ্যাস দ্বারা বিচারবৃত্তি বোধিতে পরিণত হয়। এই বোধি দ্বারাই তত্ত্বের অপরোক্ষানুভব হয়। এই অবস্থা মানসবৃত্তির নিরোধ-সাপেক্ষ নয়। লোভ, কাম, অহঙ্কার-রূপ মলনির্মুক্ত চিত্তবৃত্তিকেই বোধি বলা যাইতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছেন, শুদ্ধমন ও শুদ্ধচৈতন্য বা ব্রহ্ম একই বস্তু।

উপনিষদের মতে ব্রহ্মকে জানার অর্থ ব্রহ্মভূত হওয়া।[৮] যথার্থ দার্শনিক জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জীবনযাত্রা ও চরিত্রে রূপান্তর উপস্থিত হয়। সুতরাং এই প্রকার জ্ঞানানুসরণের জন্য নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাদির অনুশীলন অবশ্য কর্তব্য। কেবলমাত্র বুদ্ধিপ্রয়োগে সাধুতা যথেষ্ট নয়। হিন্দু দার্শনিকগণ জোরের সহিত বলেন, তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তি অন্তরিন্দ্রিয় ও বহিরিন্দ্রিয়ের সংযমরূপ সাধন-সম্পদে সম্পন্ন হইবেন। কায়-মনোবাক্যে পবিত্রতা, গুরুভক্তি, সত্যানৃতবস্তু-বিবেক, অতত্ত্ব বিষয়ে অনাসক্তি, শীতোষ্ণ, সুখ-

৫ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র 'ব্রহ্মসূত্রে' ব্রহ্ম বা পরমতত্ত্বকে শাস্ত্র-বাক্যের ভিত্তিতেই প্রমাণ করা হইয়াছে (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।৩); অবশ্য আচার্য শঙ্কর মাণ্ডূক্য উপনিষদের উপর গৌড়পাদ-কৃত কারিকার ব্যাখ্যান-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, শাস্ত্রপ্রমাণব্যতিরেকে যুক্তিদ্বারাও ব্রহ্মসত্তা সিদ্ধ হইতে পারে। (মাণ্ডূক্য-কারিকা, ২।১; ৩।১) তিনি শ্রুতিপ্রামাণ্যে অবিশ্বাসী বৌদ্ধ ও জৈন-মত খণ্ডনক্রমে ব্রহ্মসত্তা-প্রতিপাদন করিতে গিয়া মুখ্যতঃ যুক্তি-বিচারের উপর নির্ভর করিয়াছেন।

৬ "কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্।" (কঠোপনিষৎ, ২।১।১)

৭ জড়বাদী লোকায়তিক চার্বাকমতাবলম্বিগণ প্রত্যক্ষকে বস্তুজ্ঞান-বিষয়ে একমাত্র প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহাদের দার্শনিক সম্প্রদায় বহুকাল লোপ পাইয়াছে। তাঁহাদের রচনা বিচ্ছিন্ন আকারে পাওয়া যায়। প্রত্যেক সাগ্রহ সত্যকার তত্ত্ববিষয়ক অনুসন্ধিৎসাকে হিন্দুগণ উদারতা-বশতঃ 'দর্শন'-নামে অভিহিত করিয়াছেন।

৮ "স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।"
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৯)

দুঃখ, মান-অপমান এবং জড়জগতের অন্যান্য দ্বন্দ্বসমষ্টির প্রতি কতকটা ঔদাসীন্য; আর্তের প্রতি করুণা এবং পার্থিব জীবনের বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য অবিচলিত মানসিক দৃঢ়তা—এই সকল গুণাবলীও তত্ত্বজিজ্ঞাসুর অনুশীলনের বিষয়। অবস্তুর প্রতি বিরাগ এবং মুক্তির জন্য সুগভীর আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত নৈতিক নিয়ম-চর্চা মরুভূমিতে জলাভাসের ন্যায় নিতান্ত বাহ্য অবভাস-মাত্র। কেবলমাত্র নৈতিক অনুশীলন দৃঢ়ভিত্তিহীন, ইহা যে কোন সময় মরীচিকার মত বিলীন হইয়া যাইতে পারে।[৯] করুণাহীন জ্ঞান নররক্ত-পিপাসু দেবতার মত হইয়া দাঁড়ায়। মনুষ্যজীবনের নৈতিক মূল্য-বিষয়ে উদাসীন আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের আবিষ্কার ইহার পরিচয় দেয়। যে জ্ঞানের পরিণতি মনুষ্যসমাজের বিনাশ তাহার যথার্থ মূল্য কি, সে বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠে।

গৌড়পাদ মাণ্ডুক্য উপনিষদের ব্যাখ্যায় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের তিনটি লক্ষণের কথা বলিয়াছেন—শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের অন্য জ্ঞানের সহিত কোন বিবাদ থাকিবে না, ইহা অন্য জ্ঞানের বিরোধী হইবে না, ইহা সকলের পক্ষে কল্যাণপ্রদ হইবে।[১০] অল্প জ্ঞানেই বিরোধ, ভূমাতে বিরোধের সম্ভাবনা নাই।[১১] স্বভাবতই ঐক্যাত্মক বলিয়া শ্রেষ্ঠ জ্ঞান বিরোধ-বিবর্জিত। তত্ত্বস্তু দ্বৈতহীন এবং সর্ববিসারী। সুতরাং জড় ও চৈতন্য উভয়ই তাহাতে অনুস্যূত। সর্বসংশয় তখনই ছিন্ন হইতে পারে, যখন মানুষ 'পর' ও 'অবর' অর্থাৎ জড় ও চৈতন্য-স্বরূপ সেই পরমতত্ত্বকে জানিতে পারে।[১২]

তত্ত্বসাক্ষাৎকার অর্থ তত্ত্বজ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান এই জন্মেই লাভ করিতে হইবে। মৃত্যুর পরে কি ঘটে, তাহা অনুমানের বিষয়। উপনিষদ্ এই জন্মেই তত্ত্বজ্ঞান-লাভের কথা বলিয়াছেন।[১৩] জ্ঞানেই মুক্তি। আচার্য শঙ্কর জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ এই মর দেহেই মুক্তি হইতে পারে স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তপুরুষ 'পদ্মপত্রমিবাম্ভসা' পাপ-পুণ্যাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট থাকিয়া জগতে বাস করেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণ—তাঁহারা প্রচলিত ধর্মমত দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত—বিদেহ-মুক্তি, অর্থাৎ মৃত্যুর পর মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, জীবাত্মা যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে অধিষ্ঠিত আছেন, ততক্ষণ তিনি সম্পূর্ণভাবে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, রোগ, জরা, মৃত্যুরূপ-উপাধি-মুক্ত হইতে পারেন না। অবশ্য তাঁহারাও বলেন, সমাধিমান্ ব্যক্তি তাঁহার পার্থিব পরিবেশকে নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তিলাভ করিয়া মুক্তপুরুষ হইতে পারেন, যদিও দেহাপগমে আসিবে তাঁহার

৯ "এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবত্তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা।"
(বিবেকচূড়ামণি, ৩০)

১০ "অস্পর্শযোগো বৈ নাম সর্বসত্ত্বসুখো হিতঃ।
অবিবাদোঽবিরুদ্ধশ্চ দেশিতস্তং নমাম্যহম্।"
(মাণ্ডুক্যোপনিষদ্-গৌড়পাদ-কারিকা, ৪।২)

১১ "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।১।৩)

১২ "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"
(মুণ্ডকোপনিষৎ, ২।২।৮)

১৩ "ইহ চেদশকদ্বোদ্ধুং প্রাক্ শরীরস্য বিস্রসঃ।
ততঃ সর্গেষু লোকেষু শরীরত্বায় কল্পতে।"
(কঠোপনিষৎ, ২।৩।৪)

"ইহ চেদবেদীদথ সত্যমস্তি
ন চেদিহাবেদীন্মহতী বিনষ্টিঃ।"
(কেনোপনিষৎ, ২।৫)

"যো বা এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বাস্মাল্লোকাৎ
প্রৈতি স কৃপণঃ।"
(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৩।৮।১০)

চরম মুক্তি। বোধিবৃক্ষ-মূলে বুদ্ধ নির্বাণ-লাভ করেন; কিন্তু দেহান্তে লাভ করেন আত্যন্তিক মুক্তি বা পরিনির্বাণ।

বেদান্ত-দর্শনে পরমতত্ত্ব ব্রহ্ম-নামে অভিহিত। বিভিন্ন বৈদান্তিক দার্শনিক ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যথা—অদ্বৈতবাদী শঙ্করের মতে ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ, সর্বোপাধিবর্জিত এবং জীব ও জগতের সঙ্গে অভিন্ন। ব্রহ্মই একমাত্র সদ্‌বস্তু। ব্রহ্মব্যতিরিক্ত বস্ত্বন্তর কেহ যদি দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে তিনি অবিদ্যাগ্রস্ত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ এবং দ্বৈতবাদী মধ্বের মতে ব্রহ্ম সগুণ, সবিশেষ। রামানুজ বলেন, জীব ও জগৎ ব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ; জীব ও জগদ্রূপেই ব্রহ্ম অভিব্যক্ত; স্ফুলিঙ্গ যেমন অগ্নির অংশ তদ্রূপ ইহারা ব্রহ্মেরই অংশ। কিন্তু মধ্ব জীব ও জগৎকে ব্রহ্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ সত্তা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন, তাঁহারা উভয়েই বিদেহমুক্তি স্বীকার করিয়াছেন যদিও তাহা শঙ্করস্বীকৃত নয়। অদ্বৈতবাদ-অনুসারে তত্ত্বজ্ঞানান্তে জীবের সবিশেষত্ব অপসৃত হয়, কিন্তু দ্বৈতবাদ-মতে অহং-এর নাশ নাই, ইহা বিলয়হীন; অবশ্য ভগবদ্‌জ্ঞানে ইহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া যায়।

সকল হিন্দু আচার্য বেদকেই স্ব স্ব মতবাদের ভিত্তি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। উপনিষৎসমূহে বৈদিক দর্শন প্রপঞ্চিত। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপনিষদ্ কি বলেন? ইহা নিশ্চিত যে, উপনিষদে দ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ-সমর্থক বিভিন্ন উক্তি আছে। শঙ্কর-মতে অদ্বয় নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তা-প্রতিপাদনেই উপনিষদ্‌বাক্যের তাৎপর্য; উপনিষদ্ সুস্পষ্ট ভাষায় দ্বৈত-নিরাস করেন;[১৪] অদ্বৈত-নিরাস উপনিষদে দেখা যায় না।

কখনও কখনও এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, অপরোক্ষানুভূতি-সম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞগণ কিরূপে আপাততঃ পরস্পরবিরোধী ভাবে একই ব্রহ্মকে বিবৃত করিলেন। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ব্রহ্ম-স্বরূপ বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহা অনির্বাচ্য; ইহা দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত। দ্বৈত ও অদ্বৈত শব্দদ্বয় পরস্পরাপেক্ষ। ব্রহ্মস্বরূপ স্ব স্ব অনুভূতিতে যেভাবে উদ্‌ভাসিত হইয়াছে, বিভিন্ন আচার্য সেইভাবেই তাহা বিবৃত করিয়াছেন। যে যে ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাকেই উচ্চতম সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।[১৫] ব্রহ্মকে কখনও কখনও চিন্তা-মণির সহিত তুলনা করা হইয়াছে। পুরাণ-বর্ণিত এই মণিকে যাহারাই দেখিতে আসিত, তাহাদেরই মনের ভাব ইহাতে প্রতিফলিত হইত। অবশ্য অদ্বৈতভাবাত্মক বর্ণনা ব্রহ্মস্বরূপের নিকটতম প্রপঞ্চন বলা যাইতে পারে। অথবা এইরূপও বলা যায় যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সত্ত্বেও শিষ্য-গণের বিভিন্ন বোধ-সৌকর্যার্থ ব্রহ্মকে বিভিন্নভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। যে শিষ্য জীব ও জগদ্-বোধসম্পন্ন—জীবজগদাত্মতাপ্রাপ্ত—গুরু তাহাকে দ্বৈতাত্মক উপদেশ দেন; কিন্তু শিষ্য যদি নিয়ত-পরিণামী জগৎসম্বন্ধে সচেতন না থাকে, তাহা হইলে সে ব্রহ্ম, জীব ও জগতের ঐক্যানুভব করে। জাগতিক বা ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়রূপ উপাধিযুক্ত; কিন্তু অজাগতিক বা পারামার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্ম সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত।

হিন্দু ঐতিহ্যে ধর্ম ও দর্শন পরস্পরসামঞ্জস্য-হীন। ধর্মে অনুভূতির প্রাধান্য, দর্শনে প্রাধান্য

১৪ "মৃত্যোঃ স মৃত্যুং গচ্ছতি য ইহ নানেব পশ্যতি।"
(কঠোপনিষৎ, ২।১।১১)

১৫ "যং ভাবং দর্শয়েদ্‌যস্য তং ভাবং স তু পশ্যতি।
তং চাবতি স ভূত্বাসৌ তদ্‌গ্রহঃ সমুপৈতি তম্॥"
(মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-গৌড়পাদ-কারিকা, ২।২৯)

যুক্তির। ধর্মে চরম তত্ত্বকে বলে ঈশ্বর। এই ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা। যদিও বিভিন্ন ধর্ম ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে এই বিষয়ে একমত নয়, তথাপি সকলেই মনে করে যে, মানুষ ভগবৎসান্নিধ্য দ্বারা অজ্ঞাননির্মুক্ত হইয়া পরমানন্দ লাভ করে। ইহা বেদান্তেরও অভিপ্রেত। ধর্ম বলে, কেবলমাত্র মৃত্যুর পর স্বর্গে জীবনের শ্রেষ্ঠ ঈপ্সিত লাভ করা যায়। অবশ্য ভক্ত এই জীবনেই ভগবানের সান্নিধ্য-সুখ অনুভব করিতে পারেন। পূর্বেই বলা হইয়াছে, বহু ভারতীয় আচার্য বিদেহমুক্তি স্বীকার করিয়াছেন।

ধর্ম সাধনাঙ্গ হিসাবে বিশ্বাসের উপর জোর দেয়; ধর্ম ভগবৎপ্রাপ্তির পথে যুক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করে না, বরং যুক্তিকে নিন্দাই করে। এই বিশ্বাসৈকনিষ্ঠা বিশেষভাবে ভক্তিমার্গে লক্ষণীয়। এই পথে ভক্ত ভালবাসা দ্বারা সবিশেষ ভগবানের সহিত মিলিত হয়। উপনিষদ্‌ও বলেন, কেবলমাত্র যুক্তিদ্বারা, তর্কের সাহায্যে তত্ত্বে উপনীত হওয়া যায় না।[১৬]

বিচার ও বিশ্বাস চিন্তনরত মনের দুইটি বৃত্তি। দুইটি প্রায়ই পরস্পরের পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষানুভূতি বিশ্বাসের ব্যাপার হইতে পারে, কিন্তু এই অনুভবের যুক্তি-বিরোধী হওয়া উচিত নয়; ইহা যৌক্তিকতার সহিত অপরের নিকট উপস্থাপিত হইতে পারে। ধর্মে উচ্ছ্বাস-আবেগের প্রাধান্য; সুতরাং ধর্ম যদি যুক্তিপ্রধান দর্শন দ্বারা দৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে ইহা নিছক ভাবপ্রবণতায় পর্যবসিত হয়। ঠিক সেইরূপ ধর্মানুরাগ-বিহীন দর্শনও শুষ্ক বিচার-বিতর্কবহুল জ্ঞানচর্চায় নামিয়া আসিতে পারে। বিশ্বাস মুমুক্ষু মানবকে সত্যান্বেষণ-পথে নানা বিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার প্রেরণা দান করিয়া থাকে; আবার যুক্তিবিচার তাহাকে অন্ধকার সঙ্কীর্ণপথে লক্ষ্যহীন ভাবে বিঘূর্ণিত হইতে অথবা প্রাণহীন অবাস্তব লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হইতে বাধা প্রদান করে। স্বামী বিবেকানন্দ একবার বলিয়াছিলেন, ধর্মপথের পথিক একশত লোকের মধ্যে পঁচাত্তরটি লোক ভণ্ড, কপটাচার হইয়া দাঁড়ায়; কুড়িটি হয় অব্যবস্থিতচিত্ত; মাত্র পাঁচ জন ভগবদ্দর্শন লাভ করিতে পারে। বেদান্ত বিচার ও বিশ্বাস, দর্শন ও ধর্মের মধ্যে সামঞ্জস্য-সাধন করিয়াছে। এই জন্যই বেদান্ত মানুষের আধ্যাত্মিক প্রয়োজন মিটাইবার পক্ষে যথেষ্ট, এই জন্যই ইহা সর্বহিতকর—সর্বজনীন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রগতির সকল স্তরেই ধর্ম এবং দর্শন পরস্পরকে ত্রুটিহীন, ভ্রান্তিহীন করিয়াছে। যেমন, যখনই ধর্ম বাহিরের নাম-রূপ বা নিছক বাহ্য আচারে আবদ্ধ হইয়া সত্য-সম্বন্ধে মানুষের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, তখনই দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠা প্রতিবাদে আপন কণ্ঠস্বর উত্তোলিত করিয়াছে। উপনিষদ্, বুদ্ধ ও শঙ্করের বাণী ধর্মবিশ্বাসের সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে দার্শনিক যুক্তিনিষ্ঠার প্রতিবাদ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, লোক ধর্মস্থানে জন্মগ্রহণ করিতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে তাহার মৃত্যু হওয়া সঙ্গত নয়। বেদান্ত সত্যই বলেন, বুদ্ধ, খৃষ্ট ও কৃষ্ণ 'অহম্'-স্বরূপ অনন্ত-সচ্চিদানন্দ-সমুদ্রের ক্ষুদ্র কয়েকটি তরঙ্গ। উপনিষদ্ ও ভগবদ্গীতা বলেন, লক্ষ্যে পৌঁছিবার পর সাধক শাস্ত্র-প্রয়োজনের বাহিরে চলিয়া যান।[১৭]

১৬ "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া।" (কঠোপনিষৎ, ১।২।৯)

১৭ "অত্র⋯বেদা অবেদা⋯⋯(ভবন্তি)।"

(বৃহদারণ্যকোপনিষৎ, ৪।৩।২২)

"যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥" (গীতা, ২।৪৬)

আবার রামানুজ ও চৈতন্যের মত ভগবদ্-ভক্তের উপদেশ ধর্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে প্রাণহীন শুষ্ক বৈদান্তিক আলোচনার অন্তঃসারশূন্য বাগাড়ম্বর হইতে রক্ষা করিয়াছে। হিন্দু ঐতিহ্যে যথার্থ ধর্মপ্রাণ সাধু ব্যক্তি ও সত্যকার দার্শনিকের মধ্যে কোনই পার্থক্য নাই। শঙ্কর ও রামানুজ ভারতবর্ষে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ও দার্শনিক—উভয়রূপেই পূজিত।

ধর্মের সগুণ-সবিশেষ ঈশ্বর এবং বেদান্তের ব্রহ্ম মূলতঃ পৃথক্ বস্তু নন। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন জগৎকারণ-রূপে অভিহিত হন, তখনই তিনি ঈশ্বর, ভগবান্। যখন তিনি সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়-ব্যাপারে নিরত, তখন সগুণ-সবিশেষ-রূপে প্রতীয়মান হন। যখন সৃষ্ট্যাদি জগদ্-ব্যাপার-বর্জিত তখন ব্রহ্ম নির্বিশেষ, নির্গুণ। ব্রহ্মশক্তি মায়া ব্রহ্মেই অবস্থান করে; ইহার কোন স্বাধীন, পৃথক্ সত্তা নাই। অদ্বৈতবাদ ব্যাবহারিক বা আপেক্ষিক দৃষ্টিতে সগুণ ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকে; তাঁহাকে অন্যান্য সৃষ্ট্যাদি-শক্তিসম্পন্ন জীব হইতে বিলক্ষণ জ্ঞান করে। কিন্তু পারমার্থিক দৃষ্টিতে ব্রহ্মে সর্বপ্রকার ভেদ অপসৃত হইয়া যায়। মৃন্ময় সিংহ মৃন্ময় মূষিক হইতে বিলক্ষণ, যদিও মৃত্তিকাতে বিলয়প্রাপ্ত হইলে তাহারা একই। যখন কোন ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন, তখন ঈশ্বর, জীব ও জগৎ নির্বিশেষ ব্রহ্মসত্তায় একীভূত হইয়া যায়। আচার্য শঙ্করের মত পুরাদস্তুর অদ্বৈতবাদী পর্যন্ত দেবদেবীর উদ্দেশে প্রাণস্পর্শী স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। ভক্তি ও চিত্তের একাগ্রতা বৃদ্ধির নিমিত্ত সাধকগণের জন্য তিনি সগুণ ঈশ্বরোপাসনা সমর্থন করিয়াছেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

সাথী

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

দৃষ্টির অতীত হয়ে তুমি রহ সম্মুখে আমার,
আলোর ছায়ার মত—জীবনের জয়যাত্রা-পথে।
আশার প্রদীপ জ্বালি' আসে যবে অনন্ত আঁধার
জ্যোতির প্রভায় তুমি উদ্ভাসিত কর মনোরথে।

সৃষ্টির প্রথম হ'তে প্রলয়ের সমাপ্তি-রেখায়,
তোমার মঙ্গলধ্বনি নিত্যকাল উঠিছে রণিয়া।
ব্যর্থতার আর্তনাদে যুগান্তের গভীর-ব্যথায়,
উচ্ছ্বসি' উঠিলে প্রিয়, শান্ত কর অশান্ত এ হিয়া।

দিবসের আলো তুমি রজনীর স্তব্ধ অন্ধকার,
অসীম কালের গতি—যাত্রা তার তোমার ইঙ্গিতে।
অশ্রুর প্রবাহ তুমি, তুমি হাসি—রুদ্র-হাহাকার,
সৃষ্টির অপূর্ব রূপ হে সুন্দর তোমার সঙ্গীতে।

চিরন্তন কাল-স্রোতে ভেসে যাবে অনাগত দিন,
তুমি শুধু রবে সাথী—যাত্রা তব বিরাম-বিহীন।

স্বামী বিবেকানন্দ ও সক্রিয় বেদান্ত

শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর

[পাটনা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে স্বামিজীর জন্মোৎসব-উপলক্ষে বিহারের রাজ্যপাল কর্তৃক প্রদত্ত হিন্দী বক্তৃতার সার-সঙ্কলন। অনুবাদক—শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত]

বর্তমান ভারতে স্বামী বিবেকানন্দের নাম জানেন না এরূপ লোক যদি কেহ থাকেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য। স্বল্পায়ু হইলেও স্বামিজীর জীবন এত উদ্দীপনাদায়ক, কর্ম-ভূয়িষ্ঠ ও কৃতিত্বপূর্ণ ছিল যে ওইটুকু সময়ের মধ্যে এত কাজ তিনি কি করিয়া করিলেন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়।

যুগ-প্রয়োজনে ভারতে যে-সকল মহান্ ঋষি এবং সিদ্ধপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন বিবেকানন্দ নিঃসন্দেহে তাঁহাদের অন্যতম।

তাঁহার গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসই প্রথম বর্তমানের শিক্ষিত ভারতের বিবেককে দেশের অধ্যাত্ম-সম্পদের দিকে উদ্বুদ্ধ করেন। নিজেদের অবহেলিত অমূল্য ঐশ্বর্যের প্রতি তিনি দেশ-বাসীর চোখ খুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দও ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার প্রেরণা ও সংস্কারের জন্য পাশ্চাত্ত্য দেশসমূহের দিকেই দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন।

প্রথম জীবনে বিবেকানন্দ ছিলেন অজ্ঞেয়বাদী। তথাকথিত ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা ও হিন্দুধর্মের প্রতি তাঁহার তত অনুরাগ ছিল না। কিন্তু একবার শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য যাদুস্পর্শেই তাঁহার আবেগময়ী ও যোগনিষ্ঠা প্রকৃতি জাগ্রতা হইল এবং কালে তিনি একজন আশ্চর্য শক্তিশালী বেদান্ত-প্রচারক হইয়া উঠিলেন।

বিবেকানন্দের জীবনেও অনেক দুঃখকষ্ট, বিপর্যয় এবং নৈরাশ্য আসিয়াছিল। ফলে আমরা তাঁহাকে কন্যাকুমারীর নির্জন প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিঃসঙ্গ ও চিন্তামগ্ন অবস্থায় উপবিষ্ট থাকিতে দেখিতে পাই। তাঁহার নৈরাশ্য ছিল উষার প্রাক্কালীন অন্ধকারের মতো। কিন্তু হঠাৎ অরুণোদয় হইল। তিনি পাইলেন সম্মুখে অগ্রসর হইবার এবং বিদেশে ভারতীয় অধ্যাত্ম-বিদ্যার ও দর্শনের আলোক-বর্তিকা বহন করিবার প্রেরণা।

বিবেকানন্দই প্রতীচ্যে অধুনাতন প্রাচ্যের সর্বপ্রথম ধর্মপ্রচারক। তাঁহার পর হইতে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অনেক আশ্রম ও মঠ স্থাপিত হইতে লাগিল—ভারতের কৃতী সন্তানগণ অদ্যাবধি সেই বিজয়-পতাকা সগৌরবে উড্ডীন রাখিয়াছেন।

যে স্পন্দহীন ও কর্মবিমুখ আধ্যাত্মিকতা অন্য সব কিছুর প্রতি উদাসীন থাকিয়া কেবল নিজের ব্যক্তিগত মুক্তির অন্বেষণ করে, বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিকতা সেই আকৃতি লয় নাই। তাঁহার জীবন-লক্ষ্যে অবশ্য ইহাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু ঐ স্থানেই তিনি থামেন নাই।

তাঁহার আধ্যাত্মিকতা ভারতের দরিদ্র-নারায়ণগণের বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ সেবায় রূপ পরিগ্রহ করিয়া ছিল। মানুষের প্রতি কর্তব্য ভুলিয়া যাঁহারা শুধু নিজেদের মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল, তাঁহাদের উপর তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য ও রোগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে আধ্যাত্মিক শস্ত্রব্যতীত অন্যান্য কার্যকর লৌকিক উপায়ও অবলম্বন করিতে হইবে।

বিবেকানন্দের অগণিত রচনায় বেদান্তের অভীঃ-মন্ত্র এবং স্বদেশ-প্রেমের উদাত্ত আহ্বান ঝঙ্কৃত হইয়াছে—স্বদেশ-প্রেমিক সন্ন্যাসী তাঁহার মাতৃভূমিকে শুধু রাজনৈতিক দাসত্ব হইতে নহে, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য বন্ধন হইতেও মুক্ত করিবার জন্য ব্রতী হইয়াছিলেন। দেশমাতৃকার সেবায় যাঁহাদের বিন্দুমাত্র অনুরাগ আছে, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকটই স্বামিজীর বক্তৃতা ও রচনাবলী অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। রামকৃষ্ণ মিশন নামীয় যে বৃহৎ প্রতিষ্ঠান ভারতে ও বিদেশে সাত-আট শতের অধিক সন্ন্যাসি-কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে, তাহা ভারতের গৌরবময় ভবিষ্যৎ-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ যে উচ্চ আশা ও আদর্শ পোষণ করিতেন, তাহারই প্রতীক।

দৈব ও পুরুষকার

শ্রীদ্বারকানাথ দে, এম্‌-এ, বি-এল্‌

দৈব ও পুরুষকার লইয়া বিতর্ক এ পৃথিবীতে বহুকাল যাবৎ চলিয়াছে। দৈববাদিগণ পুরুষকারের উপর মোটেই গুরুত্ব প্রদান করেন না। তাঁহারা বলেন—"ন চ দৈবাৎ পরং বলম্‌", "ভাগ্যং (দৈবং) ফলতি সর্বত্র ন চ বিদ্যা ন পৌরুষম্‌"। পক্ষান্তরে পুরুষকারবাদিগণ দৈবকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন এবং বলেন যে, মানুষ তাহার নিজের ভাগ্য নিজেই গঠন করে। তাঁহাদের কথা—"উদ্‌যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীর্দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি"।

শব্দার্থ-মতে দৈব বলিতে বুঝায়—যাহা দেবতা কর্তৃক সংঘটিত। সময় সময় এমন সব ঘটনা ঘটিতে দেখা যায়, যাহা আমাদের একান্ত অপ্রত্যাশিত বা সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত। তখন আমরা ঐসবকে ঐশ্বরিক ব্যাপার মনে করি। ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের অভিজ্ঞতার অন্তর্গত। কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপারে নয়, জাতিগত ব্যাপারেও এরূপ অহরহ দৃষ্ট হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে স্পেনের যে বিখ্যাত ও বিশাল রণতরিবহর ইংলণ্ড আক্রমণে উদ্যত হইয়াছিল এবং যাহার ভয়ে ইংরেজজাতি সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, অকস্মাৎ উত্থিত প্রচণ্ড ঝটিকার ফলে উহা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। যে অপরাজেয় সমরবীর নেপোলিয়ন্‌ সমস্ত ইউরোপকে সামরিক বলে পদানত করিতে চলিয়াছিলেন, জনৈক সেনানায়কাধীনে পরিচালিত একটি প্রত্যাশিত সৈন্যবাহিনীর সময়মত আবির্ভাবের দৈবাধীন অসমর্থতা হেতু সেই পরাক্রান্ত বীর নেপোলিয়ন্‌ ওয়াটার্লু'র যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শেষে বিজিতের লাঞ্ছিত জীবন দীর্ঘকাল যাপনান্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরবিশ্বাসীর নিকট এই সকলে আশ্চর্যের কিছুই নাই, যেহেতু সমস্তই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাতে হয়—তাঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়, সম্ভবও অসম্ভবে পরিণত হয়। সাধারণ কথায় লোকে বলে 'রামের ইচ্ছা'। ঐশী শক্তির নিকট মানুষী শক্তি তুচ্ছ। যাঁহারা আধ্যাত্মিক পথের পথিক এবং ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে ভগবৎকৃপার উপর নির্ভরশীল। তাঁহার কৃপাই ভক্তের একমাত্র সম্বল, অন্য বল তাহার নাই। মহাপাপী দস্যু রত্নাকর তাঁহার কৃপায় বাল্মীকি মুনি।

দৈব-সম্পর্কে আমাদের উপরোক্ত আলোচনা ঈশ্বরীয় স্তরের। নিম্নে আমরা যুক্তির স্তরে বিষয়টি বিবেচনা করিব।

মানুষ যুক্তিবাদী। সে প্রত্যেক কার্যের ও ঘটনার পশ্চাতে কারণ অনুসন্ধান করে এবং যে পর্যন্ত সে কারণ আবিষ্কার করিতে না পারে, ততক্ষণ তাহার মন তৃপ্ত হয় না। এই কার্যকারণ-সম্বন্ধ বৈধ বা বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক, নতুবা তাহা যুক্তিবাদীর নিকট গ্রহণীয় নয়। আমরা যেখানে দৈবকে কোনও ঘটনার কারণ বলিয়া নির্দেশ করি, সেখানে যুক্তিবাদীর বিচারে উহা কারণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। সেজন্য দৈবকে 'অদৃষ্ট', 'ভাগ্য', 'অলৌকিক বা আকস্মিক সংঘটন' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে দৈব আমাদের প্রচলিত যুক্তিবাদের বহির্ভূত। কিন্তু তথাপি

দৈবকে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। অভিজ্ঞতা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাহার উদ্যম, চেষ্টা ও কর্ম অনেক সময় এক অজ্ঞাত ও অবোধ্য শক্তি ব্যাহত বা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে এবং ঐ প্রকার শক্তির প্রভাব হইতে সে কিছুতেই নিষ্কৃতি পাইতেছে না। আমরা ইহা অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, এ সংসারে কতিপয় লোক আজীবন মূক, বধির, অন্ধ, বিকলাঙ্গ ও আতুর হইয়া জীবনপাত করিতেছে। আবার সময় সময় দেখি যে, তুল্যবিদ্যা-জ্ঞানগুণবিশিষ্ট দুই ব্যক্তির মধ্যে সম চেষ্টা ও উদ্যম সত্ত্বেও একজন জীবনে প্রভূত সাফল্যলাভ করিয়াছেন, কিন্তু অপর জন জীবনে অকৃতকার্য ও ব্যর্থমনোরথ। এই প্রকার এবং অনুরূপ বহু দৃষ্টান্ত দেখিয়া শেষ পর্যন্ত আমরা দৈবকে কিরূপে অগ্রাহ্য করি? দৈবের সুসঙ্গত ব্যাখ্যা করিতে না পারিলেই ইহার অস্তিত্ব খণ্ডিত হয় না।

আমাদের হিন্দুশাস্ত্রকারগণ যুক্তিবাদের ভিত্তিতেই দৈবের ব্যাখ্যা করেন। তজ্জন্য তাঁহারা জন্মান্তর ও কর্মবাদের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রমতে জীব মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে এবং তাহার এক জন্মের কৃত ভালমন্দ কর্মের ফল কোনও কোনও স্থলে পরবর্তী জন্মে ভোগ করিতে হয়। একজন্মের কৃত কোনও কর্ম যখন পরবর্তী জন্মে ফলপ্রসূ হয়, তখন পূর্ববর্তী জন্মের সেই কর্মই পরবর্তী জন্মে দৈব বলিয়া কথিত হয়। "পূর্বজন্মকৃতং কর্ম তদ্দৈবমিতি উচ্যতে।" সুতরাং যাহা দৈব-নামে অভিহিত হয়, বস্তুতঃ তাহা পূর্ববর্তী জন্মের পুরুষকার ব্যতীত কিছুই নয়। এক জন্মের যাহা পুরুষকার তাহাই পরবর্তী জন্মে দৈব এবং একজন্মে যাহা দৈব তাহাই পূর্ববর্তী জন্মের পুরুষকার। এই মতানুসারে দৈব ও পুরুষকার প্রকৃতপক্ষে অভিন্ন এবং পরস্পর-অবিরোধী। ইহাতে যুক্তিবাদীর কার্যকারণ-সম্বন্ধবিধি সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; কেবল ইহার প্রয়োগের পরিধি একজন্মের মধ্যে সীমায়িত না রাখিয়া একাধিক জন্ম বিস্তারিত করা হইয়াছে। অবশ্য যাঁহারা জন্মান্তর বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকট উপরোক্ত সমাধান গ্রাহ্য নয়। তবে দৈবের অপর কোনরূপ সুসঙ্গত ব্যাখ্যা আমাদের অবিদিত।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, দৈবের যুক্তিমূলক ব্যাখ্যা সম্ভবপর না হইলেও ইহার অস্তিত্ব আমরা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। তবে কোন মতেই দৈবকে স্বীকার করার অর্থ পুরুষ-কারকে অস্বীকার বা খর্ব করা নয়। আমাদের মতে হিন্দুর জন্মান্তর ও কর্মবাদকে গ্রহণ না করিলেও মানবজীবনে দৈব এবং পুরুষকার উভয়ের স্থানই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন দৈববল, তেমনই পুরুষকার। পুরুষকার প্রত্যক্ষ, দৈব অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু উভয়ই বল এবং যাহাই বল তাহারই ক্রিয়া অবশ্যম্ভাবী। যদি কোনও ক্ষেত্রে দুইটি বল বিপরীতমুখী হয়, সে ক্ষেত্রে একের ক্রিয়ার অন্যের ক্রিয়াকে প্রতিহত বা ব্যাহত করার চেষ্টাই স্বাভাবিক। স্রোতের বিরুদ্ধে নৌকা চালাইতে গেলে নাবিকের হস্তবল এবং নদীর স্রোতের বল পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করে। এই ভাবে প্রত্যেক মানবের জীবনে দৈব ও পুরুষ-কারের ক্রিয়া যুগপৎ সর্বদা চলিতেছে। পুরুষকারকে ত্যাগ করিলে চলে না। মানব-সমাজের এত উন্নতি পুরুষকার ব্যতীত ঘটিত না। পুরুষকারকে সর্বান্তঃকরণে বরণ করিয়া লইতে হইবে। দৈবের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া উদ্যমের সহিত কর্ম করিয়া মানুষকে চলিতে হইবে। পুরুষকার ত্যাগ পূর্বক যাহারা দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে তাহারা কর্তব্যজ্ঞানহীন, অলস ও কাপুরুষ। চেষ্টা করিয়া অকৃতকার্য হইলে দোষ নাই, চেষ্টা না করাই দোষের। "যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি, কোঽত্র দোষঃ।" জীবনের সার্থকতা কর্মে, ফলে নয়। "কৃপণাঃ ফলহেতবঃ।"

বাল্মীকি-রামায়ণ

ডক্টর শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, এম্-এ, পিএইচ্-ডি

(১)

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত রামায়ণ-আখ্যান ভারতের সর্বত্র প্রচলিত। ইউরোপের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকের কাছে বাইবেলের আখ্যান যত পরিচিত রামায়ণ-বিষয়ে সাধারণ ভারতবাসীর পরিচয় তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী। "সীতারামকি জয়," এই বুলি সব সময়েই লোকের মুখে; এবং শব-বহনকালে "রামনাম সত্য হৈ," শব্দে চারিদিক কাঁপিয়া উঠে। যীশুখৃষ্ট কে ছিলেন, ইহার উত্তর পাশ্চাত্ত্য দেশের অশিক্ষিত লোক অনেকেই হয়ত কম জানে; কিন্তু রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, হনুমান, ভরত, সুগ্রীব, বিভীষণ, এমন কি কৈকেয়ীর নাম না জানে এমন ভারতবাসী খুঁজিয়া পাওয়া শক্ত হইবে।

প্রচলিত রামায়ণগুলিতে, বিশেষতঃ বাংলা ও হিন্দি রামায়ণে, যে কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে মূল রামায়ণের সহিত অনেক স্থলেই তাহার অমিল হইবে। রামায়ণ-মাত্রই বাল্মীকির গ্রন্থকে আশ্রয় করিয়া নিজের গৌরব প্রচার করে। কিন্তু প্রাদেশিক ভাষায় লিখিত রামায়ণসমূহ বাল্মীকি হইতে হাজার দুই বৎসরেরও বেশী ব্যবধানে রচিত। ইতোমধ্যে জনসাধারণের মন মূল রামায়ণের ঘটনাগুলিকে নানা রঙ-বেরঙ্ দিয়া নূতন করিয়া সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। এই নূতন সৃষ্টির বহু জিনিষ প্রচলিত রামায়ণে স্থান পাইয়াছে। সুতরাং বাল্মীকি-রামায়ণের সহিত কৃত্তিবাসের রামায়ণের তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাল্মীকির দেওয়া প্রাচীনকালের সামাজিক পরিবেষ্টনে বারো আনা অংশই বাংলা রামায়ণ হইতে একেবারে নির্বাসিত হইয়াছে; সজীব চরিত্রগুলি পরিবর্তিত হইয়া কাব্য-সুলভ মনোবৃত্তিতে গঠিত হইয়াছে; এবং ঘটনাসমূহের স্বাভাবিক বর্ণনা বহু অপ্রাকৃত আজগুবি কল্পনায় অতি-রঞ্জিত হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে। দুই চারিটি ঘটনার উল্লেখ করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট বুঝা যাইবে।

রামের জন্মের ষাট্ হাজার বৎসর পূর্বে রামায়ণ রচনা কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্পিত নহে। দস্যু রত্নাকরের ঋষিত্বলাভ ও রামের জন্মের বহু পূর্বে রামায়ণ-রচনা—কৃত্তিবাস বাল্মীকির পরবর্তী সংস্কৃতে রচিত রামায়ণগুলির অতিরঞ্জিত বর্ণনা হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। বাল্মীকিতে এমন কথা ত পাওয়া যাইবেই না বরং ঠিক ইহার উল্টা কথাই রহিয়াছে। রামায়ণ-গ্রন্থের আরম্ভই হইয়াছে এই বর্ণনা লইয়া—বাল্মীকি নিজের আশ্রমে বসিয়া নারদকে প্রশ্ন করিতেছেন, সম্প্রতি পৃথিবীতে এমন কোন ব্যক্তি আছেন যাঁহাতে বহুমুখীন নানা দুর্লভ গুণসমূহের একত্র সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যায়? উত্তরে নারদ অযোধ্যার রাজা ইক্ষ্বাকু-বংশীয় রামচন্দ্রের নাম করেন। রামচন্দ্র তখন কেবলমাত্র লঙ্কা হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং সীতার নির্বাসন তখনও হয় নাই। সীতার নির্বাসন এবং তাহার পরবর্তী ঘটনা-সকল বাল্মীকি নারদের নিকট শুনিতে পা'ন নাই এবং মহর্ষি তাঁহার গ্রন্থ প্রথমে সমাপ্তও করিয়াছিলেন অযোধ্যায় আসিয়া রামের রাজ্যপ্রাপ্তির সাথে সাথে। বাকী ঘটনাগুলি,

যাহা ইহার পরে এবং বাল্মীকির জীবিতকালেই ঘটিয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্পষ্টই উল্লেখ আছে যে—

অনাগতং চ যৎ কিঞ্চিদ্ রামস্য বসুধাতলে।
তচ্চকারোত্তরে কাব্যে বাল্মীকির্ভগবান্ ঋষিঃ॥

পৃথিবীতে রামের জীবনের অন্য যে সমস্ত ঘটনা তখনও ঘটে নাই, তাহা ভগবান বাল্মীকি ঋষি পরবর্তী অন্য একখানি কাব্যে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

অহল্যার পাষাণ হওয়ার কাহিনী এবং রামের পাদস্পর্শে তাহার স্বীয় দেহপ্রাপ্তি সমস্তই পরবর্তী কালের কল্পনা। বাল্মীকিতে আছে যে, অহল্যার স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের জন্য স্বামী গৌতম যখন তাঁহাকে চিরকালের জন্য ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলেন, তখন অহল্যা প্রাণস্পর্শী অনুতাপের সহিত স্বামীর নিকট কাঁদিয়া পড়িলে গৌতম আজ্ঞা করিলেন যে, অহল্যা যেন উপবাসে কৃশা হইয়া ভূমিশয্যায় একমনে তপস্যা করিতে থাকেন। পরে প্রথিতযশা রাজপুত্র স্বয়ং আসিয়া অহল্যার পাদবন্দনা করিলে তাঁহার পাপ চলিয়া যাইবে। রামচন্দ্রই নিজে আশ্রমে আসিয়া অহল্যার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন। "রাঘবৌ তু তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা" — রামলক্ষ্মণ হৃষ্টচিত্তে এই মনস্বিনীর পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম জানাইলেন। এই বর্ণনার কোথাও অহল্যার পাষাণে পরিণত হওয়ার কথা নাই, বরং তাহার বিপরীত কথাই আছে। রামচন্দ্র—

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।
লোকৈরপি সমাগম্য দুর্নিরীক্ষ্যাং সুরাসুরৈঃ॥
প্রযত্নান্নির্মিতাং ধাত্রা দিব্যাং মায়াময়ীমিব।
ধূমেনাভিপরীতাঙ্গীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
সতুষারাবৃতাং সাভ্রাং পূর্ণচন্দ্রপ্রভামিব।
মধ্যেঽম্ভসঃ দুরাধর্ষাং দীপ্তাং সূর্যপ্রভামিব॥

যাহাকে ধূমে পরিবৃত দীপ্ত অগ্নিশিখাস্বরূপা বলিয়া এভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহার দেহ আর যাহাই হউক জ্যোতিহীন মলিন পাষাণ হইয়া ছিল না।

(২)

ঘটনার বর্ণনায় ব্যতিক্রম অপেক্ষাও বেশী মারাত্মক হইয়াছে চরিত্রের মূল সুরের আমূল পরিবর্তন। ইহার ফলেই পূতচরিত্র ধর্মনিষ্ঠ দৃঢ়-সঙ্কল্প হনুমান্‌কে আমরা লেজবিশিষ্ট হাস্যরসাত্মক অপ্রাকৃত জন্তু বলিয়া মনে করিতে বাধ্য হইতেছি। যাহার প্রথম পরিচয়ে রামচন্দ্র বলিয়াছিলেন, "বহু ব্যাহরতানেন ন কিঞ্চিদ্ অপভষিতম্,"—অনেকক্ষণ ধরিয়া কথা বলা সত্ত্বেও অপভাষা বা অশিক্ষিতের ভাষা ইহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই,—সেই মারুতিকে আমরা জানি নিতান্ত শিক্ষাবিহীন কিম্ভূতকিমাকার এক জোয়ান জন্তু বলিয়া। রাবণের আলয়ে মদ্যপানে বিভোর অর্ধনগ্না স্ত্রীসমূহ দর্শন করিয়া যাহার মনে ভয়ের উদয় হইয়াছিল, পাছে পাপ তাহাকে স্পর্শ করে, সেই হনুমানের যে কোনও মার্জিত রুচি থাকিতে পারে, কৃত্তিবাস পড়িয়া তাহা আমাদের মনেও আসে না। আমরা জানি মাত্র তাহার লেজের বহর ও লঙ্কাদাহরূপ গোঁয়ারতমি।

যে রামচন্দ্র কৃত্তিবাসে সাক্ষাৎ ভগবান্, বাল্মীকি কিন্তু তাঁহার নিন্দার্হ কাজগুলির বিরুদ্ধে শক্ত মন্তব্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, চোরের মতন আসিয়া বালিবধ ও সীতার প্রতি সর্বসমক্ষে অনার্যোচিত বর্বর ভাষার প্রয়োগ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাল্মীকি বলিয়াছেন, "অমৃষ্যমাণা তং সীতা বিবেশ জ্বলনং সতী"—সতী সীতাদেবী সেই পরুষ উক্তি ক্ষমা না করিয়া আগুনে প্রবেশ করিলেন। রামচরিত্র নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও মহৎ। এই মহত্ত্বের আস্বাদ হইতে আমরা বঞ্চিত হই, যখন বাংলা রামায়ণে আমরা পূর্ণ অবতার ভাবে তাঁহাকে পূজিত হইতে

দেখি। সমগ্র রামায়ণ বইখানিতে বহু চরিত্রের বহু অসংগতি বর্ণিত হইয়াছে। এই সমস্ত অসংগতি লইয়াই চরিত্রগুলি জীবন্ত। বাংলা রামায়ণে সমস্তই যেন ব্যক্তিত্বশূন্য কবিত্বের শোভনতায় আবৃত।

(৩)

বাল্মীকি-রামায়ণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু পারিপার্শ্বিক ঘটনার উল্লেখ থাকাতে প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি বুঝিতে আমরা অনেক সাহায্য পাই। কৈকেয়ীকে বিবাহ করার সময় দশরথকে প্রতিশ্রুতি দিতে হইয়াছিল, এই দ্বিতীয় বিবাহের মহিষীও রাণীর সমস্ত সম্মান পাইবেন এবং তাঁহার গর্ভ-জাত সন্তানের সমান অধিকার থাকিবে কৌশল্যার সন্তানের মতই সিংহাসন-প্রাপ্তির। সুমিত্রা বা অন্য-কোন রাজপত্নীর সন্তানের সিংহাসনে বসিবার কোন অধিকারই ছিল না।

মন্থরার কথা বর্ণনা করিতে গিয়া বাল্মীকি বলিয়াছেন, "জ্ঞাতিদাসী যতো জাতা সহোঢ়া পরিচারিকা,"—তিনি কৈকেয়ীর জ্ঞাতিবংশীয়া, দাসী বা পরিচারিকা-পদবাচ্যা এবং কৈকেয়ীর সাথে একসঙ্গে দশরথের সহিত বিবাহিতা। কথাগুলি সেকালের রাজপরিবারের গঠন-সম্বন্ধে বেশ কিছু ধারণা জন্মায়। কোন রাজকন্যার সহিত রাজা বা রাজপুত্রের বিবাহের সময় রাজকন্যার সহচরী অন্যান্য অনেক কন্যাও একই মন্ত্রে রাজার হস্তে সমর্পিতা হইতেন। ইঁহারা বিবাহের পর রাণী আখ্যা পাইতেন না, পরিচারিকা বলিয়া পরিচিত হইতেন এবং তাঁহাদের সখী রাজমহিষীর নিকট সহচরী অথবা অনেকক্ষেত্রে দাসীর মতন ব্যবহার পাইতেন। এ প্রথা অতি আধুনিক সময়ে দেশীয় রাজাদের মধ্যেও প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই অনুসরণে রাজপুতানার এক মহারাজার ২৫৩ জন স্ত্রীর কথা জানিতে পারি। মহারাজ দশরথেরও স্ত্রী সংখ্যা ছিল ৩৫০। ইহাদের মধ্যে তিনজন ব্যতীত আর প্রায় সকলেই ছিলেন এই পরিচারিকার পদে। কেবল কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা মহিষী-পদবাচ্যা ছিলেন। মন্থরা এই নামটিও বাংলা রামায়ণের প্রচলিত সংস্করণগুলি হইতে অন্তর্ধান করিয়াছে। সে কুব্জা বা কুঁজা ছিল বলিয়া কুব্জা-নামেই ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কুব্জা এবং বামনিকাদিগকে অনেকসময় আগ্রহ করিয়া রাজান্তঃপুরে স্থান দেওয়া হইত; ইহারা অন্তঃপুরের শোভাসম্পদ বৃদ্ধি করিত, ময়ূর সারিকা প্রভৃতি পাখীদের সাথে একত্রে।

লঙ্কায় রাবণের পুরীর যে বর্ণনা আছে তাহাতেও আমরা মনে করিতে বাধ্য হই যে, আমরা কোন পরাক্রান্ত রাজার রাজধানীতে আসিয়াছি। লঙ্কাদ্বীপের অনেকগুলি পাহাড়ের মধ্যে একটির শীর্ষদেশ কাটিয়া ফেলিয়া তাহার মধ্যদেশকে এক বিস্তৃত সমভূমিতে পরিণত করা হইয়াছিল। পর্বতনিম্ন হইতে এই সমভূমিতে উঠিতে অনেকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া আসিতে হয়। এই উচ্চভূমিতে প্রাচীর-বেষ্টিত গর্বিতা লঙ্কাপুরী। প্রাচীরের বহির্ভাগে প্রশস্ত পরিখা, জলে পূর্ণ। তাহার উপর দিয়া "যন্ত্রচালিত সেতু" বা বৃহৎ চারিটি draw bridge ছিল, পুরীর প্রধান চারিটি দ্বারের সহিত সংলগ্ন। কোন শত্রু এই সেতুর উপর উঠিলে যন্ত্রবলে তাহাকে জলের মধ্যে তৎক্ষণাৎ পতিত করা হইত।

প্রত্যুত বানর ও রাক্ষস বলিয়া যাহাদের উল্লেখ আছে, তাহারা কাল্পনিক জীবজন্তু নহে। আর্যাবর্তে যে সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা গৌরবর্ণ আর্য ও কৃষ্ণকায় অশিক্ষিত অনার্যদিগের সমবায়ে গঠিত। ইহাদের মধ্যে রক্তের সংস্রবও

যথেষ্টই ঘটিয়া থাকা স্বাভাবিক। রামের গায়ের রঙ বর্ণনা করিতে গিয়া বাল্মীকি তাঁহাকে বলিয়াছেন "রামমিন্দীবরশ্যামম্"—নীলপদ্মের মত শ্যামল আভাযুক্ত; কিন্তু লক্ষ্মণকে বলিয়াছেন "সুবর্ণ-চ্ছবি"। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ছাড়া এরূপ বর্ণ-বৈষম্য সম্ভব হয় না। এই আর্য-অনার্য-মিশ্রণে গঠিত সমাজকে বলা হইত মানব-সমাজ—মনুর বিধান মানিয়া যাহারা জীবন-যাপন করিত। এই সমাজের লোকদের বলা হইত, মানব, নর, মানুষ ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত এই সমাজ হইতে নিতান্ত আলাদা-ভাবে যে সমস্ত জাতি ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে ছড়াইয়া ছিল, তাহাদিগকে আখ্যা দেওয়া হইত অসুর, রাক্ষস, বানর, পাখী, ভল্লুক, গোলাঙ্গুল, কিন্নর, হয়মুন বলিয়া। এগুলি সমস্তই আলাদা আলাদা জাতি; পশু নয়, মানব-সমাজের বাহিরের মানুষ। মানব বা আর্যসমাজের মানুষদের অপেক্ষা ইহাদের মধ্যে কোন কোন জাতি বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতায় অনেক উন্নত ছিলেন, বিশেষ করিয়া রাক্ষস ও অসুরগণ। অসুর-সভ্যতা বা Assyrian civilization-এর নিদর্শন আমরা আজও দেখিতে পাইয়াছি হরপ্পা এবং মহেন্জো-দারোর ধ্বংসাবশেষে, যাহা বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া মাটির নীচে লুক্কায়িত ছিল।

একথা স্মরণ রাখিলে বাল্মীকি-রামায়ণের ঘটনাগুলি বুঝিতে পারা সহজ হইবে। রাবণের রাজধানী ছিল লঙ্কায়, এবং দক্ষিণ ভারতের বহুস্থলে তাহার প্রতাপ বা military establishments ছিল। জনস্থান বা বর্তমান নাসিকের নিকটবর্তী এমন একটা ফাঁড়িতে চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসসৈন্য মোতায়েন থাকিত। বিন্ধ্য পর্বতের সমস্তটা অংশ জুড়িয়াই ছিল রাবণের প্রভাব। তাহার অনুচরগণ মধ্যে মধ্যে মানবসমাজের মধ্যে আসিয়াও উৎপীড়ন চালাইত; মারীচ ও সুবাহু যেমন বিশ্বামিত্রের যজ্ঞের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়াছিল। সভ্যতার অতি নিম্নস্তরে অবস্থিত দাক্ষিণাত্যের আদিম অধিবাসীদিগের উপর রাবণের আক্রোশ ততটা ছিল না যতটা ছিল মানবসমাজের প্রতি, কারণ 'আর্য' বা মানব-জাতিই ছিল রাক্ষসদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী। সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের অসুরদিগের সহিত রাক্ষসদিগের অবন্ধুতা ছিল না। আর্যসভ্যতা তখনও আর্যাবর্ত ছাড়িয়া দক্ষিণে বেশীদূর অগ্রসর হয় নাই। প্রয়াগ বা এলাহাবাদের দক্ষিণেই অরণ্য। প্রয়াগ হইতে রামেশ্বর পর্যন্ত কুত্রাপি কোন আর্যজনপদের উল্লেখ রামায়ণে নাই। অরণ্যের মধ্যে বহু মানবেতর জাতি দলবদ্ধ ভাবে বাস করিত। কিন্তু আর্যনিবাসের মধ্যে আমরা শুধু দেখি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মুনি-ঋষিদের আশ্রম। রাক্ষসেরা সাধারণতঃ ইহাদের কোনও ক্ষতি করিত না, কিন্তু আর্যদিগের সহিত কোন কারণে বিবাদ বাধিলে অথবা এই ঋষিদের পেছনে কোনও ক্ষত্রশক্তি রহিয়াছে জানিতে পারিলে তাহারা মুনিদিগকে সংহার না করিয়া ছাড়িত না। এই জন্যই বহু ঋষি ভয়ে রামের সান্নিধ্য ত্যাগ করিয়াছিলেন, কারণ রাম হইতে রাক্ষসদের ভয়ের সম্ভাবনা ছিল।

(৪)

আর্ষ-রামায়ণে আজগুবির স্থান খুব বেশী নাই। সহজ সরল ভাবে ঘটনার স্রোত নানা বিচিত্র ভঙ্গীতে চলিয়া আসিয়াছে। প্রকৃত ও অপ্রকৃতের একটা খিচুড়ী পাকাইয়া পরবর্তী কালে রামায়ণের আখ্যান-ভাগের যে পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে তাহার জন্য দায়ী বাল্মীকি নহেন।

বর্তমানে প্রচলিত বাল্মীকি-রামায়ণে কিন্তু অনেক আজগুবি কাণ্ডের বর্ণনা পাওয়া যাইবে। ইহার প্রধান কারণই রামায়ণের প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি। অবশ্য মহাভারতের মত রামায়ণে অত

বেশী প্রক্ষেপ নাই। মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশের চাপে মূল আখ্যান অনেকস্থলেই খুঁজিয়া পাওয়া ভার। রামায়ণে কিন্তু মূল অংশ অনেকস্থলে অমিশ্রিত অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যাকাণ্ডের ন্যূনাধিক ছয় হাজার শ্লোকের মধ্যে ছয়টি প্রক্ষিপ্ত শ্লোকও খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত হইবে। সমস্তটা যেন একই প্রেরণায় লেখা, একই যুগের রচনা এবং একটানা ভাষার স্রোতে ঘটনাগুলি প্রবাহিত। সুন্দরকাণ্ডে ও যুদ্ধকাণ্ডে প্রক্ষেপ রহিয়াছে, তবে খুব বেশী নয়। কিন্তু বালকাণ্ড বা আদিকাণ্ডের অন্ততঃ ½ অংশ প্রক্ষিপ্ত এবং উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষেপের মাত্রা আরও বেশী। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে কতকগুলি সর্গ একসঙ্গে প্রক্ষিপ্ত, অরণ্যকাণ্ডেও তাহাই। কিন্তু এই দুই কাণ্ডে মূল আখ্যান-সূত্র ধরিতে কোন কষ্ট পাইতে হয় না, যেমন হয় বালকাণ্ডে ও উত্তরকাণ্ডে। ফলতঃ কাব্যের এই প্রথম ও শেষ ভাগে বাল্মীকির রচনা যে কতখানি তাহাতেই যথেষ্ট সন্দেহ হয়। কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ হয়ত অনেক প্রাচীন, কিন্তু তাহা যে মূল রামায়ণের মধ্যে প্রক্ষেপ-মাত্র তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঘটনার অসামঞ্জস্যে ও ভাষার বিভিন্নতায় এবং যতটুকু আজগুবি কাহিনী তাহার পৌনে ষোল আনাই এই সমস্ত প্রক্ষিপ্ত অংশে। জনকপুরে রাম যে ধনু ভগ্ন করেন, তাহা লইয়া শিব ও ইন্দ্রে বিবাদ, ইন্দ্রের পাপ ও তাহার অদ্ভুত শাস্তি, বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের অতিদীর্ঘ বিবাদ-বর্ণনা, বানরদিগের সীতান্বেষণের নিমিত্ত যবদ্বীপ বলিদ্বীপ প্রভৃতি নানান রাজ্য বিচরণ, এ সমস্তই শুধু অপ্রাকৃত নহে, ঘটনার বর্ণনায় নিতান্ত অনাবশ্যক।

এই প্রক্ষিপ্ত অংশের রামায়ণে প্রবেশ কোন সময়ের? কিছু হয়ত খৃষ্ট-জন্মের অনেক পরের, কিন্তু কতকগুলি প্রক্ষিপ্ত অংশ যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। অযোধ্যা হইতে মিথিলা পর্যন্ত বিশ্বামিত্রের সহিত রামলক্ষ্মণের পথভ্রমণের বর্ণনায় বহু আজগুবি বর্ণনার মধ্যেও একটা কথা প্রতিভাত হয়। শোণনদীর তীর ধরিয়া বিশ্বামিত্র রামলক্ষ্মণকে লইয়া যখন গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পৌছিলেন, তখন তাঁহারা পাটলিপুত্র নগর দেখিতে পান নাই, অথচ ইহার পূর্বে মগধের রাজধানী পঞ্চগিরির মধ্যস্থ গিরিব্রজের বর্ণনা রহিয়াছে এবং গঙ্গা পার হওয়ার পরেই বৈশালী নগরীর উল্লেখ আছে। এ দুইটি নগরীর একটিও রামায়ণের যুগে ছিল কিনা সন্দেহ। ইহাদের বর্ণনার সাথে পাটলিপুত্রের বর্ণনা জুড়িয়া দিতে কি দোষ ছিল? ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, পাটলিপুত্রের সৃষ্টিই হইয়াছে বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর সময়ে এবং ইহা একটি মহানগরীতে পরিণত হইয়াছে তাহারও পরে। রামায়ণের এই প্রক্ষিপ্ত অংশ রচিত হইয়াছে হয় অজাতশত্রুর পূর্বে (যাহার সম্ভাবনা খুব বেশী নয়) নতুবা অন্ততঃ এমন সময় যখন পর্যন্ত পাটলিপুত্রের অতি আধুনিকত্ব-সম্বন্ধে সাধারণ লোকের জ্ঞান খুব বেশী রকমে বিদ্যমান ছিল। যবদ্বীপ প্রভৃতির বর্ণনাও সম্ভবতঃ খৃষ্টীয় প্রথম কি দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রক্ষেপ। অধিকাংশ প্রক্ষিপ্ত বর্ণনাই সম্ভবতঃ এই সময়ের হইবে।

(৫)

কিন্তু একথা বলা চলিবে না যে, আর্ষ-রামায়ণের মূল অংশে ঘটনার বর্ণনা সম্পূর্ণ যথাযথ, এবং ইহাতে অপ্রাকৃতের স্থান নাই। রামায়ণ বইখানিকে আমরা বর্তমানে যে আকারে পাইতেছি, তাহা বাল্মীকির সময় হইতে অনেক পরবর্তী কালের ভাষায় লিখিত বাল্মীকির সময় ভাষার যে কি রূপ ছিল তাহা একটি মাত্র শ্লোক হইতে আমরা জানিতে পাই—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

উহার ছন্দ অনুষ্টুপ্ হইলেও বৈদিক, কারণ প্রথম পঙ্‌ক্তির ষোলটি অক্ষর একসাথে পড়িয়া যাইতে হয়, অষ্টম অক্ষরের পর না থামিয়া; অবধীঃ ও অগমঃ এই দুই ক্রিয়াপদ বৈদিক, পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্যে ইহার প্রয়োগ কম, এবং শাশ্বতীঃ সমাঃ এই কথাটির বাক্যমধ্যে সংযোগ পরবর্তী সংস্কৃত প্রয়োগ হইতে কিছু আলাদা বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু অযোধ্যাকাণ্ডের (যাহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ প্রায় নাই বলিলেই চলে) যে কোন শ্লোক পরবর্তী কালের সংস্কৃতভাষার সৌষ্ঠবেই রচিত। উদাহরণ স্বরূপ একটি শ্লোক দেওয়া যাইতেছে—

তত্রাপি নিবসন্তৌ তৌ তর্প্যমানৌ চ কামতঃ।
ভ্রাতরৌ স্মরতাং বীরৌ বৃদ্ধং দশরথং নৃপম্॥

[সেই (কেকয়রাজ্যে) সর্বসুখে লালিত হইয়া নিবাস করার সময়েও (ভরত ও শত্রুঘ্ন) দুই বীর ভ্রাতা (রাম ও লক্ষ্মণের) কথা স্মরণ করিতেন এবং (বিশেষ করিয়া) বৃদ্ধ রাজা (পিতা) দশরথের কথা]

দুইটি শ্লোকের ভাষাগত অসাদৃশ্য অতি স্পষ্ট। বাল্মীকির অর্ধবৈদিক ভাষা এই ভাবে পুরোপুরি সংস্কৃতে পরিণত হইতে বহু শতাব্দী পার হইয়াছে। রামায়ণ-কাব্য মুখে মুখে চলিয়া আসাতে ক্রমে ক্রমে ভাষার এই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ভাষার পরিবর্তনের সাথে ঘটনার বর্ণনা ও লোকের কল্পনাও কিছু পরিবর্তিত না হইয়া যায় নাই। সুতরাং সাধারণ লোকের কল্পনার মধ্য দিয়া অনেক কিছুই আমরা বর্তমানের মূল অংশে পাই যাহার জন্য বাল্মীকি হয়ত আদৌ দায়ী নহেন।

তথাপি একথা সত্য যে, পরিবর্তিত মূল অংশও অতি প্রাচীন এবং আমরা আর্ষ রামায়ণ বলিতে ইহাকেই বুঝিব। ইহার মধ্যেই আরও অনেক পরে প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি যোজিত হইয়াছে। এই মূল অংশে অপ্রাকৃত কল্পনা অনেক কিছু থাকিলেও একটু সতর্ক দৃষ্টিতে দেখিলেই বাল্মীকির আদি রচনায় কি ছিল তাহা ধরিতে পারা শক্ত হয় না। বাল্মীকি হনুমান্‌কে অতি শোভন চরিত্র পুরুষশ্রেষ্ঠ বলিয়াই বর্ণনা করিয়াছিলেন। মূলে যদি কোথাও তাহার লেজের উল্লেখ থাকে (খুব কমই আছে) তাহা বাদ দিয়া হনুমানের স্বরূপ উপলব্ধি করা আমাদের পক্ষে শক্ত হইবে না। এই ভাবে নানা বিভিন্ন অংশে কিছু কিছু পরবর্তী কালের কল্পনার প্রসারকে ক্ষমার চক্ষে দেখিয়া মূল ঘটনার অনুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, আধুনিক স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত অংশগুলি বাদ দিলে মূল রামায়ণ বলিয়া যাহা গ্রহণযোগ্য তাহার প্রায় শতকরা ৯৫ অংশই আসিয়াছে বাল্মীকির রচনা হইতে—সেই বর্ণনা, সেই শ্লোক, সেই বাক্যযোজনা; শুধু কালের পরিবর্তনে ব্যাকরণগত পরিবর্তন কিছু কিছু সাধিত হইয়াছে। এই মূল অংশকেই আমরা সমাদর করিতে বাধ্য এবং ইহাতে যে ঘটনার স্রোত প্রবাহিত হইতে দেখি, তাহারই রসাস্বাদে আমাদের সাহিত্যে তৃপ্তি এবং জীবনের আদর্শ পূর্ণতা লাভ করে। এই মূল অংশ কখন বর্তমান রূপ ধারণ করিয়াছে তাহার আলোচনা সম্ভব হইলে পরে করা যাইবে।

ভগবান্ মহাবীর

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

জৈনধর্মের সংস্থাপক ও প্রবর্তকগণকে তীর্থঙ্কর বলে। এইরূপ তীর্থঙ্কর চতুর্বিংশতি জন হইয়াছেন। তাঁহারা সময়ে সময়ে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম ও সংঘ প্রবর্তন, নিয়মন ও পরিচালন করিয়া গিয়াছেন। জৈন-মতে একজন তীর্থঙ্করের আবির্ভাবের পর যে পর্যন্ত অন্য আর একজন আবির্ভূত না হন, সে পর্যন্ত প্রথম আবির্ভূত তীর্থঙ্করের শাসন বলবৎ থাকে, অর্থাৎ তাঁহার প্রবর্তিত ধর্ম ও নিয়ম প্রচলিত থাকে। বর্তমানে চলিতেছে ভগবান্ মহাবীরের শাসন।

খৃঃ পূঃ ৫৯৯ অব্দে চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বিদেহ জনপদের তদানীন্তন রাজধানী বৈশালীর নিকটবর্তী ক্ষত্রিয়-কুণ্ডপুরে মহাবীর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা 'জ্ঞাত'-নামক ক্ষত্রিয়-বংশের অধিনায়ক সিদ্ধার্থ ও মাতা রাজ্ঞী ত্রিশলা। ত্রিশলা বৈশালীগণতন্ত্রের মুখ্যাধিপতি মহারাজ চেটকের ভগ্নী ছিলেন। মহাবীরের পিতৃদত্ত নাম 'বর্ধমান'। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম নন্দিবর্ধন। কুমার বর্ধমানের বয়ঃক্রম যখন ২৮ বৎসর, তখন তাঁহার পিতামাতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। তিনি তখনই বৈরাগ্যের প্রেরণায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে উদ্যত হন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার আগ্রহে আরও দুই বৎসর গৃহে থাকিয়া যান। অতঃপর ত্রিশ বৎসর বয়সে মার্গশীর্ষ মাসের কৃষ্ণা দশমী তিথিতে ধন, সম্পত্তি, গৃহ, পরিবার প্রভৃতি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া নিজহস্তে শ্রমণদীক্ষা গ্রহণ পূর্বক মাত্র একটি দিব্যবস্ত্র স্কন্ধে ধারণ করিয়া একাকী নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

অভিনিষ্ক্রমণের সময় তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল আজ হইতে সমগ্র জীবন প্রাণীর প্রতি সমভাব অবলম্বন করিব এবং মন, বচন ও কায়ের দ্বারা কোনও প্রকার পাপজনক আচরণ করিব না, অন্যের দ্বারা করাইব না বা অন্য কেহ তদ্রূপ আচরণ করিলে তাহা অনুমোদন করিব না। অনন্তর দীক্ষা-গ্রহণান্তে আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ-সাধন করিয়া জীবন্মুক্তি-লাভের জন্য কুমার বর্ধমান কঠোর সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। সম্পূর্ণ রিক্ত ও নগ্নাবস্থায় তিনি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, নগর হইতে নগরান্তরে, প্রান্তরে, শ্মশানে, বনে পদব্রজে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। সূর্যের প্রচণ্ড উত্তাপ বা উৎকট শীত, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব, নানাপ্রকার শারীরিক নির্যাতন তাঁহাকে বিন্দুমাত্রও বিচলিত করিতে পারিত না। দেহাত্মবোধ তাঁহার সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়াছিল; ঘৃণা, লজ্জা, ভয়কে তিনি জয় করিয়াছিলেন। উপকার-অপকার, সুখ-দুঃখ, জীবন-মৃত্যু, আদর-অপমান প্রভৃতিতে সম্পূর্ণ সমভাব অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, স্তাবক ও নির্যাতক—উভয়েই তাঁহার চক্ষে সমভাবে দৃষ্ট হইত। মৌনাবলম্বন পূর্বক ধীরপদবিক্ষেপে ভূমি-সংলগ্ন-দৃষ্টি লইয়া তিনি পরিব্রজন করিতেন। শূন্য ও পরিত্যক্ত গৃহে, শ্মশানে, উদ্যানে বা বৃক্ষতলই ছিল তাহার আবাস, এমন কি দণ্ডায়মানাবস্থায়ই তিনি ধ্যানে লীন থাকিতেন। নিদ্রাকে জয় করিয়া সমস্ত রজনী তাঁহার ধ্যানে কাটিত। রাঢ়দেশ হইতে পশ্চিমে অঙ্গ, মগধ, বিদেহ, কাশী, কোশল প্রভৃতি উত্তর ভারতের জনপদ-সমূহে তিনি পরিব্রজন করিয়াছিলেন।

পর্যটনের সময় স্থানে স্থানে তাঁহার প্রতি যেরূপ ভীষণ নির্যাতন করা হইয়াছিল, তাহার বিবরণ পাঠ করিলে সত্যই রোমহর্ষণ হয়, কিন্তু তিনি সমস্তই অবিচলিত চিত্তে সহ্য করিতেন। অবশেষে ঘোরতর তপস্যা ও অসীম কষ্ট-সহিষ্ণুতার জন্য তিনি মহাবীর-আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

এইরূপে সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরাধিক কাল কঠোর সাধনায় অতিবাহিত করিয়া বৈশাখ-মাসের শুক্লপক্ষের পুণ্য দশমী তিথিতে মহাবীর কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন, যাহার আলোকে সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সমুদয় পদার্থ প্রকৃত স্বরূপে তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া উঠিল। তিনি অর্হৎ, জিন, কেবলী, সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হইলেন।

এইবার মহাবীরের তীর্থঙ্কর-জীবনের আরম্ভ। সাধক-অবস্থায় তিনি কোনও রূপ উপদেশ-প্রদান বা ধর্মপ্রচার করেন নাই। এখন তিনি ধর্ম-প্রচার ও সংঘস্থাপন করিতে সচেষ্ট হইলেন। প্রথমেই তিনি আপাতদৃষ্টি-বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত বেদবাক্যের সমন্বয়াত্মক ও নবীন অর্থ করিয়া ইন্দ্রভূতি, গৌতম প্রমুখ একাদশ জন বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী প্রগাঢ় বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণকে দীক্ষা-প্রদান পূর্বক নির্গ্রন্থ সাধু-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই একাদশ জন আচার্য সাধু-সংঘের নেতা বা গণধর-পদে স্থাপিত হইলেন। এই একাদশ জনের শিষ্যসংখ্যা ছিল—৪৪০০ জন। তাঁহারাও তাঁহাদের আচার্যগণের সহিত দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এই সময়েই স্ত্রীগণকে দীক্ষা প্রদান করিয়া সাধ্বী-সংঘের এবং গৃহস্থ পুরুষ ও স্ত্রীগণকে ব্রত ধারণ করাইয়া শ্রাবক ও শ্রাবিকা-সংঘেরও প্রতিষ্ঠা হইল। অতঃপর সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক ও শ্রাবিকারূপ চতুর্বিধ সংঘের প্রবর্তন করিয়া ভগবান্ মহাবীর ধর্মপ্রচার করিতে লাগিলেন।

মহাবীর সাধুগণের জন্য অহিংসা, সত্য, অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ এই পঞ্চ মহাব্রত পালন করিবার নিয়ম প্রণয়ন করিলেন, প্রত্যেক সাধুকে মন, বচন ও কায়ের দ্বারা উক্ত পাঁচটি মহাব্রত সম্পূর্ণরূপে পালন করিতে হইবে। কোনও সাধু কোনও প্রকার হিংসা, অসত্য, চৌর্য, অব্রহ্মচর্য-সেবন ও ধনধান্যাদিরূপ পরিগ্রহ গ্রহণ বা সঞ্চয় স্বয়ং করিতে পারিবেন না, অন্য কোন ব্যক্তির দ্বারা করাইতে বা অন্য কেহ তদ্রূপ করিলে তাহা অনুমোদন পর্যন্ত করিতে পারিবেন না। সাধ্বী-গণকেও সাধুর অনুরূপ সমস্ত নিয়ম পালন করিতে হইবে। গৃহস্থগণের পক্ষে এইরূপ মহাব্রত সম্পূর্ণরূপে পালন করা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাদের জন্য অহিংসাদি ব্রত আংশিক রূপে ও সীমাবদ্ধভাবে পালন করিবার নিয়ম প্রবর্তন করা হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮ তম জন্মোৎসব—বেলুড়মঠে তিথিপূজা ও সাধারণ উৎসবের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারেও যথারীতি ভাবগম্ভীর পরিবেশে প্রচুর আনন্দ, কর্মপ্রাণতা এবং উৎসাহমুখর উদ্দীপনার মধ্যে নিষ্পন্ন হইয়াছে। তিথিপূজা-দিবস ছিল ৩রা ফাল্গুন, রবিবার। সাধারণ উৎসব হইয়াছিল ১০ই ফাল্গুন—পরবর্তী রবিবারে। ৩রা ফাল্গুন ভোর রাত্রি হইতেই উৎসবের এক-টানা কর্মসূচী আরম্ভ হয়—মঙ্গলারতি, বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পূজা-হোমাদি, ভজন, চণ্ডীপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ

ও ব্যাখ্যান এবং লীলা- ও কালীকীর্তন প্রভৃতি। বহুসহস্র ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হইয়াছিল। আনুমানিক ৭৫,০০০ সমুৎসুক ধর্মপ্রাণ নরনারীর একত্র সমাবেশ এবং প্রত্যূষ হইতে রাত্রি পর্যন্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে ভক্তিবিনতভাবে তাঁহাদের অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দানের দৃশ্য ছিল সত্যই অপরূপ। অপরাহ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত জনসভায় সভাপতি ছিলেন কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায়। অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ সুচিন্তিত ভাষণ দেন।

রাত্রে যথাবিধি কালীপূজা ও হোম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। শেষরাত্রে মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ ১৪ জন ব্রহ্মচারীকে সন্ন্যাস এবং ২৪ জন ব্রতীকে ব্রহ্মচর্যদীক্ষা-দানে ধন্য করেন।

সাধারণ উৎসবের দিন মন্দিরের পূর্বদিকের প্রাঙ্গণে সাময়িক ভাবে নির্মিত সুসজ্জিত মণ্ডপে শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি সুবৃহৎ তৈলচিত্র ও ব্যবহার্য জিনিষপত্র সজ্জিত রাখা হয়। ঐ মণ্ডপে অনেকগুলি কীর্তনের দল সারাদিন ভজন ও কীর্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের মনোরঞ্জন করেন। মঠবাড়ীর প্রাঙ্গণেও বিখ্যাত আন্দুল সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন হইয়াছিল। প্রধান মন্দিরে দর্শনের সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। স্বেচ্ছাসেবক-দলের দায়িত্বশীল কর্তব্যপালন ও কার্যতৎপরতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মধ্যাহ্নে বহুসহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। এবারকার উৎসবে অন্যূন চার লক্ষ লোকের সমাবেশ অনুমিত হয়।

কতকগুলি শাখাকেন্দ্র হইতে সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত উৎসবানুষ্ঠানের বিবরণী আমাদের নিকট পৌছিয়াছে।

মাদ্রাজ মঠে তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, হোমাদি এবং প্রায় ১০০০ দরিদ্রনারায়ণ ও ১২০০ ভক্তকে পরিতোষসহকারে ভোজন করান হয়। সায়াহ্নে আরাত্রিকান্তে ভক্ত ও সুধীবৃন্দের সমক্ষে Gospel of Sri Ramakrishna পাঠ ও ব্যাখ্যা হয়। সাধারণ উৎসবের দিন সকাল ৮টায় ৪০ জন সাধু ও ভক্তের সমগ্র শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থটির ইংরেজীতে 'প্রবচন' খুব হৃদয়স্পর্শী হইয়াছিল। অপরাহ্নে উপস্থিত ভক্ত ও জনমণ্ডলী প্রসিদ্ধ পাঠক শ্রীআন্নাস্বামীর তামিল ভাষায় সুললিত 'ভক্ত কুচেল' উপাখ্যান শ্রবণ করেন। অতঃপর বিবেকানন্দ কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক ডি এস শর্মার সভাপতিত্বে এক মহতী সভার অধিবেশন হয়। বিভিন্ন বক্তা তামিল, তেলেগু ও ইংরেজী ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন বাণীর আলোচনা করেন।

বোম্বাই (খার) আশ্রমে তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, হোম, ভজন-কীর্তন, দরিদ্রনারায়ণ-সেবা প্রভৃতি যথারীতি সম্পন্ন হইয়াছে। অপরাহ্নে Sri Ramakrishna, The Great Master গ্রন্থ হইতে পাঠ এবং আলোচনা হয়। ৯ই ফাল্গুন বোম্বাই শহরের সি জে হলে আহূত জনসভায় পৌরোহিত্য করেন বোম্বে রাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মাননীয় শ্রীমোরারজী দেশাই। প্রধান অতিথিরূপে শিক্ষা ও আইন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় শ্রীদিনকররাও দেশাই উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি এবং অধ্যক্ষ ডক্টর এস কে মুরঞ্জন, অধ্যক্ষ এন ডি গুরবক্সানি, অধ্যাপক এল্ এইচ্ আজোয়ানী এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণ-বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন।

১৭ই ফাল্গুন রবিবার আশ্রমিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিপদে বৃত হ'ন সস্ত্রীক মাননীয় রাজ্যপাল শ্রীজি এস বাজপেয়ী। রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার ভাষণে জনসাধারণকে নিজেদের জাতীয় ঐতিহ্য হইতে সেবাধর্মের প্রেরণা লাভ করিতে বলেন। তিনি শ্রোতৃবৃন্দকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, আমাদিগের বৈদেশিক নানা 'ইজ্‌মে'র দিকে ঝুঁকিয়া পড়ার কোন প্রয়োজনীয়তা নাই। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের সেবা-সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ইহার বিরাট কর্ম-প্রেরণা নিছক সামাজিক কর্তব্যবোধে জাগরিত এবং সম্প্রসারিত হয় নাই, ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে মানবসমাজের প্রতি পরম ভালবাসা।

পুরী (চক্রতীর্থ) মঠে অন্যান্য আনুষঙ্গিক রীতিসহ তিথিপূজার দিন বিশেষ পূজা, চণ্ডীপাঠ, হোম এবং প্রসাদবিতরণ হইয়াছিল। বিকালে স্বামী জগন্নাথানন্দ 'কথামৃত' পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন।

মেদিনীপুর সেবাশ্রমে তিথিপূজা উপলক্ষে দুই দিন কলিকাতার বিশিষ্ট ধর্মবক্তা শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, সাহিত্যরত্ন মহাশয় 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ'-সম্বন্ধে বক্তৃতা এবং 'কথামৃত' ব্যাখ্যা করেন।

জামতাড়া (সাঁওতাল পরগণা) আশ্রমে বিশদভাবে পূজা, হোম, ভজন এবং দরিদ্রনারায়ণ সেবা হইয়াছিল। প্রাতে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্য-সজ্জায় মোটরে বসাইয়া কীর্তন-সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করা হয়। জনসভায় স্বামী সংশুদ্ধানন্দ ও স্বামী মৃত্যুঞ্জয়ানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণীর আলোচনা করেন।

রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শহরের ডুরেণ্ডা পল্লীতে ১০ই ফাল্গুন প্রাতে উষাকীর্তন, পূজা ও ভজন, দ্বিপ্রহরে দ্বিসহস্রাধিক দরিদ্র-নারায়ণসেবা এবং অপরাহ্ণে স্বামী বেদান্তানন্দের পৌরোহিত্যে জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। রাঁচি কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীনওলকিশোর গৌর ও অধ্যাপক শ্রীবীরেশ্বর গাঙ্গুলি ভাষণ দেন। রাত্রে 'ভক্তের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ'-সম্বন্ধে কথকতা এবং স্থানীয় শিশুদের 'লবকুশের যুদ্ধ'-নামক অভিনয় সকলের চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল।

ফরিদপুর আশ্রমে জন্মতিথি-উৎসব সমারোহের সহিত উৎযাপিত হইয়াছে। আলোচনা-সভায় সভাপতি ছিলেন স্থানীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ আলতাফ গহর। কুষ্টিয়া-পাবনার জেলাজজ শ্রীঅনুকূলচন্দ্র লাহিড়ী এবং স্থানীয় সাব ডেপুটী কালেক্টর শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র গুহ এবং সভাপতি মহাশয়ের প্রাঞ্জল ও ভাবপূর্ণ অভিভাষণ উপস্থিত সকলেরই মনোরঞ্জন করিয়াছিল। ৮ই ফাল্গুন শুক্রবার ফরিদপুর শহর ও পল্লী-অঞ্চল হইতে আগত প্রায় ছয় সহস্র নরনারীর মধ্যে প্রসাদ-বিতরণ করা হয়।

দেওঘর বিদ্যাপীঠে তিথিপূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ১১ই ফাল্গুন সকালে বিহার-রাজ্যপাল মাননীয় শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকরের সভাপতিত্বে একটি জনসভার আয়োজন হয়। শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, শ্রীশিবসাগর অগস্তী (হিন্দিতে) এবং এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক স্বামী বোধাত্মানন্দ শ্রীশ্রীঠাকুরের ভাবধারা-সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষণ দেন। রাজ্যপাল মহোদয় তাঁহার ভাষণে বলেন—তিনি তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাব-ধারার সংস্পর্শে আসার সুযোগ লাভ করেন। 'লীলাপ্রসঙ্গ', 'কথামৃত' প্রভৃতি পুস্তকগুলি পড়িবার আগ্রহে তিনি বাংলা ভাষা শিক্ষা করেন। তিনি আরও বলেন—আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বহু কর্মী দেশ ও সমাজ-সেবায় আত্মনিয়োগ করিতেছেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবের দ্বারা সমগ্র জগৎ প্রথম ভারতকে শ্রদ্ধাকরিতে

শিখে। বুদ্ধ, মহাবীর, শ্রীরামকৃষ্ণ, গান্ধীজী প্রভৃতি মহাপুরুষদের বাণী শুধু আলোচনা করিলেই চলিবে না—পরন্তু তাঁহাদের উপদেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে রূপায়িত করিতে হইবে। আজ পৃথিবী হিংসায় উন্মত্ত—একমাত্র ভারতই তাহার আধ্যাত্মিক আদর্শ প্রচারের দ্বারা সমগ্র জগতে শান্তি আনিতে সমর্থ। রাজ্যপাল বিদ্যাপীঠের বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলী, কর্মতৎপরতা, পরিচ্ছন্নতা এবং ত্যাগ, শিক্ষা ও সেবার আদর্শের বাস্তব রূপায়ণ দেখিয়া খুবই আনন্দ প্রকাশ করেন।

জনশিক্ষা-শিবির—গ্রামোন্নয়নের জন্য সাধারণ কয়েকটি শিল্প, কৃষি এবং স্বাস্থ্য, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক-শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে আগ্রহশীল কর্মীরা যাহাতে একসঙ্গে আলোচনা এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের নির্দেশ ও পরামর্শ দ্বারা তাঁহাদের জ্ঞানবৃদ্ধি করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠের উদ্যোগে ৩রা ফাল্গুন হইতে ১০ই ফাল্গুন পর্যন্ত একটি শিক্ষা-শিবির খোলা হইয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম ও প্রতিষ্ঠানের ১৯ জন দূরাগত কর্মী সারদাপীঠে থাকিয়া উহার সুযোগ গ্রহণ করেন। তাঁহারা ব্যতীত সারদাপীঠ জনশিক্ষা-বিভাগের যুবক কর্মিবৃন্দ এবং অন্যান্য আরও অনেকে শিবিরের বক্তৃতাদিতে উপস্থিত থাকিতেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীযুত পান্নালাল বসু মহোদয় এই অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করিয়াছিলেন। শ্রীগজেন্দ্র কুমার মিত্র, ডাঃ মন্মথনাথ সরকার, কলিকাতা পশুচিকিৎসা কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, পশ্চিম বঙ্গ শিক্ষা-বিভাগের শ্রীনিখিলরঞ্জন রায়, ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট্ সমাজসেবা-বিভাগের শ্রীননী দত্ত, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী এবং শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দ বিভিন্ন আলোচনা-পরিচালনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্যমন্ত্রী শ্রীযুত প্রফুল্ল সেন, প্রচার-বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীযুত গোপিকাবিলাস সেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-পরিষদের সভাপতি শ্রীযুত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্য-বিধানসভার স্পীকার শ্রীযুত শৈলকুমার মুখোপাধ্যায় শিবির পরিদর্শন করিয়া শিক্ষার্থিগণকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছিলেন।

প্রাত্যহিক শিক্ষাপ্রদ নানা সান্ধ্য অনুষ্ঠানে সাতদিনে দশ হাজারের উপর জনসমাবেশ হইয়াছিল।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বামী নিখিলানন্দের প্রচার—নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দজী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী হইতে প্রতি বুধবার ভারতীয় দর্শন ও মনস্তত্ত্ব-সম্বন্ধে শিক্ষামূলক ভাষণ দিতেছেন। এই বক্তৃতাগুলি ৮ সপ্তাহ পর্যন্ত চলিবে। উহাদের ক্রমিক সূচী :—(১) হিন্দুদর্শনের মূলকথা (২) মন এবং উহার শক্তিনিচয় (৩) চেতনার পাঁচটি স্তর (৪) কর্ম এবং নৈষ্কর্ম্য—ভগবদ্গীতার দর্শন (৫) মৌনের সৃজনী শক্তি (৬) আধ্যাত্মিক সাধনারূপে ধ্যান (৭) বুদ্ধবাণী (৮) হিন্দুধর্ম এবং ভাবী ভারত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপকগণ ব্যতীত ভারতীয় চিন্তাধারার প্রতি অনুরাগী জনসাধারণও বক্তৃতাগুলি হইতে শিক্ষা ও প্রেরণা লাভ করিতেছেন।

পোর্টল্যাণ্ড বেদান্ত-সমিতি—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন্ রাজ্যে অবস্থিত এই শাখা-কেন্দ্রের সাম্প্রতিক কার্যবিবরণী (অক্টোবর, ১৯৫১ হইতে অক্টোবর, ১৯৫২ পর্যন্ত) আমাদের হস্তগত হইয়াছে। আলোচ্য কালে আশ্রমাধ্যক্ষ

স্বামী দেবাত্মানন্দজী প্রতি রবিবার সকালে ভক্তি-মূলক বিষয়ে আলোচনা ও ধ্যানশিক্ষা দান এবং সন্ধ্যায় মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছেন। প্রতি মঙ্গলবার ভগবদ্গীতা-অবলম্বনে 'প্রাত্যহিক জীবনে দর্শন'-সম্পর্কে প্রসঙ্গ হইয়াছিল। বুধবার বেলা ১টায় আরও একটি ক্লাশ হইত। বৃহস্পতিবারে সকলকে যোগ ও ধ্যান-সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল।

ওরেগন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী-উপলক্ষে আহূত একটি ধর্মমহাসভার চারিদিন ব্যাপী অধিবেশনে স্বামী দেবাত্মানন্দজী হিন্দু-ধর্মের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। চারিদিনই তিনি সুচিন্তিত ভাষণ দান করেন। ইহা ছাড়া বিভিন্ন ধর্মের ক্লাশেও তাঁহাকে বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

ওরেগন্ শিক্ষা কলেজ হইতেও বক্তৃতার জন্য স্বামী দেবাত্মানন্দজী আমন্ত্রিত হন। সিয়েটল্ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁহার বক্তব্য বিষয় ছিল যোগদর্শন। লিঙ্কন বিদ্যালয় (সাংবাদিক বিভাগ) এবং লুইস্ ও ক্লার্ক কলেজ হইতে আগত শিক্ষক ও ছাত্রদের বেদান্ত-দর্শন ও ধর্মবিষয়ক মনোজ্ঞ ভাষণে আপ্যায়িত করা হইয়াছিল।

গ্রীষ্মকালে হনলুলুর (হাওয়াই দ্বীপ) কতিপয় আগ্রহশীল ব্যক্তির আহ্বানে দেবাত্মানন্দজী মাসাধিককাল সেখানে কাটান এবং 'কর্মজীবনে বেদান্ত-দর্শন' এবং 'ধ্যানযোগ'-সম্বন্ধে ধারাবাহিক কতকগুলি বক্তৃতা দেন।

আশ্রমিক ঘরোয়া খবর হিসাবে পূজাদির ও বিভিন্নানুষ্ঠানের কথা উল্লেখযোগ্য। দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা ও কালীপূজা যথাবিধি প্রচুর আনন্দের মধ্যে উদ্যাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীশ্রীমা, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান যীশুখ্রীষ্ট, স্বামী বিবেকানন্দ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী সারদানন্দের জন্মতিথি ও ইষ্টার দিবস উদ্যাপন বর্ষের বিভিন্ন সময়ে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। এই বেদান্ত-কেন্দ্রের পঞ্চবিংশ বার্ষিকীর সময় উপাসনালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের একটি পূর্ণাবয়ব ব্রোঞ্জের মূর্তি স্থাপন করা হয়। ইহা নিউইয়র্কের বিখ্যাত মহিলা-ভাস্কর মিস্ ম্যালভিনা হফ্ম্যানের নির্মিত। দক্ষিণ আমেরিকার বুয়েনস্ আয়রস্ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী বিজয়ানন্দজী বুদ্ধদেবের জন্মদিনে আশ্রমে উপস্থিত ছিলেন এবং হৃদয়গ্রাহী ভাষণে সকলকে আনন্দ দান করিয়াছিলেন।

বিবিধ সংবাদ

ফিনিশ্ রাষ্ট্রদূত ও সংস্কৃত ভাষা—গত ২৯শে মাঘ (১১ই ফেব্রুয়ারী) কাশী সরকারী সংস্কৃত কলেজের ৬ষ্ঠ এবং ৭ম বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষ্যে ফিনল্যাণ্ডের রাষ্ট্রদূত সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মঃ হুগো ভলবাঁ বলেন—বহুতর ভাষাসমস্যা সত্ত্বেও স্বাধীন ভারতে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের একান্ত কর্তব্য, এই দেশের প্রাচীন, মহান সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন এবং সংরক্ষণের চেষ্টা করা। এই ভাষার ঐতিহ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ঘরে বাহিরে উহার প্রসার পূর্বক বিশ্বের দরবারে ভারত যাহাতে সংস্কৃত-শিক্ষার প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হয় এই গুরু কার্যভার ভারতবাসীকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংস্কৃত কৃষ্টির মধ্যেই জাতির অমূল্য আধ্যাত্মিক

ভাবরাশি নিহিত আছে। সমগ্র পৃথিবীরই উহা প্রয়োজন।

জীবন ও মৃত্যু-সম্বন্ধে মানব-মনের চিরন্তন প্রশ্নগুলির সমাধান ভারতবাসী যাহা করিয়াছে তাহা গ্রীক দার্শনিকগণের সিদ্ধান্তকে ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ধর্মের ক্ষেত্রে এই দেশের মরমীয়া ও ভক্ত সাধকেরা জীবনের দুর্জ্ঞেয় সমস্যাগুলি-সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি লাভ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার কালিদাসপ্রমুখ কবিগণের কতকগুলি অতুলনীয় নাটক এবং কাব্য বিশ্বসাহিত্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সংস্কৃত ভাষার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শতাব্দীর পর শতাব্দী মানবজাতিকে পথপ্রদর্শন এবং শান্তিদান করিয়াছে।

নয়া দিল্লীর শহরতলীতে উৎসব—নয়াদিল্লীর বিনয়নগরে ২৯শে ও ৩০শে ফাল্গুন ভক্তবৃন্দ কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জন্মোৎসব উদ্যাপিত হইয়াছে। প্রথম দিন অপরাহ্নে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে পুষ্পমালিকা-সজ্জায় মঞ্চস্থ শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর বিশাল প্রতিকৃতির সম্মুখে আরতি এবং স্থানীয় ধর্মসভা কর্তৃক কীর্তন এক ভাবগম্ভীর পরিবেশের সৃষ্টি করে। অতঃপর পণ্ডিত জগদীশ রাজপ্রভাকরের শ্রীরামচরিতমানস-পাঠ ও ব্যাখ্যা, রামনাম-সংকীর্তন এবং গোস্বামী গণেশদেওজীর সুচিন্তিত ভাষণ সমবেত ভক্ত ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

দ্বিতীয় দিন অপরাহ্নে স্থানীয় বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, সিন্ধি ও মাদ্রাজীদের আবৃত্তি ও বক্তৃতা-প্রতিযোগিতার পর বেদমন্ত্রোচ্চারণ ও ভজন-শেষে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার অধিবেশন হয়। অধ্যাপিকা কমলা গর্গ, অধ্যাপক বি এন চৌধুরী, শ্রীযুক্তা সুচেতা কৃপালনী এবং দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী রঙ্গনাথানন্দজী শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনী আলোচনা করেন।

পুরুলিয়ায় স্বামিজীর একনবতিতম জন্মোৎসব—স্থানীয় জনসাধারণের সহায়তায় ও শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ তরুণসংঘের উদ্যোগে গত ২৫শে মাঘ পশুপতি গঙ্গাধর সঙ্গীত-বিদ্যালয় ভবনে এই অনুষ্ঠান উদ্যাপিত হইয়াছে। ছাত্রছাত্রীগণের মধ্যে স্বামিজীর জীবনী-সম্বন্ধে রচনা ও আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ উদ্বোধন-পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দের পৌরোহিত্যে একটি আলোচনা-সভারও অধিবেশন হয়।

আজমীরে অনুষ্ঠান—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের শুভ জন্মোৎসব এখানে যথারীতি অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এতদুপলক্ষে গত ৩রা ফাল্গুন বিশেষ পূজাদি, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ও বচনামৃত পাঠ, জীবনী ও উপদেশ-আলোচনা এবং ভজনাদি হইয়াছিল।

১০ই ফাল্গুন রবিবার দিবস স্থানীয় টাউন হলে আজমীর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহরিভাট উপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভায় অধিবেশন হয়। মঞ্চোপরি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামিজীর প্রতিকৃতি পুষ্প-মাল্যাদিতে সুশোভিত করা হইয়াছিল। বৈদিক প্রার্থনা ও ভজনগানের পর শ্রীযুত চন্দ্রগুপ্ত বার্ষ্ণেয় তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহান্ অবদান দুইটি; প্রথম—স্বামী বিবেকানন্দ ও দ্বিতীয়—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। স্বামিজী গো-সেবা অপেক্ষা নরনারায়ণ-সেবার উপর সমধিক আগ্রহান্বিত ছিলেন। স্থানীয় সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীতি ভি জন বলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের অনাড়ম্বর ও মৌন তপস্যার জীবন অবশ্য অনুসরণীয়—অন্যথা কেবল বৃথা

বাক্যব্যয় ও ধর্মহীন কপটতায় ভারতবাসীর প্রকৃত কল্যাণ সুদূরপরাহতই থাকিবে। অতঃপর স্বামী আদিভবানন্দ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও জড়-বিজ্ঞানের আক্রমণ প্রতিরোধকল্পে রামমোহন রায়, দয়ানন্দ সরস্বতী, শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ও এ্যানি বেশান্তের অবদান আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেন যে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের প্রদর্শিত ধর্ম-সমন্বয়, নরনারায়ণ-সেবা, সাম্য ও মৈত্রীর বাণী সমগ্র জগতের প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তির নিদান-স্বরূপ। সভাপতি শ্রীযুত উপাধ্যায় তাঁহার মনোজ্ঞ অভিভাষণে বলেন,—"কারাবাস-কালে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং আমার চঞ্চল ও বিক্ষুব্ধ চিত্তে প্রকৃত শান্তির সঞ্চার হয়। 'যে রাম, যে কৃষ্ণ সেই এ শরীরে রামকৃষ্ণ'—এক নিরক্ষর ব্যক্তির এই উক্তি প্রথমে তেমন বুঝি নাই। কিন্তু গভীরভাবে অনুধ্যান দ্বারা হৃদয়ঙ্গম হইল, সত্যই পূর্ব পূর্ব যুগে শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণে যে সকল মহান্ ঐশ্বরিক শক্তির উন্মেষ হইয়াছিল তাহাই এই নাস্তিকতার যুগে লোকশিক্ষার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরিত্রে বিকাশ লাভ করিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী উচ্চ-নীচ সকলকে সমানভাবে দেখিয়াছেন। আমরাও অপরের দুঃখে মানসিক দুঃখ বোধ করিয়া থাকি। কিন্তু গরীব মাঝিকে প্রহৃত হইতে দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ যেভাবে ব্যথিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার শরীরেও প্রহার-চিহ্ন লক্ষিত হইয়াছিল তাহা সত্যই অলৌকিক। তিনি সিদ্ধাই পছন্দ করিতেন না; যেখানে দুই পয়সা ব্যয়ে নদী পার হওয়া যায় সেখানে কঠোরতা ও সাধনার দ্বারা যোগবলে হাঁটিয়া নদী পার হওয়ার সার্থকতা নাই, কারণ সাধনার প্রকৃত উদ্দেশ্য ভগবান-লাভ। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন ও বাণী আমরা ব্যবহারিক জীবনে অনুসরণ করিয়া যেন ধন্য হই এই প্রার্থনা।"

কয়েকটি স্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—আমেদাবাদে উৎসবের আয়োজন করেন স্থানীয় বিবেকানন্দ-মণ্ডলী পাঠচক্র। অন্যান্য কার্যসূচী ব্যতীত সন্ধ্যায় একটি সম্মেলনে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা ও ত্যাগের আদর্শ-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ আলোচনা হয়।

রামগড়ে (হাজারিবাগ) স্থানীয় ভক্তবৃন্দের উৎসাহে বিশেষপূজা ও দরিদ্রনারায়ণ-সেবা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। জনসভায় পৌরোহিত্য করেন রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন স্যানাটোরিয়ামের অধ্যক্ষ স্বামী বেদান্তানন্দ।

পাবনায় (পূর্ব-পাকিস্থান) শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের ১১৮তম জন্মতিথি-স্মরণে আহূত সভায় অধ্যাপক শ্রীমাখনলাল চক্রবর্তী, শ্রীঅমর মৈত্র, শ্রীজগদিন্দ্র মৈত্র, ডাঃ দ্বিজদাস বাগ্‌ছি, অধ্যাপক শ্রীনলিনী রায় এবং শ্রীরাধাচরণ দাস, সাহিত্যরত্ন পাঠ ও আলোচনা করেন।

মেদিনীপুর জেলার খেপুত গ্রামে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথিপূজা বিশেষ উৎসাহ ও আড়ম্বরের সহিত অনুষ্ঠিত হয়। কীর্তন, গীতাপাঠ, শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ ও আলোচনা এবং প্রসাদ-বিতরণ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় (পূর্বপাকিস্থান) স্থানীয় রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসবে প্রায় তিন সহস্র নরনারী যোগদান করিয়াছিলেন। সহস্রাধিক হরিজন অন্য সকলের সঙ্গে বসিয়া খিচুরী মিষ্টান্নাদি প্রসাদ পাইয়াছিলেন।

গত ৯ই ফাল্গুন অপরাহ্নে কলিকাতা বদ্রিদাস টেম্পল্ ষ্ট্রীটস্থ শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা ঠাকুরবাটীতে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে একটি আলোচনা-সভার অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে পৌরোহিত্য করেন বেলুড়মঠের স্বামী সাধনানন্দ। ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এবং অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র দত্ত ছিলেন অন্যতম বক্তা। সভান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাকীর্তন গীত হয়।

পরলোকে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র—কলিকাতা পৌরসভার মেয়র শ্রীনির্মলচন্দ্র চন্দ্রের পরলোক-গমনে বাংলার একজন একনিষ্ঠ প্রাচীন দেশকর্মীর অভাব হইল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সময় হইতে তিনি দেশের স্বাধীনতা এবং উন্নতির জন্য নানাক্ষেত্রে যে অকুণ্ঠিত উদ্যম প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভুলিবার নয়। আমরা তাঁহার লোকান্তরিত আত্মার শান্তি কামনা করি।

উদ্বোধন
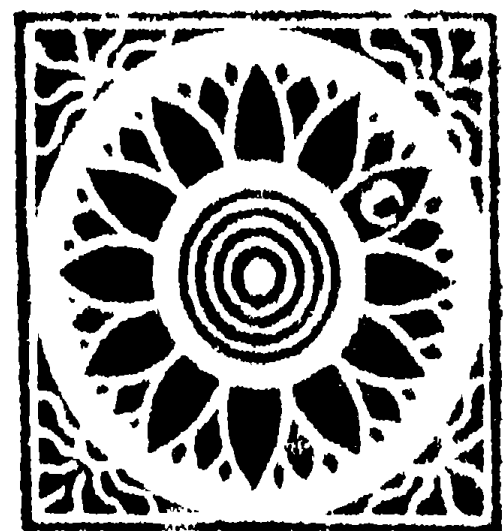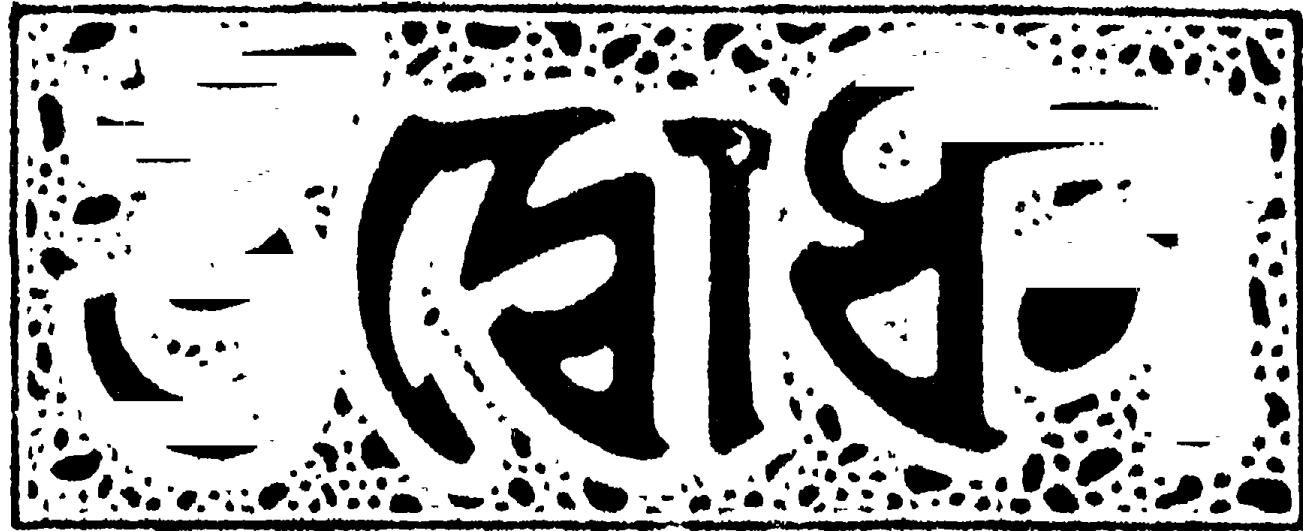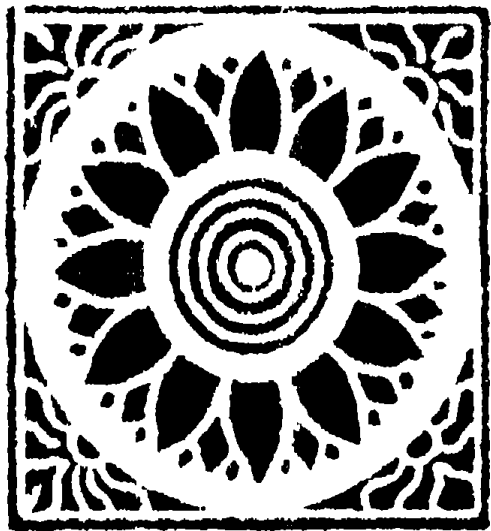
"হে রাম, শরণাগত"

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শ্রুতিভির্বিমৃগ্যং
যন্নাভিপঙ্কজভবঃ কমলাসনশ্চ।
যন্নামসাররসিকো ভগবান্ পুরারি-
স্তং রামচন্দ্রমনিশং হৃদি ভাবয়ামি ॥

যস্যাবতারচরিতানি বিরিঞ্চিলোকে
গায়ন্তি নারদমুখা ভবপদ্মজাদ্যাঃ।
আনন্দজাশ্রুপরিষিক্তকুচাগ্রসীমা
বাগীশ্বরী চ তমহং শরণং প্রপদ্যে ॥
(অহল্যা-স্তোত্র, অধ্যাত্মরামায়ণ)

যাঁহার চরণ-কমল-কণিকা
বেদচয় ফিরে সন্ধানে
নাভি-শতদলে ব্রহ্মা জাগেন
অখিল-সৃষ্টি-সংজ্ঞানে—

ত্রিপুরনাশন শঙ্কর যাঁর
নামরসপানে উন্মনা
অবিরত সেই শ্রীরামচন্দ্রে
রাখিনু চিত্ত-ভাবনা।

বিরিঞ্চি-লোকে মহিমা যাঁহার
অবতার-লীলা-ব্যাখ্যানী
গান নারদাদি ঋষি-দেবগণ
গান পদ্মজ-শূলপাণি—

গান বাগ্‌দেবী প্রেমবারি ছুটে
বক্ষের সীমা লঙ্ঘিয়া
সেই রঘুবরে লইনু শরণ
শ্রীপদযুগ্ম বন্দিয়া।

"হে রাম শরণাগত, শরণাগত! এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়—আর যেন তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ কোরো না।"

—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উক্তি

কথাপ্রসঙ্গে

'রামকৃষ্ণ—ফ্যাশান্'

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথি-উপলক্ষে গতমাসে কলিকাতার অনতিদূরবর্তী নানাস্থানে উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল এবং এখনও হইতেছে। বর্তমান কালের নাস্তিকতা, বিদ্বেষ ও নির্লজ্জ ভোগোন্মত্ততার প্রতিষেধকরূপে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভগবন্ময় বিশ্বহিতরত নিষ্কলুষ জীবন ও উদার শিক্ষার যত প্রচার ও সমাদর হয় ততই মঙ্গল, ইহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না; কিন্তু অনেক ভাল জিনিসও যেমন যথার্থ প্রেরণার অভাবে প্রাণহীন হইয়া পড়ে, আকাঙ্ক্ষিত সুফল প্রসব করে না—সেইরূপ গতানুগতিক আলেখ্য-সজ্জা, নগর-সংকীর্তন, পূজা-হোমাদি খিচুড়ী-প্রসাদ-বিতরণ এবং আলোচনাসভার পারম্পর্যই কিছু শ্রীরামকৃষ্ণদেবের স্মৃতিবার্ষিকীকে সার্থক করে না —যদি না উৎসবের পশ্চাতে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে ভাব ও আদর্শের জীবন্ত বিগ্রহ, সেইগুলি উৎসব-উৎসাহীরা জীবনে সাধিবার চেষ্টা করেন। এই খাঁটি সত্যকথাটি অভিনব ইঙ্গিতপূর্ণ একটি উক্তির মাধ্যমে দুই স্থানের উৎসব-সভায় জনৈক চিন্তাশীল বক্তার (পণ্ডিত শ্রীযুক্ত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ) ভাষণে শুনিয়া আমাদের খুব ভাল লাগিল। বক্তা 'রামকৃষ্ণ-ফ্যাশান্' হইতে শ্রোতৃমণ্ডলীকে সাবধান হইবার কথা বলিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্য ঈশ্বরপ্রেম, সকল স্ত্রীতে মাতৃবুদ্ধি প্রভৃতি গভীরভাবে যদি অনুশীলন করিতে পারি তবেই তাঁহার নাম করা সার্থক—নতুবা রামকৃষ্ণ রামকৃষ্ণ করিয়া আসর জমানো একটি 'ফ্যাশান্' বা হুজুগ—সাময়িক উচ্ছ্বাসমাত্র ইহাই ছিল তাঁহার কথার তাৎপর্য।

'ফ্যাশান্' মাত্রই একটি হালকা অহমিকার দ্যোতক। উহার পশ্চাতে কোন গভীর ভাব বা মনন নাই। কোন কোন 'ফ্যাশান্' অনিষ্টকরও বটে। লৌকিক জীবনের ক্ষেত্রে ইহা আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে 'ফ্যাশান্' শুধু অনিষ্টকরই নয়, মারাত্মক। শুভ ও সত্যকে জীবনে পরিণত করিতে যে পরিশ্রম ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হয় উহা যখন আমরা এড়াইতে চাই তখনই হয় 'ফ্যাশান্' এর উদ্ভব। মনকে আমরা চোখ ঠারি দিয়া বুঝাই আমরা তো সত্যেরই পতাকা বহন করিতেছি—কিন্তু বস্তুতঃ আমরা নিজেদের এবং বাহিরের লোককেও প্রবঞ্চনা করি। 'ফ্যাশান্' দিয়া আমরা আমাদের সাধনা ও অনুভূতির দৈন্যকে ঢাকিতে চাই।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ছিল সর্বপ্রকার 'ফ্যাশানের' জ্বলন্ত প্রতিবাদ। লোক দেখানো কিছু তিনি জানিতেন না, করিতে পারিতেন না। আচারবৃত্তে একটুও আড়ম্বর ছিল না বলিয়াই আবার অনেকে তাঁহাকে ভুলও বুঝিত; ভাবিত, এ আবার কি রকম সাধু! কেহ কেহ তাঁহার অতি-সহজতাকে সভ্যতার অভাব ধারণায় তাঁহাকে উপহাস ও অবজ্ঞাও করিয়াছে। তিনি কিন্তু লোকের নিন্দা ও প্রশংসার অপেক্ষা না করিয়া অহরহঃ মাতৃপ্রেমে বিভোর হইয়া দিন কাটাইতেন। মায়ের

শিশু—বলিতেন,—"আমি মা ছাড়া আর কিছু জানি না," "মাইরি বলছি ঈশ্বর বই আর কিছু ভাল লাগে না।"

এই সরল, সহজ, সত্যমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণকে অবলম্বন করিয়া যদি কোন নূতন 'ফ্যাশান্' গড়িয়া উঠে তাহা হইলে সত্যই তাহা পরিতাপের বিষয়। ভাবী কালের হুজুগকারিগণের তাঁহাকে লইয়া এই 'ফ্যাশান্' তিনি নিজেও বোধ করি তাঁহার জীবৎকালে দূরদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন। দেহত্যাগের কিছুদিন পূর্বেকার একটি স্বগতোক্তি হইতে ইহার আভাস পাওয়া যায় :

"শরীরটা কিছুদিন থাকতো, লোকদের চৈতন্য হোতো। * * * তা রাখবে না। * সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নেই।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ৩।১৪।২)

এখন যে লোক ধর্মপ্রচার করিতেছে তাহা কিরূপ মনে করেন এই প্রশ্নের উত্তরে একদিন বলিয়াছিলেন—"দুই শত লোকের সঞ্চয়, হাজার লোকের নিমন্ত্রণ, অল্পসাধনে গুরুগিরি ও প্রচার।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশাবলীর একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য উহাতে আগাগোড়া সাধনের উপর—মন মুখ এক করিয়া ধর্মতত্ত্ব জীবনে অনুভব করিবার উপর ঝোঁক। সাধনায় শৈথিল্য দেখিলে কখনও কখনও তিনি কঠোর ভর্ৎসনা করিতেন :

"সালিশী, মোড়লী এ সব তো অনেক হোলো। তোমার ঈশ্বরের পাদপদ্মে মন দিবার সময় হয়েছে। পাগল হও, ঈশ্বরের প্রেমে পাগল হও। লোকে না হয় জানুক যে ঈশান* এখন পাগল হয়েছে, আর পারে না। * * কোশাকুশি ছুড়ে ফেলে দাও।"

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২।১৯।৬)

"সাধন নাই, ভজন নাই, বিবেক বৈরাগ্য নাই, দু চারটে কথা শিখেই অমনি লেকচার!" (ঐ)

স্বামী বিবেকানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগিগণকে বার বার সাবধান করিয়া দিয়াছেন—ঠাকুরের অদ্ভুত জীবনের শিক্ষা কার্যতঃ অনুসরণ করাই তাঁহাকে প্রকৃত ভক্তি করা। শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী একবার অনেকগুলি ভক্তের নাম সন্নিবিষ্ট করিয়া একটি শ্রীরামকৃষ্ণ-পার্ষদ-স্তোত্র লিখিয়া তাঁহাকে শুনাইলে স্বামিজী উহার সমালোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ-বৈরাগ্যের ছাপ যাঁহার জীবনে পড়ে নাই তিনি কখনও ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত নামের যোগ্য নন্।

(স্বামি-শিষ্য সংবাদ, ২।২৩)

আমেরিকা হইতে স্বামিজী তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও দেখিতে পাই তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও শিক্ষার তাৎপর্যের গভীর বিশ্লেষণ করিতেছেন,—তাঁহার শিক্ষার ভ্রান্ত অপপ্রয়োগ সম্বন্ধে গুরুভাইদের সাবধান করিয়া দিতেছেন। 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্'-বিষয়ে স্বামিজীর সুস্পষ্ট নির্দেশ বিশেষ লক্ষ্য করিবার। নাম নয়—কাজ, উচ্ছ্বাস নয়—জীবন, আলস্য নয়—আত্মপ্রত্যয়, মূঢ়তা—নয় সমীক্ষা, দল নয়—সমদৃষ্টি, ইহাই শ্রীরামকৃষ্ণপতাকাবাহীদের স্বামিজী বলিতে চাহিয়াছিলেন। আজিও ইহাই আমাদের আরও গভীরভাবে মনে রাখিতে হইবে। নচেৎ 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্'-এর অভিঘাত শ্রীরামকৃষ্ণমহিমাকে ম্লান করিবে সন্দেহ নাই।

* * *

আর এক জাতীয় 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইহার সম্বন্ধেও কিছু

* ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একজন বিশিষ্ট ভক্ত।

সতর্কতা আবশ্যক। এই 'ফ্যাশানের' লক্ষণ হইতেছে কোনও কোনও ব্যক্তিতে শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব। ভক্তরূপে নয়, সাধনার প্রেরণাদাতা রূপেও নয়—একেবারে ভগবানরূপে, শ্রীরামকৃষ্ণের অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করিবার নায়করূপে। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব-ভঙ্গী, কথা, ভাষা (নর্তন, রোমাঞ্চ, অশ্রু প্রভৃতিও) সবই এই সকল আধুনিক অবতারে নূতন করিয়া প্রকটিত! নূতন কর্মনীতি, নূতন ভবিষ্যদ্বাণীও বিঘোষিত!

সহজে যদি দুর্লভকে পাওয়া যায় তাহা হইলে সে সুযোগ ছাড়ে কে? বিনা ভাড়ায় যদি সুরম্য প্রাসাদে বাস করিবার নিমন্ত্রণ আসে তো উহা প্রত্যাখ্যান করা যায় কি? তাই এই নূতন 'ফ্যাশান্'-এ আকৃষ্ট হইবার লোকেরও কিছু কমতি দেখিতেছি না। কোন্ শান্তিপুরের কুটিরছায়ায় কোন্ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য তুলসী-গঙ্গাজলের পূজা এবং 'এস, এস' হুঙ্কার দিয়া এই সকল অবতারকে পৃথিবীপৃষ্ঠে নামাইয়া আনিতেছেন জানি না। আমরা শুধু ভগবান যীশুখ্রীষ্টের সেই বিখ্যাত উপদেশটি উদ্ধৃত করিয়া এই নূতন 'রামকৃষ্ণ ফ্যাশান্' হইতে সতর্ক হইতে সকলকে অনুরোধ জানাই। খ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন—Beware of false prophets.

বিশ্বধর্মের মর্মকথা

ইতিহাসে এমন এক একটি সময় আসিয়াছে যখন এক একটি ধর্মকে প্রবলশক্তিশালী হইয়া ব্যাপক প্রসারলাভ করিতে দেখা গিয়াছে—দিকে দিকে সহস্র সহস্র নরনারীর ভক্তি উহার দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। দল-বুদ্ধিরূপ মানুষের মনের নৈসর্গিক প্রবৃত্তিটি (অথবা দুর্বলতা?) তখন সক্রিয় হইয়া ঐ ধর্মের পতকাবাহীদের হৃদয়ে স্বভাবতই এই বিশ্বাস জাগ্রত করিয়াছে যে, তাঁহাদের এই সবল ধর্মটিকে বিশ্বের সকল নরনারীর উপর চাপাইতে পারিলে সমগ্র মানবজাতি এক অখণ্ড পরিবারে পরিণত হইবে। এইভাবে দেখিতে পাই বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম—বিভিন্ন সময়ে 'বিশ্বধর্মে'র আসন অধিকার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রচেষ্টায় মানুষের শুভও হইয়াছে, অশুভও হইয়াছে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচেষ্টাটি তাহার লক্ষ্যে পৌছিতে পারে নাই। 'বিশ্বধর্ম' মানুষের কাছে একটি স্বপ্নই রহিয়া গিয়াছে।

এখনও মানুষ ঐ স্বপ্ন ছাড়িতে পারে নাই। 'এক পৃথিবী,' 'এক সমাজ,' 'এক রাষ্ট্রে'র ন্যায় 'এক ধর্ম'রূপ শ্লোগানটিও মানুষের কল্পনাকে মাঝে মাঝে বেশ দোলা দিয়া যায়। পৃথিবী যে এক এবং তাহাতে যে এক মানুষজাতি বাস করে (শারীরতত্ত্ব, সামাজিক লেন-দেন এবং মানসিক আশা আকাঙ্ক্ষার দিক দিয়া) তাহাতে কোন সন্দেহ নাই এবং এইজন্য সকল মানুষের জন্য এক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা একদিন বাস্তব হওয়া কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু 'একধর্ম'—কল্পনাটির কথা বোধ করি আলাদা। ধর্ম মানুষের অন্তরের একটি অতীন্দ্রিয় আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। উহার পরিপূর্তি সব মানুষের একই রীতিতে হইবার নয়। নিজের নিজের সংস্কার-বিবেক-বিচার-আবেগের গঠনানুযায়ী মানুষের ধর্মসাধনা বহু বিচিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে। ইহা কিছু দোষের নয়। দোষ শুধু এইটিকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারা। স্বামী বিবেকানন্দ কোন এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—পৃথিবীতে যতগুলি মানুষ, প্রত্যেকের জন্য যদি এক একটি আলাদা ধর্ম থাকিত তাহা হইলে আমি খুশী হইতাম। ধর্ম-সাধনার বৈজ্ঞানিক প্রণালীটির দিকে তাকাইয়াই স্বামিজী উক্ত মন্তব্য করিয়াছিলেন। বহুধর্ম থাকুক ক্ষতি নাই—কিন্তু বহুধর্ম দ্বারা মানুষ যে একই লক্ষ্যে

পৌঁছিবার চেষ্টা করিতেছে এইটি বুঝিতে না পারিলে সমূহ ক্ষতি আছে। এই যুগে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার জীবন ও শিক্ষা দ্বারা ইহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। স্বামিজী শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করিয়াই বিশ্বধর্মের মর্মকথা উদ্ঘাটন করিয়া দিয়াছেন। বিশ্বধর্ম অর্থে একটি কোন নির্দিষ্ট ধর্ম নয়, যত শক্তিশালীই ঐ ধর্ম হউক না কেন। সারা পৃথিবীকে গির্জায় লইয়া যাওয়া, সব দেশের মানুষকে কলমা পড়ানো, সকল নরনারীর মনে চতুরার্যসত্যের ছাপ দেওয়া—ইহার নাম যদি বিশ্বধর্ম হয় তবে উহার ভিত্ হইবে বালুকার উপর স্থাপিত। উহা ধসিয়া পড়িবেই। বস্তুতঃ বিশ্বধর্ম একটি দৃষ্টিভঙ্গী। সকল মানুষের মধ্যে শাশ্বত দেবতা বসিয়া আছেন—সকল মানুষের অন্তরেই পরিপূর্ণতা জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে—অনন্ত ভঙ্গীতে, অসংখ্য পথে উহাকে বিকাশ করিবার চেষ্টা মানুষ করিয়া চলিতেছে এবং চলিবে—এই সত্যটি উপলব্ধি করিবার নামই বিশ্বধর্ম। হিন্দু জৈন, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, পারসিক, মুসলমান এবং আরও যত ধর্মাবলম্বী আছেন সকলেই নিজ নিজ ধর্মে সুস্থির থাকিয়া বিশ্বধর্মের পতাকা বহিতে পারেন।

'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ'

'গল্পভারতী' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার 'স্বামী বিবেকানন্দ'—প্রবন্ধে লিখিতেছেন :—

"স্বামিজীর জন্মতিথিতে অর্ধশতাব্দী পশ্চাতে চাহিয়া দেখি, এই দুর্ভাগা ছত্রভঙ্গ সমাজকে তিনি যেখানে রাখিয়া গিয়াছিলেন, প্রায় সেইখানেই আছে। রাজনৈতিক আন্দোলন, শাসক ও শাসিতের সংঘর্ষ, দুই দুইটা মহাযুদ্ধ, বৃটিশ প্রতাপের বিলয়, ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ, পরিবর্তন কিছু কম হইল না। কিন্তু ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ, ভদ্রলোকের ভারতবর্ষই রহিয়া গেল; লক্ষ কোটি নরনারী তাহাদের দুর্ভাগ্য ও দারিদ্র্য হইয়া, সহিষ্ণু ভারবাহী বলদের মত সূতিকাগার হইতে শ্মশান পর্যন্ত মন্থরপদে চলিয়াছে, চোখে নৈরাশ্যের নিষ্প্রভ দৃষ্টি, শতাব্দীর দুর্বহ বোঝায় মেরুদণ্ড বক্র।"

এই মর্মান্তিক অবস্থার কারণ কি? কারণ—আমরা আগের কাজ আগে করি নাই- ভিত না গাঁথিয়া সৌধ নির্মাণ করিয়াছি। 'ভদ্রলোক' লইয়া জাতি নয়—লক্ষ লক্ষ কৃষক-শ্রমিক লইয়া জাতি। আমরা যত আন্দোলন করিয়াছি উহা প্রধানতঃ 'ভদ্রলোকের' আন্দোলন। জাতির শেষোক্ত বৃহৎ অংশকে যখন ডাকিয়াছি—হুজুগে মাতাইয়া, তাহাদের নিরক্ষরতা এবং শিক্ষাহীনতা ভাঙ্গাইয়া তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়াছি। তাহারা গোলামীও বুঝে নাই, আজাদীও বুঝে নাই—বুঝিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা আমরা দি নাই। উহারা আমাদের অভিযানে জয় দিয়াছে, জেল খাটিয়াছে, সংখ্যা-দ্বারা আমাদের দল বাড়াইয়াছে। আমরা পরাধীনতার সময়ে ভদ্রলোক বনিয়াছিলাম তাহাদেরই পরিশ্রমের মূল্যে, জীবনের মূল্যে; আবার এখন স্বাধীন হইয়া ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ উপভোগ করিতেছি তাহাদেরই শক্তি ও কৃচ্ছ্রতার বিনিময়ে। তাহাদের যদি যথেষ্ট শিক্ষা-দীক্ষা থাকিত তাহা হইলে আমাদের এই নিষ্ঠুর অত্যাচার বেশীদিন চলিত না। আমাদের জাতীয় সরকার গণজীবনের দুঃখকষ্ট দূর করিবার জন্য সজাগ রহিয়াছেন—কার্যতঃ নানা পরিকল্পনার মাধ্যমে উহার চেষ্টাও করিতেছেন, কিন্তু এখানেও আগের কাজ আগে হইতেছে না। তাহাদিগকে নাবালক রাখিয়া তাহাদের ভরণ-পোষণ রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া যাওয়া একটি কথা, আর তাহাদিগকে সাবালক করিয়া দিয়া তাহাদের নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিজেদেরই

মিটাইয়া লইতে দেওয়া আর একটি কথা। যতশীঘ্র সম্ভব শেষের অবস্থাটিকে সম্ভবপর করিয়া তোলা প্রয়োজন। স্বামিজী বুকফাটা স্বরে চিৎকার করিয়া গিয়াছেন—শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা। একটি ব্যাপক শিক্ষার অভিযান সর্বাগ্রে প্রয়োজন—শুধু মধ্যবিত্তের মধ্যে নয়—মাঠে, ঘাটে, দোকানে, কল-কারখানায়, প্রকৃত জাতি যেখানে উঠিতেছে, বসিতেছে, চলিতেছে। জাতির চোখ খুলুক—তাহা হইলে তাহারা বুঝিতে পারিবে কে শত্রু কে মিত্র, কোন্ পথে গেলে মঙ্গল, কোনপথে গিরি-খাত।

'ভদ্রলোক' সমাজ-শীর্ষদের নিকট হইতে প্রত্যাশা কম। কাঞ্চন-তৃষ্ণা তাঁহাদিগের মনুষ্যত্বকে বিশুষ্ক করিয়া দিয়াছে। টাকা-টাকা-টাকা, পদোন্নতি ও মান—পরাধীনতার সময় সাহেবদের ডাণ্ডার ভয়ে কিছুটা ঘুমাইয়াছিল। এখন আজাদী আসিয়া সে ঘুম ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। আরও কত পাওয়া যায়, আরও কত উঠা যায় ইহাই এখন হইয়াছে 'ভদ্রলোকে'র জপ-মন্ত্র। এ তৃষ্ণা যাইবার নয়। এ তৃষ্ণা ছাপাইয়া 'গণ'দের জন্য কিছু করিবার ঝোঁক সহজে উঠিবার কথা নয়।

আশা তরুণদের নিকট—এখনও যাহাদের মন কোমল আছে—হৃদয়ের সহানুভূতি শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরে নাই। জাতীয় প্রতিরক্ষা-বাহিনী গঠন করিবার পূর্বে এই তরুণদের দিয়া একটি জাতীয় গণশিক্ষা-প্রচার বাহিনী গঠন করা চলে না কি? গ্রামে গ্রামে, বস্তিতে বস্তিতে, হাটের বটতলায়? 'গণে'র চোখ খুলিলে গণশক্তি সুদৃঢ় হইবে—সেই সুদৃঢ় গণশক্তির উপরই শান্তি-সমৃদ্ধি-কল্যাণময় ভারতবর্ষের হইবে প্রকৃত প্রতিষ্ঠা—'ভদ্রলোকের ভারতবর্ষ' নয়—সনাতন চিরন্তন বিশাল ভারতবর্ষ।

সন্ন্যাসের পরিসংখ্যান'

প্রথিতযশা ঔপন্যাসিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকার দোলসংখ্যায় 'সন্ন্যাস' নাম দিয়া একটি সরস ব্যঙ্গ-নিবন্ধ লিখিয়াছেন। শেষ লাইনগুলি :

"সন্ন্যাসীদের সন্ন্যাসগ্রহণের মূলতত্ত্ব গুহায় নিহিত। এ বিষয়ে পরিসংখ্যান রচনা করা প্রয়োজন। দেশে যে সাধু-সন্ন্যাসী বাড়িয়াই চলিয়াছে, ইহার কারণ কি?"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি উক্তি হইতে বোধ করি শরদিন্দু বাবুর প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইতে পারে। উহা উদ্ধৃত করিতেছি :

"বৈরাগ্য তিন চার প্রকার। সংসারের জ্বালায় জ্বলে গেরুয়াবসন পরেছে—সে বৈরাগ্য বেশীদিন থাকে না। হয় ত কর্ম নাই, গেরুয়া পরে কাশী চলে গেল। তিন মাস পরে ঘরে পত্র এলো, 'আমার একটি কর্ম হইয়াছে, কিছুদিন পরে বাড়ী যাইব, তোমরা ভাবিত হইও না।' ভগবানের জন্য একলা একলা কাঁদে। সে বৈরাগ্য যথার্থ বৈরাগ্য।

মিথ্যা কিছুই ভাল নয়। মনে আসক্তি, আর বাহিরে গেরুয়া! বড় ভয়ঙ্কর।"

সাধু 'সাজিলে' যে এই দেশে দুমুঠা খাইতে পাওয়া যায়, অনেক জায়গায় মানসম্ভ্রমও জুটে, ইহা তো সর্বজনবিদিত। দেশের ক্রমবর্ধমান অন্নসমস্যা, বাসস্থানের সমস্যা এবং বেকারসমস্যার চাপে অনেকে যে রোজগারের পন্থারূপে 'সন্ন্যাসীগিরি'কেই অবলম্বন করিবে ইহা বিচিত্র কি? এই ধরনের সন্ন্যাসের পরিসংখ্যান লওয়া খুব কঠিন কথা নয়, যদি সন্ন্যাসগ্রহণের মূল-তত্ত্বটির দিকে 'গুহায় নিহিত' বলিয়া চোখ বুজিয়া না থাকি।

মনুষ্য-জীবনের পরম লক্ষ্য যে শ্রীভগবান, তাঁহাকে লাভ করিবার জন্যই যে সাধক সর্ব-ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হয়, উহা যে একটা অলস ফাঁকি নয়, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাপৃতি—এ কথা ভারতবর্ষের অশিক্ষিত কৃষক-মুটে-মজুরও জানে, এবং জানে বলিয়াই আসল ও মেকীর পার্থক্য অনেক সময়েই তাহারা সহজেই বুঝিয়া লয়। পক্ষান্তরে উচ্চশিক্ষিত আমরা আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধি-বিচার-সহায়ে 'পরিসংখ্যান' করিতে গিয়া বহুক্ষেত্রে মুস্কিলে পড়িয়া যাই। আমরা আসল নকল দুটিই বাদ দিয়া বসি! গৈরিক এড়াইয়া এড়াইয়া পরিশেষে হয়তো একদিন সাদা কাপড়ের হাতেই চরম ঠকিয়া মরি—ধর্মের নামেই। অতএব সন্ন্যাসের পরি-সংখ্যান রচনা করা ভালই, প্রয়োজনীয়ও বটে, তবে মনে হয়, খুব হুশিয়ার হইয়া উহা করা বাঞ্ছনীয়।

কঠোপনিষদ্

(পূর্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

শ্রেয় হ'তে প্রেয় ভিন্ন, অথচ উভয়ে
পুরুষে আবদ্ধ করে বহুবিধ ভাবে
শ্রেয়োবদ্ধ হ'ন যিনি মঙ্গল তাঁহার
প্রেয়কামী হ'লে পরে পরমার্থ যাবে ॥১॥

শ্রেয় প্রেয় দুইই আসে জীবনে সবার
ধীমান বিচার করি শ্রেয়কেই লন্ বরি'
বৈষয়িক স্বল্পবুদ্ধি প্রেয় করে সার ॥২॥

নচিকেতা, তুমি প্রিয়—প্রিয়রূপী কামনা সকল
ত্যজিয়াছ বিচার করিয়'
যে বিষয়াকীর্ণ মার্গে বহুলোক হ'ল নিমজ্জিত
তুমি তাহা থাকনি ধরিয়া ॥৩॥

অবিদ্যা ও বিদ্যা এরা অতি ভিন্নমুখী
বহমান বিপরীত ধারে
নচিকেতা তুমি জানি, বিদ্যা-অভিলাষী—
প্রলুব্ধ করেনি শত কামনা তোমারে ॥৪॥

অবিদ্যা অন্তরমাঝে সদা বর্ত্তমান
পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে নিজেদের ভাবে জ্ঞানবান
অন্ধ-নীত অন্ধ সম মূঢ় জেনো তারা
ভ্রান্ত পথে সদা ভ্রাম্যমাণ ॥৫॥

বিত্তমূঢ় ভ্রান্তিময় অজ্ঞান-জীবনে
সাধনার জ্যোতি নাই, দৃষ্টি অতি ক্ষীণ
ইহলোকই আছে শুধু, আর কিছু নাই
এই ভাবি হয় তারা বারম্বার আমার অধীন ॥৬॥

যার কথা বহুলোকে পায় না শুনিতে
শুনিয়াও মর্ম্মে নাহি করে অনুভব
কুশলীরা পায় তাহা, দুর্লভ আচার্য্য তার,
আচার্য্য-উপদিষ্ট জ্ঞাতাও দুর্লভ ॥৭॥

হীনবুদ্ধি এঁরে কভু ভালভাবে পারে না বুঝাতে
তাহাদের কাছে ইনি শুধু নানা চিন্তার বিষয়,
অভেদদর্শীর বাক্যে স্থির ইনি তর্কের অতীত
সূক্ষ্ম তর্ক সূক্ষ্মতরে অবসান হয় ॥৮॥

যে বুদ্ধি পেয়েছ তুমি তর্কে তাহা কখনও মেলে না
সদ্‌গুরুর উপদেশে সুজ্ঞান সম্ভব প্রিয়তম
বুঝিয়াছি নচিকেতা সত্যনিষ্ঠ হইয়াছ তুমি
সর্ব্বদা জিজ্ঞাসু যেন পাই তোমা সম ॥৯॥

যেহেতু জেনেছি আমি ধনরত্ন অনিত্য সকলই
নিত্যের সন্ধান দেয় অনিত্যের হেন সাধ্য নাই
অনিত্য আহুতি দিয়া নাচিকেত অগ্নিমুখে
নিত্য লভিয়াছি আমি তাই ॥১০॥

কামনার পরিতৃপ্তি, প্রতিষ্ঠা ধরার
যজ্ঞের অনন্ত ফল, অভয়ের পার
সুখৈশ্বর্য্য সুমহান সুবিস্তীর্ণ অবস্থান
ধৈর্য্য ভরে ধীরচিত্তে করিয়া বিচার
নচিকেতা, করিয়াছ সব পরিহার ॥১১॥

দুর্নিরীক্ষ্য গুহাবাসী গহ্বর-বিলীন
নিগূঢ় অন্তরতম দেব সনাতন
অধ্যাত্ম-যোগের বলে জানিয়া তাঁহারে
ধীরগণ হর্ষ-শোক করেন বর্জ্জন ॥১২॥

মানুষ এ আত্মতত্ত্ব পূর্ণভাবে করিয়া গ্রহণ
স্থূল ত্যজি' সূক্ষ্ম ধর্ম্ম করিল বরণ
উপভোগ করে তাহা
সত্য উপভোগ্য যাহা,
তব লাগি নচিকেতা উন্মুক্ত সত্যের সদন ॥১৩॥

[নচিকেতা বলিলেন]
ধর্ম্মাধর্ম্ম নয় যাহা, নয় যাহা কৃত বা অকৃত
ভূত ভবিষ্যৎ নয়, যা তব প্রত্যক্ষীভূত
তাই তবে করুন বিবৃত ॥১৪॥

[যম বলিলেন]
সর্ব্ববেদ যেই সত্য করেন মনন
সকল তপস্যা করে যাহার বর্ণন
যারে ইচ্ছা করি লোকে হয় ব্রহ্মচারী
সংক্ষেপে কহিতেছি—'ওম্' নাম তারই ॥১৫॥

ব্রহ্মসম এ অক্ষর, পরম ইহাই
এই অক্ষরকে জানি' যিনি যাহা চান
তিনি পান তাই ॥১৬॥

ইনিই আশ্রয় শ্রেষ্ঠ, পরম আশ্রয়
যে জানে সে ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হয় ॥১৭॥

অজাত অমৃত ইনি সদা জ্ঞানময়
কোন কিছু হ'তে ইনি উদ্ভূত ন'ন
ইঁহা হ'তে উৎপন্ন হয় নাকো কিছু কোন দিন
শাশ্বত সনাতন চিরন্তন ইনি জন্মহীন
দেহের নিধনে এঁর হয় না নিধন ॥১৮॥

হন্তা যদি মনে করে হত্যা করিলাম
হত যদি ভাবে মনে হইল মরণ
উভয়েই ভ্রান্ত তবে ; হত ইনি হন না যে,
করেন না কখনও হনন ॥১৯॥

অণু হ'তে অণীয়ান মহৎ হইতে মহীয়ান
এই আত্মা প্রাণীদের নিহিত গুহায়
ইহার মহিমা শুধু নিষ্কাম বিগতশোক
বিশুদ্ধ চরিত্রবলে দেখিবারে পায় ॥২০॥

আসীন থাকিয়া যিনি সুদূরেতে করেন ভ্রমণ
সর্ব্বগামী অথচ শয়ান
হৃষ্ট ও অহৃষ্ট সেই দেবতার কহ
মোরা ছাড়া কে জানে সন্ধান ॥২১॥

শরীরেতে অশরীরী নাস্তিতেও অস্তিত্ব যাঁহার
সে মহান বিপুল আত্মার করিয়া মনন
ধীরগণ বীতশোক হন ॥২২॥

বেদ অধ্যয়ন করি বুদ্ধিবলে শাস্ত্র পড়ি
এ আত্মার মেলে না সন্ধান
ইনি যাঁরে বর দেন তিনি শুধু পান।
তাঁহারই সকাশ
স্বীয় তনু করেন প্রকাশ ॥২৩॥

অসংযমী দুশ্চরিত্র অস্থির অসমাহিত
অধীর অশান্ত চিত্ত যিনি
জ্ঞানী হইলেও এঁরে পাবেন না তিনি ॥২৪॥

অন্ন যাঁর ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়
মৃত্যু যাঁর ব্যঞ্জনোপচার
সে আত্মা আছেন যেথা
কেবা জানে কিবা রূপ তার ॥২৫॥

(ক্রমশঃ)

ত্যাগ

স্বামী বিরজানন্দ

(লোকান্তরিত লেখকের অপ্রকাশিত ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে অধ্যাপিকা শ্রীমতী সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ কর্তৃক অনূদিত।)

ত্যাগের প্রেরণা কী অপরিসীম মহত্ত্বমণ্ডিত!

মানবের কল্পনায় কী সুমধুর সঙ্গীত-সুধাই না বর্ষণ করছে প্রাচীন ঋষিদের অনুশীলিত এই দিব্য ভাবটি। এ যেন পরমেশ্বরের প্রেম-আহ্বান, সুকোমল স্পর্শে ভাগ্য-লাঞ্ছিত, দুঃখ-পীড়িত মানবাত্মাকে মোহনিদ্রা থেকে জাগ্রত করছে। সহস্র সহস্র জন্মের পুঞ্জীভূত মালিন্যের নিরাময়, সুখকর মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য এমন আর কি আছে? উত্থান-পতন, সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় প্রভৃতি অজস্র দ্বৈত সংগ্রামের অবসানে জন্মলাভ করে যে অচঞ্চল সংপ্রাপ্তি—সকল খণ্ডিত সত্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছে যে একক সার তত্ত্ব—অপূর্ণ মানুষকে পূর্ণতায় পৌছে দেয় যে অদ্বিতীয় লক্ষ্য—সকল ধর্ম-চিন্তা ও জীবনের যা মর্মবাণী—তা ত্যাগ ছাড়া আর কি হতে পারে? ত্যাগই সেই সুদৃঢ় ভিত, যার উপর গড়ে ওঠে আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিশাল সৌধ। ত্যাগই শান্তি এবং পরম বিশ্রামের উৎস। ত্যাগই সেই বিরাট শক্তি যা এই বিশ্বজগৎকে বিশ্লেষ থেকে ধরে রাখে।

মানবাত্মা এ সংসারভূমিতে বারবার আবির্ভূত হয় অসংখ্য অতীত জন্মের সঞ্চিত সংস্কারের প্রকাশ ও সক্রিয়তার জন্যে। প্রচণ্ড শক্তি অজ্ঞানতার, তাই তো এ সংসারে ভোগ ও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই মানুষকে জন্মাবার পর থেকে দুর্নিবার আকর্ষণে অনবরত টানতে থাকে। কিন্তু, তারপর? তারপর সে কি পায়?

যযাতি একদিন আফশোষ করে বলেছিলেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে॥

অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিয়ে অগ্নি কখনও নির্বাপিত করা যায় না, তা বরং বেড়েই ওঠে। সেইরূপ ভোগতৃষ্ণা ভোগের দ্বারা মেটে না, অধিকতর প্রবর্ধিত হয় মাত্র। রাজচক্রবর্তী যযাতির এই অভিজ্ঞতার কাহিনী মহাভারতের অমৃতগাথায় বর্ণিত আছে। মহারাজ যযাতি কামকাঞ্চন-সহায়ে লভ্য সকল প্রকার ভোগ-সুখে নিমজ্জিত ছিলেন, এমন সময় মহর্ষি শুক্রের অভিশাপে তাঁকে জরাগ্রস্ত হতে হল। জরা যে সকল ভোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করল তাদের জন্য তাঁর অন্তরে দুরন্ত কামনা প্রতিনিয়ত তাঁকে বহ্নি-প্রদাহের মত দগ্ধ করতে লাগল। তখন তিনি আপন পুত্রগণকে ডেকে তাদের যৌবন তাঁকে দিয়ে তাঁর জরাভার গ্রহণ করতে বললেন। প্রথম চারপুত্র এ অনুরোধ রক্ষা করতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। কিন্তু পঞ্চম পুত্র পুরু জানাল সম্মতি। নবযৌবন-সম্পন্ন যযাতি তখন সহস্র বৎসর ধরে এ জীবনের যাবতীয় ভোগসুখ-আস্বাদনে রত থাকলেন। অবশেষে একদিন মোহজাল ছিন্ন হল, ভোগে এল তাঁর বিরক্তি। পুত্রকে ডেকে তিনি

উপরে উদ্ধৃত শ্লোকটি বললেন। ভাবলেন—এমন যদি কোনও ভাগ্যবান থাকেন যিনি একক স্বর্গ-মর্ত্যের যাবতীয় বিত্ত ও সুন্দরীদের করায়ত্ত করতে সক্ষম তাহলেও তিনি পরিতৃপ্তি পাবেন না—তৃষ্ণা তাঁর মিটবে না। এই তো এত ভোগ করলাম, কিন্তু ভোগ-তৃষ্ণা আমার দিন দিন বর্ধিতই হচ্ছে! অতএব আর নয়। এবার ভোগবাসনা ছুঁড়ে ফেলে দেব, ব্রহ্মে মনকে নিবিষ্ট কোরব।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

আমাদের দৃষ্টি বহির্মুখী, বহিঃপ্রকৃতির বস্তু-সমূহকে ভালবাসাই আমাদের স্বভাব। ক্রমাগত মানুষ তার সমস্ত প্রাণমন দিয়ে এগুলিকে আঁকড়ে ধরে ধরে অবশেষে একেবারে অসহায় হয়ে পড়ে। নিজেকে সে আর কিছুতেই নিবৃত্ত করতে পারে না। ক্রমশই সে মায়ামোহে ডুবতে থাকে। কখনও ঢেউয়ের আবর্তের শিখরে থাকে, কখনও আবার তলিয়ে যায় সমুদ্রের কোন্ গভীর নিম্নে। প্রাপ্য তার আসে সীমাহীন গভীর বেদনায়ই, সুখের ভাগ যা থাকে তা সামান্যই। কিন্তু এমনই প্রচণ্ড শক্তি মায়ার যে নিজেকে এ মোহ থেকে মুক্ত করে নিতে কিছুতেই সে পেরে ওঠে না। হঠাৎ উপস্থিত হয় বজ্রকঠিন আঘাত। নির্দয় মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে যায় প্রেমময়ী পত্নী ও স্নেহপুত্তলী সন্তান-সন্ততিদের। তাদের সে প্রাণাপেক্ষাও বেশী ভালবেসেছিল। তাদের সত্তায় সে মিলিয়ে দিয়েছিল আপন সত্তা। কী কঠিনই না বাজে সে আঘাত! মৃতদের স্মরণ করে বয়ে যায় অশ্রুর বন্যা—প্রাণে ওঠে সর্বদা হাহাকার, রাত্রিদিন ভরে যায় বিরাট শূন্যতায়, আশাহীন অন্ধকার ঢেকে রাখে তার চারিপাশ, সম্মুখে প্রসারিত যে ভবিষ্যৎ তাও সে দেখে অন্ধকারময়। তার চোখে জগৎসংসার শুধু নৈরাশ্যময়, শুধু কষ্টময় বলে প্রতিভাত হয়। এ ঘোর দুঃখ-রাত্রির কি অবসান নেই? হঠাৎ এক টুকরো আলোর ঝলক দেখা দেয় দুর্ভেদ্য অন্ধকারের বক্ষ চিরে। মনে ঝঙ্কার ওঠে : আমার জীবন, আমার সর্বস্ব দিয়ে আমি এই ক্ষণভঙ্গুর, অপম্রিয়মাণ বস্তুগুলিতে তন্ময় হয়েছিলাম। কাকে আমি ভাবছিলাম আপন? এতদিন কি একটি ছলনা-ময় স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম? যথেষ্ট হয়েছে, আর না।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

সর্বগ্রাসী মৃত্যু সকলের কাছেই হাজির হয়, কাউকে বাদ দেয় না। ধনি-নির্ধন, জ্ঞানি-অজ্ঞানী, সাধু-অসাধু, রাজা-ভিখারী—মৃত্যুর শীতল স্পর্শ কেউ এড়াতে পারে না। কে জানে কখন সে এসে দুয়ারে দাঁড়াবে? তোমার আমার অপেক্ষা করবে না সে। যে কোনও মুহূর্তে এসে হানা দিতে পারে। কার জন্যে তুমি তোমার সমস্ত জীবন ও শক্তি ক্ষয় করে কুবেরের ধনসম্পদ সংগ্রহ করবে, নির্মাণ করবে গগনচুম্বী প্রাসাদ, ছুটবে নামের পেছনে, যশের পেছনে? সব কিছুই কি এখানে ক্ষণ-স্থায়ী নশ্বর নয়? সবই চলমান, মৃত অতীতের গর্ভে ক্রমবিলীয়মান। যে পন্থায় তুমি গৌরব অর্জন কর সে পথ যে তোমায় শেষ পর্যন্ত পৌছে দেবে শ্মশানে। এই ভাবে মৃত্যুর চিন্তা তোমায় মোহমুক্ত করবে এবং পরিশেষে আনবে এই সত্যানুভূতি যে সবই বৃথা, সবই অসার। একমাত্র ভগবানই সত্য, তাঁর প্রেম এবং সেবাই হচ্ছে একমাত্র সার কাজ।

এরই নাম ত্যাগ।

প্রকৃতিতে দুটি বিরুদ্ধ শক্তির খেলা পরি-লক্ষিত হয়—একটি কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে, আর একটি কেন্দ্র থেকে দূরে নিক্ষিপ্ত করতে সচেষ্ট। একটিকে আমরা আখ্যা দিতে পারি প্রবৃত্তি বলে, অপরটিকে

বলতে পারি নিবৃত্তি। একটি হচ্ছে ক্রিয়া, অপরটি প্রতিক্রিয়া। এমন কোনও মানুষ নেই যে এই দুই শক্তির দ্বারা প্রভাবান্বিত নয়। এই মুহূর্তে গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশায় উল্লসিত হয়ে উঠছি—পরমুহূর্তেই আবার নৈরাশ্যে ভেঙ্গে পড়ছি। এই মুহূর্তে আভাস পেলাম যেন এক আলোক-রাজ্যের, আবার পরমুহূর্তে সম্মুখীন হলাম এক অন্ধকারময় অতলস্পর্শী গহ্বরের। আজ দেখছি সকলের উপর বিপুল প্রভাব আমার, কাল আমি সর্বজন-পরিত্যক্ত হচ্ছি—বন্ধু নেই, বান্ধব নেই, স্বজনহীন অবস্থা, কেউ চিনতে চায় না, কেউ গ্রাহ্য করে না। আজ ছুটছি বিশ্বপ্রকৃতির সুখসামগ্রীর ছায়ার পিছনে। এই আপাতসত্য হতে সুখ পাবার অসম্ভব কল্পনার বশে উন্মাদ হয়ে কাল অনুভব করছি এ সকল প্রয়াস বৃথা, এ প্রয়াস সফল হয় না। ছায়াকে ধরা যায় না।

মানুষ এই ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার চাকায় প্রতিনিয়ত নিষ্পেষিত হচ্ছে। এই নিষ্পেষণ তার অস্তিত্বকে যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলে। কতদিন আর নিজের সঙ্গে ছলনা ও বঞ্চনা করবে সে? কতকাল আর এ দুর্ভোগ ভোগ করবে? দুর্ভোগের ত একটা সীমা আছে। কিন্তু, এ দুর্ভোগের কি ফল? এর ফলে তার প্রাণে জাগে দারুণ বিতৃষ্ণা। মানবাত্মা সকল প্রকার আসক্তি হতে আসে পিছিয়ে।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

মানব-প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা কি দেখতে পাই? কি খোঁজে মানুষ? নিশ্চিতই সুখ খুঁজে খুঁজে বেড়ায় সে জীবনভোর। তার বেঁচে থাকার একমাত্র লক্ষ্যই সুখলাভ। জনবহুল কর্মব্যস্ত শহরের রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে দেখতে পাবে কি তাড়া সকলের, কি ঠেলাঠেলি নানাগঠনের, নানাপ্রকৃতির মানুষের মধ্যে। তাদের মুখ দেখে যদি তাদের মনকে পড়তে পারতে, দেখতে পেতে যে সকলেই ছুটে বেড়াচ্ছে কিঞ্চিৎ সুখের আশায়। নিজ নিজ মানসিক প্রবৃত্তি-অনুযায়ী ধরছে একবার এটা, আবার সেটা। মনে মনে যে সুখের কল্পনা আছে, তাকেই ক্রমাগত এ বস্তুতে সে বস্তুতে প্রক্ষেপ করছে। এই সুখের আশাতেই পুরুষ ভালবাসে নারীকে। তাকে ঘিরে কল্পনায় গড়ে তোলে সুখের স্বর্গলোক—সেখানে বিচ্ছেদ নেই, অভাব নেই, দুঃখ নেই। মৃত্যুকে পর্যন্ত ভুলে যায় সে এ অবস্থায়। সে যখন তার প্রিয়তমাকে আলিঙ্গন করে রয়েছে, তখন একথা তার মনে থাকে না যে নিজেই সে ইতঃপূর্বে মৃত্যুর শীতল আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছে। তার মনপ্রাণ সে উজাড় করে দেয় তার প্রিয়ার কাছে, বিনিময়ে চায় যে তার প্রিয়তমা একান্তরূপে তারই হবে। কিন্তু এ স্বার্থপূর্ণ সংসারে তা তো হয় না। তার ভালবাসা প্রতিদান না পেয়ে পর্যবসিত হয় নিদারুণ তিক্ততায়, স্বার্থের সংঘাতে তার বুকে এসে শুধু বাজতে থাকে তীব্র বিষময় বেদনা—ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় তার সুখের কল্পলোক। এণ্টনী সুখের সন্ধান করেছিল প্রেমের মধ্যে, ব্রুটাস যশগৌরবের ভিতর, আর সীজার আধিপত্যের মধ্যে। প্রথমোক্ত জন বিনিময়ে পেয়েছিল লাঞ্ছনা, দ্বিতীয় ব্যক্তি তিক্ততা, আর শেষোক্ত জন অকৃতজ্ঞতা—এবং পরিণামে সকলেই হল ধ্বংস। হায়রে অবিশ্বাসী মানুষের মন! বদ্ধজীব তুমি, মুক্তি প্রার্থনা করছ আর এক জন বদ্ধজীবের কাছে! তুমি কি জান না সুখদুঃখ এ জগতে বস্তুতঃ একই? সুখদুঃখের তারতম্য প্রকার-ভেদে হয়নি,

হয়েছে মাত্রাভেদে। এ দ্বৈতজগতে কোথায় সুখ? প্রকৃত সুখ দ্বন্দ্বাতীত ভূমিতে লভ্য। জেনো, অবিচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুখের উৎস একমাত্র ভগবান। তাঁর আশ্রয় গ্রহণ কর। তোমার আশা পূর্ণ হবে,—সুখ পাবে, আনন্দ পাবে।

এই হচ্ছে ত্যাগ।

মানুষের অভাব কখনও মেটে না। কিছু বা মিটলো—কিম্বা বর্তমান সব চাহিদাগুলোরই পূরণ হল—কিন্তু পরক্ষণেই দেখা দেয় নতুন নতুন অভাব। এইভাবে ক্রমাগত অভাবের আর বিরামও নেই, শেষও নেই। একেবারে রক্তবীজের রক্তকণার মত, প্রতিকণা মাটীতে পড়বামাত্র সহস্র রক্তবীজের সৃষ্টি, অবশেষে অসুরের সংখ্যা আর গোনা যায় না। এই অগণন অসুরের সঙ্গে সংগ্রাম করে জয়ী হওয়া অসম্ভব। যত বেশী অভাব উৎপন্ন হয় তত বেশী দুর্গতি হয় মানুষের, তার দুঃখের আর অবধি থাকে না। যে ব্যক্তি অল্পে সন্তুষ্ট নয়, সে কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়। প্রকৃত ধনী সেই যার কোনও অভাব নেই। সসাগরা ধরিত্রীর অধীশ্বর হয়েও যদি কোনও ব্যক্তি নিত্য অভাব-বোধে তাড়িত হয়, তবে তার চেয়ে দীনদরিদ্র আর কে আছে জগতে? একবার এক সম্রাট এক সন্ন্যাসীর গুহায় এসেছিলেন। সন্ন্যাসীকে দেখে তিনি অনুরোধ করলেন, "আপনার যা অভাব আছে আমার কাছ থেকে চেয়ে মিটিয়ে নিন।" সন্ন্যাসী উঠেই রাজার কাছে জানতে চাইলেন "আচ্ছা, আপনি কি কোনও কিছুর অভাব বোধ করেন?" রাজা জানালেন, "হ্যাঁ। আমারও অভাব আছে।" সন্ন্যাসী তখন তাঁকে বললেন—"আপনি এখান থেকে যেতে পারেন। ভিখারীর কাছ থেকে আমি ভিক্ষা করি না।" অভাব অপূর্ণতা-প্রসূত, আত্মার পূর্ণস্বরূপে যে প্রতিষ্ঠিত তার আর কিসের অভাব? নিজেকে পূর্ণস্বরূপ আত্মারূপে উপলব্ধি করাই ত্যাগের মূলকথা।

মানুষ কর্ম করতে এ পৃথিবীতে জন্ম নেয়। কোনও কাজ না করে মানুষ মুহূর্তমাত্রও থাকতে পারে না। কিন্তু সহস্র কামনা জুড়ে মানুষ কর্ম করে। এ করব তা করব, এই ফল লাভ করব, সেই ফল লাভ করব—এই তার ভাবনা। এর অনিবার্য ফল হল, বন্ধন ও দুঃখ। অহং-বোধ থেকেই আসে কর্মফলের প্রতি আসক্তি। আসক্তি মানুষের হৃদয়-দুয়ার রুদ্ধ করে দেয়, তাকে সঙ্কুচিত করে, দুর্বল করে তোলে তাকে। অনাসক্তি করে আত্মাকে নির্মল। সেইজন্য অনাসক্ত হয়ে কর্ম করতে হয়। কর্মযোগের এই হল মূলকথা। গীতায় এ প্রসঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্মে তোমার অধিকার, কর্মফলে নয়।"

এই হচ্ছে ত্যাগ।

অজস্র দুঃখের আকর এই সংসার—বহু বিপদ এখানে আকীর্ণ—বহু মলিনতায় পরিপূর্ণ এই পৃথিবী। জগৎ মনের একটি ভ্রান্তিমাত্র—শুধু মায়ার খেলা। আমরা প্রত্যেকেই এই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে চলেছি।

কবি বলেছেন,

"Lo! as the wind is, so is mortal life,
A moan, a sigh, a sob, a storm, a strife!"

"শোন শোন বন্ধু! এ মর জীবন বায়ুর ন্যায় অস্থির। এ যেন মুহূর্তের শোকোচ্ছ্বাস, একটী মাত্র টানা দীর্ঘশ্বাস। একসময়ে চাপা কান্না, হঠাৎ আসা যেন ঝড়, হঠাৎ ওঠা একটি দ্বন্দ্ব।" বস্তুতঃ জীবন একটি কারাগার।

শাশ্বত আত্মা, স্বরূপতঃ যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডরূপ জড়-বস্তুর গণ্ডীর দ্বারা আবদ্ধ হতে পারে কি? আমাদের এর সীমা পার হয়ে যেতে হবে বহুদূর। কারণ, কালের গণ্ডী পার হয়ে, কার্যকারণের গণ্ডী পার হয়ে আত্মার স্বরূপ-স্থিতি। তাইত মানবাত্মাকে স্থানকালের গণ্ডী, কার্যকারণের গণ্ডী ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলতে হয় যেমন করে নাকি প্রস্তর-অভ্যন্তরস্থ এক বিন্দু জল কালে বিশাল পর্বতকে উৎপাটিত করে। এই যে সকল গণ্ডী ভেদ করে যাওয়া, এই যে সাহসভরে এগিয়ে আসা প্রকৃতির রহস্যময় মুখাবরণ ছিন্ন করে ফেলে দিতে, এরই নাম ত্যাগ।

এইগুলি হচ্ছে ত্যাগের মূলকথা। এ কথা বলে দেওয়া বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন যে এসকলই হচ্ছে অন্তঃপ্রকৃতির কার্য, মানবের মনের উৎকর্ষ-সাধনের পরিণতি। ত্যাগ মানে নয় কাষায়-বস্ত্র, মুণ্ডিত শির বা সন্ন্যাসের বাহ্যাড়ম্বর। ত্যাগের প্রকৃত মর্ম ক্ষুদ্রকে অসীমে বিলীন করা। চৈতন্যদীপ্ত দিব্যসত্তার মধ্যে—আপনার ব্যক্তিসত্তাকে চিরতরে বিসর্জন দেওয়া। এমনকি অতুল ঐশ্বর্য পরিত্যাগ এবং ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণও প্রকৃত ত্যাগ আখ্যা পেতে পারে না যদি পূর্বজীবনের পদমর্যাদাবোধ থেকে যায় মনের মধ্যে। ক্ষুদ্র অহংকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারলেই মানবাত্মা পূর্ণতা লাভ করতে পারে।

প্রাণের মধ্যে এই প্রকৃত ত্যাগ প্রতিষ্ঠিত হবার পরই সত্যিকারের বেঁচে থাকা হয় সুরু। ত্যাগের প্রতিষ্ঠার পরই প্রকৃত ধর্মজীবনেরও হয় আরম্ভ। ত্যাগের দ্বারাই লোভ ও স্বার্থবুদ্ধিরূপ আগাছার উচ্ছেদ হয়, পরাজ্ঞান-লাভে প্রস্তুতি আসে মনে। ত্যাগ বিনা মুক্তিলাভ অসম্ভব। বেদ বলেছেন,—ন প্রজয়া ন ধনেন ন চেজ্যয়া, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ। ভর্তৃহরি বলছেন,—সর্বং বস্তু ভয়ান্বিতং ভুবি নৃণাং বৈরাগ্যমেবাভয়ম্।

এ জগতে সব কিছুই মানুষের কাছে আনে ভয়, এক মাত্র বৈরাগ্যই হচ্ছে অভয়।

প্রাচীনকালে সত্যদ্রষ্টা ঋষিরা আর্য-জীবনকে বিভক্ত করেছিলেন চারভাগে। চারভাগের প্রথম ছাত্রাবস্থা—ব্রহ্মচর্য আশ্রম। দ্বিতীয় গার্হস্থ্য—এ অবস্থায় সংসারধর্ম পালনীয়। তৃতীয় বানপ্রস্থাশ্রম—সস্ত্রীক বনগমন করে ঈশ্বরচিন্তা করবে মানুষ। চতুর্থ অবস্থা পূর্ণত্যাগের—সন্ন্যাসাশ্রম নামে অভিহিত। এই পরিকল্পনার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে স্বতই প্রতিভাত হয় যে প্রত্যেক পূর্ববর্তী অবস্থা পরবর্তী উচ্চাবস্থার প্রস্তুতি। জীবনের শেষ লক্ষ্য হচ্ছে সর্বত্যাগ বা পূর্ণসন্ন্যাস।

এই ত্যাগের মহান আদর্শ ভারতীয় ধর্ম ও ভারতীয় জীবনের চিরন্তন মর্মবাণী। এদেশের সকল শাস্ত্রেরই প্রধান কথা এই ত্যাগ। পূর্বোক্ত অনন্যসাধারণ ঋষিদত্ত জীবন-পরিকল্পনা, যা এককালে আর্য ঋষিরা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন, একদিন আশ্চর্য ফল প্রসব করেছিল—ভারতকে এবং ভারতীয় জাতিকে বিশ্বের দরবারে উচ্চতম আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল।

জগতে এ পর্যন্ত যত মহৎকার্য অনুষ্ঠিত হয়েছে, ত্যাগের ভাব ব্যতীত তাদের কোনটিই সম্ভবপর হয় নি। জগতে যে সকল মহাপ্রাণ আচার্য মানুষকে উন্নতির পথে নির্দেশ দিয়েছেন, সকলেই জাগতিক সুখসম্পদ ত্যাগ করে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিয়েছেন কৃচ্ছ্রতা। অবোধ জ্ঞানহীনের কাছ থেকে মাথা পেতে নিয়েছেন আঘাত। এই সকল দেব-মানবের নাম আজ মানুষের হৃদয়-মন্দিরে অমর হয়ে রয়েছে—এখনও মানুষ গভীর প্রেমে তাঁদের স্মরণ করছে। ইতিহাস তার

অসংখ্য সাক্ষ্য বহন করে। পবিত্রতা-ঘন-বিগ্রহ শুকদেব, দার্শনিক তত্ত্বের জন্মদাতা মহামুনি কপিল, প্রেমাবতার খৃষ্ট, রাজবংশ-সম্ভূত ভগবান বুদ্ধ, যাঁর মনীষার প্রশংসায় আজও বিদ্বৎসমাজ মুখর সেই জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ শঙ্কর, ভক্তিপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য এবং সর্বশেষে উল্লেখ করলেও যাঁর নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য, যিনি চরিত্রবিভায় ও মাধুর্যে অতিক্রম করেছেন পূর্বাচার্যদের, যিনি তাঁদের সমষ্টিমূর্তি, যাঁর মধ্য দিয়ে পূর্বাচার্যগণ আমাদের কাছে অধিকতর বোধগম্য হয়েছেন—সেই ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস এই সকল বিশ্বনেতা আচার্যগণের সকলেই ছিলেন ত্যাগব্রতী। যীশুখ্রীষ্ট তাঁর জীবন দিয়েছিলেন ক্রুশে, কিন্তু ভেবে দেখুন, তাঁর আত্মাহুতির যজ্ঞাগ্নি থেকে পরে কত শত অনুগামী উৎপন্ন হয়েছিলেন। এমনই বিপুল প্রভাব ত্যাগের? ত্যাগ কর, সব কিছু পাবে। জগৎকে আজ এই কথা অনুধাবন করতে হবে। আজ যদি মানুষ অগ্রগতি চায় এই মহান আদর্শেই তাকে দীক্ষা নিতে হবে—আজ দিকে দিকে এই শিক্ষার প্রদীপ্ত আলোকই ছড়িয়ে দিতে হবে।

পরিশেষে, আমার পুণ্য মাতৃভূমির উদ্দেশে রেখে যাই বন্দনা-গান। স্মরণ করি একদা এই ভূমিই জন্ম দিয়েছে শুক, কপিল, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, রামকৃষ্ণকে। এর শীর্ষদেশে স্মরণাতীত কাল হতে দণ্ডায়মান ঐ মহান হিমালয়, তার তুষারমণ্ডিত শিখরমালা স্পর্শ করেছে আকাশকে, তার জনহীন গুহা, নীরব জলাশয়ে আভাস পাওয়া যায় পরমৈশ্বর্যময় এক জীবনের। বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে এই হিমগিরিই বৈরাগীর অন্তরের দীপ্তরাগ-রেখার প্রতিচ্ছবি। এই পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করে, এই পুণ্যছবিখানি সম্মুখে পেয়ে, এই সকল মহৎ জীবন দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে এ কি সম্ভব যে আমরা হব আত্মবিস্মৃত? আমাদের পিতৃপিতামহদের প্রতি করব বিশ্বাসঘাতকতা? আমাদের হাত হতে চ্যুত হবে গৌরবমণ্ডিত অতীতকালের সেই পতাকা, —বিজয়ী ভারতবর্ষের সেই জয়চিহ্ন? মনে হয় এই দেশে সে অশুভ দিন কখনও আসবে না। উত্তরবংশীয়েরা, তোমরা অবহিত হও, তোমাদের মনশ্চক্ষু সেই মহান আদর্শে স্থিরনিবদ্ধ কর, লাভ কর তোমরা ত্যাগ-লভ্য সেই পূর্ণতা।

আশা

শ্রীধীরেন্দ্রকুমার বসু

প্রেমের খেলায় ডাকিবে মোরে
আশা ছিল যে মনে
ভরিবে প্রাণ লীলা-মধুর রসে।
তোমারি কাজ জীবন ভরে
সাধিতে প্রাণে প্রাণে
প্রেমের গান শ্রবণে যেন পশে।
তোমার পথ ধূলির পরে
লুটায়ে দিতে হিয়া
প্রাণের ফুল ফুটাবে কবে প্রভু?
লীলার ছলে পরশ ক'রে
পূরাবে মধু দিয়া
দিয়েছ যত ভরে নি হিয়া তবু।

তোমার পূজা-বেদীর তলে
দূর্বাদলের মত
মিশিয়া রব নম্র নত হয়ে।
সে দিন শুধু নয়ন-জলে
সাধিব প্রেম-ব্রত
তব চরণ-স্বর্ণরেণু লয়ে।
দিবস নিশি ভরিয়া কবে
বাজিবে মনোবীণ
যে সুরে রয় তোমারি জয়গান।
আমারে তুমি পাঠালে ভবে
করিয়া দীন হীন
রাজাধিরাজ, করো জীবনদান।

স্বামিজীর সান্নিধ্যে

৺শচীন্দ্রকুমার বসু

(স্বর্গীয় লেখকের কতকগুলি পুরাতন পত্র হইতে সঙ্কলিত। ১৩২৯ সালের মাঘ ও চৈত্র সংখ্যার উদ্বোধনে এই সঙ্কলনের পূর্বাংশ প্রকাশ করা হইয়াছিল।—উঃ সঃ)

৬ই নভেম্বর, ১৮৯৮। সন্ধ্যার পর কলিকাতা বাগবাজারে বলরাম বসু মহাশয়ের বাড়ীতে স্বামিজী ও রাখাল মহারাজ কথাবার্তা বলিতেছিলেন। স্বামিজী বলিলেন,—"দেখ রাখাল, আমি আগে মনে করতুম, বুঝি child-marriage (বাল্য-বিবাহ) ভাল, ছেলেবেলা থেকে একটা ac-quaintance (পরিচয়) হয়ে love (ভালবাসা)-টা deep (গাঢ়) হয়। এখন আমার সে mis-takeটা (ভুল) একেবারে গেছে; কারণ ও system (রীতি)-এর principle (আদর্শগত ভাব)-টাই খারাপ। গোলামীর উপর যে relation (সম্বন্ধ)-টা based (স্থাপিত) সেটা আবার কখন ভাল হতে পারে? যেখানে মেয়েদের liberty (স্বাধীনতা) নেই, সে জাত কখনো prosper (উন্নতিলাভ) করতে পারে? এ দেশের যত law (আইনকানুন), যত love (ভালবাসা), যত স্মৃতি সমস্ত মেয়েদের দাবিয়ে রাখবার জন্য হয়েছে। ওঃ, বলতে আমার গা শিউরে উঠছে—এই দেশ আজ দুই হাজার বছর জগদম্বার অপমান করছে; সেই পাপে এত ভুগ্‌ছে; তবু চৈতন্য নেই। যদি ভাল চাস্, জগদম্বার অপমান আর করিসনি। না কথা শুনিস, খা জুতো, খা লাথি! রুষ আসুক, জার্মেণী আসুক, জাতের পর জাত আসুক, অনন্তকাল পায়ে থ্যাংলাক্। লোকদের একটা false idea of chastity-তে (সতীত্বের ভ্রান্ত ধারণা) মাথাটা খেয়েছে—ঘোরতর selfishness (স্বার্থপরতা)-এর manifestation (প্রকাশ) বই আর কিছু নয়।"

আমি।—কেন মহারাজ, ওদের দেশে তো স্বাধীনতা আছে, তবু ওদের দেশেও এত ব্যভিচার কেন?

স্বামিজী।—তা কি আমি বলছি, ওদের দেশে সব ভাল? তবে ওদের দেশে এতটা brutality (পাশবিকতা) নেই, ওরই মধ্যে কেমন একটা poetry (কবিত্ব) আছে। তুই যেমন বালক! কোন দেশটা ভাল আছে বল তো!…এখন একটু চুপ কর দেখি, সব ঠিক হয়ে যাবে। বাবা, সতী সতী করে ঢের চেঁচিয়েছ, বাঁশ দিয়ে হাজার হাজার বিধবা পুড়িয়েছ। একটু ক্ষান্ত হও দেখি, এখন জন কতক 'সতা' হও দেখি—আমি বুঝি।…যত খারাপ মেয়েমানুষ, যত দোষ করেছে, যত কাম, passion (আসক্তি) মেয়েমানুষের—না?…hypocrites and selfish to the backbone (ভণ্ড ও স্বার্থপরের দল)। ছাড় দেখি জগদম্বার অপমান—দেশটা হুড়্ হুড়্ করে এখনি উঠে পড়বে।……রাম! রাম! এখন marriage (বিবাহ) মানে একটা মেয়েমানুষকে চিরকালের জন্য গোলাম বা বাঁদী করা।…তাদেরও কোন education (শিক্ষা) নেই—হাজার হাজার বছর ঐ করে

করে মনে করছে—We are doomed for that (আমরা ঐরূপ নিয়তি নিয়ে জন্মেছি)… ওদের দেশে এখনও রাখাল,…poetry (কবিত্ব) আছে।…আর দেখনা, এই সব মেয়েরা যারা এখানে এসেছে এদের কাকেও মা বলি, কাকেও বোনের মত দেখি—এদের কারও কোন কুভাব একদিনের তরে হয়? Chastity! chastity আর কিছু নয়—আমার ভোগ্যা স্ত্রী…আমি যথেচ্ছ ভোগ কোরব!

পরদিবস অর্থাৎ মঙ্গলবার, যাইয়া দেখি স্বামিজী বসিয়া আছেন।…স্বামিজী বলিতেছেন, বাংলাদেশে যেমন তরকারী-ব্যবস্থা এমন কোথাও নেই; তবে North-West-এ (উত্তর-পশ্চিম) রাজপুতানায় বেশ আহারের ব্যবস্থা আছে।

আমি।—মহারাজ, ওরা কি খেতে জানে? সব তরকারিতে টক দেয়।

স্বামিজী।—তুমি বালকের মত কথা কইছ যে। কতকগুলি লোকদের দিয়ে তুমি সমস্ত জাতটা judge (বিচার) করবে? Civilization (সভ্যতা) তো ওদের দেশেই ছিল—Bengal (বাংলায়)-এ কোন কালে ছিল? ওদের দেশে বড় লোকের বাড়ী খাও তোমার ভ্রম ঘুচে যাবে।…আর তোমার পোলাওটা কি? Long before (অনেক আগে) 'পাক-রাজ্যেশ্বর' গ্রন্থে পলান্নের উল্লেখ আছে; মুসলমানরা আমাদের copy (নকল) করেছে। আকবরের সিন্-ই-আকবরীতে কি রকম করে হিন্দুর পলান্ন প্রভৃতি রাঁধতে হয় তার রীতিমত বর্ণনা আছে। Bengal-এ (বাংলা) আবার civilization (সভ্যতা) কবে হল? আমি তোদের রোজ রোজ বলছি—Cape Comorin (কন্যাকুমারী) থেকে একটা লাইন যদি আলমোড়া অবধি টানা যায়, তাহলে পূর্বদিকটা একেবারে অনার্য, অসভ্য; চেহারাও সব কেলে কেলে ভূত, আবার বেদ-বিগর্হিত অবরোধ-প্রথা, বিধবা পোড়ান প্রভৃতি অনার্যপ্রথা, কুলগুরু—। আর পশ্চিম দিকটা—সভ্য, আর্য, manly (তেজস্বী) কি আশ্চর্য! ……পশ্চিমদিকের মানুষ সব সুন্দর—স্ত্রীলোক সব beautiful (রূপসী)—গ্রামগুলি type of cleanliness (পরিচ্ছন্নতার আদর্শ)—বেশ healthy flourishing (স্বাস্থ্যকর ও সমৃদ্ধ)। ধর্মও দেখ, বাংলায় কিচ্ছু নেই। ত্যাগী কটা জন্মেছে?

* * *

মিস্ নোবল্ স্বামিজীর সহিত ২০শে জুন তারিখে গোলকুণ্ডা জাহাজে চড়িয়া বিলাত গিয়াছেন। আমি অবশ্য প্রিন্সেপ্ ঘাটে উপস্থিত ছিলাম। তিনি মঠের সন্ন্যাসিগণের নিকট অনেকটা সুখ্যাতি লাভ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শেষ বক্তৃতা কালীঘাটে মায়ের নাটমন্দিরে হইয়াছিল। স্বামিজী এই বক্তৃতায় (বিষয়—কালী) সভাপতিত্ব করিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল—হালদারেরা এই বিষয়ে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। তাঁহাদের তখন স্বামিজীর উপর বিশেষ ভক্তি হইয়াছিল। তাহার কারণ, ইহার এক সপ্তাহ পূর্বে স্বামিজী সহসা কালীঘাটে মায়ের শ্রীমন্দিরে যাইবার ইচ্ছা করিয়া ২।৩ জন মহারাজ ও মিস্ নোবল্ সহ তথায় যাইলেন—হালদারেরা সসম্ভ্রমে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিলেন। মায়ের মন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটিত ছিল। মায়ের প্রসন্ন শ্রীমুখমণ্ডল দর্শন করিয়া বিবেকানন্দের হৃদয়ে ভাবসাগর উথলিয়া পড়িল। বেদান্তের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভাবরাশি ছুটিয়া বাহির হইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে তাহার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল—বিশাল লোচনদ্বয় আরক্তিম হইল, দরদর বেগে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল—আর কমনীয় কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল অনর্গল সুন্দর স্তবরাজি; হৃদয় আনন্দে পরিপূর্ণ—তিনি অঞ্জলি ভরিয়া

চন্দনচর্চিত জবাকমল মায়ের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন, সকলকে দিতে বলিলেন। কালীঘাট-বাসী সকলে তাঁহার ভাব দেখিয়া বিস্মিত হইল। মিস্ নোব্‌ল তথায় তৎপরে বক্তৃতা দিবেন এইরূপ স্থির হইয়াছিল। নির্দিষ্ট দিনে লোক ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল—অবশ্য স্বামিজীকে দেখিতে ও শুনিতে। আমিও গিয়াছিলাম, মানিক দাদাও গিয়াছিলেন; কিন্তু যখন অসুস্থতার দরুন স্বামিজী আসিতে পারিবেন না এই খবর আসিল তখন সকলে খুব নিরাশ হইলেন। যাহা হউক ঠিক ৬ টার সময় মিস্ নোব্‌ল খালি পায়ে নাটমন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং প্রায় আধঘন্টা বলিলেন, বক্তৃতার পর সকলে খুব সাধুবাদ দিলেন।

মিস্ নোব্‌ল-এর নাকি ভারি তিতিক্ষা ছিল—মাছ-মাংস খাইতেন না। একখানি কি দুইখানি পাউরুটি ও ফলমুলাদি খাইয়াই জীবন-ধারণ করিতেন। মাতাঠাকুরাণীর প্রতি তাঁহার খুব ভক্তি। তাঁহার স্কুল টাকার অভাবে কিছুই চলিতেছে না। এবার নাকি বিলাতে টাকা তুলিবার উদ্দেশ্যেই যাইতেছেন।

মঠের উজ্জ্বলতম জ্যোতি কিছু দিনের জন্য অন্তর্হিত হইয়াছে—বেলুড় মঠ একেবারে শ্রীহীন। যাইবার আগের দিবস মঠে স্বামিজীর বক্তৃতা হইয়াছিল। শুনিয়া সকলের ধমনীতে উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হইল। সকলেরই অন্ততঃ ক্ষণেকের জন্য মনে হইল যে আমরা মানুষ। স্বামিজী খুব উৎসাহের ভরে বলিলেন, "বাবা সব, তোরা মানুষ হ—এই আমি চাই। ইহার কিছুমাত্র সফল হলেও আমার জন্ম সার্থক হবে।" সকলকে বলিলেন, "তোমাদিগকে অধিক আর কি বলিব? তোমরা সকলে সেই মহাপুরুষের (শ্রীরামকৃষ্ণদেবের) পদাঙ্ক অনুসরণ করবার জন্য যত্নবান হও—জীবনে কর্মের ও বৈরাগ্যের সমাবেশ কর।" তাহার পরদিন কলিকাতায় আসিলেন। বেলা তিনটার সময় প্রিন্সেপ্ ঘাটে যাইবেন স্থির হইল। তাঁহার জন্য কোন গাড়ী যাইলে ভাল হয় এইরূপ কথাবার্তা হইতেছিল—কোন স্থিরতা হয় নাই; সৌভাগ্যক্রমে গর্গের (মহিষাদলের রাজা) Bruham ও Arab pairs শ্যামবাজার stable হইতে আনাইয়াছিলাম। স্বামিজী দয়া করিয়া তাহাতে গেলেন। স্বামিজী এবারে সমুদ্রযাত্রার পোষাক বদলাইয়াছিলেন—আসাম সিল্ক্ এর কোট এবং ১০।১২ টাকা দামের Cabin shoe আর Night cap; হরি মহারাজেরও এই ব্যবস্থা। But to tell you the truth he was not looking well. ঘাটে plague এর examination হইয়াছিল—খুব কড়া পরীক্ষা। প্রায় ৪০।৫০ জন লোক সমবেত ছিলেন। বেলা ৫ টার সময় লঞ্চ্ আসিল। আমাদের নয়নাভিরাম স্বামিজী তাহাতে উঠিলেন সকলের নিকট বিদায়-গ্রহণ করিলেন। হরি মহারাজের মুখের ভাব খুব গম্ভীর হইয়াছিল। মঠের সকলেই সেখানে উপস্থিত। গঙ্গাধর মহারাজ মহুলা হইতে আসিয়াছিলেন। লঞ্চ্ ছাড়িবার সময় সকলেরই চোখ ছলছল করিতে লাগিল—কাহারও কাহারও বা চোখ জলে ভরিয়া গেল। তৎপর সেই ৫০ জন লোক এক-সঙ্গে স্বামিজীর উদ্দেশে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। গঙ্গাতীরে সেই দৃশ্য বড়ই সুন্দর দেখাইয়াছিল। অপরাপর সাহেবেরা অবাক হইয়া চাহিয়া দেখিল। তাঁহাদের তিন জনেরই প্রথম শ্রেণীর টিকিট। ক্রমে লঞ্চ্ ছাড়িয়া দিল। যতক্ষণ দেখা গেল সকলে রুমাল প্রভৃতি ঘুরাইতে লাগিলেন। ক্রমে লঞ্চ্ যখন অদৃশ্য হইয়া গেল, সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ—"বিসর্জি প্রতিমা যথা দশমী দিবসে।"...

ধর্ম্মসমন্বয়-সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

রেজাউল করীম

পৃথিবীতে নানাধর্ম্ম প্রচলিত আছে। সকল ধর্ম্মের উদ্দেশ্য মানুষের সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন—আধ্যাত্মিক, মানসিক, নৈতিক ও ঐহিক। শুধু মানুষের নহে মনুষ্যেতর জীবেরও কল্যাণ-সাধন ধর্ম্মের অন্যতম উদ্দেশ্য। আদিযুগে যখন মানুষের শৈশব-অবস্থা তখনও মানুষ এই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণের কথা চিন্তা করিয়াছে। যে যুগে তাহার যতটুকু বুদ্ধি ছিল সে তদনুসারেই এই সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণবোধ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল। এই বোধ-শক্তি ক্রমে ক্রমে বিকশিত হইয়াছে। মানুষ উপলব্ধি করিয়াছে যে, সে ক্ষুদ্র শক্তি তাহার নিতান্ত সীমাবদ্ধ। প্রাকৃতিক শক্তি নানাভাবে মানুষকে বিপর্য্যস্ত করিতে চাহিয়াছে। কিন্তু তবুও অসহায়তা বোধ করিলেও মানুষ এই বিরুদ্ধ শক্তি দেখিয়া বিচলিত হয় নাই। সকল শক্তির কেন্দ্রকেই সে অনুসন্ধান করিয়াছে। সে দেখিয়াছে ও উপলব্ধি করিয়াছে যে, প্রাকৃতিক শক্তির উর্দ্ধে একটা অনন্ত শক্তি আছে। তাহার সন্ধান পাইলেই তাহার সকল অসুবিধা দূর হইবে, তাহার শান্তি আসিবে। এই অনন্ত শক্তির মূল উৎস সন্ধান করিতে গিয়া মানুষ ঈশ্বর-আবিষ্কার করিয়াছে। কতক অন্তরের অনুভূতি, কতক প্রয়োজনের তাগিদ, আর কতক অভিজ্ঞতা হইতে সে বুঝিয়াছে ঈশ্বরই চরম সত্য, ঈশ্বরই পরম মঙ্গলময়, আর ঈশ্বরই মানব-জীবনের এক মাত্র আরাধ্য দেবতা। পরম শক্তিমান, কল্যাণময় ও সদাচিন্ময় ঈশ্বর-আবিষ্কার সীমাবদ্ধ মানুষের চরম আবিষ্কার। মানুষ ক্ষুদ্র, আর ঈশ্বর বিরাট ও মহৎ। ঈশ্বরতত্ত্ব লাভ করিয়া মানুষ সমুদয় সৃষ্ট জীবের উর্দ্ধে স্থান পাইয়াছে। মানুষ ব্যতীত অন্য কোন জীবের পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অর্জ্জন করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। মানুষের মধ্যে এমন একটি শক্তি ও প্রতিভা নিহিত আছে যে, কেবলমাত্র তাহারই পক্ষে ঈশ্বর-জ্ঞানলাভ সম্ভব হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে মানুষ বুঝিল যে, ঈশ্বর-প্রাপ্তিই চরম প্রাপ্তি। ঈশ্বর-লাভ ব্যতীত জগতে মানব-জীবনের আর কোন সার্থকতা নাই।

পৃথিবীতে যুগে যুগে ঋষি মুনি সাধু সজ্জন সেণ্ট্ পয়গম্বর আসিয়াছেন। তাঁহারা গভীর অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা ঈশ্বরকে উপলব্ধি করিয়াছেন ও সাধারণ মানুষকে ঈশ্বরলাভের পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বরের স্বরূপ-সম্বন্ধে মোটামুটি একটি ধারণা দিয়াছেন। নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা হইতে জন-সাধারণকে এই শিক্ষা দিয়াছেন যে, ঈশ্বর-চিন্তাই আসল বস্তু। ঈশ্বরগত প্রাণ লইয়া জীবন গঠন করিলে প্রকৃত শান্তি ও পরমার্থ পাওয়া যাইবে; এতদ্ব্যতীত মানুষ পশুর তুল্য।

মানুষ ঈশ্বরকে বুঝিল। কাহার কাহার ঈশ্বর-দর্শনও হইল। ইহা ত কতিপয় সাধকের ব্যাপার। কেমন করিয়া সর্ব্বসাধারণের ভাগ্যে ঈশ্বর-দর্শন হয়, আর কেমন করিয়াই বা তাঁহাকে পাওয়া যায় ইহাই হইল সমস্যা।

ঈশ্বর-দর্শনের উপায় অনুসন্ধানেরই অন্য নাম ধর্ম্ম। প্রাচীন কালের আদিম মানুষ—যাহাদের আমরা অসভ্য বলি, তাহাদের মধ্যেও ঈশ্বর-সম্বন্ধে একটা ধারণা ছিল। আর তাঁহাকে পাওয়ার জন্য তাহারাও একটা পন্থা আবিষ্কার করিয়াছিল। সাঁওতালগণ যাঁহাকে বলে 'মারাং বুরু' তিনিও ঈশ্বর। সাঁওতাল-গণের পূজা-পদ্ধতি ও আচার-নিষ্ঠাকেও 'ধর্ম্ম' না বলিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই। এই ভাবে মানুষ সত্যের পথে যেমন যেমন অগ্রসর হইয়াছে, তাহার ঈশ্বর-প্রাপ্তির পন্থারও তেমনি পরিবর্ত্তন হইয়াছে। মানুষের অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। সে এক স্তর হইতে উন্নততর স্তরে উপনীত হইয়াছে। কিন্তু তবুও শ্রদ্ধার সহিত সে যাহাই নিবেদন করিয়াছে তাহা সেই ঈশ্বরের উদ্দেশেই করিয়াছে। এই সত্য-নিষ্ঠার পন্থাই ত ধর্ম্ম। কেহ আগে উন্নত হইয়াছে, কেহ পরে উন্নত হইয়াছে—সকলেই ধর্ম্মকে কেন্দ্র করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। ঈশ্বর-প্রাপ্তির পন্থা হইতে ধর্ম্মের উৎপত্তি। সুতরাং সকল ধর্ম্মের একমাত্র লক্ষ্য ঈশ্বর-প্রাপ্তি। প্রশ্ন এই যে, তাহাই যদি হয় তবে জগতে এত ধর্ম্ম কেন? আর বিভিন্ন ধর্ম্মের মধ্যে এত রেষারেষি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাই বা কেন? দেশকালপাত্র-ভেদে মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশ বিভিন্ন হইবেই। ধর্ম্মের বাহ্যিক ক্রিয়াকাণ্ড ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই আছে পার্থক্য, কিন্তু উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ব্যাপারে কোনই পার্থক্য নাই। আর রেষারেষি সে ত সাধারণ মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ধর্ম্মবোধ না থাকিলে ইহা চরম আকার ধারণ করিত। ধর্ম্মবোধই মানুষের শয়তানী প্রবৃত্তিকে চরম আকার ধারণ করিতে দেয় নাই। ধর্ম্মবোধ যখন পূর্ণ ও চরম হইবে, তখনই মানুষ প্রকৃত দেবত্বে উন্নীত হইবে। বিভিন্ন মানুষের আকার, প্রকৃতি, প্রবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ে বহু পার্থক্য আছে। ধর্ম্মের বাহিরের ব্যাপারে সেই প্রকার পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু মূল লক্ষ্য-সম্বন্ধে কোথাও কোন গণ্ডগোল নাই। লক্ষ্য এক, পন্থা বিভিন্ন—ইহাই ত সৃষ্টির নিয়ম। প্রচলিত ধর্ম্মসমূহের বিধি-ব্যবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, সকল ধর্ম্মের মধ্যে মৌলিক ঐক্যের যোগসূত্র আছে। আচার-পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য আছে, পূজা-প্রণালীর মধ্যে বিভিন্নতা আছে, কিন্তু মূল লক্ষ্য-বিষয়ে কোথাও কোন বিরোধ নাই। সেইজন্য আমরা আশা করি, পৃথিবীতে এই ধর্ম্ম-সমন্বয়ের সম্ভাবনা একেবারেই কল্পনাতীত ব্যাপার নহে।

বর্ত্তমান জগতে যে কয়েকটি ধর্ম্ম প্রচলিত আছে, তাহাদের সকলের মধ্যেই মৌলিক ঐক্য দেখা যাইবে। প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্ম, খৃষ্টান ধর্ম্ম ও ইসলাম ধর্ম্ম—এ গুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যে একই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস, সৎ কর্ম্মের দ্বারা ও মানব-সেবার দ্বারা ঈশ্বরলাভ ও আত্ম-শুদ্ধির জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা—এইগুলিই হইল প্রত্যেক ধর্ম্মের মৌলিক নীতি। এই দিক দিয়া এই সব ধর্ম্মের মধ্যে কোন বিরোধ নাই। বড়ই আনন্দের কথা যে, রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই ভাবেই সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ প্রচার করিয়াছেন—শুধু প্রচারই নহে, তিনি নিজের জীবনে সে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শে বিশ্বাসী তাঁহারা অপরকে ধর্ম্মান্তরিত করার নীতি স্বীকার করেন না। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মেই মুক্তি আছে, প্রত্যেক পদ্ধতিতেই ঈশ্বর

পাওয়া যায় ও মানুষের সেবা করিবার সুযোগ আছে। আজ রাজনৈতিক কারণে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সখ্যের যথেষ্ট অভাব দেখা দিয়াছে। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি যে, যদি উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসিগণ ধর্ম্মকে অন্তর দিয়া গ্রহণ করেন ও উদারতার সহিত সকল ধর্ম্মকে সত্যের বিভিন্ন দিক বলিয়া স্বীকার করেন, তবে সব বিরোধের মূল কারণ দূর হইয়া যাইবে। সাধারণ লোক ধর্ম্মের মূলনীতি জানে না বলিয়াই যত গণ্ডগোল ও কোলাহল। আমি ত নিজে বিশ্বাস করি যে, মুসলিম হইয়াও হিন্দু, খৃষ্টান বা অন্য কোন ধর্ম্মের সার সত্য গ্রহণ করিলে আমার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের কোনই অঙ্গহানি হয় না। বরং হৃদয় আরও প্রসারিত হয়। সেই জন্য একথা জোর গলায় বলিতে পারি যে, এক জন লোক একই সময়ে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সবই। আমি কোরআন মানি, সুতরাং আমি মুসলমান। আমি বেদ-উপনিষদ-গীতা মানি, সুতরাং আমি হিন্দু; আর বাইবেল মানি, সুতরাং আমি খৃষ্টান। বেদ-গীতা-বাইবেল মানিলে আমার কোরআনকে কোনক্রমেই অমান্য করা হয় না। রাজনৈতিক কূটচালের দ্বারা নহে, এই ধর্ম্মবোধের দ্বারাই ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের মধ্যে সত্যকার সৌহৃদ্য স্থাপিত হইবে—এ বিশ্বাস আমার আছে।

দুঃখের বিষয় যে, সাধারণ মানুষ উদার দৃষ্টিভঙ্গী দিয়া বিভিন্ন ধর্ম্মকে দেখে না। মনে করে যে, প্রত্যেকটি ধর্ম্মই অপরের বিরোধী। বিরোধ সৃষ্টি করিবার জন্য মানুষ ঈশ্বর-ভজনা করে না। সকলেই ঈশ্বরের সন্তান এই নীতি স্বীকার না করিলেই বরং ঈশ্বরের মহতী মর্য্যাদার অবমাননা করা হয়। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এই উদার ধর্ম্ম-বোধের আদর্শই প্রচার করিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষ ধর্ম্মের দেশ। প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণ অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যে যে তত্ত্ব বিশ্বকে দিয়াছেন, তাহাতে সঙ্কীর্ণতার স্থান নাই। তাই দেখি ইউরোপের মত ভারতে ধর্ম্মের জন্য রক্তবন্যা বহে নাই। ভারতবর্ষ উদারভাবে সকল বিরোধীকে স্বীকার করিয়াছে। বিশেষ করিয়া হিন্দু ধর্ম্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা কোন দিন exclusive salvation নীতি স্বীকার করে নাই। সব ধর্ম্মেই মুক্তি আছে—যত মত তত পথ—ইহা শুধু রামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা নহে, ইহাই ভারতের শাশ্বত নীতি। উদারভাবে ইসলাম ধর্ম্ম-সম্বন্ধে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, ইহার মূলনীতির সহিত হিন্দু ধর্ম্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। যেমন বহু মুসলমানই হিন্দুধর্ম্মের প্রামাণিক গ্রন্থাদি পাঠ করেন নাই, সেইরূপ বহু হিন্দুও ইসলামের প্রামাণিক কেতাবের কোনই সংবাদ রাখেন না। সাধারণের জ্ঞান এ বিষয়ে এত সীমাবদ্ধ যে, ইহা তাহাদের ধারণার মধ্যেও আসে না কেমন করিয়া এই দুই ধর্ম্মের মূলনীতি এক হইতে পারে। এই অজ্ঞানতা দূর করিবার দিন আসিয়াছে। বারান্তরে ইসলাম ধর্ম্মের মূলনীতি-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখাইবার প্রয়াস পাইব যে, হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম্মের মধ্যে সমন্বয় সম্ভব। বিরোধ হইতে আসে ধ্বংস। কিন্তু সমন্বয়ের পথই মুক্তির পথ। যাঁহারা বিরোধের কারণগুলি খুঁজিয়া বেড়ান তাঁহারা হিন্দু-মুসলমান কাহারও বন্ধু নহেন। মৈত্রী ও ঐক্যের যোগসূত্র যাঁহারা খোঁজেন তাঁহারাই মানবদরদী—তাঁহারাই হিন্দু-মুসলমান সকলের বন্ধু।

লীলা

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

শ্যাম সুন্দর মুরতি সুঠাম রাজে মন্দিরমাঝে—
আজিকার মত হয়ে গেছে শেষ তাহার আরতি সাঁঝে।
দেবালয়ে যারা এসেছিল তা'রা ঠাকুর প্রণাম করি',
যে যাহার ঘরে চলে গেছে সবে নিজ নিজ পথ ধরি'।
মর্ম্মরে গাঁথা রোয়াকে উছলে চাঁদের জোছনা রাশি,
সৌম্য আননে পূজারী বসিয়া, অধরে দিব্য হাসি,
পুঞ্জিত জ্যোতি উন্নত ভালে, নয়ন আবেশময়,
দেখে মনে হয় এ মুরতি যেন মর জগতের নয়।
হেনকালে এক ভক্ত নমিয়া মৃন্ময় দেবতায়,
দাঁড়াল আসিয়া পূজারী যেখানে বসে ছিল নিরালায়।
স্মিত মুখে তারে শুধালে পূজারী, "কিছু কি বলিবে মোরে?"
"যুগল চরণে প্রণাম করিব", কহিল সে করজোড়ে।
সঙ্কোচ-ভরে পূজারী কহিল, "তুমি কি জান না ভাই,
দেউলে দেবতা ছাড়া কাহারেও প্রণাম করিতে নাই?"
ভক্ত কহিল, "তা'রি লাগি' দেব এসেছি তোমার কাছে—
হৃদয় লুটায়ে প্রণাম করিব মনে বড় সাধ আছে।
নাহিক শক্তি প্রাণবান্ করি মৃন্ময় দেবতারে
নিত্য আসিয়া গতানুগতিক প্রণতি জানাই তা'রে।
ভরে নাকো মন, হৃদয়ের কোণে শূন্যতা রয়ে যায়,
বেদনার ভারে অবিরত মন করে শুধু হায় হায়।
হাসি' কহে দেব 'ওরে ও অবোধ, দেখ্ না ওদিকে চেয়ে,
আমি যে রয়েছি প্রাণবান্ হয়ে পূজারী-হৃদয় ছেয়ে।
এমন শুদ্ধ যোগ্য আধার কোথা পাবো আর বল্?
তাহারে পূজিস্ আজি থেকে, পাবি আমারে পূজার ফল!'
প্রাণের মাঝারে দেবতার বাণী মিথ্যা কভু সে নয়,—
তোমাতেই মোর শ্যামসুন্দর চির বিরাজিত রয়।
তাইতো এসেছি নমিতে হে দেব তোমার চরণতলে,
ঐ পদে আজি অঞ্জলি দিব মোর প্রাণ-শতদলে।"
শুনি' ভাবাবেশে ধীরে পূজারীর মুদিল নয়ন দু'টি,
হৃদয়-যমুনা উজান বহিল সকল বাঁধন টুটি',
প্লাবনের বেগে কপোল বহিয়া নামিল অশ্রুধার,
বলিল, "ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, তব লীলা বোঝা ভার।
ইঙ্গিত তব বুঝিয়াছি, আজি সফল জীবন মম,
সাধনায় আজি সিদ্ধি দানিলে হে আমার প্রিয়তম।
এতদিন পরে বুঝিলাম দেব তুমি আর নহ দূরে,
চিরসুন্দর শ্যামসুন্দর বসেছ হৃদয় জুড়ে।"

সানফ্রান্সিস্‌কোয় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীদিলীপকুমার রায়

সানফ্রান্সিস্কোয় পৌঁছেই কনসালের কাছে শুনলাম, এখানে রামকৃষ্ণদেবের দুটি মন্দির আছে, অধ্যক্ষ অশোকানন্দ স্বামী। অশোকানন্দকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোন করলাম: তিনি সাদরে নিমন্ত্রণ করলেন মন্দিরে। পাঠিয়ে দিলেন তাঁর সেক্রেটারিকে—মিষ্টভাষিণী আমেরিকান মহিলা।

প্রকাণ্ড মোটর। কার মোটর জিজ্ঞাসা করাতে শ্রীমতী বললেন তাঁর নিজের। ইনি কত যে করেছেন মিশনের জন্যে! ঠাকুরের কাজ এই ভাবেই হ'য়ে যাবে। "গন্ধর্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা:" সবাই এগিয়ে আসে দেবকার্যে জোগান দিতে, মানুষ তো কোন্ ছার!

শ্রীমতী আমাদের নানা কথাই বললেন: অশোকানন্দ স্বামীকে কত কর্ম করতে হয়েছে। আজ একুশ বৎসর তিনি প্রবাসী—কিসের জন্যে? ঠাকুরের কাজে। স্বাস্থ্য তাঁর ভালো নয়—অত্যধিক পরিশ্রমে খানিকটা স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়েছে বৈ কি। কিন্তু মুখে তাঁর অনুযোগ নেই। জিজ্ঞাসা করলাম: "দেশের জন্যে মন কেমন করে না?"

"করে বৈ কি। কিন্তু ঠাকুরের কাজ যে!"

অলডাস্ হাক্সলির একটি চিঠির কথা মনে পড়ল—আমাকে অনেক দিন আগে লেখা। তাতে তিনি লিখেছিলেন এই ভাবের একটি কথা যে, আমেরিকায় রকমারি কসরৎদার আসে সত্যের নাম নিয়ে—কিন্তু তবু সত্য সাধু বিরল হ'লেও আছে এখনো। যেমন রামকৃষ্ণ মিশনের সাধু।

এঁরা সত্যই সাধু। যাঁরা আজকের দিনে ধর্মের নামে হাসেন, বলেন ধর্ম হ'ল মেকি টাকা—তাঁদের ব্যঙ্গ অনেক সময়ে তীক্ষ্ণ হ'লেও লক্ষ্যবেধে অপারগ। কারণ হসনীয় হ'ল অধর্ম—ধর্ম বরণীয়—যেহেতু সেই থাকে ধারণ ক'রে। যেখানে শুভকর্মের আন্তরিক প্রয়াস সেখানে ধার্মিক পানই পান অন্তরদেবতার আশীর্বাদ। আর একথার একটি জাজ্বল্যমান প্রমাণ—বিদেশে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু তা ব'লে রামকৃষ্ণ মিশনের সাধুদের পথ যে কুসুমাস্তৃত এমন কথা বলা যায় না। অশোকানন্দ বলছিলেন: "প্রথম দিকে লোক আসত না, কিম্বা যারা আসত তারা ধর্মার্থী নয়—ভোজবাজি-অর্থী। তবু বলব একদল লোক আছেই এখানে যারা চায় সত্যের দিশা, ধর্মের বরাভয়। এ যদি না হ'ত তাহ'লে এখানে কিছুতেই আমরা আপ্তকাম হ'তে পারতাম না।"

আর আপ্তকাম হয়েছেন বৈ কি। স্বচক্ষে দেখে এলাম কী সুন্দর দুটি আশ্রম। একটির প্রতিষ্ঠা সানফ্রান্সিস্কোর আগেই হয়েছিল, বুঝি ১৯০৫ সালে—সেটির সমাপন হয় ১৯০৮ এ। আর একটির প্রতিষ্ঠা সানফ্রান্সিস্কোর প্রতিবেশী শহর বার্কলিতে।

প্রথমে অশোকানন্দ নিয়ে গেলেন বার্কলিতে। সেখানে দেখলাম একটি খুব বড় না হ'লেও বেশ বড় বাড়ি। হাল আমলের চমৎকার আসবাব-পত্র, হীটিং, চেয়ার, ঝাড়লণ্ঠন, লাইব্রেরি, লেকচার হল, সুন্দর বাগান—কী নয়? লেকচার হলের একদিকে দোতলায় ছোট একটি ঘর

মতন, সেখানে মস্ত পিয়ানো। প্রতি মাসে এখানে ধর্মসঙ্গীত হয় বক্তৃতার আগে বা পরে। নিচে হলের সামনেই মঞ্চ ও বেদী। মঞ্চে বক্তা বক্তৃতা করেন বেদীর সামনেই। বেদীর উপরে একদিকে ঠাকুরের ছবি, অন্যদিকে স্বামী বিবেকানন্দের। মধ্যে সুন্দর ক'রে ওঁ আঁকা বড় হরফে।

ঠাকুরের ছবির সামনে ইন্দিরা, অশোকানন্দ ও আমি প্রণাম করলাম—বেদীমূলে। মন ভরে উঠল। বললাম অশোকানন্দকে: "এখানকার আবহাওয়াই আলাদা।"

অশোকানন্দ বললেন গাঢ়কণ্ঠে: "দিলীপবাবু, যখন এ মন্দিরটি গ'ড়ে তুলি তখন প্রথমদিকে যে হৃদয়ে সংশয়গ্রন্থি ছিল না এমন কথা বলব না। কারণ মনে হয়েছিল ঠাকুরের মূর্তি তো স্থাপন করা হ'ল—কিন্তু প্রাণপ্রতিষ্ঠা হবে তো? কিন্তু তারপরেই গ্রন্থিমোচন হ'ল—স্পষ্ট অনুভব করলাম তাঁর আবির্ভাব। আর শুধু আমি নই অনেকেই শিহরিত হ'য়ে উঠলেন সে আবির্ভাবের অপার দাক্ষিণ্যে। শুধু বাহ্য প্রসাদ নয়—সে প্রসাদ স্বাদন করবার সময় মনে হ'ল সত্যিই প্রসাদ—জীবন্ত প্রসাদ!"

আমি বললাম: "সত্যের প্রতিষ্ঠা এম্নি ভাবেই হ'য়ে থাকে। সুরু হয় ধীরে ধীরে—কিন্তু যা গ'ড়ে ওঠে সে-বস্তু বালুচরে তাসের স্তূপ নয়—খৃষ্টদেব যাকে বলতেন পাষাণভিত্তির 'পরে নির্মিত নিলয়। আপনারা ধন্য যে ঠাকুরের মহিমা রক্ষার জন্যে জীবন উৎসর্গ করেছেন নিঃস্বার্থ কর্মযোগে। জগতে নানা ভেক নিয়ে নানা দল নানা মন্ত্রপাঠ করে। সত্য নিষ্ঠা ভক্তি ও জ্ঞানের বাণী প্রচার করেন যাঁরা তাঁদের সংখ্যা কম। কিন্তু সংখ্যার অনুপাতে সত্যের মহিমা নির্ণয় করা যায় না। ঠাকুরের আশীর্বাদ পেয়ে যাঁরা কাজে এগোন তাঁদের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী কাজই হয়, ক্ষণিক আড়ম্বরের জাহিরিপনা নয়।"

ধর্ম-সম্বন্ধে মন্দিরে অনেক কথা হল। মন ভরে উঠল এ আবহে ধর্মালোচনা করতে পেরে। মনে হ'ল বিদেশে পেয়েছি স্বদেশের আস্বাদ—সাত সাগরের পারে ঠাকুরের পরিচিত কৃপাস্পর্শ।

তারপর অশোকানন্দ নিয়ে এলেন সানফ্রান্সিস্কোর মঠে। এখানে কয়েক জন ব্রহ্মচারী থাকেন। বাইরে থেকে দেখতে চমৎকার এ-অট্টালিকাটি। ভিতরেও শান্তির আবহ। দেখলাম, সেখানে আরো দুটি আমেরিকান মহিলাকে—তাঁরা মিশনের ছাপা থাম নিয়ে ব'সে কর্মনিরত। সাদর অভ্যর্থনা করলেন আমাদের। সেখানে ব'সে আরো অনেক কথাবার্তাই হ'ল। অশোকানন্দকে বললাম কথায় কথায়: "আমাকে আপনাদের একজন মনে করবেন—বাইরের লোক নয়।"

অশোকানন্দ বললেন: "তা জানি দিলীপ বাবু।" আমি বললাম: "শুনুন। তের বৎসর বয়সে আমি প্রথম পড়ি শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত। প্রথম বেরিয়েছিল তিনটী খণ্ড। পরে চতুর্থ খণ্ড। আরো পরে পঞ্চম খণ্ড। প্রথম তিনটি খণ্ড আমি অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশবার পড়েছি, চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড বোধ হয় বিশ ত্রিশ বার এখনো প্রায়ই পড়ি। আমার ধর্মজীবনের সূচনা হয় এই মহাগ্রন্থ থেকে। আমার কাছে তাই এ-গ্রন্থ গুরুগ্রন্থই হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আমি যেতাম স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে, শ্রীম-র কাছে, স্বামী সারদানন্দের কাছে, শ্রীমা সারদামণির কাছে, শিবানন্দের কাছে। তাঁদের আশীর্বাদ আমি পেয়েছি। আর একথা আমি প্রমাণ করতে না পারলেও বলবই বলব যে, তাঁদের সে পরম আশীর্বাদ আমাকে

নানা দুঃসময়ে বল দিয়েছে। মনঃকষ্টে সান্ত্বনা, শঙ্কায় অভয়, নির্ভরসায় বিশ্বাস। তাই কোনো সময়ে আমাদের আশ্রমে পরমহংসদেব-সম্বন্ধে কোনো গুরুভাইয়ের মুখে অশ্রদ্ধার কথা শুনে আমি হয়েছিলাম মর্মাহত। তিনি বলেছিলেন—কিন্তু সে কথা উচ্চারণ করতে পারব না। আমি লিখেছিলাম শ্রীঅরবিন্দকে —শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে আপনার উচ্চধারণার কথা আমি পড়েছি আপনার 'সিন্থেসিস্ অব্ যোগ' বইটিতে। আপনার সে-ধারণা কি বদ্‌লে গেছে—নৈলে আপনার শিষ্য শ্রীরামকৃষ্ণদেব-সম্বন্ধে এমন অশ্রদ্ধার কথা বলেন কেমন ক'রে? তাতে শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন: "আমার সে ধারণা বদলায় নি একটুও। আর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সম্বন্ধে অশ্রদ্ধার টোনে (tone) আমি কথা বলব কেমন ক'রে? আমার ধর্মের সঙ্গে কি বর্ণপরিচয়ও হয় নি? শ্রীরামকৃষ্ণকে ধর্মজগতে ছোট করা হবে এই কথা বলার সামিল যে শেক্সপীয়র তৃতীয় শ্রেণীর কবি; নিউটন এক জন গড়পড়তা অধ্যাপক।"

চিঠিটা হাতের কাছে নেই—স্মৃতি-শক্তির উপরে ভর ক'রে তার মর্মার্থ দিলাম অশোকানন্দকে।

বিদায় নিলাম যখন তখন মন ভ'রে উঠেছে আমার। মনে হ'ল ভারত অধঃপতিত বলে কে যেখানে আজও মহাপুরুষদের জন্ম হয়, যাঁরা ধারণ ক'রে আছেন ভারতের সনাতন ঐতিহ্যকে? সানফ্রান্সিস্কোয় এসে যেন ভারতের ধর্মবাণীকে শুনলাম নূতন শ্রুতি দিয়ে। মনে পড়ল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভবিষ্যদ্বাণী:

"অন্য অনেক ধর্ম আসবে যাবে, কিন্তু হিন্দুধর্ম সনাতন।"

গান

শান্তশীল দাশ

আমার আমি এই কথাটি
যতই ভাবি মনে মনে,
বন্ধু, তুমি সে-ভুল ভেঙে দাও।
আঘাত হানি বারে বারে,
অভিমানী সেই আমারে
মিথ্যা মোহের বাঁধন হ'তে
বন্ধু হে বাঁচাও।
ভাঙন-গড়ন আমার হাতে
শক্তি যে অপার—
বারে বারেই ধূলায় লোটে
এ-মোর অহংকার।
যতই আমি তোমায় ভুলি,
ততই কাছে নাও যে তুলি;
অভিমানের সকল বেদন
বন্ধু হে ঘোচাও।

উপনিষৎ ও ভারতীয় কৃষ্টি

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

যুগে যুগে ভারতীয় উপনিষৎ পৃথিবীবাসী সকলকেই কর্মে উৎসাহিত, জ্ঞানে প্রোদ্দীপ্ত, নিরাশায় আশা প্রদান করে এসেছে। আল বেরুণী এক হাজার বৎসর আগে উপনিষৎ-পাঠে ধন্য হয়েছিলেন। দারা শুকোহ উপ-নিষদের যে ফার্সী অনুবাদ করেন, তার ল্যাটিন অনুবাদ করেন পুনরায় Anquetil du perron নামক ফরাসী পণ্ডিত ও ধর্ম-যাজক। তিনি একেবারে ভারতীয় ঋষির মত ছিলেন, এবং তিনি উপনিষৎপাঠে কত বিমুগ্ধ, উপকৃত, জীবনে কৃতকৃতার্থ হয়েছিলেন, তার বিবরণ অতি সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন E. Windisch তাঁর Die altindischen Religions ur Kunden and die Christliche Mission এবং Geschichte der Sanscrit-philologie নামক গ্রন্থে। Perron গ্রন্থের নামকরণ করেন Oupnek'hat. এই উপনিষদ্-গ্রন্থের অনুবাদের অনুবাদ পড়েই জার্মানদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঋষি দার্শনিক বলেছেন, "The Upanishats present the fruit of the highest human knowledge and have almost superhuman conceptions whose originators can hardly be regarded as men." তিনি আরো বলেছেন, তাঁর দেশে সংস্কৃত শিক্ষার প্রচার তাঁর দেশের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের কারণ; উপনিষৎই মূলসংস্কৃত; উপনিষদ্-গ্রন্থ ব্যতীত জগতে শ্রেষ্ঠ আনন্দপ্রদ ও চিত্তোদ্বেলক গ্রন্থ আর নাই এবং এই উপনিষদ্ জীবন ও মৃত্যুর চির সান্ত্বনা।

দুঃখের বিষয়, সমস্ত জগৎ যে উপনিষদের আলোতে ভাস্বর, নিখিল বিশ্ব যার রসসুধাপানে অমর, আমাদের দেশবাসীরা সে আলোর প্রকৃত সন্ধান রাখেন না এবং সে অমৃতভাণ্ডারের চাবিস্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রতি তাঁদের সত্যিকার কোনও দরদ, কোনও প্রাণের টান নেই।

উপনিষদের মধ্যেও বহু স্তর আছে। অনেক গুলি অতি প্রাচীন; কতকগুলি বহু পরবর্তী কালের। এমনকি, সম্রাট আকবরের সময়েও সেখ ভিখন (মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ, পরে মুসলমান-ধর্মাবলম্বী) আল্লোপনিষৎ তৈরী করে গেছেন। ভগবান্ আদি শঙ্করাচার্য যে দ্বাদশটি উপনিষদ্-গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করেছেন, সেগুলিই অতি-প্রাচীন এবং শ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে আমি আজ শুক্লযজুর্বেদের অন্তর্গত ঈশা ও বৃহদারণ্যকের বাণী পর্যালোচনা করছি।

ঈশোপনিষৎ

ঈশা উপনিষদ্ মাত্র ১৮টী কবিতার সমাহার। তা হ'লেও বিষয়বস্তুর অপূর্ব অবতারণার জন্য এ গ্রন্থ জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শনগ্রন্থরূপে যুগে যুগে সমাদৃত হয়েছে।

ঈশা উপনিষদের বক্তব্য বিষয় মোটা-মুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। (১) ব্রহ্ম-জ্ঞান ও তার ফল (১-৮); (২) জ্ঞান ও

কর্মের সমুচ্চয় (৯-১৪); (৩) সূর্য-মণ্ডলবাসী পুরুষ (১৫-১৬); ও (৪) মৃত্যুকালীন চিন্তা ও অগ্নিস্তুতি (১৭-১৮)।

"ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥"

এই অপূর্ব শ্লোকটী নিয়ে এই গ্রন্থের প্রারম্ভ। অর্থাৎ "এই জগতে যা' কিছু বিদ্যমান, তা' সমস্তই ঈশ্বরময়, এরূপ জেনে বিষয়বস্তু ত্যাগ করতে হ'বে এবং সেই বিষয়বস্তু ত্যাগ করে পরমাত্মাকে সম্ভোগ করতে হ'বে। কারো ধনে কখনো আকাঙ্ক্ষা করা চল্‌বে না।"

এ গ্রন্থে এটাও স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হয়েছে, যেন কর্ম করেই মানুষ ইহলোকে শত বৎসর জীবিত থাকতে চায়। এরূপ নিষ্কাম কর্ম করলে মানুষ কর্মলিপ্ত হবে না। ব্রহ্ম-সম্বন্ধে বলা হয়েছে যে তিনি চলেন, তিনি চলেন না; তিনি দূরে আছেন, তিনি নিকটেও আছেন; তিনি এই সমুদয়ের অন্তরে আছেন, তিনি এই সমুদয়ের বাইরেও আছেন। (৫) যিনি আত্মাতে সমুদয় বস্তু দেখেন এবং সমুদয় বস্তুতে আত্মাকে দেখেন, তিনি সেই কারণে কাকেও ঘৃণা করেন না। (৬)

"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ॥ ৫
যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥ ৬

জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়ের বিষয়ে বল্‌তে গিয়ে ঈশোপনিষদ্ বলেছেন—যারা অবিদ্যার অর্থাৎ কেবল কর্মের অনুসরণ করে, তারা অজ্ঞানরূপ গভীর অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যারা কেবল জ্ঞানে রত, তারা তদপেক্ষাও গভীর-তর অন্ধকারে প্রবেশ করে। (৯) যিনি জ্ঞান ও কর্ম উভয়কে একই পুরুষের অনুষ্ঠেয় বলে জানেন, তিনি কর্ম দ্বারা মৃত্যু (অর্থাৎ প্রকৃত জীবন) থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞান দ্বারা অমৃতত্ব (আধ্যাত্মিক জীবন) লাভ করেন। (১১)

"অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥ ৯॥
বিদ্যাঞ্চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়ামৃতমশ্নুতে॥" ১১॥

অন্যান্য উপনিষদের মত এই ক্ষুদ্র অথচ অপূর্ব সুন্দর উপনিষদ্ সমাপ্ত হয়েছে একমেবাদ্বিতীয়ম্-এর জয়গাথায়। উপনিষদের ঋষি প্রারম্ভে যে ঈশ্বর দ্বারা জগতের সব কিছু আচ্ছাদনীয় বলে ঘোষণা করেছেন, সমাপ্তিতে সেই পরম কল্যাণময় দেবতার সহিত নিজের একত্ব, অভিন্নত্ব সাক্ষাৎ উপলব্ধি করে ধন্য হয়েছেন। সেইজন্য তিনি উল্লসিত চিত্তে বল্‌ছেন—

"পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্ সমূহ।
তেজো যত্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্যামি
যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি॥" ১৬॥

অর্থাৎ "হে জগতের পোষক, হে একাকী গমনশীল, হে সকল প্রাণীর সংযমকর্তা, হে প্রজাপতিতনয়, হে সূর্য, তোমার রশ্মিসমূহকে সংযত কর, তোমার তেজ সংবরণ কর। তোমার যে অতি শোভনরূপ, তা আমি তোমার প্রসাদে দেখি। ঐ যে সূর্যমণ্ডলস্থিত পুরুষ, তিনি আমি।"

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ই সম্ভবতঃ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষৎ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে অজাতশত্রু, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, আরুণি, উষস্ত, প্রবাহণ প্রভৃতি অনেক ঋষিরই নামোল্লেখ আছে। সুপ্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর মনোহর আখ্যায়িকাও এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, যাজ্ঞবল্ক্যই এ উপনিষদের প্রধান ঋষি। এই উপনিষদের গভীরতম তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ তাঁরই নামে ব্যাখ্যাত। পরবর্তী দার্শনিক চিন্তায় যাজ্ঞবল্ক্যের প্রভাব অতি গভীর ও ব্যাপক।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে আমরা যাজ্ঞবল্ক্যের প্রথম দর্শনলাভ করি। এই ব্রাহ্মণটীর স্ফূর্ততররূপ চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে প্রকটিত হয়েছে। মহর্ষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করতে ইচ্ছুক হয়ে তদীয় পত্নীদ্বয়ের মধ্যে সম্পত্তিবিভাগ করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী বল্‌লেন: "যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্"—অর্থাৎ যার দ্বারা আমার অমৃতত্বলাভ না হয়, তার দ্বারা আমি কি করবো? মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌লেন—"তুমি প্রিয়াই ছিলে, (এখন) প্রিয়ত্ব বর্ধিত করলে।" এই প্রিয়ত্বের কথা থেকেই আত্মোপদেশের আরম্ভ। প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে অন্যান্য নানা কথার মধ্যে একস্থানে যাজ্ঞবল্ক্য-কথিত আত্মতত্ত্বের সারসংগ্রহ করা হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্বস্মাদন্তরতরং যদয়মাত্মা [স যোঽন্যমাত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো—তথৈব স্যাদাত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত] স য আত্মানমেব প্রিয়মুপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি॥" অর্থাৎ "এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদয় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলে মনে করে, তাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলে—'তোমার প্রিয় বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হবে'—সে এ প্রকার বল্‌তে সমর্থ এবং এ প্রকার ঘট্‌বেই। সুতরাং আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তার প্রিয়বস্তু নিশ্চয়ই বিনাশ-প্রাপ্ত হয় না।" মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে এ মতই দৃষ্টান্ত সহ প্রপঞ্চিত হয়েছে। আমরা যে স্ত্রী-পুত্রাদি আপনজনকে প্রীতি করি, তার কারণ কি? যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—আত্মপ্রীতিই মূল প্রীতি; আত্মা স্বভাবতই আপনাকে প্রীতি করে। জাগতিক বস্তুসমূহের মধ্যে যে যতই বেশী নিজেকে দেখ্‌তে পায়, সে সে পরিমাণেই আত্মপ্রীতি উপলব্ধি করে; সকলকে ভালবাসে। প্রেমতত্ত্ব ব্যাখ্যার পর আবার যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—"এ আত্মাকেই দর্শন করতে হবে, মনন করতে হ'বে, নিশ্চিত রূপ ধ্যান করতে হ'বে। অয়ি মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রবণ, মনন ও বিজ্ঞান দ্বারা এ সমুদয় অবগত হওয়া যায়।" আত্মার স্বরূপ উল্লেখপূর্বক যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে আত্মাকে ছেড়ে কোন বস্তুকে সম্যক্‌রূপে জান্‌তে চেষ্টা করলে সেই বস্তু অনুসন্ধিৎসুকে বঞ্চিত করে, পরিত্যাগ করে। "যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ-জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক্ বলে মনে করে, ব্রাহ্মণ-জাতি তাকে পৃথক্ বলে মনে করবে বা পরিত্যাগ করবে। যে ব্যক্তি ক্ষত্রিয়-জাতিকে আত্মা থেকে পৃথক্ বলে মনে করে, ক্ষত্রিয়-জাতি তাকে পরিত্যাগ করবে…। যে ব্যক্তি সমুদয় বস্তুকে আত্মা থেকে পৃথক্ বলে মনে করে, সমুদয় বস্তু তাকে পৃথক্ বলে মনে করবে। এই ব্রাহ্মণ-জাতি, এই ক্ষত্রিয়জাতি, এই লোকসমূহ, এই ভূতসমূহ, এই সমুদয় বস্তু—(এই সমস্ত তাহা) যাহা এই আত্মা—"ইদং ব্রহ্মেদং ক্ষত্রম্ ইমে লোকা ইমে দেবা ইমানি ভূতানি ইদং সর্বং যদয়মাত্মা।" (২।৪।৬) বিষয়কে বিষয়ী থেকে স্বতন্ত্র মনে করা যে প্রমাদমূলক, তা' প্রতিপন্ন করার জন্য ঋষি তাড্যমান দুন্দুভি, বাদ্যমান শঙ্খ ও বীণা এবং অগ্নি থেকে নির্গত ধূমের দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। দুন্দুভি প্রভৃতিও

তাদের বাধক, বা অগ্নি থেকে যেমন ধূমের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই, তেমনি বিষয়ী আত্মা থেকেও বিষয়ের স্বাধীন অস্তিত্ব নেই। দৃষ্টান্তান্তর প্রদান-ব্যপদেশে যাজ্ঞবল্ক্য সমুদ্র ও জলের, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়-বিষয় ও চক্ষু-রসনাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং কর্ম ও গতি প্রভৃতি ও কর্মেন্দ্রিয়ের মধ্যে আশ্রয় ও আশ্রিতের সম্পর্ক উল্লেখ করেছেন। ফলতঃ, আত্মা সর্বব্যাপী। দৃষ্টান্তস্বরূপ যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন—যেমন সৈন্ধবখণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হলে জলেই বিলীন হয়ে যায়, তাকে আর পৃথক্ করে গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়, (কিন্তু) যে কোন স্থল থেকে জল গ্রহণ করা যায়, তা' লবণ-ময়ই, তেমনি এই মহাভূত অনন্ত, অপার ও বিজ্ঞানময়।" আত্মার সর্বব্যাপিত্ব প্রদর্শন ব্যতীত এই দৃষ্টান্তের আরো একটা উদ্দেশ্য এই যে, আত্মা অসীমরূপে, সমষ্টিরূপে, সর্বদা বিরাজমান বটে, কিন্তু আত্মার যে ব্যষ্টিরূপে সসীমরূপে প্রকাশ—যাকে আমরা জীবাত্মা বলি, সে প্রকাশ অস্থায়ী। আত্মা বিজ্ঞানময় বটেন, কিন্তু তাঁর বিজ্ঞান অভেদ-বিজ্ঞান, বিষয়-বিষয়ি-ভেদশূন্য বিজ্ঞান। অতঃপর যাজ্ঞ-বল্ক্য আরো স্পষ্ট করে বলেছেন যে, জীবদ্দশায় জ্ঞানে বিষয়-বিষয়ীর, জ্ঞেয়-জ্ঞাতার ভেদ থাকে, কিন্তু মৃত্যুর অবস্থায় তা থাকে না। বিষয়ের সহিত ভেদ থাক্‌লে বিষয়ীকে জানার প্রশ্ন আসে। কিন্তু যে অবস্থায় বিষয়জগৎ থাকে না, কেবল আত্মাই থাকেন, সে অবস্থায় আত্মা কিরূপে জ্ঞানগোচর হবেন? সেজন্য যাজ্ঞবল্ক্য বল্‌ছেন—"যে স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রয়েছে, সেই স্থলে একে অপরকে আঘ্রাণ করে, একে অপরকে দর্শন করে, একে অপরকে শ্রবণ করে, একে অপরকে অভিবাদন করে, একে অপরকে মনন করে, একে অপরকে জানে। কিন্তু যখন জ্ঞানীর নিকট সমুদায়ই আত্মা হয়ে যায়, তখন কে কাকে আঘ্রাণ করবে, কে কাকে দর্শন করবে, কে কাকে শ্রবণ করবে, কে কাকে অভি-বাদন করবে, কে কাকে মনন করবে, এবং কে কাকে জান্‌বে? যা দ্বারা এ সমুদায়কে জানা যায়, তাকে কিরূপে জান্‌বে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জান্‌বে?"

পুনরায় আমরা তৃতীয় অধ্যায়ে জনক-যজ্ঞভূমিতে যাজ্ঞবল্ক্যের সাক্ষাৎ পাই। এখানে তিনি বচক্নু ঋষির কন্যা গার্গী বাচক্নবীর সঙ্গে কথোপকথনে নিরত। গার্গী প্রশ্ন করলেন—কিসে সমুদায় ওতপ্রোতভাবে বিরাজমান? যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—'আকাশ'। পুনরায় গার্গী জিজ্ঞাসা করলেন—'আকাশ কিসে ওত-প্রোতভাবে বিরাজমান?' যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর দিলেন—'অক্ষর পুরুষে' এবং অক্ষর পুরুষের অভাবাত্মক ও ভাবাত্মক লক্ষণ দুইই বর্ণনা করলেন। গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের শেষ মীমাংসা এই—এই অক্ষরকে দেখা যায় না, কিন্তু তিনি দর্শন করেন। তাঁকে শ্রবণ করা যায় না, কিন্তু তিনি শ্রবণ করেন। তাঁকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি মনন করেন। তাঁকে জানা যায় না, কিন্তু তিনি জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা নাই। এই অক্ষরেই আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান রয়েছে।

সপ্তমাধ্যায়ে উদ্দালক আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি সূত্রাত্মা ও অন্তর্যামীকে জানেন কি না। যাজ্ঞবল্ক্য পৃথিবী থেকে আরম্ভ করে নানা ভৌতিক বস্তু, এবং প্রাণ, মন, বিজ্ঞানাদি আধ্যাত্মিক বস্তুর উল্লেখ করে এই সকল বস্তুর সঙ্গে অন্তর্যামী আত্মার ভেদ ও অভেদ প্রতিপাদন করেন। কিন্তু উপদেশ করেছেন যাজ্ঞবল্ক্য উপসংহারে অদ্বৈতবাদের। বলেছেন—"তিনি অদৃষ্ট কিন্তু সকলের দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু সকলের শ্রোতা; ইত্যাদি। ইনিই তোমার আত্মা, ইনিই অন্তর্যামী ও অমৃত, ইনি ভিন্ন আর সমুদায় আর্ত। বৃহদারণ্যক বল্‌ছেন—এখানে আরুণি বিরত হলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

১৩১৬ সাল, জ্যৈষ্ঠমাস চলিতেছে। আমি পুণ্যধাম বারাণসীতে রহিয়াছি। শ্রীশ্রীমায়ের চরণ দর্শন করিবার একান্ত ইচ্ছায় ঐ মাসের শেষাশেষি একদিন কলিকাতা রওনা হইলাম। সেই সময় 'ব্রহ্মবাদিন্'[১] মহাশয় কাশী অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা মণিকর্ণিকার ঘাটে চলিয়া যাইতেন এবং সমস্ত রাত্র সেখানে জপ-ধ্যানে কাটাইয়া আবার প্রাতে আশ্রমে ফিরিয়া আসিতেন। আমি যখন কলিকাতায় আসি তিনি আমাকে একান্তে বলিলেন,—মাকে একটু জিজ্ঞাসা করিবেন আর কতদিনে আমার উপর তাঁহার কৃপা হইবে।

যথাসময়ে নির্বিঘ্নে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী পৌঁছিলাম—পূজনীয় শরৎ মহারাজের দর্শন-লাভ হইল। বলিলেন,—মায়ের পানিবসন্ত হইয়াছে, দূর হইতে দর্শন করিয়াই চলিয়া আসিও।

আমি উপরে উঠিয়া গেলাম। মায়ের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখি, মায়ের শুইবার খাটখানি সরানো হইয়াছে, ঘরের মেঝেতে বিছানা পাতা—মা শুইয়া রহিয়াছেন। প্রণাম করিবার সময় করুণাময়ী মা আমাকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন,—আমার পায়ের কাপড়টা সরিয়ে দাওতো। আদেশ পালন করিতে হইল। শ্রীচরণস্পর্শে ধন্য হইলাম। ইহার কিছুকাল পরে পূজনীয় শরৎ মহারাজ আমাকে মায়ের সেবায় নিযুক্ত করিলেন।

১ ইঁহার পূর্বাশ্রমের নাম বঙ্কুবাবু, পূর্বে সব্‌রেজিষ্ট্রার ছিলেন।

মায়ের শরীর ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিতে লাগিল। আরোগ্য-স্নানের দিন আমাকে বলিলেন,—আমার শরীরটা খুব দুর্বল; মা শীতলার উপোস্ করতে পারবো না—আমার হয়ে তুমিই উপোসটা করে মায়ের পুজো দিয়ে এসো। তাঁহার কথামত কাশীপুরে ৺শীতলার মন্দিরে চলিয়া গেলাম এবং পূজান্তে প্রসাদ ও চরণামৃত আনিয়া মাকে দিলাম।

এই অসুখে মা বেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছেন। একটু ভাল হইলে পর তাঁহাকে নিবেদন করিলাম,—মা, আমি যখন ৺কাশী থেকে এখানে চলে আসি, ব্রহ্মবাদিন্ তখন আমাকে আপনার কাছে জিজ্ঞাসা করতে বলেছিলেন, কতদিনে তাঁর উপর আপনার কৃপা হবে। মা এতক্ষণ স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা কহিতেছিলেন, কিন্তু এই কথা শুনিবামাত্র মা খুব গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে বলিলেন,—দেখ, ঋষিরা ঊর্ধ্বদিকে পা আর অধোদিকে মাথা করে হাজার হাজার বছর ধরে তপস্যা করতেন, তাতেও কারও ওপর কখনও তাঁর কৃপা হতো, আবার কখনও হতো না। সে যে একটু কঠোর করছে বলেই তাঁর কৃপা হবে এর কোন মানে নেই। কঠোরতা করে কেউ তাঁকে পায় না; তাঁর দয়াতেই তাঁকে পাওয়া যায়। তুমি এই কথাটা তাঁকে লিখে দাও।

মায়ের শরীর খুব দুর্বল। শরীর সারাইবার জন্য তাঁকে মধ্যে মধ্যে গড়ের মাঠ, হাওড়া,

গঙ্গার ধার প্রভৃতি স্থানে বৈকালবেলা বেড়াইতে লইয়া যাওয়া হইত। সাধারণতঃ ললিত চাটুজ্যে মহাশয়ের[২] ঘোড়ার গাড়ীতে যাইতেন। দেহে ক্রমশঃ খানিকটা বল পাওয়ার পরেই মা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা পুনরায় আরম্ভ করিলেন। পূজার ফুল ফল ইত্যাদি সমস্ত কিছু আমরাই জোগাড় করিয়া দিতাম। মা ঠাকুর-পূজাটি সাধ্যমত নিজেই করিতে চাহিতেন—অপর কাহাকেও করিতে দিতেন না। এমন কি ঠাকুর-ঘরের মেঝে পর্যন্ত মুছিতে গেলে তিনি বলিয়া উঠিতেন,—না, না, তোমরা কেন, আমিই করব। মায়ের পূজার বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। তিনি আসনে বসিয়া আচমন সারিবার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটোটি কুশী হইতে গঙ্গাজল দিয়া স্নান করাইতেন এবং সযত্নে মুছাইয়া দিয়া কপালে চন্দনের টিপ পরাইবার পর ধীরে ধীরে সিংহাসনে বসাইয়া দিতেন। ইহার পর গোপাল প্রভৃতি দেবতাদের বিগ্রহগুলি তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া একযোগে স্নানান্তে ভাল করিয়া মুছিয়া রাখিতেন। ক্রমে ঠাকুরকে অর্ঘ্য ও পুষ্পাদিতে সাজাইবার পর নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া মাও ধ্যানস্থা হইতেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক এই অবস্থাতেই কাটিয়া যাইত—কেহ গা টিপিয়া দিলে তবে উঠিতে পারিতেন। পূজান্তে আসন ত্যাগ করিবার পর মা ঠোঙ্গাতে সকলের জন্য প্রসাদ ভাগ ভাগ করিয়া সাজাইয়া রাখিতেন। বাড়ীর পাচক ও চাকরের ভাগটি একট ভাল হইত—মা বলিতেন, ওরা সব খাটে খোটে, ওদের একটু ভাল খাওয়া দরকার। সামান্য একটু প্রসাদ খাইয়া মা চলিতেন গঙ্গাস্নানে—সঙ্গে গোলাপ মা প্রভৃতি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে স্নানাদি সারিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেন—ঐসময় গোলাপ মা পরের দিনের পূজার জন্য ছোট এক ঘড়া গঙ্গাজল আনিতেন। গঙ্গা হইতে ফিরিয়া মা দ্বিপ্রহরে ঠাকুরের ভোগের জন্য নিয়মিত পান সাজিতে বসিতেন।

ভোগ রান্না হইয়া গেলে মা নিজেই ঠাকুরকে ঘরেই নিবেদন করিতেন। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া ডান দিকের বড় ঘরে আমরা সকলে প্রসাদ পাইতাম—মা মেয়ে ভক্তদের সহিত ঠাকুরের ঘরে পাশের প্রকোষ্ঠে বসিতেন। আহারান্তে খানিকক্ষণ বিশ্রামের পর মায়ের নিত্যকর্ম ছিল কাপড় কাচিয়া বেলা চারটার সময় ঠাকুর তোলা। শনি মঙ্গলবারে বৈকাল ৫টা হইতে ৬টা পর্যন্ত ভক্তদের দর্শনের জন্য মা খাটের উপর বসিয়া থাকিতেন—পা দুটি ঝুলান, সর্বাঙ্গ চাদরাবৃত। ভক্তেরা একে একে মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া যাইতেন। যদি কাহারও বিশেষ বক্তব্য বা জিজ্ঞাস্য কিছু থাকিত, তবে তিনি শেষভাগে প্রণাম করিয়া মায়ের সহিত কথাবার্তা কহিতেন। আগত প্রত্যেককেই কিছু প্রসাদ দেওয়া মায়ের আদেশ ছিল। একদিন প্রসাদ কম পড়িয়া গেলে আমি বলিয়াছিলাম—প্রসাদ তো একটু একট খেলেই হবে। মা আমার কথা শুনিবা মাত্র উত্তর করিলেন,—না, না, তুমি বাজার থেকে মিষ্টি কিনে নিয়ে এসো, আমি ঠাকুরকে নিবেদন করে দোব; আগে খেলে দেলে তবে তো টান হবে, ভক্তি হবে।

নিম্নে শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকটি ভ্রমণের বিবরণী প্রদত্ত হইতেছে:

১৩১৬ সালের ৩রা ভাদ্র বৃহস্পতিবার মা

২ মায়ের মন্ত্রশিষ্য, জন্ ডিকিন্‌সন্ কোম্পানীর বড়বাবু ছিলেন।

ললিতবাবুর গাড়ীতে গড়ের মাঠের দিকে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সঙ্গে ছিলেন তাঁহার কয়েক জন আত্মীয়া ও গোলাপ মা। ফিরিতে রাত সাড়ে সাতটা বাজিয়া গিয়াছিল।

দুদিন পরে শনিবার অপরাহ্নে কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানের অধ্যক্ষ যোগবিনোদ স্বামীর[৩] একান্ত ইচ্ছা ও উৎসাহে মা যোগোদ্যান দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। ললিতবাবুর গাড়ী এবং আরও কয়েকখানি গাড়ী ছিল। যোগীন মা, গোলাপ মা, এবং মায়ের আত্মীয়েরা ছিলেন। সাধুদের মধ্যে আমি এবং আরও দু'এক জন ছিলেন মনে পড়ে। পৌঁছাইতে একঘণ্টা লাগিয়া গেল। যোগোদ্যানে যোগবিনোদ স্বামী এবং আরও অনেক ভক্ত মায়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। মা ভক্তদের সম্মুখে অবগুণ্ঠনবৃতা থাকিলেও যোগবিনোদ স্বামীর নিকট ঘোমটা দিতেন না। প্রথমেই ঠাকুরঘরে যাইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের দর্শন ও প্রণামাদি সারিয়া মন্দির-সংলগ্ন বাগানখানি পরিদর্শনান্তে ঠাকুরঘরের পূর্বদিকস্থ দ্বিতল বাড়ীটির উপরের ঘরটিতে বসিলেন। স্ত্রীপুরুষ সমস্ত ভক্তেরা মাকে প্রণাম করিলেন। কিঞ্চিৎ জলযোগ ও বিশ্রাম করিয়া রাত ৭৷৷৹টায় উদ্বোধনের বাড়ীতে ফিরিয়া আসেন।

পরবর্তী শনিবারে (১২ই ভাদ্র, ১৩১৬) মা বৈকালে তাঁহার কয়েকটি আত্মীয়া ও গোলাপ মা সমভিব্যাহারে ললিতবাবুর গাড়ীতে প্রথমে শ্রীশ্রীপরেশনাথের মন্দিরাভিমুখে গমন করিলেন। অনন্তর মন্দির-দর্শনান্তে সেখানকার পুষ্করিণীর লাল মাছগুলির খেলা দেখিয়া মা পুলকিত চিত্তে বলিতে লাগিলেন,—দেখ, মাছগুলি কেমন আনন্দে খেলছে। মন্দিরের পার্শ্বস্থিত সুন্দর বাগানটি দর্শনে মা খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। এখান হইতে পুনরায় যাত্রা করা হইল। গাড়ী সার্কুলার রোড, মেছুয়া বাজার ষ্ট্রীট ধরিয়া চলিয়া অবশেষে আসিয়া পড়িল হাওড়ার পুলে। গাড়ী করিয়া ব্রীজের উপর বেড়াইবার পর গঙ্গার তীরবর্তী রাস্তায় মা যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন তখন ৭টা বাজিয়া গিয়াছে।

১৪ই ভাদ্র সোমবার মা রামরাজাতলা বেড়াইতে যান। মায়ের সাথী গোলাপ মা ও যোগীনমা যথারীতি একত্র গাড়ীতে চলিলেন। তবে সেইদিন সঙ্গের লোকজন বেশি হওয়ায় আরও কয়েকটি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করা হয়। হাওড়ার পুল, খুরুট পার হইয়া বৈকাল ৪টায় নির্বিঘ্নে রামরাজাতলা পৌঁছান গেল। আধঘণ্টার মধ্যেই মা দর্শনাদি শেষ করিয়া ঠাকুর দেখিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন; অবশেষে বেলা ৫টার সময় শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত শ্রীনবগোপাল ঘোষের রামকৃষ্ণপুরস্থিত বাটীতে উপস্থিত হইলেন। মা ঠাকুরঘরে যাইয়া বসিলেন; অতঃপর নবগোপালবাবুর স্ত্রীর ইচ্ছা বুঝিয়া বাটীতে শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসব করিবার সম্মতি দিলেন। ওখানে সেদিন মায়ের খাওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছিল। আহারাদি-সমাপনান্তে ফিরিবার জন্য রওনা হইয়া রাত্রি নয়টার সময় বাগবাজারে পৌঁছিলেন।

সে বৎসর জন্মাষ্টমী পড়িয়াছিল ২১শে ভাদ্র। ঐদিন মা কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে শ্রীশ্রীঠাকুরের নিত্যাবির্ভাব-উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন। যোগেন-মা, গোলাপমা, মায়ের কয়েক জন আত্মীয়া, এবং আরও কয়েক জন সাধু সঙ্গে ছিলেন। 'উদ্বোধন' হইতে বেলা সওয়া দুইটায় বাহির হইয়া একঘণ্টা পরে কাঁকুড়গাছি উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর-দর্শন ও প্রণামাদি সারিয়া মন্দিরসন্নিহিত বাগানটি পরিদর্শনান্তে মা ঠাকুরঘরের পিছনের বাড়ীটির

৩ ইনি মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের শিষ্য ছিলেন।

দোতলার ঘরটিতে বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। উৎসবোপলক্ষ্যে বহু ভক্ত এবং লোকজনের সমাবেশ হইয়াছিল। উপস্থিত অনেক পুরুষ ও স্ত্রীভক্তেরা মাকে দর্শন করিলেন।

সেদিন বেশ বৃষ্টি পড়ায় আশ্রমের ভিতরের রাস্তাটিতে যেমন কাদা তেমন পিছল হইয়াছিল। মায়ের ঐরূপ কর্দমাক্ত পিচ্ছিল পথে হাঁটিতে অসুবিধা হইবে ভাবিয়া একজন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসি-সন্তান মাকে সাহায্য করিতে ধরিবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় মা শশব্যস্তে উত্তর করিলেন—না, না, না, এমনিই যেতে পারব, ধরবার কোন দরকার নেই; এখানে কত লোকজন—ভক্তেরা রয়েছে, দেখলে কি মনে করবে? মা ছিলেন সত্যই খুব লজ্জাশীলা; কোন অল্পবয়স্ক সন্ন্যাসী সন্তানও হাত ধরিয়া সাহায্য করিবে, ইহাও তাঁহার মনোমত হইত না। এমনও দেখা যাইত—কোন ভক্ত বা আশ্রিত ব্যক্তি হয়ত তাঁহাকে দিবার উদ্দেশ্যে পুষ্পমাল্য লইয়া আসিয়াছেন, মা কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে মালাখানি গ্রহণ করিয়া স্বহস্তে নিজের গলায় পরিলেন।

এই সময় নাট্যাচার্য শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাঁহার পরিচালিত নাটকের অভিনয় দেখিতে যাইবার জন্য শ্রীশ্রীমাকে বার বার অনুরোধ করেন; মা অবশেষে থিয়েটার দেখিতে রাজী হইলেন। অপরাহ্ণে ডাঃ কাঞ্জিলাল, ললিতবাবু, কয়েক জন সন্ন্যাসী প্রভৃতির সহিত মা যখন মিনার্ভা রঙ্গালয়ে পৌঁছিলেন তখন ৬টা। সেদিন অভিনয় দেখিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের বহু ভক্ত উপস্থিত ছিলেন। মাকে রয়াল বক্স-এ বসানো হইয়াছিল। গিরীশবাবু অন্যান্য দিন অপেক্ষা সেদিন আরও পূর্বে অভিনয় আরম্ভ করিয়াছিলেন। অভিনীত নাটক দুইটি ছিল—'পাণ্ডবগৌরব' ও 'রঙ্গরাজ'।

পাণ্ডবগৌরব-নাটকে শেষদৃশ্যের মহামায়ার আবির্ভাবের সময় সমবেত ভাবে এই গানটি গীত হইতে লাগিল:

হের হরমনোমোহিনী কে বলে রে কালো মেয়ে,
মায়ের রূপে ভুবন আলো চোখ থাকে ত
দেখনা চেয়ে।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী, অরুণ পড়ে নখে খসি
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী,
কমলভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে বিভোর ভোলা
চরণ পেয়ে॥

শ্রীশ্রীকালী-দর্শনে এবং এই সংগীতশ্রবণে মা ক্রমে গভীর সমাধিস্থা হইয়া পড়িয়াছিলেন। মায়ের প্রীতির জন্য গিরীশবাবু স্বয়ং এই নাটকে কঞ্চুকীর ভূমিকা গ্রহণ করেন—তবে রঙ্গমঞ্চে নামা এই তাঁহার শেষ। অভিনয়-শেষে মায়ের বাড়ী ফিরিতে রাত্রি দেড়টা হইয়াছিল।

ওরে যাত্রী

শ্রীপিনাকিরঞ্জন কর্ম্মকার, কবিশ্রী

মৃত্যু-লহরী উঠিয়াছে ফুলি'
রে জীবন সাবধান,
কাণ্ডারী তোরে খুঁজে নিতে হ'বে
মুক্তির সন্ধান।
পড়ুক বজ্র, চলুক্ ঝঞ্ঝা,
পূর্ণ হউক্ মুক্তিপণ যা,
স্বার্থের গ্লানি এক সাথে সবে
তরঙ্গে কর দান।

কাণ্ডারী তোরে খুঁজে নিতে হ'বে
মুক্তির সন্ধান।
কণ্টক-ভরা দুস্তর পথে
হ'তে হবে আগুয়ান
মন্থন করি' কালসমুদ্র
মুক্তি অমৃত আন্।
বাজাও তূর্য্য, চলুক্ ঘূর্ণি
কান্তার-মরু-পাহাড় চূর্ণি,
কাণ্ডারী তোর মৃত্যুঞ্জয়ী
বাজারে বাজা বিষাণ॥

গাথার দুইটি (ঋক্ শ্লোক)

শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়

পার্শীদিগের মূল ধর্মগ্রন্থ 'জেন্দ আবেস্তা' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে 'আবেস্তা' শব্দটীকে প্রধান (বিশেষ্য), এবং 'জেন্দ' শব্দটীকে গৌণ (বিশেষণ) বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলেন জেন্দ শব্দের অর্থ 'ভাষ্য' (ব্যাখ্যা); কেহ কেহ বলেন, জেন্দ-শব্দের অর্থ 'জেন্দ নামক ভাষা'। অতএব 'জেন্দ আবেস্তা'র অর্থ দাঁড়ায় সভাষ্য আবেস্তা, অথবা জেন্দ ভাষায় লিখিত আবেস্তা। আবেস্তা শব্দের অর্থ উপাসনার গ্রন্থ। আবেস্তা শব্দটী জেন্দ অথবা পুরাতন পার্শী ভাষার শব্দ। পুরাতন পার্শীর সহিত বৈদিক সংস্কৃত ভাষার সম্বন্ধ অতীব নিকট। লৌকিক সংস্কৃতের সহিত পালিভাষার যে সম্পর্ক, বৈদিক সংস্কৃতের সহিত পুরাতন পার্শী অথবা জেন্দেরও সেই সম্পর্ক। অর্থাৎ বৈদিক ভাষাকে জেন্দের 'সংস্কৃত' (reformed) রূপ, কিম্বা জেন্দকে বৈদিক ভাষার 'বিকৃত' (degraded) রূপ বলা যাইতে পারে। 'আবেস্তা' শব্দটীর বৈদিক রূপ, 'উপস্থা'। [উপ—স্থা+ক্বিপ্ =উপস্থা]। উপস্থা-শব্দের অর্থ উপাসনা। পাণিনি সূত্র করিয়াছেন, 'উপান্মন্ত্র-করণে' (১-৩-২৫) অর্থাৎ মন্ত্রোচ্চারণ অর্থে উপ পূর্বক স্থা ধাতু আত্মনেপদী হয়। ইহা হইতে আমরা বুঝিলাম 'উপস্থা'র অর্থ মন্ত্রোচ্চারণ। ব্রাহ্মণ বালক আহ্নিক সন্ধ্যায় মন্ত্র পড়ে, "সূর্য্যোপস্থানে বিনিয়োগঃ", অর্থাৎ সূর্য্যের উপাসনায় এই মন্ত্র (উপ্ উ ত্যম্ জাতবেদসং) পড়িতে হয়। 'উপস্থান' অথবা 'উপস্থা'র অর্থ উপাসনা। 'আবেস্তা' শব্দটী শুনিতে অদ্ভুত শুনায়, কিন্তু 'উপস্থা' আমাদের শাস্ত্রের নিজের ভাষা। সেইরূপ পার্শীদিগকে দেখিতে পর দেখায়, কিন্তু তাহারা আমাদের নিতান্ত আপনার জন।

আমাদের বেদ যেমন চারি ভাগে বিভক্ত, ঋক্, যজুস্, সাম এবং অথর্ব, আবেস্তা অথবা উপস্থাও তেমন চারিখণ্ডে বিভক্ত, যস্ন (যজ্ঞ), যস্ত (ইষ্ট), বিস্পেরেদ (বিশ্বরত্ন) এবং বেন্দিদাদ্ (বিদৈবদাত)। যস্নে মন্ত্রের, যস্তে উপাখ্যানের বিস্পেরেদে স্তোত্রের এবং বেন্দিদাদে বিধি-নিষেধের প্রাধান্য। বেদের মধ্যে ঋগ্বেদই যেমন প্রাচীন এবং প্রধান, উপস্থার মধ্যে যস্নই তেমন প্রাচীন এবং প্রধান।

যস্নগ্রন্থে বাহাত্তরটি অধ্যায় আছে। তন্মধ্যে সতেরটী অধ্যায় (২৮—৩৪)=৭+(৪৩—৫১)=৯+(৫১)=১=১৭ গাথা নামে অভিহিত হয়। গাথা যস্নের পবিত্রতম অংশ বলিয়া বিবেচিত হয়। গাথা ভগবান জরথুস্ত্রের শ্রীমুখ-বাণী বলিয়া বিখ্যাত।

ভগবান জরথুস্ত্র জগতের অন্যতম আদিম ধর্মগুরু। রচনাকাল-বিচারে যস্ন এবং ঋগ্বেদের অন্তিম মণ্ডলগুলি সমসাময়িক, পণ্ডিতগণ এরূপ বলিয়া থাকেন। যস্নে "অহুর" অর্থাৎ "অসুর"-পূজার বিধান বলবৎ। ঋগ্বেদের সময়েও অসুর-পূজা ভারতে পরিত্যক্ত হয় নাই। তাই মহর্ষি অত্রি বলিয়াছেন "নমোভির্ দেবং অসুরং দুবস্য" (ঋগ্বেদ, ৫-৪২-১১)—যিনি দেবও বটেন, অসুরও বটেন, নমস্কার দ্বারা সেই রুদ্রের পূজা কর।

ভগবান জরথুস্ত্র ভক্তিযোগের প্রচারক,

অর্থাৎ তিনি জ্ঞানযোগের লক্ষ্য নির্বিশেষ নির্গুণ ব্রহ্মের সাধনা না করিয়া সগুণ অথবা শক্তিমান ব্রহ্মের আরাধনা করিয়াছেন। শক্তিমান ব্রহ্মের নাম দিয়াছেন তিনি "মঝ্‌দা" অর্থাৎ সর্ব-বিধাতা। "মঝ্‌দা" শব্দটী 'মস্‌' উপসর্গের সহিত 'ধা'-ধাতুর যোগে গঠিত হইয়াছে। মস্‌ শব্দের অর্থ 'সম্পূর্ণরূপে', অথবা 'সকল'। ধা ধাতুর অর্থ বিধান করা, নিষ্পন্ন করা। মঝ্‌দা অর্থ সর্বময় কর্তা। কেহ কেহ "ধা" ধাতু হইতে গঠিত হইয়াছে মনে না করিয়া মঝ্‌দা শব্দটী 'ধ্যৈ' ধাতু হইতে গঠিত হইয়াছে এমন মনে করেন। ধ্যৈ ধাতুর অর্থ ধ্যান করা বা জানা। তাহা হইলে মঝ্‌দা শব্দের অর্থ হয় সর্বজ্ঞ।

ভগবান জরথুস্ত্র পরমেশ্বরকে সগুণ বলিয়াছেন, কিন্তু সাকার বলেন নাই। তিনি মূর্তিপূজার প্রবল বিরোধী ছিলেন। ভগবান জরথুস্ত্রই এই জগতে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন।

ইসলাম তন্ত্রই মূর্তিপূজার উৎকট প্রতিষেধক। কিন্তু ইসলাম এবং খ্রীষ্টান পন্থা ইহারা উভয়েই ইহুদি ধর্ম হইতে নিরাকারোপাসনায় দীক্ষা লাভ করে। অতএব ইহুদিপন্থাকেই নিরাকারোপাসনার আবিষ্কর্তা বলিয়া অনেকে প্রচার করেন। পরন্তু ইতিহাস এই দাবী সমর্থন করে না।

ইহুদিগণ পূর্বে মূর্তিপূজক ছিল। বাআল, আষ্টরথ প্রভৃতি দেববিগ্রহ-সকল ইহুদি-মন্দিরে পূজিত হইত। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে সম্রাট নেবুকাদনাজের রাজত্বকালে, তাঁহার রাজধানী বেবিলনে ইহুদি পুরোহিতগণ পার্শীদিগের সংস্পর্শে আসে, এবং পার্শীদিগের অনুকরণে নবী এজেকিয়েলের নেতৃত্বে মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করে।* ভগবান জরথুস্ত্রই নিরাকারোপসনার প্রথম প্রচারক ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। এই দৃষ্টিতে দেখিলে, ভগবান জরথুস্ত্রকে ব্রাহ্ম সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য্য সমাজ প্রভৃতি নিরাকারোপাসক সম্প্রদায়গুলির আদিম গুরু বলা যাইতে পারে।

আমরা গাথা হইতে দুইটী শ্লোক নিম্নে আহরণ করিয়া দিলাম। বৈদিক ঋকের সহিত গাথার ভাষাগত সাদৃশ্য কত প্রবল, ইহা হইতে তাহা অঞ্জসা প্রতীত হইবে।

(১) কদা মঝ্‌দা মাং নরোইশ্‌ নরো বীশেন্তে
কদা অজেন্‌ মূথ্রেম্‌ অহ্যা মগহ্যা।
যা অংগ্রয়া করপনো উরুপয়েইন্তী
যা দ্বা খ্রতু দুশে-খ্‌থ্‌রা দস্যুনাম্‌॥
(যস্ন — সুক্ত—৪৮—ঋক্‌—১০)

অন্বয়ঃ—হে মঝ্‌দা, কদা নরোইস্‌ নরঃ মাং বিশতে (হে মঝ্‌দা, কবে নরের নর আমাতে প্রবেশ করিবে)? কদা মুর্তম্‌ অস্য মঘস্য অহন্‌ (কবে মূর্ত্তিকে এই মঘ হইতে অপসারিত করিতে পারিব)? যাং কল্পাঃ অং গ্রাঃ আরোপয়ন্তি (কল্পসূত্র-পরায়ণ আঙ্গিরসগণ যাহা আরোপিত করে)। যা চ দুষ-ক্ষথাণান্‌ দস্যুনাম্‌ খ্রতু (যাহা দুর্দান্ত দস্যুদিগের [যোগ্য] ক্রিয়া বটে)।

টীকাঃ—নরোইস্‌ নরঃ=নরের নর, নরোত্তম নারায়ণ। মঘস্য=মঘাত। পঞ্চমীস্থলে ষষ্ঠী। অজেন্‌=অহন্‌=হনানি।

অনুবাদঃ—হে মঝ্‌দা নরের নর (নারায়ণ) কবে আমার অন্তরে আবির্ভূত হইবেন; কবে আমি এই সংঘ হইতে মূর্তিপূজা দূর করিতে পারিব? যে মূর্তিপূজা কল্পসূত্রাশ্রিত আঙ্গিরসগণ উদ্ভাবন করিয়াছে, আর যাহা (কেবল) দুর্দান্ত অনার্য্যদিগের (যোগ্য) কাজ বটে।

তাৎপর্য্যঃ—ভগবান জরথুস্ত্র বলিলেন যে, আঙ্গিরসের (বৃহস্পতির) শিষ্যগণ কল্পসূত্রে

* Macdonell, Comparative Religion, p. 128

অবলম্বন করিয়া মূর্তিপূজার উদ্ভাবন করিয়াছে। ইহা অসভ্য দস্যুদিগের যোগ্য কাজ—সুসভ্য আর্য্যদিগের পক্ষে মূর্তিপূজা শোভা পায় না। পুরুষোত্তম যাহাতে অন্তরে আবির্ভূত হন মঘবদ্দিগের (পার্শীদিগের) পক্ষে তাহাই করণীয়।

মন্তব্য :—মূর্তিপূজা উপলক্ষ্যেই মূল আর্যগণ হিন্দু ও পার্শী এই দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। হিন্দুগণ মূর্তিপূজার অনুরাগী ছিলেন। অথর্ব বেদের অঙ্গিরস শাখা তাঁহাদের গুরুগ্রন্থ। পার্শীগণ নিরাকারোপাসনা পছন্দ করিতেন। অথর্ব বেদের ভার্গব শাখা তাঁহাদের গুরুগ্রন্থ। অঙ্গিরস এবং ভার্গব এই দুই ভাগে বিভক্ত বলিয়া অথর্ব বেদের অপর নাম ভৃগ্বঙ্গিরসী সংহিতা (গোপথ ব্রাহ্মণ)—১-৩-৪)

মূর্তিপূজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন বলিয়াই ভগবান জরথুস্ত্রের প্রতি আমরা যেন বিদ্বিষ্ট না হই। ঋগ্বেদও বলিয়াছেন :—

অপাদ্ অশীর্ষা গুহমানো অন্ত।
আযোযুবানঃ বৃষভস্য নীড়ে॥

(ঋগ্বেদ, ৪-১-১১)

তাঁহার পা নাই, মাথা নাই। নিজের অবয়বগুলি গোপন করিয়া তিনি শক্তির কেন্দ্রে বসিয়া আছেন।

(২) মঝ্দাও সখারে মইরিস্তো
যা জী বাবেরেজোই পইরিচিথীত্।
দত্রবাইস্ চা মশ্যাইশ্ চা
যা চা বরেষইতে আইপিচিথীত্।
হ্বো বীচিরো অহুরো
অথা নে অংহত্ যথা হ্বো বসত্॥

(যস্ন—স্তুক্ত-২৮, ঋক্ ৫)

অন্বয় :—মঝ্দাঃ সকৃত্বঃ সনরিষ্ঠঃ (মঝ্দাই একমাত্র স্মরণীয়)। দেবৈঃ মনুষ্যৈঃ চ পরি-চি-থাত্ যা হি বাবৃজ্যতে (দেব এবং মনুষ্যগণ কর্তৃক ইতঃপূর্বে যাহা কৃত হইয়াছে)। যা চ অপি-চি থাত্ বৃষ্যতে (এবং অতঃপর যাহা কৃত হইবে)। স্বঃ অহুরঃ [তেষাং] বিচিরঃ (সেই অহুর [মঝ্দা] তাহাদের বিচারক)। অথা নঃ অংহত্ (আমাদের তেমন হউক) যথা হ্বঃ বশত্ (যেমন তিনি চান)।

টীকা—বৃজ্—করণে। বৃজ্+যঙ্+লট্ তে বাবৃজ্যতে।

অনুবাদ :—মঝ্দাই একমাত্র পূজনীয়। দেব এবং মনুষ্যগণ পূর্বে যাহা করিয়াছে, কিম্বা পরে যাহা করিবে, তিনি তাহার বিচারক। তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, আমাদের তাহাই হউক।

তাৎপর্য :—যে জন যেমন কার্য করে, সে তেমন ফল পায়। ইহা মঝ্দারই বিধান। মহেশ্বর মঝ্দা এই ন্যায্য বিধানের প্রতিষ্ঠাতা। ইহা অপেক্ষা সঙ্গত বিধান আর কী হইতে পারে? তাঁহাকে মঙ্গলময় বলিয়া বুঝিতে পারিয়া মঝ্দাতে আত্মসমর্পণ করাই জীবনের পূর্ণ সার্থকতা।

মন্তব্য :—মুসলমানগণ বলেন একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা হজরত মহম্মদের প্রধান কীর্তি। মুসলমানদিগের যাহা গায়ত্রী (কলিমা = মূলমন্ত্র), তাহা বলে "লা ইলাহি ইল আল্লা"। লা (নাই) ইলাহি (পূজা) ইল (বিনা) আল্লা (আল্লা)—আল্লা ব্যতীত আর কেহ পূজার পাত্র নহে। ভগবান জরথুস্ত্রই প্রথম বলিয়া গিয়াছেন "মঝ্দাত্ সখারে মাইরিস্তো"—মঝ্দা কেবল পূজ্যতম। ভগবান জরথুস্ত্রের এই বাণী বিকশিত করিয়াই শ্বেতাশ্বতর মুনি বলিয়াছেন "একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ, ৩-২)—রুদ্র একজনই, দ্বিতীয় আর একজন রুদ্র নাই। ইহারই নাম একেশ্বরবাদ।

[জরত্+উষ্ট্র=জরথুস্ত্র (জেন ভাষার সন্ধি সূত্র অনুযায়ী)। যাহার উষ্ট্রটী হিরণ্যবর্ণ ছিল। শ্বেত+অশ্বতর=শ্বেতাশ্বতর। যাহার অশ্বতরটী শ্বেত বর্ণ ছিল। তদানীন্তন মহামুনিগণ বাহনপ্রিয় ছিলেন।]

পূর্বেই বলিয়াছি ভগবান জরথুস্ত্র ভক্তিযোগের অবতার। ভক্তির সার হইল প্রপত্তি কিম্বা আত্মসমর্পণ। যীশুখ্রীষ্টের ভাষায় Thy will be done.

তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ
আমার জীবন মাঝে।

(রবীন্দ্রনাথ)

জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমরা যেন ভগবান জরথুস্ত্রের বাণী স্মরণ করি—

অথা নে অংহত্ যথা হ্বো বসত্।
[অথা নঃ অসত্ যথা স্বঃ বশত্
তেমন আমাদের হউক যেমন তিনি চান]

অনুধ্যান

(এক)

লোকধর্ম্মস্রষ্টা শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীগোপীনাথ সেন

অন্ধতমসাচ্ছন্ন মানুষ নিজেদের আহার-বিহার ব্যতীত কিছুই জানে না। তাহারা ক্ষণিক সুখভোগের জন্য যে কোন হীনকর্ম্ম করিয়া থাকে। তাহাদের নিকট ধর্ম্মকর্ম্ম কেবল ধন-যশ-পুত্রের জন্য প্রার্থনা। বিষয়ী মানবমন কচুরি পানার বন, যতই পরিষ্কার করা যাক না কেন, পুনরায় বিষয়চিন্তায় ভরিয়া উঠে। ইহার শিকড় এরূপ দৃঢ় যে উহাকে উৎপাটন করা শক্ত, যতক্ষণ না কোন যথার্থ প্রতিষেধক ঔষধ প্রয়োগ করা যায়। বিষয়-মোহাচ্ছন্ন সাধারণ মানুষের জন্য এইরূপ এক ঔষধ লইয়া আসিয়াছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। উহা অবলম্বনে প্রথমতঃ মানুষ ভক্তিমার্গে আস্থিত থাকিয়া ক্রমশঃ সংসার-ব্যাধি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে। পরিবর্ত্তনশীল সংসারে প্রতিনিয়ত যাঁহারা নৈরাশ্যের আবর্ত্তে ঘুরপাক খাইতেছেন, তাঁহাদের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের লোক-ধর্ম্মসম্বন্ধে পথনির্দ্দেশ অতি অপূর্ব্ব।

ভারতীয় দর্শন-শাস্ত্রে যে বাণী আছে, তাহার যথাযথ তাৎপর্য্য গ্রহণ করা সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সহজসাধ্য নয়। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সাধারণ মানুষের কল্যাণে অর্পিত হইয়াছে। ইহাই আধুনিক কালের সহজ অধ্যাত্ম-শাস্ত্র। তিনি দিনের পর দিন যাহা শিষ্যদের উপদেশ দিতেন তাহা পাঠ করিলে জীবনের জটিল সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরদর্শনের উপায়-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাকে দেখা যায়।' 'ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বরদর্শন।...বিড়ালের ছানা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানেই থাকে, কখনও হেঁসালে, কখনও মাটীর উপর, কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে, আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।' সেইরূপ ভক্তের আকুল আহ্বানে ত্রিভুবন-স্বামী না সাড়া দিয়া থাকিতে পারেন না।

কবীর বলিয়াছেন—'শাস্ত্র পড়িয়া লোকে ইঁট-পাথর হইয়া যায়।' তাহাদের অবস্থা একচক্ষু হরিণের মত। তীরবেগে একদিকেই দিগ্‌বিদিগ জ্ঞানশূন্য হইয়া দৌড়াইতে থাকে। মনে করে তাহারা আধ্যাত্মিকতার উচ্চমার্গে উপস্থিত হইয়াছে এবং শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিদের হেয় জ্ঞান করে। তাহারা সহজ মানব-ধর্ম্মের প্রতি বিশেষ মনোযোগী হন না। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ কিন্তু শাস্ত্রকে কঠিন পদার্থ না করিয়া সহজ উপায়ে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার শিক্ষা জনগণের প্রাণে সাড়া জাগায়। যে ব্যক্তি লোকশিক্ষার ভার গ্রহণ

করিবেন তাঁহার কর্ত্তব্য নিজেকে জনগণের মধ্যে মিশাইয়া দেওয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি লোকশিক্ষা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'লোকশিক্ষা যে দেবে তার চাপরাস চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয় না আবার অন্যলোক। কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে!' প্রত্যেক জন-শিক্ষকের কর্ত্তব্য যাহা উপদেশ দিবেন তাহা নিজ জীবনে আচরণ করিবেন। তাহা না হইলে অন্ধের হাতী দেখার মত হইবে।

গৃহস্থদের সংসারধর্ম্মপালন যেরূপ কর্ত্তব্য, তেমন সন্ন্যাসিগণের সেইরূপ জীবের মঙ্গল ও সেবা করা কর্ত্তব্য। শ্রীরামকৃষ্ণ সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়কেই তাঁহাদের স্বধর্ম্ম-সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতেন। সংসারীদের গল্পচ্ছলে বলিতেন, "জনকরাজা নির্জ্জনে অনেক তপস্যা করেছিলেন। সংসারে থেকেও এক একবার নির্জ্জনে বাস করতে হয়। সংসারের বাহিরে একলা গিয়ে যদি ভগবানের জন্য তিন দিনও কাঁদা যায় সেও ভাল।'

ভক্তি-সম্বন্ধে তিনি বলিতেন 'ভক্তি মেয়েমানুষ, তাই অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যেতে পারে। জ্ঞান বারবাড়ী পর্য্যন্ত যায়।' ইহার অর্থ গভীর; কারণ সরল না হইলে সহজে বিশ্বাস করা যায় না, আবার শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'অনেকে মনে করে, বই না পড়ে বুঝি জ্ঞান হয় না, বিদ্যা হয় না। কিন্তু পড়ার চেয়ে শুনা ভাল, শুনার চেয়ে দেখা ভাল। কাশীর বিষয় পড়া, কাশীর বিষয় শুনা, আর কাশী দর্শন অনেক তফাৎ।'

শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্মের তত্ত্ব নিজে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন—আর তাহাই সরল ভাবে সকলের উপযোগী করিয়া বলিয়া গিয়াছেন. তাই তিনি লোকধর্ম্মস্রষ্টা।

(দুই)

প্রেমমূর্তি শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য

দরদী দার্শনিক মিষ্টার একহার্ট আপন মনের দরদ ও মাধুরী মিশিয়ে বলেছেন,—"ভগবান মানুষ হন, মানুষকে ভগবানে রূপায়িত করবার আকুল পিপাসা নিয়ে।" জীবের স্বাভাবিকী ব্রাহ্মীস্থিতি সে যখন বিস্মৃত হয়, তখনই ভগবানের আরেক-বার নতুন করে অবতরণ ঘটে মানুষের ছোট্ট বামন কলেবরের মাঝে জীবের প্রাণের তারে জীবন-সাধনার সুর চড়া পর্দায় বেঁধে দেবার জন্য।

মানুষ ভগবান হয় প্রেমের দ্বারা যেহেতু ভগবান "ভক্তিসূত্রের" অনুযায়ী "সা পরমপ্রেমরূপা" এবং "God is love personified". যেখানে হৃদয়ের সম্প্রসারণ নেই, চোখের আলোয় স্বচ্ছতা নেই, চিন্তা দৈন্যে ভরা, সেখানে কি প্রেমপ্রসূন ম্লান হয়ে ঢলে পড়ে যায় না মাটির বুকে, স্বার্থসংঘাতে নিঠুর পীড়নে প্রপীড়িত হয়ে? এই প্রেমপ্রস্রবিণী বাংলার এই প্রেমঝরা মাটিতেও উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষ্টি, ধর্ম ও আচারগত সৌভ্রাত্রের অভাব প্রাদুর্ভূত হয়েছিল দিকে দিকে; হানাহানি ডাক দিয়েছিল মানুষের পশুকে। প্রেমলতিকা সৌহার্দ-সিঞ্চনের অভাবে যেন স্বীয় তনু-কারায় অধৈর্য হয়ে পড়েছিল। আর বঙ্গ-জনমনও সংকীর্ণতার অন্ধদোলায় দোলায়িত না হয়ে সর্বজনীনতার

প্রজ্ঞাঘন আলোয় গিয়ে মুক্তি-নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবার জন্য হয়ে উঠেছিল উন্মুখ, একান্ত উদ্‌গ্রীব।

এই যখন সময় তখন করুণাঘনতনু—"ভাস্বর ভাব সাগর চির উন্মদ প্রেমপাথার" ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ প্রেমময় সত্যের উদ্ভিন্ন আলোকে বাংলার দিক্‌চক্রবাল অনুরঞ্জিত করে এলেন বাংলার কোলে—ঠিক অন্যান্য বারের মত যুগ-প্রয়োজনে সাড়া দিয়ে। স্বীয় সাধনদীপ্ত উদাত্ত কণ্ঠে ডাক দিয়ে বল্লেন, ভগবান লাভই চরম পুরুষার্থ, আর প্রেম বা ভালবাসার দ্বারাই ভগবান লাভ করা যায়। তিন টান এক হলে ভগবান দেখা দেন—বিষয়ীর বিষয়ের উপর, মায়ের ছেলের উপর, আর সতীর পতির উপর টান। অথবা "রাধাকৃষ্ণ মানো আর নাই মানো শ্রীকৃষ্ণের উপর যেরূপ টান বা অনুরাগ ছিল গোপীদের সেই টানটুকু নাও।" এইরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখ্‌তে গেলে শ্রীরামকৃষ্ণ অবতার-পুরুষই—প্রেমের ধারক, বাহক ও সংস্থাপক হিসেবে।

আচট্‌কা দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণের সীমায়িত জীবনের মাঝে যে অব্যয় "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষে"র রূপ রং ও রেখাটি ফুটে ওঠে তাতে মনে হয় তিনিই তো পরাৎপর, সারাৎসার "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। তবে কেন তাঁর এ কৃচ্ছ্র তপশ্চর্যা? "লোক-বত্তু লীলাকৈবল্যম্"—ধরণীর ধূলিপথে যে কেহই আসুন না কেন সকলকারই জীবসাধারণের মত বাস করতে হয়। অথবা এই ঘটনার প্রচ্ছদপটে আরেকটি ইংগিতের ছাদিত রূপধারারও হদিস্ মিলে, যেটি হচ্ছে যিনি যতই মহান হন না কেন প্রত্যেকের পক্ষেই সাধনদুয়ার দিয়ে "তমসঃ পরস্তাৎ" অবগম্য "নান্যঃ পন্থাঃ"। এই অমর তত্ত্ব ও তথ্যটিই জীব-মানসপটে মুদ্রিত করেছেন তিনি নিজ জীবনের সাধন-তুলিকা দিয়ে। মহাত্মা গান্ধী তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন, "The story of Ramakrishna Paramahamsa's life is a story of religion in practice." আর স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলেছেন, "Religion is realisation, not talk nor doctrine, nor theories however beautiful they may be. It is being and becoming not hearing or acknowledging; but it is the whole human soul becoming changed into what it believes."

এ সব ছেড়ে দিয়েও শ্রীরামকৃষ্ণের কথাটি মীরার ভাষায় বলা যায়, 'সাধন করনা চাহিয়ে মনুয়া ভজন করনা চাহিয়ে।"

মানবের সহজ ভাব প্রেমের স্বরূপধর্ম কি এবং কিরূপে তার সুষ্ঠু বিকাশ ও পরিপূর্ণ সার্থকতা ঘট্‌তে পারে, তা শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন এবং দেখিয়ে দিয়েছেন তাঁর জীবনতরুর পাতায়, তার শিরায় উপশিরায়। তাঁর মতে প্রেম আজকের দুনিয়ার দার্শনিক মতানুবর্তী "Happiness of misunderstanding" নহে; পরন্তু মানবীয় খণ্ড-প্রেম, অখণ্ড অনবচ্ছিন্ন প্রেমের প্রতিভাগ বা ছায়া; কিন্তু এই ছায়াকেই কায়ারূপে প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যদি আমাদের নিষ্পন্দ গতিহারা পথ-হারা প্রেমকে যো সো করে সর্বমালিন্য-বিরহিত প্রেমের খনি ঈশ্বরের অভিমুখী করে দেখা যায় যুগযুগান্তের মরমিয়াদেরই মত। তাঁর মতে আমিত্বের বেড়াজাল ধূলিসাৎ না করা পর্যন্ত প্রেমের পূজারী "কষিত কাঞ্চন" প্রেমফুলহারের বদলে দুঃখ-হাহাকারের তীব্র কশাঘাতই লাভ করে থাকেন।

বিপুল অজানার নাম-না-জানা আহ্বান সাড়া দিয়েছে মানবের চেতনায়। এই রূপ-রস-গন্ধে বৈচিত্র্যে ভরা বিশ্বের নানা কিছু দোল দিয়েছে মানবের আন্তর মানসটিকে। জ্যোছ্‌নামত্তা শারদ রাতে তটিনী-তীরে পূর্ণচন্দ্রের চন্দ্রিকাধারা পান করতে করতে মানব চিন্তা করে ফেলে তার

অজান্তে, কোথায় এর আদিম সত্যিকার উৎস আবার নিথর তমসার জমাট বিভীষিকা এসে হানা দেয় মানব-মনে; মানব-মন তখনও জিজ্ঞাসা করে—কারণ। ভোরের গগনে উষার রক্তলেখা যখন লিখে দিয়ে যায় নিতুই নতুন-রূপে নবীনের জয়গান তখনও মানব অপার বিস্ময়ে বলে ওঠে,—কেন। প্রশ্নের অন্ত নেই অথবা বলা যায় "অন্ত নাই গো অন্ত নাই, বারে বারে নূতন প্রশ্ন তাই", চিন্তাসায়রে খেই হারিয়ে ফেলে মানুষ ছোটে দরদী বন্ধু রহস্যমর্মবিদ্‌দের কাছে। আর যুগের ইতিহাসও বল্‌ছে শ্রীরামকৃষ্ণও মরমী—দরদী; তাই তিনিও অজানিতের সন্ধানে ছুটে চলা মানব-[illegible] হাতছানি দিয়ে ডেকেছেন আর আবেগভরে অশ্রু বিসর্জন করে বলেছেন,—ওরে আয় কে কোথায় আছিস! আমি তোদের প্রশ্নের মীমাংসা করে দেব। করেছেনও তিনি সত্যই।

শুধু একবার অন্তরের তীব্র ব্যাকুলতা নিয়ে ভগবানকে ডাক্‌লেই তিনি সাড়া দিবেন। তখনই সাধকের অরুণোদয় হবে। তবে ব্যাকুলতার মধ্যে খাদ বা ভেজাল থাক্‌লে আর চলিষ্ণু জগতে 'অচলম্ অব্যয়ম্'-কে পাওয়া যায় না, কারণ "সে যে কড়ার কড়া তস্য কড়া কড়ায় গণ্ডায় বুঝে লবে।"

(তিন)

শ্রীরামকৃষ্ণ ও ঈশ্বরলাভের উপায়

শ্রীরঞ্জিতকুমার আচার্য

ঈশ্বরলাভের সহজতম উপায় নির্দেশ-প্রসংগে ঠাকুর ভক্তি, বিশ্বাস আর ব্যাকুলতার স্থান দিয়েছেন সবার উপরে। তিনি বল্‌তেন, "ঈশ্বরের নামগুণগান সর্বদা করতে হয়। আর সৎসংগ, ঈশ্বরের ভক্ত বা সাধু, এদের কাছে মাঝে মাঝে যেতে হয়। সংসারের ভিতর ও বিষয়কাজের ভিতর দিনরাত থাক্‌লে ঈশ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তাঁর চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন। যখন চারাগাছ থাকে, তখন তার চারিদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া না দিলে ছাগল-গরুতে খেয়ে ফেল্‌বে। * * * ধ্যান করবে মনে কোণে, বনে আর সর্বদা সদসৎ বিচার করবে। ঈশ্বরই সৎ কিনা নিত্যবস্তু, আর সব অসৎ কিনা অনিত্য, এই বিচার করতে করতে অনিত্য বস্তু মন থেকে ত্যাগ করবে। আর এই পথের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় হচ্ছে অটুট বিশ্বাস আর তাঁর রাতুল চরণে অচলা ও অহৈতুকী ভক্তি। ঠাকুর বল্‌তেন, "বিশ্বাস হয়ে গেলেই হল। বিশ্বাসের চেয়ে আর বড় জিনিষ নেই। বিশ্বাসের কত জোর তা' তো শুনেছ? পুরাণে আছে, রামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ, তাঁর লংকায় যেতে সেতু বাঁধ্‌তে হল। কিন্তু হনুমান রামনামে বিশ্বাস করে লাফ দিয়ে সমুদ্র-পারে গিয়ে পড়ল। যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, সে যদি মহাপাতক করে তবুও ভগবানে এই বিশ্বাসের জোরে ভারী ভারী পাপ হতে উদ্ধার পেতে পারে।" এইরূপে বিশ্বাস যদি মানবের মনের মর্মস্থলে স্থান লাভ করতে পারে তবে, সংগে সংগে দেখা

দিবে শুদ্ধা ভক্তি, তাঁর পরম পুণ্যময় নামে অকৃত্রিম অনুরাগ আর আকর্ষণ। ক্রমে সেই মন্দাকিনীর ন্যায়—পূত পীযূষধারার ন্যায় অচলা ভক্তি রূপান্তরিত হবে ব্যাকুলতায়। ঠাকুরের অমর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল, "ব্যাকুলতা হলে অরুণ উদয় হল, তার পর সূর্য দেখা দিবে। * * * ঈশ্বরকে ভালবাসতে হবে; মা যেমন ছেলেকে ভালবাসে, সতী যেমন পতিকে ভালবাসে, বিষয়ী যেমন বিষয় ভালবাসে। এই তিনজনের ভালবাসা এই তিনজনের টান্ একত্র করলে যতখানি হয় ততখানি ঈশ্বরকে দিতে পারলে তাঁর দর্শন লাভ হয়। ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। বিড়ালের ছা কেবল মিউ মিউ করে মাকে ডাকতে জানে। মা তাকে যেখানে রাখে, সেইখানে থাকে। কখনও হেঁশালে, কখন মাটীর উপর কখনও বা বিছানার উপর রেখে দেয়। তার কষ্ট হলে সে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে আর কিছু জানে না। মা যেখানেই থাকুক, এই মিউ মিউ শব্দ শুনে এসে পড়ে।" তবে এখন প্রশ্ন হতে পারে যে সংসারী জীব কি তাঁর ধ্যান-ধারণা করতে পারে? তাঁর দর্শন পেতে পারে কিংবা তাঁর অশেষ আশিস লাভে নিজেকে ধন্য মনে করতে পারে? ঠাকুরের বাণী হতে আমরা তার সহজ ও সরল উত্তর লাভ করতে পারি, যাতে সংসারী জীবের অন্তরেও নব আশা, অনুপ্রেরণা বা উদ্যম জেগে উঠবে। "সব কাজ করবে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্‌তে হবে। স্ত্রী-পুত্র, মা-বাপ সকলকে নিয়ে থাকবে ও সেবা করবে। যেন কত আপনার লোক। কিন্তু মনে জান্‌বে যে তাঁরা তোমার কেউ নয়। * * * ঈশ্বর লাভ না করে যদি সংসার করতে যাও তাহলে আরো জড়িয়ে পড়বে। বিপদ-শোক-তাপ এসবে অধৈর্য হয়ে যাবে। আর যত বিষয়চিন্তা করবে, ততই আসক্তি বাড়বে। তেল হাতে মেখে তবে কাঁটাল ভাংগ্‌তে হয়। তা না হলে হাতে আটা জড়িয়ে যায়। ঈশ্বরের ভক্তিরূপ তেল লাভ করে তবে সংসারের কাজে হাত দিতে হয়। * * * তোমরা সংসার করছ এতে দোষ নাই, তবে ঈশ্বরের দিকে মন রাখতে হবে, তা না হলে হবে না, এক হাতে কর্ম করো আর এক হাতে ঈশ্বরকে ধরে থাকো, কর্ম শেষ হলে দু'হাতে ঈশ্বরকে ধরবে।" তবে এখন কথা হচ্ছে কর্ম কিরূপভাবে করা উচিত। সংসার-কর্ম, বিষয়কর্ম করতে করতে মানুষ হয়ত ভুলে যেতে পারে তাঁর পরম মধুময়, শান্তিপ্রদায়ক অমৃতময় নাম। বেশী কর্ম জুটলে সংসারের মোহাচ্ছন্ন জীব সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে তাঁর সত্য, শাশ্বত, সনাতন অস্তিত্বে। তবে তা'র ত্রুটিবিহীন উপায় হচ্ছে নিষ্কামভাবে কর্ম করে যাওয়া—'মা ফলেষু কদাচন'।

"ঈশ্বর কর্তা, তিনি সব কিছু, আমি তাঁর হাতের যন্ত্রস্বরূপ, তিনি সব করছেন, আমি কিছু করছি না—এই বোধ অন্তরের মধ্যে জাগাতে হবে, কিন্তু নিষ্কামভাবে কর্ম করতে পারে কয় জন? 'অহংকার-বিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে'—অহংকারে অন্ধ হয়ে মানুষ নিজেকে কর্মকর্তা বলে মনে করে। অন্তরে নিষ্কাম কর্মের আদর্শ গ্রহণ ক'রে সংসার-সমরাংগনে অবতরণ করলেও মানবমনের অগোচরে অনেক সময় সকাম হয়ে পড়ে, হয়তো দান-দক্ষিণা, সদাব্রত ইত্যাদি করতে গিয়ে লোকমান্য, দেশপূজ্য হবার উদ্ভট প্রয়াস মনের গহনে জেগে উঠে। ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত স্বচ্ছ হৃদয়াকাশ ছেয়ে ফেলে এই

দুর্দমনীয় দুরাকাঙ্ক্ষায়। তবে কি তার কোন উপায় নেই? সংসারে বদ্ধজীব কি তবে ভববন্ধন হতে মুক্ত হতে পারবে না? অজ্ঞান-অন্ধকারে কি আশার অরুণোদয় হবে না? নিরঞ্জন জ্যোতির্ময়ের পরশ কি লাভ করতে পারবে না? না, সত্যিই তা' নয়। 'নিরাশ-হৃদি-পূর্ণেন্দু' শ্রীশ্রীঠাকুর দিয়েছেন তার পথনির্দেশ তাঁর সুললিত সুরধারার মধ্য দিয়ে। "কর্মযোগ বড় কঠিন, শাস্ত্রে যে কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে তা' করা বড় কঠিন। অন্নগত প্রাণ। বেশী কর্ম চলে না * * * কলিযুগে ভক্তিযোগ, ভগবানের নামগুণগান আর প্রার্থনা। ভক্তি-যোগই যুগধর্ম। ব্যাকুল হয়ে ডাক্‌লে তাঁকে অবশ্য পাবে।" এই হচ্ছে ঠাকুরের বাণী সংসার-সাগরে বিভ্রান্ত, পথহারা, মানবের প্রতি। কাজেই 'ডাকো তাঁরে ডাকো' হৃদয় খুলে আন্তরিকতা মিশিয়ে; যেন আমার ডাকে তাঁর সিংহাসন কেঁপে উঠে, তাঁকে অস্থির করে তোলে। জোর করে নিয়ে এসো মনের মণিকোঠায়, জলন্ত বিশ্বাসের রজ্জুতে বেঁধে, যেন ডাকাতি করে ধন কেড়ে লওয়া। 'মারো কাটো বাঁধো' এইরূপ ডাকাতপড়া ভাব। আজ তাই কবি রবীন্দ্রনাথেয় সুরে সুর মিলিয়ে গাই—

"তুমি যদি দেখা না দাও
কর আমায় হেলা
কেমন করে কাটে আমার
এমন বাদলবেলা।"

বাজিয়ে বেণু নাচছে রাখাল

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

বাজিয়ে বেণু নাচছে রাখাল—ভবের রাখাল রে,
নাচের তালের ঝঙ্কারে তার নাচায় সকলরে।
নীল আকাশের অসীম নীলায়
কেমন মধুর সে রূপ ঝলায়,
ভুবনমোহন শ্যামলরূপে রূপের নাকাল রে,
বাজিয়ে বেণু নাচছে রাখাল—ভবের রাখাল রে,

নাচছে রাখাল গাছের ছায়ে—গাছের পাতায় রে,
এই জীবনের গহন কোণে—নয়ন-তারায় রে।
ফিরছে নেচে কথায় কথায়,
সবার সুখে, সবার ব্যথায়,
স্বপ্ন ঘুমে যায় সে চুমে—হৃদয় মাতায় রে,
নাচছে রাখাল গাছের ছায়ে—গাছের পাতায় রে।

নাচের আসর বিরাট হ'লেও বিরাট কে কয় রে,
বিশ্বজোড়া হস্ত যে তার—বিরাট সে নয় রে।
শক্তি তাহার বিশ্বজোড়া
জীবন-ভুবন আকুল করা,
জীবন চেয়েও মহৎ অভয় স্মরণ সে হয় রে,
নাচের আসর বিরাট হ'লেও বিরাট কে কয় রে।

তাহার মোহন নাচের তালে জীবন-মরণ রে,
কেমন ক'রে ভুলব সে মোর হৃদয়হরণ রে?
জগৎ-জীবন অন্তরালে
থাক্ সে আকুল নাচের তালে,
ভুলতে নারি সেই সুমধুর জগৎ-স্মরণরে,
তাহার মোহন নাচের তালে জীবন-মরণ রে।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার

শ্রীরসরাজ চৌধুরী

[গত মাসের উদ্বোধনে শ্রীদ্বারকানাথ দের 'দৈব ও পুরুষকার' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীতে লিখিত একই বিষয়ের বর্তমান আলোচনাটি পাঠক-পাঠিকাগণের মনন উদ্রিক্ত করিবে, সন্দেহ নাই। —উঃ সঃ]

পুনর্জন্মবাদে অবিশ্বাসী পাশ্চাত্ত্য এবং তাদেরই মুখে ঝাল খেতে অভ্যস্ত এদেশে অনেকেই বেশ একটা মুরব্বিয়ানা সুরে বলে থাকেন যে, আমরা হিন্দুরা হচ্ছি ঘোর অদৃষ্টবাদী —fatalist ; দৈবের উপর নির্ভরশীলতা আমাদের মজ্জাগত, দৈবকেই জীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রধান নির্ণায়ক মনে করে আমরা পুরুষকারের অপমান করি।

কয়েক শত বৎসর পূর্বে যখন ইউরোপে বিজ্ঞানের উৎকর্ষ ও শিল্প-বিপ্লবের (Industrial Revolution) ফলে ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস শিথিল হয়ে এল এবং উপনিবেশস্থাপন, বাণিজ্য-বিস্তার ও অন্য জাতির শাসন ও শোষণ দ্বারা সকলেরই অর্থোপার্জন অতি সুগম হয়ে উঠ্‌ল তখনই তারা স্থির করে ফেল্‌ল যে অদৃষ্ট একটা বাজে কথা, পুরুষকারের আশ্রয় নিলে অসাধ্য সাধন করা যায়। এই ভাবটা এদেশে অনেকে কথাবার্তায় প্রকাশ করেন।

কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির সঙ্গে জন্মান্তরবাদ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আবার কর্মসূত্র অর্থাৎ কর্মের সহিত ফলের অখণ্ডনীয় সম্বন্ধ জন্মান্তরবাদের প্রধান অঙ্গ। এই ফল-ভোগকেই অদৃষ্ট বলা হয়। অদৃষ্টের উপর নির্ভর না করে নিজের ক্ষমতা-প্রয়োগের নাম পুরুষকার। এখন প্রশ্ন এই, অদৃষ্ট বড়, না পুরুষকার বড়, অর্থাৎ পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধ খণ্ডন করা যায় কিনা। এই প্রশ্ন নাস্তিক বা অজ্ঞেয়বাদীর (agnostic) জন্য নয়, যারা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাদের জন্যই।

উত্তর এই যে, আধ্যাত্মিক ক্ষেত্র ছাড়া প্রারব্ধ অমোঘ, অখণ্ডনীয়; পুরুষকার তার কাছে দুর্বল, পঙ্গু। মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার পূর্বপূর্ব জন্মের সংস্কার ও কর্মানুযায়ী এই জীবনের প্রতিচিত্র (blue print) তৈরী হয়ে যায়; এবং একমাত্র আধ্যাত্মিক উন্নতি ছাড়া এই প্রতিচিত্রের মুখ্য নক্সার কোন প্রকারই পরিবর্তন সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে পুরুষকারের ক্ষমতার সে আশ্বাসবাণী আছে, তা একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। তবে পুরুষকারের প্রাধান্য দেখাতে গিয়ে কালকের বদহজম আজকে উপবাসদ্বারা ক্ষয় করান, অমাত্যগণের হস্তি-প্রেরণদ্বারা ভিক্ষুকপুত্রকে রাজাসনে বসান, ঔষধপ্রয়োগে রোগের উপশম, অঙ্গ-পরিচালনা ও স্থানান্তরে গমন, লেখনীচালন দ্বারা লিপিকার্য সম্পাদন প্রভৃতি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে তদ্দ্বারা চেষ্টায় উৎসাহ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু ভাগ্যের ব্যতিক্রম ঘটিয়ে নিছক্ ঐহিক ব্যাপারে অভীষ্ট-কামনায় সিদ্ধি লাভ করা যায় না।

প্রারব্ধকে এড়িয়ে চলার শক্তি মানুষের নেই যদি না সে ভগবানকে আবেদন জানায়। তূণীর থেকে যে বাণ ছাড়া হয়ে গেছে তিনি ব্যতীত কেউ উহাকে রুখতে পারে না। যার ভাগ্যে সুখ, উন্নতি বা অর্থাগম নেই, সে প্রাণান্ত চেষ্টা করলেও তা পাবে না। আর এগুলো যার প্রাপ্য, বিনা আয়াসে তার করতলগত হবেই। একথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না যে, যখন ভাগ্যে দেয় তখন সে রকম বুদ্ধিও যোগায়। পুরুষকার দ্বারা ঐহিক সুখ আনা যায় না বা ঐহিক দুঃখের নিরাকরণ হয় না। হয় না বলেই, মানুষ নানা দৈবদুর্বিপাকে জর্জরিত হয়ে ক্ষোভের সহিত কবি শেলীর ভাষায় আক্ষেপ করে – হায়, আমার বেলাই অন্য ব্যবস্থা—"To me that cup (of happiness) has been dealt in another measure." শ্রীবৎস-চিন্তার উপাখ্যান অনিবার্য দৈব-বিড়ম্বনারই দৃষ্টান্ত।

কোটীপতি মটরগাড়ীব্যবসায়ী হেন্‌রি ফোর্ডের মতে কৃতকার্যতার মন্ত্র হলো—শতকরা ৯৯ ভাগ মাথার ঘাম পায় ফেলা (perspiration) অর্থাৎ পুরুষকার, আর একভাগ প্রেরণা (inspiration); সুখে দিন কাটাচ্ছেন এদেশে এমন অনেকে এই কথাটা আওড়ান, কিন্তু ইহা একটা সিদ্ধান্ত (theory) মাত্র। কারও ব্যক্তিগত জীবনে দৈবানুগ্রহে সাফল্য-লাভকে একটা সিদ্ধান্ত বলে খাড়া করলেই ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সে সিদ্ধান্তের সার্বত্রিক সত্যতা প্রমাণিত হয় না।

মূলকথা এই যে, একমাত্র বিধাতাই যন্ত্রী, যাঁর অভিপ্রায়েই মন পর্যন্ত স্ব-কার্যে নিযুক্ত হয়, তিনিই নিজের বিধান ইচ্ছানুরূপ বদলাতে পারেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়:

"জ্ঞানবল, ভক্তিবল, কিছুই তাঁর কৃপা ভিন্ন হবার নয়……(এমন কি) তাঁকে ডাক্‌বার ইচ্ছাও তাঁর কৃপা ছাড়া হয় না (যমেবৈষ বৃণুতে… · তৎপ্রসাদাৎ)……ত্যাগ করতে হলে পুরুষকারের জন্য প্রার্থনা করতে হয়…… তাঁর শরণাগত হলে পূর্বজন্মে অনেক কর্মপাশ কেটে যায়……তিনি কপালমোচন।"

শ্রীশ্রীমাও বলেছেন: জপতপ করলে প্রারব্ধ অনেকটা খণ্ডন হয়, যেমন একজনের পা কেটে যাওয়ার কথা ছিল, সেখানে একটা কাঁটা ফুটে ভোগ হলো। গরুড়-পুরাণেও আছে: ধ্যানেন সদৃশং নাস্তি শোধনং পাপকর্মণাম্— ধ্যান দ্বারাই পাপ ক্ষয় হয়। ঋষি অরবিন্দের মতেও "আধ্যাত্মিক শক্তি গ্রহনক্ষত্রাদিরূপে সূচিত প্রারব্ধ বা নিম্নতর শক্তিকে ব্যর্থ করিতে সমর্থ হয়, যদি সেই আধ্যাত্মিক শক্তির কার্য-করী হওয়ার সময় এসে থাকে (অর্থাৎ পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা সাধনভজনের ফলে ভগবান কৃপা করেন)। যদি আধ্যাত্মিকতার দিকে মনের গতির পরিবর্তন আমূল হয়, তবে প্রারব্ধের শক্তি অবিলম্বেই নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে। পরিবর্তনটা আমূল না হয়ে অংশতঃ হলে প্রারব্ধের ফল যতটা অনিবার্য হওয়ার কথা ততটা হয় না।" (শ্রীদিলীপ রায়ের Among the Great, ৩০৯-১০ পৃঃ)

যে অনুপাতে ঈশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া যায়, প্রতিকূল প্রারব্ধ সত্ত্বেও সেই অনুপাতে শ্রীভগবানকে তাঁর যোগক্ষেমের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে দেখা যায়। অনাশঙ্কিত অথবা অপরিহার্য বিপদ থেকে অভাবনীয় উপায়ে ভক্তের রক্ষার দৃষ্টান্ত মোটেই বিরল নহে। শুনা যায়, ভগবান নাকি বলেন "যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ।" কিন্তু কে জানে তাকে লঘু দুঃখদৈন্য দিয়েই ভগবান হয় ত তার জন্মজন্মান্তরে ভোগ্য সঞ্চিত গুরু পাপ-কর্মের নাগপাশ এই জন্মেই কাটিয়ে দিচ্ছেন।

পুরুষকার-প্রয়োগে চরিত্রগঠন বা বৃত্তিবৃত্তির উৎকর্ষ-সাধন ও অপকর্মে বিরতি এসব সম্ভব এবং এই প্রয়োগ ও কর্মবলে তার ফলও অবশ্যম্ভাবী। এই কর্ম একটা উত্তম বিনিয়োগ (investment) মাত্র, পরজন্মে তার সুখভোগ হবেই, কিন্তু ইহা দ্বারা প্রারব্ধকে আংশিক ভাবেও খণ্ডন করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের 'চালক' কবিতার এই পঙ্‌ক্তি-গুলি স্মরণীয় :

"অদৃষ্টেরে সুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে।
সে কহিল, ফিরে দেখো। দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥"

দুরদৃষ্টকে শনির দৃষ্টি বলা হয়। কিন্তু জীবনে ইহার উপকারিতাও কম নয়। দুঃখের চরম হলে অনেকে কুকর্মে রত হয় বা আত্মহত্যা করে। আবার অনেকের চৈতন্যোদয়ও হয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেন, আর্তও আমার ভজনা করে। স্বামিজীর অম্বাস্তোত্রম্-এ আছে :

"পূর্ণজ্ঞান দিবে তাই, জন্ম হতে সুখ নাই,
দুঃখপথ দিয়া মোর করে ধরি চলিছ।

একমাত্র আধ্যাত্মিক জীবনেই পুরুষকার দ্বারা প্রারব্ধকে নাকচ করা যায়। এখানেই যোগ-বাশিষ্ঠের "হস্তং হস্তেন সংপীড্য দন্তৈর্দন্তান্ বিচূর্ণ্য চ অঙ্গান্যঙ্গৈঃ সমমাক্রম্য ইত্যাদি দ্বারা অর্থাৎ প্রাণপণে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ দ্বারা মনকে বশে এনে ঈশ্বরের কৃপা লাভ সম্ভব। "তুমি তাঁর দিকে এক পা এগিয়ে গেলে, তিনি দশ পা এগিয়ে আসেন।"

স্বামী শুভানন্দের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীঅনুকূলচন্দ্র সান্যাল

সাতচল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইতে চলিল স্বামী শুভানন্দের সহিত আমার প্রথম পরিচয়ের তারিখ হইতে। আমি তখন প্রথমবার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। কলিকাতায় কলেজের পূজার ছুটি হইয়াছে। কাশীধামে গিয়াছি। একদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া রামাপুরায় সেবাশ্রমে উপস্থিত হইলাম। তখন সেবাশ্রম রামাপুরায় ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত। মাসিক ভাড়া দশ টাকা। সাক্ষাৎ হইবার পর প্রাথমিক পরিচয়-অন্তে তিনি আমাকে আমার অনুরোধ অনুযায়ী আশ্রমের ভিতরের দিকে লইয়া গিয়া সব দেখাইলেন। তিনি তখন আশ্রমের সহকারী সম্পাদক। পদে সহকারী সম্পাদক হইলেও প্রকৃত পক্ষে তিনি-ই ছিলেন আশ্রমের প্রাণ। তখন তিনি শ্রীচারুচন্দ্র দাস। তাহার বহুপরে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুকনো চেহারা, বেশভূষার বিন্দুমাত্র পারিপাট্য নাই, কেশবিন্যাসের ধার ধারেন না—প্রথম দর্শনে তাঁহার এই বৈশিষ্ট্য-গুলি আমার কিশোর-চিত্তে রেখাপাত করিল। পরিচয় গাঢ় হইতে বিলম্ব হইল না। প্রতিদিন প্রায় দু'বেলা সকালে বিকালে সেবাশ্রমে তাঁহার কাছে গিয়া বসিতাম। তিনি হোমিওপ্যাথি

জানিতেন। সকালে সেবাশ্রমে বহিরাগত (outdoor) রোগীদিগকে তিনি-ই যথোপযুক্ত ঔষধ নির্ব্বাচন করিয়া সেবাশ্রমে রক্ষিত হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ করিতেন। কি আদর্শে যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাহা এক অপরাহ্নের একটি ছোট ঘটনা বিবৃত করিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। সেই অপরাহ্নে এক বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার অনুরোধ, তাঁহার জন্য একটি ভাড়াটিয়া বাড়ী খুঁজিয়া দিতে হইবে। তিনি বলিলেন একজন কর্ম্মীকে ডাকিয়া "যাও, এপাড়ায় কিম্বা বাঙ্গালী টোলায় যেখানে যেখানে ভাড়াটিয়া বাড়ী পাবার সম্ভাবনা, খোঁজ করো।" চারুচন্দ্রের সম্পূর্ণ অপরিচিত সেই ভদ্রলোকটি চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, "আচ্ছা, চারুবাবু, বাড়ী খোঁজ করা ত পাণ্ডারা-ই করতে পারে, এর জন্য সেবাশ্রমে আসবার কি প্রয়োজন?" তিনি তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ, কি বলছো, স্বামিজী আমাদের সর্ব্বপ্রকারে জীবের সেবা করতে বলে গিয়েছেন। ভদ্রলোকের দরকার বাড়ীর, ওষুধের নয়, বাড়ী খুঁজে দিয়েই ওঁর সেবা করতে হবে, এটা Home of Service, —এটা ত সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয় কিম্বা হাসপাতাল নয়।" একমাস পরে কাশীত্যাগ করিলাম। পরবর্ত্তী কালে তাঁহার সহিত দিনের পর দিন কাটাইয়াছি। এক ঘরে শয়ন, এক কম্বলে তিনি, আর এক কম্বলে আমি। একত্রে রাত্রিতে ভোজন। তখন দিনের বেলায় সেবাশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া মধ্যাহ্ন-ভোজনের জন্য তিনি বাসায় যাইতেন, ভোজনান্তে বাসা হইতে ফিরিয়া আসিতেন। রাত্রিতে সেবাশ্রমেই আহার ও শয়ন করিতেন। ভোজনান্তে ফিরিয়া আসিয়া কখন স্বামিজীর কোন রচনাপাঠ, কখন গিরিশচন্দ্রের কোন নাটক পাঠ করিতেন। গিরিশচন্দ্রের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার রচিত নসীরাম, পূর্ণচন্দ্র, বিল্বমঙ্গল—এইসব নাটক তিনি পড়িতে ভালবাসিতেন এবং আমাকে পড়িয়া শুনাইতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি একদিন যে গৃহে গিরিশচন্দ্র শঙ্করাচার্য্য-সম্বন্ধে নাটক রচনা করিয়াছিলেন, সেই গৃহটি আমাকে দেখাইয়া দিয়াছিলেন।

তাঁর বাহিরের আবরণটি ছিল কঠোর। আশ্রম-কর্ম্মিগণের কার্য্যে কোন ত্রুটি দেখিলে রীতিমত বকিতেন। মহান আদর্শ যে আশ্রমে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে, সেই রকম আশ্রম পরিচালনা করিতে হইলে সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত অর্থের কত যত্ন করিয়া পাইপাইএর হিসাব রাখিতে হয়, কত বিবেচনা করিয়া প্রতিটি পয়সা ব্যয় করিতে হয়, তাহা দিনের পর দিন স্বচক্ষে তাঁহার কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া আমি শিখিয়াছি। একদিন একটি পথচারী ভিক্ষুক আসিয়া তাঁহার নিকট সেবাশ্রমে ভিক্ষা চাহিল। তিনি বাক্স হইতে একটি আধলা বাহির করিয়া ভিক্ষুকের হস্তে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন খরচের খাতা খুলিয়া সেই দানের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিলেন, যেহেতু সেই অর্দ্ধ পয়সাটি সেবাশ্রমের অর্থ হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। সেবাশ্রমের কার্য্য-প্রয়োজনে কোথাও কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইতে হইলে তিনি সচরাচর হাঁটিয়াই যাইতেন। পশ্চিমের সুলভতম যান একাও ব্যবহার করিতেন না। একবার কোন একজন তাঁহাকে একা করিয়া সেবাশ্রমের প্রয়োজনার্থ কোন জায়গায় যাইতে বলিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তৎক্ষণাৎ উত্তর করিয়াছিলেন, "না, না, সে হতেই পারে না, জীবনে একভাবে এতদিন চলে এসেছি, সেই ভাবেই চলবো, shareএর একা হলেও ত চা'রটে পয়সা লাগবে। কৃপণ গৃহী তাহার সঞ্চিত অর্থকে ব্যয় করিবার সময় যেমন কুণ্ঠিত হয়, তিনি

সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত সেবাশ্রমের অর্থ, সেবাশ্রমেরই প্রয়োজনে অথচ নিজের একটু সুখ-সুবিধার জন্য ব্যয় করিতে তেমনি কুণ্ঠিত হইতেন।

কুচবিহার রাজ্যের একজন দরিদ্র পেনসন-ভোগী কর্ম্মচারী একবার তাঁহার সমগ্র জীবনের সঞ্চিত অর্থ সেবাশ্রমে দান করিয়াছিলেন। সেই অর্থের পরিমাণ দুই সহস্র টাকা। তিনি এই সাত্ত্বিক দানের খুব প্রশংসা করিতেন। অপর পক্ষে, সেবাশ্রমের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কোন গণ্যমান্য লোক প্রশংসা করিলে তিনি রীতিমত কুণ্ঠিত হইতেন, কোন প্রকার বাহ্যিক সম্মান প্রদর্শন করিলে আন্তরিক বিরক্ত হইতেন। একবার, ই এ মলোনী, যতদূর মনে পড়ে তিনি তখন বারাণসী বিভাগের কমিশনার, সেবাশ্রমের বার্ষিক সভায় সভাপতি এবং রাজা মাধোলাল (তখন তিনি রাজা উপাধি পাইয়াছেন কিনা স্মরণ করিতে পারিতেছি না, কিন্তু তাহার কিছু পূর্ব্বে C. S. I. উপাধি পাইয়াছেন, ইহা স্মরণ আছে) সেবাশ্রমের স্থানীয় কমিটির সভাপতি। হঠাৎ মাধোলালজীর কি খেয়াল হইল, সেবাশ্রমের বিশিষ্ট কর্ম্মিগণকে এক একটি সুবর্ণপদক উপহার দিবেন। তিনি কে কে প্রধান কর্ম্মী, তাঁহাদের নাম জানিবার জন্য চিঠি লিখিলেন। চিঠিখানি পড়িয়াই চারুচন্দ্রের মুখে বিরক্তি ও ক্রোধের ভাব প্রকাশিত হইল। বলিয়া উঠিলেন "কে চায় তাঁর মেডাল? কিসের মেডাল? সোনা দিয়ে কি করবো? স্বামীজি কি সোনার মেডেলের লোভে, লোকের প্রশংসা পাবার লোভে, আমাদের দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে বলে গিয়েছেন?"

সে সময়ে লাক্সায় সেবাশ্রমের নিজের গৃহ নির্ম্মাণ চলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিগণের সাহায্য ও সহযোগিতার প্রয়োজন। সুতরাং সেবাশ্রমের হিতার্থে অর্থাৎ মাধোলালজী যাহাতে অস্বীকৃতির দ্বারা অপমানিত বোধ না করেন বা ক্রোধান্বিত না হন, চারুচন্দ্র নিজেদের অনিচ্ছা-সত্ত্বেও তাঁহার বিশিষ্ট সহকর্ম্মিবৃন্দের নামগুলি লিখিয়া মাধোলালজীকে পাঠাইলেন এবং সভার অধিবেশন-কালে সভাপতি মলোনী সাহেবের হস্ত হইতে তিনিও তাঁহার কয়েক জন বিশিষ্ট সহকর্ম্মী মাধোলালজী-প্রদত্ত সুবর্ণ-পদকগুলি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ঐ গ্রহণ করা পর্য্যন্ত—তারপর সেই সুবর্ণপদকগুলির কোন ব্যবহার কোন দিন তিনি কিম্বা তাঁহার সহকর্ম্মিবৃন্দ করেন নাই।

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও, এইখানে একটি কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। লোকের সহিত কথাবার্ত্তা বলিবার সময় চারুচন্দ্রের একটি মুদ্রাদোষ ছিল। তিনি কথা বলিতে বলিতে প্রায়ই বলিয়া উঠিতেন, "কি বলেন, দুর্লভবাবু?" কিম্বা "কি বলেন মশাই?" যদিও দুর্লভবাবু হয়ত সেই কথোপকথনের স্থানের ত্রিসীমানার মধ্যে নাই!

আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে চারুচন্দ্রের রীতি ছিল, প্রতি বৎসর মহাষ্টমীর দিন প্রাতে সেবাশ্রমে হোমিও-প্যাথিক ঔষধ বিতরণ বন্ধ রাখিয়া সঙ্গীদের লইয়া কাশীধামের পুণ্যস্থানগুলি দর্শন করা। মহাত্মা তুলসীদাসের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত স্থানে তাঁহার সঙ্গিরূপে ঐদিনে যখন গিয়াছি, তখন তিনি তুলসীদাসের কথা বলিতে বলিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন। প্রচণ্ড কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তাঁহার দৈনন্দিন সদ্‌গ্রন্থপাঠ ও আলোচনা এবং বার্ষিক কাশীধামের পুণ্য-স্থানগুলির পরিক্রমা বাদ যাইত না।

সে সময়ে সেবাশ্রম পরিচালনা করিতে

কত দিক, কত বিষয়, বিবেচনা করিয়া চলিতে হইত, তাহার একটি উদাহরণ দিলে পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন। আবাসিক (indoor) রোগি-শ্রেণীভুক্ত হইতে কেহ আসিলে যেদিন সে আসিত, সেই দিনই তাহার কি আছে সেই সম্বন্ধে একটি উক্তি লিপিবদ্ধ করিতে হইত। একটি বাঁধানো খাতায় লেখা হইত এবং দুই জন ভদ্রলোককে সেই লিপিবদ্ধ উক্তির সাক্ষিস্বরূপ সহি করিতে হইত। আমি যখন তাঁহার কাছে থাকিতাম, তখন অনেক সময় আমি এই লিপিবদ্ধ করার কাজটি করিতাম এবং কেদার বাবা (স্বামী অচলানন্দ) ও আমি বহুবার ঐ সব লিপিবদ্ধ উক্তির সাক্ষিস্বরূপ সহি করিয়াছি। আমি একদিন চারুচন্দ্রের নিকট এই কাজটির প্রয়োজন কি, জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "কাশী ত চেন না, এই রোগীদের ভিতর কেহ মারা গেলে তখনই পুলিশ এসে বলবে, 'এর অনেক টাকা ছিল, অনেক জিনিষ ছিল, সেসব কোথায় গেল, কে নিলো?' তাই আমাদের খুব সতর্ক থাকতে হয়, এই রকম স্থলে যদি রোগী পূর্ব্বাহ্নেই নিজেই উক্তি করিয়া থাকে যে আমার পরণের ধুতি ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং সেই উক্তি যদি লিপিবদ্ধ থাকে এবং তা'র উপর যদি সেই লিপিবদ্ধ উক্তির তলায় দুইজন ভদ্রলোকের স্বাক্ষর থাকে, তবে পুলিশ কিম্বা মৃত ব্যক্তির দেশের আত্মীয়স্বজন কেহ কোন গোলমাল করিতে পারে না।" আবার, সরকারী হাসপাতাল দুইটির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারদ্বয়ের সহিতও সে সম্বন্ধে বিশেষ ভাব রাখিতে হইত, কারণ সেবাশ্রমে তদানীন্তন ক্ষুদ্রপরিসর ভাড়াটিয়া বাড়ীতে বহু আবাসিক রোগীর স্থান হইত না, তখন তাহাদিগকে হয় ভেলুপুরা হাসপাতালে নয়ত Prince of Wales Hospitalএ পাঠাইতে হইত। লোকগুরু বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ পতাকা-বাহীদের অন্যতম এই চারুচন্দ্র কর্ম্মের কৌশল সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। কাহাকে দিয়া কোন কাজ হইতে পারে এবং কতটুকু হইতে পারে এবং কোন সময়ে হইতে পারে, তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে বুঝিতেন এবং তদনুযায়ী কাজও করিতেন। এই ক্ষীণস্বাস্থ্য অথচ নিরলস, নিরভিমান অথচ তীক্ষ্ণবুদ্ধিমান, নীরব অথচ কঠোর কর্ম্মীর জীবন হইতে বর্ত্তমান ভারতের বিভিন্ন রকম প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট কর্মিগণ বহু শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

আমার সহিত তাঁহার শেষ সাক্ষাৎ হয় বোধ হয় ১৯২২ খৃষ্টাব্দে পূজার ছুটির সময়। তখন তিনি সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া কাশীধামের সিগরা মহল্লায় শ্রীগিরীশ্বর মহাদেবের মন্দির-সংলগ্ন গুহায় কঠোর তপস্যা করিতেছেন। আমি প্রণাম করিলাম। মৃদু হাসিয়া শ্রীগিরীশ্বর মহাদেবের প্রসাদ আনিয়া আমার হাতে দিলেন। গুহার অভ্যন্তরে লইয়া গিয়া তথায় ধ্যান-ধারণার কত সুবিধা বর্ত্তমান, তাহা আমাকে দেখাইলেন। দেখিলাম, মশামাছির আক্রমণ হইতে নিস্তার পাইবার জন্য, যাহাতে সাধনাকালীন সাধকচিত্তে তজ্জনিত বিক্ষেপ উপস্থিত না হয় তাহার অতি সুব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন যিনি ছিলেন গুহার সংস্কারকর্ত্তা। কথাপ্রসঙ্গে স্বামী শুভানন্দ বলিলেন, "দেখ, একটি জিনিষ আমি অনেকদিন ভেবেছি, উত্তরাখণ্ডে যুবক বাঙ্গালী সাধুরা প্রথম তপস্যা করতে গিয়ে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত খাদ্য সদাব্রতের ঐ আধ-পোড়া আধকাঁচা রুটি আর উরত-কা-দাল দিনের পর দিন খেয়ে খেয়ে প্রথমেই পড়ে অসুখে, হয় আমাশয় নয় রক্তামাশয়, তখন আর তপস্যা, ধ্যান, ধারণায় মন যায় না, সব মন গিয়ে পড়ে দেহের উপর। এর কি কোন একটা ব্যবস্থা, দুটি ভাতের ব্যবস্থা ধর্ম্মপ্রাণ বাঙ্গালী ধনীরা সমবেতভাবে চেষ্টা করে করতে পারেন না?" সন্ধ্যা আগতপ্রায়, প্রণাম করিয়া চলিলাম। তা'রপর একদিন উদ্বোধনে পড়িলাম, কোন সাল মনে নাই, কনখলে তাঁহার অভাবনীয় ভাবে দেহত্যাগের বিবরণ। চক্ষু হইল সজল! থাক্ সে কথা।

কল্যাণ কোন্ পথে

শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদার

বাংলা-সাহিত্য বাঙ্গালীর সত্যই বড় গর্বের বস্তু ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি প্রাচীন কবি হইতে আরম্ভ করিয়া বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক মনীষিগণের সাধনা বঙ্গসাহিত্যকে যে অতুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত করিয়াছিল, তাহার জন্য শুধু স্বদেশেই নয়, বিদেশেও বাঙ্গালীর মর্যাদা অসাধারণরূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল। কিন্তু এখন সময়ের পরিবর্তন হইয়াছে। সোনার বাংলার অর্ধাংশেরও অনেক অধিক এক্ষণে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পদানত, লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালী বঙ্গের বাহিরের বিবিধ প্রদেশে কেবলমাত্র উদরসর্বস্ব হইয়া কোন প্রকারে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় রত; আর ক্ষীণকায়া পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত প্রাচীন আদর্শের প্রভাব-মুক্ত করিবার প্রচেষ্টায় এমনই কূপমণ্ডুকে পরিণত যে, বাংলার বাহিরের কোন অবাঙ্গালীর নিকট বাংলাভাষা এক্ষণে আর আকর্ষণের বস্তু নহে। পলাশীর যুদ্ধ বা মেবারপতন ও চন্দ্রগুপ্তের মত কাব্য ও নাটক এখন আর হিন্দী প্রভৃতি ভাষায় অনূদিত হয় না; বাংলা ভাষার কণ্ঠরোধ করিবার জন্যই অবাঙ্গালীগণ এখন অতিমাত্র ব্যগ্র। ইহার উপর বাঙ্গালীর ভোগবাদ, নারীপ্রগতি, ও বিলাসবিহ্বলতা বাংলা ভাষার সমাধিশয্যা রচনায় নিযুক্ত। বাংলার যে গ্রন্থকার আত্মস্বার্থের জন্য ভোগবাদের প্রশস্তি কীর্তন করিবেন, পবিত্র বিবাহ-বন্ধনকে হীন প্রতিপন্ন করিয়া অবাধ প্রেমের স্তুতিগীতি গাহিবেন, তাঁহার জয়ধ্বনিতেই শুধু বাংলার আকাশ-বাতাস কম্পিত হইয়া উঠিবে না, তাঁহার অর্থভাণ্ডারও দেখিতে দেখিতে ফাঁপিয়া উঠিবে। এইরূপ সাহিত্যের জন্য যদি অবাঙ্গালী কোন আগ্রহ বোধ না করে তবে তাহাকে দোষ দিবারই বা কি আছে? বাঙ্গালী স্বখাত সলিলে ডুবিয়া মরে; কিন্তু সেকথা সে কিছুতেই স্বীকার করিতে চাহে না। বাংলার বহু সাময়িক পত্রিকা ও বহু গ্রন্থকারই এই দুঃখ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে তাঁহাদের বিক্রয়ের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র পূর্ববঙ্গ হাত ছাড়া হইয়া যাওয়ায় তাঁহাদের দুর্দশার আর সীমা নাই। ফলকথা, পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালীর সহানুভূতি ও সাহায্যে যাঁহাদের এতদিন চলিত, তাঁহাদের আর এক্ষণে চলে না। কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস দারিদ্র্যের তীব্র কষাঘাতে তিলে তিলে দেহক্ষয় করিয়াছেন, কিন্তু আমাদের সাহিত্যিকগণ সে দিকে একবার দৃকপাতও করেন নাই। তাহার কারণ তাঁহার কবিতায় মনুষ্যত্বের প্রবোধনা থাকিলেও ভোগবাদের স্তুতিকীর্তন নাই। কিন্তু কয়জন বাঙ্গালী এজন্য অনুতাপ করিয়া এই জাতীয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন? আত্মদোষ সব শোধন না করিয়া পরের উপর দোষারোপ করিতেই তাঁহারা ভালবাসেন। যত দোষ নন্দ ঘোষ বলিয়া, অর্থাৎ অবাঙ্গালীর উপর সব দোষ চাপাইয়া দিয়া বাঙ্গালী নিশ্চিন্ত হইতে চাহেন।

মিথিলা হইতে রাজস্থান পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে বহু কথ্য ভাষা থাকা সত্ত্বেও উহার সাহিত্যিক ভাষা হিন্দী কেমন করিয়া হইল বাঙ্গালী তাহা অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন কি? আবার বাংলার মাসিক পত্রিকাগুলি যেখানে পাতায় পাতায় সদ্যস্নাতা ও অভিসারিণী প্রভৃতি চিত্রগুলি ছাপিয়া এবং শ্লীল অশ্লীল সর্বপ্রকারের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ছয় সাত হাজারের বেশী গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন না, সেখানে ক্ষুদ্র গোরক্ষপুরে ক্ষুদ্র "কল্যাণ" পত্রিকা বাহিরের বিজ্ঞাপন গ্রহণ না করিয়াও এবং গল্প উপন্যাস ও অপৌরাণিক চিত্র না ছাপিয়াও কেমন করিয়া ষাট হাজারের মত গ্রাহক সংগ্রহ করিতে পারেন তাহাও কি কথনো তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখিয়াছেন? ধর্মের কাহিনী এবং পৌরাণিক চিত্রগুলি সম্বল করিয়া এই পত্রিকাখানি অসাধ্য সাধনের মত যাহা করিতেছেন, বাঙ্গালী তাহা কি স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন? আপনি অগাধ মাতৃভক্তিতে অভিষিক্ত হইয়া "মাতৃপুজা" লিখিলেন, কিন্তু বাঙ্গালার সমালোচক অমনি বলিয়া বসিলেন, এ চিত্র নিতান্তই সেকেলে, বর্তমানে ইহা একেবারেই অচল। অতএব সচল চিত্র যদি আপনি অঙ্কিত করিতে পারেন তবেই আপনি সাহিত্যক্ষেত্রে সচল হইবেন, নতুবা চিরদিন অচল হইয়াই থাকিতে হইবে। বাঙ্গালী যতই দিন দিন দুর্দশার অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হইতেছেন, ততই জোর গলায় বলিতেছেন— "আমার মত সাহিত্যসৃষ্টি কেহ করিতে পারে না। আমার সাহিত্য পড়িয়া কত বাল-বিধবা পতনের হাত হইতে রক্ষা পাইল; কত পতিতা পাপের পঙ্ক হইতে বাহির হইয়া পুণ্যের জীবন গ্রহণ করিল; ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের ভণ্ডামি চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া আমার সাহিত্যসমাজকে পুণ্যের জ্যোতিঃতে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিল।" কিন্তু বাঙ্গালী বুকে হাত দিয়া বলিবেন কি, তাঁহারা আজ কোথায়? সত্যই কি তাঁহারা পুণ্যের পথে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন? পাপ-ব্যবসায় কি সত্যই বাংলাদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে? না, নিত্য নূতন পোষাকে অঙ্গাবৃত করিয়া এই দুষ্ট-বৃত্তি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনকে ক্ষীণমূল করিয়া ফেলিতেছে? যে জাতি ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া কঙ্কালসার, যক্ষ্মার আক্রমণে যাহার জীবনীশক্তি স্তিমিতপ্রায়, দারিদ্র্য ও তজ্জনিত অনাহার বা অর্ধাহারে যে জাতি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় পতনোন্মুখ সে জাতি দিবারাত্রি প্রেমচর্চায় মাতিয়া থাকে ইহাকে আশ্চর্য বলিব না ত জগতে আশ্চর্য আর কি আছে? বাঙ্গালী-মানসিকতা বর্তমানে কোন স্তরে নামিয়া আসিয়াছে তাহা বাঙ্গালী জন-সাধারণ বিশেষতঃ বাঙ্গালীর তরুণ-তরুণীরা ভাবিয়া দেখিবেন কি? বাঙ্গালীর বিস্ময়কর জাগৃতি সম্ভব হইয়াছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টিপ্রসূত সাহিত্যের অবদানে, বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জ্ঞানঘন দিব্যবাণীর প্রেরণায়, রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি বিরাট পুরুষগণের চারিত্রিক মহিমায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, বাঙ্গালীর সে দিন আর নাই। বাঙ্গালীর আদর্শে আজিকার অবাঙ্গালী আর বিন্দুমাত্র পরিচালিত হয় না। জীবনের কোন ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর আর প্রভাব-প্রতিপত্তি নাই। বাঙ্গালীকে যদি আবার উঠিতে হয়, ব্রহ্মচর্য ও ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ লইয়াই তাঁহাকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে, এবং তাহার সাহিত্যকেও সেইভাবেই গড়িয়া তুলিতে হইবে। 'আনন্দমঠ' যদি বাঙ্গালী ও ভারতবাসীর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে

পারে, তবে এইরূপ সাহিত্যে বাঙ্গালীর কেন মনোরঞ্জন করিবে না? আর কেবল কাব্য, উপন্যাসই যে বাঙ্গালীকে পাঠ করিতে হইবে তাহাও নয়। উত্তর ভারতের অসংখ্য নরনারী আজও গোস্বামী তুলসীদাসকৃত হিন্দী রামায়ণ পরম ভক্তিভরে পাঠ করিয়া থাকে। কোন কাব্য বা উপন্যাসের সাধ্য নাই যে এই রামায়ণের স্থান গ্রহণ করিতে পারে। ফলকথা বাঙ্গালীকে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হইয়া চলিতে হইবে। সাহিত্যের দিব্যবাণী দ্বারা উদ্বুদ্ধ না হইলে জাতির জয়যাত্রা কখনই সফল হইতে পারে না। কিন্তু সেই দিব্যবাণী বুঝিতে হইলে দিব্য কর্ণেরও একান্তই প্রয়োজন। কাচ ও কাঞ্চনের প্রভেদ-জ্ঞান বিলুপ্ত না হয়, দুগ্ধ ফেলিয়া কেহ সুরার আদর না করে সেজন্য জাতিকে বিশেষভাবেই সতর্ক থাকিতে হইবে। তবেই বঙ্কিমচন্দ্রের মত দিব্য মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষ আবার আবির্ভূত হইয়া দিগ্‌ভ্রষ্ট বাঙ্গালী জাতিকে পথের সঙ্কেত প্রদান করিবেন। অতএব বাঙ্গালী জাতির পুনরুত্থানের জন্য সমগ্র জাতির মধ্যে সৎসাহিত্যের সমাদর হওয়া একান্তই প্রয়োজন। বর্তমানে সমগ্র জাতিটাই যেন দারুণ মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যেমন করিয়াই হউক এই মোহ-ঘোর কাটাইয়া উঠিতে না পারিলে জাতির কিছুতেই কল্যাণ নাই। বাঙ্গালী জাতি যদি এখনও জাগ্রত না হন, হয়ত বিধাতার দিব্য বিধানে আরও কঠিন আঘাত তাঁহাদিগকে সহ্য করিতে হইবে। অতএব বাঁচিতে হইলে এখন হইতেই তাঁহাদিগকে সতর্ক হইতে হইবে। সৎসাহিত্যের—সংযম ও পবিত্রতা-মূলক পুস্তক সমূহের সম্যক আদর যেমন তাঁহাদিগকে করিতে হইবে, অসৎ সাহিত্যকেও তেমনি সম্মার্জনী-প্রহারে দূর করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ব্যষ্টি মানব অপেক্ষা সমষ্টি মানবের দ্বারা—বাংলার বিবিধ প্রতিষ্ঠান, বিশেষতঃ সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির দ্বারাই এ কার্য অধিকতর সুষ্ঠুভাবে হওয়া সম্ভবপর। কোথাও সাহিত্যিক প্রতিভা অনাদরে বা হতাদরে শুষ্ক কোরকের ন্যায় অকালে ঝরিয়া না পড়ে এই সকল প্রতিষ্ঠানকে সেদিকে বিশেষভাবেই লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রতিভার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন অনুকূল বায়ু পাইলে প্রজ্বলিত হইয়া সমগ্র দেশকে আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে, উহার অভাবে তেমনি অকালে নিভিয়া যাইতেও পারে। আর প্রতিভার এইরূপ অকাল নির্বাণ যে দেশ ও জাতির পক্ষে একান্তই অকল্যাণকর তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুতরাং বাংলার সাহিত্যিক-প্রতিষ্ঠানগুলি এই দিক দিয়া যাহাতে তাঁহাদের কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করিতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা সমগ্র দেশবাসীকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করিতে পারেন, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা সকলেরই একান্ত প্রয়োজন।

"আহার, চালচলন, ভাব-ভাষাতে তেজস্বিতা আনতে হবে, সব দিকে প্রাণের বিস্তার করতে হবে—সব ধমনীতে রক্তপ্রবাহ প্রেরণ করতে হবে, যাতে সকল বিষয়েই একটা প্রাণস্পন্দন অনুভব হয়। তবেই এই ঘোর জীবনসংগ্রামে দেশের লোক বাঁচতে পারবে। নতুবা অদূরে মৃত্যুর ছায়াতে অচিরে এদেশ ও জাতিটা মিশে যাবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমালোচনা

গানে রামপ্রসাদ—লেখক : শ্রীঅমিয়লাল মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চ্যাটার্জী এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা—(৮✓০+৮০)। মূল্য একটাকা।

সাধক রামপ্রসাদ-সম্পর্কিত একখানি তথ্যপূর্ণ পুস্তিকা। লেখক অবতরণিকায় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-প্রকাশিত 'সাহিত্য সাধক চরিতমালা'র ৯২-সংখ্যক 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় কর্তৃক প্রচারিত রামপ্রসাদের দ্বৈতব্যক্তিত্ববিষয়ক মতবাদ খণ্ডন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। মূল প্রবন্ধে রামপ্রসাদের বিদ্যাশিক্ষা, গান ও বিদ্যাসুন্দর প্রভৃতি রচনা, বাল্য ও গার্হস্থ্য জীবন এবং ধর্ম সাধনা প্রভৃতি আলোচিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে ত্রিবিধ তান্ত্রিক সাধনার সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। লেখক বিশেষ অধ্যবসায় সহকারে প্রথম ও দ্বিতীয় পরিশিষ্টে রামপ্রসাদের দুইটি দুরূহ প্রহেলিকা-জাতীয় গানের আধ্যাত্মিক অর্থের উদ্ধার করিয়াছেন। তৃতীয় পরিশিষ্টে ৫৩ হইতে ৮০ পৃষ্ঠায় রামপ্রসাদের প্রসিদ্ধ ৫১টি গান প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তিকাখানির বৈশিষ্ট্য এই যে, রামপ্রসাদের জীবনী উদ্ধারে জনশ্রুতি বা কিংবদন্তীর উপর বিশেষ নির্ভর না করিয়া লেখক রামপ্রসাদের গানের সাক্ষ্যের উপরই বেশী নির্ভর করিয়াছেন। গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ও উদ্যম সাধু ও প্রশংসনীয়—বঙ্গের অলঙ্কার, মহাপুরুষ, সাধকপ্রবর রামপ্রসাদের স্মৃতিরক্ষা। আমরা এইজাতীয় পুস্তিকার বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী (অধ্যাপক)

শ্রীমদ্ভাগবত (পরিচয় ও আলোচনা)—অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ('শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ জীবন ও সাধনা' এবং 'স্মৃতিকথা' প্রণেতা) ও শ্রীপ্রণতি সান্ন্যাল বিরচিত। প্রাপ্তিস্থান—১০, বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলিকাতা-৯। পৃষ্ঠা—৬৪৮+১৩+✓০; মূল্য—ছয় টাকা।

সর্বসাধারণের উপযোগী করিয়া লেখা শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্রের এই সহজ সরস এবং তথ্যপূর্ণ পরিচয়- ও আলোচনা-গ্রন্থটি পড়িয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। ভাগবতের ১২টি স্কন্ধেরই ধারাবাহিক বিষয়বস্তু এবং প্রত্যেক স্কন্ধের অনেকগুলি মূল সংস্কৃত শ্লোক সরল ব্যাখ্যা সহ পুস্তকে সুবিন্যস্ত হইয়াছে। শ্লোকগুলির নির্বাচনে গ্রন্থকর্তার কৃতিত্ব প্রশংসনীয়। ভাষা স্বচ্ছ ও সজীব। আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গী সাম্প্রদায়িকতা-বর্জিত, টীকা-টিপ্পনীর জটিলতা-নির্মুক্ত এবং আগাগোড়া একটি সশ্রদ্ধ ভক্তির আবেদনে ভরপুর বলিয়া প্রাণস্পর্শী। বাংলা ধর্মসাহিত্যে বইটি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া লইবার যোগ্যতা রাখে।

সমাধান (দ্বিতীয়খণ্ড)—স্বামী দুর্গাচৈতন্য ভারতী প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরু লাইব্রেরী ২০৪ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা : ২৮৯; মূল্য—৩৲ টাকা।

বহু ধর্ম-ও দার্শনিক-গ্রন্থের প্রণেতা প্রবীণ গ্রন্থকারের এই বইখানিতে হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে ৯টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। সব লেখা-গুলির মধ্যেই প্রখর শাস্ত্রজ্ঞান এবং সত্যসন্ধানী মৌলিক মনন-ধারা সুপরিস্ফুট।

বিবেকানন্দ [illegible] পত্রিকা (১৩৫৯)—শ্রীসুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, এম-এ, বি-টি কর্তৃক বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশন, ১০৭ নেতাজী সুভাষ রোড, হাওড়া হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত।

স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষার আদর্শে গঠিত হাওড়ার সুপরিচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিবেকানন্দ ইন্‌ষ্টিটিউশনের এই ষষ্ঠবিংশতি বার্ষিক প্রকাশন পড়িয়া আমরা প্রীতিলাভ করিয়াছি। ছাত্র লেখকদের লেখা প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায় প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধারার অভিনবত্ব ফুটিয়া উঠিয়াছে। তরুণ বন্ধুদের অভিনন্দন জানাই।

Maha Bodhi Society Diamond Jubilee Souvenir—৪এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীটস্থ মহাবোধি সোসাইটি হইতে প্রকাশিত। ডবলক্রাউন আর্টপেজী পৃষ্ঠা ২১৬; মূল্য—৬৲ টাকা।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ প্রচারক ভিক্ষু অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর ১৯৫১ সালে উহার হীরকজয়ন্তী পূর্ণ হইয়াছে। এতদুপলক্ষে প্রকাশিত এই স্মারকগ্রন্থটির সম্পাদন করিয়াছেন ডক্টর শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ সাত জন মনীষী। বৌদ্ধধর্মের সম্প্রসারের জন্য দেবচরিত্র এবং অদ্ভুতকর্মা ধর্মপালের অকুণ্ঠ পরিশ্রম অতীব বিস্ময়কর। গ্রন্থের প্রথম ১৩২ পৃষ্ঠায় তাঁহার বিশদ জীবনী এবং মহাবোধি সোসাইটির বিস্তারিত ইতিহাস ও কার্যবিবরণী দেওয়া হইয়াছে। বাকী অংশে বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের লেখা বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি-বিষয়ক অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধ আছে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী নেহেরু এবং দেশের ও বিদেশের বহু প্রসিদ্ধ ব্যক্তির বাণী পুস্তকে সম্বলিত হইয়াছে। এই তথ্যবহুল স্মৃতি-গ্রন্থ বিদ্যা- ও ধর্মোৎসাহীদের নিকট সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

স্বামী স্বয়মানন্দের দেহত্যাগ—পরমপূজনীয় শ্রীমৎ শিবানন্দ (মহাপুরুষ) মহারাজের মন্ত্রশিষ্য এবং সন্ন্যাসি-সন্তান স্বামী স্বয়মানন্দ ৭৪ বৎসর বয়সে গত ২১শে চৈত্র বেলুড় মঠে দেহত্যাগ করিয়াছেন। পূর্বাশ্রমে পার্শীসম্প্রদায়ভুক্ত তাঁহার নাম ছিল দিনশা কাপাডিয়া। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় আকৃষ্ট হইয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সঙ্ঘে যোগদান করেন। কিছুকাল মায়াবতী অদ্বৈত আশ্রমে ছিলেন—পরে বরাবর বেলুড়মঠেই থাকিতেন। তাঁহার বৈরাগ্য, ধ্যান-নিষ্ঠা এবং তিতিক্ষা সকলকেই মুগ্ধ করিত। এই অনাড়ম্বর সন্ন্যাসীর লোকান্তরিত আত্মা শ্রীগুরুর অভয় পাদপদ্মে চিরশান্তি লাভ করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

মূর্তিপ্রতিষ্ঠা—গত ২রা ও ১১ই চৈত্র যথাক্রমে পাটনা এবং শিলং আশ্রমের মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ কর্তৃক সম্পন্ন হইয়াছে। উভয় স্থানেই এতদুপলক্ষে কয়েকদিনব্যাপী আনন্দোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং নানা কেন্দ্র হইতে আগত বহু সন্ন্যাসীর উপস্থিতি ও ধর্মালোচনায় স্থানীয় ভক্ত এবং বন্ধুগণ প্রভূত আধ্যাত্মিক উদ্দীপনা লাভ করিয়াছিলেন।

পাটনা আশ্রমে উৎসবসমারোহ এক সপ্তাহ ধরিয়া চলে। মূর্তি-প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন ৮কাশীর পণ্ডিতগণ কর্তৃক বৈদিক হোম (হরিহর যজ্ঞ) উদ্‌যাপিত হয়। ৩রা হইতে ৬ই চৈত্র পর্যন্ত একটানা কর্মসূচী ছিল শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজীর জীবনী ও বাণীর বিভিন্ন দিক আলোচনা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী, স্বামী ওঙ্কারানন্দ, স্বামী রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী তেজসানন্দ, স্বামী চিদাত্মানন্দ, বিচারপতি এস্, কে, দাস এবং বিচারক এস্, সি, মিশ্র মহাশয় বিভিন্ন দিন মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

স্বামী মাধবানন্দ ৩রা চৈত্র তাঁহার ভাষণে বলেন, যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ছিলেন মহামানব। তাঁহার জীবনী ও বাণী জানা এবং উহা নিজেদের বাস্তব জীবনে অনুশীলন করা প্রত্যেকেরই কর্তব্য। বেদান্তের শিক্ষাসমূহ তাঁহার উপদেশের মধ্যে প্রতিফলিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর এই শিক্ষাগুলিই ভারতীয় সংস্কৃতির সার কথা। আজ মানুষ পার্থিব ভোগ-সুখের এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিমুখে খুব বেশী ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে কিন্তু এই পথে তাহার কোনদিনই শান্তি আসিবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব দেখাইয়া গেলেন যে কেবলমাত্র পার্থিব সমস্ত কিছুর ত্যাগেই আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভবপর।

বিচারক এস্, কে, দাস বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন: শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বর দূরের ঈশ্বর নন্। সেই ঈশ্বর হইতেছেন আমাদের দেহমন্দিরের দেবতা—আমাদের গৃহ, আমাদের প্রতিটি কর্মের মধ্যে অনুস্যূত ঈশ্বর। শুধু পুরুষ নয় নারীকেও তিনি ইষ্টের প্রকাশ বলিয়া দেখিতেন। সমস্ত স্ত্রীলোককে দৈহিক লালসার দৃষ্টিতে না দেখিয়া গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মানের চক্ষে দেখিতে তিনি আমাদের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

৫ই চৈত্র, ছাত্রদের একটি সভা হয়। সভাপতি ছিলেন বিহার রাজ্যের মন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅনুগ্রহ নারায়ণ সিংহ। বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর রায় বাহাদুর শ্যামনন্দন সহায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ পূর্বক রচনা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। তাঁহারা বিদ্যার্থীদের সম্বোধন করিয়া বলেন, তাহারা যদি নিজেদের জীবনটীকে উচ্চভাবে গড়িয়া তুলিতে চায় এবং দেশের ও সমাজের অবস্থার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনই যদি তাহাদের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করা তাহাদের কর্তব্য। ৬ই চৈত্র, অনুষ্ঠিত মহিলাসভায় স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং স্বামী ওঙ্কারানন্দ আমাদের দেশে নারীগণের সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ভাগলপুরের শ্রীউদয়নারায়ণ ঠাকুরের হিন্দী-কথকতা এবং স্বামী ওঙ্কারানন্দের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ উৎসবের প্রাণবন্ত অঙ্গ ছিল। ৮ই চৈত্র শেষদিনে প্রায় দুই হাজার দরিদ্র-নারায়নকে বসাইয়া খাওয়ানো হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্মোৎসব—ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮ তম জয়ন্তী অনুষ্ঠানের বিস্তারিত সংবাদ আমরা গতমাসে কতকগুলি কেন্দ্র হইতে পাইয়াছি। সংক্ষেপে উহা লিপিবদ্ধ করা হইতেছে।

১লা চৈত্র এই উৎসব টাকী (২৪ পরগণা) আশ্রমে বেশ সমারোহেই উদ্‌যাপিত হইয়াছে। প্রাতে ভজন, কথামৃত-ও চণ্ডী-পাঠ, পূজা এবং প্রায় ৪০০০ নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল। অপরাহ্নে একটি মহতী জনসভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনী ও বাণী-বিষয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ, শ্রীপ্রফুল্লনাথ বন্দোপাধ্যায়, শ্রীস্মরজিৎ দত্ত এবং সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধাংশু-কুমার সেনগুপ্ত মহাশয়। পরিশেষে বিদ্যালয়ের

ছাত্রগণ কর্তৃক নাটকাভিনয়ের পর, দিনের কর্মসূচী সমাপ্ত হয়।

মেদিনীপুর সেবাশ্রমে উৎসব চলে ১০ই হইতে ১৮ই ফাল্গুন অবধি। পূজার্চনা, শাস্ত্রপাঠ, ভজন-কীর্তন, বিশিষ্ট সঙ্গীতগণের কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত, মাইকযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণীর বক্তৃতালোচনা ও প্রবন্ধ পাঠ, রামরসায়ন গান এবং ত্রি-সহস্রাধিক নরনারায়ণসেবা প্রথম দিবসের কর্মপর্বের অঙ্গ ছিল। দ্বিতীয় হইতে চতুর্থ দিবস ধরিয়া শ্রীশ্রীঠাকুর-স্বামিজী ও শ্রীশ্রীসারদামণিদেবী সম্বন্ধে সুচিন্তিত আলোচনা চলে। বক্তৃতা করেন স্বামী পূর্ণানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, শ্রীশুভেন্দু কুমার রায় ও স্বামী বিশ্বদেবানন্দ।

গড়বেতা (মেদিনীপুর) আশ্রমে বিশেষ পূজাদি সহ অনুষ্ঠান পালিত হয় ৮ই চৈত্র। প্রায় দেড়হাজার ভক্ত নরনারীকে প্রসাদদানে তৃপ্ত করা হইয়াছিল। বৈকালিক ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার নীলমাধব সেন। বক্তৃতা দেন রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের অধ্যক্ষ ও উদ্বোধন পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক স্বামী সুন্দরানন্দজী।

হবিগঞ্জ (শ্রীহট্ট, পূর্বপাকিস্তান) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমে ২০শে ফাল্গুন হইতে পাঁচ দিবস ব্যাপী উৎসবের প্রথম ও দ্বিতীয় দিনে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দের শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত পাঠ, আলোচনা এবং ছাত্রসভায় ছাত্র-ছাত্রীগণের আবৃত্তি, প্রবন্ধপাঠ ও বক্তৃতা হয়। তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে স্বামী রামেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীবীরেন্দ্রকুমার চৌধুরী, ও পণ্ডিত রাসমোহন চক্রবর্তীর ভাষণ এবং রামায়ণ গান ও শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা সমবেত সকলকেই আনন্দ দান করিয়াছিল।

দক্ষিণ ভারতের উতকামণ্ড (নীলগিরি) আশ্রমের উৎসবের উদ্‌যাপণ নির্বিঘ্নেই শেষ হইয়াছে। প্রায় ৩১০০ জন নরনারী বসিয়া প্রসাদ পান। ১৮টি ভজনগায়কদল ভজনে পর পর অংশ গ্রহণ করিয়া আশ্রম মুখরিত রাখেন। আহূত জনসভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন ব্যাঙ্গালোর আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী। স্বামী অজয়ানন্দ ছিলেন অন্যতম বক্তা।

জামসেদপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে ১৪ই ও ১৫ই চৈত্র উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। দুই দিনই আশ্রম প্রাঙ্গণে আহূত জনসভায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন ও বাণী-সম্বন্ধে ভাষণ দেন হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার সহকারী-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী, আরা জৈন কলেজের অধ্যাপক শ্রীশিববালক রায় এবং উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ। দ্বিতীয় দিবস সারাদিনব্যাপী পূজা, নাম-সংকীর্তন এবং প্রসাদ বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সারগাছি (মুর্শিদাবাদ)তে অনুষ্ঠান —গত ৮ই চৈত্র সারগাছি আশ্রমে পরমারাধ্য শ্রীমৎ স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের স্মৃতিপূজা-উৎসবসুসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। মঙ্গলারতি, ষোড়শোপচারে পূজা, হোম, ৺চণ্ডীপাঠ ও ভজনাদি সারাদিন অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সারদেশানন্দ পূজ্যপাদ অখণ্ডানন্দজী মহারাজের জীবনী পাঠ করেন। অপরাহ্নে জনসভায় স্বামী প্রেমেশানন্দজী ও শ্রীনারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বক্তৃতা দেন। প্রায় ১২শত নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। উৎসবের রন্ধন, পরিবেশন ও অন্যান্য যাবতীয় কাজ আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রগণ নিজেরাই করিয়াছেন। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে স্বামী অখণ্ডানন্দজী মহারাজের অনেক মন্ত্রশিষ্য এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক—(১) গীতাসার-সংগ্রহ (দ্বিতীয় সংস্করণ)—স্বামী প্রেমেশানন্দ সম্পাদিত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন শিলং। মূল্য একটাকা চার আনা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একশত সুনির্বাচিত শ্লোকের মূল, অন্বয়, শব্দার্থ, বঙ্গানুবাদ, ব্যাকরণ, টিপ্পনী ও ব্যাখ্যা।

(২) Golden Jubilee Souvenir of the R. K. Mission Sister Nivedita Girls School—ভগিনী নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী স্মারক গ্রন্থ। প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস এবং ইংরেজী ও বাঙ্গলা অনেকগুলি সুলিখিত রচনা দ্বারা সমৃদ্ধ।

বিবিধ সংবাদ

নানাস্থানে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী—গত ৩১শে ফাল্গুন ইছাপুর প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১১৮তম জন্মমহোৎসব অনাড়ম্বর অথচ গাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। ভোরে প্রভাত ফেরী সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ, সঙ্ঘগৃহে বিশেষ পূজা, হোম, চণ্ডী ও গীতাপাঠ এবং দ্বিপ্রহরে দুই সহস্রাধিক লোককে প্রসাদ বিতরণের সুব্যবস্থা হইয়াছিল। অপরাহ্নে স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পৌরোহিত্যে একটি জনসভায় পণ্ডিত শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী এবং সাংবাদিক শ্রীঅমর নন্দী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী আলোচনা করেন।

ঢাকুরিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে এতদুপলক্ষে ২৪শে ফাল্গুন যথাবিধি পূজাপাঠাদি এবং নগর সংকীর্তনের আয়োজন হইয়াছিল। রেডিও শিল্পী শ্রীহরিদাস করের সুললিত কীর্তন এবং বেলঘরিয়া সুহৃৎ সম্মিলনীর শিবদুর্গা-ভজন সকলকে প্রভূত আনন্দ দান করিয়াছিল। বৈকালে একটি জনসভায় পৌরোহিত্য করেন অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী। প্রধান অতিথি ছিলেন সুকবি শ্রীনরেন দেব। সন্ধ্যায় সুগায়ক শ্রীঅনুপম ঘটক মহাশয়ের ছাত্রীবৃন্দের মধুর ভজন উপস্থিত সকলকেই পরিতৃপ্ত করিয়াছিল।

হরিশপুর (হাওড়া) শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে ১৭ই ফাল্গুন পুণ্য জন্মতিথি দিবস যথাবিধি উদ্‌যাপিত হয়। অপরাহ্নে প্রায় এক হাজার গ্রামবাসীর সম্মেলনে বেলুড়মঠের ব্রহ্মচারী অভয়-চৈতন্য 'আমি কি চাই' বিষয়ক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণবাণী-সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন।

গত ১৫ই চৈত্র বাটানগর রামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত উৎসবে নগরসংকীর্তন এবং পূজাপাঠাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রায় দুই হাজার নরনারী বসিয়া এবং তিন হাজার নরনারী হাতে হাতে প্রসাদ গ্রহণ করেন। স্বামী বীতশোকানন্দের (বেলুড় মঠ) সভাপতিত্বে একটি আলোচনা সভায় সভাপতি এবং স্থানীয় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঠাকুরের সম্বন্ধে ভাষণ আলোচনা করেন।

বেলঘরিয়ার দেশপ্রিয় নগরে গত ২৪শে ফাল্গুন পূজাদি সুশৃঙ্খলে সম্পাদিত হয়। পূর্বদিবস সন্ধ্যায় প্রারব্ধ সংকীর্তনের সমাপ্তি এই দিন মধ্যাহ্নে হইয়াছিল। কীর্তনান্তে খিচুড়ী প্রসাদ বিতরণ এবং বৈকালে একটি জনসভার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমনকুমার সেন, শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, সাহিত্যরত্ন এবং স্বামী শ্রদ্ধানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আলোচনা করেন।

গত ৩রা ফাল্গুন মথুরাপুর (২৪ পরগণা) শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে প্রাতে ঠাকুরের তিথিপূজা, চণ্ডীপাঠ, এবং হোমাদির পর নাম-সংকীর্তন ও বৈকালে সুরশিল্পী শ্রীবিমলকুমারের ভজন গানের অনুষ্ঠান হয়। সন্ধ্যারতির পর পণ্ডিত চারুচন্দ্র বিদ্যার্ণব বেদান্ত-শাস্ত্রী চিত্তাকর্ষক ভাষায় সমবেত শ্রোতাদিগকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনবেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের 'একাদশী মাহাত্ম্য' শ্রবণ করাইয়া বিশেষভাবে মুগ্ধ করেন।

১৬ই ফাল্গুন অপরাহ্নে "পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ" গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত অনুপম ভাবে ও ভাষায় অপরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়া সমবেত মাতৃমণ্ডলী ও সজ্জনবৃন্দকে রামকৃষ্ণ-ভাব-সমুদ্র-মন্থনে অমৃত পরিবেশন দ্বারা পরম আপ্যায়িত করেন। পর দিবস সন্ধ্যার পর "বিবেকানন্দ সোসাইটী" কর্তৃক

ছায়াচিত্রে ঠাকুর স্বামিজীর জীবনী প্রদর্শিত হয়।

২৪শে ফাল্গুন অপরাহ্ণে প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীনীলমণি চক্রবর্তী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এক ধর্মসভার অনুষ্ঠান হয়।

ভদ্রকালী গ্রামস্থিত শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ব্রহ্মচর্য-বালিকাশ্রমে প্রতি বৎসরের ন্যায় এই বারেও শ্রীভগবান রামকৃষ্ণদেবের শুভাবির্ভাব স্মরণে ২৪শে মাঘ (৭ই ফেব্রুয়ারী) হইতে ৪ঠা ফাল্গুন (১৬ই ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত মহোৎসব সুসমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তিথি পূজার দিনআশ্রম বালিকাগণ ব্রাহ্মমুহূর্তে সমবেত-প্রার্থনানন্তর মঙ্গলঘট স্থাপন করিয়া আশ্রমের বহিস্থ প্রাঙ্গণে সাময়িক নির্মিত মণ্ডপে স্থাপিত শ্রীশ্রীঠাকুরের বৃহৎ প্রতিকৃতি পুষ্পমাল্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করে। অতঃপর সুমধুর শ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্তন আরম্ভ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজা, ভোগ, আরতি ও চণ্ডীপাঠ শেষ হইয়া গেলে মধ্যাহ্নে সমাগত তিন চারি শত নর নারীকে বসাইয়া প্রসাদ দেওয়া হয়। উৎসব উপলক্ষে আশ্রমে দশদিন যাবৎ প্রত্যহ অপরাহ্ণে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হইয়াছিল।

পাকিস্তানে উৎসব—বিগত ২৬শে হইতে ২৯শে ফাল্গুন কুমিল্লা শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব ও আশ্রমের সাধারণ বার্ষিক উৎসব বিশেষ সমারোহে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তৃতীয় দিবস বেলুড় মঠের স্বামী রামেশ্বরানন্দের সভাপতিত্বে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রীবিভূরঞ্জন গুহ এবং অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ চক্রবর্তী মহোদয়গণ ঠাকুরের জীবনী বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করেন। চতুর্থ দিবস প্রাতে শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত প্রতিকৃতি লইয়া কীর্তন সহকারে প্রায় অর্ধেক সহর প্রদক্ষিণ করা হয়। দুপুরে সুললিত কণ্ঠে লীলাকীর্তন চলিতে থাকে এবং সমগ্র আশ্রমপ্রাঙ্গন আনন্দমুখরিত হইয়া উঠে। দশহাজার নরনারী আশ্রমে সমবেত হইয়াছিল। আট হাজারের অধিক লোক প্রসাদ পাইয়াছিল। ৩১শে ফাল্গুন সায়াহ্নে আশ্রমপ্রাঙ্গণে বৈদিক 'জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদ, বাংলাভাষায় নাট্যাকারে অভিনীত হয়।

যশোহরে শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জয়ন্তী উৎসব ১৩ই চৈত্র-অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রভাতে মঙ্গল আরতি, ভজনগান, পূজা ও বেলা দ্বিপ্রহর হইতে রাত্র দ্বিপ্রহর পর্যন্ত প্রায় তিন সহস্র নর-নারীকে পরিতোষ সহকারে প্রসাদ-দান এবং বৈকালে একটী সভার অধিবেশন হয়। দৌলতপুর কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীভুবনমোহন মজুমদার মহাশয় উক্ত অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। তিনি এবং ঢাকা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী সত্যকামানন্দ বক্তৃতা দেন। সভান্তে স্থানীয় যুবকসম্প্রদায় কর্তৃক শারীরকৌশল প্রদর্শিত হয়। সন্ধ্যারতির পর রামায়ণ গানের ব্যবস্থা ছিল। শহরের অনেকদূর হইতেও বহু নরনারী এই উৎসবে যোগদান করিতে আসিয়াছিলেন।

চট্টগ্রাম জেলার ধূমগ্রামে (পোঃ মহাজনহাট) স্থানীয় বিবেকানন্দ সমিতি কর্তৃক ১৫ই এবং ১৬ই চৈত্র দুই দিন ব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। শোভাযাত্রা, সংকীর্তন, ধর্মালোচনা, পূজাহোমাদি এবং জনসভা কর্মসূচীর অঙ্গীভূত ছিল।

উদ্বোধন
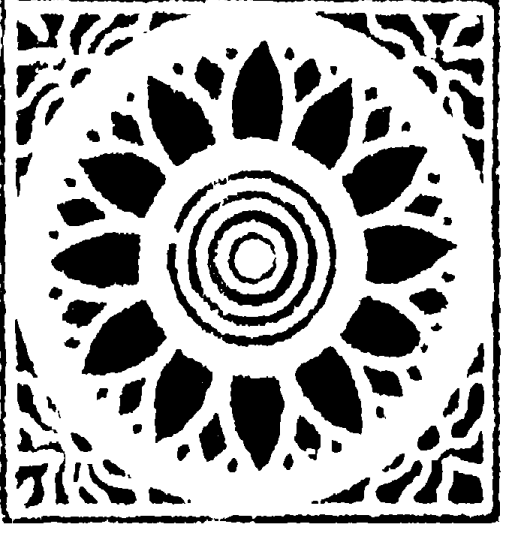
মহাব্রত

চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং। মা একেন দ্বে অগমিত্থ। দেসেথ ভিক্খবে ধম্মং আদিকল্যাণং মজ্ঝেকল্যাণং পরিয়োসানকল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলপরিপুন্নং পরিসুদ্ধং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসেথ।

(বুদ্ধবাণী—বিনয়পিটক, মহাবগ্গ, ১।১১)

হে ভিক্ষুগণ, বহুজনের হিতকারী বহুজনের শান্তিবিধায়ী ব্রত ধারণ করিয়া তোমরা দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর। জগতের প্রতি অনুকম্পায় তোমাদের হৃদয় বিগলিত হউক। দেব ও মনুষ্যগণের প্রয়োজন, মঙ্গল ও সুখ সাধন করিয়া চল। দুই জনে একদিকে যাইও না। (জানিও যাহা বলিবে বা করিবে তাহা গ্রহণ ও সমর্থন করিবার লোকের অভাব হইবে না)। হে ভিক্ষুগণ, আদিতে যাহার কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পরিশেষেও যাহার কল্যাণ সেই পরম শ্রেয়স্কর ধর্মের যথামর্ম যথানিবদ্ধ প্রচার কর। পরিশুদ্ধ ব্রহ্মচর্যমণ্ডিত পুণ্যময় জীবনের মহিমা কীর্তন কর।

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো
বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনা
নহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ॥

(শঙ্করাচার্য—বিবেকচূড়ামণি, ৩৭)

শান্তচিত্ত উদারহৃদয় এমন সব সাধুপুরুষ পৃথিবীতে রহিয়াছেন বসন্ত ঋতুর ন্যায় লোকহিত সাধন করিয়া চলাই যাঁহাদের জীবন-ব্রত। এই ভীষণ ভবসমুদ্র তাঁহারা নিজেরা (সাধনবলে) পার হইয়াছেন—অপরেও যাহাতে উহা অতিক্রম করিতে পারে সেই দিকেই নিয়োজিত হয় তাঁহাদের অহৈতুকী চেষ্টা।

কথাপ্রসঙ্গে

বুদ্ধ ও শঙ্কর

আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় (১৪ই জ্যৈষ্ঠ) ভগবান বুদ্ধদেবের পুণ্যজন্ম, সম্বোধিলাভ এবং মহাপরিনির্বাণ স্মরণে আমরা তাঁহার উদ্দেশে অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধা ও পূজা নিবেদন করিব। তথাগতের জীবন ও উপদেশে এমন একটি উদার সর্বজনীনতা আছে যে উহাকে কোন নির্দিষ্ট দেশে বা সম্প্রদায়ে আবদ্ধ করিয়া রাখা চলে না। বুদ্ধবাণী বিশ্বের সকল ধর্মাবলম্বীকেই সত্য, শান্তি ও কল্যাণের পথ নির্দেশ করে। উহা প্রত্যেক অধ্যাত্ম-সাধনপথে সমন্বিত হইতে পারে এবং হওয়া প্রয়োজনও। শত শত বৎসর পূর্বে এই পৃথিবীর দেশ ও জাতিসমূহ যখন ভৌগোলিক কারণে পরস্পর অত্যন্ত বিচ্ছিন্ন ছিল তখনই বৌদ্ধ শ্রমণগণ এদেশ হইতে শাস্তার অভিনব ধর্মালোক দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত, মরুভূমি, অরণ্যানীর বাধা অতিক্রম করিয়া দূর দূরান্তরে লইয়া গিয়াছিলেন। আজ জগতের মানুষের কাছে ভৌগোলিক এবং ভাষা- ও কৃষ্টিগত বাধা অনেক কম। অতএব সত্য, মৈত্রী ও শান্তির অনুশীলনে সমাহিত ভারতের যে সনাতন বৃহৎ মন বুদ্ধ ও বুদ্ধবাণীতে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল উহার সংস্পর্শলাভ সকল দেশের মানুষের পক্ষে আজ বহুতর সহজ। যদিও বর্তমান মানুষের জটিল জীবনধারা ঐ সংস্পর্শলাভের অনুকূল নয়, তথাপি বিবিধ ঘাতপ্রতিঘাত ও সঙ্কটে পড়িয়া মানুষ ধীরে ধীরে বুঝিতে পারিতেছে তাহার কল্যাণের অন্য দ্বিতীয় পন্থাও নাই। বাহির হইতে তাহাকে ভিতরে তাকাইতে হইবে —উদ্দাম ভোগোন্মত্ততাকে সংযত করিয়া শম, দম, সন্তোষাদির অনুশীলন করিতে হইবে। তাহার জাগতিক জীবনের সংহতির জন্যই ইহার প্রয়োজন আছে। আলেকজাণ্ডার, সিজার, নেপোলিয়ন, হিটলারকে 'হিরো' করিয়া মানুষের যে অগ্রগতি—উহার ব্যর্থতা বিশ্বমানব মর্মে মর্মে অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে। 'হিরোর' আসনে তাই আজ বসানো প্রয়োজন জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম, সত্যদ্রষ্টা, বিশ্ববন্ধু আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বকে। গৌতম বুদ্ধ এমনই একজন হৃদয়মন-আকর্ষণকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ। শত শত বৎসর পূর্বেকার মত পুনর্বার মানুষের হৃদয়মন্দিরে তাঁহার আসন প্রতিষ্ঠিত হইবার দিন আসিয়াছে।

এ কথার তাৎপর্য অবশ্যই ইহা নয় যে, জগতে সকলকেই বৌদ্ধধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে। আমাদের বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান বুদ্ধ ভারতের যে শ্রেয়োধর্মী বিশ্বহিতরত পরম-সত্যানুসন্ধানী শাশ্বত আধ্যাত্মিক আদর্শের প্রতীক, ঐ আদর্শের সমাদর উত্তরোত্তর এই যুগে অপরিহার্য।

* * *

আগামী ৫ঠা জ্যৈষ্ঠ ভগবান শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব-তিথি (বৈশাখী শুক্লা পঞ্চমী)। ভারতের ধর্মসংস্কৃতির এক সঙ্কটময় ক্ষণে ভারতের ভগবান এই বালসন্ন্যাসীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং কালগতির অব্যর্থ নিয়মে দেড়-হাজার বৎসরে ভারত-ধর্মে যে বিকৃতি এবং দুর্বলতা সঞ্চিত হইয়াছিল, তাহা অপনোদন করিয়া জনগণকে বেদান্তের বিশুদ্ধমার্গে লইয়া গিয়াছিলেন। শঙ্কর শুধু একজন অদ্বিতীয় দার্শনিকই ছিলেন না—তাঁহার বত্রিশ বৎসরের

জীবন ছিল লোককল্যাণের জন্য, অবিশ্রান্ত নিঃস্বার্থ কর্মে পরিপূর্ণ। ঔপনিষদ সত্য যাহাতে মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে গভীর-ভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয় সেদিকে ছিল তাঁহার প্রখর দৃষ্টি। অদ্বৈতজ্ঞান সর্বাবগাহী চরম সার্থকতম জ্ঞান। কিন্তু উহাকে লাভ করিতে গেলে যে ধাপগুলি অতিক্রম করিতে হয় তাহা শঙ্কর আদৌ অবহেলা করেন নাই। তাই অদ্বৈত-মতসংস্থাপক আচার্যকে আমরা উপাসনা, ভক্তি, পূজার্চনা প্রভৃতিরও উৎসাহী প্রচারকরূপে দেখিতে পাই। সমগ্র হিন্দুধর্ম আচার্যের শিক্ষায় সবল যুক্তিপ্রতিষ্ঠ হইয়া অভিনবরূপে ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মে শঙ্কর যে প্রাণশক্তি উদ্দীপিত করিয়াছিলেন আজিও তাহার ক্রিয়া চলিতেছে। হিন্দুজাতি শঙ্কর-মনীষার নিকট সকল কালের জন্য ঋণী থাকিবে।

শুধু কি হিন্দুজাতি? স্বামী বিবেকানন্দ একস্থানে বলিয়াছেন—"এই ষোড়শবর্ষীয় বালকের লেখায় আধুনিক সভ্য-জগৎ বিস্মিত হইয়া আছে।" সত্যই বিস্মিত হইবার কথা। 'আধুনিক সভ্যজগৎ' বিজ্ঞান ও যুক্তির জগৎ। এই জগতে যদি ধর্মের কোন স্থান করিতে হয় তাহা হইলে ধর্মকে বিজ্ঞান ও যুক্তির চ্যালেঞ্জ মিটাইতে হইবে। আচার্য শঙ্করের লেখায় দেখিতে পাই তিনি বেদান্তকে ঐরূপই বিজ্ঞান ও যুক্তির অভিঘাত হইতে অতি সক্ষমভাবে রক্ষা করিয়াছেন। এই জন্যই শাঙ্কর-বেদান্ত আজ আধুনিক শিক্ষিত মনের বিস্ময় ও আকর্ষণের বস্তু।

ভারতে খ্রীষ্টান মিশনরী

কিছুদিন আগে ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কাটজু রাষ্ট্রীয় পরিষদে ভারতে বৈদেশিক খ্রীষ্টান মিশনরীদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে একটি মন্তব্য করিয়াছিলেন। মিশনরীরা এদেশে তাঁহাদের সেবা ও শিক্ষাপ্রচারমূলক কাজ করুন, আপত্তি নাই, কিন্তু তাঁহারা এদেশের লোককে নানা ফন্দী-ফিকির দ্বারা ধর্মান্তরিত করিয়া যে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করেন উহা বাঞ্ছনীয় নয়—ডক্টর কাটজুর কথার তাৎপর্য বোধ করি ছিল ইহাই। কিন্তু তাঁহার ঐ উক্তিতে মিশনরী এবং দেশের খ্রীষ্টানসম্প্রদায়েরও অনেকে ক্ষুব্ধ হইয়াছেন। সংবাদপত্রে বহু সমালোচনাত্মক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে এবং ডক্টর কাটজুর পক্ষ লইয়াও অনেকে প্রত্যুত্তর দিতেছেন। কোন কোন পাদ্রী হুমকি দিয়াছেন, যদি এই-ভাবে মিশনরীদের কার্যে বাধা দিতে চাও তাহা হইলে এদেশের হিন্দুপ্রচারক যাঁহারা বিদেশে প্রচার কাজ করিতেছেন—তাঁহাদিগকেও পাল্টা বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। খ্রীষ্টানসম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি বলিয়াছেন—"খ্রীষ্টান ধর্মবিশ্বাসানুযায়ী প্রত্যেক খ্রীষ্টানই একজন ধর্ম-প্রচারক। নিজের বিশ্বাস ও অনুভূতিসমূহের অংশীদার অপরকেও করিতে হইবে—ধর্মনিষ্ঠ খ্রীষ্টানের ইহাই লক্ষ্য। * * * অন্যান্য দেশ হইতে আধ্যাত্মিক প্রভাব আসিতে বাধা দেওয়া হইবে কেন আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। * * * আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মত কি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও সাম্প্রদায়িক করিয়া ফেলিতেছি না?" (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২৫শে এপ্রিল)

স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"ভারত-বাসী যেদিন পাশ্চাত্ত্যের পদতলে ধর্ম শিখতে বসবে, সেইদিন এ অধঃপতিত জাতির জাতিত্ব একেবারে ঘুচে যাবে।" অতএব হিন্দুভারত যদি বিদেশের 'আধ্যাত্মিক প্রভাব' লাভ করিতে উৎসাহ কম দেখায়, তাহা দূষণীয় নয়। এদেশে উহার প্রয়োজনও নাই। কেহ যদি স্বেচ্ছায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে

তাহাতে বলিবার কিছু নাই—কিন্তু পৌত্তলিকতার নিন্দা করিয়া, পরিত্রাতা যীশু হইতে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সঙ্কট হইতে পরিত্রাণের বহু কাল্পনিক চিত্র আঁকিয়া, বহুতর আর্থিক ও সামাজিক প্রলোভন দেখাইয়া দরিদ্র, অশিক্ষিত, অনুন্নত লোকদিগকে খ্রীষ্টধর্মে টানিয়া আনা এদেশে এখন আর কেহই সহ্য করিবে না। 'আধ্যাত্মিক প্রভাব' দান করিতেই কি এই ভাবে লোককে খ্রীষ্টান করা হয়, না অন্য কোন মতলব পশ্চাতে থাকে তাহা ধর্মযাজকগণই বুকে হাত দিয়া বলুন। এ দেশে যাঁহারা খ্রীষ্টান আছেন তাঁহাদের ধর্মানুশীলনে কোনও প্রকার বাধা কেহই কখনো দেয় নাই এবং দিবেও না। এ বিষয়ে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের কোনও প্রকার আশঙ্কা ডক্টর কাটজুর উপরোক্ত বিবৃতি হইতে উদিত হওয়া সঙ্গত নয়।

ভারতবর্ষে বৈদেশিক মিশনরীদের খ্রীষ্টধর্ম-প্রচার এবং ইউরোপ-আমেরিকায় হিন্দুসন্ন্যাসিগণের বেদান্ত-প্রচার একার্থক নয়। ইউরোপ-আমেরিকায় যাঁহারা বেদান্ত শুনিতে আসেন, বেদান্তে আকৃষ্ট হন তাঁহারা অশিক্ষিত দরিদ্র বুদ্ধিবিচারহীন মূক জনসাধারণ নন—তাঁহারা সমাজের সুসভ্য উচ্চশিক্ষিত নরনারী—টাকা, পোষাক, চাকুরী বা সামাজিক মানের লোভে আসেন না—আসেন অন্তরের আধ্যাত্মিক তৃষ্ণায়, সত্যের সন্ধানে, শান্তির সন্ধানে। তাঁহারা দেখেন, খ্রীষ্টের যথার্থ আলোক আজ খ্রীষ্টান চার্চে পাওয়া সুকঠিন—বৈদান্তিক দৃষ্টিভঙ্গীতেই তাঁহারা প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম প্রতিফলিত দেখিয়া মুগ্ধ হন। এ দেশের সন্ন্যাসীরা তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম ছাড়িতে বলেন না—প্রকৃত খ্রীষ্টান হইতে বলেন। তাহা ছাড়া সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, যে হিসাবে আমরা 'খ্রীষ্টধর্ম', 'ইসলামধর্ম', এমন কি 'হিন্দুধর্ম' শব্দের প্রয়োগ করি—বেদান্ত সেই হিসাবে কোন 'ধর্মমত' নয়। বেদান্ত একটি বিজ্ঞান—যাহা সকল ধর্মের লোককে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য ও সাধন কি তাহা বুঝাইয়া দেয়। শারীর বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান যেমন সকল মানুষের জন্য—বেদান্তও সেইরূপ সকল মানুষের জন্য। উহা মানুষের অন্তরতম প্রকৃতির বিজ্ঞান। পাশ্চাত্য দেশবাসীকে নিজেদেরই সামাজিক ও আত্মিক কল্যাণের জন্য বেদান্তের সার্বভৌমিক সত্যের শ্রবণ ও অনুশীলন করিতে হইবে। না করিলে তাঁহাদেরই লোকসান।

"ছত্রিশ কোটি দেবতা"

১৮৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমনের পর দক্ষিণ-ভারতের রামেশ্বরের শিব-মন্দিরে যে বক্তৃতা দেন তাহাতে বলিয়াছিলেন,—

"সকল উপাসনার সার এই—শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। যিনি দরিদ্র, দুর্বল, রোগী—সকলেরই মধ্যে শিব দেখেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন। আর যে ব্যক্তি কেবল প্রতিমার মধ্যে শিব উপাসনা করে, সে প্রবর্তক মাত্র। * * যে ব্যক্তি জাতিধর্মনির্বিশেষে একটি দরিদ্র ব্যক্তিকেও শিববোধে সেবা করে তাহার প্রতি শিব, যে কেবল মন্দিরেই তাঁহাকে দর্শন করে তাহার অপেক্ষা অধিক প্রসন্ন হন। * * যিনি শিবের সেবা করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে তাঁহার সন্তানগণের সেবা সর্বাগ্রে করিতে হইবে।"

ইংরেজের অধীনতার সময়ে দেশের কর্মিগণের সমগ্র দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামের উপর। রাজনীতি-বিযুক্ত গঠনমূলক সেবা দ্বারা জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং জীবনের মান উন্নয়নের দিকে তেমন প্রত্যক্ষ মনোযোগ দেওয়া তখন সম্ভবপর হয় নাই। দিতে পারিলে বোধ করি খুব ভাল হইত, কেননা উহাই ছিল জাতীয় প্রগতির গোড়াকার কাজ। আজ আমরা স্বাধীনতা লাভ

করিয়াও যে সকল জটিল সমস্যার সম্মুখীন হইতেছি তাহাদের অনেকগুলিই ঠেকিতেছে ঐ গোড়াকার গলদে। যাহাদের লইয়া জাতি অগ্রসর হইবে তাহারাই পঙ্গু হইয়া পড়িয়া আছে। তাহাদিগকে দাঁড়াইবার, চলিবার সামর্থ্য আগে দিতে হইবে। ইহার জন্য প্রয়োজন ব্যাপক সেবার অভিযান। সেবার বিপুল ক্ষেত্র বিশাল ভারতবর্ষ জুড়িয়া পড়িয়া আছে। কোন্ রাজনৈতিক দল দেশ শাসন করিতেছেন, তাঁহারা কি কি ভুল ত্রুটি করিতেছেন, তাঁহাদের বৈদেশিক নীতি কি—এই সকল লইয়া বাদবিতণ্ডা বালক-বৃদ্ধ-যুবা সকলেরই করিবার প্রয়োজন নাই। যতবেশী সম্ভব বলিষ্ঠ, উৎসাহী ও সহানুভূতি-সম্পন্ন যুবকগণ বরং এখন জনসেবার বাস্তবক্ষেত্রে যদি লাগিয়া যান—তাঁহাদের কায়িক ও মানসিক শক্তি 'গণকে' গড়িয়া তুলিতে নিয়োজিত করেন তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পরিকল্পিত ধাপগুলি আমরা এক এক করিয়া উঠিতে পারিব। ৬৬ বৎসর পূর্বে আমাদের স্বদেশমন্ত্রের পুরোধা যে জীবরূপী শিব সেবার আদর্শ আমাদের দিয়া গিয়াছেন তাহা কর্মে মূর্ত হইয়া উঠিতে আর বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। নান্যঃ পন্থাঃ। বড়ই আনন্দের বিষয় মহাত্মা গান্ধীর উপযুক্ত শিষ্য অক্লান্ত দেশসেবক আচার্য বিনোবা ভাবে তাঁহার সাম্প্রতিক ভূদান-যজ্ঞের সফরে জনসেবার এই আদর্শের কথা প্রাণবন্ত ভাষায় সকলকে শুনাইতেছেন। নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি হরিজন পত্রিকা (১১ই এপ্রিল) হইতে লওয়া :—

"ডোমচাচি (হাজারীবাগ) গ্রামে বিনোবাজী বলিতেছিলেন যে, ভগবান কাশী, মথুরা এবং রামেশ্বরেই নাই। তিনি এখানেও আছেন। তারপর বিনোবাজী একটি বালককে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে মানে কোথায়? সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, সকলের হৃদয়ে। ইহা শুনিয়া বিনোবাজী খুশী হইলেন এবং বলিলেন, ভারতের ছোট্ট একটি গ্রামের ছেলেও বুঝিতে পারে যে, ভগবান শুধু মন্দির বা মসজিদে থাকেন না, তিনি সকলের হৃদয়ে বাস করেন।"

প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহরুরও কিছুদিন পূর্বেকার একটি ভাষণ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৭ই বৈশাখ শোলাপুর শহরে বিখ্যাত বিঠোবা মন্দিরে বিঠোবা এবং রুক্মিণীর প্রাচীন মূর্তিগুলি পরিদর্শনের পর তিনি বলেন—

"পুজা-অর্চনার দিকে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমি কিন্তু একটি অতি-বৃহৎ মন্দিরে আরাধনায় ব্যাপৃত রহিয়াছি। ঐ মন্দিরের নাম ভারত—যেখানে আছে ৩৬ কোটি দেবতার মূর্তি। আমার এই ৩৬ কোটি দেবতার পুজার একমাত্র উদ্দেশ্য ইহাদিগকে সুষ্ঠুতর এবং পরিতৃপ্ত জীবন যাপন করিতে সাহায্য করা।"

ভগবান তথাগত ও তাঁহার ধর্ম

শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, বি-এল্

বৈশাখী পূর্ণিমা ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় তিথি। এই পবিত্র দিনটি তিন প্রকারে জয়যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। এই শুভ তিথিতে ভগবান তথাগত খৃঃ পূঃ ৬২৩ অব্দে কপিলবাস্তু নগরের লুম্বিনী উদ্যানে জন্ম পরিগ্রহ, এই তিথিতেই পঞ্চত্রিংশ বৎসর বয়সে মগধ রাজ্যের উরুবেল নামক স্থানে বোধিদ্রুমমূলে সম্যক্ সম্বোধিলাভ, আবার এই তিথিতেই অশীতিবৎসর বয়ঃক্রমকালে কুশীনগরের উপবর্তনে শালবনে তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

এই সর্বলোকানুকম্পী, লোকোত্তর মহাপুরুষের

আবির্ভাব-সময়ে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজের প্রবল গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া এদেশের হিন্দু আর্যগণ যে-সকল বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড, আচার-অনুষ্ঠান নির্বিচারে মানিয়া আসিতেছিলেন, কালক্রমে সেগুলি এরূপ প্রাণহীন, নীরস ও আড়ম্বরবহুল হইয়া পড়িয়াছিল যে, উহারা আর কাহারও চিত্তে ধর্মবোধের সঞ্চার করিত না। তদুপরি জাতি-বৈষম্যের বাড়াবাড়ির দরুন সর্বসাধারণের মনে এই ধারণা ক্রমশঃ দৃঢ় হইতে লাগিল যে, যাজক পুরোহিতই প্রতিনিধি-স্বরূপ ভগবানের পূজার্চনা করিবেন, ব্যক্তিগত ক্লেশ ও তপশ্চর্যা স্বীকার করিয়া তাহাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার কোনও আবশ্যকতা নাই। ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্ব মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোক ঐ তত্ত্বের কোন সন্ধান রাখিত না এবং রাখিবার কোন সুযোগ ও সুবিধা পাইত না। মানুষের স্বাভাবিক সরল চিত্ত এই সকল সাম্যনীতিবিগর্হিত সমাজ-ব্যবস্থা বেশীদিন নীরবে সহ্য করিতে পারিল না। ভিতরে ভিতরে একটা চঞ্চল বিদ্রোহের ভাব ঘনীভূত হইয়া উঠিতে লাগিল। ভগবান বুদ্ধই এই আলোড়নকারী বিদ্রোহের অগ্রণী হইয়া আবির্ভূত হইলেন। এই জন্যই আমরা তৎপ্রচারিত ধর্মকে স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায় 'rebel-child of Hinduism' অর্থাৎ হিন্দুধর্মের বিদ্রোহী সন্তান বলিয়া থাকি।

লোকে তাঁহাকে বেদবিরোধীই বলুক আর নাস্তিকই বলুক, তিনি সেই নিন্দা, গঞ্জনা ও বিরূপ মনোভাবকে বরণ করিয়াই বিদ্রোহের বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়াছিলেন। তিনি অতি সহজ কথায় সত্য-প্রচারের দ্বারা লোকের হৃদয়-মন জয় করিয়া লইলেন। তাঁহার হৃদয় ছিল প্রেমময়, সমুদ্রের ন্যায় বিশাল এবং আকাশের মতো অনন্তবিস্তৃত। প্রেমের এই বিশালতা ও গভীরতায় উদ্বুদ্ধ হইয়াই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—"মাতা যেমন প্রাণ দিয়াও নিজের পুত্রকে রক্ষা করেন। ঠিক তেমনি সকল প্রাণীর প্রতি অপরিমিত দয়াভাব জন্মাইবে। ঊর্ধ্বে, অধোদিকে, চতুর্দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাশূন্য, হিংসাশূন্য, শত্রুতাশূন্য মনে অমিত করুণা দেখাইবে। কি দাঁড়াইতে, কি চলিতে, কি বসিতে, কি শুইতে, যাবৎ নিদ্রিত না হইবে, এই মৈত্রীভাবে অধিষ্ঠিত থাকিবে—ইহাকেই ব্রহ্মবিহার বলে।" তিনি সামাজিক জাতি-ব্যবস্থার ক্ষুদ্র গণ্ডি ভাঙ্গিয়া ছোট-বড় সকলকে স্নেহকণ্ঠে নিজ সমীপে আহ্বান এবং ধর্মের উদার মহৎ ক্ষেত্র প্রদর্শন করেন। তাঁহার বাণী সর্বজনের হৃদয়গ্রাহী ও মনোমুগ্ধকর ছিল বলিয়া উহা কতিপয় মুষ্টিমেয় শাস্ত্রজ্ঞ বিদ্বজ্জনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকিয়া জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকল দেশের সকল শ্রেণীর মানুষের ধর্ম হইল। গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হইয়া দুঃখের স্বরূপ, দুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের বিনাশ এবং দুঃখ-ধ্বংসের উপায়—এই চতুরার্যসত্য উপলব্ধি করিয়া সিদ্ধার্থ বুদ্ধ বা জ্ঞানী বা তথাগত নাম ধারণ করেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত জীবের সমস্ত ব্যাপারই দুঃখময়। এই দুঃখের কারণ নিশ্চয়ই আছে। দুঃখের কারণ কি? দুঃখের কারণ —তৃষ্ণা বা বাসনা, অবিদ্যা বা অজ্ঞান। তৃষ্ণা বা বাসনার আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলেই দুঃখের নাশ হয়—কারণের নাশে কার্যের বিনাশ। বাসনা বা তৃষা দূর করিবার উপায় কি? তৃষ্ণানাশের উপায় আটটি :—সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। দুঃখ-পরিহারের এই আটটি উপায়কে আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে। সম্যক্ দৃষ্টি—জগৎকে চঞ্চল, দুঃখাত্মক, অনাত্মরূপে ধারণা করিয়া জীবনের লক্ষ্যের দিকে সর্বদা

দৃষ্টি। সম্যক্ সংকল্প—গতানুগতিক জীবনধারা ত্যাগ করিবার ইচ্ছা, ইন্দ্রিয়-সম্ভোগ-বর্জনের সংকল্প। সম্যক বাক্—মিথ্যা, পরনিন্দা, কর্কশবাক্য ও অসার আলাপ-পরিত্যাগ। সম্যক্ কর্মান্ত—প্রাণিহিংসাবর্জন, অচৌর্য ও অব্যভিচার। সম্যক্ আজীব—সৎপথে জীবিকার্জনের চেষ্টা। সম্যক্ ব্যায়াম—যে-সকল অসদ্‌গুণ চরিত্রে এখনও দেখা দেয় নাই, সেইগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে আক্রমণ করিতে না পারে; যে-সকল অসদ্‌গুণ ভাগ্যদোষে পূর্বে অসতর্কতা নিবন্ধন আসিয়াছে সে-গুলি যাহাতে চলিয়া যায়; যে-সকল সদ্‌গুণ আয়ত্ত করা হয় নাই তাহাদের অর্জন; যে-সকল সদ্‌গুণ চরিত্রে আসিয়াছে তাহাদের পরিরক্ষণ—এই চারিটি বিষয়ে দৃঢ় চেষ্টা। সম্যক্ স্মৃতি—সংসার-প্রবাহ সংসার-প্রকৃতি ও সংসার-পরিণামের ধ্যান। সম্যক্ সমাধি—তৃষ্ণানাশের উপায়গুলি যথাযথ অনুশীলনের ফলে বাসনার আত্যন্তিক বিনাশ এবং নির্বাণের পরমানন্দ সম্ভোগের অবস্থা।

তত্ত্বজ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই পরমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া গৌতম বলিয়াছিলেন, "হে দেহরূপ গৃহের নির্মাত্রি তৃষ্ণে, অন্বেষণ করিতে করিতে আজ তোমাকে দেখিতে পাইয়াছি। তুমি পুনঃ আর গৃহ নির্মাণ করিতে পারিবে না। গৃহের স্তম্ভ ও উহার পার্শ্বদণ্ডগুলি সম্পূর্ণরূপে ভগ্ন করিয়াছি। আমার সংস্কারবিহীন চিত্ত তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করিয়াছে।" (ধম্মপদ)

বুদ্ধ যে ধর্ম ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তত্ত্বের দিক দিয়া তাহার মধ্যে তিনি কোন মৌলিকত্বই দাবী করিতে পারেন না। সূত্রপিটকে তিনি স্বয়ং বলিয়াছেন, "আমি একটি প্রাচীন পথ আবিষ্কার করিয়াছি। পুরাকালের মহাজ্ঞানিগণ এই পথেই যাতায়াত করিতেন। এই পথে বিহার করিয়া আমি জন্ম-মৃত্যুর রহস্য বুঝিয়াছি। আমি যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ভিক্ষুদের এবং শ্রাবকদের নিকট প্রচার করিয়াছি।" কাজেই তত্ত্বের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বুদ্ধদেব কপিল ও পতঞ্জলি প্রভৃতি পূর্বগ দার্শনিকগণের পন্থাই অনুসরণ করিয়াছেন। তথাপি তিনি যাহা বলিয়াছেন এবং যে ভাবে বলিয়াছেন তাহা অপূর্ব। পণ্ডিত মোক্ষমূলর 'ধর্মচক্রপ্রবর্তন সূত্রের' ভূমিকায় বলিয়াছেন—"Never in the history of the world had a scheme of salvation been put forth so simple in its nature, so free from any superhuman agency." অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাসে আর কেহ মুক্তির বাণী এমন সরলভাবে, এমন অতিপ্রাকৃত ব্যক্তিত্ব বর্জন করিয়া বিবৃত করেন নাই।

বৌদ্ধসাধনার চরম পরিণতি 'নির্বাণ'কে পণ্ডিতগণ তিনভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন: (১) নির্বাণ—শূন্য, বিনাশ, মহাবিনাশ, অহং-বোধের বিলোপ সাধন করিয়া গভীর শূন্যতার মধ্যে নিমজ্জন; (২) নির্বাণ—এক পরম রহস্য, যাহার স্বরূপ বুদ্ধ খোলাখুলি বলেন নাই; (৩) নির্বাণ—মানবজীবনের এক গৌরবময়, সুখকর, ও কল্যাণকর পরিণাম। এই নির্বাণের অবস্থা আর যাহাই হউক, উহা শুষ্ক 'শূন্য' নহে, 'না' নহে—উহা আনন্দ, আশা, অভয় ও অশোক; উহা অনির্বচনীয়—বেদ যে পদার্থের সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "বাক্য মনের সহিত যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে ফিরিয়া আসে সেই ব্রহ্মের আনন্দ।" উহা সেই "অবাঙ্‌মনসোগোচরং" ভিন্ন আর কিছুই নয়। এই অবস্থাটি অবাচ্য, অনিদর্শন, অপ্রতিষ্ঠ, অনাভাস, অনিকেত। এই শূন্যতা নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এই চরম অনুভূতি সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ব্রহ্ম যে কি, মুখে বলা যায় না। সব জিনিস উচ্ছিষ্ট হয়ে গেছে—বেদ, পুরাণ, তন্ত্র, ষড়্‌দর্শন, সব এঁটো হয়ে গেছে! মুখে পড়া হয়েছে, মুখে উচ্চারণ হয়েছে—তাই

এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটি জিনিস কেবল উচ্ছিষ্ট হয় নাই—সে জিনিসটি ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যন্ত কেহ মুখে বলতে পারে নাই।" হিন্দুর ব্রহ্মানুভূতি, ভগবদ্দর্শন, মুক্তি বা মোক্ষের অবস্থা, আর বৌদ্ধের নির্বাণের অবস্থা একই।

বুদ্ধ হিন্দুদের অপৌরুষেয় অভ্রান্ত ঈশ্বরের বাণী 'বেদে'র কর্ম-কাণ্ডান্তর্গত যাগযজ্ঞক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার এবং যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ করিয়াছিলেন, বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম সম্বন্ধে নীরব ছিলেন, ঈশ্বর আছেন কি নাই তৎসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই ও বলিতে চাহেন নাই এবং তদানীন্তন জাতিবৈষম্যের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির বিষময় ফল দেখিয়া হিন্দুশাস্ত্রসমর্থিত 'চাতুর্বর্ণ্য' সমাজ-বিধানের বিরোধী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু বেদের জ্ঞানকাণ্ডের সারাংশের সহিত তাঁহার ধর্মের বিশেষ কোন পার্থক্য নাই। এতদ্দেশে সাধারণতঃ যাহারা ঈশ্বর ও পরলোকে অবিশ্বাসী এবং প্রবৃত্তিমূলক ধর্ম অনুসরণ করে তাহাদিগকেই ভোগবাদী নাস্তিক বলে। চার্বাক এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চিত্তবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য সুখের অন্বেষণ করাই ভোগবাদী নাস্তিকদের নিরন্তর চেষ্টা। বুদ্ধ কিন্তু সম্পূর্ণ নিবৃত্তিমূলক ধর্ম প্রচার করিয়াছেন—বাসনা- ও তৃষ্ণা -ত্যাগের দ্বারা সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হইলে পরিণামে নির্বাণের বিমল আনন্দ সম্ভোগ হয়। ইহাই বৌদ্ধসাধনায় চরম লক্ষ্য এবং মানবজীবনের চরম উদ্দেশ্য। বুদ্ধকে জড়বাদী নাস্তিক বলা যায় না—তিনি নিবৃত্তিমার্গী অজ্ঞেয়বাদী। ঈশ্বর-সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুদ্ধ বলিতেন—"সকল শাস্ত্রই যদি বলে ঈশ্বর শুদ্ধ ও শিবস্বরূপ, তবে মানুষের প্রথমে শুদ্ধ ও শিব-স্বরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সে জানিতে পারিবে ঈশ্বর কি বস্তু।" ইহা নিছক অদ্বৈতানুভূতির কথা, নির্গুণব্রহ্মতত্ত্বের কথা। বুদ্ধ ঈশ্বর-সম্বন্ধে নিরুত্তর ও নীরব থাকিতেন বলিয়া একথা বলা চলে না যে, তিনি ঈশ্বরকে অস্বীকার অবিশ্বাস করিতেন। এই নীরবতার দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, কতকগুলি সত্য আছে যাহা মুখে ব্যক্ত করা যায় না, কেবল প্রত্যক্ষানুভূতির বিষয়ীভূত, তৎসম্বন্ধে সংযতবাক্ হইয়া থাকাই সরলতা ও ধর্মপরায়ণতার পরিচায়ক। যে চরম সত্য বাক্য-মন-চিন্তার অতীত, যাহার সম্বন্ধে মুখে কোনও উপদেশ দেওয়া চলে না বলিয়া উপনিষদ ঘোষণা করিয়াছেন, বুদ্ধও সেই চরম সত্য-সম্বন্ধেই নীরব থাকিতেন। আমেরিকায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বৌদ্ধধর্মের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, "অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারিলে সাধনপথ খুব সহজ হইয়া থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্ট প্রতীত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি ঈশ্বরকে আদৌ বিশ্বাস না করে, যদি সে কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয়, অথবা কোন মন্দিরাদিতে গমন না করে, তথাপি সে নিষ্কাম কর্মের দ্বারা চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতিলাভে সমর্থ হয়। সৎকর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, সাধন না করিয়া, কেবল মুখে ধর্মের কথা আওড়াইলেই এবং ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইলেই ধর্ম হয় না।"

প্রকৃতপক্ষে হিন্দুভারত বুদ্ধকে তাহার ধর্ম সংস্কৃতির মধ্যে গভীরভাবে গ্রহণ করিয়াছে। বহু পুরাণে বুদ্ধ ঈশ্বরাবতার রূপে বর্ণিত। বুদ্ধ কিন্তু নিজেকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া কখনও ঘোষণা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, "কেহই তোমাকে মুক্ত হইবার জন্য সাহায্য করিতে পারে না—নিজের সাহায্য নিজে কর—নিজ চেষ্টাদ্বারা নিজ মুক্তি-সাধনের চেষ্টা কর। বুদ্ধ শব্দের অর্থ আকাশের ন্যায় অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন। আমি গৌতম, সেই অবস্থা লাভ করিয়াছি—তোমরাও যদি উহার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কর, তোমরাও উহা লাভ করিতে পারিবে।"

অঙ্গুলিমাল

(বৌদ্ধ-গাথা)

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্ত্তী

শ্রাবস্তীপুরে অঙ্গুলিমাল দস্যু ভয়ঙ্কর—
দিনে আর রাতে করিত ডাকাতি, ছিল নাকো ভয়-ডর।
হিংসার বশে সাধিত হত্যা, নির্দয় লুণ্ঠন,
নর-অঙ্গুলি গাঁথিয়া রচিত কণ্ঠের আভরণ!
ধন আর প্রাণ রক্ষার লাগি' সারা শ্রাবস্তী-বাসী,
জানালো তাদের মনের দুঃখ নৃপতি-সকাশে আসি।
মন্ত্রীরে ডাকি প্রজা-সমক্ষে কহিলা প্রসেনজিৎ—
"দস্যুরে আমি করিবারে চাই দণ্ডিত সমুচিত!
রাজ্য আমার শান্তি-ভ্রষ্ট, নহে সুখী কা'রো প্রাণ,
নিদারুণ এক আতংক মাঝে হেরি সবে ম্রিয়মাণ!
নগর-রক্ষী কি হেতু রয়েছে, কি করিছে সেনাদল?
তুচ্ছ দস্যু দমন করিতে হয়েছে কি হীনবল?
পাঠাও এখনি প্রহরী সেনানী চাই আমি প্রতিকার,
নির্মম হাতে শেষ কর তার পাশব-অত্যাচার!"
দিকে দিকে ফিরে রাজ-অনুচর, সেনা-সামন্ত কত,
অঙ্গুলিমাল তাদের নিকটে করিল না শির নত!
নৈশ আঁধারে লুকায়ে নিজেরে অবাধে যায় ও আসে,
হিংসা-অগ্নি জ্বালে সব ঠাঁই, সব লোক মরে ত্রাসে!
দস্যুর ভয়ে রাজা অস্থির—মন সদা শংকিত
নিখিলরাজ্য ভরে হাহাকারে জনগণ লাঞ্ছিত!

জেতবন মাঝে বুদ্ধ আসীন—শান্তির পরিবেশ,
ভক্ত-নিচয় ঘিরিয়া তাঁহারে শুনিতেছে উপদেশ।
হেনকালে আসে শ্রাবস্তীবাসী নরনারীগণ সবে,
বুদ্ধ-চরণে নিবেদিল ব্যথা করুণ-আর্ত্ত-রবে—
"অতি বলবান অঙ্গুলিমাল, দুরন্ত তস্কর—
সারা শ্রাবস্তী করিয়া তুলেছে অশান্তি-জর্জর।
রাজার শাসনে নাহি পায় ত্রাস, বাধাহীন তার গতি,
করে অন্যায় আচরণ যত নিয়ত মোদের প্রতি

প্রতিকার তুমি কর মহাভাগ, নহিলে উপায় নাই,
তোমার চরণে জানাতে বেদনা সমাগত মোরা তাই!"
কন তথাগত মধুর বাক্যে সবারে অভয় দানি'—
"ফিরে যাও গৃহে, নাহিক চিন্তা, যাবে অশান্তি-গ্লানি।"

নগরীপ্রান্তে নির্জন এক অরণ্যে নিরালায়,
অঙ্গুলিমাল করিত বসতি সুখে সদা নির্ভয়!
ভ্রমিতে ভ্রমিতে একদা বুদ্ধ সেই ঠাঁই উপনীত,
নেহারি তাঁহারে হইল দস্যু বিস্মিত সচকিত!
সম্ভাষি তাঁরে কহে তস্কর—"কোথা যাও, স্থির হও!"
কহেন শাস্তা—"স্থির আমি আছি, স্থির তুমি কভু নও!"
কহিল দস্যু—"তোমার কথার অর্থ বুঝি না কিছু,
জীবন দানিতে কেন মিছামিছি এলে মরণের পিছু?"
কহিলেন প্রভু,—"অহিংসা মাঝে স্থির আমি চিরকাল,
হিংসা-ধর্মে অস্থির-মন, তুমি অঙ্গুলিমাল!
জীবন তোমার পদ্ম-পত্রে জল-বিন্দুর মত,
করেছো হত্যা শত-সহস্র, তবু তুমি ব্যথাহত!
জীবনে শান্তি পাও নাই কভু, পাইবে না কোন কালে,
হিংসার পথ ভ'রে থাকে শুধু চির-অশান্তি-জালে!
অগ্নিতে যদি দাও ঘৃতাহুতি, নিভে কি গো শিখা তার?
লেলিহান শিখা শুধু শতগুণ তেজ করে বিস্তার!
কাঙালের মত কি খুঁজিছ তুমি? চাহ কোন্ বৈভব?
জ্ঞানের বিত্তে ভরি লও প্রাণ, সেই তব গৌরব!"
বুদ্ধ-বাক্যে স্তম্ভিত হল কঠোর দস্যু-প্রাণ,
অমিত দম্ভ একটি নিমেষে হয়ে গেল হতমান!
উদ্যত-ফণা ভুজংগ যেন হয়ে নির্জীব-পারা,
অবনত-মাথে লুটায়ে প'ড়িল তেজ-বিক্রম-হারা!

বুদ্ধ সকাশে আসি একদিন নৃপতি প্রসেনজিৎ,
পূজিলা তাঁহার চরণ-পদ্ম গাহি বন্দনা-গীত।
নৃপতিরে ডাকি কহেন বুদ্ধ,—"শুন অদ্ভুত কথা,
দস্যু আজিকে বন্দী আমার—নাহি করে দস্যুতা!
যে ছিল ভীষণ অতি-চঞ্চল দুর্জয় এতকাল,
সম্মুখে হের স্থির প্রশান্ত সেই অঙ্গুলিমাল!"

বিস্মিত-আঁখি ভূপাল তখন, মুখে নাহি সরে বাণী,
ইন্দ্রজালের মত হয় বোধ, মন নাহি লয় মানি!
কহিলা দস্যু নমি নৃপতিরে—"মিথ্যা বিভব লাগি,
এতদিন আমি ছিলাম ভ্রান্ত, হয়ে তার অনুরাগী!
এবার চিনেছি মহাবৈভবে, তারি তরে করি লোভ,
শাস্তা-চরণে বিকায়েছি মোরে, নাহি আর কোন ক্ষোভ!"
কহিলেন রাজা—"যাহা প্রয়োজন, পাবে তুমি মোর কাছে,"
কহিলা দস্যু—"ভিক্ষুজীবনে অভাব কি আর আছে?
হস্ত পাতিলে ভিক্ষা-অন্ন পাব আমি সব ঠাঁই,
কাষায়-বস্ত্র? সেও জুটে যাবে, অভাব আর ত' নাই!"

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত

উত্তরে নগাধিরাজ হিমালয়, দক্ষিণে তরঙ্গ-চঞ্চলা মহাসাগর, ভৌগোলিক ভারতবর্ষও যেন সুগভীর ধ্যানের সামগ্রী। কিন্তু ভারতবর্ষের আর একটি মানসমূর্তি আছে—সে মূর্তি ধ্যানস্থ বুদ্ধের। ভারতবর্ষের প্রাণশিল্পীর যুগ যুগ সাধনার ফলে গড়ে উঠেছে এই মূর্তি।

বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে বলতে গেলে ভারতবাসীর মনে যোগাসনে উপবিষ্ট, নিমীলিত নয়ন, নির্বিকল্প-সমাধিমগ্ন এক যোগিপুরুষের ছবি ভেসে ওঠে। বরাভয়মুদ্রা তাঁর হাতে, জলদগম্ভীর-স্বরে যেন তিনি বলছেন—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ।' ধর্মপিপাসু ভারতবাসীর মনে এই বুদ্ধমূর্তি একটি চিরকালের প্রেরণা, আর ধর্ম-জিজ্ঞাসুর মনে বুদ্ধদেব একটি পরম জিজ্ঞাসা। ভারতবর্ষে ধর্মের বহু মত ও পথ রয়েছে, কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে জীবনকেই ভারতবর্ষ সব সময় উঁচু স্থান দিয়েছে। তাই বুদ্ধদেবকে সে অতি সহজেই অবতারের আসনে বসিয়ে বলতে পেরেছে, 'কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর,—জয় জগদীশ হরে।' যেখানে ভাস্বর জীবন—অতলস্পর্শ হৃদয়, মত ও পথের বিভিন্নতা সেখানে নিতান্তই গৌণ।

বুদ্ধদেবের মূর্তি ও জীবন তাই অতি স্বাভাবিক ভাবেই বিবেকানন্দের বালকমনকে স্পর্শ করতে পেরেছিল। যে বিচারশীল বিবেকী মন আপন ইষ্টদেবের মধ্যে সামান্যতম দোষও সহ্য করতে পারে না, সামান্য দোষের জন্য প্রিয়তম বিগ্রহকে বিসর্জন করতেও যে বালকমন কুণ্ঠিত হয় নি, বুদ্ধদেবের জীবনসলিলে অবগাহন করতে গিয়ে সে মন কোথাও বাধা পায়নি একথা মনে করবার কারণ আছে। বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস, তীব্রত্যাগ-বৈরাগ্য, মানবজাতির দুঃখ, জরা-মৃত্যুর জন্য তীব্র বেদনাবোধ, বিশেষ করে বুদ্ধদেবের সেই সংকল্প,—'ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু'…বিবেকানন্দের

মনে একটা গভীর দাগ কেটে দিয়েছিল। বুদ্ধদেবের ধ্যান করতে করতে তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন, ধ্যানাবস্থায় বুদ্ধদেবের সন্ন্যাস-মূর্তি কতবার তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। একবার ধ্যানাবস্থায় গৈরিকমণ্ডিত দণ্ড-কমণ্ডলুহাতে বুদ্ধদেবের দর্শন পেয়েছিলেন; আর একবার বোধিদ্রুমতলে বুদ্ধধ্যানে তন্ময় হয়ে তীব্র বিরহে পার্শ্বস্থ গুরুভাইয়ের গলা জড়িয়ে তিনি কেঁদে উঠলেন—সবই তো রয়েছে ভাই, কিন্তু সেই নায়কশ্রেষ্ঠ প্রিয়তম কোথায়! পরবর্তী কালেও বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে বলতে তাঁর কোন ক্লান্তি ছিল না।

বুদ্ধদেবের জীবন ছিল অনুভূতির জীবন। তাই তাঁর জীবনে শুষ্ক দর্শনের ও তর্কের স্থান অল্প। নিজের অনুভূতিলব্ধ সত্যকে তিনি জীবন দিয়ে প্রচার করেছিলেন। স্বামিজীর ভাষায় বুদ্ধবাণী হ'ল, "প্রথমে গভীর যুক্তি-বিচারের মধ্য দিয়ে সত্যের অনুসন্ধান কর, আর সেই বিশ্লেষণের পর যদি দেখ যে উহা বিশ্বের সকলের পক্ষে হিতকর তাহলে ঐ সত্যে বিশ্বাস স্থাপন কর ও জীবনে উহা রূপায়িত করে তোল এবং অপরকেও উহা জীবনে গ্রহণ করতে সাহায্য কর।" বুদ্ধ ছিলেন পুরোপুরি খাঁটি লোক—"an absolutely sane man"—"বুদ্ধদেব একজন দেহধারী মানুষমাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন ঘনীভূত অনুভূতি। তোমাদের সকলকেই সেই অনুভূতির ভিতর প্রবেশ করতে হবে।"

স্বামিজী তাঁর বক্তৃতাবলীর অনেক স্থানে বুদ্ধদেবকে একজন আদর্শ কর্মযোগিরূপে দেখিয়েছেন। আবার অন্যত্র তাঁকে কর্মনিষ্ঠ জ্ঞানী (working jnani) বলে বর্ণনা করেছেন। ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করাই কর্মযোগীর লক্ষ্য, আর জীব-ব্রহ্মের ঐক্য-অনুভূতিই জ্ঞানীর চরমাকাঙ্ক্ষা। বুদ্ধদেব ধ্যানযোগে জ্ঞানীর চরম অনুভূতি নির্বিকল্প সমাধি বা নির্বাণ লাভ করেছিলেন, কিন্তু তিনি চেয়েছিলেন এই অনুভূতিকে সর্বসাধারণের সামগ্রী করে তুলতে। মানবজাতির দুঃখানুভূতিই তাঁকে একদিন গৃহত্যাগী করেছিল; শুধু নিজের মুক্তি-আকাঙ্ক্ষা তিনি কখনও করেননি। তাই তাঁর সাধনোত্তর জীবন সর্বজীবের প্রতি সহানুভূতি ও স্বার্থহীন ভালবাসায় মহীয়ান্ হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ খুব সুন্দরভাবে বলেছেন, "তাঁর সাধুত্ব অন্য কোন উদ্দেশ্য-প্রণোদিত ছিল না। উহা সাধুত্বের জন্যই সাধুত্ব। তাঁর প্রেম ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কাম।" ভগবান বুদ্ধদেব তাঁর প্রেমের বাণী ছড়িয়ে দিয়েছিলেন পূর্ব থেকে পশ্চিমে, উত্তর থেকে দক্ষিণে—সমস্ত পৃথিবীতে। বিশেষ করে তাঁর ভালবাসা ছিল অজ্ঞান, দরিদ্র, অসহায়দের জন্য। তাই তাঁর ভাষা ছিল সর্বসাধারণের প্রাণের ভাষা—"আমি দরিদ্র ও জনসাধারণের জন্য। আমাকে জন-সাধারণের মর্মকথা জনসাধারণের ভাষায় বলতে দাও।" তাই বোধ হয় বুদ্ধদেবের সমস্ত বাণী সে যুগের কথ্যভাষা পালিতে লিখিত। কিন্তু তাঁর এই প্রেমের পেছনে ছিল না কোন অর্থ, মান বা সম্মানের অভিসন্ধি। তাঁর এই প্রেমের উৎস পরিপূর্ণ জ্ঞান থেকে। তাই 'কর্মনিষ্ঠ জ্ঞানী'ই বুদ্ধদেবের যোগ্যতম পরিচয়।

বুদ্ধদেবের এই অসীম হৃদয়বত্তাই স্বামিজীকে মুগ্ধ করেছিল। যে সাধনপথে তিনি নির্বাণ লাভ করলেন সে পথ তিনি উন্মুক্ত করে দিলেন সর্বসাধারণের জন্য। অমৃতে সকলেরই সমান অধিকার, কোন জাতিবিশেষের তাতে একচেটিয়া দাবী থাকতে পারে না। স্বামিজী তাই বললেন, "যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে বদ্ধ হইয়াছিল, বুদ্ধদেব তাহারই দ্বার ভাঙ্গিয়া সরল

কথায়, চলতি ভাষায় খুব ছড়াইয়াছিলেন। নির্বাণে তাঁহার মহত্ব কি? তাঁহার মহত্ব in his unrivalled sympathy (তাঁর অতুলনীয় সহানুভূতিতে)। তাঁহার ধর্মে যে সকল উচ্চ অঙ্গের সমাধি প্রভৃতি গূঢ়তত্ত্ব আছে তাহা প্রায় সমস্তই বেদে আছে। কিন্তু নাই তাঁহার heart যাহা জগতে আর হইল না।" একটি খুব চমৎকার উপমা দিয়েছেন স্বামিজী—"বুদ্ধদেব যেন ধর্ম-জগতের ওয়াশিংটন। ওয়াশিংটনের সমস্ত চেষ্টা যেমন আমেরিকাবাসীদের উদ্দেশে উৎসর্গিত, বুদ্ধদেবের অধিকৃত ধর্মরাজ্যও ছিল জনসাধারণের জন্য। নিজের জন্য তিনি কিছুই চাননি।" যে জ্ঞান ছিল গুহার অন্ধকারে, বনানীর শান্ত নীরবতায়, তাকে বুদ্ধদেব নিয়ে এলেন সর্ব-সাধারণের মর্মদেশে। আর জীবন দিয়ে প্রচার করলেন কি করে সেই জ্ঞানকে প্রাত্যহিক জীবনে কাজে লাগান যায়। কথাপ্রসংগে উল্লেখযোগ্য, এই 'বনের বেদান্তকে ঘরে আনা' স্বামিজীরও জীবন-দর্শনের মুলবাণী ছিল। Practical Vedanta—কর্মে পরিণত জ্ঞান—ব্যক্তিজীবনে, সমাজ-জীবনে, জাতীয় জীবনে তার বিকাশ—এই ছিল স্বামিজীর স্বপ্ন। তাই এইদিক দিয়ে বুদ্ধদেব স্বামিজীর পথপ্রদর্শক, স্বামিজী তাঁর উত্তরসাধক। বুদ্ধদেবের মধ্যে বেদান্তের পরিপূর্তি লক্ষ্য করে ভক্তিতদ্গতচিত্তে বললেন,—"ভগবান বুদ্ধই সর্ব-প্রথম সেই বেদান্তকে বাস্তবভুমিতে নিয়ে আসেন ও কিভাবে তাকে জনগণের প্রাত্যহিক জীবনে প্রবর্তিত করা যায় তার নির্দেশ দেন। এক দিক দিয়ে তিনি ছিলেন বেদান্তের জীবন্ত মূর্তি।"

স্বামী বিবেকানন্দও ছিলেন মূর্তিমান বেদতনু। 'Absolutely sane man'—পুরোপুরি খাঁটি লোক—বুদ্ধদেব-সম্বন্ধে স্বামিজীর এই উক্তি শুধু ভক্তির উচ্ছ্বাসমাত্র নয়। যে যুগে আধ্যাত্মিকতা ও অতিপ্রাকৃত শক্তির প্রভেদ বুঝতে সাধারণ লোক ভুলে গেছে, বুদ্ধদেবই প্রথমে বললেন, 'ধর্মের সঙ্গে যাদুবিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই।' এইরূপে সর্বসমক্ষে অলৌকিক শক্তি দেখানোর অপরাধে জনৈক শিষ্যকে তিনি চিরদিনের মত বহিষ্কৃত করে একটা অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। তাছাড়া কী সংস্কার-মুক্ত মন ও বিনয় ছিল তাঁর! জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলের আতিথ্য তিনি গ্রহণ করতেন। সকলের প্রার্থনা পূরণ করতেন। জীবনের অবসান হবে জেনেও তিনি সানন্দে পারিয়ার অন্নগ্রহণ করলেন, আর তাঁকে মুক্তিদানের জন্যে জানালেন কৃতজ্ঞতা। জীবনের শেষ ঘটনাটি এমনি করে অপূর্ব করুণায় শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠল। আবার রাজগীরের ছাগদের জীবনরক্ষার জন্য তিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করতে চাইলেন। এতখানি করুণা, এত পৌরুষ, এত প্রেম বুদ্ধদেবের জীবনেই সম্ভব হয়েছিল।

বুদ্ধদেবের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের এই উদ্বেল ভক্তির আর একটি গুপ্ত কারণ ভগিনী নিবেদিতা নির্দেশ করেছেন। প্রভু শ্রীরামকৃষ্ণের যে দিব্যজীবন স্বামিজী স্বচক্ষে দেখেছিলেন, দেখেছিলেন যে প্রেম, বীর্য ও সত্যের সংহত মূর্তি, বুদ্ধের জীবনের সংগে তা অবিকল মিলে যেত। এই অভেদ উপলব্ধি করেই বোধ হয় স্বামিজী বলেছিলেন,—'বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই, তিনি নিজে ঈশ্বর, খুব বিশ্বাস করি।' নিবেদিতার কথায় বলতে হয়, "In Buddha he saw Ramakrishna Paramhansa, in Rama-krishna he saw Buddha." (বুদ্ধদেবের মধ্যে তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেখতে পেতেন, আর রামকৃষ্ণের মধ্যে উপলব্ধি করতেন বুদ্ধকে)। বুদ্ধদেব যুগপ্রয়োজনে বেদের কর্মবাদ অর্থাৎ বাহ্যোপকরণের সাহায্যে অন্তরশুদ্ধি করা—এর

প্রতিবাদ করেন। বাহ্যকর্মবাদের পরিবর্তে আন্তরকর্মবাদের প্রচার করলেন। প্রচার করলেন চতুর্বিধ সত্য—(১) পৃথিবীতে জীবন দুঃখময়, (২) বাসনাই দুঃখের জনক, (৩) বাসনার অবলুপ্তিই দুঃখজয়ের মূল উপায়, (৪) প্রকৃত ধর্মজীবন-যাপনের ফলেই বাসনার বিনাশ হয়। এই বাসনার অবলুপ্তির জন্য তিনি প্রচার করলেন 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ'—সৎশ্রদ্ধা, সৎসংকল্প, সদ্বাক্য, সৎকার্য, সৎচেষ্টা, সৎ-চিন্তা, সৎসংযম ও সৎসমাধি। বুদ্ধদেব নৈতিকতার অন্তরের ও বাহিরের দুটো দিকের উপর সমান জোর দিতেন। তাঁর এই নীতিবাদ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত। বুদ্ধদেবের নীতিবাদকে লক্ষ্য করে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "বুদ্ধদেবই জগৎকে দিয়েছিলেন নৈতিকতার একটি সর্বাঙ্গসুন্দর ধারা।"

কিন্তু বুদ্ধদেব সর্বসাধারণের জন্য মোক্ষধর্ম প্রচার করে একদিক দিয়ে ভারতবর্ষের খুব ক্ষতি করেছিলেন বলে স্বামিজী মনে করতেন। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—উন্নতির এই বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করেই মানুষ পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে, ধর্ম-অর্থ-কাম বাদ দিয়ে বাসনার নিবৃত্তি বা মোক্ষলাভ সম্ভব নয়। তাই স্বামী বিবেকানন্দ বললেন, "সর্বসাধারণকে একই মোক্ষপথ অনুসরণ করানোর কেন এই প্রচেষ্টা? এই দিক দিয়ে দেখলে বুদ্ধদেবের শিক্ষা আমাদের জাতির ক্ষতি করেছে, যেমন খ্রীষ্ট অনিষ্ট করেছিলেন গ্রীসীয় ও রোমক সভ্যতার।" বৈদিক ধর্মেরও লক্ষ্য মোক্ষ কিন্তু বৈদিক ধর্মের পথ বিভিন্ন। জাতিধর্ম বা স্বধর্ম-সাধনের দ্বারা অন্তরশুদ্ধি হলেই সে মোক্ষধর্মের অধিকারী হবে। কিন্তু বুদ্ধদেব যোগ্যতা বিচার না করে সকলের জন্য মোক্ষধর্ম প্রচার করার ফলে দেশে উত্তর কালে নানাপ্রকার ব্যভিচার দেখা দিল। জনসাধারণ ক্রমশঃ নির্বীর্য কাপুরুষ হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য স্বামিজী বিশেষ করে পরবর্তী বৌদ্ধমতাবলম্বীদেরই এই সকল অধঃপতনের জন্য দায়ী করেছিলেন ও বলেছিলেন—"অত্যধিক দর্শনচিন্তার ফলে তাঁরা হৃদয়ের বিস্তার অনেকটা হারিয়ে ফেলেছিলেন। ক্রমে 'বামাচার'রূপ নৈতিক অধঃপতন বৌদ্ধধর্মের মধ্যে প্রবেশ করে বৌদ্ধধর্মকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে নিয়ে গেল।" বুদ্ধদেব ছিলেন হৃদয় ও মস্তিষ্কের অপূর্ব সমন্বয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিস্থল যে অপারহৃদয়বত্তা, তার অভাবে বৌদ্ধধর্মের অন্তিমকাল এ দেশে স্বাভাবিক ভাবে ঘনিয়ে এল।

এদেশে বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তির আরও একটি কারণ স্বামিজী নির্দেশ করেছেন। বৈচিত্র্যের দেশ এই ভারতবর্ষ, আবার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে সেই এককে উপলব্ধিই ভারতবর্ষের সাধনা। তাই ভারতবর্ষে অসংখ্য মত ও পথ দেখা যায়। এক গীতায় শ্রীকৃষ্ণ মোক্ষলাভের তিনটি প্রধান পথ—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের নির্দেশ করেছেন। ভারতবর্ষ যেমন নিরাকার মেনেছে, সাকারকেও স্বীকার করেছে। সাকার ঈশ্বর ছাড়া প্রেমভক্তি লাভ করা কঠিন, আর ভক্তিপথই এদেশের প্রাণের পথ। কিন্তু বুদ্ধদেব সেই প্রেমাস্পদ ঈশ্বরকে অস্বীকার করলেন। তাই ভারতবর্ষ বুদ্ধি দিয়ে বুদ্ধদেবকে গ্রহণ করলেও প্রাণের মধ্যে বুদ্ধবাণীকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। তাই তারা বুদ্ধদেবকে অবতাররূপে গ্রহণ করলেও, বৌদ্ধধর্মকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করল। স্বামিজীর ভাষায় "যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে মানুষমাত্রেই—স্ত্রী বা পুরুষ—অতিযত্নে আঁকড়ে থাকে, বৌদ্ধেরা গণমানস থেকে তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। ফলে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের হ'ল স্বাভাবিক মৃত্যু।"

তবু স্বামিজী বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের পরিপূরক বলে মনে করতেন এবং যুগপ্রয়োজনে

বৌদ্ধধর্মের সার্থকতাও তিনি স্বীকার করতেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মের সব কিছু থাকা সত্ত্বেও অভাব ছিল হৃদয়ের, বুদ্ধদেব সেই অভাব পূরণ করেছিলেন। ধর্মজীবনে তিনি নিয়ে এলেন অতলগভীর হৃদয়। তাই ব্রাহ্মণ্যধর্মের মেধা ও বুদ্ধদেবের হৃদয়ের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে ভবিষ্যৎ ভারতের ধর্ম। স্বামিজী উদাত্ত কণ্ঠে বলেছিলেন, "বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের মধ্যে এই বিচ্ছেদই ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ। তার জন্যই ভারতবর্ষ আজ ত্রিশ কোটি ভিক্ষুকে অধ্যুষিত। তার জন্যই ভারতবর্ষ গত একশত বৎসর বিদেশীর পদানত। আজ আমাদের ব্রাহ্মণ্যধর্মের সুতীক্ষ্ণ মেধার সঙ্গে মহামানব বুদ্ধদেবের অপূর্ব হৃদয়, উদার প্রাণ, এবং অদ্ভুত মানবিকতার সমন্বয় সাধন করতে হবে।"

বোধ করি এই মিলনমন্ত্রের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের ধর্মচিন্তার নবজাগৃতি সম্ভবপর।

পরমহংস*

অধ্যাপক শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য, এম্-এ, পি-আর্-এস্, দর্শনসাগর

পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনেক ওলট-পালট ঘটে গেছে। কিন্তু ঐতিহ্য হিসাবে আমরা পেয়েছি ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা, যোগের প্রতি সম্ভ্রম ও সন্ন্যাসের প্রতি ভক্তি। যাঁরা ইহজীবনটাকেই একমাত্র সত্য বলে গ্রহণ করেন নি, যাঁরা চঞ্চল মনকে সংযত করে আত্মজ্ঞান লাভ করতে যত্ন করেছেন এবং যাঁরা আত্মীয়স্বজনের মায়া ও সংসারের বন্ধন কাটাতে পেরেছেন তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক আদর্শ হিসাবে ধরে নিয়ে জনসাধারণ নিজেদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার চেষ্টা করেছে এবং যখন তাতে অসমর্থ হয়েছে তখন তারা নিজেদের ব্যর্থতাকে গৌরবের মুকুট পরায়নি। মানুষের মনের কোণে কোথায় এমন একটা অসম্পূর্ণতার অস্বস্তি লুকোনো আছে যাতে সে নিজের অজ্ঞতা, অক্ষমতা বা অধঃপতনকে বরণ করে নিতে পারেনি—তাদের বিরুদ্ধে সে লড়াই করেছে এবং যাঁরা সেই যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন তাঁদের সান্নিধ্য ও সহায়তা পেয়ে কৃতার্থ মনে করেছে এবং দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁদের অনুসরণ করবার চেষ্টা করেছে। মহাপ্রাণ মহামানবকে যুগে যুগে সমাজ ভগবানের মূর্ত বিকাশরূপে দেখেছে, ঈশ্বরের বিভূতি তাঁতে লক্ষ্য করেছে, এমন কি অবতার বলে পূজা করেছে। সসীমের মধ্যে অসীমের আবির্ভাব তাকে যুগপৎ চমৎকৃত, সন্ত্রস্ত ও আকৃষ্ট করেছে।

নৈসর্গিক জগতের গতানুগতিকতার ধারা ঐশীশক্তির স্ফুরণ ও বৃদ্ধিতে খাটে না। তাই ঈশ্বর-প্রত্যাদিষ্ট সাধকের শিক্ষাদীক্ষার ক্রম ও প্রণালী কোনও বাঁধাধরা নিয়মে চলে না। তাঁদের অনেকেই প্রকৃতির পাঠশালাতেই তাঁদের শিক্ষা সমাপন করেছেন, মানুষের শাস্ত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করবার সুবিধা বা প্রয়োজন তাঁদের অনেকের জীবনে দেখা দেয়নি। এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই কেন না, মৌলিক সত্য যাঁরা

* কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে।

আবিষ্কার করেন সেই সব মন্ত্রদ্রষ্টারা অনুপ্রেরণা লাভ করেন বিশ্বের খোলা পুঁথির পাতা থেকে—যেখানে সঙ্কীর্ণতার অবসর নেই, বিভিন্ন মতের দ্বন্দ্ব নেই, স্বার্থের গন্ধ নেই, অচলতার বন্ধন নেই। জগৎ চলে সকল গণ্ডীর বাঁধ ভেঙ্গে, ঘটনা-প্রবাহকে চলিষ্ণু রেখে ও বৈচিত্র্যকে ঐক্যসূত্রে বেঁধে।

হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম গড়ে উঠেছিল প্রকৃতিকে অনুকরণ করে। যারা স্বার্থ ও স্বজন নিয়ে থাকবে তারা থাকবে নীচে, আর যাঁরা সমাজের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করবেন তাঁরা থাকবেন উপরে। [যারা চাইবে ভূতি ও প্রেয়স্ তারা সম্ভূতি ও শ্রেয়সের উপাসকদের সমান পর্যায় বা মর্যাদা লাভ করবে না।] যাদের শক্তি বাহুতে, তারা যাঁদের শক্তি মনে তাঁদের সামিল হবে না। প্রবৃত্তির বিস্তৃত মার্গ যারা বেছে নেবে, তারা নিবৃত্তির সঙ্কীর্ণ মার্গের যাত্রীদের পিছনে পড়ে থাকবে।

কিন্তু মনতো ছোট বড় দুইই নিয়ে ব্যাপৃত থাকতে পারে। তাই যাঁরা বৃহৎকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তাঁরাই হবেন বড়। ব্রহ্মই বৃহত্তম বস্তু—তাই ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ যিনি তিনিই হবেন সকলের চেয়ে বড়। কৃচ্ছ্রসাধন না করলেও তিনি সন্ন্যাসী—ক্ষুদ্রতার দ্যোতক জাতিবর্ণের চিহ্ন তিনি দেহে ধারণ করেন না, তাঁর না আছে শিখা না আছে যজ্ঞোপবীত। বৈরাগ্যসাধন ছাড়া এ অবস্থায় সহজে পৌছান যায় না। [যিনি কুটীচক তাঁর গতি ভুবর্লোক; যিনি বহূদক তিনি স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন; যিনি হংস তাঁর তপোলোকে অবস্থান, আর যিনি পরমহংস তিনি সত্যলোকের অধিবাসী। যাঁরা তুরীয়াতীত ও অবধূত, তাঁরা নিজের আত্মাতেই পরমপদ লাভ করেন এ কল্পনাও কখন কখন করা হয়েছে; কিন্তু সাধারণতঃ হংস-পদবী লাভ করাই সন্ন্যাসের কাম্য বলে বিবেচিত হয়েছে।] জীবজগতে হংস যেমন মৃণালবন্ধন ছিন্ন করে আকাশে উড়ে যায়, তেমনই ব্রহ্মজ্ঞ সংসারের মায়াপাশ কেটে চলে যান। হংস ক্ষীরমিশ্রিত নীর থেকে ক্ষীরমাত্র গ্রহণ করে—ব্রহ্মজ্ঞও তেমনই একমাত্র সদ্‌বস্তু ব্রহ্মকে অসৎ মায়াপ্রপঞ্চ থেকে আলাদা করে নেন—শ্রীরাম-কৃষ্ণের ভাষায় তিনি গোলমালের গোল ছেড়ে মালটি নিয়ে নেন। জগতের কলুষতা যাঁর শুচিতাকে ম্লান করতে পারে না এবং যিনি সংসারের স্নেহ-সলিলে আর্দ্র হন না, যিনি প্রত্যেক শ্বাসপ্রশ্বাসের 'সোহহম্' ধ্বনির মধ্যে আপনার ও ব্রহ্মের ঐক্য উপলব্ধি করেন তিনিই যথার্থ হংস। নভোমণ্ডলের ভাস্বর হংসরূপী সূর্যের মত যিনি অবিদ্যারূপ অন্ধকার নাশ করেন তিনিই হংস। এই হংসের পরাকাষ্ঠাই পরমহংস—তিনিই আধ্যাত্মিকতার চরম স্তরে অবস্থিত।

ভাগ্যবান আমরা যে এই দেশেই গত শতাব্দীতে এমন একজন ভাগবতপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যিনি দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন প্রকৃতির পাঠশালায়; যিনি লৌকিক গুরু বরণ করেছিলেন বটে, কিন্তু দেখিয়েছিলেন যে, সাধনায় সিদ্ধিলাভ নির্ভর করে না কালের পরিমাণের উপর, কিন্তু ধ্যানের তীব্রতা ও প্রাণের আকুল আকাঙ্ক্ষার উপর; যাঁর অপাপ-বিদ্ধ শরীর কাঞ্চনের কলুষস্পর্শে ও পাতকীর দেহসংস্পর্শে বিকৃত ও সঙ্কুচিত হয়ে যেতো; যিনি কেবল স্বয়ংসিদ্ধ নন, কিন্তু অন্যেতে ব্রাহ্মীভাব সঞ্চারিত করতে পারতেন মাত্র স্পর্শের দ্বারা; যিনি শান্ত-সমাহিত-দৃষ্টির দ্বারা অতিবড় নাস্তিক ও উচ্ছৃঙ্খলের চিত্তকেও ধর্মপ্রবণ করবার শক্তি ধারণ করতেন। এই অলোক-সামান্য পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে যে সকল অনৈসর্গিক ঘটনাবলী গড়ে উঠেছে বা এখনও উঠছে তাদের কথা বাদ দিলেও যে ছবিটি

আমাদের মানস চক্ষে ভেসে ওঠে তা হচ্ছে এক অসামান্য জিজ্ঞাসু সমন্বয়বাদী ও সমন্বয়কারী তত্ত্ববিদের প্রশান্তমূর্তি। উপাদান হিসাবে তাঁর চরিত্রে ছিল ভাবের প্রাবল্য, জিজ্ঞাসার আতিশয্য, আধ্যাত্মিক অনুভূতি-পরীক্ষার আত্যন্তিক আগ্রহ, ভক্তির প্রবণতা, সমাধির তীব্রতা, জীবসেবার আকাঙ্ক্ষা, স্বাধীন মত-প্রকাশের বলিষ্ঠতা ও দৈনন্দিন জীবনের ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতি নির্দোষ পরিহাসপ্রিয়তা। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ভক্তের ভগবান্, জ্ঞানীর ব্রহ্ম ও যোগীর আত্মাকে একসূত্রে গ্রথিত করেছিলেন বলে সাকার-নিরাকারের দ্বন্দ্ব, নিত্য ও লীলার কলহ তাঁর মনকে সংশয়বিদ্ধ বা দ্বিধাবিভক্ত করেনি। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ স্বীকার করে নিয়ে তিনি আদ্যাশক্তি লীলাময়ী মহামায়া কালীর মধ্যেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের সন্ধান পেয়েছিলেন। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত আর শঙ্করাচার্যের মোহমুদ্গর তাঁর কানে একই ঝঙ্কারে ধ্বনিত হোতো।

তাঁর জীবনদর্শন গড়ে উঠেছিল ভক্তির ভিত্তির উপর। তাই জ্ঞান ও কর্মযোগের চেয়ে ভক্তিযোগকেই তিনি যুগধর্ম বলে মনে করতেন। [যেমন রোসনচৌকির পোঁ ধরার ঐক্যের উপর রংবেরংএর সুর তোলা হয় বলেই তা উপভোগ্য, তেমনই জ্ঞানমার্গীর অদ্বিতীয় ব্রহ্মসত্তার উপর বৈচিত্র্যের লহর ওঠালেই ধর্মজীবন সরস হয়।] এখানে কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই—বহিঃ শিব হৃদে কালী মুখে হরিবোল। চাই অহৈতুকী রাগানুগা ভক্তি ["পূজার চেয়ে জপ বড়। জপের চেয়ে ধ্যান বড়। ধ্যানের চেয়ে ভাব বড়। ভাবের চেয়ে মহাভাব প্রেম বড়।...প্রেম হলে ঈশ্বরকে বাঁধবার দড়ি পাওয়া গেল"।] তবে অনন্ত মত অনন্ত পথ—কাজেই কোনও ধর্মের অধিকার নেই বলবার যে, সেইই মোক্ষের একমাত্র মুক্তদ্বার।

কিন্তু ধর্মজীবনের একটা দিক্ হচ্ছে সামাজিক কর্তব্য। মানুষকে অবহেলা করে বা ঘৃণা করে ভগবানকে পাওয়া যায় না। খালি সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম বলে চেঁচালে চলবে না। সর্বজীবে বিশেষতঃ মানুষের মধ্যে তাঁর অবস্থান উপলব্ধি করে জীবসেবায় সার্থক করে তুলতে হবে ব্রহ্মজ্ঞানকে। দরিদ্রনারায়ণের সেবা করতে হবে শ্রদ্ধার সহিত, সঙ্কোচের সহিত, সন্ত্রস্ততার সহিত। [নির্জনের বেড়া দিয়ে সাধনকে পুষ্ট করে নিয়ে সংসারে নামলে দৈ থেকে তোলা মাখনের মতন মন আর সংসারে মিশে যায় না—কামিনী-কাঞ্চনের মোহ কেটে যায়। তখন অহংভাব থাকে না ও ভগবানের প্রতি তুঁহু তুঁহু ভাব অর্থাৎ সব কাজই ভগবানের ইচ্ছায় হচ্ছে এই ভাব এসে পড়ে।] প্রিয়শিষ্য বিবেকানন্দকে তিনি সমাধির পথ ধরতে দেন নি কেননা, বোধিসত্ত্বের ব্রত নিয়ে অজ্ঞান, দুঃস্থ, অধিকার-বঞ্চিত অগণিত নরনারীর আত্মার উন্নতির ভার নেবার লোক তা হলে থাকবে না। এই ক্ষাত্রশক্তিকে তাঁর ব্রাহ্মণ্যরথধুরাতে যোজিত করে তিনি ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর বিশ্ব-পর্যটনের ব্যবস্থা করেছিলেন বলেই আজ তাহা দিগন্তপ্রসারী। মহাপ্রভু চৈতন্যের মত তিনি শিষ্যগোষ্ঠী-নির্বাচনে অদ্ভুত দক্ষতা দেখিয়ে গিয়েছেন এবং প্রচলিত সনাতন পথ ত্যাগ করে জাতিধর্মবর্ণ-নির্বিশেষে শিষ্যগণকে সন্ন্যাস-আশ্রমের অধিকারী করে ভাবী যুগের সূচনা করে দিয়ে গেছেন। তিনি নিজে খাট-বিছানায় বসতেন। লালপেড়ে কাপড় জামা জুতা মোজা সব পরতেন, অথচ সংসার করতেন না। ভাব সমস্ত ত্যাগী সন্ন্যাসীর বলে তিনি পরমহংস।

তিনি মানুষ না দেবতা এসম্বন্ধে বিবেকানন্দ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে যা বলেছিলেন তাই

উদ্ধৃত করে আমরা এ কথিকা সমাপ্ত কোরবো। ডাঃ সরকার যখন শিষ্যগণকে বল্লেন, ঈশ্বর বলে পূজা করে ভাল লোক শ্রীরামকৃষ্ণের মাথা না খেতে, তখন বিবেকানন্দ উত্তর দিয়েছিলেন—"এঁকে আমরা ঈশ্বরের মত মনে করি। কি রকম জানেন? যেমন vegetable creation (উদ্ভিদ) ও animal creation (জীবজন্তুগণ) এদের মাঝামাঝি এমন একটা point (স্থান) আছে, যেখানে এটা উদ্ভিদ্ কি প্রাণী স্থির করা ভারি কঠিন, সেইরূপ man-world (নরলোক) ও God-world (দেবলোক) এই দুয়ের মধ্যে একটি স্থান আছে যেখানে বলা কঠিন এ ব্যক্তি মানুষ কি ঈশ্বর। We offer to him worship bordering on Divine Worship (এঁকে আমরা পূজা করি—সে পূজা ঈশ্বরের পূজার প্রায় কাছাকাছি)।" প্রিয়তম অন্তরঙ্গ শিষ্যের এই উক্তির উপর মন্তব্য অনাবশ্যক।

ঋগ্বেদের উষাস্তোত্র

অধ্যাপিকা শ্রীযূথিকা ঘোষ, এম্-এ, বি-টি

বিভিন্ন দেশের সাহিত্যের মূল উৎস অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে ধর্মই মানুষকে প্রথম সাহিত্য-সৃষ্টির প্রেরণা দিয়াছে, সাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধির জন্য নব নব উপকরণ-আহরণে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। ধর্মের বাহন হইয়াই ভাষা সাহিত্যের দরবারে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছে। ধর্মের নামে যাহা কিছু কীর্তিত ও প্রচারিত হইত প্রাচীন যুগের সরল মানবকে তাহা আকৃষ্ট করিত বিশেষভাবে। ভারতের সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই চিরপ্রথার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। বেদই ভারতের সর্বপ্রাচীন ও সর্বপ্রধান ধর্মসাহিত্য। বৈদিক সাহিত্যে প্রাচীন ভারতীয় জীবনধারার বিশিষ্ট দিগ্‌গুলি সুস্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান-গরিমার সাক্ষ্য বহন করিতেছে এই বিশাল বৈদিক সাহিত্য। বৈদিক মন্ত্রসমূহে আর্যগণের ধর্মপ্রবণ চিত্তের সরল ভাবটির সহিত আমরা সহজেই পরিচয় লাভ করি। আর্যগণ যে সব রহস্যময় পদার্থের সন্ধান পাইয়াছেন প্রকৃতির মধ্যে, সেখানেই কোন এক দেবতার কল্পনা করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ চিত্তে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়াছেন আবেগময়ী ভাষায়। বিভিন্ন সময়ে প্রকৃতির অপরূপ রূপ পরিবর্তন তাঁহাদের মনে দিত দোলা; বিশ্বসৃষ্টির অনবদ্য মাধুর্যে বিহ্বল হইত তাঁহাদের চিত্ত; অপূর্ব আনন্দের আতিশয্যে অভীপ্সিত দেবতাকে আবাহন করিতেন মন্ত্রের পর মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া। বিশ্বস্রষ্টার বহুবিচিত্র শক্তির কথা স্মরণ করিয়া বিস্ময়রসে আপ্লুত হইত তাঁহাদের মন, বিভিন্ন স্থানে বিরাট বিপুল শক্তির প্রকাশ অনুভব করিয়া অগণিত সূক্ত রচনার দ্বারা দেবদেবীর মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন আর্যগণ। কিন্তু ধীরে ধীরে তাঁহারা বহুর ভিতর হইতে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এর সন্ধান পাইয়া অধিকতর বিস্মিত হন এবং পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সেই "সত্যং শিবং সুন্দরম্" এর মহিমা কীর্তন করিয়াছেন—যে ভাবের পরিচয় দিতে যাইয়া বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন 'ভারততীর্থ' কবিতায়—

হেথা একদিন বিরামবিহীন
মহাওঙ্কারধ্বনি,
হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে
উঠেছিল রণরণি।
তপস্যাবলে একের অনলে
বহুরে আহুতি দিয়া
বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল
একটি বিরাট হিয়া।

বিরাট বিশ্বজগতে নিরন্তর অদ্ভুত আলোড়ন চলিয়াছে, সেখানে যে বিশাল শক্তির ক্রীড়া চলিতেছে তাহার অলৌকিকতা প্রাচীন আর্যগণকে অভিভূত করিত। মানবের শক্তি কত ক্ষুদ্র, কত নগণ্য, কত অকিঞ্চিৎকর প্রকৃতির বিপুল শক্তির নিকট। নিজেদের কল্যাণকামনায় সেই অলৌকিক শক্তির প্রীতি-উৎপাদনের নিমিত্ত বিস্ময়বিমথিত চিত্তে অন্তরের ভাবটিকে বাণীরূপ দান করিতেন তাঁহারা কল্পিত দেবতার উদ্দেশে শত শত কবিতা রচনা করিয়া। বিশ্বশোভার স্তাবক তাঁহারা, প্রকৃতির বিশ্বস্ত পূজারী তাঁহারা, প্রকৃতির সৌন্দর্যসুধা আকণ্ঠ পান করিয়া অশেষ তৃপ্তিলাভ করিতেন। শিশুসুলভ সরলতার সহিত দ্বিধাহীন চিত্তে দেবতার নিকট পার্থিব সুখ-বৃদ্ধির আশায় সাধারণ দ্রব্য প্রার্থনা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইতেন না। প্রত্যেক দেবতার নিকট আনুগত্য প্রকাশ করিতেন সরলচিত্তে এবং সকল প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করার জন্য দেবতাকে অনুরোধ করিতেন। স্তব-স্তুতি ও যজ্ঞের মন্ত্র—প্রধানতঃ এই সমস্ত বিষয় লইয়াই বেদের সংহিতা-ভাগ পদ্যে রচিত হইয়াছে। ঋক্‌, সাম, যজুঃ ও অথর্ববেদের মধ্যে ঋগ্বেদই প্রাচীন সংহিতা। ঋগ্বেদেই প্রথম উন্মেষ ভারতীয় সাহিত্যের। যজ্ঞস্থলে দেবতাকে আবাহন করা হইত ঋগ্বেদের মন্ত্রের দ্বারা। বহু দেবদেবীর বন্দনা-গান গাহিয়াছেন আর্যগণ ঋগ্বেদে। পুরুষ দেবতাদের মধ্যে ইন্দ্র শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়া আছেন এবং স্ত্রীদেবতাদের মধ্যে উষাই অধিক-সংখ্যক স্তোত্রে বন্দিত হইয়াছেন। প্রায় ২০টি সূক্তে উষাদেবীর বন্দনা করা হইয়াছে।

রাত্রি ও দিনের যে স্নিগ্ধ সন্ধিক্ষণ সেই মধুর মুহূর্তে হয় উষার আগমন। ক্ষণে ক্ষণে ধরণীর বক্ষে প্রকৃতিদেবীর অপরূপ পরিবর্তন ঘটে বর্ণে, রূপে, বৈচিত্র্যে। প্রকৃতির সুমধুর বহুবিচিত্র প্রকাশ যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের কবির মনে জাগায় অপূর্ব প্রেরণা; আনন্দবিহ্বল চিত্তে বাস্তব জগৎ অতিক্রম করিয়া কবি উপস্থিত হন কল্প-লোকের দ্বারপ্রান্তে; ভাববিহ্বল কবির সম্মুখে ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হয় কল্পলোকের দ্বার। অবাধ গতিতে কবি তখন বিচরণ করেন উদার উন্মুক্ত মানসলোকে। কি যে অনির্বচনীয় আনন্দরসে সিঞ্চিত হয় কবির মনপ্রাণ তাহা কবি ঠিক প্রকাশ করিতে পারেন না; আংশিক ভাবে তিনি নিজের ভাব প্রকাশ করেন সুললিত ছন্দোবদ্ধ ভাষায়। প্রকৃতিবৈচিত্র্যের যে রমণীয় মুহূর্ত উষা তাহা যুগে যুগে কবিদের উৎসাহ দিয়াছে কবিতা-রচনায়। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ যিনি "সুদূরের পিয়াসী" তিনিও উষার অপরূপ সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া গাহিয়াছেন—

অরুণময়ী তরুণী উষা
জাগায়ে দিল গান
পুরবমেঘে কনকমুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগৎ ছেয়ে
বিকশি উঠে প্রাণ।
কাহার হাসি বহিয়া এনে
করিলি সুধা দান।

এই ব্রাহ্মমুহূর্তের নিত্যনূতন বর্ণসুষমায় সাতিশয় পুলকিত হইয়া আর্যগণ আবাহন করিতেন উষা-দেবীকে—

আ ত্মাং তনোষি রশ্মিভিরাস্তরিক্ষমুরু প্রিয়ম্ ॥
উষঃ শুক্রেণ শোচিষা ॥ (৪।৫২।৭)

হে দেবি, সমগ্র আকাশ, সমগ্র অন্তরিক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে তোমার পূত প্রভায়।

প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে পূর্বদিকের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া উষার নিস্তব্ধ আগমন-দর্শনে অতীব আনন্দিত হইতেন আর্যগণ। দীপ্তিময়ী দ্যুলোক-দুহিতা তিনি, সকল দিক শুভ্র তেজোরাশিতে উদ্ভাসিত করিয়া গগনবক্ষে আবির্ভূতা তিনি, স্বর্ণরথে ধীরে ধীরে নামিয়া আসেন বিশাল ধরাতলে—

প্রতি ষ্যা সূনরী জনী ব্যুচ্ছন্তী পরি স্বসুঃ ॥
দিবো অদর্শি দুহিতা ॥ (৪।৫২।১)

মানবের প্রেরণাদাত্রী, কল্যাণের জনয়িত্রী, অন্ধকার-অপসারণরতা গগনতনয়া উষাদেবী আকাশ-প্রাঙ্গণে প্রকাশিত হইয়াছেন।

অম্বর-দুহিতা তিনি, পবিত্রতার পূর্ণ প্রকাশ তাঁহার মধ্যে ; মানবের মনে প্রভাতের পবিত্র লগ্নে প্রজ্বালিত করেন সত্যের দীপশিখা। রজনীর নিদ্রায় ক্লান্তিমুক্ত সবল সতেজ মনে এই অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবর্তন নিরীক্ষণ করিয়া বিস্মিত আর্যগণ শ্রদ্ধায় উষাদেবীকে প্রণতি-নিবেদন করিতেন। উষাদেবীর অগণিত গুণাবলী স্মরণ করিয়া উচ্চারণ করিতেন একাধিক সূক্ত—

অচ্ছা বো দেবীমুষসং বিভাতীং
প্র বো ভরধ্বং নমসা সুবৃক্তিম্ ॥ (৩।৬১।৫)

জ্যোতির্ময়ী উষাদেবীর উদ্দেশে সুন্দর স্তোত্র রচনা কর, সশ্রদ্ধ প্রণতি নিবেদন কর সকলে তাঁহার চরণে।

কমনীয়া লাবণ্যময়ী উষার আগমনে রাত্রির পুঞ্জীভূত অন্ধকার হয় ধীরে ধীরে অপসৃত। যাহা কিছু কলুষতাময়, কালিমাপূর্ণ, পাপমলিন সবই হয় তিরোহিত নবীন আলোকস্পর্শে। অসুন্দর অনাচারের নৃত্য হয় স্তব্ধ; শান্ত স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশে শ্রুত হয় উষার পদবিক্ষেপ। সেই শান্ত শুভ মুহূর্তে পবিত্রতার মধুর স্পর্শে অপূর্ব আনন্দের সন্ধান পায় মানুষ। রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া স্নিগ্ধ আলোকরাশি চতুর্দিকে বিকিরণ করিয়া তিনি মানবের মনকে আকৃষ্ট করেন সুন্দরের প্রতি, মানবকে চালিত করেন সত্যের পথে। সত্যাশ্রয়ী উষাদেবী বহুস্থানে ঋতাবরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। সত্যই যে মানুষকে অনাবিল আনন্দের সন্ধান দিতে পারে তাহা আর্যগণ স্বীকার করিতেন, তাই প্রভাতের প্রথম পবিত্র স্পর্শে উষাদেবীর নিকট সত্যের পূত আলোক ভিক্ষা করিতেন। আগ্রহভরে তাঁহারা গাহিতেন—

ঋতাবরী দিবো অর্কৈরবোধ্যা
রেবতী রোদসী চিত্রমস্থাৎ। (৩।৬১।৬)

সত্যের অর্চনাকারিণী গগনকে আলোকমণ্ডিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্যশালিনী দেবী গগনে বিচিত্র-ভাবে অবস্থান করিতেছেন।

মানুষ গভীর সুপ্তির ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করে রাত্রিকালে, কিন্তু সেই সুপ্তি তাহাকে যদিও দেয় ক্লান্তিমোচনের অদ্ভুত আনন্দ, তবুও সেই সুপ্তির রেশ সে নিরন্তর ভোগ করিতে পারে না। নিরন্তর সুপ্তিভোগ করার নামই ত মহানিদ্রা অর্থাৎ মৃত্যু। নির্দিষ্ট সময় সুপ্তির আনন্দ ভোগ করিয়া পুনরায় নির্ধারিত কাজের জন্য কর্মজগতে নামিতে হইবে। সংসারের ভরণপোষণ ও নিজের জীবধর্ম পরি-পূর্তির জন্য প্রয়োজন কর্মস্পৃহার। গগন-তনয়া প্রেরণাময়ী আনন্দরূপা উষাদেবী তাই প্রতিদিন একই সময়ে পূর্বাকাশে উদিতা হন জীবজগৎকে সুপ্তির ক্রোড় হইতে ধীরে ধীরে জাগাইয়া তুলিতে। মাতৃস্নেহে পূর্ণা তিনি, জননীর দায়িত্ব ন্যস্ত তাহার উপর, তাই সন্তানের কল্যাণের জন্য, তনয়ের সুখতৃষ্ণা

মিটাইবার জন্য অদৃশ্য অঙ্গুলিচালনে প্রেরণা দেন সমগ্র বিশ্বজগৎকে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবার জন্য। তাই আমরা দেখি যাদুমন্ত্রে যেন অপসারিত হয় রাত্রির নিস্তব্ধতা এবং চতুর্দিক ধীরে ধীরে মুখরিত হয় কর্মব্যস্ততায়। মানব, জীবজন্তু সকলেই নূতন প্রেরণায় নবীন উদ্যমে কর্মসাধনে তৎপর হয়। বিহগের নীড়েতেও শ্রুত হয় উষার পদধ্বনি; তাই পক্ষিকুল মধুর কাকলীতে পূর্ণ করে দিঙ্মণ্ডল; নীড় ত্যাগ করিতে উদ্‌গ্রীব হয় আহার-অন্বেষণের জন্য—

যূয়ং হি দেবীর্ঋতযুগ্‌ভিরশ্বৈঃ
পরিপ্রয়াথ ভুবনানি সদ্যঃ।
প্রবোধয়ন্তীরুষসঃ সসন্তং
দ্বিপাচ্চতুষ্পাচ্চরথায় জীবম্॥ (৪।৫১।৫)

—অশ্বপৃষ্ঠে নির্দিষ্ট সময়ে সমগ্র জগৎ-পরিক্রমার সময় নিদ্রিত দ্বিপদ চতুষ্পদ প্রত্যেক জীবকেই জাগ্রত কর তুমি, তাহাদের গতিশীল কর তুমি।

পূর্বাচলে উষার আগমনের কিছু পরেই হয় প্রদীপ্ত সূর্যের আবির্ভাব, আকাশপ্রাঙ্গণে বিস্তৃত হয় আলোকরাশি, তাই ঋগ্বেদে উষার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রসমূহে উষা ও সূর্যের মধ্যে মধুর সম্পর্কের কল্পনা করা হইয়াছে। দীপ্তিময়ী পুণ্যময়ী উষার মাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়াই যেন সপ্তরথে আবির্ভূত হন দিবাকর; উষার অসমাপ্ত কর্ম শেষ করিবার জন্য যেন ভানুর উদয় পূর্বগগনে। "উষা যাতি স্বসরস্য পত্নী" (৩।৬১।৪)—সূর্যপত্নী উষা গগনমার্গে বিচরণ করিতেছেন। অন্যান্য দেবতাদের কথাও উষা-সূক্তে পাওয়া যায়। রাত্রি উষার ভগিনী, তাই উষাস্তোত্রে 'নক্তোষবা' কথাটি বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। অগ্নির সহিত তাঁহার নিবিড় সম্বন্ধ কেননা উষাকালে পূজারী শয্যাত্যাগ করিয়া ব্যস্ত হয় পূজার আয়োজনে, হোমাগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া আহুতি-প্রদানে ব্যগ্র হয়, সেই সময় আবাহন করে অভীষ্ট দেবতাদের; সেজন্য অগ্নি ও অন্যান্য দেবতাকে 'উষর্বুধ' বলা হয়, অর্থাৎ উষসি বুধ্যতে—প্রভাতকালে যাঁহারা জাগরিত হন। দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয়ের কথা উষা-স্তোত্রে পাওয়া যায়। উষার স্তুতির সহিত এই দেবচিকিৎসকদ্বয়ের বন্দনা করা হইয়াছে—

উত সখাস্যশ্বিনোরুত মাতা গবামসি॥
উতোষো বস্ব ঈশিষে॥ (৪।৫২।৩)

অশ্বীদের বান্ধবী তুমি, আলোকের জনয়িত্রী তুমি, ঐশ্বর্যপ্রদায়িনী তুমি, তোমাকে জানাই আমাদের হৃদয়ের আন্তরিক শ্রদ্ধা।

পৃথিবীর বক্ষে সুখে কালাতিপাত করিতে হইলে প্রয়োজন কিছু পার্থিব সম্পত্তির। জননীর কাছে সন্তান সেই সম্পত্তি যাচ্ঞা করিতে কুণ্ঠিত হইত না। প্রত্যেক দেবতার কাছে আর্যগণ সরল প্রাণে দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সাধারণ সামগ্রী প্রার্থনা করিতেন। ধন, কীর্তি, পুত্র সকলই নিঃসঙ্কোচে উষাদেবীর কাছে চাহিতেন।

রয়িং দিবো দুহিতরো বিভাতীঃ॥
প্রজাবন্তং যচ্ছতাস্মাসু দেবীঃ॥ (৪।৫১।১০)
বয়ং স্যামযশসো জনেষু। (৪।৫১।১১)

—দ্যুলোকদুহিতা আমাদের উপর আলোক বিকিরণ কর, আমদের ধন ও বীর্যশালী পুত্র দান কর। লোকজগতে আমরা যেন প্রসিদ্ধি লাভ করি।

গীতি-কবিতার উদ্ভব পরবর্তী যুগে হইলেও ঋগ্বেদের ভিতর এমন কবিতা আমরা পাই যেখানে লিরিকের সুরটি আমাদের চিত্তকে সরস করিয়া তোলে। উষার উদ্দেশে রচিত স্তোত্রগুলি ভাবালালিত্যে ও ভাবমাধুর্যে অতুলনীয়, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে তাহারা সমুজ্জ্বল। দীপ্তিময়ী শুভ্রতেজোবসনা উষাদেবীর স্বরূপটি

পরিস্ফুটভাবে প্রকাশিত করিবার জন্ত সেই স্মরণাতীত যুগে রচয়িতাগণ সার্থক উপমা, রূপক প্রভৃতি অলঙ্কারের সাহায্যে একদিকে যেমন সূক্তগুলির বাহ্যিক সৌন্দর্য বর্ধন করিয়াছেন, তেমনি অন্তদিকে ভাবসম্পদকে গভীর করিয়া তুলিয়াছেন—

বহন্তি সীমরুণাসো রুশন্তো গাবঃ সুভগামুর্বিয়া প্রথানাং।

অপেজতে শূরো অস্তেব শত্রূন্ বাধতে তমো অজিরো ন বোল্হা॥ (৬।৬৪।৩)

অরুণোজ্জ্বল গোসমূহ সুদূরপ্রসারিণী সৌভাগ্যময়ী উষাদেবীর বাহক। সাহসী ধানুষ্কের ন্যায় তিনি শত্রুদের ধ্বংস করেন ও সুদক্ষ যোদ্ধার ন্যায় অন্ধকার অপসারিত করেন।

প্রতি ভদ্রা অদৃক্ষত গবাং সর্গা ন রশ্ময়ঃ॥
ওষা অপ্রা উরু জ্রয়ঃ॥ (৪।৫২।৫)

পূতরশ্মিগুলি যেন বারিধারার ন্যায় নামিয়া আসে ধরণীর বক্ষে; উষাদেবী পর্যাপ্ত আলোকে সমগ্র জগৎ পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

উষাস্তোত্রের অনেক স্তবকেই লিরিক উচ্ছ্বাস দেখা যায়। সহজ সরল শব্দের দ্বারা ভাবের সূক্ষ্ম চারুত্ব বিকশিত হইয়াছে; বিচিত্ররমণীয় প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা ভাবগভীরতা প্রকাশিত হইয়াছে—

উষো দেব্যমর্ত্যা বিভাহি
চন্দ্ররথা সূনৃতা ঈরয়ন্তী॥
আ ত্বা বহন্তু সুযমাসো অশ্বা
হিরণ্যবর্ণাং পৃথুপাজসো যে॥ (৩।৬১।২)

—শক্তিরূপিণী তেজোময়ী দেবী তুমি, মৃত্যুর অধীন নও তুমি, তোমার স্বর্ণরথ সুদৃঢ় অশ্বগণ সুষ্ঠুভাবে বহন করুক, হে সত্যের পূজারিণী, আলোকরাশিতে সর্বস্থান পরিপূর্ণ কর।

আদিম যুগের সরলতা, উচ্চ মনোভাব আজ অপসৃতপ্রায়। যে সুখ-শান্তির অধিকারী ছিলেন আর্যগণ, আমরা সেই অনাবিল আনন্দের সন্ধান আজ কেন পাই না? হিংসা, দ্বেষ, কলুষতা, কালিমায় জগৎ পূর্ণ, এক জাতির সহিত অপর জাতির যে মৈত্রীবন্ধনের সূত্র তাহা শিথিল হইতে চলিয়াছে; অবিশ্বাস ও সন্দেহের কালোছায়া সকলের মনকে আবৃত করিতেছে। সমবেতভাবে উদাত্তকণ্ঠে শান্তি-কামনায় আর্য ঋষিদের ন্যায় সরলপ্রাণে আজ আমাদের গাহিতে হইবে—

যবয়দ্দ্বেষসং ত্বা চিকিত্বিৎ সূনৃতাবরি॥
প্রতি স্তোমৈরভুৎস্মহি॥ (৪।৫২।৪)

—সত্যের প্রতিমূর্তি তুমি, হে উষাদেবী, দ্বেষ-হিংসার প্রতিরোধকারিণী তুমি, জ্ঞান-প্রদায়িনী তুমি, আমাদের চিত্তে জাগ্রত হও।

কোথায় তুমি?

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

কেউ বা দেখি গুরুর কাছে
তোমার তত্ত্ব বুঝতে যায়।
কেউ বা নানান শাস্ত্র ঘেঁটে
তোমার স্বরূপ খুঁজতে চায়।
কেউ বা খুঁজে মঠ-দেউলে,
তীর্থে-তীর্থে কেউ বা বুলে,
সোনা ফেলি অঞ্চলেতে
গিরা তারা বাঁধ্‌ছে হায়।
তোমার আকাশ তোমার বাতাস
তোমার গ্রহ চন্দ্র তারা,
তোমার ভূধর তোমার সাগর
তোমার কানন নদীর ধারা,
তোমার কথাই কয় যে নিতি,
গাইছে তব প্রণব-নীতি।
একি শুধু কথার কথা
কেবল কবির কল্পনায়?
প্রতিক্ষণই দেখছি আমি
আছ তুমি ভুবন ছেয়ে।
নিশায় দেখি কোটি তারায়
আমার পানে রইছ চেয়ে।
সংজ্ঞা যদি না হয় তবু
নারি তোমায় চিন্‌তে প্রভু,
শাস্ত্র, গুরু, দেব্‌তা কারো
সাধ্য ত নাই, সাধব কা'য়?

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

(এক)

বিশ্বাসী ভক্ত যদু

স্বামী ঈশানানন্দ

জয়রামবাটীতে তখন রাধুর বিবাহ উপলক্ষে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজ, যোগেন মা, গোলাপ মা ও কয়েক জন ব্রহ্মচারীও রহিয়াছেন। বিবাহান্তে বরকনে বিদায় লইল। পূজনীয় শরৎ মহারাজও অনেকটা নিশ্চিন্ত। মাঝে মাঝে সকলকে লইয়া নানারূপ আমোদ করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় মুহুর্মুহু বজ্রপাতসহ মুষলধারে বৃষ্টি হইতেছে। যদু নামক একটি ব্রহ্মচারী পূজনীয় শরৎ মহারাজকে তামাক দিবার জন্য আসিলে তিনি তাহাকে বলিলেন,—যোদো, এই সময় যদি ১০৮টি 'পদ্মো' (ছেলেটি পদ্ম উচ্চারণ করিতে পারিত না। বলিত 'পদ্মো') এনে মার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে পারিস, তা হলে তাঁর অশেষ করুণা ও কৃপা লাভ করতে পারবি এবং তোর নিত্য 'পদ্মো' দিয়ে পূজা করা এক দিনেই সার্থক হবে। জানবো তোর কেমন ভক্তি ও উৎসাহ।

বলা বাহুল্য, পূজনীয় শরৎ মহারাজ রহস্য করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মচারী যদু রাধুর বিবাহের কয় দিন জলকাদা উপেক্ষা করিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম করিত এবং উহারই মধ্যে দৈনিক নিয়মিত কয়েকটি পদ্ম আনিয়া মার চরণে দিয়া প্রণাম করিত। যদু কিন্তু পূজনীয় শরৎ মহারাজের এই কথা শুনিবামাত্র এক লাফে পদ্মের সন্ধানে বাহির হইয়া গেল। দারুণ প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা ভাবিয়া পূজ্যপাদ মহারাজ অতিশয় ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া —ও যোদো, ও যোদো, যোদো ফিরে আয়, বলিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন এবং অবশেষে দাঁড়াইয়া পড়িলেন। কিন্তু তখন কে কার কথা শোনে! যদু কিছুতেই ফিরিয়া আসিল না। আমি সেই সময় মায়ের নিকট বারান্দায় বসিয়া আটা মাখিতেছি। ঘণ্টাখানেক পরে মা কাজকর্ম শেষ করিয়া ঘরের মধ্যে তক্তাপোষের উপর পা দুটি ঝুলাইয়া একটু বসিয়া রহিয়াছেন, এমন সময় প্রায় মাইল খানেক দূরের মাঠের পুকুর হইতে ১০৮টি পদ্ম তুলিয়া লইয়া সেই অন্ধকারের মধ্যে বৃষ্টিতে ভিজিতে ভিজিতে যদু হাজির!—আসিয়া পদ্মগুলি মায়ের চরণ-দুটিতে দিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। মা সকল কথাই অন্যের মুখে শুনিলেন, মুখে কিছুই বলিলেন না—কেবল হাত দুটি যদুর মাথায় রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন। পূজনীয় মহারাজও বিশেষ আর কিছু বলিলেন না, কেবল, —যাঃ, তাঁর যা ইচ্ছা তাই হবে, অসুখবিসুখ কিছু করে না বসে বাঙ্গাল—বলিয়া গম্ভীর হইয়া রহিলেন। শুনিয়াছিলাম ইহার কিছুকাল পরেই যদু ম্যালেরিয়াতে আক্রান্ত হইয়া অল্প কয়েক দিন উহাতে ভুগিয়া কনখল সেবাশ্রমে সজ্ঞানে শরীর ত্যাগ করে।

(দুই)

আমার প্রথম মাতৃদর্শন

শ্রীমতী—

আমার স্বামী যখন আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া যান তখন আমার বয়স ষোল সতেরো।

মা তখন রহিয়াছেন বাগবাজারে তাঁহার জন্য নির্ম্মিত বাড়ীতে—(উদ্বোধন কার্যালয়)। একদিন অপরাহ্নে ঐ বাড়ীতে পৌঁছিয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলাম; আমার স্বামী 'মা' বলিয়া ডাকিতে মা সহাস্যে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ইহার কিছুদিন পুর্বে স্বামী একদিন শ্রীশ্রীমায়ের নিকট গিয়াছিলেন; শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহাকে বলিয়া দেন,—বউমাকে একদিন এনো। মায়ের আদেশ মতই স্বামী আমাকে লইয়া গিয়া মাতৃপদে সঁপিয়া দিলেন। স্নেহময়ী মা হাস্যমুখে আমায় গ্রহণ করিলেন—আমি তাঁহার শ্রীচরণে প্রণত হইলাম। মা সাদরে আশীর্বাদ করিলেন। স্বামী আমায় কৃপা করিবার কথা জানাইলে করুণাময়ী মা দিন স্থির করিয়া দিলেন,—রথের দিন—দ্বিতীয়া তিথি, এনো, সেদিন দীক্ষা দেবো। ক্রমে রথযাত্রা আসিয়া পড়িল। সকাল বেলা স্বামী আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট লইয়া গেলেন। মা আমাকে ঠাকুর-ঘরে লইয়া গিয়া দীক্ষা দিলেন। আমি ধন্য হইলাম। তারপর তাঁহার কাছে বসিয়া প্রসাদ পাইবার পর গৃহে ফিরিয়া আসিলাম।

শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিতে ইচ্ছামত যাইতে পারিতাম। কিন্তু বাড়ীতে ছিল অনেক বাধা-বিঘ্ন। তাই যখন 'উদ্বোধনে' যাইতাম অনেক কষ্টেই যাইতে হইত। একদিন শ্রীশ্রীমাকে পূজা করিবার প্রবল ইচ্ছা মনে জাগিল। পূজার কিছু উপচার জোগাড় করিয়া আমার স্বামীর সহিত সকাল বেলা বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলাম। মা তখন গঙ্গাস্নানে গিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া আমার সাধ জানিয়া সহাস্যে আসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহার শ্রীপদকমলে ফুল দিয়া প্রাণ ভরিয়া পূজা করিলাম। আমার বয়স তখন অল্প—বুদ্ধিশুদ্ধি তত ছিল না। মায়ের অভয় চরণ হৃদয়ে ধারণ করিবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা হইল। মাকে কিছু না জানাইয়াই তাঁহার পা দুটি পরমাগ্রহে বক্ষে তুলিয়া লইলাম। মা হেলিয়া পড়িলেন। মনে ভীষণ লজ্জা হইল, আর মুখ তুলিতেই পারি না। মায়ের মুখ অপার স্নেহের হাসিতে ভরিয়া গেল। গোলাপ মা, যোগেন মা সকলেই হাসিয়া উঠিলেন। মা বলিলেন—বড় ছেলেমানুষ···। অতঃপর প্রসাদ পাইতে বসিলাম। লম্বা ঘরের কোণের দিকে মা নিজে খাইতে বসিতেন। আমরা সকলে এ পাশে বসিতাম। পরিবেশন করিতেন গোলাপ মা, যোগেন মা। মা নিজে একটু প্রসাদ করিয়া ওঁদের হাতে দিতেন, তাঁহারা সেইটি আমাদের সকলকে ভাগ করিয়া দিতেন। সে সময়ে আমি সব জিনিষ খাইতাম না। তাই একবার কি একটি জিনিষ আমি খাই নাই—তজ্জন্য গোলাপ মার কাছে বেশ বকুনি খাইতে হইয়াছিল। তিনি বলিলেন,—বৌমা, তুমি ওটা ফেলে দিয়েছ, দেখে এসো মার ছেলেকে—পাতে একটাও দানা নেই···!

এইরকম আমি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট যাইতাম,

কখনও সকালবেলা, কখনও বা আমার স্বামীর সঙ্গে নতুবা গৌরমাকে সঙ্গে লইয়া। তবে বেশীর ভাগ দিনই সঙ্গী পাইতাম ডাক্তার শশীবাবুর স্ত্রীকে। সকালবেলা মায়ের বাড়ী যাইলে দেখিতাম মা প্রসাদ ভাগ ভাগ করিয়া নিজেই ছেলেদের পাঠাইতেন, আমাদেরও দিতেন। তাঁহার কাছে যখনই গিয়াছি, বেশী কথা বলিতে পারিতাম না। মা আর পাঁচ জনের সহিত কথা কহিতেন—আমি তাহাই শুনিতাম। তবে কখনও কখনও মাকে একটু বাতাস করিতাম কিংবা পায়ে হাত বুলাইয়া দিতাম। একদিন কেবল তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, —মা, আমি ত নিত্যপূজা কিছু করি না, আমাকে বলিয়া দিন। মা আমাকে একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা দিয়া বলিয়াছিলেন,—মা, তুমি কচিকাচার মা, পূজো করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়, তোমার যে মালা দিয়েছি ঐ জপ কর আর স্মরণ-মনন রাখ, তাহলেই হবে। পূজার ইচ্ছে হয়, আমার ছেলের কাছে জেনে নিও।

মায়ের যখন শেষ অসুখ, স্বামী আমাকে তাঁহাকে দেখিতে লইয়া যান নাই; বলিলেন,—ডাক্তারে নিষেধ করিয়াছে, সুতরাং যাওয়া হইবে না। কাজেই শেষে আর মায়ের দর্শনলাভ করিবার ভাগ্য হইল না।

কঠোপনিষৎ

(পূর্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

প্রথম অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

যে দু'জনে* কর্মলোকে করিয়া থাকেন
স্বকর্মের ফল-রস-পান
এবং পরম লোকে বুদ্ধির গুহায় পশি'
পান যাঁরা ব্রহ্মের সন্ধান
ছায়াতপ সম বলি তাঁহাদের করেন বর্ণন
ব্রহ্মজ্ঞগণ,
কিম্বা যাঁরা পঞ্চ-অগ্নি-সেবী,
কিম্বা যাঁরা নাচিকেত তিনবার করেন চয়ন॥১॥

জানিয়াছি স্বরূপ তাহার
যাজ্ঞিকের সেতুরূপ সেই নাচিকেত অগ্নি
অক্ষর পরম ব্রহ্ম, তিতীর্ষুর অভয়ের পার॥২॥

আত্মাই রথী জেনো, শরীর সে রথ
বুদ্ধি সারথি তার, মন বল্গা-বৎ॥৩॥

ইন্দ্রিয়েরা অশ্বসম; তাহাদের গ্রাহ্য যাহা
মনীষীরা তাহাকেই বিষয় কহেন,
ইন্দ্রিয় ও মনোযুক্ত আত্মাকে তাঁহারা
ভোক্তা নাম দেন॥৪॥

বিজ্ঞানবিহীন যারা অশান্ত অধীর
ইন্দ্রিয় তাদের বশে থাকে না কখনও
দুষ্ট অশ্ব যেন সারথির॥৫॥

* জীব ও ঈশ্বর: জীবই কর্মফল ভোগ করে, কিন্তু ঈশ্বরকেও (পরমাত্মাকেও) এখানে ফল-ভোক্তা বলা হইয়াছে, সম্ভবতঃ জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঘনিষ্ঠতা বুঝাইবার জন্য।

পরন্তু যে বিজ্ঞানীর চিত্ত ধীর স্থির
ইন্দ্রিয় তাহার বশে থাকে সর্বদাই
বাধ্য অশ্ব যেন সারথির ॥ ৬ ॥

জ্ঞানহীন অসংযত অপবিত্র সদা চিত্ত যার
সেই পদ পায় না সে সংসারেতে অধোগতি তার ॥৭॥

জ্ঞানী ও সংযত যিনি, চিত্ত যাঁর পবিত্র সদাই
সেই পদ পান তিনি যাহা হ'তে পুনর্জন্ম নাই ॥ ৮ ॥

বিজ্ঞান সারথি যাঁর ধৃত-বল্‌গা-মন
সকল পথের পার বিষ্ণুর পরমপদ লভেন সে জন ॥৯॥

ইন্দ্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ ভোগ্য বিষয়েরা
ভোগ্য বিষয় হ'তে উচ্চতর মনের সম্মান
মন হতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হতে আরও শ্রেষ্ঠ
আত্মাই মহান ॥ ১০ ॥

সে মহান হ'তে শ্রেষ্ঠ অব্যক্ত পরম
পুরুষ তাহ'তে শ্রেষ্ঠ, তাই শ্রেষ্ঠ অতি
পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছু নাই
ওই শেষ ওই পরাগতি ॥ ১১ ॥

নাহি এঁর আত্মপ্রকাশ সর্বভূতে ইনি সুগোপন
সূক্ষ্মদর্শীর সূক্ষ্ম একাগ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হন ॥১২॥

প্রাজ্ঞেরা মনের মাঝে বাক্যেরে করেন সংহরণ
আত্মজ্ঞানে মন
আত্মজ্ঞান মহাজ্ঞানে বিলীন করিয়া
মহাজ্ঞান শান্তি মাঝে করেন অর্পণ ॥১৩॥

ওঠ, জাগো আপনারে হও অবগত
লাভ করি বরণীয়তম
সে পথ দুর্গম অতি কবিরা বলেন
তীক্ষ্ণীকৃত ক্ষুরধারা সম ॥ ১৪ ॥

শব্দহীন স্পর্শহীন অরূপ অব্যয়
অরস অগন্ধ নিত্য অনাদি অনন্ত যিনি বুদ্ধির অতীত
মৃত্যুমুখ হ'তে মুক্তি লভয়ে সে জন
সে ধ্রুবকে জানে যে নিশ্চিত ॥ ১৫ ॥

মৃত্যু-উক্ত নাচিকেত এই উপাখ্যান
বলিয়া বা করিয়া শ্রবণ
মেধাবীরা ব্রহ্মলোকে মহীয়ান হ'ন ॥ ১৬ ॥

অতি গুহ্য এই উপাখ্যান
ব্রাহ্মণ-সমাজে যিনি শুদ্ধচিত্তে শ্রাদ্ধকালে শ্রবণ করান
অনন্ত ফলের তিনি অধিকার পান ॥ ১৭ ॥

"উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্বলতা পরিত্যাগ কর। মানুষ কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করে, মানবের দুর্বলতা কি নাই? উপনিষদ্ বলেন, আছে বটে, কিন্তু অধিকতর দুর্বলতা দ্বারা কি এই দুর্বলতা দূর হইবে? ময়লা দিয়া কি ময়লা দূর হইবে? পাপের দ্বারা কি পাপ দূর হইবে? উপনিষদ্ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর। জগতের সাহিত্যের মধ্যে কেবল ইহাতেই 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে—আর কোন শাস্ত্রে ঈশ্বর বা মানবের প্রতি 'অভীঃ'—'ভয়শূন্য' এই বিশেষণ প্রযুক্ত হয় নাই।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সারনাথ

শ্রীঅক্ষয়কুমার রায়

সে-বার বারণসীধামে কিছুদিন অবস্থানের সময় প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ সারনাথ-দর্শনের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন দ্বিপ্রহরে বেলা দুই ঘটিকার সময় টাঙ্গায় চড়িয়া গোধূলিয়া হইতে সারনাথ অভিমুখে যাত্রা করিলাম। শহরের সীমানা ছাড়াইয়া একটি তিন্তিড়ী-আম্র-নিম্বাদি বৃক্ষের ছায়া-মণ্ডিত রাস্তা ধরিয়া টাঙ্গা দুই ঘণ্টা চলিবার পর সারনাথের উচ্চ স্তূপ ও নবনির্মিত বৌদ্ধমন্দিরের সমুন্নতশীর্ষদেশ আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল।

সারনাথ বারাণসী হইতে প্রায় চারিক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। সারনাথের অপর নাম মৃগদাব। 'সারঙ্গনাথ' শব্দের অপভ্রংশ সারনাথ। সারঙ্গনাথ অর্থে হরিণের রাজা। কথিত আছে, উক্ত অরণ্যময় স্থানে বুদ্ধদেব পূর্বজন্মে মৃগরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং স্বয়ং মৃগরাজ হইয়া অন্যান্য হরিণ সহ বনে বিচরণ করিতে থাকেন। একদা কাশীরাজ মৃগয়া-ব্যপদেশে তথায় আগমন করিয়া বনের বহু মৃগ বধ করেন। তখন রাজার সহিত এই চুক্তি হইল যে, প্রত্যহ এক একটি হরিণ স্বেচ্ছায় তাঁহার নিকট প্রাণদানার্থ উপস্থিত হইবে, আর রাজাও মৃগয়ার জন্য আর কোন দিন বনে আসিবেন না। একদিন এক আসন্নপ্রসবা হরিণীর পালা আসিলে মৃগরূপী বুদ্ধ উহার দুঃখে ব্যথিত হইয়া তৎপরিবর্তে স্বয়ং রাজসকাশে গমন করিলেন। এই অপূর্ব হরিণটি দেখিবামাত্র কাশীরাজ চমকিত হইয়া উঠিলেন। মৃগরাজের মুখে তদীয় আত্মত্যাগের কাহিনী শুনিয়া রাজা নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তিনি দয়াপরবশ হইয়া উহাকে যাইতে দিলেন এবং তদবধি মৃগয়া পরিত্যাগ করিলেন। ইহাই সারনাথের প্রাচীন উপাখ্যান। আবার সারঙ্গনাথ বুদ্ধদেবেরও অপর নাম। হরিণ তাঁহার বড় প্রিয় ছিল বলিয়া তিনি এই আখ্যা লাভ করেন।

প্রাচীন কাশী বর্তমান নগরীর মত জাঁক-জমক-পূর্ণ না হইলেও উহা শিক্ষার কেন্দ্রস্থল ছিল; ঋষি ও পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে অধ্যাপনা করিতেন। উহার কোন অংশে যোগি-তপস্বীর বাস ছিল। তৎকালে কাশ্মীরের ন্যায় এস্থানও সংস্কৃত চর্চার জন্য বিখ্যাত ছিল। এই পবিত্র কাশীর এক অঞ্চলের নাম ঋষিপত্তন। পালি ভাষায় উহাকে 'ইসিপতন' বলা হয়। ঋষিপত্তনের সাধারণ অর্থ ঋষিদের বাসস্থান। কাশীর বর্তমান নাম বারাণসী; গঙ্গার উপনদী অসী ও বরুণার মধ্যস্থলে অবস্থিত বলিয়া কাশী এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। ঋষিপত্তনের একাংশে বা সন্নিকটে উক্ত মৃগদাব বা হরিণের উদ্যান অবস্থিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বুদ্ধগয়ায় আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া তথাগত প্রথমে এই মৃগদাব বা সারনাথে আগমন করিয়া ধর্মপ্রচার করেন; তাই এই স্থানের এত প্রসিদ্ধি। বৌদ্ধ গ্রন্থে উল্লেখ আছে প্রাচীন কাশী নগরী সারনাথে অবস্থিত ছিল। উহা বর্তমান শহর হইতে ৩½ মাইল দূরে স্থিত। তথায় অনেক ধ্বংসাবশেষও পাওয়া গিয়াছে।

সারনাথ এক অনুচ্চ শৈলের উপর প্রায় দুই বর্গমাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ছিল। পুণ্যতোয়া

বরুণা উহার দক্ষিণ প্রান্ত বিধৌত করিয়া প্রবাহিতা। আমরা ফুল্লচিত্তে ও সসম্ভ্রমে এই পুণ্যভূমিতে পদক্ষেপ করিতে লাগিলাম। প্রাচীন কালে এস্থানে কত স্তূপ, কত স্তম্ভ, কত মঠ, কত বিহার অবস্থিত থাকিয়া তথাগতের অপার মহিমা প্রচার করিত, সর্বধ্বংসী কালের কুটিল-চক্রে লুণ্ঠনকারীর অস্ত্রাঘাতে আজ সে-সকল ভগ্নস্তূপে পরিণত।

বারাণসীর শ্রেষ্ঠী নন্দীয় বুদ্ধদেব ও তদীয় শিষ্যবর্গের জন্য ঋষিপত্তনে এক বিহার নির্মাণ করেন। তথায় অপর একটি বিহারও বর্তমান ছিল। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সারনাথ বৌদ্ধধর্মানুশীলন ও জ্ঞান-চর্চার প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল। শ্বেত হুনাদি বৈদেশিক জাতির আক্রমণের ফলে সারনাথের বৌদ্ধ বিহার কয়েকবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে বিধ্বস্ত বিহারের উপর আবার নূতন বিহার নির্মিত হইয়াছে, নূতন মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গজনীর সুলতান মামুদের আক্রমণের ফলেও সারনাথ একবার ভগ্নস্তূপে পরিণত হয়। সর্বশেষে দ্বাদশ শতাব্দীতে মোহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি কুতব-উদ্দিনের নির্মম আক্রমণের ফলে বৌদ্ধকীর্তি নিশ্চিহ্নপ্রায় হয়। সারনাথ বিস্মৃতির অতল সলিলে নিমগ্ন হয়। বহুকাল এই অতুল কীর্তি মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত ছিল। দৈবক্রমে ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই ধ্বংসস্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্যার আলেকজাণ্ডার কানিংহাম ইহার কিয়দংশ খননের পর তত্ত্বানুসন্ধানে মনোযোগী হন। মাত্র ১৯০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জনের আনুকূল্যে সারনাথের ভূগর্ভস্থিত ধ্বংসাবশেষের খননকার্য আরম্ভ হয়। অদ্যাপি উহার সকল স্থান খোঁড়া হয় নাই। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে খননকার্য বন্ধ হয়।

খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন সারনাথে চারিটি বৃহৎ স্তূপ এবং দুইটি বিহার দেখিতে পান। কোন হিন্দুদেবতার মন্দির তৎকালে তথায় ছিল না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ সারনাথে আসিয়া তথায় ত্রিশটি সঙ্ঘারাম, প্রায় তিন সহস্র ভিক্ষু এবং শতেক হিন্দুদেবালয় দেখিতে পান। ইহা বৌদ্ধধর্মের উপর ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাবের পরিচায়ক। শেষ মুসলমান আক্রমণের পরও দুই তিনটি ভগ্নদশাগ্রস্ত অট্টালিকা ঐ ধ্বংস কার্যের নীরব সাক্ষ্যস্বরূপ কিছুদিন বিদ্যমান ছিল। ইহাই সারনাথের প্রাচীন ইতিহাস।

খননকার্যের ফলে যে সকল স্থান উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে তাহা আমরা সবিস্ময়ে ও সূক্ষ্মভাবে দর্শন করিতে লাগিলাম। কোথায় কোন্ মঠ ও বিহার, স্তূপস্তম্ভাদি ছিল পরিচয়ফলকে তাহা উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। কোন্ বিহার বা মঠ-মন্দির কোন যুগের তাহা ঐতিহাসিকগণের গভীর গবেষণার বিষয়। আমরা উহাদের অবস্থান স্থল ও ধ্বংসচিহ্নাদি বিস্ময়নেত্রে অবলোকন করিতে লাগিলাম, লর্ড কার্জনের নির্দেশক্রমে এস্থানের আবিষ্কৃত নিদর্শন সমূহ যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া সারনাথের মিউজিয়ম রচিত হইয়াছে।

ধ্বংসাবশেষের মধ্যে প্রথমেই এক ধ্বংসপ্রাপ্ত বিহারের কক্ষ সমূহের ভিত্তি আমাদের নয়ন পথে পতিত হয়। উহা অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হইয়াছিল। ১৮৫১ খৃঃ ইহার আবিষ্কার হয়। হিউয়েন সাঙের লিখিত বিবরণে সারনাথের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত দুইশত ফুট উচ্চ শিল্পনৈপুণ্যপূর্ণ পিত্তলচূড়া-বিশিষ্ট একটি গোলাকার মন্দিরের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে বুদ্ধদেবের দেহের সমায়তন একটি সুবর্ণময় বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। মন্দিরের প্রধান দ্বারের সম্মুখভাগে একটি শতস্তম্ভযুক্ত বিরাট প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। উহাতে এক সময় তিনসহস্র বৌদ্ধ সন্ন্যাসী প্রাতঃসন্ধ্যায় উপাসনারত থাকিতেন। উক্তমন্দিরের সামান্য নিদর্শন ও স্তম্ভসমূহের চিহ্ন

এখনও বর্তমান আছে। উহাই সারনাথের প্রাচীনতম মন্দির। মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের সম্মুখভাগে প্রায় আটফুট উচ্চ ভগ্ন অশোকস্তম্ভ অদ্যাপি বর্তমান। সমগ্র স্তম্ভটির উচ্চতা প্রায় পঞ্চান্ন ফুট ছিল। উহা চুণাপাথরে প্রস্তুত অতিমসৃণ এক-হস্ত উচ্চ লৌহনির্মিত মুলভিত্তির উপর স্থাপিত। ঐ স্তম্ভের শিরোভাগে চতুর্দিকে নিবদ্ধদৃষ্টি গম্ভীরাকৃতি লৌহনির্মিত চারিটি সিংহের দেহের সম্মুখভাগ একত্র সংস্থাপিত ছিল। উহাদ্বারা বৌদ্ধসঙ্ঘের মহিমা এবং অহিতকারী ব্যক্তি-বর্গের প্রতি সতর্কবাণী বিঘোষিত হইত। সিংহ-চতুষ্টয় গোলাকৃতি সমুন্নত প্রস্তর ফলকের উপর দণ্ডায়মান। ফলকের গাত্রদেশে চক্রাকারে ধাবমান সিংহ, অশ্ব, হস্তী ও বৃষের মূর্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে। দুই দুইটি প্রাণি-মূর্তির মধ্যস্থলে এক একটি ধর্মচক্র বর্তমান। এই চক্রগুলি একযোগে পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যু ও সংসারের অনিত্যতা প্রকাশ করিতেছে। সিংহমস্তক-যুক্ত প্রস্তরটি আবার একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের উপরিভাগে অবস্থিত। পদ্মের পাপড়িগুলি ভাঁজ করিয়া নিম্ন-মুখ করিয়া নির্মিত হইয়াছে। অশোকস্তম্ভের এই সিংহসমন্বিত শিরোভাগ অধুনা সারনাথের মিউজিয়মে সুরক্ষিত হইয়া দর্শকগণের মহা-আকর্ষণের বস্তু হইয়া রহিয়াছে। সিংহমস্তকের উপরিভাগে যে বৃহৎ ধর্মচক্র অবস্থিত ছিল তাহা খণ্ডিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। খননকালে সমগ্র অশোকস্তম্ভটিও খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। উক্ত সুমসৃণ সিংহমূর্তি-চতুষ্টয় সেই যুগের অপূর্ব শিল্পনৈপুণ্যের ও রসায়ন বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক। অদ্যাপি সেই লৌহের মসৃণতা অমলিন রহিয়াছে। পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সিদ্ধিলাভ করিয়া বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম সারনাথে তাঁহার বাণী ঘোষণাপূর্বক নবধর্ম প্রচার করেন। এই নূতন ধর্ম প্রবর্তনকে ধর্মচক্র প্রবর্তন বলা হয়। উক্ত সিংহমূর্তি ও ধর্মচক্র তাহারই প্রতীক। প্রাচীন প্রস্তর-লিপিতে ধর্মচক্র বা সদ্ধর্মচক্র বিহারের নাম উল্লিখিত আছে। সম্ভবতঃ পরবর্তীকালে উহাই সারনাথ নামে অভিহিত হয়। সম্প্রতি ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকায় উক্ত ধর্মচক্র বা অশোকচক্র শোভা পাইতেছে।

খননের ফলে এস্থান হইতে মৌর্য ও সুঙ্গ যুগের বহু জীবমূর্তি ও নরমূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সারনাথের উত্তরভাগে ক্ষুদ্র বৃহৎ বিবিধ স্তূপ ও স্তম্ভ দৃষ্টিগোচর হয়। একটি বৃহৎস্তূপ কাশীরাজ চৈৎ সিংহের দেওয়ান জগৎসিংহ বিধ্বস্ত করিয়া উহার ইষ্টকাদি দ্বারা ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে বারাণসীতে জগৎগঞ্জ নামক বাজার নির্মাণ করিয়া স্বীয় কীর্তি ঘোষিত করেন। উক্ত স্মৃতিস্তম্ভের ব্যাস ১১০ ফুট ছিল। এই উচ্চ ভূমিতে মহারাজ অশোক-নির্মিত বিখ্যাত ধর্মরাজিকা স্তূপ ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। জগৎসিংহ তন্মধ্যে দুইটি মর্মর প্রস্তর ও চুণাপাথরের পাত্র এবং ১০৮৩ সম্বতের বুদ্ধমূর্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মর্মর কৌটায় যে দেহাস্থি পাওয়া গিয়াছিল, তাহা বুদ্ধ-দেবের অস্থি বলিয়া মনে করা হয়। পূর্বোক্ত স্তূপের নিকটেই কান্যকুব্জের বৌদ্ধধর্মাবলম্বিনী রাজ্ঞী কুমারদেবী কর্তৃক আটশত ফুট দীর্ঘ একটি বৌদ্ধমঠ নির্মিত হইয়াছিল; উহা 'ধর্মচক্র-জিন-বিহার' নামে অভিহিত। এই বিহারের পশ্চিমদিকে একটি পরিচ্ছন্ন ভূগর্ভস্থ দীর্ঘপথ রহিয়াছে। উহার উপরিভাগ 'গ্রানাইট' নামক স্ফটিক প্রস্তরে আবৃত। পথের অভ্যন্তরস্থিত প্রাচীরে কিয়দ্দূর অন্তর অন্তর এক একটি প্রস্তর-প্রদীপ স্থাপিত। ঐ পথ মন্দির পর্যন্ত গিয়াছে। রাণী বিহার হইতে উক্ত গুপ্তপথে মন্দিরে গমনাগমন করিতেন বলিয়া অনুমিত হয়। এই সম্বন্ধে আবার প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সন্দেহও প্রকাশ করিয়া থাকেন, কারণ কুমারদেবী-

বিনির্মিত বিহার দাক্ষিণাত্যস্থিত মন্দিরের স্থাপত্য-পদ্ধতিতে নির্মিত হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। উহার ধ্বংসস্তূপের মধ্যে যে দুইটি স্ত্রী-মূর্তি পাওয়া গিয়াছে তাহাও মিউজিয়মে স্থানলাভ করিয়াছে; কিন্তু উহা কোন্ দেবতার মূর্তি তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।

প্রধান মন্দির কেন্দ্রস্থলে রাখিয়া চারিদিকে কয়েকটি বিহার নির্মিত হইয়াছিল। এ পর্যন্ত সাতটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে। আরও কত বিহার যে ভূগর্ভে বিধ্বস্ত অবস্থায় পতিত আছে তাহা কে বলিবে!

সারনাথের ভূগর্ভ হইতে বুদ্ধদেবের প্রায় দশফুট উচ্চ একটি দণ্ডায়মান মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়া মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে। উহার মস্তকের উপর দশফুট ব্যাস বিশিষ্ট প্রস্ফুটিক পদ্মাকৃতি একটি সুশোভন ছত্র স্থাপিত ছিল। উহা মিউজিয়মে রহিয়াছে। এই ছত্রযুক্ত বুদ্ধমূর্তি সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে নির্মিত হয়। উৎকীর্ণ-লিপিতে লিখিত আছে: সকল জীবের কল্যাণ ও সুখের জন্য এই বোধিসত্ত্ব-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

আমরা অতঃপর ধামেকস্তূপ দর্শন করিলাম। ধামেকস্তূপ শব্দ ধর্মমুখস্তূপ শব্দের সংক্ষিপ্তাকার। উহা গুপ্তযুগের কোনও রাজা কর্তৃক ভাবী-বুদ্ধ মৈত্রেয়ের সম্মানার্থ নির্মিত হইয়াছিল। শেষ মুসলমান আক্রমণের সময়েও উহা বিধ্বস্ত হয় নাই, কিন্তু উহার সুদৃশ্য প্রস্তরসমূহ যে, লুণ্ঠিত হইয়াছে তাহার চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান। কোনও কোনও শূন্যস্থানে সাধারণ প্রস্তর স্থাপিত হইয়াছে। লোহার পাতে বড় বড় প্রস্তরগুলি দৃঢ়সংবদ্ধ না থাকিলে হয়ত এই স্তূপ কোন্ দিন কেহ বিধ্বস্ত করিয়া প্রাসাদের কাজে লাগাইত। খননকালে উক্ত স্তূপের নিকট হামান দিস্তা ও উহার দণ্ড পাওয়া গিয়াছে। তদ্দ্বারা ইহাই অনুমিত হয় যে, ঐ-স্থানে একটি চিকিৎসালয় স্থাপিত ছিল। বুদ্ধদেবের কালের এই একটি মাত্র স্তূপ ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে; উহা তীর্থযাত্রীর পূজা পাইয়া থাকে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত চিন্তাকুলচিত্তে ধ্বংসস্তূপ-রাশি দর্শনের পর আমরা নিকটবর্তী একটি সঙ্কীর্ণ স্বল্পতোয়া নদীর সম্মুখবর্তী হইলাম। উহাই পুণ্যসলিলা বরুণা বলিয়া অনুমান করিলাম। যে নদীতে একদা সহস্র সহস্র ভিক্ষু-শ্রমণ অবগাহন করিতেন তাহা আজ কালচক্রে লোকচক্ষুর অন্তরালে পতিত—বিলুপ্ত-গৌরব হইয়া আত্মগোপনই যেন তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। এইস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমরা অনাগারিক ধর্মপাল কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমঠ দর্শন করিলাম।

অতঃপর আমরা সন্নিহিত নবনির্মিত মূল-গন্ধকুটী বিহার দর্শনে গমন করিলাম। মহাবোধি-সমিতির প্রচেষ্টায় বহু অর্থব্যয়ে এই উচ্চচূড়াযুক্ত সুদৃশ্য মন্দির নির্মিত হইয়াছে। গন্ধকুটী অর্থ সুবাসিত অট্টালিকা। সারনাথে বুদ্ধদেবের বাসার্থ তদীয় শিষ্যগণ কতৃক যে সকল গৃহ নির্মিত হয় তাহাই গন্ধকুটী নামে অভিহিত। বুদ্ধদেব সারনাথে আসিয়া যেই ভবনে তাঁহার প্রথম বর্ষাকাল যাপন করেন তাহা মূলগন্ধকুটী নামে অভিহিত হয়। তদীয় গৃহস্থশিষ্যা সুথমনা উহা বুদ্ধদেবের নামে উৎসর্গ করেন; মিউজিয়মে রক্ষিত উক্ত শিলালিপিতে ঐরূপ লিখিত আছে।

মূলগন্ধকুটী-মন্দিরে ভারতসরকার-প্রদত্ত বুদ্ধ-দেবের পবিত্র দেহাবশেষ (relics) রক্ষিত হইয়াছে। মন্দিরের বেদীতে প্রতিষ্ঠিত প্রভাযুক্ত বুদ্ধদেবের নয়নাভিরাম মূর্তিদর্শনে আমাদের অন্তর ভক্তিরসাপ্লুত হইল। মন্দিরের অভ্যন্তরস্থিত প্রাচীরগাত্রে তেইশটি বৃহৎ বৃহৎ সুরঞ্জিত চিত্রে তথাগতের জীবনের প্রধান প্রধান কাহিনী সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে। এই অভিনব

প্রাচীর-চিত্রসমূহ অতি মনোরম; ধর্মপ্রাণ-ব্যক্তির, বিশেষতঃ বৌদ্ধভক্তগণের অন্তরে এই সকল জীবন্ত চিত্র অকৃত্রিম ভক্তিরসের সঞ্চার করিবে। বিখ্যাত জাপানী চিত্রশিল্পী কোসেৎসু নসু এই সকল চিত্র ভক্তি-প্লুত অন্তরে অঙ্কন করিয়াছেন। তাহার পর আমরা 'সারনাথ' নামক মহাদেব মন্দির দর্শন করিলাম; উহা সুপ্রাচীন নহে। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে মহাদেবের এই নাম হইয়াছে। অতঃপর আমরা অদূরস্থিত চৈনিকগণের নবনির্মিত বৌদ্ধমন্দির দর্শন করিলাম। মন্দিরস্থ বুদ্ধদেবের অমল ধবল সৌম্যমূর্তি চৈনিক শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

ইহার পর আমরা ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এক জৈন মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। মন্দিরে একাদশ-তীর্থঙ্কর শ্রেয়াংশনাথের কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্মিত প্রশান্ত মূর্তি-সন্দর্শনে চিত্তপ্রসাদ লাভ করিলাম। উক্ত তীর্থঙ্কর অর্ধ ক্রোশ দূরবর্তী সিংহপুরে সিদ্ধিলাভ করেন। মন্দিরে অনেক মূল্যবান দ্রব্যসম্ভার পরিলক্ষিত হইল।

এইবার আমরা অগ্রসর হইয়া সারনাথের মিউজিয়মে প্রবেশ করিলাম। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এই মনোরম শ্বেতপ্রাসাদের সম্মুখস্থ তৃণগুল্মসুশোভিত অঙ্গনটি নয়নানন্দদায়ক। মিউজিয়মের দুইটি গৃহে সংগৃহীত দ্রব্য-সম্ভার স্থাপিত আছে। প্রথম গৃহে সিংহস্তম্ভের শিরোভাগ, লোহিত প্রস্তরে নির্মিত ছত্রযুক্ত দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তি, ও ধর্মচক্র মুদ্রাধারী, ধর্মোপদেশ প্রদানরত পদ্মাসনে উপবিষ্ট অর্ধ-নিমিলিতনেত্র ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি মুগ্ধ নেত্রে অনেকক্ষণ দর্শন করিলাম। শেষোক্ত প্রস্তর-মূর্তিটি ভারতীয় ভাস্কর্যের চরম উৎকর্ষের নিদর্শন। মূর্তির মস্তকের চতুর্দিকে প্রভামণ্ডল। উহার চতুর্দিকে পদ্মের সুন্দর মালা, দুই দেবদূত উপর হইতে পুষ্পবর্ষণে রত। মূর্তির মূল ভিত্তিতে তথাগতের প্রথম পঞ্চশিষ্য এবং সম্ভবতঃ মূর্তি প্রদাতার মূর্তি উৎকীর্ণ আছে। মূলভিত্তির মধ্যস্থলে ধর্মচক্র বিদ্যমান। এই গৃহে মহাযান বৌদ্ধদের অবলোকিতেশ্বর বা বোধিসত্ত্বের মূর্তি এবং ভাবী-বুদ্ধ মৈত্রেয়ের মূর্তিও দেখিলাম। মূর্তিগুলির ভাস্কর্য অতুলনীয়। মিউজিয়মের দ্বিতীয় গৃহে ত্রিশূলের সাহায্যে অসুর-বিনাশোদ্যত শিবের বৃহদাকার প্রতিমূর্তি দৃষ্টিগোচর হইল। সারনাথে খননকালে অসমাপ্ত অবস্থায় উহা পাওয়া যায়। কুতুবুদ্দিন অন্যান্য হিন্দু-বৌদ্ধ দেবমূর্তিসহ উহা ভূগর্ভে নিপাতিত করেন, এজন্য উহার নির্মাণ-কার্য অসম্পূর্ণই থাকিয়া যায়।

উভয় গৃহে আমরা বুদ্ধদেবের বিভিন্ন অবস্থার অনেক মূর্তি, লোকনাথ তারাদেবী ও অন্যান্য হিন্দুদেবতার প্রতিমূর্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্তি, একপ্রকার মোটা পশমী কাপড়, মৃৎপাত্র, পূজোপকরণ ও তৈজসপত্র, প্রাচীন মুদ্রা আরও কত কি নয়ন ভরিয়া দর্শন করিয়া বলদৃপ্ত প্রতি-হিংসা পরায়ণ লোকের ধ্বংসলীলার কথাই ভাবিতে লাগিলাম। হৃদয়হীন আক্রমণকারীরা বিহারের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী শুধু লুণ্ঠন করে নাই, অগ্নি-প্রজ্বালনে অট্টালিকা ও সকল দাহ্য দ্রব্য ভস্মীভূত করিয়াছে। কত মূল্যবান্ দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ যে ভস্মসাৎ হইয়াছে, কত সুদর্শন ভক্তি-উদ্দীপক মূর্তি যে বিকলাঙ্গ, ভগ্ন ও চূর্ণীকৃত হইয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। আবার খননকালেও বহু মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খণ্ডিত হইয়াছে। মানবের অপূর্ব কীর্তির এইরূপ শোচনীয় পরিণতির কথা কেহ কোন দিন কল্পনাও করিতে পারে নাই।

সন্ধ্যার কিঞ্চিৎকাল পরে আমরা কাশী ফিরিয়া আসিলাম। মনে ভাবিলাম যতবার কাশী আসিব ততবার এই পুণ্যতীর্থ দর্শনে প্রাণমন শীতল করিব।

দর্শন ও ধর্ম

(দ্বিতীয়ার্ধ)

স্বামী নিখিলানন্দ

অতীন্দ্রিয় তত্ত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা সবিশেষ বিতর্কমূলক। মরমী সাধকেরা বলেন, তাঁহাদের অনুভূতি যুক্তিজগতের বাহিরে। সুতরাং যিনি তাঁহাদের গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নন, তাঁহার মধ্যে এই অনুভব সংক্রমিত হইতে পারে না। এই অনুভূতি সাধকের নিজস্ব; ইহা দার্শনিক সমীক্ষার মত সর্বজনীন নয়। ভারতবর্ষের অধিকাংশ মরমী সাধক ভগবৎপ্রেম ও মানবপ্রীতির উপর জোর দেন। তাঁহাদের বলা হয় প্রেমোন্মত্ত। সাধারণ ধর্মপ্রাণ লোকের মত মরমী সাধকগণ জাতি-বর্ণ বা ধর্মমতের পার্থক্যকে স্বীকার করেন না। তাঁহারা মনুষ্যজাতির একত্ব অনুভব করেন। তাঁহাদের নিকট জগৎ অবাস্তব নয়; ভগবানের শক্তি তাহাতে ওতপ্রোতভাবে নিবিষ্ট। তাঁহারা ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা দার্শনিক বিচারের প্রতি উদাসীন। তাঁহারা স্বাভাবিক বা স্বতঃস্ফূর্ত জীবন যাপন করেন।[১৮] ভারতবর্ষের মরমীদের মধ্যে ভক্ত ও জ্ঞানী দুইই আছেন। যথার্থ মরমী-সাধনকে আধ্যাত্মিক প্রচেষ্টা ও দার্শনিক অনুধাবনের পরিণতি বলা যায়। কিন্তু জগৎ তথাকথিত বাজে মরমী সাধকে ভর্তি; যুক্তি-বিচারকে অবিশ্বাস করে বলিয়া তাহারা খামখেয়ালী জীবনযাপন করে। ভগবান্ হইতেই সরাসরি তাহারা প্রেরণা-লাভ করিয়াছে, এইরূপ দাবী করিয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহারা নিজেদের মলিন অহংবৃত্তির আকর্ষণে চালিত হয়; আচরণে তাহারা প্রায়ই নীতি-বিরোধী। ধর্ম, দর্শন ও মরমী সাধনের সুদৃঢ় ভিত্তিই হইল নীতি-পরায়ণ জীবন। সত্য, সংযম, দয়া ও পবিত্রতাহীন ব্যক্তির পক্ষে ঈশ্বর-প্রেম বা সত্যানুভূতি সম্ভব নয়।[১৯] যে ব্যক্তি আপনার পক্ষে কি কর্তব্য ও কি অকর্তব্য স্থির করিতে পারে না, সে পশুস্তরের বিশেষ উপরে নয়। স্বার্থবুদ্ধিকে যে দমন করিতে অসমর্থ, সেই ব্যক্তি মনুষ্যসমাজে বাস করিবার উপযুক্ত নয়। যতদিন মানুষের স্বার্থপর প্রকৃতির পূর্ণ রূপান্তর না ঘটিবে, ততদিন পর্যন্ত তাহার দিব্য দর্শনাদি, তাহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি বা ভাব-সমাধি যথার্থ নয়। সত্য, পরিশেষে মানুষ একদিন নৈতিক নিয়ম-কানুনের ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইতে পারে; কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, সে দুর্নীতিপর জীবন-যাপন করিবে। কথাটা হইল, পূর্ণজ্ঞানী প্রথমাবস্থায় আপন আধ্যাত্মিক জীবন গঠন-কালে যে সকল সদ্‌গুণ ও সদাচারের অভ্যাস করিয়াছিলেন, সেইগুলিই পরে তাঁহাকে মহামূল্য মণির মত অলঙ্কৃত করে। এই গুণরাশি তাঁহার স্বভাবের অঙ্গীভূত হইয়া যায়। তিনি কখনও ভুলক্রমেও বেতালে পা দিতে পারেন না।

১৮ "তস্মাদ্ ব্রাহ্মণঃ পাণ্ডিত্যং নির্বিদ্য বাল্যেন তিষ্ঠাসেৎ। বাল্যং চ পাণ্ডিত্যং চ নির্বিদ্যাথ মুনিঃ, অমৌনং চ মৌনঞ্চ নির্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ; স ব্রাহ্মণঃ কেন স্যাৎ? যেন স্যাৎ তেনেদৃশ এব, অতোঽন্যদার্তম্।" (বৃঃ উঃ, ৩।৫।১)

১৯ "নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"
(কঠ উপ, ১।২।২৪)

ভারতীয় দার্শনিক সিদ্ধান্তের নিম্নোক্ত সংক্ষিপ্ত পরিচিতি হইতে বুঝা যাইবে যে, হিন্দু ঐতিহ্য ধর্ম, দর্শন ও মরমী সাধনপন্থা পরস্পরের মধ্যে নিকট সম্পর্ক রাখিয়াছে :

(ক) একটিমাত্র চরম সদ্‌বস্তু আছে—তিনি আত্মভু, অদ্বৈত, নিত্য শাশ্বত এবং অকার্য, অর্থাৎ তিনি কারণোদ্ভুত কার্য নন। অবশিষ্ট সব কিছুই বাহ্যপ্রপঞ্চের অন্তর্ভুক্ত; ইহারা সকলেই কার্যভূত, আদ্যন্তবান্, সুতরাং আত্যন্তিকভাবে তাহাদের কোন সত্তা নাই।[২০]

(খ) চরমতত্ত্ব সর্বব্যাপী; ইহা বস্তুমাত্রেরই মূলীভূত সত্তা। ইহা হইতে আলাদা হইয়া স্বতন্ত্রভাবে কোন কিছুই থাকিতে পারে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সব কিছুই সত্যস্বরূপ বলিয়া দেখেন। কোন ব্যক্তি যদি তত্ত্বভিন্ন অন্য কিছু অনুভব করিয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে সে ভ্রান্তির কবলে। অজ্ঞান ব্যক্তি যাহাকে নাম-রূপান্বিত বলিয়া প্রত্যক্ষ করে, অদ্বৈত জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তির নিকট তাহাই সর্বোপাধি-বিনির্মুক্ত পরব্রহ্ম।

(গ) সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ চরম ও পরম তত্ত্ব একাধারে সর্বানুস্যূত ও সর্বাতিগ। তাঁহার একটি অংশমাত্র মায়াপ্রভাবে যেন দৃশ্যমান জগদ্‌রূপে প্রতিভাত হয়।[২১] আচার্য শঙ্করের অদ্বৈতবাদ সর্বেশ্বরবাদ (pantheism) নয়, মায়াবাদও নয়। ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্যতার প্রতিপাদনই ইহার উদ্দেশ্য—ইহা ব্রহ্মাস্তিত্ববাদ।

(ঘ) চরম সত্তা বা ব্রহ্মই জগৎকারণ।[২২] সৃষ্টি ব্যাপার স্বতঃপ্রবৃত্ত; ইহা কোন বাহ্য প্রেরণার ফল নয়। বিভিন্ন দর্শনাচার্য বিভিন্ন অর্থে 'কারণ'-শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন, সৃষ্টি শ্রীভগবানের লীলা; আবার কেহ কেহ বলেন ইহা ব্রহ্মবস্তুর উপর মায়িক অধ্যাসমাত্র—যেমন মরীচিকাতে জলের অধ্যাস। সান্ত মন চরম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক সত্যের মধ্যে, এক এবং বহুর মধ্যে যুক্তিগত সম্পর্ক নির্ধারণ করিতে অসমর্থ—ইহা লীলাবাদ ও মায়াবাদ উভয়েরই অভিমত। সৃষ্টজীব জীবনক্রীড়ায় ক্লান্ত হইয়া যথার্থই মুমুক্ষু হইয়া পড়ে; এই বাদদ্বয়-অনুসারে ইহাদেরও মুক্তির সম্ভাবনা আছে। অদ্বৈতমতে চরম তত্ত্ব ও আপেক্ষিক সত্যের সম্বন্ধ অবাস্তব; এই মতে ব্রহ্ম ত নানাত্মক জগদ্রূপে পরিণত হন নাই।[২৩] মাণ্ডূক্য-উপনিষদের ব্যাখ্যায় গৌড়পাদ অজাতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; নানাত্বের অস্তিত্ব মানসব্যাপার-মাত্র; যুক্তি দ্বারা ইহা প্রতিষ্ঠা করা যায় না। সৃষ্টি মরীচিকার মত ঘটনা-হিসাবে অনুভূত হইতে পারে; কিন্তু সৃষ্টি-কার্য বলিয়া কিছুই নাই। মরুভুমি তত্ত্বতঃ মরীচিকা-দৃষ্ট জল সৃষ্টি করে না। গৌড়পাদ কার্যকারণ-সম্বন্ধ স্বীকার করেন না।[২৪] জগৎ ব্রহ্মস্বরূপই।[২৫] দ্বৈতবাদী আচার্যগণ বলেন, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম; ইহা তাঁহার ইচ্ছা এবং অনুধ্যান-সম্ভূত।

(ঙ) জীবাত্মা ও পরমাত্মা তত্ত্বতঃ একই। ইহাদের আপাত-ভেদ মায়াকল্পিত। মোহগ্রস্ত

২০ "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেঽপি তত্তথা।
বিতথৈঃ সদৃশাঃ সন্তোঽবিতথা ইব লক্ষিতাঃ॥"
(মাণ্ডূক্য উপনিষদ্ গৌড়পাদ-কারিকা ২।৬)
"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ॥"
(গীতা, ২।১৬)

২১ . "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥"
(গীতা, ১০।৪২)

২২ "জন্মাদ্যস্য যতঃ।" (ব্রহ্মসূত্র, ১।১।২)

২৩ "মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।"
(মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্ গৌড়পাদ-কারিকা, ১।১৭)

২৪ মাণ্ডূক্য-উপনিষদ্ গৌড়পাদ-কারিকার ৪র্থ প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

২৫ মাণ্ডূক্য উপনিষদ্-গৌড়পাদ কারিকা, ১।৯

জীবাত্মা দেহাভিমানবশে সবিশেষ হইয়া পড়ে। অদ্বৈতবাদ অজ্ঞানাবস্থায় জীববহুত্ব স্বীকার করে; অদ্বৈতবাদ-মতে ইহাদের মুক্তি যমনিয়মাদি সাধন সাপেক্ষ। জন্ম-মৃত্যু, ভাল-মন্দ, কর্ম ও জন্মান্তর—এই সমস্ত জীবাত্ম-বিষয়ে প্রযোজ্য, পরমাত্ম-বিষয়ে নহে। জীবাত্মার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কার্যকারণাত্মক কর্মনীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। প্রারব্ধই বর্তমান দেহারম্ভের কারণ। এই প্রারব্ধই বর্তমান জীবনের সুখ ও দুঃখকে প্রভাবিত করিবে; আমৃত্যু ইহা ফলপ্রসব করিবে। অন্যবিধ কর্মের নাম সঞ্চিত কর্ম; ইহা আগামী জীবনে ফলপ্রসব করিবে। ভগবদ্‌জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত কর্মের ফল নিরাকৃত হইতে পারে। রাগ ও অহঙ্কার বর্জিত তত্ত্বজ্ঞগণ-কৃত কর্ম ফল উৎপাদন করে না। মানুষ একটি স্বতন্ত্র, স্বাধীন কর্তা; সে অন্ধ নিয়তি অথবা ভগবানের খেয়ালের বশবর্তী নয়। তাহার নিজের অতীতই তাহার বর্তমানকে নিয়ন্ত্রিত করে; বর্তমানই আবার ভবিষ্যতের নিয়ামক। মনে হয় কোন প্রেরণা তাহাকে কর্মে প্রণোদিত করিতেছে, এই প্রেরণা বাহির হইতে আসে না, ইহা তাহার ভিতর হইতেই আসে। কর্মনীতি বলে বর্তমানে তোমার জীবনে যাহা ঘটিতেছে তাহা ধৈর্যের সহিত গ্রহণ কর, মানিয়া লও। এই কর্মনীতিই আবার নিজের ইচ্ছানুসারে ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিতে সাহস দান করে। অজ্ঞানবশতঃ জীবাত্মা প্রথমেই জড়াভিমানী হইয়া দেহপরিগ্রহ করিয়া থাকেন। এখন জীবাত্মা আপনাকে জড়ের কারাগার হইতে মুক্ত করিবার জন্য সচেষ্ট। ক্রম-পরিণাম বলিতে ইহাই বুঝায়। আত্মীয়, সমাজ, দেশ ও মানবজাতির প্রতি কর্তব্য সম্পাদন বিভিন্ন হিন্দুদর্শন সম্মত মুক্তির একটি সাধন।

(চ) ভগবানের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্নতা-প্রাপ্তিই মুক্তি। বৈষ্ণব ধর্ম দ্বৈতবাদী; এইরূপ দ্বৈতমূলক ধর্মসাধনায়ও ভক্ত শেষ পর্যন্ত আপন অন্তরে ইষ্ট-সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যতদিন মুক্তিলাভ করা না যায়, ততদিন পর্যন্ত মানুষ সৃষ্টি-প্রপঞ্চের অধীন। সমাজে যে যে-স্তরে বাস করে তদনুযায়ী তাহাকে সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও নৈতিক কর্তব্য করিতেই হইবে। জগৎকে সে মিথ্যা, অবাস্তব মনে করিতে পারে না। এইরূপ লোকের জন্য অদ্বৈত বেদান্ত একটি বিস্তৃত সৃষ্টিতত্ত্বের পরিকল্পনা করিয়াছে। জগচ্চক্রকে অতিক্রম করিবার একমাত্র উপায়, এই চক্রে প্রবেশ করিয়া ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা। নিত্যানিত্যবিচার ও যমনিয়মাদি সাধন দ্বারা এই নিষ্ক্রান্তি তাড়াতাড়ি আসিতে পারে। ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং ভ্রম এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে পার্থক্য করা হয়; অবশ্য পারমার্থিক দৃষ্টিতে ইহারা সকলেই সমভাবে অবাস্তব।

হিন্দুধর্ম জড়বিজ্ঞান এবং ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনপ্রকার বিরোধ দেখিতে পায় না। বিজ্ঞান যুক্তির সাহায্যে জগৎপ্রপঞ্চের শক্তিরূপটি অভিব্যক্ত করে; ধর্ম প্রকাশ করে প্রেমের মাধ্যমে ইহার আন্তর কল্যাণরূপ। জগৎ একটি অবিভাজ্য সত্তা; ইহাতে জড় ও চৈতন্যের মধ্যে, মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর জীবের মধ্যে তত্ত্বতঃ কোন পার্থক্য নাই। যে পার্থক্যটুকু প্রতীত হয়, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে বিলীন হইয়া যায়।[২৬] দেব, মনুষ্য, প্রাণী, ও উদ্ভিদ সকলেই একই মৌলিক নিয়মাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই নিয়মগুলি যখন বাহ্য-

২৬ "জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে।"
(মাণ্ডূক্য উঃ গৌড়পাদ-কারিকা, ১।১৮)

বস্তুজাত—সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহারা জাগতিক বা ব্যাবহারিক নিয়মাবলী; আবার এই গুলিই যখন আভ্যন্তর জগতের ঘটনাবলী সম্বন্ধে প্রযুক্ত হয়, তখন তাহারা আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী। পূর্বেই বলা হইয়াছে, তত্ত্ববিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জড় ও চৈতন্য উভয়কেই জানা দরকার। মায়াবাদের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রভাবে হিন্দু দার্শনিকগণ যখন পরিদৃশ্যমান জগৎকে মিথ্যা, অবাস্তব এবং অবান্তর জ্ঞান করিতে লাগিলেন, তখনই ভারতবর্ষের অবনতি আরম্ভ হয়।

বাহ্যজগতের নিয়মাবলী যুক্তির সাহায্যে অনুধাবন করিতে হইবে; আধ্যাত্মিক নিয়ম বুঝিতে হইবে সমীক্ষণ বা মনন দ্বারা। অন্তর্দৃষ্টির অনুশীলন হইয়া থাকে যোগের সাহায্যে। আধ্যাত্মিক সংপ্রাপ্তির পথে এই যোগ দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ উভয়বিধ যন্ত্রের কাজ করে। সে সকল বস্তু বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিকট অপ্রত্যক্ষ, যোগদৃষ্টি-সম্পন্ন মনের নিকট তাহা প্রত্যক্ষ। মানুষ ও ভগবানের মধ্যে এমন কোন পার্থক্য নাই যাহা অনপনেয়। যে কোন পার্থক্যই থাকুক না কেন, মানুষ আপন ব্যক্তিগত প্রগতিদ্বারা তাহা দূর করিতে পারে। পিপীলিকার মধ্যে যে সুপ্ত দেবত্ব বিরাজমান, তাহা সে একদিন উপলব্ধি করিবে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

যে আলো এনেছ মর্তের পরে সীমাহীন করুণায়
এ-জীবন-দীপ যেন ভরি' প্রাণ তাহারি পরশ পায়।
ধূলিকার বুকে বহ্নির সাধ
নিশীথ-মর্মে অমল প্রভাত
সে-পরশ মাঝে চির স্বপনের রঞ্জন বুঝি চায়।

যে আশা এনেছ আশাহীন এই মর্ত-মরুর মাঝে
উঠি' উচ্ছলি' যেন নির্বাধ প্রতি তরঙ্গে বাজে।
চির সবুজের সুবর্ণ-শিখা
বিলায় অমরা-বহ্নির লিখা,
লভি' তব ভাষা তোমার ছন্দে তোমারি স্বপনে সাজে।

যে-দিশা এনেছ নির্দিশা এই নিতল রাতের তলে
হে চিরদিশারী, সে যেন অবার-পন্থায় তারি চলে।
বরি' নিস্তল ছায়া ধরণীর
যেন উল্লাসে অমরা-মিহির,
তব মহিমার অসীম-মন্ত্রে প্রতি মুহূর্তে জ্বলে।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ও পশ্চিম বাংলার গ্রাম *

অধ্যাপক শ্রীফণিভূষণ সান্যাল, এম্‌-এ

আমাদের দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সম্প্রতি যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা নিয়ে চারদিকে যে রকম আলোচনা চলছে তাতে সাধারণ লোকের মনেও এ সম্বন্ধে কৌতুহল হওয়া স্বাভাবিক। বাদানুবাদের ভেতর না গিয়ে, এ পরিকল্পনাটা কি, এর সাফল্যের জন্য জনসাধারণ কি করতে পারে, এবং বিশেষ করে আমাদের সমস্যা-কণ্টকিত পশ্চিম বাংলার জন্য এতে কি ব্যবস্থা করা হয়েছে এই তিনটি বিষয় সংক্ষেপে আলোচনাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্রথমেই বর্তমান পরিকল্পনার তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য বোঝা দরকার। জাতীয় সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য এ যাবৎ বহু পরিকল্পনাই নিয়োগ করা হয়েছে, সুতরাং আর একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন এমন একটা কী বিশেষ ঘটনা? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে এক একটা পরিকল্পনার সাহায্যে সাধারণত আমরা কোন একটা নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি যেমন, 'অধিক খাদ্য উৎপাদন' 'শিক্ষাপ্রসার', 'বন্যানিরোধ' ইত্যাদি, কিন্তু বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য দেশের **সর্বতোমুখী** বিকাশ। সমস্যাগুলি বিচ্ছিন্নভাবে গ্রহণ না করে, এই পরিকল্পনায় আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজন ও সম্বলের বিচার করে উভয়ের সামঞ্জস্যমূলক একটা কার্যকরী কর্মসূচী প্রবর্তন করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এ রকম ব্যাপক পরিকল্পনার গুরুত্ব সুভাষচন্দ্র উপলব্ধি করেছিলেন প্রথম এবং ১৯৩৮ সালের ত্রিপুরী কংগ্রেসে পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য পণ্ডিত নেহেরুর সভাপতিত্বে একটা কমিটি তাঁরই নির্দেশে গঠিত হয়েছিল। কমিটির পক্ষে যথাযথভাবে পরিকল্পনা রচনা সম্ভব হয়নি, তাই দেশ স্বাধীন হওয়ার পর নতুন উদ্যমে কাজ সুরু করা হয়। ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয় 'পরিকল্পনা পরিষদ।' ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে দেশবাসীর আলোচনার জন্য 'পরিষদ' তাঁদের খশড়া প্রস্তাব পেশ করেন এবং দেড় বৎসর সর্বস্তরের লোকের মতামত গ্রহণ করে সংশোধিত আকারে ১৯৫২ সালের ৮ই ডিসেম্বর পরিকল্পনাটা বিধানসভায় চূড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। এ রকম গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে ব্যাপক পরিকল্পনা রচনার দৃষ্টান্ত অভিনব বলে বিষয়টি বিশ্ববাসীর সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল এই পাঁচ বছর পরিকল্পনার নির্ধারিত কাল। অর্থাৎ ইতোমধ্যেই পরিকল্পনার তৃতীয় বৎসরে আমরা পদার্পণ করেছি। ব্যাপারটা "রাম না হতে রামায়ণের" মত শোনালেও দুর্বোধ্য নয়। বিভিন্ন দিকে গঠনমূলক যে সমস্ত কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে সেগুলিকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যেই এরকম করতে হয়েছে। আর এর একটা সুবিধা আমাদের দিক থেকে রয়েছে।

* কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের পল্লীমঙ্গল আসরে লেখক কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণ-অবলম্বনে।

পরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে ইতোমধ্যে আমরা কতটা অগ্রসর হয়েছি সেটা জেনে পরিকল্পনার সম্ভাব্যতা বিচার করা সম্ভব হয়েছে—সমস্তটাই ভবিষ্যতের গহ্বরে না থাকায়।

পরিকল্পনার মোট ব্যয় হবে ২০৬৯ কোটী টাকা অথবা মাথাপিছু ৬০৲ টাকা। বিভিন্ন বিষয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ব নির্ধারণই ব্যাপক পরিকল্পনার প্রধান সমস্যা। বর্তমান পরিকল্পনায় বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের বন্টনের হার এজন্য লক্ষণীয়।

মোট ব্যায়ের শতকরা

কৃষি ও সমাজ সংগঠন	১৭'৪
সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদন	২৭'২
যানবাহন ও রাস্তাঘাট	২৪
শিক্ষাস্বাস্থ্য ইত্যাদি সমাজসেবা	১৬'৪
শিল্পের প্রসার	৮'৪
উদ্বাস্তু পুনর্বাসন	৪'১
বিবিধ	২'৫

সেচ কৃষিরই আনুষঙ্গিক, সুতরাং পরিকল্পিত ব্যয়ের শতকরা ৩৯% অর্থাৎ ৭৯৫ কোটী টাকা ধার্য হয়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কৃষির উন্নতির জন্য; কৃষির উন্নতিকে এতটা প্রাধান্য দেওয়ার কারণ খাদ্যের ক্রমবর্ধমান ঘাটতি পূরণ করে কৃষিতে উদ্বৃত্ত সৃষ্টি করতে না পারলে ভবিষ্যৎ উন্নতির সমস্ত পথ অবরুদ্ধ থাকবে এবং আশু প্রয়োজন মিটিয়ে, ভবিষ্যৎ উন্নতির বনিয়াদ গড়াই বর্তমান পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সূচনা ও প্রস্তুতি হিসাবেই এই প্রচেষ্টার সার্থকতা মনে রাখা দরকার। শিল্প-প্রসারের জন্য মোট ব্যয়ের ৮'৪% অর্থাৎ মাত্র ১৭৩ কোটী টাকার বরাদ্দ অকিঞ্চিৎকর মনে হতে পারে, তাই বলে দেওয়া দরকার যে এটা কেবল সরকারের নিজের ব্যয়ের হিসাব। শিল্প-প্রসারের প্রধান দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছে শিল্পপতিদের ওপর। কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী ৪২টী শিল্পের প্রসারের জন্য তাঁরা ২৩৩ কোটী টাকার মূলধন নিয়োগ করবেন এই পাঁচ বছরে স্থির হয়েছে। শিল্পপতিরা এ আশা পূর্ণ করবেন কিনা সেটা অবশ্য সন্দেহের অবকাশ রাখে কিন্তু পরিকল্পনায় শিল্পের প্রসার উপেক্ষিত হয়েছে এ অভিযোগ ভিত্তিহীন। শিল্প কৃষির চেয়ে লাভজনক সুতরাং জাতীয় আয়ের দ্রুতবৃদ্ধি শিল্পপ্রসার ছাড়া হতে পারে না, তাছাড়া শিল্পপ্রসারের সাহায্যে জমির ওপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা না কমালে কৃষির উন্নতিও সম্ভব নয় "কমিশন" নিজেই সেকথা বলেছেন।

টাকা জোগাড়ের কি ব্যবস্থা হয়েছে সেটার খোঁজ দেওয়া নিশ্চয়ই দরকার। বৈদেশিক সাহায্য যতটা পাওয়া যায় তার চেষ্টা অবশ্যই করা হবে এবং আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশের কাছ থেকে ১৫৬ কোটী টাকা ইতোমধ্যে পাওয়াও গেছে, কিন্তু প্রধানতঃ নির্ভর করতে হবে কর, ঋণ ও মুদ্রাসৃষ্টির ওপর। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের তহবিলে কর ও ঋণের মাধ্যমে ১২৫৮ কোটী টাকা সংগৃহীত করা হবে এই কয় বছরে। তাছাড়া এই পাঁচ বছরে আমাদের পাওনা হিসাবে বিলাত থেকে ২৯০ কোটী টাকার মালপত্র আসার কথা, সুতরাং সেই পরিমাণ মুদ্রাসৃষ্টি করা যেতে পারে মূল্য-বৃদ্ধির আশঙ্কা না করে। মুস্কিল হচ্ছে বাকী ৩৬৫ কোটী নিয়ে—(অবশ্য অন্য অংশের বেলাতেও ঠিক যেমনটী আশা করা হয়েছে কার্যক্ষেত্রে ঠিক তেমনটী হবে মনে করে নিশ্চিন্ত থাকা উচিত হবে না)। বৈদেশিক ঋণে সমস্তটা সঙ্কুলান না হলে—এবং হওয়ার সম্ভাবনাও কম, দেশের মধ্যে থেকেই ব্যবস্থা করতে হবে। ব্যাপারটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই যে, আমাদের ব্যক্তিগত ক্রয়শক্তি-হ্রাসের (অর্থাৎ আশু স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষতির) বিনিময়ে সৃষ্টি হবে কৃষিশিল্প ও সমাজসেবার মূলীন জাতীয়

আয়বৃদ্ধির পক্ষে যা অপরিহার্য। কৃচ্ছ্রসাধনটা অবশ্য যাতে গরীবের ভাগেই না পড়ে তার জন্য প্রয়োজন মূল্যনিয়ন্ত্রণ ও অন্যবিধ নিয়ন্ত্রণের। সুষ্ঠু নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ছাড়া পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাবে মনে রেখে নিয়ন্ত্রণের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টির সহায়তা করতে হবে।

আমাদের আলোচনার প্রধান অংশটায় এবার আসা যাক। পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের জন্য কি ব্যবস্থা হয়েছে বলার আগে পশ্চিমবঙ্গের গুরুতর অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উল্লেখ প্রয়োজন, উন্নয়ন প্রচেষ্টার তাগিদ বোঝার সহায়তা হবে এতে। এখানে জনসংখ্যার চাপ যত বেশী অন্য কোন প্রদেশেই তত নয়, পশ্চিম বাংলার চাল গম ইত্যাদি তণ্ডুলজাতীয় খাদ্যের ঘাটতি ৫ লক্ষ টনেরও বেশী। গ্রামাঞ্চলে ঋণভার সম্বন্ধে কিছুকাল আগে যে অনুসন্ধান হয়েছিল তা থেকে জানা যায় শতকরা ৫৬টী পরিবারই দেনাগ্রস্ত এবং এ দেনা করতে হয়েছে অমিতব্যয়িতার জন্য নয়, নিতান্ত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য। ক্ষেতমজুর-দের বেলায় তো মোট দেনার ৭১·৭% ভাগই খাদ্যের জন্য দেনা। দেনা শোধ করতে জমিজমা বিকিয়ে যাওয়ায় বর্গাদারদের সংখ্যা ক্রমাগতই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে যারা নিজের জমি চাষ করে তাদের সংখ্যা উত্তরপ্রদেশে শতকরা ৬২ জন, উড়িষ্যায় ৫৯ জন, বিহারে ৫৫ জন কিন্তু পশ্চিম বাংলায় মাত্র ৩২ জন। এ পরিস্থিতিতে উন্নয়ন পরিকল্পনার সঞ্জীবনী, আশার সঞ্চার করবে আশ্চর্য কি?

মোট ৬৯ কোটী টাকা ব্যয়ে বিভিন্ন বিষয়ের ১৫০টী প্রস্তাব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিকল্পনায় করা হয়েছে। প্রদেশগুলিতে মাথাপিছু ব্যয়ের হিসাবে পশ্চিম বাংলার স্থান বোম্বাইয়ের পরই। শিক্ষা স্বাস্থ্য বাসস্থান-নির্মাণ প্রভৃতি সমাজ-সেবার দিকটাকেই আমাদের পরিকল্পনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে, মোট ব্যয়ের ৩৬% ভাগেরও বেশী এই খাতে নির্দিষ্ট করে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রধান প্রস্তাব—৬ বছর থেকে ১১ বছর পর্যন্ত বয়সের ছেলেদের জন্য বাধ্যতা-মূলক বুনিয়াদি শিক্ষার আংশিক প্রবর্তন ও গ্রামে গ্রন্থাগার-প্রতিষ্ঠার সাহায্যে বয়স্কদের মধ্যে শিক্ষা ও কৃষ্টিবিস্তার।

স্বাস্থ্যসম্বন্ধে প্রধান প্রস্তাব গ্রামাঞ্চলে ৬৫০টী "Health Centre" বা 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র' স্থাপন করে চিকিৎসার অভাব দূর করা। ১২৩টী 'স্বাস্থ্যকেন্দ্র' ইতিমধ্যেই স্থাপিত হয়েছে এবং আরও ৬০টীর নির্মাণকার্য শেষ হয়ে আসছে। এই সঙ্গে গ্রামের আর দুটী প্রধান সমস্যা ম্যালেরিয়া ও পানীয় জল, সমাধানের জন্য যথাক্রমে ১ কোটী ২২ লক্ষ ও ১ কোটী ২৭ লক্ষ টাকার বরাদ্দ হয়েছে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতি না হলে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি সম্ভব নয় পশ্চিমবাংলার পরিকল্পনায় এ সত্যটীর স্বীকৃতি প্রশংসনীয়।

প্রায় ৭ কোটী টাকা ব্যয়ে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধি করে আমাদের প্রদেশের ঘাটতি পূরণ পরিকল্পনার আর একটী লক্ষ্য। বলা বাহুল্য চাষীর উদ্যম ছাড়া লক্ষ্য লাভ হবে না। উত্তরপ্রদেশ সরকার চাষীদের এ বিষয়ে প্ররোচিত করার জন্য প্রাচীরচিত্র প্রকাশের যে ব্যবস্থা করেছেন তা অনুকরণীয়।

রাস্তাঘাটের অসুবিধা দূর করার জন্য ১৩ কোটী টাকা ব্যয়ে ১৬৯০ মাইল নতুন রাস্তা নির্মাণের সঙ্কল্প করা হয়েছে। এর মধ্যে গত বছর মার্চ মাস পর্যন্ত ১০০০ মাইল রাস্তার নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়ে গিয়েছে।

সেচ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রধান পরিকল্পনা "ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা'। এ পরিকল্পনা

সম্পূর্ণ হলে ৬ লক্ষ একর জমিতে সেচের আয়োজন ও ৪০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে। তিলপাড়া বাঁধের নির্মাণ হওয়ার ফলে প্রায় ১ লক্ষ একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা গত বছরই করা গিয়েছে।

পল্লীগঠনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা নবপ্রবর্ত্তিত "Community Project" বা 'সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা'। এই প্রচেষ্টাগুলির উদ্দেশ্য এক একটা সীমাবদ্ধ অঞ্চলের কৃষিশিল্প ও অন্যান্য বিষয়ের যুগপৎ ক্রমোন্নতি। একশোটী পাশাপাশি গ্রাম নিয়ে একটা করে "ব্লক" গড়া হবে, এবং এই একশো গ্রামের কাঁচামাল ব্যবহারের জন্য থাকবে একটী শিল্পকেন্দ্র যেখানে প্রতিষ্ঠিত হবে শুধু কারখানা নয়, সমষ্টি কল্যাণের সমস্ত আয়োজন। ৩ কোটী ৩১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রকম আটটী ব্লক সম্পূর্ণ করার ব্যবস্থা হয়েছে। এই প্রচেষ্টা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় প্রাদেশিক সরকারকে ব্যয়ের অংশ গ্রহণ করতে হবে না।

স্বাবলম্বনের ভিত্তিতে ছোট ছোট সংগঠনের কাজের সুযোগ দেওয়ার জন্য প্রদেশব্যাপী গ্রাম পঞ্চায়েৎ স্থাপনের প্রস্তাব গণতন্ত্রের দিক থেকে খুবই মূল্যবান। আংশিক সরকারী সাহায্যে ছোট কাঁচা রাস্তা, (১৫০০০ টাকা অনধিক ব্যয়ে) প্রভৃতি নির্মাণ এদের উদ্দেশ্য। এ রকম ৮৭টী রাস্তা ইতোমধ্যেই নির্মিত হয়েছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনার কাজ বেশ সন্তোষজনকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং পল্লীবাসীর সুখস্বাচ্ছন্দ্যবর্ধনই এ পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। জাতি আজ দৈন্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করেছে এইটেই বড় কথা—পরিকল্পনাটা ত্রুটীবিহীন রচয়িতারাও সে দাবী করেন নি বা অদলবদলের সুযোগ দিতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি। ফলাফল নির্ভর করবে আমাদের মনোবল ও দৃঢ়তারই ওপর।

গর্ব

(Imitation of Christ, ১।৭—অবলম্বনে)

শ্রীনিত্যানন্দ দত্ত

বৃথা গর্বী অহঙ্কারী কহি তাহারেই—
মানুষ ও দ্রব্যচয়ে যে করে নির্ভর,
আপনারও প্রতি কভু আছে কি ভরসা?
রেখো আশা একমাত্র ঈশ্বরের পর।
শক্তিমান বন্ধুদের গর্ব করা ভুল,
হয়োনা কো মদমত্ত যদি থাকে ধন,
ধ্রুব শুধু ভগবানে মতি ও বিশ্বাস
তাঁরি পায়ে কোরো সদা আত্মসমর্পণ।
উন্নত সবল দেহ সুঠাম সুন্দর,
তাই লয়ে অভিমান রেখোনা কো মনে,
স্বল্পমাত্র ব্যাধি যদি করে আক্রমণ,
সকলি বিনষ্ট হতে পারে এইক্ষণে।
প্রতিভা ও জ্ঞান গুণ লভিয়াছ যাহা,
সেই গর্বে ভগবানে রেখো নাকো দূরে,
আপন স্বভাবে তব, যাহা কিছু ভাল,
জেনো সেই বিশ্বপিতা হতে সদা স্ফুরে।

আলো

(একটি ইংরেজী কবিতার ভাব অবলম্বনে)

শ্রীশৈলেশ

মেলিয়া হাজার চোখ রাত্রি দেখে চাহি
দিবা শুধু মেলে এক আঁখি,
নামে যবে সন্ধ্যা-ছায়া সে আঁখি মুদিলে
তমো মাঝে ধরা যায় ঢাকি।
মেলিয়া হাজার আঁখি মন চাহি দেখে
হৃদি চাহে একটি নয়নে,—
মিলায় জীবন আলো মরণের মাঝে
ধরণীর প্রেম-আবাহনে।

হিন্দী-ভজন

শ্রীজয়দেব রায়, এম-এ, বি-কম্

বাংলার ভগবৎ-সঙ্গীতের অধিকাংশ যেমন সাধারণ ভাবে কীর্তনের বিশিষ্ট সুরে গাওয়া হয়, হিন্দী, মারাঠী, গুজরাতী প্রভৃতি ভাষার ঐরূপ গানেরও তেমনি একটি বিশেষ সুরভঙ্গী আছে। ঐ সকল ভাষার সাধন-সঙ্গীত 'ভজন' গান নামে সুপরিচিত।

বাংলা মহাজনী কীর্তনের অনেক পদই অতি উচ্চাঙ্গের সুর ও তালে পূর্বে গাওয়া হইত, নানাপ্রকার তাল, আখর, নিবদ্ধ ও অনিবদ্ধ প্রভৃতি লয়ে নানা শ্রেণীর স্বতন্ত্র রীতিতে সেগুলি গীত হইত। কিন্তু ক্রমে দেখা গেল শ্রোতারা গানের বহিরঙ্গের কলা-নৈপুণ্যে মুগ্ধ না হইয়া অন্তরঙ্গের ভাববিহ্বলতায়ই বিগলিত হইতেছেন। কীর্তন তখন উচ্চাঙ্গের অভিজাত সুরের আসন হইতে জনমনের উপযোগী সরল সুরে নামিয়া আসিল। হিন্দী ভজন গানগুলির বিবর্তন সেই ভাবেই হইয়াছে।

ওস্তাদী তানমানলয়ের আসরে রাগসঙ্গীতের পূর্বে গায়করা অপেক্ষাকৃত লঘু সুরে ভগবানের নাম স্মরণ করিতেন। তাঁহাদের নিকট লঘু মনে হইলেও সাধারণের কাছে অবশ্য তাহা তেমন সহজ মনে হইত না! এ সমস্ত ভজন গানের সুর ও ছন্দ একরকম ধ্রুপদ খেয়ালের ন্যায়ই বেশ উচ্চাঙ্গেরই ছিল। এ গানগুলিই আবার শ্রোতারা নিজেদের কণ্ঠোপযোগী করিয়া লইতেন, তাঁহাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া সে সুর সমগ্র জনগণের আরাধনার সুরে পরিণত হইত। এভাবেই তানসেন, গোপালনায়ক, বৈজুবাওরা, আনন্দঘন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-রচকদের ভজন সুররসবঞ্চিত জনগণও লাভ করিয়াছেন। তানসেনের প্রসিদ্ধ শ্রীরাগিণীর চৌতালের শিববন্দনা আজও শিবমন্দিরে, কাশীতেও গাওয়া হয়—

বংশীধর পিনাকধর, গঙ্গাধর গিরিধর।
জটাধর মুকুটধর, রাজত হরিহর।
চন্দনধর ভস্মধর, পীতাম্বর, মৃগচর্মাম্বর,
চক্রধর, ত্রিশূলধর, নরহর শঙ্কর॥
সুধাধর, বিষধর, গরুড়াসন বৃথবাহন;
মানধর পরমেশ্বর ঈশ্বর॥

গোপালনায়কও ছিলেন তানসেনের মতনই সঙ্গীতধুরন্ধর। তানসেনের মতো তিনি অবশ্য ম্লেচ্ছ ছিলেন না, তিনি ছিলেন দাক্ষিণাত্যের অভিজাত ব্রাহ্মণ; 'নায়ক' তাঁহার সাঙ্গীতিক উপাধি। সুতরাং তাঁহার 'শিববন্দনা'য় অনেকটা আন্তরিকতাময় ভক্তি উচ্ছলিত—(দীপক)

শিখর গড় চন্দ কৈলাস নিহতা চন্দ্রপ্রভা কিরণ
জ্যোতি প্রজ্জ্বল।
চন্দ মকরন্দ ফুল ফুলে পরিমল সুগন্ধে দ্বিবিয়া বদন
তনু মদনুপ জাল॥
লাল মোতিয়ন সে ছোটে চন্দ কিরণ সোভাল।
ছন্দ অভিছন্দ গাওয়ে নায়ক গোপাল॥

বৈজু বাওরা ছিলেন গোপাল নায়কের সমসাময়িক। তাঁহার সাধক জীবনের বিষয়ে নানা গল্প প্রচলিত আছে; বনের পশুপাখীরা পর্যন্ত তাঁহার সুরে মোহিত হইত। তাঁহার মাতৃ-বন্দনা ইমনকল্যাণ চৌতালে রচিত—

জয় কালী কল্যাণী, খর্গধারিণী, গিরিজা ঘনশ্যামা
চণ্ডী চামুণ্ডা ছত্র ধারিণী।

জগতজননী জ্বালামুখী, আদি জ্যোতি অনন্তদেব
অন্নপূর্ণা অনাদি তরণ তরণী ॥

আনন্দঘন এই শ্রেণীর আরো একজন উচ্চাঙ্গের সুরসাধক, তাঁহার 'রামস্মরণ' কেদারায় রচিত গানে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সেতু রচনার প্রয়াস দেখা যায়—

ভাজন ভেদ কহাবত নানা, এক মৃত্তিকারূপ রে।
তৈসে খণ্ড কল্পনা রোপিত, আপ অখণ্ড স্বরূপ রে ॥

কিন্তু এসব গানের মধ্যে কলানৈপুণ্য থাকিলেও আন্তরিকতা বিশেষ নাই। কিন্তু আর এক শ্রেণীর সাধকদের গানের মধ্যে সুর চাতুর্যের সঙ্গে ভগবতপ্রীতি অঙ্গাঙ্গী সন্নিবিষ্ট। নানক, দাদূ, কবীর, রইদাস প্রভৃতি ছিলেন ধর্মগুরু সাধুসন্ত; তাঁহাদের গান তাঁহাদের বাণীও। এ গানগুলি অবশ্য তাঁহাদের নিজস্ব সৃষ্টি কিংবা অনুগামিগণ তাঁহাদের নামে উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইয়াছেন তাহা জানা যায় না। কিন্তু এই ভজনগুলিই স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহাদের বাণীকে বহন করিয়া আনিয়াছে।

নানকের ভজন গুরুমুখী বা পাঞ্জাবী ভাষায় রচিত; তাঁহার অনেক গানের সুরই বেশ চাতুর্যময় কৌশলের—যেমন।

ঠাকুর তব শরণাই আয়ো।
উতর গয়া মেরে মনকা সংশা, জব তেরা
দরশন পায়ো ॥
অনবোলত মেরী বিরথা জানী, অপনা
নাম জপায়ো।
বাঁহ পকড় কঢ় লীনে জন অপনে, গর্হ্‌ অন্ধ
কূপতে মায়ো।
দুখ নাঠে, সুখ সহজ সমায়ে, আনন্দ আনন্দ
গুণ গায়ো ॥
কহ নানক গুরু বন্ধন কাটে; বিছড়ত আন্
মিলায়ো ॥

উপরের গানটির রাগিনী আশাবরী এবং ছন্দ ১৪ মাত্রার দীপচন্দী। বাংলায় যে তালকে যৎ বলে, পাঞ্জাবী ভাষাগীতে তাহারই নাম দীপচন্দী। নানকের ভজন শিখদের ঐক্যবদ্ধ ধর্মের কল্যাণে সমগ্র ভারতে প্রচারিত হইয়াছে। নানকের দুইটি ভজন 'গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে' এবং 'বাদৈ বাদৈ রম্যবীণা বাদৈ' গানের সুর রবীন্দ্রনাথ তাঁহার দুইটি বাংলা গানে গ্রহণ করিয়াছেন।

এই রকম নানকের আর একটি ভজনের মধ্যে আন্তরিকতা কি সুন্দর ফুটিয়াছে—"ঠাকুর তোমার নাম এমনই যে পতিত পবিত্র সবাই তোমাকে আপন ভাবিতে পারে, জাতবর্ণনির্বিশেষে আপামর সবাই তোমার চরণে আশ্রয় পায় - নানক এই ভাবেই সৎসঙ্গ হইতে জ্ঞান পায়।"

ঠাকুর, য়্যাসো নাম তুম্হারো।
পতিত পবিত্র লিয়ে কর অপনে, সকল করত
নমস্কারো।
জাতবরণ কউ পূছে নাহী, পূছে চরণ নিবারো।
সাধুসঙ্গত নানক বুধ পাই, হরি কীর্তন উধারো ॥

রামানন্দ-শিষ্য কবীরও নানকের মতোই দোঁহার মধ্য দিয়া তাঁহার বাণী প্রচার করিয়াছেন। তিনিও মতবাদে হিন্দু-মুসলমানের মহামৈত্রীর চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কারণে তাঁহার 'হরিগুণগানে'ও বহু বিজাতীয় শব্দ স্থান পাইয়াছে। তিলং খাম্বাজ: তেতালা ছন্দে রচিত—

ভজো রে ভৈয়া রামগোবিন্দ হরী।
জপতপ সাধন কছু নহিঁ লাগত, খরচ ত নহিঁ গঠরী ॥

কবীর তাঁহার গানে নিজের অজ্ঞান তিমির বিদূরিত হইবার সংবাদ দিয়াছেন—

তোহি মোহি লগন লগায়ে, রে ফকীর বা।
সোবত হী ম্যঁয়্‌ অপুনে মন্দির মেঁ;
শব্দ মার জগায়ে, রে ফকীর বা!

বূড়ত হী মঁয় ভবকে সাগর মেঁ,
বহিয়াঁ পকড় সুলঝায়ে, রে ফকীর বা।
কহৈঁ কবীর, সুনো ভাই সাধো,
প্রাণন প্রাণ লগায়ে, রে ফকীর বা॥

"ভগবান, তুমি আমাদের মধ্যে অদৃশ্য বাঁধন লাগাইয়াছ। আমি যখন মোহে মগ্ন ছিলাম হে চিরভিক্ষু, তুমিই সুরের আঘাতে আমাকে জাগাইয়াছ। আমি তো সংসার সাগরে ডুবিয়াই গিয়াছিলাম, তুমি হাত ধরিয়া আমাকে তুলিলে। কবীর সাধুজনকে সম্বোধন করিয়া জানাইয়া দিলেন এ ভাবেই ভগবান আমার প্রাণে আসিয়াছেন।"

কবীরের সমসাময়িক সাধক দাদূর ভজনেও দর্শনের জন্য আকুল আকুতি ফুটিয়াছে—

অজহুঁ ন নিকসৈ প্রাণ কঠোর।
দরশন বিনা বহুত দিন বীতে সুন্দর প্রীতম্ মোর॥
(বাগেশ্রী)

রবিদাস ছিলেন মুচীর ছেলে, কবীর ছিলেন জোলার ছেলে—তাহা সত্ত্বেও তাঁহাদের অনুসৃত সাধনমার্গের পথ অনুসরণে দেশবাসীর দ্বিধা সংকোচ অনুভূত হয় নাই। রবিদাসের ভজন—দেশকার ঝাঁপতালে

সাচী প্রীতি হম তুম সঙ্গ জোড়ী,,
তুম্ সঙ্গ জোড় অওর সঙ্গ তোড়ী॥
জো তুম্ বাদল, তো হম্ মোরা,
জো তুম চন্দ্র, হম ভয়ে জী চকোরা॥
তুম্‌রে ভজন কটে ভয় ফাঁসা,
ভক্তি হেতু গাবে রবিদাসা॥

"তোমার সঙ্গ তো আমি ছাড়িব না, তুমি যদি মেঘ হও আমি হইব ময়ূর, তুমি যদি চাঁদ হও আমি হইব চকোর। কি ভাবে তুমি রবিদাসের ভক্তিকে এড়াইয়া যাইবে ?"

মুসলমান সাধকরাও এভাবেই অনেকে ভজনগান রচনা করিয়াছিলেন। সন্ত রজ্জবের একটি ভজনের মধ্যে এই ধরণের ভাবময়তা ফুটিয়াছে—

অঘ মিটৌ অঘ-মোচন স্বামী,
অন্তর ভেটৌ অন্তরযামী।
গতলোচন অন্ধ অচল অনাথা,
গতি দে স্বামী, পকড়ো হাথা।
সরণ তুম্‌হারা, তুম্-সিরভারা,
জন রজ্জবকী সুনহ পুকারা॥

"হে পাপমোচন স্বামী, পাপ দূর কর, অন্তর্যামী ভগবান তুমি অন্তরে এসো। আমি অন্ধ অনাথ তুমি হাত ধরিয়া আমাকে পথ দেখাও। আমি তোমার শরণ লইলাম, তোমার উপরই এখন রজ্জবের সম্পূর্ণ ভার রহিল।"

তুলসীদাস তাঁহার 'রামচরিত মানস' রচনা করিয়া সমগ্র ভারতের ঘরের কবি হইয়া রহিয়াছেন। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোক নিয়মিতভাবে তাঁহার রামায়ণখানি প্রতিদিন পড়িয়া থাকে। রামায়ণের মধ্যেই তাঁহার স্বতন্ত্র ভজনও অনেক আছে। যেমন সিদ্ধিদাতা স্মরণ গানটি (ভূপালী, তেতালা)—

গাইয়ে গণপতি জগবন্দন,
শঙ্কর সুবন ভবানী-নন্দন।
সিদ্ধিসদন গজবদন বিনায়ক,
কৃপাসিন্ধু সুন্দর সবনায়ক
মোদকপ্রিয় মুদমঙ্গলদাতা,
বিদ্যাবারিধি বুদ্ধিবিধাতা।
মাঁগত তুলসীদাস করজোরে,
বসহি রামসিয় মানস মোরে॥

বল্লভাচার্য সম্প্রদায়ের নন্দদাস রাসপঞ্চাধ্যায়ী ভ্রমর গীতা, কৃষ্ণচরিত প্রভৃতি রচনা ছাড়াও বহু ভজন গান রচনা করেন—

নন্দভবন কো ভূষণ মাঈ,
যশোদাকো লাল,
বীর হলধর কো।
রাধারমণ, পরম সুখদাঈ॥
শিবকো ধন, সন্তন কো সর্বস্,
মহিমা বেদ পুরানন গাঈ॥

এসব গানের অধিকাংশই আবৃত্তির এবং কথকতার পর্যায়ভুক্ত। হিন্দী সুর সৌন্দর্য মণ্ডিত ভজনগানের মধ্যে মীরাবাঈ এবং সুরদাসের রচনাগুলিই উল্লেখযোগ্য।

সুরদাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার পিতাও একজন 'দরবারী' গায়ক ছিলেন। তানসেন এবং সুরদাস উভয়ই আকবরের সভাগায়ক ছিলেন। সুরদাস রচিত 'সুরসাগর' নামে ভাগবতের একটি অনুবাদও পাওয়া যায়।

নানক, কবীর প্রভৃতির ভজন ভক্তিরস-উচ্ছ্বসিত, কিন্তু তাহাদের সুরসৌন্দর্য থাকিলেও নৈপুণ্য মোটেই নাই। সুরকে কোথাও অযথা প্রাধান্য ঐ সকল ভাবপ্রধান গানে দেওয়া হয় নাই। তুলসীদাসের রামায়ণ তো তাঁহার দোঁহার মতনই সুর করিয়াই পঠিত হয়। সাধারণ জনগণের পক্ষে পুঁথি ধরিয়া পড়িবার অপেক্ষা পুণ্যকাহিনীর রস গ্রহণ এ ভাবেই ঘটিত।

কিন্তু সুরদাস এবং মীরার ভজন রীতিমতো সুর, তাল মান লয়ে গীত হইবার জন্য রচিত। এগুলি নিয়মিতভাবেই উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতের আসরে ওস্তাদ গান গাহিয়া শোনান। উচ্চাঙ্গের ধ্রুপদ গানের যে গম্ভীর সুরধ্বনি শ্রোতাগণ শুনিতে অভ্যস্ত ছিল, তাহারই ঔদার্যময় প্রতিধ্বনি সুরদাসের ভজনের মধ্যেও আছে। Composer বা সুরস্রষ্টারূপে সুরদাস যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রাগিণীর স্বর-বিন্যাসে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য সমাবেশ করিয়া তিনি নবতম সুরসৃষ্টি করিতেন। এই ভাবেই সৃষ্টি হইয়াছে সুরদাসী মল্লার, সুরদাসী থাম্বাজ প্রভৃতি। রামকেলি রাগিণী কাওয়ালীতে রচিত তাঁহার এ শ্রেণীর ভজন গান—

জয় নারায়ণ ব্রহ্মপরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তম্।
নাম অনন্ত কাঁহা রাগবর্ণ শেষ না পায়ো অন্তম্॥
শিব সনকাদি ব্রহ্মাদি নারদ ধ্যান ধরন্তম্।
রামরূপ ধরে রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তম্॥
বসুদেব গৃহে জনম লিয়ো হৈ নাম ধরে যদুনাথম্।
কৃষ্ণরূপ ধরে অসুর সংহারে কংসকো কেশ গৃহন্তম্॥
জগন্নাথ জগমগ চিন্তামণি বৈঠ রহে মেরি চিন্তম্।
দশম সুকন্দ ভাগবত গাওয়ে সুরদাস ভগবন্তম্॥

কিন্তু আন্তরিকতায় সবাইকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে মীরার ভজনগুলি। মীরাবাঈয়ের ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তাঁহার গানের সুর সৌন্দর্যে চিরকালই দেশবাসী বিমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে শ্রীভগবানের অংশস্বরূপা বলিয়া শ্রদ্ধা জানাইয়া আসিয়াছে।

হ্মারে জনম মরণকে সাথী
থানে নহীঁ বিসরূঁ দিনরাতি॥
তুম্ দেখ্যা বিন্ কল ন পড়ত হ্যয়,
জানত মেরী ছাতী।
উঁচী চঢ়্ চঢ়্ পন্ত নিহারুঁ,
রোয়্ রোয়্ আঁখিয়া রাতী।
মীরাঁকে প্রভু পরম মনোহর,
হরি চরণা চিত রাতী॥
পল পল তেরা রূপ নিহারুঁ,
নিরখ নিরখ সুখ পাতী॥

মীরা বলিতেছেন—"হে আমার জন্মমরণের সাথী, তোমাকে যেন দিনরাতে কখনও না ভুলি। আমার অন্তর জানে তোমার অদর্শনে আমি কত কষ্ট পাই। তোমার পথ দেখিবার জন্য আমি উঁচুতে বার বার উঠিতেছি। কাঁদিয়া

চোখ লাল করিতেছি। মীরার প্রভু তুমি পরম মনোহর, তোমার চরণে আমার আত্ম নিবেদন। পলে পলে তোমার রূপ দেখিয়া আমি আনন্দ পাইতেছি।"

মীরার অনেক ভজনের সুর কিন্তু বেশ উচ্চাঙ্গের। মনে হয় সুরজ্ঞগণের কণ্ঠে কণ্ঠে তাহার রূপের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। আমাদের মনকে অবশ্য মুগ্ধ ক'রে মীরার ভজনের আন্তরিকতাময় ঘরোয়া ভাবই। গান গাহিবার এবং শুনিবার সময় তাহার সুরের সূক্ষ্ম কাজের দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখিবার প্রয়োজনই হয় না। এই রকম সিন্ধুড়া ; ঝাঁপতালে রচিত—

ফাগুনকে দিনচার, হোলি খেল মনা রে।
বিনা করতাল পখাবজ বাজৈ,
অনাহতকি ঝঙ্কার রে॥
বিনা সুর রাগ ছত্তীসু গাবৈ,
রোম রোম রনকার রে।
শীল সঁতোষকী কেশর ঘোলী,
প্রেম প্রীত পিচকার রে॥

এই শ্রেণীর ভজন গানগুলি আমাদের দেব-উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে গণ্য হয়। মন্দিরে মন্দিরে আরতির সঙ্গে এ রকম গান ভক্তগণ গাহিয়া থাকেন। গীতার পন্থানুসারে নিজেদের শ্রেষ্ঠধনকে দেবতার পায়ে উৎসর্গ করাই পূজা; সাধক-গায়করা তাঁহাদের দেবদত্ত সুকণ্ঠকে এই ভাবেই সার্থক করিয়া তুলিতেন।

বাংলা দেশের কীর্তন যেমন রাগ আভিজাত্য হইতে বিচ্যুত হইলেও বাংলার গ্রাম্য জনগণের হৃদয়ে স্থান পাইয়াছে, তেমনি ভাবে ঐ সকল হিন্দী ভজন গানও সুর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াও ভারতের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্তে ধ্বনিত হইয়া চলিতেছে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে একমাত্র এই ভজন গান-গুলি সুরের স্বারাজ্যে বাণীর স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে। কবি রবীন্দ্রনাথ তাহাই বলিয়াছেন—"বাংলা দেশে সঙ্গীত কবিতার অনুচর না হোক্, সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত; বাণী তার 'ছায়েবানুগতা'। ভজন সঙ্গীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সঙ্গীত যে বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সঙ্গীত সেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।"

প্রাসাদ ও কুটীর

শ্রীবিনয়ভূষণ সেনগুপ্ত

প্রাসাদ কহিছে গর্বে উঁচু করি শির,
"মোর পাশে কেন আছ দাঁড়ায়ে কুটীর?
দরিদ্রের দল যত, মলিন বসন,
তোমার ও তুচ্ছ কক্ষে করে বিচরণ।
ধনীর দুলাল শত, ঘিরিছে আমায়,
দেখ কত বেশ ভূষা, চমক লাগায়।"

কুটীর কহিল, "সৌধ, আমার সন্তান,
বেশ-ভূষা-হীন বটে, তবু শান্ত প্রাণ।
সম্পদ তোমার মাঝে আনে পরমাদ,
ভা'য়ে ভা'য়ে পিতা পুত্রে ঘটায় বিবাদ।
ঐশ্বর্য-বিভব-শূন্য মোর ছায়া ঘিরে,
রাজাও প্রাসাদ ছাড়ি, শান্তি খুঁজে ফিরে

ত্যাগী শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীঅতুলানন্দ রায়

সন ১৮৮২ সালের ৫ই আগষ্ট। অপরাহ্ন। মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখতে এসেছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। নীচে বৈঠকখানায় বসে বিদ্যাসাগর হাসিমুখে শুনছিলেন তাঁর কথা আর ভাবছিলেন, কে এই নির্বিকার সদানন্দ পুরুষ! রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে মা কালীর পূজারী রামকৃষ্ণ তখন বিভিন্ন ধর্মমতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে মূর্তিমান বৈদিক প্রজ্ঞা। কিন্তু ছাই-চাপা আগুনের মত সেই প্রচ্ছন্ন মহাপুরুষকে বেশী কেউ তখনও বুঝতে পারেনি। তখনও কত লোকে কত কথা ব'লে তাঁর নামে। কী ক্ষীণ বুদ্ধি বিবেচনা। কী লজ্জা। ঠাকুরকে কেউ কেউ তখন 'মাতাল' বলেও বিদ্রূপ করেছে।

সিমলায় ভক্ত রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী থেকে আনন্দে বিভোর রামকৃষ্ণ গলি-পথ দিয়ে যাচ্ছেন বড় রাস্তায় গাড়ীতে উঠতে। ভাব মুখে বাহ্য-জ্ঞান হারা। পা টলছে। পথের ধারে রকে বসেছিল যারা তাদের কেউ কেউ রসিয়ে বলতে লাগলো, "খুব টেনেছে তো। পা টলছে ছাখ···" সবার চোখে যাঁরা বড় তাঁরা কেউ তখনও আসেন না দক্ষিণেশ্বরে। রামকৃষ্ণ নিজেই যান ভক্ত, পণ্ডিতদের দেখতে, আলাপ করতে। পরনে লাল পেড়ে ধুতি গায়ে একটা বোতাম খোলা কালো কোট, ধুতির আঁচলটা কাঁধের উপর···বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বৈঠকখানার একটা বেঞ্চের উপর বসে রামকৃষ্ণ মুচ্‌কি মুচ্‌কি হেসে বললেন, আজ সাগরে এসে মিললাম। এতদিন খাল, বিল, হদ্দ নদী দেখেছি; এইবার সাগর দেখছি। বিদ্যাসাগর সহাস্যে বললেন, তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান। রামকৃষ্ণ বললেন, না না! নোনা জল কেন? ··বিদ্যার সাগর! ক্ষীরসমুদ্র! তবে কি জানো, পুঁথি পুরাণ কেতাব পড়ার উদ্দেশ্য জ্ঞান লাভ করা। ঈশ্বরকে জানার জ্ঞান। ঈশ্বরকে পাওয়ার পথ সন্ধান। গীতা-ই ধর। গীতা কী বলে? দ্বাদশবার আওড়াও। জবাব পাবে। শোন। গীতা গীতা বলতে বলতে শুনবে গী-তাগী-তাগী। মানে ত্যাগী। অর্থাৎ ত্যাগী মানুষ। কিনা, হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানের পাদপদ্ম আশ্রয় কর। যশ মান কামকাঞ্চনাসক্তি মুক্ত হয়ে ঈশ্বরকে জানবার চেষ্টা করতেই বলছে গীতা। আর ঈশ্বরকে জানতে হলে সন্ন্যাসীই বল আর গৃহীই বল, লোভ লিপ্সা ত্যাগ করতেই হবে। অন্য পথ নেই। ওই-ই জ্ঞান। আর সব অজ্ঞান··· অবিদ্যা।

ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ···

তবে লোকে এত সাধন ভজন করে কেন? করে অহঙ্কার নাশ করতে। 'আমি' 'আমার' মায়া ঘুচাতে। "আমি" জ্ঞানেই যত গলদ। 'আমি' ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। তুমি কি বল গা? "আচ্ছা তোমার কি ভাব," রামকৃষ্ণ শুধালেন বাঙলার অন্যতম মনীষী বিদ্যাসাগরকে। বিস্ময়ে বিহ্বল বিদ্যাসাগর মৃদুহাস্যে বললেন, "আচ্ছা সে কথা আপনাকে একলা একলা একদিন বলব।"

জ্ঞান বিজ্ঞানের এই শেষ কথা সুদীর্ঘ সাধন ভজনের ফলে অর্জন করেন নি রামকৃষ্ণ। নিয়েই এসেছিলেন সঙ্গে। প্রকাশ্যে চিরকাল গৃহীর

বেশে, গৃহীর পরিবেশের মধ্যে থেকেও যশ মান কামকাঞ্চনাসক্তির লেশ মাত্রও ছিলনা তাঁর মনে। না লোভ, না লিপ্সা, না লালসার কণা। ত্যাগের স্পৃহা, ত্যাগের শক্তি, ত্যাগে আনন্দ ছিল তাঁর কাছে শ্বাস-প্রশ্বাসের মতো সহজ, সাবলীল।

গৃহী ভক্তদের বলতেন, ঘর ছাড়বে কেন? ঘরে থেকে সাধন ভজন করাই তো সহজ। ঝামেলা কম। সংসারের মধ্যে বাস করে যিনি সাধনা করতে পারেন তিনিই তো বীর সাধক। ত্যাগের বাহ্যিক আড়ম্বর ছিল না রামকৃষ্ণের। ত্যাগ-প্রতীক বহিরাবরণ অবাধ্য মনের সংযমের জন্যই প্রয়োজন মনে করতেন। "শুধু মুখে বললেই হয় না। কথা রাখতে হয়। যা হোক তা হোক করে ত্যাগের সত্যপালন করতে হয়। তবেই না তুমি ত্যাগী।" "তাক্ তেরে কেটে তাক্ বোল্ মুখে বলা সহজ, হাতে বাজানো কঠিন। ধর্মকথা বলা সহজ, কাজে করা বড় কঠিন।" ধর্ম কি? যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈ তৎ···যাকে ধর্ম বলি তার প্রকৃতরূপ সত্য।

এই ভাব, এই প্রত্যয় এই প্রজ্ঞার বলেই না ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ গৃহী ও সন্ন্যাসীর আদর্শ জীবনের এক নিখুঁত সমন্বয় সাধন করে জীবনে অটুট আনন্দ সম্ভোগের পথ দেখিয়েছেন। তাই না ত্যাগাদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ, ত্যাগ সন্ন্যাসের প্রসঙ্গে ভক্ত সঙ্গীদের বলতেন, ঠাকুরকে দেখে চেনা যেতো কি? কতটুকু চিনেছি তাঁকে? ত্যাগীর বাদশা ছিলেন ঠাকুর।

আবাল্য এই সত্যনিষ্ঠায় ছিল তাঁর আনন্দ, অটুট উদ্যম। উপনয়নের সময় ধাইমা ধনী কামারনির একান্ত আগ্রহে কথা দিয়েছিলেন বালক গদাধর, ধাইমার ভিক্ষা গ্রহণ করবেন, সর্বাগ্রে। আত্মীয়স্বজনগণের তীব্র কঠোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও বালক শ্রীরামকৃষ্ণ করেছিলেন সেই সত্য পালন। ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শূদ্রাণীর হাত থেকে অন্ন ভিক্ষা গ্রহণ করে অপূর্ব ইতিহাস রচনা করেছেন। তবেই না সত্য সত্যই স্বীকার করা, যত্র জীবঃ তত্র শিবঃ···তবেই না সার্থক বলা, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।

জগন্মাতা শ্যামার শ্রীচরণে সর্বস্ব নিবেদন করেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যশ-অপযশ, সুখ-দুঃখ, জ্ঞান-অজ্ঞান, ভালো-মন্দ, পাপ-পুণ্য, ভূত-ভবিষ্যৎ। সব। ভক্তদের বলতেন, মাকে সব দিয়েছি, সত্য দিইনি। সত্য ত্যাগ করা যায় না। মায়ের পায়ে যে সব ত্যাগ করলাম, এ সত্য পালন করতে হবে তো। তাই মাকে আর সব দিয়েছি, সত্য দিইনি।

ইষ্টের চরণে এভাবে সর্বস্ব, সব রকমের আশা আসক্তি আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করাকেই তিনি বলতেন, সত্যিকার ত্যাগ, প্রকৃত সন্ন্যাস।

মুখে মনে এক। মুখের কথা, ত্যাগের আগ্রহ মনকে নাড়া দেওয়া চাই। বলতেন, মনেই তো সব। মন স্বাধীন তো তুমিও স্বাধীন। আসক্তি মনের। লোভ লালসা মোহ মনের। দেহের নয় তো। তাই মনকেই বাঁধতে হয়। অষ্টপাশ থেকে মনকে মুক্ত করতে হয়। মুখে যাই বল, সাধন-ভজন যাই কেন না কর, মনের মিল না থাকলে সবই বৃথা। মিল চাই। কথায় কাজে মিল অটুট অনড় মিল।

যৌবন-প্রারম্ভে, জগন্মাতা জগদম্বার দর্শন-লাভের পূর্বে, কাঞ্চনাসক্তি ত্যাগ করতে, গঙ্গার ধারে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, "টাকা মাটি, মাটি টাকা।" টাকায় বাড়ী গাড়ী হয়, লোক-মান্য হয়, ঈশ্বরদর্শন হয় না। তাই তিনি এক হাতে একটা টাকা আরেক হাতে এক ঢেলা মাটি নিয়ে ও আমার চাইনে ব'লে গঙ্গায় ত্যাগ করলেন টাকার সঙ্গে টাকার আসক্তিও।

সেই থেকে টাকা হাতে নিতে শ্রীরামকৃষ্ণের হাত আড়ষ্ট হয়ে বেঁকে যেতো। ছুঁতেই পারতেন

না টাকা পয়সা। জ্বলন্ত আগুনের জ্বালাবোধ হতো গায়ে লাগলে।

গোড়ার দিকে ঠাকুরের এসব অসাধারণত্ব বিশ্বাস করতেন না নরেন্দ্রনাথ। অকুতোভয়ে পরখ করতেন। রামকৃষ্ণের ঘরে বসে একদিন আলাপ করছেন নরেন্দ্র আর আরও কয়েক জন। বাইরে গিয়েছেন রামকৃষ্ণ। এই অবসরে নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) ঠাকুরের বিছানার নীচে একটা টাকা রেখে দিলেন। পরখ করবেন টাকার স্পর্শে সত্যিই ঠাকুরের গা জ্বালা করে কি না। রামকৃষ্ণ ফিরে এসে বিছানায় বসতেই লাফিয়ে উঠলেন, "উঃ"···যেন বিছায় কামড়ালো···গায়ে আগুনের ছেঁকা লাগলো। নরেন্দ্র হতবাক্! টাকাটা বের করে আনা হল বিছানার নীচে থেকে। তবে ঠাকুর বসতে পারলেন শান্ত হয়ে।

এভাবে ত্যাগ। কায়মনে ত্যাগ। মুখে ত্যাগের বড়াই আর মনে ভোগের জন্য লড়াই ·· সে ভাব নয়। নির্দ্বন্দ্ব ত্যাগানুরাগ। অকুণ্ঠ ত্যাগনিষ্ঠা!

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমাবধি রামকৃষ্ণের যা কিছু প্রয়োজন, যোগাতেন মথুরামোহন। ইষ্টজ্ঞানে ভক্তিও করতেন তিনি ঠাকুরকে। তাঁর অবর্তমানে ঠাকুরের কোনও অভাব অসুবিধা না হয় ভেবে, ভক্ত মথুর দশহাজার টাকা আয়ের একটা বিষয় শ্রীরামকৃষ্ণের নামে দানপত্রের দলিল ক'রে দিতে এলেন। শুনে রামকৃষ্ণ চটে আগুন, "তবে রে শালা, তুই আমায় বিষয়ী করতে চাস্!" বলে একটা বাঁশ তুলে তেড়ে মারতে উঠলেন মথুরকে। দলিল ছিঁড়ে ফেলে তবে সেদিন মথুর রক্ষা পান।

ধনী মারোয়াড়ী লক্ষ্মীনারায়ণ ঠাকুরকে প্রণামী দিতে আনলেন নগদ দশহাজার টাকা। ঠাকুর কি ভাবে সে টাকাকেও প্রত্যাখ্যান করেছিলেন, মনে পড়ে।

পিতার মৃত্যুর পর নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে নিদারুণ অর্থাভাব। দোরে দোরে ঘুরেও কোন কাজ পান না। অভাবের তাড়নায় নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত। ঠাকুরকে বললেন, তোমার মাকে বল না আমার অভাব মোচন করতে।

মুখ শুকিয়ে গেছে নরেনের। স্নেহার্দ্র চোখে নরেন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থেকে রামকৃষ্ণ বললেন, ওরে, আমি যে মায়ের কাছে এসব চাইতে পারিনে। পাওয়া চাওয়া সবই মায়ের পায়ে ত্যাগ করেছি যে। তুই যা। মাকে বল। মা-ই তো। আমারও মা, তোরও মা। করুণাময়ী। যা। যা চাইবি, পাবি।

মায়ের মন্দিরে গেলেন নরেন্দ্রনাথ। দেখলেন সর্বৈশ্বর্যশালিনী সর্বার্থসাধিকা অন্নপূর্ণা জগন্মাতা শ্যামার সর্বহরা রূপ। জীবন-মৃত্যুর নর্তননাদ-মুখর মহাব্যোম জুড়ে বিশ্বজননী পরমা প্রকৃতি শ্যামার বরাভয়প্রদা রূপ। অনাবৃত উদ্বেল বক্ষে অনন্ত সন্তান-বাৎসল্যের দোল···ছন্দে ছন্দে কাম-কাঞ্চন-কামনা-রিপুর বিনাশের অখণ্ড অভিযান। আকাশে বাতাসে মায়ের শাশ্বত বাণীর অনুরণন, "মা ভৈঃ, মা ভৈঃ"।

বিষয়বাসনামুক্ত রামকৃষ্ণের স্নেহোষ্ণ নিঃশ্বাসের স্পর্শে জেগে উঠলো নরেন্দ্রের সুপ্ত সহজাত সংস্কার। জেগে উঠলো সর্বত্যাগী শঙ্কর বিবেকানন্দের সুপ্ত আত্মা। ঘুমিয়েই ছিল তো সিংহ-শাবক। ঘুমের ঘোরে স্বপ্নেও সে কি চেঁচায় ক্ষুধার্ত শৃগালের মতো? আবার মন্দিরে ফিরে গেলেন নরেন্দ্র। মায়ের প্রতিমার সামনে লুটিয়ে পড়ে বললেন, বিবেক বৈরাগ্য ভক্তি দাও মা... বার বার তিন বার মন্দিরে গিয়ে ঐ একই প্রার্থনা জানিয়ে এলেন। সাংসারিক প্রার্থনা জানাতে পারলেন না।

পরম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রামকৃষ্ণ বললেন,—

বা তোদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব থাকবে না।

এই ত্যাগানুরাগ, এমনিই ত্যাগনিষ্ঠার মহিমময় ছিলেন বলেই না দেবমানব রামকৃষ্ণ গৃহীর ঠাকুর, সন্ন্যাসীর গুরু, সাধকের পরম পুরুষ।

তান্ত্রিক সাধনার ফলে অষ্টসিদ্ধাই পেয়েছিলেন রামকৃষ্ণ। ইষ্টদেবী আদ্যাশক্তির বর। অলৌকিক ক্ষমতা। অসাধ্যসাধন শক্তি। হৃদয় বললো, মামা অষ্টসিদ্ধাই পেলে তো ওগুলো ফলাও। কাজে লাগাও।

রামকৃষ্ণ সহাস্যে বললেন, ও সব পরীক্ষা প্রলোভন। মহামায়ার বন্ধন। বিষ্ঠাজ্ঞানে এড়িয়ে চলতে হয় ভোগ বিলাসের আসক্তিও, ক্ষমতাও।

ঈশ্বর-দর্শনের সাধনায় সর্বাগ্রে প্রয়োজন মনের সংযম। অখণ্ড অটল ব্রহ্মচর্য···

একান্ত নিষ্ঠায় কাম ত্যাগ করেছিলেন রামকৃষ্ণ। পার্বতী-নন্দন গণেশের মতো ত্রিলোকের সমস্ত রমণী জননীরই অংশসম্ভূতা জেনে রমণীকে জননী-জ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। পুরাণ বলেন, এই জ্ঞানে গণেশ বিবাহ করতে পারেন নি। রমণী মাত্রেই জননী তো।

রামকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন। জননীজ্ঞানও অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন। গণপতি গণেশের চেয়েও বিস্ময়কর মাতৃসত্তা-জ্ঞানে রামকৃষ্ণ তাঁর বিবাহিতা পত্নীকেও বিশ্বজননীর অংশজ্ঞানে শ্রদ্ধা করতেন। জগতে অতুল তাঁদের যুগল জীবন। অপূর্ব-শ্রুত আনন্দঘন বিগ্রহ, জ্যোতির্ময় জীবন্ত এই যুগল মূর্তি !

বৃদ্ধা জননীর সাধ মেটাতেই হোক বা দাম্পত্য-জীবনের এক অশ্রুতপূর্ব আদর্শ দেখাতেই হোক চব্বিশ বছর বয়সে, পূর্ণ যৌবনে রামকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন ছয় বছরের সারদামণিকে। পতিপত্নীর সম্পর্ক অস্বীকার না করে, ব্রহ্মজ্ঞ রামকৃষ্ণ দিনের পর দিন সাগ্রহে সারদামণির মধ্যে জাগিয়ে তুলেছিলেন অম্লান মাতৃসত্তাবোধ। বিশ্বমাতৃত্বের অকুণ্ঠ চেতনা। কামনাগন্ধ-হীন ব্রহ্মচারিণীর অপূর্ব আত্মসংযম। অনাসক্ত নিষ্কাম পতিভক্তি, অনন্ত মধুর বাৎসল্য। তবেই না আমরা পেয়েছি ত্যাগ গরিমার জ্যোতির্ময়ী সবার জননী শ্রীশ্রীমাকে।

সাধক-জীবনের চরম লক্ষ্য ইষ্টদর্শন। সন্ন্যাসীর ব্রহ্মোপলব্ধি। বেদান্ত-সাধনায় অপূর্ব সাফল্য লাভ করে, সুদীর্ঘ ছয় মাস অদ্বৈতভাব-ভূমিতে ব্রহ্মানন্দে বিলীন হয়ে থেকেও জগন্মাতার ডাকে রামকৃষ্ণ নেমে এলেন। মা বললেন, নিজেই আনন্দে ডুবে থাকবি কি ? লোক কল্যাণে নেমে আয়। পথভ্রান্ত আর্ত পীড়িত পতিত জীবের কল্যাণে ভাব মুখে থাক্।

স্বার্থত্যাগ করে, মোক্ষত্যাগ করে, অনির্বচনীয় অপার আনন্দলোক ত্যাগ করে নেমে এলেন রামকৃষ্ণ রোগশোক-ক্লেশাকীর্ণ দুঃখের সংসারে, বিশ্বকল্যাণ-সাধনে তিলে তিলে আত্মদান করতে।

দীপ্তি তো ত্যাগেই। পরহিতায় নিজে পুড়েই না প্রদীপ জ্বলে, আলো দেয়, পথ দেখায়।

আবার ডাকলেন জগদম্বা।···

কাশীপুরের বাগানে নির্জনে ধ্যানে বসেছিলেন নরেন্দ্র···রামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য উত্তরাধিকারী নরেন্দ্র। দোতলার ঘরে শয্যাশায়ী রুগ্ন রামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রকে কাছে ডেকে তার বুকে হাত রেখে রামকৃষ্ণ বললেন, জীবের জন্যই তোর আসা। তাই আজ সর্বস্ব তোকে দিয়ে আমি ফকীর হলাম। সর্বত্যাগ···সর্বস্বত্যাগ···অকাতরে অকুণ্ঠ চিত্তে জীবনার্জিত যথাসর্বস্ব দান···ফতুর হয়ে বিতরণ !!

অপূর্ব ঐশ প্রেরণা-বোধের উদ্বেল প্রবাহ নেচে উঠলো নরেন্দ্রের শিরায় শিরায়। পথভ্রান্ত আর্তমানবকল্যাণ-ব্রতের উত্তরাধিকার মাথা পেতে নিলেন নরেন্দ্রনাথ। অবতীর্ণ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মপ্রত্যয়, প্রকৃতি, প্রতিভা প্রবেশ করলো শিষ্য নরেনের দেহ-দেবালয়ে। রোগশয্যায় ফিরে মহাসমাধিস্থ হলেন রামকৃষ্ণ। গুরুর জীবনাদর্শে গড়ে উঠলো অবোধ্য দেবমানব শ্রীরামকৃষ্ণের অদৃশ্য অন্তরের প্রতিচ্ছায়া সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ।

সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবচনের কারণ

শ্রীরামশঙ্কর ভট্টাচার্য

সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবচন কেন আছে—ইহা এক অতি গভীর প্রশ্ন। আধুনিক ভাষায় দ্বিবচনের প্রয়োগ হয় না, যদিও প্রাচীনতম ভাষায় (যথা ল্যাটিন, গ্রীক্, আরবী) উহার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়। আমরা সংস্কৃত ভাষাকে সর্বপ্রাচীন ভাষা বলিয়া মনে করি, অতএব সংস্কৃত ভাষায় দ্বিবচন কেন আছে—তাহাই এই প্রবন্ধের বিচার্য বিষয়, এবং উহার কারণ নির্ণয় হইলেই অন্যান্য ভাষায় দ্বিবচনের কারণ কি তাহাও জানা যাইবে।

যে শব্দ-সংঘাতের দ্বারা মনোভাবের প্রকাশ হয়, বক্তার মনোভাব শ্রোতা বুঝিতে পারে, এবং শ্রোতা যে আমার বাক্যার্থ হৃদয়ঙ্গম করিল—তাহা বক্তা বুঝিতে পারে—এইরূপ শব্দ-সংঘাতের নাম ভাষা। বস্তুতঃ মনোভাবই ভাষার জনক, ভাষার প্রবর্তন মনোভাবের অনুসারেই হয়। এই সিদ্ধান্তের অনুসারে আমরা বলিতে পারি যে, বেদরচয়িতৃবর্গের মনে এরূপ কোন 'তত্ত্ব' ছিল, যাহা হইতে দ্বিবচন উৎপাদনের অনুকূল ব্যাপার উৎপন্ন হইত; যেরূপ চিন্তা হইত শব্দের প্রয়োগও ঠিক তদনুরূপ হইত। অনুভবানুযায়ী যে শব্দের প্রচলন ও নির্মাণ হইয়া থাকে, তাহা এক প্রসিদ্ধ তথ্য। পাণিনির 'দ্ব্যেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' (১।৪।২২) সূত্র হইতে জানা যায় যে, দ্বিত্বের জন্য দ্বিবচনের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে—অর্থাৎ দ্বিত্ববোধের প্রকাশের জন্য দ্বিবচনের প্রয়োগ করা হয়। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, দ্বিত্বরূপ এক স্বতন্ত্র পদার্থ-সম্বন্ধী মনোভাব অতি প্রাচীনকালে ছিল, যাহার ফলে দ্বিবচনের প্রয়োগ বক্তৃবর্গ করিতেন, অর্থাৎ দ্বিবচনের প্রয়োগে মানসিক দ্বিত্ব-বোধের অভিব্যক্তি হইত। তাৎকালিক বেদরচয়িতৃবর্গ বহুত্বের মধ্যে দ্বিত্বের অন্তর্ভাব করিতেন না। যেরূপ আজকাল আমরা একত্ব এবং অনেকত্বের পৃথক্ পৃথক্ চিন্তা করি, এবং দ্বিত্বকে অনেকত্বের এক ব্যাপ্য পদার্থ বলিয়া বুঝি, বেদরচয়িতৃবর্গ ঠিক সেইরূপ অনেকত্ব হইতে দ্বিত্বের পৃথক-করণ করিতেন। যেহেতু আমাদের আর অনেকত্ব হইতে দ্বিত্বের পৃথক্ বোধ করার সামর্থ্য নাই, অতএব দ্বিত্ববোধের দ্যোতক দ্বিবচনের প্রয়োগও আর আমরা করি না। অতএব আধুনিক ভাষায় ক্রমশঃ দ্বিবচনের প্রয়োগ নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত হইতে ইহা স্বীকার্য হয় যে, ঋষিগণ যে বহুত্ব হইতে পৃথক্ করিয়া দ্বিত্বের গণনা করিলেন, তাহার কারণ ছিল। তাঁহাদের মনে একত্ব-দ্বিত্ব-বহুত্বের পৃথক পৃথক প্রতিভাস। অবশ্যই দ্বিত্ব এবং বহুত্ব একজাতীয় পদার্থ নহে বা বহুত্বের মধ্যে দ্বিত্ব গণিত হয় না, এতদুভয়ের মধ্যে কোনও ভেদক তত্ত্ব কাছে, যদ্দ্বারা দ্বিবচনের পৃথক জ্ঞান হইত। এখন প্রধান হইবে 'দ্বিত্ব' নামধেয় এক পৃথক পদার্থটী কি? এবং কেন বহুত্বের মধ্যে দ্বিত্ব গণিত হয় না?

আমাদের অনুমান এই যে, সাক্ষাৎকৃতধর্মা তত্ত্বসাক্ষাৎকারী ঋষিগণ দেখিলেন যে, কখনও

'এক' হইতে সাক্ষাদ্ভাবে 'বহুর' উৎপত্তি হয় না; কারণ যদি ঐ 'এক' কোন * অপরিণামী তত্ত্ব হয়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য কোনও পরিণামী 'এক' মিলিত হইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত 'বহু' (অর্থাৎ পরিণামময় সৃষ্টি) হইতে পারে না। এই জন্য 'এক'টী দ্বিতীয় এক', অতএব উহাতে দ্বিত্ব আছে—এইরূপ স্বীকার্য হয়। অতএব মানিতে হইবে যে 'বহু'র জন্য দুইটি একের আবশ্যকতা আছে, অর্থাৎ এক+এক=বহু।

বহু এবং সৃষ্টি এক পদার্থ, বহুত্বকে ছাড়িয়া দিলে সৃষ্টির কোনই অর্থ হয় না, এবং অপর পক্ষে সৃষ্টি যতক্ষণ পর্যন্ত না হয়, ততক্ষণ বহুত্বের বোধও হইতে পারে না, বহুত্বের কারণ-ভূত দুইটি পদার্থেরই বোধ হইবে, অতএব সেস্থলে দ্বিবচনের প্রয়োগ করা অনিবার্য হইয়া পড়ে। বহু যে অনন্তেরও বাচক, তাহা ঐতরেয় প্রাঙ্গণে স্পষ্টই বলা হইয়াছে—'অনন্তো বৈ বহু' (২১।২।১৫)। এই তথ্যটির অনুভব সাধক ব্যক্তি করিতে পারিবেন। যদি এইরূপ স্বীকার করা হয় যে কথিত 'এক' পরিণামী পদার্থ, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত না দ্বিতীয় নিমিত্ত কারণের সহিত তাহার যোগ হইতেছে, ততক্ষণ 'বহু'র উৎপত্তি হইতে পারে না। অতএব এই পথেও বহুর জন্য দুইটি 'একের' সদ্ভাব অপরিহার্য হইয়া পড়ে। অতএব স্বীকার্য এই যে, প্রথম ও দ্বিতীয় কারণভূত পদার্থ, ও বহু কার্যভূত পদার্থ, অতএব কেবল কারণভূত পদার্থেরই যখন বোধ হইবে—তখন—দ্বিবচনের প্রয়োগ অনিবার্য হইবে।

প্রাচীনশাস্ত্রে যে সৃষ্টি-তত্ত্ব আছে, তাহাও এই এক-দ্বি-বহু-দর্শনের জ্ঞাপক। যথা—প্রকৃতি-পুরুষ এবং তদনন্তর বহু বিকার; ব্রহ্ম-মায়া এবং তদনন্তর লীলাবৈচিত্র্য; বিন্দু-বিসর্গ এবং অতঃপর সৃষ্টি (আগম); ইত্যাদি। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে 'কেবল দ্বিত্বে'র বোধ হইতে পারে, যেখানে বহুত্বের গন্ধমাত্র নাই। বহুত্বের মধ্যে দ্বিবচন গণিত হইতে পারে না, কারণ দ্বিবচন পর্যন্ত কারণতাবগাহী জ্ঞান থাকে, এবং বহুবচনে কার্যতাবগাহী জ্ঞান হয়। অন্তদৃষ্টি-সম্পন্ন সাধক এই বিষয়ের সাক্ষাৎ প্রমাণ হইবেন।

বেদ স্বয়ং বহুত্বের জন্য দুইটী তত্ত্বের কথা বলেন—'ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে' (ঋগ্বেদ, ৬।৪৭।৮)—এই মন্ত্রের দ্বারা। পুরুরূপ=বহুত্বের জন্য ইন্দ্র+মায়া চাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে কথিত হইয়াছে 'ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ, তদাত্মানমেবাবেৎ অহং ব্রহ্মাস্মীতি, তস্মাৎ তৎ সর্বমভবৎ…'—এই বাক্য হইতেই জানা যায় যে সর্ব=বহুর জন্য 'ব্রহ্ম' ও তাঁহার 'ব্রহ্মাস্মি' রূপ বেদন—এই দুইটি কারণ বর্তমান। যখন যোগী বহুকায়ের নির্মাণ করেন, তখনও তিনি সাক্ষাৎ-ভাবে কায়-সকলের নির্মাণ করিতে পারেন না, তাঁহাকে এক পৃথক্ নির্মাণ-চিত্তের নির্মাণ

* যদিও আমরা বর্তমানে 'এক' এবং 'বহু' দ্বারাই ব্যবহার করি, তথাপি 'দ্বি' রূপে একটী স্বতন্ত্র পদার্থের জ্ঞান প্রাচীন আচার্যের মধ্যে ছিল। প্রবন্ধের শেষের দিকে ইহা বলা হইয়াছে। পাণিনির ৫।৩।৯২ সূত্রভাষ্যে আছে: 'পরিব্রাণশ্চ অনির্জ্ঞাতে, অনির্জ্ঞাতং চ বহুযু। দ্বেকয়োঃ পুনর্নির্জ্ঞাতম্'। জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের দৃষ্টিতে দুই ও বহুর মধ্যে যে ভেদ আছে তাহা পতঞ্জলি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন। ইহা একটি মৌলিক মনোভাব; অবশ্য আজকাল এতাদৃশ বাক্য অসংবদ্ধ প্রলাপ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে 'দুই' যে 'বহু', নহে তাহা অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় আচার্যগণের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিল। প্রাচীন আচার্যগণের মতে সমূহের জ্ঞান 'তিন' হইতে সুরু হয়, 'দুই' পর্যন্ত সমূহের জ্ঞান হয় না (কৈয়টটীকা, ৪।২।৪৩)

করিতে হয় (যোগসূত্র, ৪।৩-৪)। উপনিষদে 'একোহং বহু স্যাম্' কথিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই বাক্যের 'এক, কোনও এক অবিভাজ্য অপরিণামী তত্ত্ব নহে, কিন্তু উহাতে 'চৈতন্য' এবং মনবুদ্ধি (অর্থাৎ দ্রষ্টা+দৃশ্য) আদি আছে, অতএব এখানেও বহুর জন্য দুইটি কারণের সত্তার প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। কিঞ্চ এই বাক্যে সৃষ্টি-তত্ত্বাসংবন্ধী একটি সামান্য সিদ্ধান্ত দেখান হইয়াছে, সৃষ্টিতত্ত্বের বিশ্লেষণ করা হয় নাই, অতএব এই বাক্য আমাদের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের সার্থক হয় না।

পাণিনি স্বয়ং এই সূক্ষ্মতম দর্শনের সহিত পরিচিত ছিলেন। অতএব তিনি দুইটি বচননির্ণায়ক সূত্র করিয়াছেন—বহুষু বহুবচনম্ (১।৪।২১) এবং 'দ্বেকয়োর্দ্বিবচনৈকবচনে' (১।৪।২২)। পাণিনির এই দুইটী সূত্রে বহু অর্থ লক্ষ্য করিবার আছে যাহা আমরা এস্থলে উপন্যস্ত করিতেছি। যথা—

(ক) সূত্রকার দ্বিবচন ও একবচনের এক সূত্রে পাঠ করিয়াছেন এবং বহুবচনের জন্য পৃথক্ সূত্রের রচনা করিয়াছেন। ইহা হইতে জানা যায় যে, তিনি দ্বিবচন ও একবচনকে তুল্য-জাতীয় পদার্থ মনে করিতেন, কারণ আচার্য পাণিনির একটী প্রধান শৈলী এই যে তিনি তুল্যজাতীয় পদার্থের একত্র সঙ্কলন করেন (দ্রষ্টব্য, হয়বরট্ সূত্রভাষ্য—'এষা হি আচার্যস্য শৈলী...' বাক্য)। আমরা পূর্বেই দেখাইয়াছি যে দ্বিত্ব পর্যন্ত কারণতাবগাহী জ্ঞানই থাকে, অতএব উহারা তুল্যজাতীয়। প্রয়োগ-সাধনের দৃষ্টিতে দুইটি পৃথক্ সূত্র করিবার কোনও প্রয়োজন নাই, অতএব অন্য কোনও সূক্ষ্ম প্রয়োজন যে সূত্রকারের ছিল—তাহা দুইটী সূত্রের পৃথক্ কারণ হইতে অনুমিত হয়।

(খ) এই দুই সূত্র একত্র পঠিত হইলে শাব্দিক লাঘব যে হইত তদ্‌বিষয়ে সন্দেহ নাই, তাহা না করার ফলে সূত্রকার যে কোনও বিশিষ্ট অর্থের স্ফুরণ করিয়াছেন—তাহা অবশ্য স্বীকার্য। আর্বাচীন বৈয়াকরণগণ অর্বাগ্ যোগবিৎ ছিলেন, তাঁহারা এই সূক্ষ্মদর্শন বুঝিতে পারেন নাই, অতএব একই সূত্রে একবচন, দ্বিবচন ও বহু-বচনের পাঠ করিয়াছেন, যাহার ফলে পাণিনির অধ্যাত্মদর্শন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অনেক অর্বাক-দর্শী পাণিনীয় বৈয়াকরণগণও স্বীকার করিয়াছেন যে, দুইটী সূত্রের স্থানে একটী সূত্র করিলেই ভাল হইত—কিন্তু তাহা হইলে যে দার্শনিক দৃষ্টির হানি হইত—তাহা এই সমস্ত বৈয়াকরণং-মন্যমানগণ বুঝিতে পারেন নাই।

(গ) সূত্রকার প্রথমে বহুবচনের উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তৎপরে দ্বিবচন ও একবচনের উল্লেখ করিয়াছেন। সাধারণতঃ একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন—এইরূপ ক্রমই অন্যান্য ব্যাকরণতন্ত্রে দেখা যায়, অতএব সহসা সূত্রকার প্রচলিত মানবীয় বোধের অতিক্রমণ কেন করিলেন তাহা প্রষ্টব্য হইতে পারে। উত্তরে বক্তব্য এই যে—জ্ঞানকালে প্রথমে কার্যের জ্ঞান হয়, অতঃপর কারণের জ্ঞান হয়, অতএব শিষ্যসুহৃৎ মাঙ্গলিক আচার্য পাণিনি অগ্রে বহুবচনের সূত্র ও পরে দ্বি-এক-বচনের সূত্র স্থাপিত করিয়াছেন। সমগ্র অষ্টাধ্যায়ীতেই জ্ঞানক্রমের অনুসারে বিষয়-ক্রম রাখা হইয়াছে—তাহা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বৈয়া-করণবর্গ বুঝিতে পারিবেন। এই বিষয়ে 'অষ্টা-ধ্যায়ী-প্রকরণ-ক্রমালোচনম্' নামধেয় আমার সংস্কৃত নিবন্ধ বিশেষভাবে আলোচ্য।

(ঘ) সূত্রোপাত্ত দ্বি এবং এক শব্দ (১।৪।২২) যে দ্বিত্ব এবং একত্বের বাচক তাহা যথার্থ এবং তদ্রূপ 'বহুষু বহুবচনম্' (১।৪।২১) সূত্রস্থ 'বহু' শব্দও বহুত্বের বাচক।

বহু যদি বহুত্বের বাচক হয়, তবে 'বহুষু' পদে বহুবচন কেন হইল—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, এবং প্রাচীন সর্ব টীকাকারগণই ইহার উত্তর দিয়েছেন। আরোপ-ন্যায় অবলম্বন-পূর্বক তাঁহারা যে সমাধান করিয়াছেন, তাহা যথার্থ নহে (ইহার বিশদ বিবরণ মৎকৃত শ্রীমদ্‌ভগবৎপাণিনি-সম্মতসূত্রার্থনির্ণয়ঃ নামক সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।) যথার্থ উত্তর এই:—'বহু' শব্দ কার্যভূত পদার্থের বাচক শব্দরূপে ব্যবহৃত হয়, কার্য সর্বকালেই অমেয় ও বহুসংখ্যক; যদ্যপি কারণ দৃষ্টিতে সমস্ত কার্যতে একত্ব বুদ্ধি হইতে পারে—বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌—এই শ্রৌতন্যায়ানুসারে—তথাপি কার্য-দৃষ্টিতে কার্যে একত্বজ্ঞান কদাপি হইতে পারে না। অতএব 'বহুষু' পদে বহুবচন করা হইয়াছে। 'বহৌ বহুবচনম্‌' বলিতে অবশ্য শাব্দিক লাঘব অবশ্যই হইত, কিন্তু তাহা হইলে দার্শনিক দৃষ্টির হানি হইত—ভগবান্‌ সূত্রকার দার্শনিক ছিলেন।[1]

পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, দ্বিত্বের পৃথক্‌ বোধ হইলে দ্বিবচনের প্রয়োগও অনিবার্য হইবে। কাহার মনে দ্বিত্ববোধ ছিল, এবং কিভাবে অন্যান্য সুপ্রাচীন ভাষাতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ হইয়াছিল—তাহা এস্থলে কথিত হইতেছে। দ্বিবচনের সর্ব প্রাচীন প্রয়োগ বেদে আছে, অতএব বেদরচয়িতৃবর্গের মনে দ্বিত্ববোধ হইত। কেবলমাত্র দুইটি জগৎকারণের জ্ঞান-করণের সামর্থ্য তাঁহাদের ছিল, তাহার ফলে যখন কেবল দুইটি পদার্থ ভাষিত হইত, তখন দ্বিবচনের প্রয়োগানুকূল পৃথক্‌ ব্যাপার হইত। প্রত্যেক বাহ্য কার্যের কোনও না কোনও আধ্যাত্মিক কারণ থাকে, অতএব দ্বিবচনের প্রয়োগের জন্যও যে কোনও আধ্যাত্মিক কারণ বর্তমান—তাহা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। বেদরচয়িতৃবর্গের মনে এই দ্বিত্ববোধ কেন হইল—যেহেতু তখন তো কেবল জগৎ-কারণভূত দুইটি পদার্থমাত্রই ছিল না। উত্তর—অনাদিনিধন বাক্‌স্বরূপ বেদবাণী সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতে প্রবর্তিত। তাঁহার মনে একত্ব-দ্বিত্ব-বহুত্বের পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান যথাবৎ আছে। অতএব বেদেও দ্বিবচন আছে। এই উত্তর অনেকের প্রীতিকর না হইতে পারে, কিন্তু দ্বিত্ববোধ ব্যতীত যে দ্বিবচনের প্রয়োগ হইতে পারে না—তাহা মানিতেই হইবে।

প্রত্যেক কার্যে দুই কারণের দর্শন হেতু দ্বিবচনের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে ইহা সত্য, ঐ হেতু লৌকিক ব্যবহারেও ইহা চরিতার্থ হয়। যদি শঙ্কা হয় যে এরূপ সূক্ষ্ম দর্শন তো জনসাধারণে প্রচলিত হইবার

১ একবচন দ্বিবচন আদি শব্দে আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে, তাহা 'বচন' শব্দের প্রয়োগ। একবচন আদি শব্দে বচনশব্দের সার্থকতা আছে, অন্যথা লাঘব-সর্বস্বব্যসনী ভগবান পাণিনি কেবল 'এক' 'দ্বি' আদি সংজ্ঞারই প্রয়োগ করিতেন, বচন শব্দের কোনও প্রয়োজন ছিল না। 'বচন' শব্দের প্রয়োগ দ্বারা সূত্র-কার জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, কদাচিৎ একত্ব-দ্বিত্ব-বহুত্ব-জ্ঞান বচনসাপেক্ষও হয়—উহাদের পৃথক্‌ পৃথক্‌ জ্ঞান ব্যতীতও। ইহার এক প্রসিদ্ধতম উদাহরণ 'অস্মৎ শব্দের বহুবচনের' প্রয়োগ অর্থাৎ 'বয়ম্‌' পদ। বস্তুতঃ অস্মৎপদলক্ষ্য পদার্থে অখণ্ডতা, অবিভাজ্যতা ও একাত্মরসতা নিত্য-বিদ্যমান। এবং অহংবোধে বহুত্বের গন্ধমাত্রও নাই—ইহা ন্যায়-সাংখ্য-বেদান্তের প্রসিদ্ধ মত এবং অনুভূত তথ্য। তথাপি 'অহং' পদের বহুবচনের যে প্রয়োগ হয়, উহার কারণ বচন—কথন—শব্দব্যবহার, অর্থাৎ যদ্যপি 'বয়ম্‌' পদের যথার্থ প্রত্যক্ষ হয় না, তথাপি—অহম্‌ অহম্‌ অহম্‌ এইরূপ সজাতীয় বচন—শব্দ শুনিয়াই বয়ম্‌ বা 'আবাম্‌'এর অভিকল্পনা করা হয় এবং ঐ দুইটী শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে।

নহে, অতএব কিভাবে ইহা সর্বত্র আদৃত হইল? উত্তর—সমাধিসিদ্ধ ঋষিগণ কর্তৃক যাহা প্রবর্তিত হইল, তাহার তাৎপর্য অনুসন্ধান না করিয়াও তা লোকে প্রয়োগ করিবে—তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন শব্দ-প্রয়োগ আছে, যাহা কোনও সময় বা সম্প্রদায়ে সার্থক ছিল, পরে পরবর্তী কালে বা অন্য সম্প্রদায়ে নিরর্থক হইয়া যায়—তথাপি তাহার প্রয়োগ চলিতেই থাকে—ভাষাবিজ্ঞান হইতে ইহার অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যেহেতু সর্বোৎকৃষ্ট বাক্‌স্বরূপ বেদে দ্বিবচন আছে, অতএব সংস্কৃত ভাষাতেও আছে, এবং উহার অনুসরণ হেতু অন্যান্য প্রাচীন ভাষাতেও দ্বিবচনের প্রয়োগ হইয়াছে; পরে অমনস্বিতা বাড়িয়া গেলে দ্বিবচনের প্রয়োগ বন্ধ হইয়া যায় (আধুনিক ভাষায়)।

যদিও প্রোক্ত মনোভাবের নাশ হইয়া গিয়াছে, তথাপি অদ্যাপি 'দ্বিত্ব' ও 'বহুত্বের' পাথক্য প্রসিদ্ধ আছে। এখনও আমরা 'দুই হইতে পৃথক্ করা' ও 'বহু হইতে পৃথক্ করা'র জন্য তর-তম-প্রত্যয় করিয়া থাকি ও সর্বভাষাতেই এই জাতীয় প্রত্যয় আছে। পৃথক্ করণের দৃষ্টিতে 'দুই হইতে পৃথক্ করা' ও 'বহু হইতে পৃথক্ করার' মধ্যে ভেদ নাই, তথাপি যে ভেদ করা হয়, উহার মূল অনুসন্ধান করিলে জানা যাইবে যে, কোনও না কোনও সময় দ্বিত্ব ও বহুত্ব পৃথক্‌ভাবে গণিত হইত, আজকালের মত 'এক' ও 'বহুর' মধ্যেই বিভাগ করা হইত না।

স্বপ্নাবেশ

শ্রীমতী সুজাতা সেন

জাগরণে ছিনু যে ধ্যানে বসিয়া, দেখিলেম ঘুমঘোরে
ডাকে আসি ত্বরা, আঙিনাতে কারা, তারই বাণী কহে মোরে।
এনেছিল হাতে ফুলভরা সাজি, আমারই পূজার ছিল বুঝি সাথী
জানিনা কেমনে তাকালো চকিতে, কেমনে গেল গো সরে—
ঘুমের উপর ঘুম জমেছিল আলো-ছায়া-মাখা ঘরে।

তবু প্রাণ জানে কি বারতা তারা এনেছিল সাথে করে
মন্দির পথে আরতি দেখিতে অপরূপ বেশ ধরে
বাতায়ন পথে ক্ষীণ দীপালোকে, সহসা দেখিনু যেন রে পলকে
গৃহের দেবতা সজীব আসীন ফুলের আসন পরে
দূরে মন্দিরে বাজিছে ঘণ্টা ডাকিতেছে সকলেরে।

স্বপন আবেশে কত কথা এল কত কথা গেল ফিরে
ভিতর-বাহির সারাটি চিত্ত আলোয় উঠিল ভরে।
পুরাতন যেন কত খেলাঘর, ভাঙ্গি নিল রূপ নব নব-তর
চির চঞ্চল প্রাণবিহঙ্গ স্তব্ধ রহিল নীড়ে,
বরিষে মধুর সঙ্গীত-সুধা অখিল জীবন ঘিরে।

যারা এসেছিল সোনালী-স্বপনে জাগরণে ডেকে দে রে
বেশী কিছু নয় শুধু দুটি কথা বলে দেব ত্বরা করে।
বলে দেব আজি জাগরণ-ঘুম, দুয়েরে দেখেছি স্তব্ধ নিঝুম
জীবন-সত্যে ধ্যান-আরাধিত পাইনু নিমেষে যারে
তাঁহারি আশিস্-মঙ্গলবারি পড়িছে সতত ঝরে।

সমালোচনা

অদ্বৈতামৃতবর্ষিণী—লেখক: শ্রীঅমূল্যপদ চট্টোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান: মহেশ লাইব্রেরী, ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ২৫৩+১৸৵০; মূল্য—আড়াই টাকা। বইটি অদ্বৈতবাদকে কেন্দ্র করিয়া বেদান্তের বিবিধ তত্ত্ববিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন। জটিল দার্শনিক সমস্যা-সমূহের সরল ব্যাখ্যা লেখকের চিন্তাশীল সূক্ষ্ম মনের পরিচয় দেয়। 'আনন্দ' প্রবন্ধটি সত্যই আনন্দ-দায়ক। সম্প্রদায়নির্বিশেষে ধর্মপিপাসু ব্যক্তির নিকট বইটি সমাদৃত হইবে—সন্দেহ নাই। শেষের দিকে লেখকের ভারতীয় দার্শনিক-চিন্তার বিভিন্ন ভাবধারার সারাংশটিও উপভোগ্য।

Benoy Kumar Sarkar (A Study)—অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান: দাসগুপ্ত এণ্ড কোং, ৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা ৯৪; মূল্য—দুই টাকা। সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখক স্বর্গত মনীষী বিনয় কুমার সরকারের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি এবং তাঁহার বিদ্রোহী চিন্তাধারার মৌলিকত্ব সুধীসমাজের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন। বিনয়কুমার বঙ্গের কৃতী সন্তানদিগের অন্যতম; সেইজন্য বাঙ্গালী-মাত্রই বিশেষ করিয়া ছাত্রসম্প্রদায়ের তাঁহার জীবনী এবং বাণীর সহিত পরিচিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। অধ্যাপক শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়ের এই বইটি পাঠ করিলে তাঁহারা এই বিষয়ে প্রচুর সহায়তা লাভ করিবেন মনে হয়।

শ্রীগোবিন্দসুন্দর মুখোপাধ্যায় (অধ্যাপক)

Karl Marx and Vivekananda—লেখক: শ্রীবিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য। ১৩৩নং, আপার সার্কুলার রোড হইতে লেখক কর্তৃক প্রকাশিত। পৃঃ ১০৬+১৬; মূল্য—১৷৷০ টাকা।

জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক সমন্বয় সাধনই আলোচ্য পুস্তকখানির উদ্দেশ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুস্তকের নামকরণ হইতেও এই উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। লেখক পুস্তকের ৩৫ পৃষ্ঠায় উভয়ের এই প্রকার যোগসূত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে মার্কস্ হেগেলের নিকট ঋণী; হেগেল দার্শনিকপ্রবর স্পিনোজার নিকট ঋণী এবং স্পিনোজার সহিত বেদান্তদর্শনের বহু বিষয়ে মিল দেখা যায়। সুতরাং মার্কসের সহিত বেদান্তের তথা বিবেকানন্দের ঐক্যসাধন করা যায়। বলা বাহুল্য এই প্রকার উক্তি আদৌ বিচারসহ নয়, বরং ইহা উক্ত দর্শন ও দার্শনিকদের সম্বন্ধে লেখকের স্বল্প জ্ঞানের পরিচায়ক। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে স্বামিজীর অনেক উক্তিই মার্ক্সীয় সাম্যবাদের অনুকূল বলিয়া মনে হইবে। লেখক অনেকস্থলে এই প্রকার উক্তির সাহায্য লইয়াছেন। মার্কস্ এবং বিবেকানন্দ উভয়েই মানবপ্রেমিক এবং উভয়েই বঞ্চিত এবং শোষিত জনগণের জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন,—লেখকের এই সকল মতও সর্বজনগ্রাহ্য। কিন্তু শুধু এই প্রকার উক্তির দ্বারাই তাঁহাদের মত ও পথের সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা যায় না। তাহা ছাড়া পুস্তকে যুক্তি অপেক্ষা উচ্ছ্বাস প্রবল হওয়ায় রচনা অনেকস্থলে অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য হইয়া পড়িয়াছে। অনেকস্থলে অপ্রাসঙ্গিকভাবে রাষ্ট্র, সমাজ, আইন, আপেক্ষিকবাদ, পরমাণুবাদ প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে। অবশ্য এ সম্বন্ধে লেখক নিজেও সচেতন এবং তিনি উহা স্বীকার করিয়াছেন। লেখকের উদ্দেশ্য সাধু এবং উত্তম প্রশংসনীয়। মার্ক্স্ ও বিবেকানন্দের আদর্শের প্রতি তিনি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। আলোচ্য

পুস্তকখানি তাঁহার ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও অনুভূতির অভিব্যক্তি। তবে পাঠকসমাজের জন্য এ প্রকার পুস্তক রচনা করিতে হইলে আরও ধৈর্য, গভীর অনুশীলন এবং প্রস্তুতি প্রয়োজন।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

উপগীতা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়-প্রণীত। প্রকাশক—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট; কলিকাতা-৬। পৃষ্ঠা—৩২০+১৮/; মূল্য—২৲ টাকা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিষয়বস্তুর আদর্শে ঋগ্বেদ, বিভিন্ন উপনিষদ্, মহাভারত এবং কিছু কিছু অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে শ্লোক সংকলিত করিয়া পনরটি অধ্যায়ে প্রাঞ্জল অনুবাদ সহ সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অধ্যায়গুলির বিভাগ লেখক একটি নিজস্ব পরিকল্পনা অনুসারে করিয়াছেন; উহার যুক্তি ভালই লাগিল। ৪২ পৃষ্ঠাব্যাপী তথ্যপূর্ণ ভূমিকা এবং স্থানে স্থানে জরথুষ্ট্র ও শিখধর্মের চিন্তাধারার সহিত তুলনা-মূলক আলোচনা হৃদয়গ্রাহী।

শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয় পত্রিকা (১৩৫৯)—সম্পাদক—শ্রীহৃষীকেশ চক্রবর্তী, এম্-এ, সাহিত্য-রত্ন। শ্রীরামকৃষ্ণ শিক্ষালয়, ১০৬, নরসিংহ দত্ত রোড হইতে প্রকাশিত।

পত্রিকাখানির এইটি ষষ্ঠবার্ষিকী সংখ্যা। বিদ্যার্থিগণের সুলিখিত রচনাগুলির ব্যাপক বিষয়-বৈচিত্র্য দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শিক্ষালয়ের উচ্চাদর্শ ছাত্রগণের মনন ও প্রকাশ-ভঙ্গীকে প্রভাবিত করিতেছে দেখিয়া আনন্দ হয়।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উৎসব-মুখর শিলং—গত ১১ই চৈত্র শিলং আশ্রমের উপাসনা মন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের মূর্তি-প্রতিষ্ঠার সংক্ষিপ্ত সংবাদ বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই মাসে উক্ত উৎসবের কিছু বিস্তৃততর বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

এই পবিত্র অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক সপ্তাহ কাল ধরিয়া সমগ্র শিলং উৎসব সমারোহে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল। প্রায় ষাট হাজার নরনারী বিভিন্ন দিনের কর্ম-সূচিতে যোগদান করিয়াছিলেন। আশ্রমে প্রভাতকালীন বেদপাঠ এবং সন্ধ্যায় আরতি ও ভজন উৎসবদিবসগুলিকে প্রাণবন্ত করিয়া রাখিত। মঠ ও মিশনের পূজ্যপাদ অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী শংকরানন্দজী মহারাজ কর্তৃক ১১ই চৈত্র মূর্তি-প্রতিষ্ঠার দিন প্রাতঃকালে বিশেষ পূজা হোমাদি এবং রাত্রে কালীপূজা উদ্‌যাপিত হয়। উৎসব-কর্মসূচীর আর একটি অঙ্গ ছিল প্রতিদিন সকালবেলা একঘণ্টা করিয়া ধর্মালোচনা। ইহাতে বিভিন্ন দিবস বক্তার আসন গ্রহণ করেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ, স্বামী শাশ্বতানন্দ, স্বামী বিমুক্তানন্দ, এবং স্বামী গদাধরানন্দ।

দুইদিন মধ্যাহ্নে জাতিধর্মনির্বিশেষে পনর হাজারেরও অধিক নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ ভোজন করানো হয়। এই দুই দিবস দ্বিপ্রহরে শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক লীলা-কীর্তন সমাগত সকলেই সানন্দে উপভোগ করিয়াছিলেন। স্বামী প্রণবাত্মানন্দের ছায়াচিত্রযোগে শিক্ষাপ্রদ বক্তৃতাও বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল।

উৎসব উপলক্ষে শহরের বিভিন্ন স্থানে সাতটি জনসভা আহূত হইয়াছিল। স্বামী

মাধবানন্দজী ছিলেন বিভিন্ন সভাপতিদের অন্যতম। প্রারম্ভিক এবং শেষদিনের সভায় পৌরোহিত্যে বৃত হন যথাক্রমে আসামরাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় শ্রীঅমিয়কুমার দাস এবং বিধানসভার সভ্য শ্রীনীলমণি ফুকন। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের নয়া দিল্লী কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ চারিটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার আলোচ্য বিষয় ছিল বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী, ভগবদ্গীতার মূলতত্ত্ব এবং নাগরিক জীবনের নীতি। কলিকাতা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যার্থি আশ্রমের স্বামী ধ্যানাত্মানন্দ তিনদিন মনোজ্ঞ তথ্যপূর্ণ ভাষণ দেন। শ্রীমতী পুষ্পলতা দাস, এম. পি, শ্রীমহাদেব শর্মা, রাজ্যরত্ন এস. ভি. মুখার্জী, কুমারী উষা ভট্টাচার্য এবং স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ও স্বামী সুপর্ণানন্দও বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য—মিশন বোম্বাই রাজ্যের আহমদনগর জেলায় দুর্ভিক্ষে সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দের উহার উপর পরিচালনার ভার দেওয়া হইয়াছে। প্রধান কেন্দ্র বেলুড় হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসি-সেবক সহকারিতার জন্য দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে গিয়াছেন। ৪টি কেন্দ্র খুলিয়া দুঃস্থ জনগণকে খাদ্য সরবরাহ করা হইতেছে।

জনশিক্ষা-প্রচার—চৈত্র মাসের মাঝামাঝি বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের জনশিক্ষা-বিভাগ হইতে কয়েকজন সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং ছাত্রকর্মী রাঁচির চতুষ্পার্শ্ববর্তী কতকগুলি গ্রামে শিবির খুলিয়া চলচ্চিত্র এবং ছায়াচিত্র প্রভৃতি যোগে জনশিক্ষা প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। ঐ অঞ্চলের অধিবাসিগণের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল।

জয়ন্তী-সংবাদ—মালদহ, কাঁথি, মনসাদ্বীপ, আসানসোল, বাগেরহাট, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর—এই সকল শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। বিস্তারিত বিবরণ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

বিবিধ সংবাদ

পরলোকে হেমচন্দ্র নাগ—গত ৩রা বৈশাখ 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকার সম্পাদক শ্রীহেমচন্দ্র নাগের পরলোক গমনে বাংলার একজন প্রতিভাবান প্রবীণ সাংবাদিকের অভাব হইল। সুদীর্ঘ ৭২ বৎসরের জীবনে বহু সংবাদপত্রের মাধ্যমে স্বাধীন বলিষ্ঠ রচনা দ্বারা অকুণ্ঠিত ভাবে তিনি দেশের সেবা করিয়া গিয়াছেন। অকৃতদার হেমবাবুকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের আদর্শ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বামী বিরজানন্দ মহারাজ ছিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু। মঠের কয়েক জন প্রাচীন সন্ন্যাসীর সহিতও তাঁহার বহুকালের সৌহার্দ্য ছিল। এই দৃঢ়চরিত্র, ধর্মনিষ্ঠ, উদারহৃদয় মনীষীর মৃত্যুতে আমরা পরমাত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করিতেছি। শ্রীভগবান পুণ্যাত্মার ঊর্ধ্বগতি বিধান করুন।

হোজাই (নওগাঁ, আসাম)তে অনুষ্ঠান—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জন্মোৎসব গত ৯ই ও ১০ই বৈশাখ এখানে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সৌম্যানন্দ, স্বামী চণ্ডিকানন্দ, স্বামী শুদ্ধাত্মানন্দ, স্বামী গোপেশ্বরানন্দ, স্বামী ঈশাত্মানন্দ এবং স্বামী কাশিকানন্দ মহারাজগণের শুভাগমনে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

প্রথম দিন উষাকীর্তন, পূজা, হোম, শোভাযাত্রা ও স্বামী সৌম্যানন্দের পৌরোহিত্যে একটি মহতী সভায় বাঙলা ও অসমীয়া ভাষায় শ্রীশ্রীঠাকুর-সম্বন্ধে বক্তৃতা হয়। রাত্রিতে আরাত্রিকের পর "কৃষ্ণলীলা" অভিনীত হইয়াছিল। দ্বিতীয় দিন প্রায় পাঁচ হাজার দরিদ্র-নারায়ণকে পরিতোষ সহকারে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।
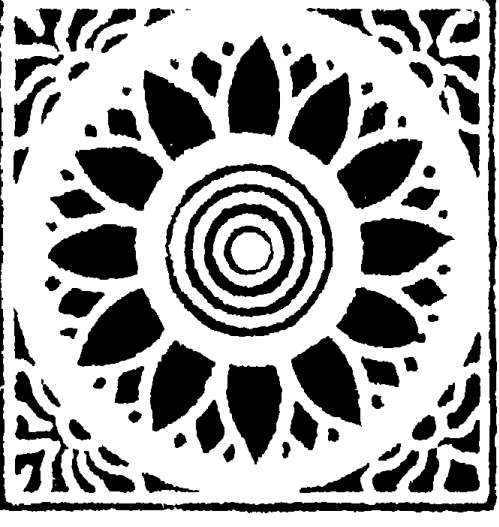
মোহের প্রভাব

আদিত্যস্য গতাগতৈরহরহঃ সংক্ষীয়তে জীবিতং
ব্যাপারৈর্বহুকার্যভারগুরুভিঃ কালোঽপি ন জ্ঞায়তে।
দৃষ্ট্বা জন্মজরাবিপত্তিমরণং ত্রাসশ্চ নোৎপদ্যতে
পীত্বা মোহময়ীং প্রমাদমদিরামুন্মত্তভূতং জগৎ ॥

রাত্রিঃ সৈব পুনঃ স এব দিবসো মত্বা মুধা জন্তবো
ধাবন্ত্যুদ্যমিনস্তথৈব নিভৃতপ্রারব্ধতত্তৎক্রিয়াঃ।
ব্যাপারৈঃ পুনরুক্তভূতবিষয়ৈরিত্থংবিধেনামুনা
সংসারেণ কদর্থিতা বয়মহো মোহান্ন লজ্জামহে ॥

(ভর্তৃহরি—বৈরাগ্যশতকম্, ৪৩-৪৪)

প্রত্যূষে সূর্য উঠে, দিবাশেষে অস্তাচলে ডুবিয়া যায়, পরমায়ু হইতে একটি একটি করিয়া দিন এই ভাবে প্রত্যহ ক্ষয় হইয়া চলে। বহু কার্যভার কাঁধে লইয়া মানুষকে ঘুরিতে হয়, ব্যাপৃতির তাহার আর শেষ নাই; তাই কালের এই দুর্বার গতি তাহার নজরে আসে না। জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং জীবনের বিপুল দুঃখকষ্ট দেখিয়াও সদা-ব্যস্ত মানুষের মনে ত্রাস জাগে না। হায়রে, মানব-চিত্তের বিভ্রম! মোহমদিরা পান করিয়া সারা জগৎ উন্মত্ত।

মনের সঙ্গোপনে উঠে অগণিত সঙ্কল্প—বাহিরে সে গুলিকে বাস্তব রূপ দিতে মানুষ উদ্যম-ভরে কতই না কাজ করিয়া ছুটে। সব কিছুই তাহার মনে হয় কত অভিনব, কত বিচিত্র। কিন্তু হায়, সে বুঝিতে পারে না পৃথিবীতে নূতন বলিয়া বড় বেশী কিছু নাই। সেই রাত্রি, সেই দিন, সেই পুরাতন বিষয়গুলিরই পুনরাবর্তন। যত কিছু ব্যাপার আমরা নূতন ভাবিয়া আকৃষ্ট হই সবই বস্তুতঃ চর্বিত-চর্বণ। বৃথাই আমাদের ছুটাছুটি। সংসারের এই গতানুগতিক জীবন-ধারা আমাদিগকে নাকে দড়ি দিয়া অনর্থক ঘুরাইয়া মারিতেছে। কিন্তু হায়রে মোহ, আমাদের একটুও লজ্জা নাই!

কথাপ্রসঙ্গে

অদ্বৈতজ্ঞান ও মায়া বনাম মায়াবাদ

যিনি আমার পঞ্চভূতাত্মক রক্তমাংসের দেহের প্রকৃত মালিক—দেহী – চেতন আত্মা, তিনিই সকল জীব-শরীরের চালক, সর্বাত্মা—শুধু তাহাই নয়, সমস্ত অচেতন পদার্থসমূহেরও আশ্রয় তিনিই—পৃথিবীতে তিনি, পৃথিবীর উর্ধ্বে অন্তরীক্ষে, দ্যুলোকে তিনি—সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি ছাড়া আর কিছু নাই—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, আত্মৈবেদং সর্বম্—এই জ্ঞানের নাম অদ্বৈতজ্ঞান। সকল উপনিষদ এই জ্ঞানের রহস্য প্রচারে মুখর। ইহা শুধু কথার কথা নয়, কল্পনাবিলাস নয়—প্রত্যক্ষানুভবের বিষয়। যুগে যুগে ভারতবর্ষে (এবং কখনও কখনও ভারতবর্ষের বাহিরেও) সাধক-সাধিকাগণ এই গভীর বৈদান্তিক সত্য সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছেন, হিসাবী দুনিয়া তাঁহাদিগকে উপহাস করিলেও, পাগল বলিলেও গ্রাহ্য করেন নাই—সত্যানুভূতির কৃতার্থতায় ভরপুর থাকিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। প্রশ্ন উঠে, সত্যদৃষ্টিতে সব কিছু যদি চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম বা আত্মা, তাহা হইলে আমি বহু দেখি কেন? মানুষে মানুষে, জীবে জীবে, জড়ে চেতনে এত পার্থক্যবোধ কেন? উপনিষদেরই উত্তর: আমি ভুল করি বলিয়া; করা উচিত নয়, তবুও করি। সত্যের দিকে চোখ ঢাকিয়া মিথ্যা আঁকড়াইয়া থাকি বলিয়া; থাকা লোকসান, তবুও সেই লোকসান মানিয়া লই। আমাদের এই ভুলের, অদ্বৈত-সত্য হইতে বিচ্যুতির কারণ কি? এই প্রশ্নের কোন স্পষ্ট জবাব নাই। শুধু এই টুকু বলা চলে—ভুল, দ্বৈতবোধ কি করিয়া আমাদের কাঁধে চাপিল জানিনা—কিন্তু জন্মিয়া অবধি যে মানুষের উহা সাথী ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মানুষ কখনো কখনো তাহার চেতনার গভীর স্তরে সংসারের বিচিত্র পরিবর্তনের স্রোতের পশ্চাতে একটি অব্যক্ত একতা অনুভব করে, তখন তাহার মনে হয় উহাই শাশ্বত সত্য—আর যাহা কিছু সবই শুধু আসে যায়, অনবরত বদলায় উহাদের থাকা মাত্র কিছুকালের জন্য—শাশ্বত সত্যের তুলনায় উহারা যেন স্বপ্নের মত ছায়া—মিথ্যা। যে সত্য সনাতন, সর্বাবগাহী আর যে সত্য বিকারশীল, সীমাবদ্ধ তাহাদের পার্থক্য একটি বাস্তব পার্থক্য—যতদিন না মানুষ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে। বেদান্ত যখন জগৎকে মায়া বলেন তখন তিনি এই পার্থক্যটিই বুঝাইবার চেষ্টা করেন। সব কিছু ব্রহ্ম এই জ্ঞানের পরিবর্তে অজ্ঞানী মানুষ যে বিশ্বসংসারে বহুত্ব বোধ করে উহারই নাম মায়া। মায়া শুধু ন্যায়ের বা ব্যাকরণের বা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি কথার প্যাঁচ নয়—মায়া স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়—"আমরা কি এবং সর্বত্র কি প্রত্যক্ষ করিতেছি এ সম্বন্ধে প্রকৃত ঘটনার সহজ বর্ণনা মাত্র (statement of facts)।"

মায়াকে কেহ অস্বীকার করিতে পারেনা—যেমন চতুষ্পার্শ্বের বায়ুকে, সূর্যের আলোককে, সম্মুখে প্রবহমান নদীর ধারাকে কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। চরম সত্য অদ্বৈতজ্ঞানকে মানিলে আপেক্ষিক সত্য মায়ার ধারণাও আমাদের কাছে অপরিহার্য হইয়া পড়ে।

সর্বজনানুভূত এই যে তথ্য মায়া—ইহার সহিত 'বাদ' যুক্ত করিয়া আমরা যে 'মায়াবাদ' কথাটি ব্যবহার করি উহার ইতিহাস কিন্তু

স্বতন্ত্র। যাহা একটি অতি স্পষ্ট নিত্য-প্রত্যক্ষ বৈজ্ঞানিক সত্য তাহাকে টিকা-টিপ্পনী বিচার-বিতণ্ডার বেড়াজালে পড়িয়া শুধু একটি মতবাদ (theory) রূপে আত্মপরিচয় দিতে হইতেছে ইহা পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। যে বায়ুকে আমরা মুহূর্তে মুহূর্তে নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিয়া চলি তাহাকে আমরা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার বিষয় করিতে পারি, কিন্তু তাহার সত্যাসত্য লইয়া জল্পনা কল্পনা করা হাস্যকর ব্যাপার। মায়া সম্বন্ধেও ঐ একই কথা প্রযোজ্য। জগৎ-সংসারের ঘটনাপুঞ্জের চোখে-দেখা প্রকৃতির নাম মায়া। উপনিষদ বার বার বলিতেছেন—উহাকে বাজাইয়া লও, পরীক্ষা করিয়া দেখ—সত্যলাভের জন্য ইহা অবশ্য প্রয়োজন। জগৎকে না চিনিলে জগদতীতকে ধরিবে কি করিয়া? এই পরীক্ষা বা বিশ্লেষণ এক কথা কিন্তু মায়াকে বাস্তব দুনিয়া হইতে তুলিয়া পুঁথির পাতায় যখন আমরা সংগ্রথিত করিবার চেষ্টা করি তখন ব্যাপারটা দাঁড়ায় অন্যরূপ। আমরা তখন আর সত্যসন্ধানী বৈজ্ঞানিক থাকিনা—আমরা হইয়া পড়ি 'মায়াবাদী'। অসংখ্য বচন এবং যুক্তির থাম তুলিয়া আমরা মায়াবাদরূপ সৌধের ভিত শক্ত করিতে যাই। শক্ত হয়তো করি—কিন্তু সেই সৌধের ইষ্টকস্তূপে মায়া জিনিষটাই চাপা পড়িয়া যায়। জগৎ ও জীবনের পরম সত্যকে জানিবার যাহা অতি প্রয়োজনীয় ধাপ—মায়াকে চেনা—তাহার আর কোন উপায় থাকে না। ভীতিপ্রদ, দুর্বোধ্য, কুয়াসাচ্ছন্ন একটি শাস্ত্রীয় জটিলতা রূপে মায়া আমাদের সমস্ত বুদ্ধি-বিচারকে বিকল করিয়া বসে!

'মায়াবাদ' এ পৃথিবীতে অনেক গালি খাইয়াছে, এখনও খাইতেছে—কেননা যাঁহারা গালি দেন তাঁহারা বলেন, এই সর্বনাশা 'বাদ' মানুষকে ইহকাল-বিমুখ, অলস, স্বার্থপর করিয়াছে—জগতের সুখদুঃখ উপেক্ষা করিয়া পর্বতগুহায় চোখ বুঁজিয়া বসিয়া থাকিতে শিক্ষা দিয়াছে। এই অভিযোগ একভাবে হয়তো সত্য। কিন্তু যে উপনিষদের ঋষিরা বলিয়াছিলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা বা মায়া, তাঁহারা নিশ্চিতই এই কটূক্তির লক্ষ্য হইতে পারেন না। তাঁহারা কোন চিত্তকল্পিত 'বাদ' উপস্থাপিত করেন নাই। জগৎ ও জীবনের দুই ধাপের দুটি সত্যের (আপেক্ষিক ও পারমার্থিক) তাঁহারা ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। ঐ সত্যদ্বয় কোন 'বাদ' এর অপেক্ষা রাখেনা। উহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা, আকাশ-বায়ু-আলোককে অস্বীকার করার মতই বাতুলতা। 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ঘোষণা করিয়া উপনিষদের ঋষিরা মানুষকে কখনও কর্মবিমুখ ও স্বার্থপর হইতে বলেন নাই। প্রতিক্ষণে বিপরিণামী জগৎ-রীতির যথার্থ পরিচয় লাভ করিলে মানুষ কি তাহার ক্ষুদ্র আমিকে আঁকড়াইয়া বসিয়া থাকিতে পারে, না তাহার কাল্পনিক সীমায়িত ক্ষুদ্র 'মায়িক' ব্যক্তিত্বকে বৃহতের জন্য বিসর্জন দিতে উন্মুখ হয়? বুদ্ধ কি করিয়াছিলেন? শঙ্করাচার্য কি করিয়াছিলেন? জগৎকে তাঁহারা মায়া বলিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাদের সমগ্র জীবন ছিল অকুণ্ঠিত অক্লান্ত মানবসেবায় ভরপুর। আধুনিক কালের শ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাগিনেয় হৃদয়কে ডাকিয়া একদিন বলিয়াছিলেন,—"হৃদু, জগৎটা যদি সত্য হত তা হলে তোদের সমস্ত কামার-পুকুরটা সোনা দিয়ে মুড়ে দিয়ে যেতাম।" অথচ সেই শ্রীরামকৃষ্ণই এই 'মিথ্যা' জগতে থাকিয়া 'মায়া'র মানুষের দুঃখে কাঁদিয়া তাহাদের কল্যাণের জন্য দেহের শেষ রক্তবিন্দু ক্ষয় করিয়া গেলেন। বুদ্ধ-শঙ্কর-শ্রীরামকৃষ্ণের পদানুগ সন্ন্যাসী

বিবেকানন্দও মায়ার জগতের সেবাই মুক্তিলাভের বিশিষ্ট সাধনরূপে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। অতএব সংসারের 'মায়িক' স্বরূপ জানার তাৎপর্য গভীরতর—উহা সংসারের 'ব্রহ্মত্ব' সম্পাদনের সহায়ক। জগৎকে 'মায়া' বলিতে আমরা যেন ভয় না পাই। তবে মায়াকে বাস্তব-সমীক্ষা-বর্জিত, বিবেক-বৈরাগ্য-সম্পর্কশূন্য বাগ-বিতণ্ডার পটভূমিতে একটি 'বাদ' মাত্রে যদি পর্যবসিত করিয়া ফেলি তবে অবশ্যই আমাদিগকে সমালোচকের অনেক নিন্দা শুনিতে হইবে। সেই 'বাদ' দ্বারা কখনও অদ্বৈতজ্ঞান লাভ করা যাইবে কিনা সন্দেহ। অতএব অদ্বৈতজ্ঞান সর্বথা বরণীয়, 'মায়া'ও স্বীকরণীয় কিন্তু 'মায়াবাদ' শুনিবার সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনীয়।

সমুদ্রের গভীরে

পুরাতন বালিগঞ্জের জনৈক বিত্তশালী ভদ্রলোকের প্রশস্ত আঙ্গিনা ও বাগানযুক্ত বাড়ীর দরজায় সন্ধ্যাবেলায় দলে দলে লোক ঢুকিতেছিল। স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, ধনী, গরীব সকল রকম লোকের ভিড়। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখা গেল প্রায় পাচহাজার নরনারী ঘাসের উপর বসিয়া। দূরে এক কোণে একটি ছোট বেদী সাজানো। পূজার আয়োজন রহিয়াছে। রামায়ণের কথকতা হইবে। এতগুলি মানুষ পরস্পর গা ঘেঁষিয়া, বহু অসুবিধা সহ্য করিয়া বসিয়া আছে—কিন্তু কাহারও মুখে চোখে কথায় কোন অস্বস্তি, উদ্বেগ, চঞ্চলতা নাই। ধীরে ধীরে কথক ঠাকুর শালগ্রাম-শিলা বহন করিয়া বেদীর নিকট উপস্থিত হইলেন। স্থিরভাবে বসিয়া নারায়ণ পূজা করিলেন। তাহার পর কথকতা আরম্ভ হইল। সুর করিয়া পয়ারছন্দে রাম সীতা লক্ষ্মণের কাহিনী বর্ণনা—মাঝে মাঝে দু একখানি গীত। নানাজাতির নানা বয়সের নানা প্রকৃতির পাঁচ হাজার মানুষ মন্ত্রমুগ্ধবৎ স্থির ভাবে বসিয়া দুই ঘণ্টা সেই প্রাচীন উপাখ্যান শুনিল। এই চলচ্চিত্র-রঙ্গমঞ্চ-আকীর্ণ, বিবিধ বিলাস-ব্যসন-আমোদপ্রমোদ-ব্যাপৃত সহস্র-কোলাহল-মুখরিত কলিকাতা শহরে ভর সন্ধ্যা-বেলায় এই দৃশ্য দেখিয়া চিত্ত একটি আশ্চর্য আবেগে অভিভূত হইল। শ্রোতৃমণ্ডলী অশিক্ষিত পল্লীগ্রামবাসী, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বৃদ্ধ বা সংসারের সর্বসুখবঞ্চিতা বিধবার দল নহেন। শত শত সুশিক্ষিত, মার্জিতরুচি, ভদ্রঘরের মহিলা ও পুরুষ এবং স্কুলকলেজের ছাত্রছাত্রীরাও বসিয়া ছিলেন।

তবে কি সমুদ্রের গভীরে একটি অনির্জ্ঞাত প্রবাহ বাহিরে সকলের অলক্ষিতে বহিয়া চলিয়াছে, আপন কাজ করিয়া অগ্রসর হইতেছে? যতই না কেন আধুনিকতার স্রোতে আমরা গা ভাসাই, বর্তমান বৃহৎ বিশ্বের রোমাঞ্চকর প্রগতি আমাদের চোখে যতই না ধাঁধা লাগাইয়া যায়, ঈশ্বর, ধর্মনিষ্ঠা, পাতিব্রত্য প্রভৃতি শব্দ ও ধারণাগুলিকে আমরা 'প্রাচীন' বলিয়া যতই না কটাক্ষ করি, ভারতের ভগবান কি ভারতবীণাকে রামায়ণের সুরে বাঁধিয়া এখনও ঝঙ্কার দিতেছেন? আর ভারতের পুত্র-কন্যারা সে সুরে কান না দিয়া পারিতেছে না? যে-গুলিকে আমরা কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস বলিয়া নাক সিঁটকাইতাম সেইগুলির ভিতরই কি প্রাণপ্রদ জীবনসত্য রহিয়া গিয়াছে, আর সেই সত্য পুনর্বার তাহার দুর্বার শক্তি লইয়া আনমনাকে আকর্ষণ করিতেছে? এই আকর্ষণের পরিধি কি বাড়িয়াই চলিবে? আধুনিকতা, ইহকালসর্বস্বতা প্রভৃতি ভারতের মাটিতে আখেরে শিকড় গাড়িতে পারিবে না, ইহাই কি বিধিলিপি?

"ঠাকুরের কৃপায়"

একগাল হাসিভরা মুখে তিনি তাঁহার

ধর্মবন্ধুর সহিত আত্ম-বিভোর হইয়া কথা বলিতেছিলেন। সরকারের উচ্চপদ হইতে সম্প্রতি মোটা টাকার পেনসনে অবসর লইয়াছেন। চাকুরী থাকিতে থাকিতেই তিনটি ছেলেকে এ-সাহেব, বি-সাহেব, সি-সাহেবকে ধরিয়া দুষ্প্রবেশ্য সরকারী বিভাগে ঢুকাইয়া দিতে পারিয়াছিলেন—তাহারা প্রত্যেকেই এখন অফিসার, যথাক্রমে ছয় শ', পাঁচ শ' ও সাড়ে চার শ' মাহিনা পায়। ছোট ছেলেটি এম্-এস্ সি পাশ করিয়া বসিয়া ছিল—'ঠাকুরের কৃপায়' অমুকের সুপারিশে তাহারও একটি ভাল অ্যাপ্রেন্টিসী জুটিয়া গিয়াছে, দুই বৎসর পরে সাত শ' টাকা করিয়া আনিবে। বড় দুটি মেয়ের বিবাহ হইয়া গেছে; এক জামাতা জজ্—অপরজন বর্ধিষ্ণু ব্যবসায়ী। ছোট মেয়েটি বি-এ দিল—পাশ করিবে কোন সন্দেহ নাই—সেতার শিখিতেছে। তাহারও জন্য পাত্র দেখা হইতেছে। বিবাহের টাকা মজুদ আছে; পুত্রহীন শ্বশুর মহাশয়ের উইলের টাকা। কয়েক বৎসর পূর্বেই বালিগঞ্জে যে একটি বাড়ী কেনা হইয়াছিল উহা "ঠাকুরের কৃপায়" খুব তালমতই হইয়া গিয়াছিল। নহিলে আজ দারুণ গৃহসঙ্কটের দিনে ঐরূপ একটি বাড়ী করিতে দেড় লাখ টাকাই লাগিয়া যাইত। গদ্‌গদ কণ্ঠে বন্ধুকে বলিতেছিলেন, সব 'ঠাকুরের দয়া' ভাই।

নিকটে অপর একটি প্রৌঢ় ক্ষীণদেহ ভদ্রলোক দাঁড়াইয়াছিলেন। পূর্বোক্ত সৌভাগ্যবান ভক্তদ্বয়ের কথা শুনিতেছিলেন। মলিন জামা কাপড়, সংসারের অজস্র ঘাতপ্রতিঘাতের চিহ্ন ললাটের কুঞ্চিত রেখায় উঁকি মারিতেছে। ভাবিতেছিলেন, তিনিও তো ঈশ্বরের ভক্ত—সারা জীবন ভগবানে মতি রাখিয়া কাটাইয়া আসিয়াছেন—সৎভাবে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া অর্থোপার্জনের চেষ্টা করিয়াছেন—কিন্তু কই, সংসারের দিক দিয়া 'ঠাকুরের কৃপা' তো তাঁহার উপর হইল না। রোগ-শোক-ব্যাধি-দারিদ্র্য-দুশ্চিন্তা—ইহাদেরই পাইয়াছেন জীবনের নিত্যসহচর—ভগবানের আশীর্বাদ!

ভাগ্যবানকে তিনি হিংসা করিতে ছিলেন না, কিন্তু একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার চিত্ত ক্ষুব্ধ হইতেছিল। এই ভদ্রলোকের সংসারে সুখ-সমৃদ্ধি কানায় কানায় ভরিয়া উঠিয়াছে—জীবনপথে পদে পদে প্রচণ্ড বাধা ঠেলিয়া ইঁহাকে অগ্রসর হইতে হয় নাই, শোকতাপ-দুঃখদুর্দশার কঠোর অভিঘাত ইঁহাকে কখনো আচ্ছন্ন করে নাই—ইঁহার পক্ষে 'ভগবানের কৃপা' সত্যই বাস্তব—কিন্তু রঙ্গমঞ্চে যদি পট-পরিবর্তন হইত, তাঁহার নিজের মত যদি দিনের পর দিন অভাব অনটন অস্বাস্থ্য পারিবারিক অশান্তি এই ভদ্রলোকের জীবনকে ঘিরিয়া রাখিত তাহা হইলে তিনি 'কৃপা'র কথা কি গালভরা হাসিমুখে বলিতে পারিতেন? ভগবান কি কেবল সুখেরই বিধাতা? দুঃখের সময় অমলিন মুখে তাঁহার মহিমা ঘোষণা করার হিম্মত কি আমাদের অর্জন করিতে হইবে না? আর একটি কথা। মানিলাম ভদ্রলোক সঞ্চিত শুভকর্ম-ফলেই হউক অথবা যে কারণেই হউক ভগবানের বিশেষ কৃপাভাজন হইয়াছেন। বিত্ত, মান, পারিবারিক শান্তি—কোন কিছুরই অভাব নাই। কিন্তু ইঁহার কি উচিত নয় সেই কৃপার ফল ভগবানের অপর শত শত সন্তানদিগের সহিত ভাগ করিয়া উপভোগ করা? শ্রীকৃষ্ণ-বুদ্ধ-খ্রীষ্ট-চৈতন্য-শ্রীরামকৃষ্ণের কি তাহাই শিক্ষা নয়? বিষয়ী লোকের সেই দুর্দম্য ধনতৃষ্ণা—সেই ঘোর স্বার্থপরতা—সেই আত্মম্ভরিতা—ইহাদের সহিত 'ঠাকুরের কৃপা'লাভের সামঞ্জস্য কোথায়? ভগবানের মহিমা

কি প্রকটিত হয় বড়লোককে আরও বড়লোক করিয়া? ধনমানমত্ত অহঙ্কারীর অহঙ্কারকে আরও পরিপুষ্ট করিয়া? 'কৃপা' যিনি অনুভব করিয়াছেন তাঁহার অন্তর কি পরিপূর্ণ হওয়া উচিত নয় দীনতা, অনাসক্তি, সন্তোষ, সহানুভূতি, সেবায়?

রবীন্দ্র-জয়ন্তী প্রসঙ্গে

গত ২৫শে বৈশাখ, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ৯২তম জন্মদিন উপলক্ষে কলিকাতায় এবং বাংলাদেশের শত শত স্থানে কয়েকদিন ধরিয়া সভা-সমিতি এবং নৃত্য-গীত, আবৃত্তি প্রভৃতির অনুষ্ঠান হইয়াছিল। বাংলার বাহিরেও নানা স্থানে এই স্মরণীয় উৎসব প্রভূত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ ছিলেন কবি ও সাহিত্য-শিল্পী, কিন্তু তাঁহার বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন শক্তিমান ব্যক্তিত্বের অপর বহুদিকও আমরা দেখিতে পাই—যে গুলি সমানই বিস্ময়কর। তাঁহার ভিতরকার বিচক্ষণ শিক্ষাবিদ্, দরদী লোকসেবক, অদ্ভুতকর্মা সংগঠক, মনস্বী দার্শনিক এবং ভাব-গভীর মরমী সাধক ও ঈশ্বরপ্রেমিক ঐ ঐ ক্ষেত্রে যে সকল মৌলিক চিন্তা, ভাবধারা ও কীর্তিনিচয় রাখিয়া গিয়াছেন তাহা ভারতীয় জাতির অভ্যুত্থানের পথে মূল্যবান পাথেয়। আমাদিগকে আজ রবীন্দ্র-প্রতিভার এই শেষোক্ত দিকগুলির সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হইতে হইবে। ভারতের প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনের আদর্শ কবির জীবন ও চিন্তাধারাকে কী গভীরভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল—ভারত-সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য তাঁহার রচনাবলীতে কী জলন্তভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল—ভারতের সামাজিক ও জাতীয় অগ্রগতির জন্য যাঁহারা পরিশ্রম করিবেন তাঁহাদের কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে তিনি কি কি সারবান উপদেশ দিয়া গিয়াছেন—এই সব বিশেষ করিয়া দেশবাসীর অনুধাবন করা কর্তব্য। বসন্তের হাওয়ায় বকুল ফুলের গন্ধ আঘ্রাণ, আর অলস সন্ধ্যায় আনমনে আকাশের পানে তাকাইয়া মিহিসুরের গান—শুধু ইহা দ্বারাই যদি আমরা রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা অর্পণ করিবার প্রয়াস পাই তাহা হইলে বিশ্বকবির প্রতি অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। রবীন্দ্রনাথ আমাদিগকে মানুষ হইতে বলিয়াছিলেন—ভারতীয় সংস্কৃতিকে চিন্তায়, আচরণে, কর্মে ফুটাইয়া তুলিতে বলিয়াছিলেন। প্রখর মননে—পবিত্র গভীর ভাবসাধনায়—অকুণ্ঠিত কর্মে, আমাদের চরিত্রকে নিরলস, সবল করিয়া তুলিবার ভূরি ভূরি প্রেরণা কবির বাণীতে আকীর্ণ রহিয়াছে। সেইদিকে আমরা যেন বেশী করিয়া দৃষ্টি দিই।

"বেদান্ত বলেন, মুক্তির যে মহা আদর্শ তুমি অনুভব করিয়াছিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু তুমি উহা বাহিরে অন্বেষণ করিতে গিয়া ভুল করিয়াছ। ঐ ভাবকে খুব নিকটে লইয়া আসিতে হইবে, যতদিন না তুমি জানিতে পার যে ঐ মুক্তি, ঐ স্বাধীনতা তোমারই ভিতরে, উহা তোমার আত্মার অন্তরাত্মস্বরূপ। শুধু ইহা বুদ্ধিপূর্বক জানা নহে, প্রত্যক্ষ করা—আমরা এই জগৎকে যতদূর স্পষ্টভাবে দেখিতেছি তদপেক্ষা স্পষ্টভাবে উহা উপলব্ধি করা। * * * তখনই সকল গোলমাল চুকিয়া যাইবে, হৃদয়ের সকল চঞ্চলতা স্থির হইয়া যাইবে, সমুদয় বক্রতা সরল হইয়া যাইবে—তখনই এই বহুত্বভ্রান্তি চলিয়া যাইবে, তখনই এই প্রকৃতি, এই মায়া এখনকার মত ভয়ানক, অবসাদকর স্বপ্ন না হইয়া অতি সুন্দররূপে প্রতিভাত হইবে, আর এই জগৎ এখন যেমন কারাগার বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা না হইয়া ক্রীড়াক্ষেত্র বলিয়া মনে হইবে—তখন বিপদ বিশৃঙ্খলা, এমন কি আমরা যে সকল যন্ত্রণা ভোগ করি তাহারাও ব্রহ্মভাবে পরিণত হইবে।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

স্বামী শান্তানন্দ

১৩১৮ সাল চলিতেছে। শ্রীশ্রীমা রহিয়াছেন বাগবাজারে তাঁহার উদ্বোধনের বাটীতে। মায়ের শরীর সুস্থ হইয়া উঠিতেছে না, তাই জয়রামবাটি যাওয়া স্থির হইল। ৩রা জ্যৈষ্ঠ বুধবার মা কলিকাতা হইতে রওনা হইলেন। হাওড়া ষ্টেশনে নাগপুর প্যাসেঞ্জার নয় নম্বর প্ল্যাট-ফর্ম হইতে ছাড়িবে। প্ল্যাটফর্মে পূজনীয় স্বামী তুরীয়ানন্দ, মাষ্টার মহাশয় প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন; অনেক ভক্তেরও সমাবেশ হইয়াছিল। গোলাপ মা ষ্টেশনে মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন, "আপনি ভক্তদের বলে দিন যে মায়ের শরীর ভাল নয়, তাঁরা যেন দেশে গিয়ে মাকে বিরক্ত না করেন।" মাষ্টার মহাশয়ও জোর গলায় এই কথা সমাগত সকলকেই জানাইয়া দিলেন। মা কিন্তু উহা শুনিতে পাইয়া গোলাপ মাকে ধীরে ধীরে বলিলেন, "একি বোল্‌ছো গোলাপ, একি বোলছো!"

* * *

পরের বৎসর (সন ১৩১৯) কার্তিক মাসে স্থিরীকৃত হইল শ্রীশ্রীমা ৺বারাণসীধাম যাইবেন। মা কলিকাতা হইতে রেলগাড়ীর একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর রিজার্ভ করা কামরাতে ২০শে কার্তিক মঙ্গলবার মোগলসরাই আসিয়া পৌছিলেন। সেদিন একাদশী। সঙ্গে রহিয়াছেন মায়ের আত্মীয়গণ এবং মঠের কয়েকজন সাধু। ষ্টেশনের কর্ম-চারীরা মায়ের কামরাটি কাশীগামী গাড়ীর সহিত জুড়িয়া দিল। গাড়ী গঙ্গার ব্রীজের নিকট আসিলে মা কাশীর দৃশ্য দর্শনে খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ব্রীজের মাঝামাঝি আসিয়া করজোড়ে প্রণাম করিতেছিলেন। মায়ের মুখের ভাবটি অদ্ভুত রূপ ধারণ করিল। মায়ের দুর্বল শরীরে ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনের ওভারব্রীজ পার হইতে বেশ কষ্ট হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ* মায়ের জন্য একটি পালকীর ব্যবস্থা করিয়া রাখেন। অন্যান্য সকলের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত ছিল। অদ্বৈত আশ্রমের গেট হইতে আশ্রম বাড়ী পর্যন্ত অতি সুন্দরভাবে সাজান হইয়াছিল। মায়ের পালকী যখন আশ্রমে পৌছিল তখন বেলা প্রায় ১টা। শ্রীশ্রীমহারাজ, মহা-পুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ, বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি সকলেই সানন্দে মায়ের শুভাগমনের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মা পালকী হইতে নামিলে মহারাজ ভাবে বিহ্বল হইয়া একজন সেবককে বলিয়া উঠিলেন, "ধর্‌ ধর্‌, মা যেন পড়ে না যান।" সে এক অপূর্ব দৃশ্য! হলঘর অতিক্রম করিয়া মা শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার ভাঁড়ার ঘরে গিয়া বসিলেন। অতঃপর কিয়ৎকাল বিশ্রামান্তে তাঁহার জন্য নির্ধারিত বাটীতে গমন করিলেন।

আশ্রমে ২৫শে কার্তিক, শনিবার দিন শ্রীশ্রীশ্যামা পূজা হইল; শ্রীশ্রীমাকে ঐ দিবস আশ্রমে পূজায় শুভাগমন করিতে অনুরোধ করা হইলে তিনি বলিলেন, "আজ যাইব না, কাল যাইব।" পরের দিন বেলা প্রায় ৯।১০ টার

* স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সময় মা আশ্রমবাটীতে আসিয়া কিছুক্ষণ প্রতিমার সম্মুখে বসিয়া ছিলেন।

শ্রীশ্রীমহারাজ প্রতিদিনই প্রাতে ভ্রমণে বাহির হইতেন; ঐ সময় তিনি শ্রীশ্রীমা যে বাড়ীটিতে থাকিতেন সেইখানে গিয়া নীচ হইতে ভূদেব* বলিয়া ডাকিতেন। মা ঐ ডাক শুনিবামাত্র "রাখাল এসেছে" বলিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেন। মহারাজ মায়ের নিকট গেলে পাছে তিনি ভাবে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন এইজন্য নিম্নেই মায়ের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া চলিয়া আসিতেন।

৺কাশীতে মায়ের থাকাকালীন আমি প্রত্যহ অদ্বৈত আশ্রম হইতে ফুল তুলিয়া মায়ের কাছে পূজার জন্য দিয়া আসিতাম এবং ঠাকুরের মিষ্টি প্রভৃতি জলখাবার আনিতাম। একদিন জিলাপী লইয়া যাইবার সময় বাড়ীর প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছি, এমন সময় খাবারের ওপর চিলে ছোঁ মারিল, সাথে সাথে ২।১ খানা জিলাপিও লইয়া গেল। আমি বিমর্ষ হইয়া পড়িলাম; আসিয়া মাকে সমস্ত বিবৃত করিলে মা সেই জিলাপিগুলি ঠাকুরের ভোগে ত দিলেনই না। এমন কি আমাদের কাহাকেও খাইতে দিলেন না, বলিলেন, "চিলের পায়ে কত কি থাকে, এ তোমাদের খেয়ে দরকার নেই।" শ্রীশ্রীমা তাঁহার সন্তানদের কি চোখেই না দেখিতেন!

২৩শে অগ্রহায়ণ, (১৯১৯) অমাবস্যা, রবিবার দিন শ্রীশ্রীমা সকালে ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইলেন। স্নানের পর মা রামচন্দ্রের মন্দির দর্শনপূর্বক ৺বিশ্বনাথের পুরানো ভাঙ্গা মন্দির দেখিতে গমন করিলেন; অতঃপর ৺বিশ্বনাথের মন্দির, ৺অন্নপূর্ণার মন্দির ও ঢুণ্ডীগণেশ দর্শনান্তে নিজ গৃহে ফিরিয়া আসেন।

২৫শে অগ্রহায়ণ মঙ্গলবার সকালে মা অসি-সঙ্গমে স্নানান্তে ঘাটের উপরেই অবস্থিত জগন্নাথ-দেবের মন্দিরে যাইলেন। ইহার পর তাঁহাকে সঙ্কট-মোচনের মন্দিরে লইয়া যাওয়া হইল। এই মন্দিরটির সন্নিকটে একটি বৃহৎ বটগাছ আছে। মা উহা দেখিয়াই বলিলেন, "দেখ, এই বটগাছটি ঠিক আমাদের পঞ্চবটির মতন।" ইহা বলিয়াই তিনি গাছটি স্পর্শ করিলেন। তৎপরে মা প্রথমে শ্রীমহাবীরকে দর্শন করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে আসিলেন। পরিশেষে সঙ্কটমোচনের মন্দিরের পিছন দিকে অবস্থিত তুলসীদাসের সাধন-স্থান পর্যবেক্ষণান্তে গাড়ী করিয়া দুর্গাবাড়ী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং দুর্গাবাড়ী ও স্বামী ভাস্করানন্দের মন্দির পরিদর্শন পূর্বক নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন।

২৮শে অগ্রহায়ণ শুক্রবার বৈকালে মা ভ্রাতুষ্পুত্রী রাধুকে সাথে লইয়া পাল্কী করিয়া সুপ্রসিদ্ধ কালভৈরব দর্শনে যান। মন্দির দেখাইবার জন্য তাঁহার এক সন্ন্যাসী সন্তান সঙ্গে ছিলেন। শ্রীশ্রীমায়ের কয়েকজন আত্মীয়া ও গোলাপ মা প্রভৃতি গাড়ীতে করিয়া গিয়াছিলেন। গাড়ীতে গেলে অনেকখানি রাস্তা হাঁটিতে হইবে বলিয়া শ্রীশ্রীমহারাজ মায়ের জন্য পাল্কীর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কালভৈরব দর্শন করিয়া শ্রীশ্রীমা মন্দিরের উত্তর পশ্চিম কোণের রোয়াকে উপবেশনপূর্বক কিছুক্ষণ জপ করিলেন। তথা হইতে ত্রৈলঙ্গ স্বামীর স্থান এবং তৎপরে আসিলেন বেণীমাধবের মন্দিরে। মায়ের বেণীমাধব ও বেণীমাধবেশ্বর শিব দেখা সমাপ্ত হইলে তাঁহার ভাইপো ও ভাইঝিরা ধ্বজায় উঠিবার ইচ্ছা প্রকাশ করায় মা অনুমতি দিলেন। তিনি নিজে তাঁহার সন্ন্যাসি-সন্তানের সহিত সেইখানে

* মায়ের অনেক ভ্রাতুষ্পুত্রের নাম

অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় কথাপ্রসঙ্গে মা বলিলেন, "দেখ, এখন আমি বুড়ো হয়েছি, তাই উঠ্‌তে পারলাম না। ঠাকুরের শরীর যাবার পর যখন ৺কাশীতে এসেছিলাম, তখন এই ধ্বজায় উঠেছিলাম। সেই সময় যখন পুষ্কর ও হরিদ্বারে যাই তখন সাবিত্রীর পাহাড় ও চণ্ডীর পাহাড়েও উঠেছিলাম।" অপর সকলের বেণীমাধবের ধ্বজা দেখা শেষ হইলে মা ৺সঙ্কটার মন্দিরে আসিলেন। অনন্তর দেবী দর্শনান্তে একটি টাকা দক্ষিণা দিলেন। মন্দিরের পাণ্ডারা ইহাতে অত্যন্ত খুশী হইয়া বার বার জিজ্ঞাসা করিল, "মাঈ কঁহাসে আয়ী!" তাহাতে শ্রীশ্রীমায়ের সহিত আগত সাধুটি উত্তর দিলেন, "য়ঁহাসে আয়ী, অউর কঁহাসে আয়েংগী?" মায়ের কানে উহা যাইতেই তিনি সাধুটিকে ধীরে ধীরে কহিলেন, "না, না, বলো, জয়রামবাটী থেকে এসেছেন।" তদনন্তর মা ৺বীরেশ্বরের মন্দিরাভিমুখে চলিলেন এবং শিবদর্শন ও প্রণামপূর্বক মণিকর্ণিকার ঘাট দেখিয়া প্রায় সন্ধ্যার সময় নিজের বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলেন।

১৫ই পৌষ, বুধবার দিন মায়ের জন্মতিথি পড়িল। অদ্বৈত আশ্রমে অনুষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও হোমাদি তিনি আসিয়া দর্শন করিলেন। অনেক ভক্ত তাঁহাকে এইখানে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। মা পরে কিছু জলযোগান্তে নিজ বাসস্থানে ফিরিয়া যান।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সময়কার একজন কথক ঠাকুর সেই সময় ৺কাশীতে আগমন করেন। তিনি শ্রীশ্রীমাকে কথকতা শুনাইতে আসিলেন। ২৭শে পৌষ, শনিবারে পাঠ হইল শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে কয়েকটি উপাখ্যান। শ্রীশ্রীমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। ধ্রুব চরিতাংশে যখন বালক ধ্রুবের একাকী নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে 'কোথায় আমার সেই পদ্মপলাশলোচন হরি' বলিয়া আকুল হৃদয়ে ক্রন্দন করিবার কথা হইতেছিল, তখন পূজনীয় হরি মহারাজজীর দুই চক্ষু দিয়া জলধারা বহিতে লাগিল। সেই সমাবেশে বেশ একটা জমজমাট্ ভাব সৃষ্টি হইয়াছিল। কথক ঠাকুর কথাপ্রসঙ্গে মাকে বলিলেন, "এখানে একটি রামকুণ্ড আছে, শ্রীরামচন্দ্র যখন ৺কাশীতে আসেন, তখন সেইখানে স্নানাদি করে-ছিলেন; আপনি কি সেই স্থান দর্শন করতে যাবেন?" শ্রীশ্রীমা ঐ কথামত যাইতে সম্মতা হওয়ায় একটি পাল্কীর ব্যবস্থা করা হইল। তিনি অপরাহ্ণে ঐ পাল্কীতে চড়িয়া রামকুণ্ডে গমন ও তথায় উহা স্পর্শ করেন।

পৌষ সংক্রান্তির দিন মা সকাল বেলায় ঘোড়াঘাটে গঙ্গাস্নান করিলেন; সেদিন বিশ্বনাথের মন্দিরে অত্যন্ত ভীড় হইবে বলিয়া ৺শূলটঙ্কেশ্বর মহাদেবকে "এই-ই বিশ্বনাথ" বলিয়া দর্শন করিয়া ফিরিয়া আসেন। অপরাহ্ণে সাড়ে চারটার সময় গাড়ী করিয়া বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা ও ঢুণ্ডি গণেশ দর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। ৺কাশীধামে মা যে কয় মাস ছিলেন, একদিন অন্তর ঘোড়ার গাড়ী করিয়া দশাশ্বমেধ ঘাটে, ঠিক সামনে, গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেন।

ভক্ত তুলসীদাসের সাধন-স্থান সঙ্কটমোচনের মন্দিরে রাসযাত্রা করিবার জন্য বৃন্দাবন হইতে রাসলীলার একটি দল আসে। শ্রীশ্রীমায়ের ভক্ত ডাক্তার নৃপেনবাবু ঐ রাসলীলা মাকে দেখাইতে দলটিকে অদ্বৈত আশ্রমে আনাইলেন। মা তিন দিনই আশ্রমে আসিয়া হলের উত্তর দিকে যে ছোট ঘরটি আছে সেইখানে বসিয়া ঐ পালা দেখিয়াছিলেন। অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আসল ও নকল এক দেখলাম।"

পালা-শেষে তিনি রাসধারীদের কয়েকটি টাকা পারিতোষিক দেন।

একদিন বৈকালবেলা শ্রীশ্রীমা গাড়ীতে করিয়া বটুক ভৈরব, কামাখ্যা, বৈদ্যনাথ ও শঙ্কর মঠ দেখিতে গমন করেন। শঙ্কর মঠ হইতে বাহির হইবার সময় গেটের কাছে দাঁড়াইয়া জঙ্গলের দিকে মুখ করিয়া তাঁহার সহিত আগত সাধুটিকে বলিলেন, "তোমাদের এইদিকে একটা মঠ হলে বেশ হোতো।"

মা একদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ন্যাসী-সন্তানদের খাওয়াইবার জন্য মনস্থ করিলেন। তাঁহার গৃহেই আহারাদির সমস্ত বন্দোবস্ত হইল। শ্রীশ্রীমহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, হরি মহারাজ ও স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী প্রভৃতি সকলে সাহ্লাদে মায়ের বাড়ী গেলেন। বেলা দ্বিপ্রহর আন্দাজ খাইতে বসা হইয়াছিল—সকলেই খুব আনন্দ করিয়া ভোজন করিলেন। মা ঠাকুরের সন্তানদের এবং উভয় আশ্রমের সমস্ত সাধু ব্রহ্মচারীদের একটি করিয়া কাপড় দিবার সঙ্কল্প করেন। তাঁহার ইচ্ছা ও আদেশ মত আমি কাপড় কিনিয়া আনিলাম। হরি মহারাজ অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন, এজন্য মা আমায় বলিলেন, "হরির কাপড়টা গেরুয়া করে দেবে।" শ্রীশ্রীমায়ের নিকট হইতে বস্ত্র পাইয়া পূজনীয় মহারাজগণ সকলেই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তিভরে উহা মাথায় বাঁধিয়া খুব আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বস্ত্র বিতরণের সময় সেবাশ্রমের একখানি কাপড় কম পড়িল; আমি বলিলাম, "এতেই হয়ে যাবে, আর কাপড় কিনতে হবে না।" আমার উত্তর শুনিবামাত্র মা বলিলেন, "না, না; তোমাদের না দিলেও চলে, এরা কত রোগীর সেবা করছে পরের জন্য কত খাটছে, ওদের কাপড় আগে দিতেই হবে। তুমি আর একটি কাপড় কিনে আনো।" আমি তাহাই করিলাম।

মায়ের ৺কাশীতে বাসকালীন আশ্রমে একদিন দশনামী সাধুদের খাওয়ানো হইয়াছিল; মা তথায় আসিয়া সাধুদের দর্শন করিয়াছিলেন।

সেইবার ৺জগদ্ধাত্রী পূজার সময় অদ্বৈত আশ্রমে প্রতিমা গড়িয়া পূজা হইয়াছিল। মা ঐদিন বেলা ১০।১১টার সময় আশ্রমে শুভাগমন পূর্বক পূজা ও হোমাদি দর্শন করিলেন। পূজা সমাপ্ত হইলে মায়ের জন্য তাঁহার বাড়ীতে প্রসাদ লইয়া যাইলাম। মা বলিলেন, "জয়রামবাটীতেও জগদ্ধাত্রী পূজো হচ্ছে, সেখানে পূজো শেষ হলে পর তবে খাবো, রেখে দাও।"

ঠিক হইল ২রা মাঘ, বুধবার, মা ৺কাশীধাম হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন। বেলা দুইটা বাজিয়া চৌদ্দ মিনিটের সময় নিজ বাটী হইতে মা শুভযাত্রা করিয়া বাহির হইলেন। বড় রাস্তায় পৌঁছিলে দেবাদিদেব ৺বিশ্বনাথের উদ্দেশে করজোড়ে প্রণামপূর্বক গাড়ীতে উঠিয়া বসিলেন এবং বেনারস ক্যান্টনমেণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ষ্টেশনে শ্রীশ্রীমহারাজ, হরিমহারাজ ও বিজ্ঞান মহারাজ প্রভৃতি অনেকে আসিয়াছিলেন। বহু সাধু মায়ের সহিত মোগলসরাই ষ্টেশন অবধিও গমন করিয়াছিলেন।

মায়ের ভ্রাতুষ্পুত্র ভূদেবের নিকট শুনিয়াছিলাম, ৺বারাণসীপুরে থাকার সময় মা খুব ভোরে মৃদুস্বরে এই গানটি গাহিতেন,

"শিবের আনন্দ কানন কাশী।
যার মধ্যে বিরাজ করেন অন্নপূর্ণার কাশী॥"

কালী করালিনী

শ্রীসাবিত্রী প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যুদ্দামসমপ্রভাময়ী, আরূঢ়া সিংহোপরি,
চক্রধরালি খেটকরধৃতা ললাটে চন্দ্রকলা ;
অনলস্বরূপা ত্রিনয়নী মাতা, ভীষণা, লম্বোদরী
বিবিধা শক্তি সেবিতা দুর্গা, বর্ণসমুজ্জ্বলা।

পঞ্চমুণ্ডসমাসীনা দেবী, শিরোপরি মহাকালী
নৃমুণ্ডমালা শোভিতা করালী, রত্নমুকুট মাথে,
পীন-উন্নত-ঘটস্তনী মা,—ধ্যানের আলোক জ্বালি'
দেখি, পুস্তক অভয়মুদ্রা অক্ষমালিকা হাতে।

ধ্যান করি তোমা ওগো মহাদেবী আগমশাস্ত্র-গীতা
অনলাত্মিকা রক্তবসনা, দাঁড়াও সমুখে আজি,
অমৃতরশ্মিরত্নমুকুটে হে কালী, মহেশপ্রীতা
চরণপদ্মযুগলে রত্ননূপুর উঠুক বাজি।

গলে মণিহার সহস্রভুজে শূলাদি অস্ত্র শোভে
ইষ্টদাত্রী চরণে তোমার বন্দনা করি নিতি,
জয় হোক তব ভূতাপহারিণী বিচ্ছেদ আনো ক্ষোভে,
হে কালরাত্রি, তোমারে প্রণাম,—নাশো তমিস্রাভীতি।

জননী, আমার সমুখে দাঁড়াও রণরঙ্গিণী বেশে
আকাশে ঠেকুক স্বর্ণমুকুট, জ্বলুক মধ্যমণি,
সূর্য্যের আলো ম্লান হয়ে যাক কুঞ্চিত এলো কেশে
মহাশ্মশানের জ্বলন্ত চিতা দেখ তুমি ত্রিনয়নী।

দক্ষিণ করে খড়্গ তোমার ঝলসি' উঠুক জ্বলে,
সুতীক্ষ্ণ ধারে শোণিত পিপাসা হউক দুর্নিবার,
বাম করে দাও অভয় আশিস ভীত সন্তান দলে,
করালিনী কালী, দাঁড়াগো আবার করি মা অঙ্গীকার—

হৃদয়-পিণ্ড উপাড়িয়া দিব, হৃদয়-বাসিনী শ্যামা
যদি সে অর্ঘ্যে তৃষ্ণা তোমার মিটে যায় চিরতরে,
প্রেতের নৃত্য সহিতে পারি না ; রোষকটাক্ষে থামা
মাতৃমন্ত্রে ছন্দোপতন,—সহিব কেমন করে ?

তুমি মহামায়া, আদ্যাশক্তি কালোয় জগৎ আলো,
অম্বিকা যার ললাট হইতে স্বয়ং সমদ্ভুতা,
দিগম্বরী মা, মুক্ত আকাশে প্রলয়ের শিখা জ্বালো,
লোলজিহ্বার তৃষ্ণা হউক আহ্লাদে আপ্লুতা।

অমাবস্যার ঘনান্ধকার, রজনী দ্বিপ্রহর,
জনমানবের সাড়া নাই, শুধু মহাশ্মশানের বুকে,
শবসাধকের কণ্ঠে মন্ত্র উঠিছে দ্বিঅক্ষর,
মায়ের চরণে প্রাণবলি দিতে চাহি সহাস্য মুখে।

এ হেন সময় ওগো মা জননী দাঁড়াও আঁখির আগে
স্নেহ নয়,—চাহি শাসনকঠোর কটাক্ষ ভয়াবহ,
তৃতীয় নেত্রে যে অগ্নি জ্বলে তাই যেন মনে লাগে,
অগ্নিশুদ্ধ প্রাণবলিদান চরণে তোমার লহ।

ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদ

অধ্যাপক শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন, এম্-এ

ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং স্বরূপসম্বন্ধে ভারতীয় দর্শনসমূহের মধ্যে প্রচুর মতভেদ দেখা যায়। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ এবং জৈন, এই তিন অবৈদিক দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং এই তিন দর্শন সম্পূর্ণ নিরীশ্বরবাদী বলা যাইতে পারে। বৈদিক দর্শনসমূহের মধ্যে মহর্ষি কপিল-প্রণীত সাংখ্য দর্শনও নিরীশ্বর বলিয়াই খ্যাত। আচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুর মতে সাংখ্য, জগতের সৃষ্টি-কর্ত্তা কোনও সগুণ ঈশ্বর কল্পনা না করিলেও নিত্য-মুক্ত নির্গুণ পুরুষবিশেষরূপ ঈশ্বর স্বীকার করে। মীমাংসামতেও জীবের কর্ম্মজনিত ধর্ম্মা-ধর্ম্মই সংসারের সৃষ্টির প্রতি কারণ, সুতরাং জগতের সৃষ্টিকর্ত্তারূপে কোনও ঈশ্বরের কল্পনা করা নিষ্প্রয়োজন। এ জন্য প্রাচীন মীমাংসাদর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হয় নাই। নবীন মীমাংসকগণ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। বেদে ঈশ্বরের উল্লেখ থাকায় তাঁহারাও আগমপ্রমাণবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তবে তিনি জগতের স্রষ্টা নহেন। তিনি পরম কারুণিক। তাঁহার উপাসনা করিলে জীব পরম নিঃশ্রেয়স লাভ করিতে পারে। বৈদিক দর্শনের মধ্যে সাংখ্য এবং পূর্ব্বমীমাংসা ঈশ্বরবাদী কি না তাহা লইয়া মতবিরোধ থাকিলেও ন্যায়-বৈশেষিক, পাতঞ্জল যোগদর্শন এবং বেদান্তদর্শন যে স্পষ্টতর ঈশ্বরবাদী সে বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। এই প্রবন্ধে ন্যায়দর্শনোক্ত ঈশ্বরতত্ত্ব সংক্ষেপে আলোচিত হইবে।

ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম প্রমেয়সূত্রে দ্বাদশ প্রকার প্রমেয়-পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়, (৪) অর্থ, (৫) বুদ্ধি, (৬) মন, (৭) প্রবৃত্তি, (৮) দোষ, (৯) প্রেত্যভাব, (১০) ফল, (১১) দুঃখ এবং (১২) অপবর্গ—এই দ্বাদশ প্রমেয়(ক)। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের উল্লেখ না থাকায় মনে হইতে পারে যে ন্যায়সূত্রকারের মতে ঈশ্বর বলিয়া কোনও পদার্থ নাই। কিন্তু ন্যায়সূত্রকার প্রথম প্রমেয় আত্ম-শব্দের দ্বারা জীবাত্মা অর্থাৎ জীব এবং পরমাত্মা বা ঈশ্বর এই উভয়কেই উদ্দেশ করিয়াছেন। এই স্থলে "ঈশ্বর" কথাটীর উল্লেখ না থাকিলেও চতুর্থ অধ্যায়ের একটী সূত্রে উহা স্পষ্টভাবে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তাহার পরবর্ত্তী সূত্রদ্বয়েও ঈশ্বরতত্ত্বই আলোচিত হইয়াছে(খ)। ঐ স্থলে সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও বলিয়াছেন "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ ; তস্যাত্মকল্পাৎ কল্পান্তরানুপপত্তিঃ।" অর্থাৎ আত্মা জীবাত্মা ও পরমাত্মাভেদে দুই প্রকার। ঈশ্বর আত্মারই প্রকারভেদ হওয়ায় আত্ম-শব্দ দ্বারাই লক্ষিত হইয়াছেন। এই জন্যই প্রমেয়বিভাগ-প্রসঙ্গে মহর্ষি গৌতম পৃথক্ ভাবে আত্মপদার্থের উল্লেখ করেন নাই।

ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, সুখ, দুঃখ এবং জ্ঞান এই ছয়টি আত্মার গুণ। এই ছয়টি গুণ হইতে আত্মার অস্তিত্ব অনুমান করা যায়। ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি গুণের যিনি আশ্রয় তিনিই আত্মা।

(ক) আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ-বুদ্ধি-মনঃ-প্রবৃত্তি-দোষ-প্রেত্য-ভাব-ফল-দুঃখাপবর্গাস্তু প্রমেয়ম্। ন্যায়সূত্র, ১।১।৯

(খ) ন্যায়সূত্র, ৪।১।১৯—২১

এই ছয়টি গুণ আত্মার অসাধারণ ধর্ম্ম, অর্থাৎ ইহা আত্মা ভিন্ন দেহেন্দ্রিয়াদি পদার্থে নাই। এই গুণগুলির মধ্যে আবার ইচ্ছা, প্রযত্ন এবং জ্ঞান এই তিনটী জীবাত্মা এবং পরমাত্মা এই উভয়েরই লক্ষণ; এবং দ্বেষ সুখ ও দুঃখ এই গুণত্রয় কেবল জীবাত্মার লক্ষণ। অর্থাৎ পরমাত্মাতে দ্বেষ, সুখ এবং দুঃখ নাই। তাঁহাতে কেবল নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন এবং নিত্য-জ্ঞান বর্ত্তমান। ঈশ্বর এই গুণত্রয়ের আশ্রয়, ইহাই প্রচলিত ন্যায়মত। ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্তভট্ট বলেন যে, নিত্যজ্ঞান প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরে নিত্যসুখও বর্ত্তমান ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কারণ বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহাকে আনন্দবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া নিত্যসুখ না থাকিলে তাঁহার জগৎসৃষ্টির যোগ্যতা থাকিত না(গ)। মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও ন্যায়কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের উপসংহারে পরমেশ্বরকে "আনন্দনিধে" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। ন্যায়বৈশেষিক সম্প্রদায়ের আরও অনেক গ্রন্থকার ঈশ্বর আনন্দবিশিষ্ট,—নিত্যসুখও ঈশ্বরের অন্যতম গুণ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহা হইলে ন্যায়মতে ঈশ্বর সগুণ পদার্থ। সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত পুরুষ কিম্বা অদ্বৈতদর্শনের নির্গুণ ব্রহ্মের ন্যায় তিনি নির্গুণ পদার্থ নহেন। আত্মার ষড়্বিধ গুণের উল্লেখ করায় বুঝা যায় যে, ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতমের মতে আত্মা-মাত্রই সগুণ। সুতরাং পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরও গুণবিশিষ্ট। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও এই মত সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে, নির্গুণ ঈশ্বর কোনও প্রমাণের বিষয় না হওয়ায় তাঁহার অস্তিত্বসাধন করা যায় না। ঈশ্বরের সগুণত্ব-বোধক বহু শ্রুতিবাক্যও এ বিষয়ে প্রমাণ। তবে যে শাস্ত্রে নির্গুণত্ববোধক বাক্যের উল্লেখ দেখা যায় সে স্থলে "নির্গুণ" শব্দ "গুণাতীত" এই অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে। ন্যায়মতে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টই জগৎসৃষ্টির প্রতি সহকারী কারণ। এই অদৃষ্টই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিনগুণের সমষ্টি বলিয়া অভিহিত হয়। পরমেশ্বরে এই গুণত্রয় না থাকায় শাস্ত্র তাঁহাকে গুণাতীত অর্থাৎ নির্গুণ বলে। অপরপক্ষে "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শ্রুতি-বাক্য দ্বারা তিনি যে নিত্যজ্ঞানরূপ গুণের আশ্রয় তাহা প্রমাণিত হয়।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা উভয়েই সগুণ হইলেও উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সূত্রকারের নির্দ্দিষ্ট ছয়টি আত্মগুণের মধ্যে ঈশ্বর ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন এবং কাহারও কাহারও মতে সুখ—এই কয়েকটি গুণের আশ্রয়। রাগ এবং দ্বেষ ঈশ্বরের ধর্ম্ম নহে। এই গুণসমূহ আবার জীবে নিত্যকাল বর্ত্তমান থাকে না। মুক্তাবস্থায় জীবাত্মায় কোনও গুণই থাকে না। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছাজ্ঞানাদি গুণ নিত্য। নিত্যজ্ঞানের আশ্রয় হওয়ায় ঈশ্বর অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান এবং প্রমাদ হইতে মুক্ত এবং ধর্ম্ম জ্ঞান ও সমাধিরূপ সম্পত্তি-বিশিষ্ট (ঘ)। জীবাত্মার রাগ ও দ্বেষ এই দুইটী গুণ থাকায় তাহার জ্ঞান কখনও কখনও ভ্রম, প্রমাদ প্রভৃতি দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। সুতরাং জীবের জ্ঞান সত্যানৃতমিশ্রিত। কিন্তু ঈশ্বরের রাগদ্বেষ না থাকায় তাঁহার মিথ্যাজ্ঞানের

(গ) সুখত্বস্য নিত্যমেব। নিত্যানন্দেনাগমাৎ প্রতীতেঃ। অসুখিতস্য চৈবম্বিধকার্য্যারম্ভযোগ্যতাভাবাৎ। ন্যায়-মঞ্জরী।

(ঘ) অধর্ম্মমিথ্যাজ্ঞানপ্রমাদহান্যা ধর্ম্মজ্ঞানসমাধিসম্পদা চ বিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪।১।২১

সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ইচ্ছা এবং প্রযত্নও রাগমোহাদির দ্বারা আক্রান্ত হয় না। এইজন্য তিনি সর্ব্বদাই ধর্ম্ম এবং সমাধিযুক্ত। নিরন্তর ধর্ম্ম এবং সমাধিযুক্ত থাকায় তিনি অণিমাদি আট প্রকার ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। এই কারণে এই কারণে তাঁহাকে ঈশ্বর বলা হয়।(৬)

জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা অর্থাৎ ঈশ্বরও লৌকিক প্রত্যক্ষের অযোগ্য। তাহা হইলে তাঁহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ কি? নৈয়ায়িক সম্প্রদায়ের মতে অনুমান এবং আগম এই উভয় প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বরাস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। প্রথম আগম অর্থাৎ শব্দপ্রমাণের কথা আলোচনা করা যাইতেছে। বেদে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক বহু শ্রুতি দেখা যায়। সর্ব্ব-দর্শনসংগ্রহ গ্রন্থে অক্ষপাদ দর্শন অর্থাৎ ন্যায়দর্শনের আলোচনায় দার্শনিকপ্রবর শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন—"এক এব রুদ্রো ন দ্বিতীয়োঽবতস্থে (তৈঃ সং ১।৮।৬) ইত্যাদিরাগমস্তত্র প্রমাণম্।" "এক ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, দ্বিতীয় কেহ ছিলেন না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাঁহার অস্তিত্ব প্রমাণ করে।" কিন্তু শ্রুতি-প্রমাণের সাহায্যে ঈশ্বরাস্তিত্ব সাধন করিতে গেলে একটি সমস্যার উদ্ভব হয়। ন্যায়মতে শ্রুতি অর্থাৎ বেদ ঈশ্বর-কৃত এবং নিত্য জ্ঞানময় ঈশ্বরের সৃষ্টি বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য। সেই শ্রুতি আবার ঈশ্বরাস্তিত্বে প্রমাণ হইলে পরস্পরাশ্রয়রূপ দোষ উপস্থিত হয় অর্থাৎ বেদের প্রামাণ্য ঈশ্বরাধীন এবং ঈশ্বরের অস্তিত্ব বেদশাস্ত্রের প্রমাণাধীন হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যার মীমাংসায় ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন যে, আগম অর্থাৎ বেদ যে অর্থে ঈশ্বরসাপেক্ষ, ঈশ্বর সে অর্থে আগমসাপেক্ষ নহেন; আবার ঈশ্বর যে অর্থে আগমসাপেক্ষ, আগম সে অর্থে ঈশ্বরসাপেক্ষ নহে। যেমন বেদের উৎপত্তি ঈশ্বরাধীন, কিন্তু তাই বলিয়া ঈশ্বরের উৎপত্তি বেদের অধীন নহে। কারণ ঈশ্বর নিত্যপদার্থ, তাঁহার উৎপত্তি নাই। আবার ঈশ্বরে জ্ঞান আগমসাপেক্ষ। বৈদিক শ্রুতি হইতে আমরা ঈশ্বরের বিষয়ে জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু বেদবিষয়কজ্ঞান ঈশ্বরসাপেক্ষ নহে। বৈদিকজ্ঞান গুরুমুখে এবং গুরুপরম্পরায় লব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপে আগম এক অর্থে ঈশ্বরসাপেক্ষ এবং ঈশ্বর অন্য অর্থে আগম সাপেক্ষ হওয়ায় পরস্পরাশ্রয় দোষ ঘটে না।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধনের জন্য নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ অনুমান প্রমাণেরও আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেখা যায় পর্ব্বত সাগর প্রভৃতি পদার্থ সাবয়ব, অর্থাৎ তাহাদের অংশ আছে। ইহা হইতে অনুমান করা যায় যে তাহারা 'জন্য' পদার্থ। যাহা 'জন্য' পদার্থ তাহার অবশ্যই কোনও কর্ত্তা থাকিবে। যেমন ঘটাদি কার্য্য দৃষ্টে কুম্ভকারের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। আর এই কর্ত্তা অবশ্যই চেতন কর্ত্তা হওয়া আবশ্যক। অচেতন পদার্থে ইচ্ছা, প্রযত্ন, জ্ঞান প্রভৃতি গুণ নাই। জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন ছাড়া কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। ঘটের উপাদান বা সমবায়িকারণ মৃত্তিকা। কিন্তু চেতন কুম্ভকারের প্রযত্ন ব্যতিরেকে মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। এইরূপে পর্ব্বত, সাগরাদি সমুদায় জাগতিক পদার্থের উপাদান কারণ নিত্য পরমাণুসমষ্টি। কিন্তু এই পরমাণু জড়পদার্থ। এই পরমাণু সমষ্টি কোনও জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্নবান পুরুষ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইলে তাহা হইতে জগতের উৎপত্তি সম্ভব হয়। অতএব জগতের নিমিত্ত কারণ রূপে পরমাত্মা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায়।

(৬) তস্য চ ধর্ম্মসমাধিফলমণিমাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যম্।
—বাৎস্যায়নভাষ্য, ৪।১।২১

প্রশ্ন হইতে পারে জগতের নিমিত্ত কারণ যে পরমাত্মা পরমেশ্বর হইবেন সে বিষয়ে প্রমাণ কি? জীবাত্মাও ইচ্ছা-জ্ঞানাদি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট। সুতরাং জীবাত্মার পক্ষে জগৎকর্ত্তা হওয়ায় বাধা কি? ইহার উত্তরে বলা যায় যে জীবাত্মার ইচ্ছা, জ্ঞান প্রভৃতি ধর্ম্ম অনিত্য। দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত যোগ হইলে জীবাত্মায় জ্ঞানরূপ ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে জীবের দেহেন্দ্রিয়াদি সৃষ্ট হইতে পারে না। সুতরাং জীবাত্মা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারে না। তাহা হইলে নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা এবং নিত্য প্রযত্ন সম্পন্ন পুরুষবিশেষই যে জগতের নিমিত্ত কারণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এইরূপ যুক্তিবলে ন্যায়দর্শনে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়।

ঈশ্বর জীবের কর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া সাক্ষাৎ ভাবেই জগৎ সৃষ্টি করেন, কিম্বা জীবের কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্ম-অনুসারে সৃষ্টি করেন, এই প্রশ্ন-সম্পর্কে ন্যায়সূত্রকার গৌতম সূত্রগ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে এক বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। দুইটি সূত্রে তিনি পূর্ব্বপক্ষ অর্থাৎ বিরোধী পক্ষের মত প্রকাশ করিয়া তৃতীয় সূত্রে উহা খণ্ডন পূর্ব্বক স্বসিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম সূত্রটি এইরূপ—"ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" (৪।১।১৯)। এই সূত্রের অভিপ্রায় এই যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়াই জগতের নিমিত্ত কারণ হন। যেহেতু অনেক সময়েই জীবের কর্ম্ম বিফল হইতে দেখা যায়। অতএব জীবের কর্ম্ম জগৎসৃষ্টির কারণ হইতে পারে না। ঈশ্বর স্বেচ্ছানুসারে জগতের সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। দ্বিতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে—"ন, পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" (৪।১।২০)। ইহার অভিপ্রায় এই যে, পুরুষের অর্থাৎ জীবের কর্ম্মই জগৎসৃষ্টির কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন। যেহেতু দেখা যায় জীবের কর্ম্মজনিত ধর্ম্মাধর্ম্মই ফলের নিয়ামক হইয়া থাকে। কর্ম্মব্যতীত ফলনিষ্পত্তি হয় না।

উপরোক্ত মতদ্বয় খণ্ডন করিয়া তৃতীয় সূত্রে মহর্ষি গৌতম সিদ্ধান্ত করিয়াছেন ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম-জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই জগতের সৃষ্টিকার্য্য সম্পন্ন করেন। সূত্রটি এইরূপ—তৎকারিতত্বাদহেতুঃ (৪।১।২১)। উহার তাৎপর্য্য এই যে শুধু জীবকর্ম্ম সৃষ্টির কারণ হইতে পারে না, যেহেতু তাহা ঈশ্বরকারিত। তাহা হইলে কেবল ঈশ্বর বা কেবল জীবের কর্ম্মজন্য অদৃষ্ট জগতের নিমিত্ত কারণ নহে। জীবের অদৃষ্ট অচেতন, সুতরাং তাহা ঈশ্বর-নিরপেক্ষভাবে কারণ হইতে পারে না। আর যদি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া ঈশ্বর স্বেচ্ছায় জগৎ সৃষ্টি করেন তাহা হইলে তাঁহাতে বৈষম্য নৈর্ঘৃণ্য প্রভৃতি দোষের আপত্তি হয়। দেখা যায় জগতে বিভিন্ন জীব বিভিন্ন সুখ দুঃখ ভোগ করে; তাহাদের ভোগায়তন দেহেন্দ্রিয়াদির মধ্যেও প্রচুর পার্থক্য লক্ষিত হয়। ঈশ্বর যদি সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় জগৎসৃষ্টি করিয়া থাকেন তাহা হইলে বলিতে হয় যে তিনি কোনও কোনও জীবের প্রতি বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরে এ প্রকার বৈষম্য কল্পনা করা যায় না। সুতরাং বলিতে হইবে যে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুসারে বিচিত্র ভোগায়তন এবং ভোগের উপকরণরূপ এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহা হইতে সন্দেহ হইতে পারে যে সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে সহকারিকারণরূপে গ্রহণ করায় তাহার স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইল। কিন্তু এইরূপ সন্দেহও অনর্থক। কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মের জনক যে শুভাশুভ কর্ম্ম তাহাও ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ

ঈশ্বর কর্তৃক প্রেরিত হইয়া জীব শুভাশুভ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। "এষ হ্যেব সাধু কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এ বিষয়ে প্রমাণ।

সূত্রকারের এই অভিমত পরবর্ত্তী ন্যায়াচার্য্যগণ সকলেই সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিগ্রন্থে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, অন্য কোনও হেতুর অপেক্ষা না করিয়া ঈশ্বর জগৎসৃষ্টি করিলে তাঁহাতে নানা দোষের আপত্তি হয়; সৃষ্টি অনাদি; বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নানা বৈচিত্র্যময়; প্রতি শরীরে ভোগেরও বৈচিত্র্য দেখা যায়; সুতরাং অনুমান করা যায় যে জগৎসৃষ্টির মূলে অদৃষ্ট নামক কোনও অলৌকিক সহকারী কারণ অবশ্যই আছে(চ)।

এখন সমস্যা এই যে, ঈশ্বরের রাগ দ্বেষ বা দুঃখ প্রভৃতি গুণ না থাকায় তাঁহার কোনও অভাবেরও উপলব্ধি হয় না। তাঁহার যদি কোনও অভাব না থাকে তাহা হইলে সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি হয় কেন? "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"—বিনাপ্রয়োজনে মন্দমতি লোকও কোন কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। তাহা হইলে ঈশ্বর কোন্ প্রয়োজনে জগৎসৃষ্টি করিলেন? ইহার উত্তরে নৈয়ায়িক আচার্য্যগণ বলেন পরমকারুণিক ঈশ্বরের করুণাই তাঁহাকে সৃষ্টি কার্য্যে প্রবৃত্ত করে। জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া জীবের মুক্তির জন্য তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। জীবের অনাদিকালে সঞ্চিত শুভাশুভ কর্ম্মের ফল ভোগের দ্বারাই ক্ষয় হইতে পারে। শ্রুতি বলিতেছেন—"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্প-কোটীশতৈরপি"; ভোগব্যতীত শতকোটী কল্পেও কর্ম্ম নাশপ্রাপ্ত হয় না। সুতরাং কর্ম্মক্ষয়ের জন্য ভোগায়তন শরীর এবং ভোগ্য জগৎ প্রয়োজন। এই জন্য ভোগের দ্বারা জীবের কর্ম্মফল ক্ষয় করাইবার উদ্দেশ্যে তাহার ধর্ম্মাধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করেন।

কোনও কোনও আচার্য্যের মতে ঈশ্বর স্বীয় স্বভাববশতঃই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ঈশ্বর নিত্য ইচ্ছা এবং নিত্যপ্রযত্নের আশ্রয়। তাঁহার ইচ্ছা এবং প্রযত্নের ফলে তাঁহার যে ধর্ম্মের উদ্ভব হয় উহাই তাঁহাকে স্বভাবতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত করে। ন্যায়বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর এই মত সমর্থনপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তৎস্বাভাব্যাৎ প্রবর্ত্ততে ইত্যদুষ্টম্", অর্থাৎ ঈশ্বর স্বভাববশতঃই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন ইহা বলিলে কোনও দোষ হয় না। আচার্য্য জয়ন্তভট্ট-কৃত ন্যায়মঞ্জরী গ্রন্থেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যায়। জয়ন্তভট্ট বলিতেছেন—সূর্য্যের উদয়াস্ত যেমন তাঁহার স্বভাবজন্য, বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারও তদ্রূপ ঈশ্বরের স্বভাব-জন্য। আবার সূর্য্যের উদয়াস্ত যেমন জীবের ভোগের জন্য তাহার কর্ম্মকে অপেক্ষা করে, বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহারও তদ্রূপ ঈশ্বরের স্বভাবজন্য হইলেও জীবের কর্ম্মসমষ্টিকে অপেক্ষা করে।

উপরে ঈশ্বরের অস্তিত্বসাধক যে অনুমানপ্রণালী বর্ণিত হইয়াছে মীমাংসক-সম্প্রদায় তাহার প্রামাণিকতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে অশরীরী পদার্থের কর্তৃত্ব কোথাও দেখা যায় না(ছ)। ঈশ্বর যদি অশরীরী হন তাহা হইলে তাঁহার করচরণাদি না থাকায় তাঁহার জগৎসৃষ্টির শক্তি থাকিতে পারে না। আর ঈশ্বরকে শরীরবিশিষ্টও বলা যায় না, কারণ শরীরবিশিষ্ট হইলে তিনি সকলের দর্শন-যোগ্য হইতেন। তাহা ছাড়া ন্যায়দর্শনও

(চ) সাপেক্ষত্বাদনাদিত্বাদ্ বৈচিত্র্যাদ্বিশ্ববৃত্তিতঃ।
প্রত্যাত্মনিয়মাদ্ভুক্তেরস্তি হেতুরলৌকিকঃ॥
ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ১।৪

(ছ) শরীরেণ বিনা যস্য কর্তা কুত্রাপি দৃশ্যতে।
মানমেয়োদয়, দ্রব্যখণ্ড—৩৮ অনুচ্ছেদ

ঈশ্বরের শরীরবত্তা স্বীকার করে না।(জ) যে অনুমানবলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধিত হয় তাহাতে প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত উদাহরণ বাক্যের সমতা না থাকায় অনুমানটীও দুষ্ট হইয়াছে। ঘটের সৃষ্টির প্রতি যেমন কুম্ভকার নিমিত্ত কারণ, জগৎসৃষ্টির প্রতি সেইরূপ ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ—এইরূপ অনুমানে কুম্ভকার শরীরধারী হওয়ায় ঈশ্বরেরও শরীরত্বাপত্তি হইয়া পড়ে। কিন্তু ঈশ্বরের শরীর না থাকায় তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব প্রমাণিত হয় না। ইহার উত্তরে ন্যায়াচার্য্যগণ বলেন যে শরীর থাকা জগৎকর্তৃত্বের বা কোনও প্রকার কর্তৃত্বের হেতু বলা যায় না। তাহা যদি হইত তাহা হইলে নিদ্রিত ব্যক্তিতে বা মৃত শরীরেও কর্তৃত্ব দেখা যাইত। তাহা ছাড়া দেহধারণই যদি কর্তৃত্বের হেতু হয় তাহা হইলে যে কুম্ভকার ইহজন্মে দণ্ডচক্রাদির সাহায্যে ঘট নির্ম্মাণ করে জন্মান্তরে পশুযোনি প্রাপ্ত হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপে ঘটনির্ম্মাণ করা সম্ভব। কারণ তখনও তাহার দেহ থাকে।(ঝ) সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে দেহবত্তাই কর্তৃত্বের হেতু নহে; কার্য্যোৎপত্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্নই হেতু, এবং এইরূপ জ্ঞান ইচ্ছা ও প্রযত্ন যাঁহার আছে তিনিই কর্তা। ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, ইচ্ছা এবং প্রযত্নের আশ্রয় হওয়ায় তাঁহার জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়।

ন্যায়দর্শনের এই ঈশ্বরতত্ত্বের সহিত পাশ্চাত্ত্য আস্তিক (Theistic) দর্শনের ঈশ্বরতত্ত্বের কোনও কোনও বিষয়ে মিল দেখা যায়। অধ্যাপক Flint এর ভাষায় "Theism is the doctrine that the universe owes its existence and its continuance in existence to the reason and will of a self-existent Being, who is infinitely powerful, wise and good." এই বিশ্বের অস্তিত্ব এবং স্থিতি কোনও সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ এবং পরম মঙ্গলময় স্বয়ম্ভূ পুরুষের জ্ঞান ও ইচ্ছার উপর নির্ভর করে—এইরূপ বিশ্বাসকেই ঈশ্বরবাদ বলা যায়। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকগণও জগৎরূপ কার্য্য হইতে ইহার চেতন এবং সর্ব্বশক্তিমান কর্তারূপে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহারাও ঈশ্বরকে পরমকারুণিক এবং জীবের মঙ্গলবিধাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে যে কর্ম্মবাদ স্বীকৃত হইয়াছে পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাহা কুত্রাপি স্থান লাভ করে নাই। সুতরাং নৈয়ায়িক যে স্থলে ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও জীবের শুভাশুভ কর্ম্মকে তাহার সহকারী কারণ রূপে গ্রহণ করিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য ঈশ্বরবাদী দার্শনিকগণ সে স্থলে ঈশ্বরকে নিরপেক্ষ জগৎ-কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঈশ্বর পরম কারুণিক হইলে তাঁহার সৃষ্টিতে সুখ-দুঃখের এত বৈচিত্র্য কেন? পাপ এবং অমঙ্গলের এত প্রাদুর্ভাব কেন?—এই প্রশ্ন পাশ্চাত্ত্য দর্শনেও একটি প্রধান সমস্যারূপে উত্থাপিত হয়। পাশ্চাত্ত্য ঈশ্বরবাদে এই প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় না। কর্ম্মবাদ স্বীকার করায় ভারতীয় দর্শনে এই প্রশ্নের মীমাংসা সহজসাধ্য হইয়াছে। নিজ সুকৃত দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে জীব শুভাশুভ ফললাভ করে। ইহাতে জগতস্রষ্টা ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি হইতে পারে না। নৈয়ায়িক সম্প্রদায় এই প্রকারে সৃষ্টিরহস্যের সমাধান করিয়া থাকেন।

(জ) মানমেয়োদয়—দ্রব্যখণ্ড, ৩৭ অনুচ্ছেদ।

(ঝ) য এব কুলালকায়বান্ ঘটস্য কর্তা স এব করভশরীরবানপি দণ্ডাদীন্ প্রযুঞ্জীত। আত্মতত্ত্ববিবেক।

বিবেকানন্দ ও যুগধর্ম্ম

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১

ক্ষুরধার বুদ্ধির দীপ্তিতে বড়ো বড়ো চোখ দুটী উজ্জ্বল। প্রতিভার ছাপ যুবক নরেন্দ্রনাথের সমস্ত মুখমণ্ডলে। তখনকার যুব-সমাজের মধ্যমণি নরেন্দ্রনাথ। শরীর সুগঠিত এবং বলিষ্ঠ। কিন্তু নরেন্দ্রনাথের মনে একটুও শান্তি নেই। সৌন্দর্য্যের মধ্যে মানুষের তৃপ্তি নেই। অনেক জানার মধ্যেই বা মানুষের পরিতৃপ্তি কোথায়? বিত্তের মধ্যেও কি মানুষের তৃপ্তি আছে? ঋষিরা বলেছেন: ভূমৈব সুখম্। অনন্তের মধ্যেই আমাদের জীবনের আনন্দ। উপনিষদ ঘোষণা করেছে:

সেই এক এবং অদ্বিতীয়, সর্ব্বনিয়ন্তা এবং সর্ব্বভূতান্তরাত্মা পরমপুরুষকে অন্তরের মধ্যে দেখ্‌বার দিব্যদৃষ্টি যাঁরা লাভ করেছেন তাঁরাই কেবল শাশ্বত সুখের অধিকারী হয়েছেন।

নরেন্দ্রনাথের চিত্তে ঈশ্বরদর্শনের জন্য ব্যাকুলতার অন্ত নেই। তাঁর হৃদয় শাশ্বত সুখের পিয়াসী! কে তাঁকে ঈশ্বরের কাছে নিয়ে যাবে? কোথায় সেই কাণ্ডারী যে তাঁকে মৃত্যুর ছায়া থেকে নিয়ে যাবে অমৃতের তীরে? 'সব আনন্দ ধূলায় ফেলে দিয়ে যে আনন্দে বচন নাহি স্ফুরে'—সেই আনন্দ-সমুদ্রে পৌছে দেবার মনের মানুষটী কই?

২

যাঁকে তিনি এমন একান্তভাবে খুঁজ্‌ছিলেন তাঁর দেখা অবশেষে মিল্‌লো গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের ছায়ায়। কিন্তু বিবেকানন্দ ছিলেন মজ্জায় মজ্জায় ক্ষত্রিয়। সহজে কারও কাছে আত্মসমর্পণ করবার মানুষ তিনি ছিলেন না। রোম্যা রলাঁ ঠিকই লিখেছেন: Battle and life for him was synonymous. শক্তির প্রাচুর্য্য থেকে অন্তরে আসে প্রভুত্ব-প্রিয়তা। নরেন্দ্রনাথের আত্মবিশ্বাস ছিল অপরিমেয়। তাঁর মধ্যে ছিল দিগ্বিজয়ী নেপোলিয়ানের জিগীষা। পৌরুষের গরিমায় তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল দৃপ্ত। কালিফোর্ণিয়া থেকে লেখা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিলের একখানি পত্রে স্বামিজী নিজের এই দুর্ব্বলতার কথা স্বীকার ক'রেছেন। ঐ পত্রের এক জায়গায় আছে:

"ইতিপূর্ব্বে আমার কর্ম্মের ভিতর নামযশের ভাবও উঠিত, আমার ভালবাসার ভিতর ব্যক্তিবিচার আসিত, আমার পবিত্রতার পশ্চাতে ফলভোগের আকাঙ্ক্ষা থাকিত। আমার নেতৃত্বের ভিতর প্রভুত্বস্পৃহা আসিত।" (পত্রাবলী দ্বিতীয় ভাগ)

রোম্যা রলাঁ স্বামীজীর জীবনচরিতে তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন: 'For he suffered from that excess of power which insists on domination and within him there was a Napoleon.'

সাহিত্যিক রলাঁর দ্রষ্টার চোখে স্বামিজীর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ঠিকই ধরা পড়েছিল। নারীসুলভ পেলবতা দিয়ে বিধাতা তাঁকে তৈরী করেন নি। তিনি ছিলেন বজ্রের উপাদানে গড়া পুরুষসিংহ। পত্রাবলীর আর একখানি পত্রে আছে: "বীর আমি যুদ্ধক্ষেত্রে মরব,

এখানে মেয়েমানুষের মত বসে থাকা কি আমার সাজে ?" (পত্রাবলী ২য় ভাগ)

কবি সত্যেন দত্তের ভাষায় স্বামিজী 'বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ,' রলাঁর ভাষায় Warrior prophet.

এই ধরণের ব্যক্তিত্বসম্পন্ন জিগীষু অতি-মানবের পক্ষে সহজে কাকেও মেনে নেওয়া স্বভাবতঃই সম্ভব ছিল না। তাঁর সতেজ মস্তিষ্কের প্রদীপ্ত বুদ্ধি সংশয়ের পর সংশয়ের পারাবারকে অতিক্রম ক'রে তবে একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের পদপ্রান্তে দৃপ্ত ফণা নত করেছিল। ভগিনী নিবেদিতা The Master as I saw Him গ্রন্থে লিখেছেন, আমার চিত্তের সংশয়াকুল অবস্থার দিকে লক্ষ্য ক'রে একদা তিনি বলেছিলেন :

Let none regret that they were difficult to convince ! I fought my Master for six years, with the result that I know every inch of the way ! Every inch of the way !"

সন্দেহের অন্ধকারকে অতিক্রম ক'রে, ছয় বৎসরব্যাপী সংগ্রামের শেষে সত্যের শিখরদেশে তিনি পৌছে গেলেন। কুয়াশা কেটে গিয়ে পথ তাঁর সাম্নে জেগে উঠ্‌লো। তাঁর মনে ভয়, সংশয়, ইতস্ততঃ ভাব—কিছুই আর রইলো না। ঠাকুরের কাছে তিনি নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলেন।

৩

ঠাকুরের কৃপায় যুবক নরেন্দ্রনাথ নির্ব্বিকল্প সমাধির অনির্ব্বচনীয় সুধাসমুদ্রের মাঝে কেমন ক'রে তলিয়ে গিয়েছিলেন—তার কাহিনী সুপরিচিত। সমাধি ভেঙে গেলে নরেন্দ্র গুরুর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন যেন তিনি যোগের আনন্দের মধ্যে মগ্ন হ'য়ে থাক্‌তে পারেন। ঠাকুর শিষ্যের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন নি। রোরুদ্যমান আর্ত্ত জগতের প্রতি অঙ্গুলি সঙ্কেত ক'রে নরেন্দ্রকে ঠাকুর বলেছিলেন : তুই স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের মুক্তি নিয়ে থাক্‌বি ? তোর মুক্তি বন্ধ রইলো আমার সিন্দুকে। তোর কাজ যখন ফুরিয়ে যাবে আবার তুই নির্ব্বিকল্প সমাধির আনন্দ আস্বাদন করবি। ঠাকুরের এই বাণীর পূর্ণ তাৎপর্য্য স্বামিজী হৃদয়ঙ্গম করতে পারলেন যখন তিনি পরিব্রাজকের বেশে ভারতের একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্ত পর্য্যন্ত পরিভ্রমণ করছিলেন। স্বদেশের সহস্র সহস্র গ্রামে লক্ষ লক্ষ কুটীরে যারা বসবাস করে তারা মানুষ, না জীবন্ত নরকঙ্কাল ? তাঁর চোখের সামনে থেকে একটা পর্দা যেন সরে গেল। দেখলেন, সাম্নে দুলছে দিগন্তবিস্তারী ফেনিল দুঃখ-সমুদ্র। কোটী কোটী মানুষ বৎসরে একটী দিনের জন্যও পেট ভ'রে খাওয়ার আনন্দ জানে না। তাদের জীবনের উপরে দুঃসহ দারিদ্র্যের জগদ্দল পাথর চাপানো। তাদের শুভবুদ্ধি শত-শতাব্দীর কুসংস্কারের গাঢ় তমসায় আচ্ছন্ন ! তাদের মেরুদণ্ড অত্যাচারে অত্যাচারে, অবজ্ঞায় অবজ্ঞায় ভগ্নপ্রায়। এরা জীবিত না মৃত, অথবা জীবন্মৃত ? ভারতের সমস্ত লাইব্রেরীর মূল্যবান গ্রন্থরাজি স্বামিজীকে যে জ্ঞান দিতে না পারতো জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের দারুণ অভিজ্ঞতা তাঁকে দান করলো সেই জ্ঞানের অমূল্য সম্পদ। দেখলেন হতাশাময় বর্ত্তমানের অশ্রুসজল সকরুণ মুখচ্ছবি ! দেখলেন মুক্তিপিপাসু মহামানবের মধ্যে স্বয়ং নারায়ণই সংগ্রাম করছেন বাঁধন ছেঁড়ার জন্য ! দেখলেন ভারতবর্ষ মহাশ্মশান, আর দেখলেন সেই মহা-শ্মশানে অমঙ্গলের অভ্রভেদী বিরাট স্বরূপ !

কান পেতে শুনলেন সর্ব্বনাশের অতলে নিমজ্জমান দরিদ্রের সকরুণ ক্রন্দন!

এই দুঃখ-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে স্বামিজী মজ্জায় মজ্জায় উপলব্ধি করলেন ঠাকুরের 'খালি-পেটে ধর্ম্ম হয় না' কথাটির সম্যক তাৎপর্য্য। পেটে খিদে থাকলে মানুষ ভগবানের কথা ভাববে কেমন ক'রে? কেমন ক'রে সে অনুভব করবে ঈশ্বরকে পাওয়ার অনির্ব্বচনীয় আনন্দ? শরীর যদি যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য না পায় চিন্তাশক্তিও দুর্ব্বল হ'তে বাধ্য। দুর্ব্বল মস্তিষ্ক নিয়ে কে কবে ঈশ্বরকে পেয়েছে? আমাদের দেশে ধর্ম্মের নামে এত যে বৈরাগ্য-চর্চ্চা—এর বেশীর ভাগই তো জড়তাপ্রসূত। স্বামিজী অনায়াসে বুঝতে পারলেন, সব আগে দেশের মানুষগুলিকে অন্ন দিয়ে বাঁচানো দরকার। ভালো ক'রে তারা খেতে যতদিন না পাচ্ছে ততদিন তাদের অন্তরে অধ্যাত্মভাবকে উদ্বুদ্ধ করবার ইচ্ছা নিশ্চয়ই অযৌক্তিক। মানুষ যতক্ষণ বুভুক্ষু, শীতার্ত্ত এবং উলঙ্গ ততক্ষণ বড়ো বড়ো আদর্শ নিয়ে মাথা ঘামানো তার পক্ষে কখনো সম্ভব নয়। তাকে খেতে পরতে দাও, থাকবার জন্য বাসস্থান দাও—অমনি তার মধ্যে সুরু হবে রূপান্তর। তার চিন্তাগুলো আকাশে ডানা মেলে উড়বে, তার মনে পাপ-পুণ্যের কথা জাগবে, অনন্তের দিকে সে দুটী বাহু প্রসারিত করে দেবে। ভারতবর্ষ যদি পেট ভ'রে খেতে পায় তবেই সে পুনরায় নিজেকে ফিরে পাবে, শরীরে মনে আবার সে শক্তি-সঞ্চয় করবে। এই চৈতন্যের আলোয় স্বামিজীর সারা মন উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠলো। তাঁর রক্তাক্ত হৃদয় চিরে যে-বাণী বেরিয়ে এলো তার প্রতিধ্বনি ভারতের আকাশে বাতাসে আজও ঘুরে বেড়াচ্ছে:

"অন্ন—অন্ন! যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন, ইহা আমি বিশ্বাস করিনা।" (পত্রাবলী—প্রথম)

অন্নহীন যারা তাদের কাছে অন্ন পৌছে দেওয়াই যথেষ্ট নয়। কি ক'রে অন্ন সংগ্রহ করতে হবে নিজের চেষ্টার দ্বারা সে শিক্ষাও তাদের কাছে পরিবেষণ করা দরকার। অন্নের জন্যই শিক্ষার প্রয়োজন আছে। স্বামিজী তাই লোক-শিক্ষার কথাও বললেন।

"ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরীবদের খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে, আর পুরোহিতের দলকে এমন ধাক্কা দিতে হইবে যে, তাহারা যেন ঘুরপাক খাইতে খাইতে একেবারে আটলাণ্টিক মহাসাগরে গিয়া পড়ে—ব্রাহ্মণই হউন, সন্ন্যাসীই হউন, আর যিনিই হউন।"

পত্রাবলীর আর জায়গায় আছে:

"আমি কেবল একটী জিনিষ চাই:—যে ধর্ম্ম বা যে ঈশ্বর বিধবার অশ্রুমোচন অথবা পিতৃমাতৃহীন অনাথের মুখে এক টুকরা রুটী দিতে না পারে আমি সে ধর্ম্ম বা সে ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। যত সুন্দর মতবাদ হউক, যত গভীর দার্শনিক তত্ত্বই উহাতে থাকুক যতক্ষণ উহা মত বা পুস্তকেই আবদ্ধ ততক্ষণ উহাকে আমি ধর্ম্ম নাম দিই না।"

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে চিকাগো থেকে লেখা একখানি পত্রে দেখতে পাই:

"আমি তত্ত্বজিজ্ঞাসু নই, দার্শনিকও নই, না, না—আমি সাধুও নই। আমি গরিব—গরিবদের আমি ভালোবাসি। আমি এ দেশে যাদের গরিব বলা হয় তাদের দেখছি আমাদের দেশের গরিবদের তুলনায় এদের অবস্থা ভালো হলেও কত লোকদের হৃদয় এদের জন্য কাঁদছে। কিন্তু ভারতের চিরপতিত বিশ কোটী নরনারীর জন্য কার হৃদয় কাঁদছে? তাদের উদ্ধারের উপায়]

কি? তাদের জন্য কার হৃদয় কাঁদে বল? তারা অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে পাচ্ছে না—তারা শিক্ষা পাচ্ছে না—কে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে বল? কে দ্বারে দ্বারে ঘুরে তাদের কাছে আলো নিয়ে যাবে? এরাই তোমাদের ঈশ্বর, এরাই তোমাদের দেবতা হোক, এরাই তোমাদের ইষ্ট হোক।"

দরিদ্রনারায়ণের সেবায় নিজেকে নিবেদন করবার সংকল্প গ্রহণ স্বামিজীর জীবনের একটী গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা। এই ঘটনার কাহিনী রলাঁ (Romain Rolland) নাটকীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন স্বামিজীর জীবনীতে:

At this date, 1892, it was the misery under his eyes, the misery of India, that filled his mind to the exclusion of every other thought. It pursued him, like a tiger following his pray, from the North to the South in his flight across India. It consumed him during sleepless nights. At Cape Comorin it caught and held him in its jaws. On that occasion he abandoned body and soul to it. He dedicated his life to the unhappy masses.

১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দ। স্বামিজীর হাতে পরিব্রাজকের দণ্ড। ভারতের উত্তর থেকে দক্ষিণপ্রান্তে চলেছেন তিনি। ভারতবর্ষের দুঃখ তাঁর চোখের সামনে রয়েছে দিবারাত্র। সেই দুঃখে পুর্ণ হয়ে আছে তাঁর সন্ন্যাসীর মন। মনের মধ্যে আর কোন চিন্তা নেই—একটী চিন্তা ছাড়া। ভারতবাসীর দুঃখের চিন্তা। দাক্ষিণাত্যের দিকে চলেছেন। একনিমেষের জন্যও ভুলতে পারছেন না দীন-দরিদ্রের ম্লান মুখচ্ছবি, ভুলতে পারছেন না তাদের নিষ্পেষিত জীবনের অপরিমেয় বেদনার কথা। বাঘ যেন শিকারকে অনুসরণ করে চলেছে। নিদ্রাহীন রজনীর প্রহরগুলিও একই চিন্তায় কেটে যায়। কুমারিকা অন্তরীপে এসে তাঁর জীবনকে তিনি উজাড় ক'রে স'পে দিলেন ভাগ্যহত জনসাধারণের সেবায়।

৪

নির্ব্বিকল্প সমাধির আনন্দসমুদ্রে যিনি চেয়েছিলেন তলিয়ে যেতে—স্বদেশের কোটী কোটী দুর্ভাগা নরনারীর অপরিমেয় দুঃখ তাঁকে দিলো কর্ম্মসাগরে ঝাঁপ দেবার প্রেরণা। মুক্তির কামনাকে ধুলায় ফেলে দিয়ে কাজের মধ্যে তিনি ডুব দিলেন। দরিদ্রনারায়ণের সেবার কাজ। দেশের জনসাধারণের দুঃখদারিদ্র্যের মর্ম্মন্তুদ ছবি একদা রবীন্দ্রনাথকেও কি কল্পজগতে বিহারের আনন্দ থেকে কর্ম্মজগতের মধ্যে ঠেলে দেয় নি? ছিন্নপত্রের মধ্যে দেখ্‌তে পাই:

"ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুল্‌ছে, সর্দ্দি হচ্ছে, জ্বরে ধরছে, পিলেওয়ালা ছেলেরা অবিশ্রাম কাঁদ্‌ছে, কিছুতেই কেউ তাদের বাঁচাতে পারছে না। এত অবহেলা, অস্বাস্থ্য, অসৌন্দর্য্য, দারিদ্র্য, মানুষের বাসস্থানে কি এক মুহূর্ত্ত সহ্য হয়?"

আমরা জানি কবির জীবনে এমন একদিন এসেছিল যখন পদ্মাতীরের নিভৃতে কল্পনা নিয়ে মেতে থাকা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। সেদিন দরিদ্রের ক্রন্দনে বিচলিত হয়ে তিনি লিখেছিলেন:

"এবার ফিরাও মোরে, লয়ে যাও সংসারের তীরে
হে কল্পনে, রঙ্গময়ী! দুলায়ো না সমীরে সমীরে
তরঙ্গে তরঙ্গে আর!"

লিখেছিলেন:

"বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট ।"

যারা সকলের পিছে, সকলের নীচে তাদের সেবার প্রেরণায় শিলাইদহের অজ্ঞাতবাস থেকে বোলপুরের কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার মধ্যে কবির জীবনের একটী বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের পরিচয় পাই। এই পরিবর্ত্তনের উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়ে লিখেছেন :

"নির্জ্জনে অরণ্যে পর্ব্বতে অজ্ঞাতবাসের মেয়াদ ফুরোলো। এবারের বিশ্বমানবের রণক্ষেত্রে ভীষ্মপর্ব্ব।" 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতাটীতে কবির জীবনধারার আমূল পরিবর্ত্তনেরই আভাষ পাই।

বিবেকানন্দের জীবনীর মধ্যে এক জায়গায় রলাঁ লিখেছেন :

Every human epoch has been set with its own particular work. Our task is, or ought to be, to raise the masses, so long shamefully betrayed, exploited, and degraded by the very men who should have been their guides.

জনসাধারণের উদ্ধারের কাজকে রলাঁ বলেছেন যুগধর্ম্ম। এই যুগধর্ম্মের আহ্বানে বাঙলাদেশের সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্প সমাধির লোভকে সংবরণ ক'রে তুলে নিয়েছেন কর্ম্মের ধ্বজা। এই যুগধর্ম্মের আহ্বানেই বাঙলাদেশের কবিও কল্পলোকে শুধু বাঁশী বাজানোর আনন্দকে ত্যাগ ক'রে কর্ম্মযোগে নিয়েছেন দীক্ষা।

বাঙলার সাধনা, বাঙলার বাণী ভারতের গণসিংহকে নিদ্রা থেকে জাগিয়েছে—এতে কোন সন্দেহ নেই। গান্ধীজীর গণ-আন্দোলনের পিছনে বিবেকানন্দের অগ্নিবাণীর এবং রবীন্দ্রনাথের রুদ্রবীণার প্রেরণা কতখানি—কে তার পরিমাপ করবার ধৃষ্টতা রাখে? নিদ্রিত ভারতবাসীর কর্ণে বিবেকানন্দের 'দরিদ্রনারায়ণ' মন্ত্র উচ্চারণ কি জাতির চিন্তারাজ্যে একটা বিরাট বিপ্লবের ঝড় বহন ক'রে আনেনি? রলাঁ ঠিকই লিখেছেন :

If the generation that followed, saw, three years after Vivekananda's death, the revolt of Bengal, the prelude to the great movement of Tilak and Gandhi, if India today has definitely taken part in the collective action of organised masses, it is due to the initial shock, to the mighty

"Lazarus, Come forth!"

of the Message of Madras.

বাংলার বিদ্রোহ, তিলক এবং গান্ধীর বিরাট আন্দোলন, আচার্য্য বিনোবার ভূদান-যজ্ঞের এবং সর্ব্বোদয়ের বাণী—এ সমস্তের মূল উৎস যে বিবেকানন্দের মাদ্রাজের সেই যুগান্তকারী বাণী এবিষয়ে কি কোন সংশয় আছে?

"আমাদের উপনিষদে, আমাদের পুরাণে, আমাদের অন্যান্য শাস্ত্রে যে সকল অপূর্ব সত্য নিহিত আছে, তাহা ঐ সকল গ্রন্থ হইতে বাহির করিয়া, মঠসমূহ হইতে, অরণ্য হইতে, সম্প্রদায়-বিশেষের অধিকার হইতে বাহির করিয়া সমগ্র ভারতভূমিতে ছড়াইতে হইবে।"

* * * * * *

"সমস্ত ভারত সন্তানের এখন কর্তব্য তাহারা যেন সমগ্র জগৎকে মানবজীবন-সমস্যার প্রকৃষ্ট সমাধান শিক্ষা দিবার জন্য সম্পূর্ণরূপে আপনাদিগকে উপযুক্ত করে। তাহারা সমগ্র জগৎকে ধর্ম শিখাইতে ধর্মতঃ এবং ন্যায়তঃ বাধ্য। আমার দৃঢ় ধারণা—শীঘ্রই সে শুভদিন আসিতেছে; প্রাচীন ঋষিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অভ্যুদয় হইবে।"

স্বামী বিবেকানন্দ

কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম বল্লী

ইন্দ্রিয়ে বিদীর্ণ করি বহির্ম্মুখী করিলেন স্বয়ম্ভু স্বয়ং,
বহির্ম্মুখী দৃষ্টি সকলের ;
অন্তরাত্মার পানে কেহ নাহি চায়।
ক্বচিৎ কখনও কোন ধীর
হইয়া আবৃত-চক্ষু অমৃত-আশায়
সে আত্মারে প্রত্যক্ষ দেখিবারে পায়॥ ১॥

বহির্ম্মুখী কামনারে অনুসরে যারা শিশুমতি
সর্ব্ব-ব্যাপী মৃত্যু-পাশে অবশেষে লভে তারা গতি।
কিন্তু ধীর-মনা
ধ্রুবেরে অমৃত জানি অধ্রুবের করে না কামনা॥ ২॥

রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ স্পর্শ ও মৈথুন
জানিতেছি যাঁর প্রভাবেই
তাঁহারে জানিলে আর বাকী থাকে কিবা ?
ইনি সেই॥ ৩॥

স্বপ্নে কিম্বা জাগরণে উভয় সময়ে
যাঁর বলে দেখে সব লোক
সেই সে মহান বিভু আত্মারে জানিয়া
ধীরগণ হন বীতশোক॥ ৪॥

ভূত-ভবিষ্যের শিব জীব-সন্নিহিত
মধুপায়ী যে আত্মাকে জানিবার পরে
ঘৃণা আর থাকে না অন্তরে
ইনি সেই॥ ৫॥

প্রথম-তাপস-জাত জলেরও পূর্ব্বেতে যিনি
করেছেন জনম গ্রহণ
গুহায় প্রবেশ করি সর্ব্বভূতে-বর্ত্তমান
যে আদির মিলে দরশন
ইনি সেই॥ ৬॥

দেবময়ী যে অদিতি* প্রাণরূপে হ'ন প্রকাশিত
উপজিয়া সর্ব্বভূতাধারে
গুহায় প্রবেশ করি দেখা যায় তিষ্ঠমান যাঁরে
ইনি সেই॥ ৭॥

গর্ভিণীর গর্ভসম নিহিত অরণি মাঝে
যেই জাতবেদা অগ্নি অতি সুনিভৃত
যজ্ঞশীল পুরুষেরা নিত্য যার সেবা করে
অপ্রমত্ত চিত
ইনি সেই॥ ৮॥

সূর্য্যের উদয় যেথা হতে
অস্ত যার মাঝে
অতিক্রান্ত নাহি হ'ন কভু
সকল দেবতা যেথা আছে
ইনি সেই॥ ৯॥

এখানে আছেন যিনি তিনিই সেখানে
সেখানে আছেন যিনি তিনি এখানেই
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এঁরে দেখে যেই জন
মৃত্যু হ'তে মৃত্যু লভে সেই॥ ১০॥

* অদিতি—ন দিতি—অসীমা অর্থাৎ যাহা সীমাহীন ব্যাপ্তি, boundlessness

মন দিয়া পাওয়া যায় এঁরে
এঁর মাঝে ভিন্নতা প্রকাশ না পায়
নানাভাবে যে দেখে ইঁহারে
মৃত্যু হ'তে মৃত্যুতে সে যায় ॥ ১১ ॥

পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ মাত্র আত্মমধ্যে যাঁর অবস্থান
যিনি ভূত ভবিষ্য ঈশান
যাঁহারে জানিলে পরে জুগুপ্সার হয় অবসান
ইনি সেই ॥ ১২ ॥

নির্ধূম জ্যোতি সম পুরুষ অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ
যিনি ভূত ভবিষ্য ঈশান
আজ যিনি কাল তিনি সর্ব্বদা সমান
ইনি সেই ॥ ১৩ ॥

সুদুর্গম উচ্চস্থানে নিপতিত বৃষ্টি যথা
পর্ব্বতেতে বহে বহুধারা
সেইরূপ ধর্ম্মে যারা পৃথক বলিয়া ভাবে
না বুঝিয়া হয় আত্মহারা ॥ ১৪ ॥

শুদ্ধ জল যেইরূপ শুদ্ধই থাকে
শুদ্ধজলে হইলে পতিত
সেইরূপ, হে গৌতম, বিজ্ঞানী মুনির আত্মা
রহে অবিকৃত ॥ ১৫ ॥

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

(১)

শ্রীশ্রীগুরুদেব সহায়

হৃষীকেশ
৭ই মাঘ রবিবার
(Jan 19, 1890)

পরম ভক্তশ্রেষ্ঠ বলরাম বাবু মহাশয়েষু

আপনার পত্র পাইলাম। আজ প্রায় ২০ দিন হইল আমি অত্যন্ত জ্বরভোগ করিয়া এক্ষণে গুরুদেবের কৃপায় আরোগ্য লাভ করিয়াছি কিন্তু এখনও অতি দুর্ব্বল। শরৎ প্রভৃতি ইহারা যথাসাধ্য সেবা দিবারাত্র করিয়াছেন। এখানে অসুখ হইলে বড়ই বিপদ, কারণ এ জঙ্গলে ঔষধ ও পথ্যের বন্দোবস্ত কিছুই হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষ আমাদের বাঙ্গালীর শরীর সহজেই কোমল, তাহাতে আবার অসুখ হইলে বুঝিতেই পারেন। শরৎ, হরি, তুলসী, ইহাদের শরীর এখন শ্রীশ্রীগুরুদেবের কৃপায় বেশ আছে। ছত্রের রুটি প্রায় কাঁচা থাকে বলিয়া সাগুলের মধ্যে মধ্যে আমাশয় দেখা যায় আবার একটু সাবধানে থাকিলেই সারিয়া যায়। আপনার শরীর অসুস্থ শুনিয়া আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। আপনি হতাশ হইবেন না। কি করিবেন বলুন, শরীরের ধর্ম্ম কখন ভাল থাকে. কখন অসুস্থ হয়। এমন কিছু আশা করা যায় না যে শরীর চিরকাল সুস্থ থাকুক। তবে যতদিন সুখে থাকে ততই ভাল। অসুখের সময় গুরুদেবের কৃপা বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সময়ে একবার তাঁহাকে স্মরণ করিলে সমস্ত যন্ত্রণা ভুল হইয়া যায় ও হৃদয়ে শান্তির উদয় হয়। তাঁহার যে কত দয়া যাঁহারা সংসারে আছেন ও তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করেন তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝিতে পারেন। তিনি কাহাকেও কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া কতই

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

শিক্ষা দেন, কাহাকেও আবার গায়ে কষ্টের আঁচ লাগিতে দেন না। তাঁহার যেমন ইচ্ছা তিনি সেইরূপ করুন, আমাদের এই প্রার্থনা যে সকল অবস্থাতে যেন তাঁহাতেই মন থাকে এবং তাঁহারই চিন্তাতে যেন দিবারাত্র অতিবাহিত হইয়া যায়। আপনি যদি শ্রীশ্রীবৃন্দাবন ধামে আসিয়া বাস করেন তাহা হইলে বোধ হয় আপনার শরীর change-তে অনেকটা ভাল থাকিতে পারে এবং সেখানে আমরাও কেহ কেহ আপনার নিকট থাকিতে পারি। গিরীশবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ হওয়াতে এখন কিরূপ মনের ভাব তাহা আমরা সকলেই জানিতে অত্যন্ত উৎসুক। আহা! মহেন্দ্রবাবুর ইদানীং কিছু ধর্ম্মের ভাব প্রবল হইতেছিল কিন্তু হঠাৎ জোয়ান পুরুষকে তিনি আর এ সংসারের যন্ত্রণা ভোগ করিতে দিলেন না। একরূপ ভাল, সকলই তাঁহার ইচ্ছা।

ইতি—কালী

(২)*

চুনীবাবু মহাশয়—

আপনার মনের অবস্থা পত্রপাঠে বিশেষ জানিতে পারিলাম। আপনি ব্যস্ত হইবেন না, অপেক্ষা করুন ও প্রার্থনা করুন। ঠিক সময় না হইলে কোন কাজ হয় না। দিবারাত্র একমনে কেবল গুরুদেবকে ডাকুন। তিনিই আপনার সকল কষ্ট দুর করিবেন। তিনি বড় দয়াময়, তিনি কাহারও কষ্ট দেখিতে পারেন না। তাঁহার কাছে যে (মন মুখ এক করিয়া) যাহা চায় সে তাহাই পায়। কত লোকের কষ্ট দুর হইয়া গেল আর আপনার হইবে না? আপনার জন্য আমরা সকলেই প্রার্থনা করিতেছি। তিনি সকলই জানিতেছেন, যাহাকে যতটুকু দরকার তাহাকে ততটুকু দিতেছেন, কাহারও অকুলান রাখেন না। তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিলেই বা কি হইবে? বরং সংসারের কষ্টের মধ্যে থাকিলে তাঁহার প্রতি নির্ভরতা বিশ্বাস বৃদ্ধি হইতেই থাকে, সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করিতে পারা যায়। তিনি বলিতেন "ঘায়ের কাঁচা ছাল তুলিলে রক্ত পড়ে আর যখন ছাল শুকাইয়া আপনি খসিয়া পড়ে তখন আর কোন কষ্ট থাকে না"। সংসার ত্যাগ সম্বন্ধে সেইরূপ জানিবেন। যতদিন সংসারের বাসনা থাকে ততদিন সংসার ত্যাগ করা উচিত নহে। আর অধিক কি লিখিব? তাঁহার যে সকল উপদেশ শুনিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলেই অনেক শান্তি পাইবেন। আপনারা আমাদের সকলের নমস্কার জানিবেন। ইতি—কালী

* এই দ্বিতীয় পত্রটি প্রথমটির সহিত একই খামে প্রেরিত হইয়াছিল। চুনীবাবু—বলরাম বাবুর প্রতিবেশী ও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম গৃহীভক্ত শ্রীচুনীলাল বসু।

(৩)

শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি

হৃষীকেশ
2nd March
(2/3/90)

শ্রীযুক্ত বলরাম বাবু মহাশয়—

আপনার পত্র কাল পাইয়াছি। আমার এখনও জর আসিতেছে, জরটা এখন পুরাতন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখানে ঔষধ ও পথ্য না পাওয়াতে প্রায় ৩মাস ভোগ হইল। এখন change ভিন্ন আর উপায় নাই। অনেক দিন হইল শরৎ নরেন্দ্রকে টাকা পাঠাইবার জন্য এক পত্র লেখে। তাহার জবাবস্বরূপ কাল নরেনের এক telegram পাই। তাহাতে এই কটি কথা আছে—Letter just received, telegraph if money required now এবং

॥• আট আনা telegraphর জন্য অপিসে জমা করিয়া দেয়। সেইজন্য আজ তুলসী ও সাণ্ডেল হরিদ্বারে টেলিগ্রাফ করিবার জন্য যাইতেছে। বোধ হয় telegraphic money order এ নরেন্দ্র শীঘ্রই টাকা পাঠাইবে। তবে কত পাঠাইতে পারিবে জানি না। টাকা পাইলেই আমি নীচে যাইব। আপনারা এখন এ ঠিকানায় টাকা পাঠাইবেন না, কারণ Dehra হইতে এখানে পত্রাদি আসিতে প্রায় ১৫দিন দেরী হয়। (তাহার সাক্ষ্য দেখুন নরেন Gazeepur হইতে 17th Feby. telegraph করে, সেই telegram কাল 1st March আমরা পাই) এবং এতদিন আমি বোধ হয় এখানে থাকিব না, টাকা পাইলেই চলিয়া যাইব। পরে যেখানে যাইব যদি টাকার আবশ্যক হয় তাহা হইলে আপনাদের পত্র লিখিব, সেই ঠিকানায় পাঠাইবেন। এই পত্র-খানি মাষ্টার মহাশয়কে ও মঠে দেখাইবেন। সুরেশ বাবুর অসুখ শুনিয়া আমরা বড়ই দুঃখিত হইলাম। আমরা প্রার্থনা করিতেছি যেন তিনি শীঘ্র সারিয়া উঠেন। বাবুরাম এতদিন ভুগিতেছে শুনিয়া বড় কষ্ট হইল। হৃষীকেশে শ্রীশ্রীগুরুদেবের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে একটি ক্ষুদ্র উৎসব হয়। মাষ্টার মহাশয় দুটি টাকা money order করিয়া ঐ দিনের ভোগের জন্য পাঠাইয়া দেন, তাহাতেই আমরা যথাকথঞ্চিৎ ভোগ দিই। ভোগের বিবরণ মাষ্টার মহাশয়ের পত্রে বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি বোধ হয় আপনাদের ঐ পত্র দেখাইয়াছেন। এখানে আর সকলে ভাল আছে। আমাদের নমস্কার জানিবেন—ইতি কালী

তবু

শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

তোমারে যে কভু ভালবাসি নাই
সে কথা আমিও জানি,
তৃষ্ণা-কাতর নয় যে চকোর
তাহাও সত্য মানি।
রুদ্ধ-দুয়ারে করিয়া আঘাত
আমারে যখন ডেকেছ হে নাথ
কণ্ঠে তোমার দিয়াছি তখন
বিদায়-মাল্যখানি।

তবু মোর লাগি' নয়নে তোমার
প্রেমের প্রদীপ জ্বলে,
তোমারে যে হেরি আলো-পারাবার
দুঃখ-তিমিরতলে।
করিয়া উজাড় তব ভাণ্ডার
তুমি দাও মোরে কত উপহার,
করুণা-কণায় কর সুরভিত
অন্তর-শতদলে।

বিশ্ব-শান্তি কোন্ পথে ?

স্বামী তেজসানন্দ

বিংশ শতাব্দীর তটভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া মানব-কৃষ্টির বৈচিত্র্যবহুল ক্রমবিকাশের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখিতে পাই কত সাম্রাজ্য ও সভ্যতা, কত জনপদ ও কৃষ্টিকেন্দ্র কাল-সাগরে বুদ্বুদের মত ক্ষণে ক্ষণে উত্থিত ও বিলীন হইতেছে; কত বিপ্লব ও পরিবর্ত্তন জাতির পর জাতিকে পৃথিবীর বক্ষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতেছে। সুদূর অতীতের বিস্ময়কর মিশরীয় সভ্যতা, আসিরিয়া ও ব্যাবিলনের রোমাঞ্চকর কীর্ত্তি-কাহিনী, গ্রীস ও রোমের চিত্ত-চমৎকারী সাম্রাজ্য বিস্তার—আজ প্রত্নতাত্ত্বিকের গভীর গবেষণার বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সৃষ্টি ও ধ্বংস—এই সংসারের চিরন্তন ইতিহাস। তাই একদিন যাহাদের পার্থিব শক্তি সৌন্দর্য্যসৃষ্টির প্রহেলিকাদ্বারা সকলকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়াছে,—কালের কুটিল গতিতে পরক্ষণেই হয়ত তাহা অসীম শূন্যে বিলীন হইয়াছে। কিন্তু ভারত আজও জীবিত,—স্বাধীনতার বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিয়া অভিযান সুরু করিয়াছে তাহার চির-সঞ্চিত সংস্কৃতি-সম্পদ বহন করিয়া। তাহার প্রতি চিন্তা ও কর্ম্মে, সাহিত্য ও শিল্পে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্মে, রাজনীতি ও দর্শনে—সর্ব্বত্র সাড়া দিয়া উঠিয়াছে যুগযুগান্তের পুঞ্জীভূত অমিত সুপ্ত শক্তি যাহা নব চেতনার উন্মেষে ভারতের ভৌগোলিক পরিধির ক্ষুদ্র আবেষ্টনীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিতে স্বতঃই কুণ্ঠিত। সৃষ্টির উন্মাদনায় প্রবুদ্ধ ভারত দিকে দিকে ছুটিয়াছে বন্ধুর পিচ্ছিল পথকে তুচ্ছ করিয়া। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হইতেছে তাহার শাশ্বত শান্তির বাণী। স্বামী বিবেকানন্দ তাই বলিয়াছেন, "...আমার এই জন্মভূমি বর্ত্তমান কালেও মহীয়সী রাজ্ঞীর ন্যায় অপূর্ব্ব মহিমায় মন্থর পদক্ষেপে ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে আপনার বিধাতৃ-নির্দ্দিষ্ট মহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য,—পশুভাবাপন্ন মানবকে নররূপী নারায়ণে পরিণত করিবার জন্য। ভূলোকে কিংবা সুরলোকে এমন কোন শক্তি নাই যাহা ভারতের এই মহৎ কার্য্যে বাধা প্রদান করিতে পারে।"

প্রশ্ন উঠিয়াছে,—এই জাতির বিপ্লববহুল সুদীর্ঘ জীবনের মূল উৎস কোথায়, যাহার প্রভাবে ভারতবাসী আজ পুনঃ জাতিসংঘে গৌরবাসন অধিকার করিয়া হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীকে সাম্য মৈত্রী ও শান্তির অভয় বাণী শুনাইতেছে? প্রতীচ্যের পানে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখিতে পাই, জড়বিজ্ঞান-মণ্ডিত সভ্যতার প্রদীপ্ত প্রতীক শ্বেতকায় জাতিনিচয় একহস্তে বিশ্ব-ধ্বংসী আণবিক বোমা ও অপর হস্তে ধর্ম্মগ্রন্থ ধারণ করিয়া শান্তি-সভা আলোকিত করিয়া বসিয়াছেন! হিংসার তীব্র জ্বালায় তাঁহাদের হৃদয় বিষাম্বিত; ধূমায়মান বিদ্বেষবহ্নির ঘনান্ধকারে তাঁহারা দৃষ্টিহীন। একদিকে "যুদ্ধং দেহি" আরাবে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত; অপরদিকে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মুখোস পরিয়া দ্বিমুখী জেনাস (Janus) এর মত সকলে শান্তির বাণীর ফোয়ারা তুলিয়াছে! ভাগ্যের এমন কদর্য্য তথা নিদারুণ পরিহাস

ইতিহাস কখনও সাক্ষ্য দিয়াছে কিনা সন্দেহ। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক Toynbee তাঁহার 'Study of History' গ্রন্থে সত্যই লিখিয়াছেন, "যে ব্যাঘ্র একবার মনুষ্যরক্তের আস্বাদ পাইয়াছে তাহার মানব-রক্ত-পিপাসা দিন দিন সহস্রগুণে বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে। রক্তের নেশা নিশ্চিত মৃত্যুকে তাহার নিকট তুচ্ছ করিয়া তোলে। মনুষ্যসমাজেও এই নৈসর্গিক নিয়মের ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না। মানব-হস্তের যে কোষমুক্ত শানিত কৃপাণ একবার নররক্তে রঞ্জিত হইয়াছে, তাহাকে কোষবদ্ধ করা সুকঠিন। হিংসায় উন্মত্ত মানব অপরের বক্ষরক্তপানের জন্য পৈশাচিক উল্লাসে ছুটিয়া চলে,—নিজের নিশ্চিত মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া।" তাই রক্তলোলুপ হিংস্র ব্যাঘ্রের মতই মানবের দুর্ব্বার পশুবৃত্তি ধরিত্রী-বক্ষে এক ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার পরিণাম যে নিশ্চিত ধ্বংস, তাহা জানিয়াও মানব স্বীয় ধ্বংস-সাধক পাশবিক প্রবৃত্তি হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে সমর্থ নহে।

মানবজাতি যে কি ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে—তাহা শান্তভাবে চিন্তা করিবার অবসরও আজ বিরল। সত্য বটে, বিজ্ঞানের বলে ভৌগোলিক ব্যবধান দূর হইয়াছে—পৃথিবীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত প্রতি নিমেষে ভাবের ও কৃষ্টিসম্পদের অবাধ আদান প্রদান চলিতেছে; জলে, স্থলে, আকাশে সকলের স্বৈর-গতির বাধাও দূরীভূত হইয়াছে। কিন্তু শান্তি কোথায়? বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিকবৃন্দের যে অপূর্ব্ব অবদান জগৎকে চমৎকৃত করিয়াছে তাহা এক-দিকে যেমন অতুল পার্থিব সম্পদে মানবজাতিকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছে, অপরদিকে তাহাই পুনঃ কতিপয় কূটনীতিপরায়ণ রাজনৈতিকের হস্তে ধ্বংসের অব্যর্থ অস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। তাহাদের ভ্রূকুটিভঙ্গে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক-কুলও আজ পর্য্যুদস্ত,—স্বাধীনভাবে চিন্তা করিবার এবং জগতের কল্যাণসাধন করিবার সামর্থ্য ও সুযোগ হইতে তাঁহারা বঞ্চিত। তাই আজ জগতের হিতকামী মনীষিবৃন্দের কণ্ঠ রুদ্ধ ও প্রতিভা স্তব্ধ। দেশ-দেশান্তরে প্রচণ্ড কোলাহল ও বিপ্লবের তরঙ্গ অবাধগতিতে ছুটিয়াছে। কোরিয়া ও কাশ্মীর, ইন্দোচীন ও দক্ষিণ আফ্রিকা, ট্যুনিসিয়া ও কেনিয়া—সর্ব্বত্র এক অশান্তির তীব্র হলাহল সমগ্র মানবমনকে বিষদিগ্ধ ও চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। তাই প্রশ্ন উঠিয়াছে— শান্তি কোথায়? শান্তির বৈঠক কতকাল ধরিয়া বসিতেছে ও ভাঙ্গিতেছে; কত মূল্যবান সময় শান্তির পরিকল্পনায় অতিবাহিত হইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে কত রাজ্য জনপদ ধ্বংসের কুক্ষিগত হইতেছে; কত প্রবল জাতি দুর্ব্বলকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া গৌরবোল্লাসে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভাবী শতাব্দীর অবশ্যম্ভাবী ধ্বংসের করাল দৃশ্য দর্শন করিয়াই যুগনায়ক আচার্য্য স্বামী বিবেকানন্দ দৃঢ়তার সহিত একদিন বলিয়াছিলেন, "সাবধান! আমি দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, সমগ্র পাশ্চাত্ত্য জগৎ একটা আগ্নেয়গিরির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; উহা যে কোন মুহূর্ত্তে অগ্নি উদ্গিরণ করিয়া পাশ্চাত্ত্য জগৎকে ধ্বংস করিয়া ফেলিতে পারে। এখনও যদি তোমরা সাবধান না হও, তাহা হইলে আগামী পঞ্চাশৎ বর্ষের মধ্যে তোমাদের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

আজ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে হইবে পররাজ্য-লোলুপ রাজনীতি-বিশারদগণের শান্তির বৈঠকে শান্তির গবেষণা করা বাতুলতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শান্তিভঙ্গকারিগণকে শান্তিকামী ও শান্তির অগ্রদূত জ্ঞানে আমরা এতদিন যে ভুল করিয়া আসিয়াছি সে ভুল সংশোধনের সময় পুনঃ উপস্থিত। ভারতের প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান

কাল পর্য্যন্ত আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দ যে শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন তাহা উপেক্ষা করিয়াই মানবকুল আজ শান্তিহারা,—দিশাহারা। বিশ্বকল্যাণকামী প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞগণ শিক্ষা দিয়াছেন ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না; অত্যাচার দ্বারা অত্যাচার প্রশমিত হয় না। অন্তরের মণিকোঠায় বিশ্বভ্রাতৃত্বের যে নিগূঢ় তত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে তাহার সঙ্গে যাহাদের পরিচয় লাভ না ঘটিয়াছে তাহাদের কণ্ঠে শান্তির বাণী বিকারগ্রস্ত রোগীর প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইতিহাস এখনও সাক্ষ্য দেয়—বুদ্ধ ও যীশু, শঙ্কর ও চৈতন্য, রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ শান্তি-স্থাপনের জন্য করাল করবাল হস্তে মনুষ্যসমাজে ধ্বংসলীলার অভিনয় করেন নাই। জাগতিক ভোগের আশা আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থপরতা ও ক্ষুদ্রতার বহু উর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন তাঁহাদের জীবন। তাঁহাদের প্রতি কথায়, প্রতি প্রেমমধুর স্নিগ্ধ চাহনিতে বিশ্ব অমৃতান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহারাই মুক্তকণ্ঠে একদিন উপনিষদের অমোঘ বাণী শুনাইয়াছেন, "যিনি এক, সকলের নিয়ন্তা, এবং সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, যিনি স্বীয় একরূপকে বিচিত্ররূপে প্রকাশ করেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য সুখ, অন্যের নহে। যিনি অনিত্য বস্তুসমূহের মধ্যে নিত্য, যিনি চেতনাবানদিগের চেতন, যিনি একাকী অনেকের কাম্যবস্তুসকল বিধান করিতেছেন, তাঁহাকে যে জ্ঞানিগণ আপনাতে দর্শন করেন, তাঁহাদেরই নিত্য শান্তি, অপরের নহে।"—বিশ্ব-প্রেমিক ভগবান যীশু স্বীয় ক্রোধোন্মত্ত শিষ্য পিটারের কোশমুক্ত অসি সজোরে ছিনাইয়া লইয়া বলিয়াছিলেন, "যাহারা অসির সাহায্য গ্রহণ করে, তাহারা সেই অসির আঘাতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।" ঠিক এমনি ভাবেই ভগবান বুদ্ধ নির্দ্দেশ করিয়াছেন বিশ্বশান্তির প্রকৃত পন্থা। বৌদ্ধধর্ম্মের অমর গ্রন্থ ধম্মপদে আজও ধ্বনিত হয় তাঁহার সেই মর্ম্মবাণী—

"নহি বেরেন বেরানি সম্মন্তীধ কুদাচনং
অবেরেন চ সম্মন্তি এস ধম্মো সনন্তনো॥
সব্বে তসন্তি দণ্ডস্স সব্বে ভায়ন্তি মচ্চুনো
অত্তানং উপমং কত্বা ন হনেয্য ন ঘাতয়ে॥
যো সহস্সং সহস্সেন সংগামে মানুসে জিনে
একং চ জেয্যমত্তানং স বে সংগামজুত্তমো॥
জয়ং বেরং পসবতি দুক্খং সেতি পরাজিতো
উপসন্তো সুখং সেতি হিত্বা জয় পরাজয়ং॥"

—এ জগতে ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা সম্ভব নহে। অঘৃণা বা অবৈরভাব দ্বারাই ঘৃণাকে জয় করা সম্ভব—ইহাই একমাত্র চিরন্তন সত্য। অপরের সঙ্গে নিজকে অভিন্ন চিন্তা করিয়া অপরকে কখনও আঘাত বা হত্যা করিবে না। সংগ্রামজয়ী বীর সহস্রবার সহস্রব্যক্তিকে পরাজিত করিয়া গৌরবার্জ্জন করিতে পারে। কিন্তু তাহার জয়ই প্রকৃত জয়, যে নিজকে জয় করিতে সমর্থ হয়। পরাজিতের প্রাণে যে পরাজয়ের গ্লানি জমাট বাধিয়া থাকে, তাহা বিজেতার প্রতি স্বতঃই ঘৃণার রূপে আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু যিনি প্রকৃত নিস্পৃহ ও শান্ত, তিনি জয় পরাজয়কে তুচ্ছ করিয়া সংসারে সদানন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন।

যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ স্বামী বিবেকানন্দের কণ্ঠেও সেই শাশ্বত সনাতন প্রশ্ন ও তাহার সুমীমাংসা পুনঃ ধ্বনিত হইয়াছে—"জীবন সংগ্রামে প্রেমের জয় হইবে, না, ঘৃণার জয় হইবে? ভোগের জয় হইবে, না ত্যাগের জয় হইবে? জড় জয়ী হইবে, না চৈতন্য জয়ী হইবে? এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক যুগের অনেক পূর্ব্বে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যেরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন,

আমাদেরও সেই বিশ্বাস। কিংবদন্তী যে অন্ধকার দূর করিতে অসমর্থ, সেই অতি প্রাচীনকাল হইতেই আমাদের মহিমময় পূর্ব্বপুরুষগণ এই সমস্যাপূরণে অগ্রসর হইয়াছেন—তাঁহারা জগতের নিকট তাঁহাদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, যদি কাহারও সাধ্য থাকে, উহার সত্যতা খণ্ডন করিতে আহ্বান করিয়াছেন। আমাদের সিদ্ধান্ত এই—ত্যাগ, প্রেম ও অপ্রতিকারই জগতে জয়ী হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। ইন্দ্রিয়-সুখের বাসনা ত্যাগ করিলেই সেই জাতি দীর্ঘজীবী হইতে পারে। ইহার প্রমাণস্বরূপ দেখ—ইতিহাস আজ প্রতি শতাব্দীতেই অসংখ্য নূতন নূতন জাতির উৎপত্তি ও বিনাশের কথা আমাদিগকে জানাইতেছে—শূন্য হইতে বুদ্বুদের উদ্ভব; কিছুদিনের জন্য পাপখেলা খেলিয়া আবার তাহারা শূন্যে বিলীন হইতেছে। কিন্তু এই মহান জাতি অনেক দুরদৃষ্ট, বিপদ ও দুঃখের ভার সত্ত্বেও এখনও জীবিত রহিয়াছে; কারণ এই জাতি ত্যাগের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছে।"

মানবজাতির ঘোর সঙ্কটমুহূর্ত্তে ভারতই আজ পুনঃ জাতিসঙ্ঘে শান্তির বাণী শুনাইতেছে;—পৃথিবীর প্রজ্বলিত হুতাশন নির্ব্বাপিত করিতে ভারত-প্রতিভা আজ অগ্রণী ও বদ্ধপরিকর। যে জড় সভ্যতা এক মুহূর্ত্তে মানব-কৃষ্টিকে ধ্বংস-স্তূপে পরিণত করিতে বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠাবোধ করে না, যাহা মানুষের অন্তরের দিব্য প্রেমসম্পদ উদ্ঘাটিত করিয়া জগতের কল্যাণে তাহা অর্ঘ্য দিতে শিক্ষা দেয় না, অদূর ভবিষ্যতে তাহার ধ্বংস যে অনিবার্য্য তাহা বর্ত্তমান যুগের ইতিহাস রক্তাক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। শান্তির আকাঙ্ক্ষায় মানবপ্রাণ আজ ব্যাকুল। সমগ্র মানবের অন্তরের আকুতি আজ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে—শান্তি কামনায়। ভারত-আত্মার চিরন্তন অমর সঙ্গীত দেশমাতৃকার বক্ষ ভেদ করিয়া ধ্বনিত হইতেছে—মানব কল্যাণে। স্বামী বিবেকানন্দের বাণী আজ সার্থক হইয়া উঠুক। তিনি বলিয়াছিলেন, "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ,—জগদ্ধিতায় ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া এবার ভারতবর্ষকে দান-প্রসারিত হস্তে তাহা বিলাইতে হইবে।" এস আর্য্য, এস অনার্য্য; এস হিন্দু, এস মুসলমান; এস বৌদ্ধ, এস খৃষ্টান, এস জৈন, এস পারশিক, এস বিশ্বসভার জাতিপুঞ্জ,—যে যেখানে আছ ছুটিয়া এস, ভারতের এই পুণ্যতীর্থসলিলে অবগাহন করিয়া সকলে ধন্য হও। শান্তির অমৃত সিঞ্চনে জগতের হিংসা দ্বেষ, ধ্বংসের বীভৎসলীলার অবসান করিয়া পুনঃ স্বর্গের সুষমায় জগৎকে মণ্ডিত করিয়া তোল; শান্তিরাজ্যের প্রতিষ্ঠা কর।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

"যাহারা সন্ন্যাসী হইয়াছে, সংসারের বন্ধন হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছে, তাহারা বনে যাইয়া ঈশ্বরের ধ্যানে নিযুক্ত হইবে, ইহা বিচিত্র কথা নহে। কিন্তু যাহারা স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, পিতা, মাতা প্রভৃতির সমুদয় কার্য্য করিয়া মনে মনে ঈশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে, তাহার প্রতি ভগবানের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃপা প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

"মনে, কোণে, বনে"

শ্রীঅন্নদাচরণ সেনগুপ্ত

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের উপদেশে পাই, তিনি বলিতেছেন :—"ধ্যান করবে মনে, কোণে ও বনে।" মনে অর্থাৎ একান্ত মনে ; কোণে—যেখানে অন্য লোকের গতায়াত নাই এমন স্থানে—নিরালায় ; বনে—জন-কোলাহলের বাহিরে, অর্থাৎ, সংসারের বিশৃঙ্খলাপূর্ণ হৈচৈ হইতে দূরে।

তাঁহার প্রথম উপদেশ,—একান্ত মনে ধ্যান করিতে হইবে। ধ্যান করিতে বসিলেই ত মনের ভিতর সাংসারিক নানা প্রকার চিন্তার উদয় হইয়া চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়। তখন যত রাজ্যের সংসারের ভাবনায় মন চারিদিকে ছুটাছুটী করিতে থাকে। এই অবস্থা আমরা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই চিত্তবিক্ষেপের প্রতিকার কি ?

স্বামী বিবেকানন্দ 'রাজযোগ' গ্রন্থে মনঃ-সংযম-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, মন যেন একটি উন্মত্ত বানর। ধ্যান করিতে বসিয়া চক্ষু বুজিলেই যখন মন ছুটাছুটী করিতে থাকে, তাহার গতিকে শিথিল করিয়া তখন চুপ করিয়া থাকিলেই দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, মন যে পথ লক্ষ্য করিয়া ঘুরিতেছে সে পথে অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না, অন্য একটা বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, সে পথ হইতে পুনরায় অন্য পথে ধাবিত হয়। এইরূপে মন ক্লান্ত হইয়া পড়িয়া বিশ্রামের জন্য চুপ করিয়া যায়। ঠিক তখন মনকে সম্মুখে যে প্রতীক রহিয়াছে—তা সেই প্রতীক যাহাই হউক—কালী, দুর্গা, হরি, শিব, কোন মহাপুরুষ, কোন শক্তিমান লোকোত্তর মানব, যাঁহার যে প্রতীক প্রীতিপ্রদ সেই প্রতীকের নিকট আত্মনিবেদন করিলে সে কাতর প্রার্থনা তাঁহার চরণে পৌছায়। এইরূপ কিছুদিন করিলে বিক্ষিপ্ত চিত্ত ক্রমে শান্ত হইয়া আসে। তখন ধ্যান করিতে বসিয়া মনকে আর পাহারা দিবার প্রয়োজন হয় না।

ধ্যান করিবার পৃথক একটী স্থান প্রত্যেকের আয়ত্তের মধ্যে করিয়া লইতে স্বামিজী উপদেশ দিয়াছেন। যিনি পৃথক একখানি গৃহ ইহার জন্য নির্দিষ্ট করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষে এ ব্যবস্থা খুবই সুবিধার। যাঁহার এরূপ সুবিধা নাই তিনি অন্তত তাঁহার বাসগৃহের একপাশে তাঁহার আদর্শ প্রতীকের স্থান নির্দেশ করিয়া ধ্যানের স্থান করিয়া লইবেন। ইহাও তিনি বলিয়াছেন যে ঐ স্থানে ধ্যান ভিন্ন সাংসারিক কোন কথা বা আলোচনা করা উচিত নয়। সেখানে শুধু ধ্যান, প্রার্থনা ও শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ আলোচনা প্রভৃতি চলিবে। ঐরূপ নির্দিষ্ট স্থানে কিছুদিন ধরিয়া সৎচিন্তার অভ্যাস করিলে ঐস্থান এমন হইয়া যাইবে যে, মনে কোনরূপ চঞ্চলতার হেতু ঘটিলে সেখানে বসিলে মন শান্ত হইয়া আসিবে। দুই একদিনের চেষ্টায় ইহা না হইলে হতাশ হইবার কিছুই নাই। ধৈর্যের সহিত কিছুদিন এই অভ্যাস করিতে পারিলে ঐস্থানের হাওয়া পর্যন্ত পবিত্র হইয়া যায়। ইহা স্বামিজী বেশ পরিষ্কার ভাবেই ভরসা দিয়া বলিয়াছেন। মনের চঞ্চলতা দূর করিবার স্বামিজীর কথিত এই প্রণালী ধরিয়া কিছুদিন চেষ্টা করিলেই তাঁহার কথার সত্যতা আমরা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতে পারি।

আমরা চাই সদ্য ফল। আজ বৃক্ষ রোপন করিয়া কালই ফলবান বৃক্ষ দেখিতে চাই। ধ্যান

করিতে বসিয়া "বিশ্বরূপ" সঙ্গে সঙ্গেই প্রত্যক্ষ করিতে চাই। কিন্তু তাহা হইবার নহে। মলিন মন। ধূলিসমাচ্ছন্ন দর্পণে সহসা প্রতিবিম্ব পড়েনা। দর্পণের ধূলি মুছিতে হইবে, তবেই ত উহাতে ছায়া পড়িবে। মলিন মন পরিষ্কার করিয়া লইলেই ত সেই মনমুকুরে মহামায়া অথবা মদনমোহনের ছবির আবির্ভাব হইবে। এই জন্য স্বামিজী বলিয়াছেন,—বহু দিনের বহুজন্মের চঞ্চল স্বভাবের গতি বন্ধ দুইএক দিনে হয় না। এইজন্য ধৈর্যের প্রয়োজন।

প্রাণে যদি ব্যাকুলতা সত্যই থাকে তাহা হইলে অরুণোদয় হইবেই এই আশ্বাস শ্রীরামকৃষ্ণদেব দিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা ভাগ্যবান তাঁহারা আন্তরিক আগ্রহ ও যত্ন লইয়া সাধন-পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে, ক্রমশঃ মানবজীবনের যাহা পরম কাম্য, তাহা সফল করিয়া তুলিতে পারিবেন।

শৈশবকাল হইতে দেখিয়া আসিতেছি, দিদিমা পিসিমার দৈনন্দিন পূজা। পূজার সঙ্গে দেখিতেছি কত ব্রত নিয়ম, উপবাস, সংযম। পাড়ার দাদা খুড়াকে দেখিয়াছি পুষ্প আহরণ করিতে;—কত মালা তিলক, পূজা হোম যজ্ঞ। দিনের পর দিন একই ভাবে পূজা অর্চনা। ঘরে ঘরে দেখিতেছি,—কত তথাকথিত শুচিভাব, কত পুরশ্চরণ, কত নামসংকীর্তন। কত পুষ্পচয়ন হইল, কত চন্দন ঘসিয়া ঘসিয়া ক্ষয় হইল। কিন্তু জীবন অগ্রসর হইল কই? যেস্থান হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছিল, জীবনের শেষের দিকেওত মনের সেই অবস্থা। নোঙ্গর ফেলিয়া শুধু দাঁড় টানা হইয়াছে

ঠাকুর দেবতার সম্মুখে চক্ষু বুজিয়া বসি,—সংসারের যত জটিল কার্যের ছবি তখনই মনের মধ্যে ফুটিয়া উঠে:—ঘরে আজ চাউল নাই,—ছেলের স্কুলের বেতন দিবার তারিখ আগামী কাল, উহার যোগাড় করিতে হইবে—গ্রামের জমীটুকু লইতে না পারিলে বাড়ীটির শোভা হয় না,—বেহাইবাড়ী তত্ত্ব না পাঠাইতে পারিলে লজ্জার সীমা থাকিবে না,—উপেনের খতের মেয়াদ এই শনিবার শেষ হইবে, সোমবার আরজি না দিলেই লোকসানের বিষয় হইবে,—মুখুজ্যেবাড়ীর সীমানার মোকদ্দমার সাক্ষী আজই ত দিতে হইবে,—বাজারে ছাই কিছুই পাওয়া যায় না, যাহা মিলে তাহাও অগ্নিমূল্য,—ইত্যাদি ইত্যাদি। ইহাই হইল ঠাকুর দেবতার সম্মুখে বসিয়া আমাদের নিত্যকার ধ্যান পূজা! অভ্যাস বশে মুখস্থ বলিবার মত ফুল দেবতার চরণে অর্পণ করিলাম, স্তব-স্তোত্র আবৃত্তি করিলাম মাত্র। ভাব কই?

জীবন একটুও অগ্রসর হইল না। সেই হিংসা দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা,—পরস্ব-অপহরণ, অসত্যভাষণ, অসংযম, মনের মধ্যে অহর্নিশি ঘুরিতেছে।

কেন এমন হয়? এত পূজা অর্চনা যাগ যজ্ঞ—ইহার কোন ফলই পাইতেছিনা, কোথায় কোন ক্রটী রহিয়া গিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারিতেছিনা। গলদ কোথায় রহিয়াছে?

আমাদের এই শোচনীয় অবস্থা হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় শ্রীরামকৃষ্ণদেব দেখাইয়া দিয়াছেন। নিষ্ঠার সহিত উহা পালন করিতে পারিলেই আমাদের কল্যাণ হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন:—"শুধু নাম করলে হবে কেন? নামের প্রতি অনুরাগ চাই। মুখে সিদ্ধি সিদ্ধি বললে কি নেশা হয়? সিদ্ধি আনতে হয়, বাটতে হয়, সেবন করতে হয়, তবে ত হবে। শুধু সন্দেশ সন্দেশ করলে কি সন্দেশের স্বাদ পায়? সন্দেশ আনতে হয়, খেতে হয়, তবে ত? নামে যদি অনুরাগ না থাকে তবে সব বৃথা। গানে আছে,—'প্রভু বিনে অনুরাগ করে যজ্ঞ যাগ, তোমারে কি যায় জানা?' তাঁর প্রতি অনুরক্ত হও। নামে অনুরাগ হলে পূজা, ধ্যান, জপ, তপস্যা সকলি সার্থক হবে।"

এই অনুরাগ লাভ করিবার উপায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কথায় পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছেন:—"সাধক যদি ঠিক ঠিক ধর্মজীবন লাভ করিতে চাও, তবে সৎসঙ্গ কর, সৎপ্রসঙ্গ, সৎ আলোচনা কর,—লোক দেখান ভাবে নয়—আন্তরিক। ভগবান বাহিরের কার্য অপেক্ষা মন অধিক দেখেন।"

সত্যই কি আমরা ধর্মজীবন চাই? তাহা হইলে উপরে লিখিত উপদেশ-অবলম্বন ভিন্ন আমাদের অন্য পথ নাই।

গোষ্পদে রবি-বিম্ব

শ্রীদুর্গাদাস গোস্বামী, এম্. এ, কাব্য-ব্যাকরণ-তীর্থ, বিদ্যালঙ্কার, সাহিত্যশাস্ত্রী

মহাকবি কালিদাস একদা সমুদ্রের অনন্ত বৈচিত্র্য ও অসীম বিপুলতা দর্শনে বিস্ময়ে বিহ্বল-চিত্তে বিষ্ণুর সহিত তাহার তুলনা করিয়া বলিয়াছিলেন—"বিষ্ণোরিবাস্যাহনবধারণীয়মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা"—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণুর ন্যায় সমুদ্রের রূপেরও যাথার্থ্য বা পরিমাণ, কিছুই নির্দ্ধারণ করা যায় না। রবীন্দ্র-প্রতিভাও মহাসমুদ্রেরই মতো অনবধারণীয় এবং বৈচিত্র্যে, বিপুলতায়, গাম্ভীর্য্যে ও সারবত্তায় এক অপূর্ব্ব বিস্ময়কর বস্তু। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবনব্যাপী সাহিত্যসাধনাতে শিক্ষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, গীতি-কাব্য, নাটক, প্রহসন, উপন্যাস, ছোট- ও বড়-গল্প, ছন্দ, ভাষাতত্ত্ব, প্রবন্ধ, রাজনীতি, ধর্ম্ম, দর্শন, সমালোচনা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, আত্মজীবনী, জীবনচরিত, ভ্রমণকাহিনী, ডায়েরী, শিশুপাঠ্য গ্রন্থ ইত্যাদি সকল বিষয়ই স্থান পাইয়াছে এবং বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলি অতি উচ্চ ও বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া আছে। সকল বিষয়ের রচনাতেই তাঁহার সুদীর্ঘ-সাহিত্যসাধনা-লব্ধ পরিপক্ব অভিজ্ঞতার ও তীক্ষ্ণ গভীর অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন, সমৃদ্ধ ও অদ্ভুত মনীষার পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বড় পরিচয় এই যে, তিনি কবি এবং সর্ব্বাংশে কবি। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁহার পরিণত বয়সের রচনা 'পরিচয়'-নামক কবিতাতেও সেই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই কবি-মনের অপূর্ব্ব দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার সকল প্রকার রচনাকেই এক বিচিত্র আলোকপাতে উজ্জ্বল, মধুর ও মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনই বর্ষার পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর মতো কবিতার লীলায়িত ছন্দে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে, কোথাও তাহার দুর্দ্দান্ত গতিবেগ প্রতিহত বা মন্দীভূত হয় নাই।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য সাহিত্যিক ও দার্শনিকদের প্রভাব প্রচুর বিদ্যমান। তাই বলিয়া অক্ষম অনুকরণের দৈন্য কোথাও তাঁহার কাব্য-লক্ষ্মীকে ম্লান করে নাই, বরং সহজাত চিন্তাধারার মতোই স্বাঙ্গীকৃত ও স্বত-উৎসারিত ভাবসমূহ তাঁহার কাব্যলক্ষ্মীকে সমুজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ করিয়াছে। ভাব-সম্পদের দিক দিয়া তুলনা করিতে গেলে তাঁহার অগ্রজ ও অনুজ সামসময়িক কবিদিগকে স্বভাবতই শিশু বলিয়া মনে হয়। ভাষা ও প্রকাশের দিক্ দিয়াও দেখিতে গেলে তাঁহার স্থান সকলের উর্দ্ধে। প্রয়োজন অনুসারে তাঁহাকে ভাষা আবিষ্কার করিয়া ও কার্য্যোপযোগী করিয়া লইতে হইয়াছে। ছন্দ, শব্দ-তত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি আলোচনাকালে তাঁহার পারিভাষিক শব্দের সৃষ্টি তাহার সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের কবিমনের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো যে একটি বিজ্ঞানী মন রহিয়াছে, 'বিশ্ব-পরিচয়" গ্রন্থখানি তাহারই পরিচয় বহন করিতেছে এবং এই জাতীয় টেকনিক্যাল বিষয়ের ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, সে বিষয়েও একটি সুনির্দ্দিষ্ট পথ নির্দ্দেশ করিতেছে। রবীন্দ্র-নাথ প্রথমে গদ্যে সাধুভাষা ব্যবহারের সমর্থক ছিলেন, পরে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের দৃষ্টান্তে চলতি ভাষাও ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা রবীন্দ্র-নাথের সংস্কারমুক্ত, চির-নবীন ও চির-জাগ্রত মনের পরিচায়ক।

চির-নবীন রবীন্দ্রনাথ কোন কিছুকেই বেশী

দিন আঁকড়াইয়া ধরিয়া রাখিতে পারেন নাই। এক এক সময়ে এক এক জাতীয় ভাব তাঁহার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে এবং এক এক জাতীয় ফসল ফলাইয়া বিদায় লইয়াছে। তাহার পর আবার আর এক জাতীয় ভাবের জোয়ার আসিয়াছে। তাঁহার কবিমনের চলমান ধারা কোথাও দীর্ঘকাল আটকাইয়া থাকে নাই। বিভিন্ন পরিবেশ, বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন ক্ষণ তাঁহার সদা-জাগ্রত, তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শ-কাতর মনে ও ইন্দ্রিয়গ্রামে যে সাড়া জাগাইত তিনি তাহাকে ছন্দে, গানে অমর করিয়া রাখিতেন। এইজন্য, কোনদিনই কোন বিশিষ্ট মতবাদ, প্রথা বা সংস্কার তাঁহাকে পাইয়া বসিতে পারে নাই। রবীন্দ্রনাথ এক সময় স্বদেশীতে নামিয়াছেন এবং অজস্র স্বদেশী গান, প্রবন্ধ, কবিতা, বক্তৃতা প্রভৃতিতে সমস্ত বঙ্গবাসীকে নূতন প্রেরণা দিয়াছিলেন। আবার তাহার পরেই রাজনীতি ত্যাগ করিয়া তাঁহার নিরালা কাব্য-কুঞ্জে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা, ছন্দ, প্রকাশ-ভঙ্গী প্রভৃতি বিষয় ও রসভাবাদির সর্ব্বতোভাবে অনুগামী। তিনি ভাষায় কারুশিল্পী। শব্দ-নির্ব্বাচনবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ সহজে সন্তুষ্ট হইবার লোক ছিলেন না। এজন্য তাঁহার লেখায় বিস্তর কাটাকাটি হইত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের পূজারীর হাতে কিছুই অসুন্দর থাকিবার উপায় ছিল না। সেই কাটকুট-গুলি চিত্রিত করিয়া তিনি বিচিত্র করিয়া তুলিতেন। তাঁহার হস্তাক্ষরও ছিল তাঁহার নিজের আকৃতির মতোই সুন্দর। রবীন্দ্রনাথ প্রথম বয়সে কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর কাব্যের প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং মনে মনে তাঁহাকে কবিগুরু পদে বরণ করিয়া তাঁহার শাগরেদি করিয়াছিলেন। তবে শীঘ্রই তিনি সে প্রভাবমুক্ত হইয়াছিলেন। ছন্দের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ছন্দ-যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে আর কোন কবিরই মৌলিকতায়, বৈচিত্র্যে, বহুলতায় ও স্বতঃস্ফূর্ত্ততায় রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনা হয় না। তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী অপূর্ব্ব ও তাঁহার ভগবৎপ্রেমিক মনের অনুসারী। তাঁহার প্রকাশভঙ্গী অনন্যসাধারণ ও অপরূপ। রবীন্দ্রনাথ তাহার 'পুরস্কার' নামক কবিতায় যে আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিয়াছেন—

না পারে বুঝাতে আপনি না বুঝে,
মানুষ ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কূজে,
মাগিছে তেমনি সুর,
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে দু'চারিটা কথা
রেখে যাব সুমধুর।"

—তাঁহার সে আকুতি তাঁহার সমগ্র সাহিত্য-সাধনায় সার্থক হইয়াছে এবং বাণী তাঁহার ভাবকে সর্ব্বতোভাবে অনুসরণ করিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একজন পূর্ণ আশাবাদী। তাঁহার রচনাতে কোথাও তিনি নৈরাশ্য, দুঃখ, ধ্বংস বা মৃত্যুকে বড় করিয়া দেখান নাই বা শেষ কথা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। আশা, আনন্দ, জীবন ও যৌবনের গানই তিনি সারা জীবন ধরিয়া গাহিয়া গিয়াছেন। "তবু আশা জেগে থাকে প্রাণের ক্রন্দনে"—ইহাই হইল তাঁহার সাহিত্যের ও জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা ও চরম কথা। মানুষের স্খলন বা পতনকে তিনি চিরদিনই সাময়িক বস্তু বলিয়া মনে করিতেন এবং হাজার দোষ-ত্রুটী-অপরাধ সত্ত্বেও মানুষের মনুষ্যত্বে তিনি চিরদিনই পূর্ণ আস্থা ও শ্রদ্ধা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। তাই বিশ্বব্যাপী অশান্তি ও সমরাভিযানের মধ্যেও তিনি তাঁহার অশীতিবৎসর বয়সের প্রারম্ভে "সভ্যতার সংকট" নামক প্রবন্ধে এই মানুষের অপরাজেয় মহিমার বাণীই উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

"কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বেস শেষ পর্য্যন্ত রক্ষে করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্ম্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্ব্বাচলে সূর্য্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ মর্য্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম ব'লে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।"

রবীন্দ্রসাহিত্যের মূল সুর হইল সীমার মাঝে অসীমের প্রকাশ। ক্রমবিকাশবাদের নিয়মানুসারে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতি বিশ্বমৈত্রী ও মানবপ্রীতিতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিগুলি দেশ ও কালের সীমানা ছাড়াইয়া এখন বিশ্বসম্পদে পরিণত হইয়াছে।

স্বর্গের রঙীন নেশাও রবীন্দ্রনাথকে কোনওদিন অতিমাত্র বিহ্বল করিয়া তোলে নাই বা মৃত্যুর বিভীষিকাকেও তিনি কোনওদিন সার সত্য মনে করিয়া ব্যথিত হন নাই। রবীন্দ্রনাথ মাটির মানুষ এবং এই মাটির পৃথিবীর জন্য তাঁহার মমতা ও বেদনাবোধ অত্যন্ত নিবিড়। অমরাবতীর অতুল ঐশ্বর্য্য তাঁহাকে প্রলুব্ধ করে নাই; বরং এই মাটির পৃথিবী ও তাহার মাটির মানুষের ছোট-খাটো সুখ-দুঃখ, আশা-নৈরাশ্য, উত্থান-পতনই তাঁহার কবি-প্রেরণা জোগাইয়াছে। একদিন লাজুক প্রকৃতির ঘোমটা খুলিয়া তিনি যেমন কত রহস্যের কথা আভাসে-ইঙ্গিতে জানিতে পারিয়াছেন তেমনি, অপরদিকে, তিনি তাঁহার গভীর সূক্ষ্মদৃষ্টিদ্বারা মানুষের সহস্র জটিল সমস্যা ও রহস্যেরও দ্বারোদ্ঘাটন করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ অতীন্দ্রিয় ভাব-সম্পদেরও খনি। তাঁহার আধ্যাত্মিক মানসের চরম পরিণতি গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি, নৈবেদ্য প্রভৃতি ছাড়াও তাঁহার অজস্র কবিতাতে আধ্যাত্মিকতা 'সূত্রে মণিগণা ইব' অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে।

স্বদেশের ও স্বজাতির যেখানে তিনি কোনও হীনতা, ভীরুতা, কাপুরুষতা, গোঁড়ামি, ভণ্ডামি, ইতরামি, দুর্ব্বলতা বা বচনসর্ব্বস্বতা দেখিয়াছেন, সেইখানেই তিনি বিদ্রূপের তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন এবং ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্ষোভে আরব বেদুইনও হইতে চাহিয়াছেন। কিন্তু আবার তাহাদের কল্যাণ কামনায়ই

"এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে দিতে হবে ভাষা;
এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে ধ্বনিয়া তুলিতে
হবে আশা";

"অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহস-বিস্তৃত বক্ষপট"

—ইত্যাদিও প্রার্থনা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের তিরস্কার নিছক আঘাত দেওয়ার জন্য নহে—উহা স্নেহমিশ্রিত ও সংগঠনমূলক। যেখানে স্নেহ নাই, তিরস্কারের প্রশ্নও সেখানে উঠে না।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবন যদিও একান্ত নিয়মানুবর্ত্তী, শান্ত ও সংযত ছিল, তথাপি তাঁহার মন কোন কালেই সংরক্ষণশীল ছিল না; বস্তুতঃ, তাহা প্রশান্ত, উদার, প্রগতিপ্রবণ ও চির-প্রসারণশীল ছিল। তাঁহার সংস্কারমুক্ত মন সমাজের সকল প্রকার নিষ্ঠুর, অনুদার, ও হৃদয়হীন মত ও প্রথার বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। তিনি অস্পৃশ্যদের প্রতি স্বদেশবাসীদের আচরণে লজ্জা ও বেদনাবোধ করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সাবধান করিয়া দিয়াছেন। 'নৈবেদ্য' কাব্যে ভগবৎসমীপে ভারতের সর্ব্ববাধাবন্ধ-সংস্কার-মুক্তির জন্য তাঁহার প্রার্থনা অপূর্ব্ব মহিমায় উজ্জ্বল।

স্বদেশের ও স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণা অত্যন্ত উজ্জ্বল ও সুস্পষ্ট।

তিনি তাঁহার ঋষিজনোচিত অন্তর্দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন যে ভারতের দুঃখ-দুর্দ্দিন-দুর্দ্দশা সাময়িক, চিরস্থায়ী নহে। সমস্ত অবসাদ, গ্লানি কাটাইয়া একদিন তাহার গৌরবময় শুভদিন আসিবেই আসিবে। তাই তিনি অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিয়াছেন—

"নয়ন মুদিয়া শুনিমু, জানি না
কোন অনাগত বরষে
তব মঙ্গল-শঙ্খ তুলিয়া
বাজায় ভারত হরষে।
ডুবায়ে ধরার রণ-হুঙ্কার,
ভেদি' বণিকের ধন-ঝঙ্কার,
মহাকাশতলে ওঠে ওঙ্কার
কোন বাধা নাহি মানি'।"

রবীন্দ্রনাথ প্রাচী ও প্রতীচীর মিলন-সাধক ছিলেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতার স্বরূপটিকে চিনিতে পারিয়াছেন এবং ভারতীয় সভ্যতা যে বিভিন্ন সভ্যতাকে আত্মসাৎকরণের দ্বারা পরিপুষ্ট হইয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া প্রাচী ও প্রতীচী উভয়ের ভাবধারার মিলনেই যে পরস্পরের মঙ্গল তাহা তাঁহার "ভারত-তীর্থ" নামক কবিতায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

রবীন্দ্র-সাহিত্যে নারী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। জননীরূপে, ভগিনীরূপে, কন্যারূপে, প্রিয়ারূপে ও মানসীরূপে—সকল রূপেই তিনি অতি সূক্ষ্ম ও নিখুঁত নৈপুণ্যের সহিত নারীর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষে নারী কেবল নর্ম-সহচরীই নহে, কর্ম- ও চিন্তা-সহচরীও বটে। বাস্তবিক পক্ষে, অম্লান শাশ্বত সৌন্দর্য্যপিয়াসী, আদর্শবাদী রবীন্দ্রনাথের কবি-মানসে নারী কখনই নিছক ইন্দ্রিয়ার্থরূপে রহিতে পারে নাই, দেখিতে দেখিতে প্রেমের উত্তুঙ্গ মহামহিমময় অমরাবতীতে উত্তীর্ণ হইয়া নারীত্বের চরম ও পরম সার্থকতা লাভ করিয়াছে।

চিন্তারাজ্যের নানাবিধ ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ অধিনায়কত্ব করিয়াছেন। তিনিই প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বপ্রথম অতি উচ্চাঙ্গের গল্প রচনা করেন। তাঁহার "গল্পগুচ্ছ" প্রভৃতি জগতের যে কোন প্রথম শ্রেণীর গল্পের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য। রবীন্দ্রনাথের "জীবন-স্মৃতি," "ছেলেবেলা" ইত্যাদি আত্মজীবনী উৎকৃষ্ট রস-সাহিত্যের মূল্য ও মর্য্যাদা লাভ করিয়াছে। তাঁহার দিন-পঞ্জী "ছিন্নপত্র" অপূর্ব্ব সাহিত্যবস্তু। এগুলির শুধু সাহিত্যিক মূল্যই নাই, পরন্তু এগুলি পরম-রহস্যময় বিরাট রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্য-ভাণ্ডারের চাবিকাঠি-স্বরূপ। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও তাঁহার সাহিত্যসাধনা ভালভাবে বুঝিতে হইলে এগুলি গভীরভাবে পাঠের আবশ্যকতা আছে, কেননা, তাহারা বহু সঙ্কেত বহন করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের "প্রাচীন সাহিত্য," "আধুনিক সাহিত্য," "লোকসাহিত্য," "সাহিত্য," "সাহিত্যের পথে," "সাহিত্যের স্বরূপ" প্রভৃতি সমালোচনা-গ্রন্থগুলিও তাঁহার লেখনীর গুণে ও কবিমানসের সংস্পর্শে অপরূপ সুন্দর রসবস্তুতে পরিণত হইয়াছে এবং তাঁহার অদ্ভুত বিশ্লেষণী শক্তির ও রসদৃষ্টির পরিচয় দিতেছে। রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি," "জাপানযাত্রী," জাপানে-পারস্যে," "ইউরোপ প্রবাসীর পত্র" প্রভৃতি ভ্রমণ-কাহিনীও তত্তৎ দেশের ও অধিবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি, ইত্যাদি নানাবিধ বিষয়ের তথ্যে পরিপূর্ণ এবং কবিমন কিভাবে তাঁহাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে গ্রহণ করিয়াছে এবং তদ্বিষয়ে তাঁহার নিজের মতামত কি তাহা বিশদরূপে জানাইয়া দেয়। "ছন্দ," "বাংলাভাষাপরিচয়," "বিশ্ব-পরিচয়" প্রভৃতি গ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানী মনের পরিচায়ক। তাঁহার লিরিক কবিতাগুলি কি প্রাচুর্য্যে, কি বৈচিত্র্যে, কি মনোহারিতায় বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীর

মধ্যে শ্রেষ্ঠতার দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যাও বিপুল। তিনি শুধু উৎকৃষ্ট প্রথম শ্রেণীর গান-রচয়িতাই নহেন, স্বয়ং সুর-স্রষ্টা, সুকণ্ঠ গায়ক এবং নূতন সম্প্রদায়-প্রবর্তক। রবীন্দ্রনাথের "কালান্তর," "স্বদেশ," ও "সমাজ," "ধর্ম," "মানুষের ধর্ম," "শান্তিনিকেতন," "ব্রাহ্ম-সঙ্গীত" প্রভৃতি তাঁহার গভীর দেশাত্মবোধ, রাজনীতি, দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিকতার জলন্ত দৃষ্টান্ত ও চিরন্তন সাক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের "চারিত্র-পূজা" জীবন চরিত জাতীয় রচনার আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য এবং তাঁহার শ্রদ্ধাবান্ চিত্তের পরিচায়ক। মাতৃভাষার মধ্যস্থতা ব্যাতরেকে এবং জাতীয় নীতি, সংস্কৃতি ও আদর্শের অনুসরণ ও পরকীয় শ্রেষ্ঠ ভাব ও গুণগ্রামের স্বাঙ্গীকরণ ব্যতিরেকে যে শিক্ষা সুসম্পূর্ণ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কল্যাণকর হয় না, এই মৌলিক কথাটি তিনি বহুভাবে "শিক্ষা"-নামক অমূল্য গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। দেশের প্রাণ-কেন্দ্র হইতে উৎসারিত ও পল্লীর সম্পদ-স্বরূপ ছেলে-ভুলানো ছড়া, গ্রাম্য সাহিত্য, বাউলের গান, পল্লী-শিল্প ইত্যাদির সংগ্রহ, সমালোচনা ও মূল্যনির্দ্ধারণ-প্রয়াসেও তাঁহার সৌন্দর্য্য ও রসপিপাসু সমজদারী মনের পরিচয় মেলে। বাস্তবিকপক্ষে, সমস্ত চেতনা ও অনুভূতি দিয়া নিবিড়ভাবে রস-স্বাদ না করিলে এবং যথার্থ সহৃদয় রসিক, বিদগ্ধ ও মার্ম্মিক না হইলে কেহ অন্যকে এভাবে বুঝিতেও পারে না বা বুঝাইতেও পারে না। রবীন্দ্রনাথের লিখিত পত্রাবলীও নানাবিধ তথ্য ও আলোচনায় পরিপূর্ণ উৎকৃষ্ট রসোত্তীর্ণ পত্র-সাহিত্যের সুন্দর নিদর্শন।

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি গতানুগতিক সাধারণ নাটকের পর্য্যায়ে পড়ে না। মহাকবি কালিদাস তাঁহার "মালবিকাগ্নিমিত্র"—নামক নাটকে নাটকের উদ্দেশ্য ও সার্থকতা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—

"ত্রৈগুণ্যোদ্ভবমত্র লোকচরিতং নানারসং দৃশ্যতে।
নাট্যং ভিন্নরুচের্জনস্য বহুধাপ্যেকং সমারাধকম্।"

অর্থাৎ, নাটকে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট নানারসাশ্রয় লোকচরিত্রের অবতারণা থাকায় লোক-রুচি বহুধা ভিন্ন হইলেও নাটক সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করে। মহাকবি কালিদাসের নাটকের আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করিতে গেলে রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলির মূল্য কমিয়া যাইবে, কেন না, এগুলির অভিনয়ের দ্বারা লোকশিক্ষার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, অন্ততঃ বর্ত্তমানে সেরূপ শিক্ষিত, মননশীল দর্শকবৃন্দের অত্যন্ত অসদ্ভাব। সংস্কৃত-সাহিত্যেও "প্রবোধচন্দ্রোদয়," জাতীয় রূপক-নাটকের সংখ্যা অতি অল্প। মেটার্লিঙ্ক্-প্রমুখ পাশ্চাত্য নাট্যকারের প্রভাব ও প্রেরণাই রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় নাটকের মূলে রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিতে বেশীর ভাগ অভিজাত শ্রেণীর চরিত্রগুলিই স্থান পাইয়াছে। উপন্যাসগুলির চরিত্র-চিত্রন, ঘটনা-বিন্যাস মন-স্তত্ত্ববিশ্লেষণ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের অদ্ভুত লোকোত্তর প্রতিভারই পরিচায়ক, সন্দেহ নাই। এ ক্ষেত্রেও তাঁহার স্বকীয়তা সুস্পষ্ট।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সুদীর্ঘ জীবনের বহু-বিস্তৃত সাহিত্য-সাধনার দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে পূর্ণাবয়ব, অপূর্ব্ব শ্রীসম্পন্ন ও মহিমা-মণ্ডিত করিয়া বিশ্বসাহিত্যের আসরে তাহার গৌরবময় ও সম্মানজনক স্থান চিরতরে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। কবি সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে আমরাও বলি—

"জগৎ-কবিসভায় মোরা তোমার করি গর্ব্ব,
বাঙ্গালী আজ জ্ঞানের রাজা, বাঙ্গালী নহে খর্ব্ব।"

রবীন্দ্রনাথের মতো সকল দিক দিয়া এরূপ

ভাগ্যবান ব্যক্তি জগতে অতি অল্পই জন্মিয়াছেন। মহাকবি কালিদাস একদা মহারাজ দিলীপ সম্বন্ধে যে উচ্চশ্রেণীর প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন—"একাতপত্রং জগতঃ প্রভুত্বং, নবং বয়ঃ কান্তমিদং বপুশ্চ", রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। রবীন্দ্রনাথ প্রভুত্ব করিয়াছেন মাটির জগতের নহে—মনোজগতের; তাঁহার ঋজু, দীর্ঘায়ত বিরাট বপুও ছিল অপরূপ কান্তিসম্পন্ন, আর বৃদ্ধবয়সেও তিনি ছিলেন মুক্ত তরুণ। রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপও তাঁহার বলিষ্ঠ সর্ব্বাতিশায়ী ব্যক্তিত্ব এবং সুদৃঢ় চরিত্রের ন্যায়ই বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মনীষী, ও জনসাধারণের নিকট হইতে যে বিপুল সম্মান, সংবর্দ্ধনা ও শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এ পর্য্যন্ত পৃথিবীর আর কাহারও ভাগ্যে জুটে নাই।

রবীন্দ্রনাথ দেশের যুবশক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান ছিলেন। তিনি ছিলেন চির আশাবাদী ও তারুণ্যের জয়-গাতা; তাহার সাক্ষ্য তাঁহার "বলাকা", কাব্য। তিনি মনে প্রাণে জড় প্রবীণদের প্রতি খড়্গহস্ত ছিলেন এবং যুবকদের কর্ত্তব্যের ইঙ্গিত করিয়াছেন। দেশমাতৃকার স্বাধীনতা-যজ্ঞে তাঁহার দান অকৃপণহস্তে বিতরিত হইয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মান কবি গ্যেটে মৃত্যুর সময় বলিয়াছিলেন—"Light, more light." সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করিয়া রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রের' একস্থানে বলিয়াছেন যে, তিনি হইলে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন—"More light and more space"। এ প্রার্থনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার সত্যই সর্ব্বথা ছিল। তাঁহার ন্যায় মহাপ্রতিভাবান বিরাট পুরুষকে পৃথিবীর এইটুকু আলো ও এইটুকু স্থানে সত্যই কুলায় না। তাঁহারই কবিতার কথায় বলিতে ইচ্ছা হয়—

"হায়, গগন নহিলে তোমারে ধরিত কেবা
তপন তোমায় স্বপন দেখি যে,
করিতে পারিনে সেবা!"

বস্তুতঃ, অসীম মহাকাশ ছাড়া রবিকে কোথাও ধরে না, ইহা সত্য কথা।

উপনিষদের সর্ব্বানুভূতি—"একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা" রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে একীভূত হইয়া গিয়াছে। বস্তুতঃ, রবীন্দ্র-সাহিত্য রবীন্দ্র-জীবন হইতে স্বতন্ত্র পোষাকী জিনিস নয়, উহারা পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত; একটিকে বাদ দিয়া অপরটিকে বুঝিবার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। বহুর মধ্যে একের, সীমার মধ্যে অসীমের সাধনাই রবীন্দ্র-জীবনের ও রবীন্দ্র-সাহিত্যের সাধনা। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'গীতাঞ্জলি'তে কৃতজ্ঞ চিত্তে ও শ্রদ্ধাবনত মস্তকে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন—

"বিশ্বরূপের খেলাঘরে কতই গেলেম খে'লে,
অপরূপকে দে'খে গেলেম দু'টি নয়ন মে'লে।
পরশ যারে যায় না করা,
সকল দেহে দিলেন ধরা,
এইখানে শেষ করেন যদি শেষ ক'রে দিন তাই
যাবার বেলা এই কথাটি জানিয়ে যেন যাই॥"

স্নানযাত্রা

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

শ্রীশ্রীনীলাচলনাথ দারুব্রহ্মকে কেন্দ্র করিয়াই ওড়িয়া জাতির অনেকগুলি জাতীয় পর্ব বা উৎসব। অক্ষয়-তৃতীয়াতে চন্দনযাত্রা—তিন সপ্তাহ ব্যাপী। শ্রীজগন্নাথের প্রতিনিধিস্বরূপ মদনমোহনকে বেশভূষা ও পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত করিয়া নরেন্দ্রসরোবরে শোভাযাত্রা করিয়া লইয়া যাওয়া হয়। পূর্বে চন্দনযাত্রা খুব সমারোহে সম্পন্ন হইত। অপরাহ্ণে সাধুমণ্ডলী স্তব আবৃত্তি করিতে করিতে, সংকীর্তনের দল উচ্চরোলে হরিনামে মত্ত হইয়া আনন্দে নাচিতে নাচিতে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়া নরেন্দ্রসরোবরের দিকে চলিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবকেরা পদোচিত বেশে সজ্জিত হইয়া কেহ আসাসোটা ও পতাকা প্রভৃতি ধারণ করিয়া, কেহ কেহ-চামর বা বড় বড় হাতপাখায় বিমানে বাহিত শ্রীশ্রীমদনমোহনকে বীজন করিতে করিতে, কেহ কেহ নানা বাদ্য-যন্ত্র বাজাইতে বাজাইতে শোভাযাত্রার অনুগমন করিতেন। সুসজ্জিত নৌকায় মদনমোহনকে আরোহন করাইয়া জগন্নাথের জয়ধ্বনি দিতে দিতে সন্ধ্যার মৃদুমন্দ হিল্লোলে নৌকা-বিহার করানো হইত এবং সন্তরণপটু সেবক, পাণ্ডা ও যাত্রীরা নরেন্দ্র-সরোবরে ভজন-কীর্তন গাহিতে গাহিতে সাঁতার কাটিয়া নৌকার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। সেই সময় মঙ্গলধ্বনির মধ্যে নানা প্রকার বাজী পোড়ানোও হইত। নৌকায় নরেন্দ্রসরোবরে বিহার করিয়া শ্রীবিগ্রহ উপনীত হইতেন সরোবরের মধ্যস্থিত চন্দন মন্দিরে। মদনমোহনের সঙ্গী বিগ্রহদেরও তথায় একে একে উঠাইয়া লওয়া হইত। তুরী ভেরী প্রভৃতি বাজিয়া উঠিত। শৃঙ্গারী পাণ্ডা ফুলহারে ও অলঙ্কারে মদনমোহনকে সাজাইয়া মন্দিরে বসাইত এবং পুজক ভোগরাগ দিত। প্রায় রাত্রি ৯টা।১০টার পর শোভাযাত্রা সহ মদনমোহন বিগ্রহ-মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। বর্তমানকালে সেই শোভাযাত্রা নামে মাত্র আছে, আনন্দোৎসব বা অনুরাগ নাই।

চন্দনযাত্রার পর ওড়িষ্যার প্রধান পর্ব স্নান-যাত্রা। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানাভিষেক হয়। এখানে জগন্নাথ অর্থে চারিজন—জগন্নাথ, সুভদ্রা, বলরাম ও সুদর্শন। শ্রীমন্দিরের মণিকোঠার রত্নবেদী হইতে বিরাট প্রাঙ্গণের উত্তর-পূর্ব কোণে স্নানবেদীর মণ্ডপে দারুব্রহ্মকে আনা হয়। পূর্বরাত্রির মধ্যভাগ হইতে স্নানযাত্রার আনুষঙ্গিক নানা ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। স্নানমঞ্চ বা স্নানবেদীতে যথাবিধি পূজার্চনা করিবার পর কলসীগুলির জলকে মন্ত্রপূত করিয়া অভিষেক-মন্ত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথ, শ্রীশ্রীসুভদ্রা ও শ্রীশ্রীবলরাম বিগ্রহাদির মস্তকের উপর বর্ষণ করা হয়। সেই সময় শঙ্খ তুরী ভেরী পটহাদি বাদ্য বাজিতে থাকে। সেই স্নানজল যাত্রীরা শ্রদ্ধাপূর্বক পান করিয়া থাকেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা দর্শন করিতে এত লোকের ভিড় হয় যে স্নানমণ্ডপে সকলের দাঁড়াইয়া দেখা অসম্ভব। পুরীর রাজা অসুস্থ বা অপর কোনও প্রতিবন্ধক থাকিলে তাঁহার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথের যথারীতি সেবাকার্য সুসম্পন্ন করাইয়া থাকেন। এই

প্রতিনিধির নাম মুদীরথ বা মুদ্রাহস্ত। স্নানযাত্রার দুইদিন পূর্ব হইতে অর্থাৎ শুক্লা ত্রয়োদশীতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী 'দৈতা'রাই শ্রীশ্রীজগন্নাথ বিগ্রহাদির পূজার্চনা ও অন্য সকল কার্য করিয়া থাকে। এই দৈতাগণ বিশ্ববসু শবরের বংশধর—তাঁহারা আপনাদিগকে জগন্নাথের জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। নব কলেবরে যখন মন্দির-প্রাঙ্গণের পশ্চাতে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে পুরাতন বিগ্রহের সমাধি হয় তখন দৈতা-সেবকেরা অশৌচ গ্রহণ করে। পতি মহাপাত্রেরা আপনাদিগকে বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। স্কন্দ পুরাণে উল্লেখ আছে যে মালবের অধিপতি রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার রাজধানী অবন্তীতে বাস করিতেন। তিনি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। স্বয়ং বিষ্ণু একদিন সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া রাজার নিকট আসিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি রাজাকে "শ্রীক্ষেত্রে"র মাহাত্ম্যের কথা বলিলেন। শ্রীভগবান সেখানে নীলমাধব মূর্তিতে বিরাজিত—দেবতারা তথায় আসিয়া শ্রীভগবান বিগ্রহের সেবা পূজা করিয়া থাকেন। আর সর্বতীর্থের অপেক্ষা শ্রীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য অধিক।

দ্বারাবত্যাং জলে মুক্তিঃ বারাণস্যাং জলে স্থলে।
জলে স্থলে চান্তরীক্ষে মুক্তিঃ স্যাৎ পুরুষোত্তমে॥

রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন সন্ন্যাসীর বাক্যে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাপতি নামক এক বিশ্বাসী ভক্ত-ব্রাহ্মণকে পথ ঘাট ও সব তথ্য সংগ্রহ করিতে পাঠাইলেন। শ্রীক্ষেত্রে শবর জাতি ছাড়া অন্য কোন বসতি ছিল না। সমস্ত স্থানটি গভীর অরণ্যপ্রদেশ বলিলেই হয়। শবর জাতির রাজা বিশ্ববসু। বিশ্ববসুর কন্যাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাপতি নীলমাধবকে দর্শন করিতে সক্ষম হন। এই বিশ্ববসুর বংশধর বলিয়া দৈতারা পরিচয় দেয় এবং পতি-মহাপাত্রেরা বিদ্যাপতির বংশধর বলিয়া দাবী করে। যাহা হউক স্নানযাত্রার দুই দিন পূর্ব হইতেই ইহারাই শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবাপূজার ভার গ্রহণ করে। মণিকোঠার রত্নবেদী হইতে স্নানবেদীতে যখন বিগ্রহেরা আনীত হন—তখন স্নানের পরে সর্বসাধারণ তাহাদের ইচ্ছামত প্রাণ ভরিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ প্রভৃতিকে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিতে পারেন—কোন বাধা নাই। এই স্নানযাত্রার দিন শ্রীশ্রীজগন্নাথ স্নানবেদীর উপরে গণেশ বেশ ধারণ করেন। পুরীবাসী অনেকেই গণেশবেশ দেখিয়া থাকেন। এই স্নানযাত্রার পর অনবসর—অর্থাৎ জগন্নাথের জ্বর হয়। তিনি মণিকোঠায় গিয়া আর রত্নবেদীতে বসেন না এবং লোকদিগকেও দর্শন দেন না। দৈতারা পতি-মহাপাত্রদের দ্বারা পাঁচনভোগ দিয়া থাকেন। সেই পাঁচন অতি সুস্বাদু। অনেকেই প্রসাদ পাইয়া থাকেন। অমাবস্যা পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চলে। সাধুভক্তেরা শ্রীশ্রীজগবন্ধুকে দর্শন করিতে পারিবেন না বলিয়া কেহ আলালনাথ বা কোন দূরতীর্থে গমন করিয়া থাকেন। কিন্তু মন্দিরে দশাবতারের পটে ভোগ নিবেদন করিয়া মহাপ্রসাদ দানে ভক্তদিগকে পরিতৃপ্ত করা হইয়া থাকে। এই পনর দিন অনবসরে জগন্নাথের দারু মূর্তির রং করা হয়। জলে রং অনেকটা ধুইয়া মুছিয়া যায়। এই সময়ে এই সব কাজ যাঁহারা করেন—তাঁহাদিগকে দাত্য বলে এবং যাঁহারা দারুমূর্তি নির্মাণ বা সংস্কার এবং মহাপ্রভুদিগকে বহন করে তাহাদিগের নাম 'দয়িতা সয়ান্তরী'। অনবসরকাল উত্তীর্ণ হইলে অর্থাৎ প্রতিপদ তিথিতে নেত্রোৎসব বা নবযৌবন এবং দ্বিতীয়া তিথিতে তাঁহাদের রথারোহন আর রথযাত্রা। এই সময়ে বিগ্রহদিগকে আলিঙ্গন ও স্পর্শ করিতে কোন বাধা নাই। শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা পূজার

অঙ্গ "ছত্তিশা নিজগ" স্বয়ং অনঙ্গ ভীমদেব এই নিয়োগ করিয়া গিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা বিস্তারিত বর্ণনা করা সম্ভবপর নয়। এই সেবকের দল উত্তরাধিকারী-সূত্রে বংশপরম্পরায় সেবাপূজা করিয়া আসিতেছেন। সেবার নীতি বা রীতি এমন করিয়া বাঁধা যে সামান্য কোন সেবক অনুপস্থিত থাকিলে মন্দিরের সেবা-পূজা অচল। বর্তমানে এই সেবকের দল—ছয় হাজার প্রাণী—১৪০০ পরিবারে বিভক্ত। মাদলাপঞ্জীতে আছে যে 'ছত্তিশা নিজগ' ব্যতীত ১২০ জন ছোট ছোট সেবকের দলও আছে।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ যে কোন্ দেবতা তাহা লইয়া এক এক সম্প্রদায়ের এক এক মত। কেহ বলেন বিষ্ণু মূর্তি, কেহ বলেন কৃষ্ণ মূর্তি কিন্তু যাঁহারা শাক্ত তাঁহারা বলেন—বিষ্ণুর প্রসাদ কোথায় মহাপ্রসাদ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে—বিষ্ণুর নৈবেদ্য বা ভোগে কোথায় আদা মাষকলাইএর পিঠা দেওয়া হয় ইত্যাদি। আবার বৈদান্তিকেরা বলেন ইহা ওঁকার মূর্তি। পূজারী পাণ্ডাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে ইঁহারা সর্বপ্রথমে ব্রহ্মমন্ত্রে অর্চনা করিয়া পরে দক্ষিণা-কালিকা-মন্ত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে, শিবমন্ত্রে বলভদ্রকে এবং সুভদ্রাকে ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে পূজা করেন। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে রাজার আদেশে সর্বশেষে গোপালমন্ত্রে পূজা হইয়া থাকে।

শিক্ষিত পুরাতত্ত্ববিদ এবং ইংরেজ ঐতি-হাসিকেরা বলেন—ইহা বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের—ত্রিমূর্তি। বিরুদ্ধবাদীরা বলেন ভারত কিম্বা ভারতে-তর দেশে কোথাও কোন বৌদ্ধমন্দিরে এইরূপ মূর্তি দেখা যায় না। ইহা যদি বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের প্রতীক-মূর্তি হয় তবে অন্যত্র তাহার সন্ধান পাওয়া যায় না। বৌদ্ধমন্দিরে কোথাও প্রসাদকে মহাপ্রসাদ বলা হয় না। বরং মহানির্বাণতন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় "মহাপ্রসাদমানীয় পাত্রেষু পরিবেশয়েৎ"। ৺পুরীধামে মহাপ্রসাদে হাত ধুইয়া কুলকুচা করিতে নাই। মহানির্বাণ তন্ত্রে ষষ্ঠোল্লাসে আছে "হস্ত প্রক্ষালনং নাস্তি তব নৈবেদ্যসেবনে॥" শ্রীশ্রীজগন্নাথের পার্শ্বদেবতা সবই শক্তিমূর্তি। শক্তিপীঠে মা সতীর এক একটি অঙ্গ পড়িয়া-ছিল—প্রস্তরীভূত সেই অঙ্গ পীঠে পূজা হয়। কিন্তু শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গের অভ্যন্তরে সেই শক্তির অঙ্গ আছে—তাহারই স্নান হয়। ইহাকে পাণ্ডারা ব্রহ্মপদার্থ বলে। কেহ কেহ বলেন বৌদ্ধ অনাচারে মূর্তি নষ্ট হওয়ায় শ্রীশঙ্করাচার্য দারু মূর্তি নির্মাণ করাইয়া গোবর্ধন মঠ স্থাপন করেন। মঠাম্নায় আছে—

"পুরুষোত্তমন্তু ক্ষেত্রং স্যাৎ জগন্নাথোঽস্য দেবতা।
বিমলাখ্যা হি দেবী স্যাদাচার্যঃ পদ্মপাদকঃ॥
তীর্থং মহোদধি প্রোক্তং ব্রহ্মচারী প্রকাশকঃ।
মহাবাক্যং চ তত্রোক্তং প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম চোচ্যতে॥"

গোবর্ধন মঠের রক্ষিত গুরু-পরম্পরার নামমালায় আছে—

"পদ্মপাদঃ শূলপাণিস্ততো নারায়ণাভিধঃ।
বিদ্যারণ্যো বামদেবঃ পদ্মনাভাভিধস্ততঃ॥
জগন্নাথঃ সপ্তমঃ স্যাদষ্টমো মধুরেশ্বরঃ।
গোবিন্দঃ শ্রীধরস্বামী মাধবানন্দ এব চ॥"

এখানে শ্রীধর স্বামীর নাম দশম আচার্যরূপে রহিয়াছে। গোবর্ধন মঠের ভূতপূর্ব মোহান্তের সময়ে গ্রন্থাগারটি সুরক্ষিত ছিল এবং সে সময়ে শ্রীধর স্বামীর হস্তলিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের টীকার পুঁথিও অনেকে দেখিয়াছেন। বর্তমান সময়ে অনেক অমূল্য হস্তলিখিত পুঁথি হারাইয়া গিয়াছে। শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত গোবর্ধন মঠের প্রভাব এখনও শ্রীশ্রীজগন্নাথের মন্দিরে লুপ্ত হয় নাই। একমাত্র উক্তমঠের পীঠাধীশ শঙ্করাচার্য শ্রীমন্দিরে আসন লইয়া বসিতে পারেন। ভারতের অন্য কোন সম্প্রদায়ের পীঠাধীশের এই মর্যাদা নাই।

মন্দিরের রক্ষিত মাদলা পাঁজিতে দেখা যায়

যযাতি কেশরী শ্রীজগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। রক্তবাহুর আক্রমণে ও সাগরের প্লাবনে মন্দির ও শ্রীমূর্তি ছিল না। যযাতি কেশরী অনুসন্ধানে জানিলেন যে সোনপুরে শ্রীবিগ্রহ আছেন। সেখানে গিয়া শুনিলেন যবনাক্রমণের ভয়ে জগন্নাথ ভূগর্ভে প্রোথিত। তিনি তাহা উত্তোলন করিয়া ৩৮ হাত উচ্চ মন্দির নির্মাণ করাইয়া শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিলেন। তিনিই বিশ্ববসু ও বিদ্যাপতির বংশধরগণকে সন্ধান করিয়া শ্রীমন্দিরের সেবা-পূজায় নিয়োগ করিয়াছিলেন। অনঙ্গ ভীমদেব বর্তমান সুবৃহৎ মন্দির নির্মাণ করাইয়া 'ছত্রিশা নিজগ' নিযুক্তপূর্বক সেবা পূজায় সুবন্দোবস্ত করেন। তাঁহারই পদ্ধতি আজ পর্যন্ত কোনক্রমে চলিতেছে। ইঁহাকে ওড়িশায় দ্বিতীয় ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

কালাপাহাড় যখন কটকে আসিয়া পৌছেন তখন পাণ্ডারা আক্রমণের ভয়ে জগন্নাথকে চিল্কাহ্রদের ধারে পারিকুদে অপসারিত করিয়াছিলেন। কালাপাহাড় তাহার সন্ধান পাইয়া শ্রীমূর্তি অগ্নিতে নিক্ষেপ করেন। বিশার মহান্তি নামক জনৈক ওড়িষ্যাবাসী শ্রীশ্রীজগন্নাথের পরম ভক্ত ছিলেন। তিনি প্রাণ উপেক্ষা করিয়া অর্ধদগ্ধ জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ হইতে ব্রহ্ম-পদার্থ (relics) উদ্ধার করিয়া কুজঙ্গে আনেন। টোডরমল্ল যখন রামচন্দ্রদেবকে ওড়িষ্যায় স্বাধীন রাজা বলিয়া গণ্য করেন তখন উক্ত রাজা কুজঙ্গ হইতে পুরীধামের শ্রীমন্দিরে দারুমূর্তিতে পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেন। মুসলমানদের আমলে মন্দির অনেকবার লুটপাট হইয়াছিল। মারাঠা রাজাদের আমলে সাতাইশ হাজারী মহলটী শ্রীশ্রীজগন্নাথের সেবা ও শ্রীমন্দিরের রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট হয়। সুতরাং শ্রীমূর্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে শ্রীশঙ্করাচার্য যে দারুমূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন—ইহা অসম্ভব মনে হয় না

কিন্তু শ্রীক্ষেত্রে বর্তমানে নদীয়ার নিমাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রভাবই দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছে—

স্নানযাত্রা দেখি প্রভুর হইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুঃখ॥
গোপীভাবে প্রভু বিরহে ব্যাকুল হইঞা।
আলালনাথে গেলা প্রভু সবারে ছাড়িঞা॥

এখনও এই স্নানযাত্রা দেখিবার জন্য যাত্রীর দল টিকিট কিনিয়া শ্রীমন্দিরের চারিপাশের মঠের ছাদ-বারান্দায় বসিয়া স্নান দর্শন করেন। বড়দাণ্ড অর্থাৎ বড় রাজপথে দাঁড়াইয়াও শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নান অনেকে দর্শন করিয়া থাকেন।

এই স্নানযাত্রার দিনেই বাংলাদেশে কলিকাতায় কালীঘাটে ভোর সাতটা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত দ্বার বন্ধ করিয়া 'দেবীর কৌটা'র (relics) স্নান হয়। এই পর্ব দর্শন করিবার আমার সৌভাগ্য হইয়াছিল। সাত জন ব্রাহ্মণকে চক্ষু বাঁধিয়া মন্দিরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। বেলা ১টার সময় যখন তাঁহাদের বাহির করিয়া আনা হইল তখন তাঁহারা প্রায় অর্ধ-মূর্চ্ছাপন্ন। সেবকেরা তাঁহাদের পাখা লইয়া বীজন করিয়া মুখে চোখে জলের ছিটা দেয়। সেই স্নানজল অত্যন্ত মধুর সৌরভপূর্ণ—আমি সেই স্নানজল পান করিয়া ঠিক অমৃতের আস্বাদ পাইয়াছিলাম। কিন্তু দেখিলাম, পাণ্ডারা সেই স্নানজলে গঙ্গাজল মিশাইয়া যাত্রীদিগকে প্রদান করেন—পয়সার জন্য। তবুও সুগন্ধ ও মধুর স্বাদ থাকে। আর কোন দেবীপীঠে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় কিনা তাহা অনুসন্ধানযোগ্য।

এই স্নান-পূর্ণিমার দিনেই শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাস্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালীমাতার প্রতিষ্ঠা হয়। বাংলাদেশেও ইহা বিশেষ পর্ব।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন-দর্শন

শ্রীমনকুমার সেন

সত্যের সাধক মহাত্মা গান্ধীর জীবননীতি ও কর্মব্রতের পশ্চাতে যে 'দর্শন' লক্ষিত হয় তাকে বলা যেতে পারে 'ভগবদ্-দর্শন' বা এই বিরাট ও অনন্ত সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের মূলে পরম সত্যস্বরূপ যিনি রয়েছেন তাঁকে উপলব্ধি করা। বস্তুতঃ, মর্মমূলে প্রচণ্ড ঈশ্বর-বিশ্বাসের শক্তি তাঁকে অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে বলেই গান্ধীজী একাধারে ভক্তিযোগী ও কর্মযোগী হ'তে পেরেছেন;—স্বার্থলেশহীন সর্বত্যাগী হয়েও সংসারের ছোট-বড় শত শত সমস্যার সমাধানে সক্রিয় থাকতে পেরেছেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সংসার ছিল মুখ্যতঃ এই চল্লিশ কোটি দরিদ্র ও মূখ ভারতবাসীর সংসার।

গান্ধীজী তাঁর 'আত্মকথা'র অন্যতর নামকরণ করেছেন 'সত্যের প্রয়োগ' (Experiments with truth): জাগতিক সীমাবন্ধনীর মধ্যে থেকে অনন্যনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক যেমন তার প্রয়োগ-শালায় আপেক্ষিক সত্যের কোন না কোন দিক, কোন নূতন দিকের বীক্ষণ, অনুবীক্ষণ বা আবিষ্কারে মগ্ন থাকেন, গান্ধীজীও তেমনি তাঁর কর্মে উৎসর্গীকৃত জীবনের মধ্য দিয়ে, প্রাত্যহিক বহু ঘটনা ও কর্মানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে, সংসারের সীমাবন্ধনীর মধ্যে লব্ধ ও আবিষ্কৃত খণ্ড খণ্ড আপেক্ষিক সত্যে জোড়া লাগিয়ে পূর্ণতম পরম সত্য বা মানবকল্যাণের মূলাধারকে উপলব্ধি করতে চেয়েছেন।

'আত্মকথা'র ভূমিকায় গান্ধীজী লিখেছেন, "সত্যই আমার কাছে মূল নীতি,—আরো অসংখ্য নীতি এর অঙ্গীভূত হয়ে আছে। এই সত্য শুধু বাক্যের সত্যতা নয়, চিন্তারও সত্যতা; আর আমরা যাকে আপেক্ষিক সত্য মনে করে থাকি শুধু তাই নয়, পূর্ণতম সত্য, সনাতন শাশ্বতনীতি,—অর্থাৎ ঈশ্বরও।" পূর্বে গান্ধীজী বলেছিলেন, 'God is truth'—'ঈশ্বরই সত্য'—; পরে বললেন, 'Truth is God'—সত্যই ঈশ্বর। সত্যের উপর উচ্চতম গুরুত্ব আরোপ করলেন তিনি। আর, যে 'সত্' থেকে 'সত্য' শব্দের উৎপত্তি, তার মানেও হচ্ছে 'যা আছে', (that—which exists):—কি আছে, বা পরম সত্য কি? ব্রহ্মজ্ঞানীরা বলেন, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন,—জ্ঞানীরা যাঁকে ব্রহ্ম বলে, যোগীরা তাঁকেই আত্মা বলে, আর ভক্তেরা তাঁকেই ভগবান বলে; কর্মযোগী গান্ধী প্রধানতঃ আত্মার বা আত্মশক্তির উদ্বোধনের মধ্যেই পূর্ণতম সত্য উপলব্ধি করেছেন; উপলব্ধি করেছেন পূর্ণতম সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে। কোন্ পথে তাঁর এই উপলব্ধি হয়েছিল? অনুপম ভাষায় তিনিই এর জবাব দিয়েছেন, "ঈশ্বররূপে সত্যকে যদি খুঁজে পেতে চাও, প্রেম বা অহিংসাই তার এক ও অদ্বিতীয় পথ",—কাজে কাজেই, "প্রেমই ঈশ্বর, একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।" কাজেই আমরা দেখছি, গান্ধীজীর দৃষ্টিতে 'সত্য' ঈশ্বরেরই স্বরূপ, সত্য-সাধনা ঈশ্বরেরই সাধনা, আর এই সাধনার একমাত্র অবলম্বনীয় পথ প্রেম। আত্মশক্তি বা 'soul force'—যা গান্ধীজীকে মহাত্মারূপে বরেণ্য করেছে, তা এই প্রেম থেকেই উপজাত। "যিনি আমার সৃষ্টিকর্তা এবং যাঁকে আমি সত্যস্বরূপ বলে

মনে করি, তাঁকে উপলব্ধি করবার জন্যে আমি উন্মুখ হয়ে আছি—আর জীবনের প্রথম অবস্থাতেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যদি আমাকে সত্যোপলব্ধি করতে হয় তাহলে জীবনের বিনিময়েও আমাকে প্রেমধর্ম (the law of love) মেনে চলতে হবে।" এই হচ্ছে তাঁর কথা: জীবন যায় যাক্, তবু প্রেম তথা অহিংসা জয়যুক্ত হোক ! প্রেমধর্মের প্রতি এই অনন্যনিষ্ঠ আনুগত্যই গান্ধী-জীবন ও সাধনার ভিত্তি। প্রয়োজনের তাগিদেই এই প্রেম নয়, মানুষের আত্মার স্বভাবধর্ম বলেই এর আবাহন। দেব ও দানব এই দুয়ের সংমিশ্রণে গড়া মানুষ: দেবত্বের বিভূতিতে যে জীবন যত আকৃষ্ট হবে, দেবভাবের দিকে যে মানুষের জীবন যত ঝুঁক্‌বে, তার গতি ও সার্থকতাও ততই বেড়ে যাবে। প্রেম বা অহিংসা মানুষের দেবভাবের পরিচয়: এইটাই তার প্রকৃত ধর্ম, আর শুধু এই ধর্মের বলেই মানুষ তার জীবনের মূল লক্ষ্যে বা পূর্ণতায় পৌছুতে পারে। তাই গান্ধীজীবন ও নীতিতে 'Truth' হচ্ছে লক্ষ্য,—পূর্ণতা বা পরম সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতীক,—আর 'Non violence' বা অহিংসা হচ্ছে সেই লক্ষ্যে পৌছুবার পথ।

মহাত্মা গান্ধী নিছক পুঁথিগত দর্শনের মত এই তত্ত্বকথা শুনিয়ে যান নি। তিনি বললেন কার্যকরী অহিংসার কথা। পূর্ণতার আদর্শ শুধু জ্ঞানের সীমানাতেই সীমাবদ্ধ থাক্‌বে না, কার্যক্ষেত্রে এর আচরণ ও প্রয়োগ চাই ! মহাত্মা বললেন, "অন্যায়ের প্রতিরোধ অবশ্য করবে, তবে অন্যায় দিয়ে নয়, ন্যায় দিয়ে। অসত্যকে সত্যের শক্তিতে পরাভূত কর; অহিংসার মন্ত্র আঁকড়ে চল,—অনিবার্যরূপে এই মন্ত্রশক্তিই তোমাকে পূর্ণতম অহিংসার বা প্রেমের প্রতিমূর্তি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরসমীপে পৌছে দেবে। সত্যই তোমাকে মহাসত্যে পৌছে দিতে পারে, প্রেমেই শুধু মহাপ্রেমের আধার উপলব্ধ হতে পারে। অসত্য দিয়ে সত্যে পৌছানো যায় না, অ-প্রেম বা হিংসাকে অবলম্বন করে প্রেম বা অহিংসার আদর্শে পৌছানো কথনই সম্ভব নয়। বুনো গাছের বীজে বুনো গাছই হয়, গোলাপ হয় কি? সমুদ্র পাড়ি দিতে গিয়ে যদি গরুর গাড়ীকে কর বাহন, তাহলে গাড়ী আর তুমি দুই-ই ডুববে। সুতরাং লক্ষ্য যতখানি সুন্দর, বিশুদ্ধ ও সৎ হবে, পন্থাও ঠিক ততখানি, এমন কি তারও বেশী সুন্দর, বিশুদ্ধ ও সৎ হওয়া চাই।" মহৎ আদর্শ যে কোন দিনই সহজ-লভ্য নয় গান্ধীজীর সংগ্রাম-বহুল জীবনই তার জ্বলন্ত প্রমাণ। বস্তুতঃ দেহের বন্ধনের মধ্য থেকে দেহাতীত পূর্ণ সত্যের সম্পূর্ণ উপলব্ধি খুবই কঠিন। তবু, মানুষ চিরদিনই আদর্শকে বড় করে তুলে ধরেছে, এক ধাপ নিজে এগিয়েছে তো জীবনের লক্ষ্যকে আরো তিন ধাপ দূরবর্তী বলে মনে করেছে: লক্ষ্যকে প্রসারিত করা এবং অনুক্ষণ সেই লক্ষ্যে পৌছুবার সাধনা করা, এটাই হচ্ছে প্রকৃত সভ্যতা ও মানুষের জীবনধর্ম। লক্ষ্যকে ক্রমেই সঙ্কুচিত করে আনবার, মনুষ্যজীবনের মহত্তম আদর্শকে ক্ষুদ্র হতে ক্ষুদ্রতর করে নিছক দৈহিক ক্ষুন্নিবৃত্তির পর্যায়ে নামিয়ে আনবার যে প্রবৃত্তি শিল্প-বিপ্লবোত্তর পশ্চিমী সভ্যতায় প্রকাশ পেয়েছে, তার ভয়াবহ পরিণাম গান্ধীজী দূরদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন: আর এই সর্বনাশা স্রোতকে অবরুদ্ধ করবার জন্যেই প্রেমভিত্তিক কর্মপন্থার রচনা ও রূপায়নেই আজীবন ব্রতী রেখেছিলেন নিজেকে ও আদর্শবাদী কর্মিদলকে,—বহুমুখী কর্মপ্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই কর্মানুষ্ঠানের উপস্থিত লক্ষ্য দুর্গত জনগণের দুঃখমোচন করা,—সমাজের সুপ্ত জীবনকে চঞ্চল করে তোলা। সমাজের এই রূপান্তর যে প্রকারান্তরে পূর্ণতম সত্যের পথকেই প্রশস্ত করবে, এই অবিচল বিশ্বাসই তাঁকে পরিচালিত করেছে: 'I know I cannot find Him apart from humanity'—মানুষকে বাদ দিয়ে আমি তাঁকে (ঈশ্বরকে) পেতে পারি না।" জীবে প্রেম, জীবের সেবা—ঈশ্বরেরই সেবা,—এই ছিল তাঁর সুগভীর প্রত্যয়। আর ভারতীয় জীবন-দর্শনেরও এইটেই মূল কথা।

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একটি মানুষ

শ্রীদীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, তর্ক-বেদান্ততীর্থ

বিরল হলেও এমন লোক আমরা পৃথিবীতে দেখতে পাই যিনি দেহে এবং আংশিক ভাবে মনে মানুষের সবলতা দুর্বলতা বহন করেও এমন এক অপার্থিব আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বেলে জগতে বিচরণ করেন যে সেই আলো অপর মানুষকেও আকৃষ্ট ও মুগ্ধ করে। এইরূপ ব্যক্তির বাহিরে কোনও পরিচয়, পদ বা প্রতিষ্ঠা না থাকলেও তাঁর ভিতরের আগুনের ছোঁয়াচ তাঁর সংস্পর্শে যারাই আসে তারাই অনুভব করে। এই ধরণের এক জন মানুষ ছিলেন শ্রীনগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী—শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের একজন খাঁটি মানুষ। গত বছর, ১লা পৌষ আমরা তাঁকে অপ্রত্যাশিতভাবে হারিয়েছি।

তাঁর বাল্যবন্ধুরা আজও তাঁর বাল্যকালের অদ্ভুত সাহস, দৃঢ়সংকল্প ও বন্ধুপ্রীতির কথা বলতে বলতে আত্মহারা হয়ে পড়েন। স্বদেশী যুগের সমিতির শিক্ষায় গড়ে উঠেছিল তাঁর অদম্য মনোবল ও সুদৃঢ় দেহবল। প্রথম যৌবনেই দুর্বৃত্ত পুলিস অথবা অন্য কোনও দুষ্টলোককে শাসন করতে বন্ধুদের অনুরোধে তিনি হতেন অগ্রণী। আবার শবদাহ, রোগীর পরিচর্যা প্রভৃতি কার্যে তাঁর ছিল অক্লান্ত উদ্যম। যে সকল বীভৎস বা কঠিন রোগীর কাছে তাদের নিকট-আত্মীয়বর্গ থাকতে কুণ্ঠিত হতেন, নগেন্দ্রনাথকে অম্লানবদনে অকুণ্ঠিতচিত্তে দীর্ঘকাল তাদের সেবায় ব্যাপৃত থাকতে দেখা যেত। কিন্তু এসব ছিল তাঁর চরিত্রের বাহিরের দিক। অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত বাল্য থেকেই ছিল তাঁর তীব্র আধ্যাত্মিক আকাঙ্ক্ষা, যা ক্রমশঃ নানা ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে জীবনের অপর সকল দিক্‌কে পরিপ্লাবিত করে মিলিত হয়েছিল শ্রীরামকৃষ্ণ-সারদা-বিবেকানন্দের ভাবধারার ত্রিবেণীসঙ্গমে। "ছোটবেলা থেকেই মনে হতো ঋষি মহাপুরুষরা যা করে গেছেন, যা বলে গেছেন—সব জানতে হবে, তাঁদের জীবন অনুসরণ করতে হবে।" সত্য ও ধর্ম জানবার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় প্রথম যৌবনেই তিনি মূল অথবা অনুবাদের সাহায্যে বহু ধর্ম ও জ্ঞানের গ্রন্থ অধ্যয়ন করেছিলেন। প্রথম যৌবনেই যখন স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও ভাবধারার সহিত পরিচিত হলেন, তখন থেকেই তাঁর নানামুখী চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষা একটা সুনির্দিষ্ট ধারা প্রাপ্ত হয়ে সেই ধারায় পরিপুষ্ট হয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। স্বামিজীর দেশ-প্রেম, মানব-প্রীতি, তাঁর ভারত-সংস্কৃতি-প্রীতি ও আধ্যাত্মিকতা-প্রীতি নগেন্দ্রনাথকে পাগল করে তুলল। এক নির্দিষ্ট স্থানে সমভাবের বন্ধুদের নিয়ে দিনরাত্রি স্বামিজীর কথা ও আলোচনায় ব্যাপৃত হলেন। খেলাধুলা, ব্যায়াম, আর্ত ও রোগীর সেবা, জনকল্যাণকর প্রতিষ্ঠান গঠন, আবার নীরবে বন্ধুদের নিয়ে পাঠ-আলোচনা-ধ্যান-ধারণা, এই সকল ব্যাপারেই তাঁর অসাধারণ সংগঠনশক্তি ও নেতৃত্ব ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যেত। স্বার্থশূন্য উদার ভালবাসা ছিল তাঁর সহজাত স্বভাব। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে স্ব-স্থান পাবনা জেলা-স্কুল থেকে প্রবেশিকা

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নানা কারণে তাঁকে ভাগলপুর, কুচবিহার প্রভৃতি নানাস্থানের কলেজে অধ্যয়ন করতে হয়। পরিশেষে রংপুর কলেজ থেকে বি. এ., পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি ঐ কলেজেরই গ্রন্থাগারিক ও হোস্টেল-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। ছাত্রজীবনে ফুটবল খেলোয়াড় রূপেও তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। বন্ধুরা বলেন, তাঁকে মেরে অজ্ঞান না করলে 'গোল' দেওয়া অসম্ভব ছিল। কিন্তু এই খেলোয়াড়-খ্যাতি যখন চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল, সেই সময় একদিনের সংকল্পে তিনি সারাজীবনের জন্য 'ফুটবল' খেলা ত্যাগ করলেন। আশ্চর্য মনোবল! "কলেজের ছেলেদের মধ্যে ঠাকুর-স্বামিজীর ভাব দিতে পারলে দেশের অনেক কাজ হবে, এই জন্যই কলেজে কাজ নিয়েছিলাম, নইলে চাকুরী করবার কোন স্পৃহা বা প্রয়োজন আমার ছিল না।" কলেজের ও হোস্টেলের ছাত্রদের কাছে দিনরাত উচ্চপ্রসংগ এবং আত্মত্যাগ ও ভালবাসা দিয়ে তাদের গড়ে তোলা, এই ছিল তাঁর প্রধান কাজ। বীরত্বপূর্ণ ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে দেশপ্রেম—এই ছিল তাঁর প্রধান শিক্ষার বিষয়। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন থেকেই এই দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের ত্যাগ, বীর্য ও পৌরুষ-পূর্ণ ভাবসমূহের অনুশীলনের ফলে তাঁর ভিতর পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছিল একটি কঠোর পুরুষোচিত মনোভাব এবং নারীজাতির প্রতি এক প্রকার অবহেলাপূর্ণ ব্যবধানের দৃষ্টি। তাই এক বন্ধুর সনির্বন্ধ অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি যেতে স্বীকৃত হন নাই শ্রীশ্রীসারদাদেবীকে দর্শন করতে। "ভাবতাম মেয়েমানুষ আর বেশী কি উন্নত হতে পারে? শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী বলেই লোকে এত বড় করছে।" তবুও পরে একদিন সেই বন্ধুর আগ্রহাতিশয্যে যেন বাধ্য হয়েই তাঁরই সংগে শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনে বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হলেন। এক ব্রহ্মচারী তাঁদের জানিয়ে দিলেন যে সেদিন আর মায়ের দেখা পাবেন না। কিন্তু বাধা পেয়েই নগেন্দ্রনাথের আগ্রহ ও সংকল্প উদ্দীপ্ত ও দৃঢ়তর হয়ে উঠ্‌ল। তিনি সংকল্প করে বসলেন,—'এসেছি যখন মাকে না দেখে যাবই না'। ব্রহ্মচারীর নিষেধ সত্ত্বেও ঘণ্টার পর ঘণ্টা প্রতীক্ষা করতে লাগলেন শ্রীশ্রীমায়ের দর্শনের আশায়। এমন সময় উপর থেকে পূজনীয় স্বামী সারদানন্দজী নেমে এলেন সিঁড়ি দিয়ে। প্রতীক্ষমান দুজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও তোমরা?"

"মার কাছে যেতে চাই, মাকে দর্শন করতে।"

"বেশ, উপরে চলে যাও তোমরা মার কাছে।" শরৎ মহারাজের আদেশ হয়েছে, আর বাধা দেয় কে? দুজনে মায়ের সন্নিধানে উপস্থিত! একে একে সমবেত পাঁচ ছয়জন প্রণাম করার পর সকলের শেষে গিয়ে প্রণাম করলেন নগেন্দ্রনাথ। কিন্তু সেই এক প্রণামেই লুটিয়ে পড়ল তাঁর জীবন শ্রীশ্রীমায়ের চরণে। শুধু মায়ের চরণে নয়, শ্রীশ্রীমায়ের প্রতিমূর্তি সমগ্র নারীজাতির চরণে! প্রণাম করার সংগে সংগেই তাঁর বাহিরের সংজ্ঞা লোপ পেল। চোখে অবিরল অশ্রু, পরে মুখে অস্ফুট মা মা ধ্বনি! সংগী বন্ধু আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল! অপার করুণাময়ী শ্রীশ্রীমা সন্তানকে ক্রোড়ে শায়িত করে ব্যজনে ব্যস্ত! কিছুকাল পরে সংজ্ঞা ফিরে এল। শ্রীশ্রীমা নিজের হাতে সন্তানকে খাইয়ে দিলেন মিষ্টান্নপ্রসাদ। পরের জীবনে নগেন্দ্র হেসে বলতেন—"মা সন্দেশ খাইয়েছিলেন বটে, কিন্তু অনেকখানি কাঁদিয়ে;

তাই সারাজীবন অনেক সন্দেশ খাচ্ছি বটে, কিন্তু কেঁদে কেঁদে।”...... সেই একস্পর্শে সমগ্র নারীজাতির প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তিত হল—ভক্তি ও সহানুভূতিতে পরিপূর্ণ হল। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত নারীর প্রতি এই শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাঁর চরিত্রের একটা বিশেষ দিক্ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই “একস্পর্শে সকল সংশয় দূর হয়ে গেল—জীবনের গন্তব্যপথ ও লক্ষ্য-সম্পর্কে। টাকা পয়সা মান যশের দিকে আর কখনই মন যায়নি।” শ্রীশ্রীমায়ের নিকট দীক্ষা লওয়ার প্রয়োজন আছে কিনা জিজ্ঞাসা করাতে মা বলেছিলেন, “এখন থাক্, সে পরে হবে।”* এই সময়ে প্রিন্সিপাল ওয়াট্‌কিন্‌সের আগ্রহে তিনি দর্শন ও ইতিহাস এই দুই বিষয়ে এম্-এ পরীক্ষা দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। ওয়াট্‌কিন্‌স-এর আকাংক্ষা ছিল, এম. এ, পাশ করিয়েই তাঁকে কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করবেন, কারণ তিনি নগেন্দ্রনাথের প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের তরঙ্গ এসে সব ওলট্ পালট্ করে দিল। এম্-এ, পরীক্ষা তো দেওয়া হোলোই না, যাদের জন্য তিনি কলেজের কাজে ছিলেন সেই সব ভাল ভাল ছেলেরা অধ্যাপকদের সাথে আন্দোলনে যোগদান করে ছত্র-ছন্ন হয়ে পড়ল। “যাদের জন্য কলেজে ছিলাম তারাই যখন ছত্রছন্ন হয়ে গেল, তখন আর থাকব কিসের জন্য?” তাই একদিন স্নান করতে যাবার সময় কলেজের আপিসে গিয়ে কাজের পরিত্যাগ-পত্র দিয়ে এলেন। “ভেবেছিলাম কলেজটাকে অবলম্বন করেই একটা প্রকৃত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌বে। সেটা যখন এইভাবে ভেঙ্গে গেল, তখন বুঝলাম যে মার ইচ্ছা নয় এ জীবনে কোন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি।” বন্ধুদের আগ্রহে তাদের সাথে কিছুকাল গ্রামে গ্রামে চরকা ও তাঁতের কাজে ঘুরলেন। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম সন্ন্যাসী শিষ্য পূজ্যপাদ স্বামী অভেদানন্দজী আমেরিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় বেদান্ত সমিতি স্থাপন করেন। নগেন্দ্রনাথ বেদান্ত সমিতির গ্রন্থাগারিকরূপে স্বামী অভেদানন্দের সাহচর্যে দুই বৎসর অবস্থান করলেন। এর পরে নগেন্দ্রনাথ কলকাতায় শ্যামবাজারে প্রায় পাঁচ বৎসর রইলেন। এ সময়েও পাঠ-আলোচনা-ধ্যান-ধারণায়, পূজা-উৎসব-সেবায় তাঁর দিন কেটেছিল বন্ধুবর্গের সাথে। দর্শন, বিজ্ঞান, ধর্ম, দেশ, এই সব ছিল তাঁর নিত্য প্রসংগের বিষয়। আবার কলা, সুর, সংগীত নিয়েও আলোচনা করতেন। নিজে যদিও পারতেন না গাইতে, তথাপি সংগীত ও সুর তাঁকে গভীর আনন্দ দিত। সুযোগ মত প্রায় প্রত্যহই গান শুনতেন বন্ধুদের মুখে। কত উৎসাহ দিতেন তাদের। যদিও তিনি নিজেকে রাখ্‌তে চাইতেন সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ও গোপন, তবুও তাঁর সংগে কারও কয়েক দিনের আলাপ কোন প্রকারে হলেই সে আকৃষ্ট হয়ে পড়তো তাঁর অসাধারণ চিন্তাশক্তি, ব্যক্তিত্ব ও ভালবাসার আকর্ষণে।

কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে (১৯২৮) ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানের জন্য উপস্থিত হলেন নগেন্দ্রনাথ। দরিদ্র যাত্রীরা পোঁটলা-পুঁটলি হাতে করেই এসেছে স্নানে। অবগাহনের উদ্দেশ্যে এক বৃদ্ধা তার পোঁটলাটি দিল জলে অবস্থিত নগেন্দ্রনাথের হাতে। দেখাদেখি একের পর আর যাত্রীরা দিয়ে চল্‌লো তাদের পোঁটলা, মুক্তহস্তে নিশ্চিন্তে

* শ্রীশ্রীমায়ের স্থূলশরীরের অদর্শনের পর পূজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজ তাঁহাকে মন্ত্রদীক্ষা দান করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন,—“মা তোমার জন্য মন্ত্র রেখে গেছেন আমার কাছে।”

ডুবটি দিতে। হৃদয়বান্ নগেন্দ্রনাথ কি করে নিরাশ করবেন দরিদ্রগণের নির্ভরতাপূর্ণ এই সামান্য আকুতিকে? দশ ঘণ্টা কোমর জলে দাঁড়িয়ে এই ব্রতরক্ষার কাজ করে চললেন নগেন্দ্রনাথ নির্বিকার চিত্তে অসহায় দরিদ্র যাত্রীদের সেবায়! কলকাতায় ফিরে তাঁর অনুগত কয়েকজন সংগী ও বন্ধুর সংগে তিনি ভুবনেশ্বরে উপস্থিত হন। অতি নির্জন তীর্থস্থান, শিবের স্থান, বিশেষতঃ স্বামী ব্রহ্মানন্দের নির্বাচিত বাসস্থান ভুবনেশ্বর, বড়ই পছন্দ হল তাঁর। রাত্রিদিন অধিকাংশ কাল ধ্যান-ধারণা, পাঠ-আলোচনা ও উচ্চপ্রসংগে অতিবাহিত করে ৩।৪ ঘণ্টা মাত্র তাঁর অবশিষ্ট থাকত নিদ্রার জন্য। প্রত্যেক মহাপুরুষের জন্মতিথি উপলক্ষে সেদিন থেকে আরম্ভ করে মাসাবধি চলতো তাঁর জীবনী ও বাণীর আলোচনা। সংস্পর্শে যারা আসতো তাদের চিন্তাধারা ও ভাবধারা গড়ে তোলার জন্য তাঁর ছিল অক্লান্ত উত্তম, অফুরন্ত ভালবাসা। কোন নিরাশ বা ব্যথিত হৃদয়ে একটু আশা ও আনন্দ সঞ্চার করতে পারলে তিনি স্বর্গ-সুখ অনুভব করতেন। কারও দোষের বিচার না করে শুধু তাকে ভালবেসে যাওয়া, তার গুণটাকে খুব বড় করে দেখে সেই দিক দিয়ে তার সাথে মেশা, ভালবেসে তাকে উন্নীত করা—এই ছিল তাঁর পদ্ধতি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী সন্তান পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী তাঁরই আগ্রহে নিমন্ত্রিত হয়ে যখন তাঁর বাসস্থান 'সারদাধামে' এসেছিলেন তখন নগেন্দ্রনাথ সকলকে বললেন—"সাক্ষাৎ ঠাকুরই আসছেন জানবে, তোমাদের যার যা আকাঙ্ক্ষা হয় সব আয়োজন করবে।" ছোট বড় সকল সন্ন্যাসীর গৈরিকের প্রতি ছিল তাঁর অকুণ্ঠ সম্মান। কেউ এলে নিজের হাতেই পা ধোয়ার জল এনে দিতেন। এমনি করে দিন কাটছিল সারদাধামে—শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেবায়। শ্রীশ্রীগোপালও আছেন প্রতিষ্ঠিত; তাঁরই নামে দেবোত্তর হল 'সারদাধাম'। সেবায়েত করলেন অপর সবাইকে, নিজে কিছুই নয়। কোন অর্থ, কোন সম্পত্তি কেউ তাঁকে দিতে পারেনি তাঁর নিজের জন্য কোন দিন। সবই ঠাকুরের, সবই গোপালের। "না খেটে খেতে নেই"—তাই তীব্র জর নিয়েও ঠাকুর-সেবার পরিশ্রম, না হয় দু'ঘণ্টা পাঠ-আলোচনা করাই চাই। উচ্চচিন্তার অগ্নি-শিখা, গভীরভাবের তীব্রতা ক্রমে বেড়েই চললো। শরীরের নিয়ম মেনে চলা অসম্ভব হয়ে পড়ল। কিন্তু শরীরের ধর্ম না মানলে প্রকৃতি তার পরিশোধ নিতে ছাড়ে না। ক্রমশঃ ভেঙ্গে এলো সেই লোহার শরীর। কিন্তু তা সত্ত্বেও আবাল্যের স্বপ্ন হিমালয়ের আহ্বানে ঘুরে এলেন কেদার বদরী। তারপর প্রায় দুই বৎসর বৈদ্যনাথ ধামে। অত্যন্ত আনন্দ পেলেন স্বামী জগদানন্দের সংগে। বৈদ্যনাথ-ধাম থেকে জগন্নাথধাম পুরীতে এলেন ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে। সমুদ্রের তীরে ছিলেন আনন্দেই—মাঝে মাঝে জগন্নাথ দর্শন, পাঠ-আলোচনা ও অসীমের ধ্যান। ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ বড়ই ব্যথিত করেছিল তাঁর হৃদয়কে। এই সময়ে তিনি পূর্ববঙ্গে ছিলেন। মানুষের দুঃখে তাঁর করুণ হৃদয় অসহায় ভাবে যে যন্ত্রণা অনুভব করতো চোখে মুখে ফুটে উঠতো সেই ব্যথা। সামনে যারা এসে পড়তো আর্ত, তাদের জন্য যতখানি সম্ভব সাগ্রহে সর্বদাই সেবা করতেন। এক বৎসর পরে আবার ফিরে এলেন নিজের প্রিয় সাধনার স্থান ভুবনেশ্বরে। এই সময়ে তাঁর অধ্যয়ন ও আলোচনা ক্রমে আরো অধ্যাত্মমুখী হয়ে উঠলো। বলতেন—"ধ্যানে ডুবে যেতে হলে বিদ্যা ও স্মৃতি—এগুলিও অন্তরায় হয়ে ওঠে, তাই এখন প্রার্থনা করে স্মৃতি ভোলবার চেষ্টা

করছি।" অদ্ভুত ছিল তাঁর স্মৃতিশক্তি; যাকে একবার দেখেছেন, যা কিছু একবার পড়েছেন তা যেন আর ভুলতেনই না। সকলের ছিলেন তিনি 'দাদা'। পূর্ণত্যাগ ছিল তাঁর সাধনার ভিত্তি। কাম-কাঞ্চন-প্রতিষ্ঠা ত্যাগ, দেহারাম ত্যাগ। নিজেকে মুছে ফেলা, অপরের জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। ভালবাসার ভিত্তিতে পূর্ণ আত্মত্যাগ। বলতেন,—"শরীরের দিকে তাকালে কি আর জীবন (অধ্যাত্মজীবন) হয়? শরীর তো যাবেই। The flesh must be crucified so that the spirit may resurrect." "My part is only to love and serve"—এই ছিল তাঁর কথা। শরীর ক্রমশঃ ভেঙে আসতে লাগলো। আহার কমে গেল অস্বাভাবিকরূপে। কিন্তু তবু এত পরিশ্রম, এত পাঠ-আলোচনা, এত ধ্যান-ধারণা, কেউ বুঝতেই পারতো না কতটা তাঁর অসুস্থতা। ডাক্তারেরাও এসে তাঁর অধ্যাত্মপ্রসংগের প্রভাবে ভুলে যেতেন রোগীর শরীরের কথা। ঠাকুর ও মায়ের সেবা ছেড়ে নড়তে চাইতেন না সহজে। তবুও ১৩৫৯ সনে পূজার পূর্বে এক বন্ধুর বিশেষ আগ্রহে রওনা হলেন দাক্ষিণাত্যের তীর্থভ্রমণে। কি এক ভাবাবেগের আলোড়ন হয়ে গেল কন্যাকুমারীর দর্শনে। ফিরে এসে অন্যান্য বারের মতই পূজার উৎসাহ! বন্ধুরা অনেকেই আসে পূজার সময়ে। সুদীর্ঘ পূজা ও মন্ত্রপাঠ-অনুষ্ঠানে অতিবাহিত করলেন পূজার দিনগুলি। পূজার পরে সবাই ধরল, কলকাতায় যেতে হবে চিকিৎসার জন্য। শরীরের ভাঙন দেখে সবাই শংকিত। "কন্যাকুমারীর পায়ে দিয়ে এসেছি এই দেহ ও জীবন," বললেন তিনি। "আর কোন কামনা নেই আমার, আমি যাবার (মৃত্যুর) জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত।" কিন্তু একথা শুনেও বন্ধুরা ও সংগীরা কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, তাঁর চিরযাত্রার দিন এত সন্নিকট। শরীরটা কতকটা ভাঙ্গা হলেও এমন কিছু কঠিন ব্যাধিতো হয়নি। বয়স তো মাত্র উনষাট। এখনো সিংহের মত শক্তি। তবু সবার অনুরোধে শেষে বল্লেন—"একটা সংকল্প নিয়ে আসনে বসছি। যদি যাই তো শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথি উৎসবের পরে যেতে পারি।" মধ্যরাত্রি হতে সারারাত ধ্যান আরম্ভ হল এই সময়ে। কলকাতার এক বন্ধুকে লিখেছিলেন—"শরীর যখন ভেঙে অন্য কাজের অযোগ্য হয়, ধ্যানই তখন একমাত্র অবলম্বন।" প্রত্যহ রাতে পাঠের সময় গভীর আধ্যাত্মিক জীবন ও তত্ত্বের আলোচনার পর বলতেন, "জীবনের প্রতি তৃষ্ণাই জ্ঞানের প্রধান অন্তরায়।" এমনি করেই কাটছিল। সহসা শরীরে প্রকাশ হল রক্তহীনতার উপসর্গ। চিকিৎসকের আদেশে এবং বন্ধুদের আগ্রহের চাপে আসতে বাধ্য হলেন কলকাতায়। সকলের আশা চিকিৎসা হলেই সুস্থ হবেন; বাহিরের কর্মশক্তি, সকলের সংগে সানন্দে প্রসংগ প্রভৃতি দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। কিন্তু ডাক্তার দেখে বললেন, ভিতরের সকল যন্ত্রই প্রায় শেষ হয়ে গেছে—'too late' তবু চেষ্টা করলেন তাঁরা প্রাণপণ। আট দশ দিন হল চিকিৎসার অভিনয়। কলকাতায় সব বন্ধুদের কাছে সেই একই কথা। "দেহ গেলেও আমার দুঃখ নেই, কন্যাকুমারীর পায়ে জীবন দিয়ে এসেছি।" আর করুণ-ভাবে বলেছিলেন, "বড় কষ্ট! সারা জীবন সকলের সেবা করে এসেছি, এখন আবার সেবা নিতে হচ্ছে।" একটুও আর্তনাদ করেন নি নিজের জন্য রোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও। ১লা পৌষ (১৩৫৯) অমাবস্যা। অজ্ঞানাচ্ছন্ন অবস্থা সত্ত্বেও 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ, হরি ওঁ রামকৃষ্ণ' নিজেই উচ্চারণ করতে লাগ্‌লেন। অনিমেষ নয়নে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও মায়ের মূর্তি। শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সাথে সাথে অদ্ভুত স্পন্দন দেখা দিল ভ্রূদ্বয়ে ও ভ্রূমধ্যে। অবিশ্রাম নামধ্বনি চলেছে সকলের মুখে 'হরি ওঁ রামকৃষ্ণ।' খেলায় ক্লান্ত সন্তান চল্‌লেন দিব্যধামে—মায়ের কোলে। স্মরণ হল গীতার বাণী—

"প্রয়াণকালে মনসাঽচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥

জান কি?

শ্রীমতী কল্যাণী সেন

তোমারি ঐ নিঃসীম নীল-নয়নে
আঁখি দুটি মোর পথ হারাল যে কেমনে?
বিশ্ব-হৃদয়! তোমার হৃদয়-গভীরে
পরাণ আমার ডুবিতে যে চায় অধীরে?
সুদূর তোমার সুমধুর হাসি-আলোকে
আকাশে যত না আঁধার টুটিল পলকে?

শান্ত শীতল অতল অমিয়-সিন্ধু
ক্লান্ত তৃষিত চাহি তারি এক বিন্দু।
চেতন! তোমার নিবিড় আলিঙ্গনেতে
জড়তা-মুক্ত আমি চাই মোরে চিনিতে।
যতেক কর্ম রহিবে তোমারে ঘেরিয়া
তারি মাঝে মোর নবীন প্রকাশ বরিয়া।

গানে গানে আর প্রাণের আকুল ছন্দে
ভরিবে নিখিল প্রেম-ফুল-মধু-গন্ধে?

সমালোচনা

পুরাণ-মংগল (সাধারণ খণ্ড—প্রথম ভাগ)—**শ্রীসাহাজী** প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান: শ্রীভবন, রাসমণিডেঙা, নবদ্বীপ; পৃষ্ঠা—১৪০; মূল্য ৫৲ টাকা।

ভারতবর্ষের রাষ্ট্র, সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির বহুতর পরিচয় পুরাণের মধ্যে নিহিত রহিয়াছে—কিন্তু ঐ পরিচয়ের ঐতিহাসিক মূল্য অনেকে দিতে চান না। ইহার পক্ষে একটি প্রধান বাধা পুরাণে কথিত কালের দুর্বোধ্যতা।

সুদীর্ঘ ৩৬ বৎসরের অনুশীলন ও গবেষণার ফলস্বরূপ আলোচ্য গ্রন্থটিতে পুরাণে বর্ণিত কালের একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। ভারতের ঐতিহ্যের অনুরাগিগণকে লেখকের উপস্থাপিত তথ্য ও যুক্তিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

মহিষ-মর্দিনী—শ্রীসাহাজী প্রণীত। পৃষ্ঠা—২৮; মূল্য—৷৷৹ আনা। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে দেবী মহিষ-মর্দিনী সম্বন্ধে একটি নূতন দৃষ্টিভঙ্গীতে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করা হইয়াছে। লেখকের সিদ্ধান্ত:—মহিষ চারিজন; ১ম মহিষ মন্দর পর্বতে, ২য় মহিষ ক্ষীরোদ (দক্ষিণ) সাগরের উত্তর তীরে, ৩য় মহিষ অরুণাচলে এবং ৪র্থ মহিষ বিন্ধ্যপর্বতে দেবী কর্তৃক বিনষ্ট হয়। দেবীও চারিজন: উগ্রচণ্ডা, ভদ্রকালী, দুর্গা এবং কাত্যায়নী। লেখক নানা পুরাণ হইতে প্রমাণ আহৃত করিয়াছেন।

উপনিষদের উক্তি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সিংহ কর্তৃক সংকলিত; প্রকাশক: শ্রীগুরু লাইব্রেরী, ২০৪, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬, পৃষ্ঠা—৩৮+।৵৹; মূল্য—দশ আনা।

ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, শ্বেতাশ্বতর, তৈত্তিরীয়, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষৎ হইতে বাছিয়া কতকগুলি শ্লোক ও উক্তির অন্বয় এবং অনুবাদ সহ সংকলন। পরিশেষে বিভিন্ন উপনিষদের আটটি আখ্যানও দেওয়া হইয়াছে। সাধারণ পাঠকমণ্ডলীর মধ্যে উপনিষদের ভাবধারা প্রচারে গ্রন্থকারের এই উদ্যমকে সমাদর করি।

শ্রীমদ্ভাগবত (সংক্ষিপ্ত আখ্যান ভাগ)—**লেখক:** শ্রীগুণদাচরণ সেন; **প্রকাশক:** প্রবর্তক পাবলিশাস, ৬১, বহুবাজার ষ্ট্রীট,

কলিকাতা—১২ ; পৃষ্ঠা—৩৫৯+৩২ ; মূল্য—৫৲ টাকা। এই পুস্তকটিতে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সকল স্কন্দ হইতে আখ্যান অংশগুলি বাছিয়া সংক্ষিপ্ত আকারে পর পর সাজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। মাঝে মাঝে অনুবাদ সহ প্রদত্ত মূল সংস্কৃত শ্লোকগুলি গ্রন্থের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। ধর্মপিপাসু সাধারণ পাঠকপাঠিকাগণ বইটি পড়িয়া উপকৃত এবং আনন্দিত হইবেন। বাংলা ভাগবত-সাহিত্যে এই পুস্তকের উপযুক্ত সমাদর কামনা করি। ইহা যখন অনুবাদ গ্রন্থ নয় তখন ভাষা আর একটু সরল ও স্বাধীন হইলে বোধ হয় ভাল হইত।

সামবেদীয় সন্ধ্যা বিধি—শ্রীশ্রীশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ঘটক সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান: ৯১নং সি কোয়ার্টার, পোঃ হিনু, রাঁচি। পৃষ্ঠা: ৩৪; মূল্য ।০ আনা।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে সন্ধ্যা-আহ্নিকের নিয়ম, ক্রম এবং অন্বয়মুখী অর্থ ও ব্যাখ্যাসহ মন্ত্রগুলি দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যা প্রাঞ্জল এবং মৌলিকতাপূর্ণ। বহু মুদ্রন-প্রমাদ চক্ষুকে পীড়িত করে, অবশ্য বইএর শেষে শুদ্ধিপত্র দেওয়া আছে।

শ্রীম-কথা (দ্বিতীয় খণ্ড)—স্বামী জগন্নাথানন্দ সংকলিত। প্রকাশক: শ্রীঅনিল কুমার গুপ্ত, ১৩।২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলিকাতা—৬। ২৭৫ পৃষ্ঠা; মূল্য আড়াই টাকা।

'শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত'-কার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত বা 'শ্রীম'র সহিত নানা ধর্মপ্রসঙ্গের বিবরণ ভক্তগণের (১৯২৪-১৯২৯) সালের দিনপঞ্জী হইতে সংকলিত হইয়া বর্তমান গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। প্রসঙ্গগুলিতে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বহু উক্তির প্রাণবন্ত বিবৃতি মিলে। পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন 'শ্রীম'র কাছে বসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত গ্রন্থেরই মনোজ্ঞ ব্যাখ্যান শুনিতেছি। শ্রীরামকৃষ্ণানুরাগিগণের নিকট পুস্তকখানি ভাল লাগিবে, সন্দেহ নাই। অনেক ছাপার ভুল চোখে পড়িল। কোন কোন দিনের আলোচনার মধ্যে 'শ্রীম'-ব্যতিরিক্ত অপর কয়েকজন ব্যক্তির কথাবার্তা ও বর্ণনা গ্রন্থের পরিপ্রেক্ষিতে স্পষ্টতই অবান্তর মনে হইল।

জনগণের উপনিষৎ—অনুবাদক: শ্রীযোগেশ চন্দ্র দত্ত, এম্‌-এ, বি-টি, বি-ই-এস্ (অবসরপ্রাপ্ত), গোরাবাজার, বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ) পৃষ্ঠা ৯২ ; মূল্য এক টাকা মাত্র।

ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক—এই চারিটি উপনিষদের পদ্যানুবাদ। 'উপনিষদের যৎকিঞ্চিৎ' নামে প্রারম্ভিক একটি পরিচিতি অধ্যায় এবং প্রত্যেক উপনিষদের পূর্বে উহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। মাঝে মাঝে পাদটীকায় কঠিন শব্দ ও বিষয়ের সরল বিবৃতি দেওয়া আছে। অনুবাদে মূল সংস্কৃতের ভাব ও তাৎপর্য সুপরিস্ফুট, তবে কবিতার শব্দবিন্যাস ও লালিত্য সর্বত্র সুষ্ঠু নয়।

নির্ঝর সঙ্গীত—প্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী-প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীগৌর চন্দ্র চক্রবর্তী, ৩।১ এম্‌ ছিদাম মুদী লেন, কলিকাতা—৬। পৃষ্ঠা—৯৬; মূল্য—বার আনা।

বিভিন্ন বিষয়বস্তু-অবলম্বনে লেখা ছোট বড় ৩৭টি কবিতা বইটিতে স্থান পাইয়াছে। কোন কোন কবিতায় উচ্চ ভাবাদর্শের সন্ধান পাওয়া যায়। কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় পুস্তকের 'পরিচায়িকা'য় লিখিয়াছেন,—"লেখকের ভাষা স্বচ্ছ, সরল, ছন্দোরচনা প্রায় নিখুঁত, প্রাণের গভীর অনুভূতি কবিতাগুলির রচনায় লেখককে প্রেরণা দিয়েছে। * * আমি সানন্দে এই নবীন কবিকে সাহিত্যসমাজে বরণ করছি।"

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

দুর্ভিক্ষসেবা—বোম্বাই রাজ্যের আহমদনগর জেলার দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চলে মিশন সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন এই সংবাদ আমরা গতমাসে দিয়াছিলাম। আহমদনগর সদর, শ্রীগোণ্ডা, রশিন্ (কার্জাট্ তালুক) এবং জামগাঁও (পর্ণার তালুক)—এই চারিস্থানের খাদ্যবিতরণকেন্দ্রে প্রত্যহ এক হাজার নরনারীর দুই বেলা ভোজনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ১১টি গ্রামের ১১৩টি দুঃস্থ মধ্যবিত্ত পরিবার ১লা মে হইতে অরন্ধিত খাদ্য-শস্য সাহায্য পাইতেছেন। প্রত্যেক কেন্দ্রেই সাহায্যপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। দুঃস্থ লোকের পরিধেয় বস্ত্রাদিরও একান্ত অভাব লক্ষিত হইতেছে। সুষ্ঠুভাবে এই সেবাকার্য চালাইবার জন্য সহৃদয় দেশবাসীর নিকট মিশনের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গৌরব ও প্রসার—এই বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষায় বেলুড় বিদ্যামন্দির, কলিকাতার গড়পারে অবস্থিত বিদ্যার্থি-আশ্রম ও পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ-আশ্রম—মিশনের এই তিনটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণের ফল প্রতিবৎসরের ন্যায় এবারও অতি সুন্দর হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানত্রয়ের ছাত্রগণের পাশের হার যথাক্রমে শতকরা ৮৫%, ১০০% এবং ১০০%। আই-এস্ সি তে তৃতীয় ও দশম এবং আই-এ তে চতুর্থ স্থান যথাক্রমে অধিকার করিয়াছে বিদ্যামন্দিরের একটি এবং বিদ্যার্থি-আশ্রমের দুই-জন ছাত্র। আশ্রমজীবনের সদাচার, সুনীতি ও স্বাবলম্বন-মূলক শিক্ষার জন্য সময় ও মনোযোগ দিয়াও বিদ্যার্থিগণ যে লেখাপড়াতেও উৎকর্ষ লাভ করিতে পারিতেছে ইহা আশ্রমগুলির শিক্ষণরীতির বৈশিষ্ট্য জ্ঞাপন করে।

কিছুদিন পূর্বে ডক্টর শ্রীসুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌরোহিত্যে বেলুড় বিদ্যামন্দিরের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণোৎসব সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

সভাপতি ডাঃ চট্টোপাধ্যায় এক মনোজ্ঞ ভাষণে দেশের এই সঙ্কটময় মুহূর্তে ছাত্রগণকে স্বামিজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইতে আহ্বান জানান। প্রত্যেক যুবককেই তিনি স্বামী বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী পাঠ করিতে বলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি স্বীয় ছাত্র-জীবনের পাঠ-পদ্ধতির বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন যে আত্মোৎকর্ষের প্রধান সহায়করূপে বিবেকানন্দ-সাহিত্য তাঁহারা বাল্যকালে পাঠ করিতেন।

বিদ্যামন্দিরের মুদ্রিত সচিত্র বার্ষিক পত্রিকা (ডবল ক্রাউন আটপেজী ১৫৪ পৃষ্ঠা) গ্রীষ্মের ছুটির প্রাক্কালে প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমান ছাত্রগণ ব্যতীত কয়েকজন প্রাক্তন বিদ্যার্থীরও রচনা আছে। প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্পগুলিতে তরুণ লেখকগণের মনন, কল্পনা এবং রচনাশৈলী সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কলেজের সেক্রেটারী স্বামী বিমুক্তানন্দের 'সংস্কৃত শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা' এবং অধ্যক্ষ স্বামী তেজসানন্দের 'সাংস্কৃতিক সমন্বয়ে স্বামী বিবেকানন্দের যোগদৃষ্টি' ইংরেজী প্রবন্ধদ্বয় মূল্যবান চিন্তা-সমৃদ্ধ।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রভূত অর্থানুকূল্যে পাথুরিয়াঘাটা আশ্রমের অব্যবহিত উত্তর পার্শ্ববর্তী পাঁচতলা বাড়ীটি মিশন ঐ আশ্রমের সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে ক্রয় করিয়াছেন।

আশ্রমের ছাত্র ও কর্মিগণ কর্তৃক পরিচালিত বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক উৎসব গত ১৭ই জ্যৈষ্ঠ সাড়ম্বরে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে। উৎসব-উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কুটিরশিল্প ও চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন ও জনসভায় পৌরোহিত্য করেন পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু।

কলিকাতা রমেশ দত্ত ষ্ট্রীটের সন্নিকটস্থ রামবাগান বস্তীতে এই বিবেকানন্দ নৈশবিদ্যালয়। প্রায় ১ বৎসর আগে ১৯৫২ সালের ২১শে মে কয়েকজন স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তির অনুরোধে পাথুরিয়াঘাটা শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্রের উদ্যোগে ইহার কাজ সুরু হয়। বিদ্যালয়টি প্রথমতঃ বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করার উদ্দেশ্যে আরম্ভ হয়। কিন্তু পরে বিদ্যালয়ের একটি শিশুবিভাগ খোলা হয়,—উদ্দেশ্য, বস্তীর স্থায়ী কল্যাণের জন্য বস্তীর শিশুদের প্রথম হইতে গড়িয়া তোলা। বর্তমানে বিদ্যালয়ের বয়স্ক বিভাগের ছাত্রসংখ্যা ৫০, শিশুবিভাগে ৩৬। বিদ্যালয়ের এই শিক্ষা-বিভাগ ছাড়াও, একটি Cottage industry development বা কুটিরশিল্প-উন্নয়ন বিভাগ খোলা হইয়াছে।

শিক্ষামন্ত্রী ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার ও কারু এবং চিত্রশিল্প-প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ করেন। প্রধান অতিথি অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী এবং মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় তাঁহাদের মনোজ্ঞ ভাষণে অনুন্নত ও অশিক্ষিত জনগণের প্রতি শিক্ষিতদের নৈতিক কর্তব্য সম্বন্ধে সকলকে সচেতন হইতে বলেন।

গত ১লা চৈত্র ভাগলপুর বিভাগের কমিশনার শ্রী কে, রমন, মহোদয়ের পৌরোহিত্যে দেওঘর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সুসজ্জিত সভামণ্ডপে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী, বুদ্ধ, যীশুখৃষ্ট, শ্রীচৈতন্য এবং মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, নেতাজী, ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, এবং শ্রীজহরলাল নেহরু প্রভৃতির প্রতিকৃতি সুন্দরভাবে সাজানো হইয়াছিল। শ্রী তুষারকান্তি ঘোষ বিদ্যাপীঠের আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষাপ্রদান-রীতির ভূয়সী প্রশংসা করেন। সভাপতির অভিভাষণে শ্রী রমন বলেন—বিদ্যাপীঠের ন্যায় আবাসিক বিদ্যালয়ের আজ দেশে প্রয়োজন, যেখানে ছাত্রগণ লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও নৈতিক আদর্শের মধ্যে চরিত্রগঠন করিবার সুযোগ লাভ করে।

উৎসব সংবাদ—গত ৫ঠা এবং ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বেলুড়মঠে যথাক্রমে আচার্য শঙ্কর এবং ভগবান বুদ্ধদেবের জন্মতিথি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পাঠ এবং আলোচনা পরিচালনা করেন স্বামী পূর্ণানন্দ, স্বামী গম্ভীরানন্দ, স্বামী রাঘবানন্দ ও স্বামী সৎস্বরূপানন্দ। রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের উদ্যোগে শহরের দুইস্থানে (হিন্দুক্লাব ও গভর্ণমেণ্ট কলেজ) বুদ্ধ-জয়ন্তী পরিপালিত হইয়াছিল। বক্তা ছিলেন আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী সুন্দরানন্দ, অধ্যাপক বিনয় কুমার সেন, ডাঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, ডক্টর অমরনাথ ঝা, অধ্যাপক শ্রীনওলকিশোর গৌড়, অধ্যাপক শ্রীঅবনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভিক্ষু জগদীশ কশ্যপ। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অন্যান্য অনেকগুলি শাখাকেন্দ্রও ঐ উৎসব-দ্বয় উদ্‌যাপিত হইয়াছে।

মালদহ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে গত ২৮শে চৈত্র হইতে ১লা বৈশাখ পর্যন্ত ৪দিবস ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শুভ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে আহূত কয়েকটি জনসভায় বেলুড়মঠের স্বামী অচিন্ত্যানন্দ ও স্বামী সুন্দরানন্দ মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন। প্রতিদিন রাত্রে বর্ধমানের চণ্ডীর কীর্তন এবং সকালে ব্রহ্মচারী ভোলানাথ বাবাজী-পরিচালিত নামকীর্তন ও পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কতীর্থ মহাশয়ের শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ হয়।

কাঁথি কেন্দ্রের দুই দিন ব্যাপী (৫ই ও ৬ই বৈশাখ) শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-জয়ন্তীর প্রথম দিবস স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দ স্বামীজির জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। দ্বিতীয় দিন বিশেষ পূজা, হোম পাঠ ও প্রায় দুই সহস্র নরনারীকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। অপরাহ্ণে প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার

সেনগুপ্তের শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী বিষয়ক আলোচনা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উভয় দিন সন্ধ্যায়ই কলিকাতার সুরশিল্পী শ্রীসুধীর চন্দ্র ঘোষ দস্তিদারের গীত এবং শ্রীমনোরঞ্জন সরকারের হাস্যকৌতুক শ্রোতৃবর্গকে প্রচুর আনন্দ দান করে।

মনসাদ্বীপ (সাগর দ্বীপ) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে গত ২০শে চৈত্র আনন্দঘন পরিবেশের মধ্যে যুগাবতারের আবির্ভাব উৎসব স্বামী নিরাময়ানন্দের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। পূজা-হোম-শাস্ত্রপাঠ-ভজন এবং জনসভা প্রভৃতি অনুষ্ঠানসূচি ব্যতীত আড়াই সহস্রাধিক নরনারীকে প্রসাদ বিতরণও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নৈশ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রগণ 'বাঙ্গালী' নামক নাটক নৈপুণ্যের সহিত অভিনয় করিয়া দর্শকবৃন্দকে চমৎকৃত করেন।

শিলচর শাখাকেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে ৭ই চৈত্র, মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীর সভাপতিত্বে একটি জনসভার অধিবেশন হয়। করিমগঞ্জ কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীকুশীমোহন দাস, শ্রীসুধীর ভট্টাচার্য, শ্রীকরুণা রঞ্জন ভট্টাচার্য মনোজ্ঞ ভাষায় শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীর বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা প্রদান করেন। ৮ই চৈত্র পূজার্চনা ভোগরাগাদি ও পদাবলী কীর্তন হয়। প্রায় ৯ হাজার নরনারী প্রসাদ গ্রহণ করেন।

গত ২রা জ্যৈষ্ঠ শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিতে জয়রামবাটীতে "শ্রীশ্রীমাতৃ মন্দির" প্রতিষ্ঠার একত্রিংশ বার্ষিকী সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এ বৎসরও বিভিন্ন শাখা কেন্দ্র হইতে অনেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী এবং নানাস্থানের বহু ভক্ত নরনারী উৎসবে যোগদান করেন।

পাকিস্তান কেন্দ্রসমূহে অনুষ্ঠান—গত ২০শে চৈত্র বাগেরহাট (খুলনা) আশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মোৎসব মহাসমারোহে পালিত হয়। অপরাহ্নে আহূত জনসভায় কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ এবং স্থানীয় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগদান করেন।

ময়মনসিংহ আশ্রমে উৎসব উৎযাপিত হইয়াছে গত ১২ই এবং ১৩ই চৈত্র। প্রথম দিন অপরাহ্নে বেলুড় মঠের স্বামী রামেশ্বরানন্দের পৌরোহিত্যে জনসভায় অধ্যাপক শ্রীগোপেশ চন্দ্র দত্ত, শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দে, স্বামী সত্যকামানন্দ এবং স্বামী শর্মানন্দ ভাষণ দেন। পরদিন সমুরো-দিনব্যাপী অনুষ্ঠানসমূহের ক্রম ছিল শাস্ত্রাবৃত্তি, রামনাম কীর্তন, বিশেষ পূজা হোমাদি, তুলসীদাসী-রামায়ণপাঠ, এবং প্রায় সাত হাজার নরনারীকে বসাইয়া প্রসাদ বিতরণ।

গত ১৫ই হইতে ২০শে চৈত্র পর্যন্ত দিনাজপুর আশ্রমে ছয়দিন ব্যাপী শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব শামসুদ্দিন সাহেবের সভাপতিত্বে একটি ধর্মসভায় রেভাঃ পি, আর, গ্রীণ "খ্রীষ্ট ধর্ম," অধ্যাপক হাসমতুল্লা সাহেব "ইস্‌লাম ধর্ম", খানবাহাদুর আমিনুল হক্ "ধর্মে সর্বজনীনতা", অধ্যাপক সুশীলচন্দ্র খাশনবীশ 'বৌদ্ধধর্ম', ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সত্যকামানন্দ "বেদান্ত", এবং দিনাজপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী অচিন্ত্যানন্দ "শ্রীরামকৃষ্ণ ও সর্বধর্ম সমন্বয়" সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৬ই চৈত্র হইতে ১৯শে চৈত্র পর্যন্ত ভাগবত পাঠ, ঢাকার নিত্যানন্দ দাসের কীর্তন ও রামায়ণগান এবং "মহাতাপস" নাটকের অভিনয় হয়।

মেদিনীপুরের পল্লী-অঞ্চলে প্রচার—স্বামী আদিনাথানন্দ গত ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি হইতে চৈত্র মাসের মধ্যভাগ পর্যন্ত মেদিনীপুরের তমলুক, চন্দ্রকোণা ও ঘাটাল মহকুমার অন্তর্গত কতিপয় পল্লীতে গ্রামবাসী এবং বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের নিকট প্রাঞ্জল ভাষণের মাধ্যমে শিক্ষা এবং শ্রীরামকৃষ্ণজীবনালোকে ধর্মের সর্বজনীন আদর্শ বিষয়ে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

স্বামী মঙ্গলানন্দের দেহত্যাগ—গত ২৮শে বৈশাখ, স্বামী মঙ্গলানন্দ ৫৭ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণমঠে শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় দেহত্যাগ করিয়াছেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি বেলুড়মঠে যোগদান এবং তিন বৎসর পরে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। মঠ ও মিশনের নানা কেন্দ্রে তিনি আর্তসেবা, শিক্ষাদান এবং ধর্মপ্রচারকার্যে ব্রতী ছিলেন। কিছুদিন উদ্বোধন-কার্যালয়েও কর্মীরূপে কাটাইয়াছিলেন। এই নিরভিমান তপোনিষ্ঠ সেবাব্রতী সন্ন্যাসীর বিদেহ আত্মা আত্যন্তিক শান্তি লাভ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

বিবিধ সংবাদ

বুদ্ধগয়া মন্দিরের নূতন ব্যবস্থা—গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বুদ্ধ-পূর্ণিমা দিবসে বুদ্ধগয়া মন্দিরের পরিচালনভার হিন্দু ও বৌদ্ধদের একটি যুক্ত কমিটির হস্তে ন্যস্ত হয়। বিহারের রাজ্যপাল অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। প্রায় এক লক্ষ নরনারী এই উপলক্ষে সমবেত হইয়াছিলেন। বিভিন্ন দেশের বৌদ্ধ প্রতিনিধিবর্গও অনুষ্ঠানে যোগ এবং মনোজ্ঞ ভাষণ দান করিয়াছিলেন।

ইংলণ্ডে ভারতীয় নৃত্যকলা প্রচার—সম্প্রতি বোর্ণমাউথ (হ্যাম্পায়ার) লিটেরারী লাঞ্চন ক্লাবের এক সম্মেলনে ভারতীয় নট রাম গোপাল বলেন যে প্রাচী ও প্রতীচ্যের মধ্যে বোঝাপড়ার ভাব জাগ্রত করার কাজে নৃত্যকলা যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করিতে পারে। তিনি আরও বলেন যে শিল্পের মধ্য দিয়াই প্রাচী ও প্রতীচ্যের মিলন সম্ভব হইতে পারে।

ভারতীয় নৃত্যকলার ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়া রাম গোপাল বলেন যে ৪,০০০ বৎসর ধরিয়া নৃত্য জনগণের জীবনের এক অপরিহার্য অংশ হইয়া আছে। ইহা হইতেছে তাহাদের জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দময় প্রকাশের মাধ্যম। তিনি এই প্রসঙ্গে ভারতীয় নৃত্য সম্পর্কে ব্যবহৃত ৫,০০০ মুদ্রার উল্লেখ করিয়া বলেন যে, এই মুদ্রার সাহায্যে জীবনের যে কোন দিকের যে কোন অভিব্যক্তির সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনা সম্ভব।

তিনি সর্বশেষে ভারতীয় ক্ল্যাসিকাল নৃত্যের সহিত পশ্চিমী নৃত্য-পদ্ধতির তুলনা করেন। (বৃটীশ ইনফরমেশন সার্ভিস্)

শ্রীরামকৃষ্ণ-জন্ম-বার্ষিকী—বর্ধমান শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামিজীর জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৯শে চৈত্র জেলাশাসক শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে 'পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' লেখক শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেন গুপ্ত, বেলুড় মঠের স্বামী বোধাত্মানন্দ ও চারণ কবি শ্রীবিজয় লাল চট্টোপাধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবনবেদ আলোচনা করেন। ৩০শে চৈত্র স্বামী বোধাত্মানন্দের সভাপতিত্বে সু-সাহিত্যিক শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায় স্বামিজীর জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন।

খড়্গপুর শহরের অধিবাসিবর্গের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় স্থানীয় দুর্গামন্দিরে ২৭শে চৈত্র হইতে চারিদিন ব্যাপিয়া বিপুল আনন্দসহকারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অষ্টাদশাধিক শততম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উৎসবের অঙ্গ হিসাবে অষ্টপ্রহর নাম সংকীর্তন, উষাকীর্তন, পূজা, পাঠ, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, আরতি, ভজন, প্রভৃতি যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। দুই দিন জনসভায় বেলুড় মঠের স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ও স্বামী লোকেশ্বরানন্দ এবং 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এর সহ-সম্পাদক শ্রীঅমর নন্দী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার খেজুরী থানায় ৮ই বৈশাখ, শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী সুসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পল্লীর পথে পথে উষাকীর্তন ও পুষ্প-পত্রশোভিত মণ্ডপে পূজা-হোম এবং গীতা ও চণ্ডীপাঠ পল্লীবাসীর প্রাণে প্রভূত আধ্যাত্মিক প্রেরণা উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। শ্রীরবীন্দ্রনাথ পাণ্ডার সভাপতিত্বে তিন সহস্র শ্রোতৃমণ্ডলীর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের তিন জন সন্ন্যাসী (স্বামী অন্নদানন্দ, স্বামী নিরাময়ানন্দ ও স্বামী বীতশোকানন্দ) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে হৃদয়স্পর্শী ভাষণ দেন।

২৪ পরগণা জেলার নূতনপুকুর (পোঃ—

পাথর বাটা) গ্রামে ২০শে চৈত্র অনুষ্ঠিত শ্রীরামকৃষ্ণোৎসবে বেলুড় মঠের স্বামী সাধনানন্দ ও স্বামী শান্তিনাথানন্দ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

মেদিনীপুর জেলার নোতুক গ্রামে 'বিবেকানন্দ বিদ্যামন্দিরে' ১৫ই চৈত্র স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতি-বার্ষিকী উপলক্ষে ঘাটাল মহকুমা-শাসক শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে স্বামী আদিনাথানন্দ স্বামিজীর শিক্ষার বিভিন্ন দিক আলোচনা করেন। উক্ত জেলার আরিট ও খেপুত গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ-জয়ন্তী পালিত হয় ১১ই হইতে ১৪ই বৈশাখ। বক্তা ছিলেন স্বামী নিরাময়ানন্দ ও প্রধান শিক্ষক শ্রীগোপেশ্বর রায়।

জিয়াগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ) স্থানীয় ভক্তগণ ২২শে ও ২৩শে চৈত্র উৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। শোভাযাত্রা, পূজা-পাঠ-কীর্তন ও প্রসাদ-বিতরণ সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়। স্থানীয় শ্রীপৎসিং কলেজের অধ্যক্ষের পৌরোহিত্যে জনসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীকালিপদ দে ভৌমিক, স্বামী বীতশোকানন্দ (বেলুড় মঠের) এবং পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ।

চুঁচুড়ায় 'প্রবুদ্ধভারত সংঘ' ও 'স্বরাজ সংঘ' এর উদ্যোগে ১৩ই বৈশাখ মল্লিক কাশেম হাটের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পৌর্বাহ্ণিক কর্মসূচি ছিল পূজা-পাঠ-কীর্তনাদি। অপরাহ্নে একটি মহতী সভায় শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচিত হয়। সভাপতিত্ব করেন স্বামী পূর্ণানন্দ (বেলুড় মঠ) এবং প্রধান অতিথি হন মিঃ, এস্ কে হালদার আই-সি-এস্, (হুগলী জেলাশাসক)। শ্রীযুক্ত অমরনাথ নন্দী (সহকারী সম্পাদক, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড) এবং অধ্যক্ষ গোপাল চন্দ্র মজুমদার (বিজয়মোহন মহাবিদ্যালয়, ইটাচুণা, হুগলী) বক্তৃতা করেন।

গত ২৭শে বৈশাখ কলিকাতা বহুবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ-সমিতিভবনে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। অপরাহ্ণের ধর্মালোচনা-সভায় পৌরোহিত্য করেন বেলুড় মঠের স্বামী গম্ভীরানন্দ এবং ভাষণ দেন অধ্যাপক শ্রীজ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র দত্ত। অধ্যাপক মহাশয় তাঁহার দীর্ঘ ভাব-ব্যঞ্জক বক্তৃতায় শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য জীবন ও বাণী সুললিত ভাষায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন নির্লেপ ত্যাগাদর্শের মূর্তিমান বিগ্রহ। ঠাকুরের জীবনে কাম-কাঞ্চন-ত্যাগের যে বহ্নিমান্ আদর্শ রূপায়িত হইয়াছে তাহার সাধ্যানুসারে অনুধ্যান ও অনুশীলনই আধুনিক প্রত্যেক নর-নারীর শ্রেয়স্কর কর্তব্য। সভাপতি মহারাজ বলেন, অবতার একাধারে ভগবান ও মানুষ, নর ও নারায়ণ, জীব ও শিব। অবতারলীলায় অসীম ভগবান সসীম জীবদেহের মধ্যে ধরা দেন জীবকল্যাণের জন্য। মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের নিমিত্ত, দুর্নীতি ও অধর্মের দূরীকরণ এবং নীতি ও ধর্মের সংস্থাপনার জন্যই পূর্ণকাম ভগবানের নরদেহগ্রহণ।

পরলোকে প্রাচীন ভক্তদ্বয়—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য শ্রীকুঞ্জলাল চট্টোপাধ্যায় ৬৩ বৎসর বয়সে ৺কাশীধামে গত ১১ই বৈশাখ নশ্বর দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বাড়ী ছিল ফরিদপুর জেলায়। দীর্ঘকাল শিক্ষাব্রতে আত্মনিয়োগ করিয়া গত ১৫ বৎসর যাবত তিনি ৺বারাণসীধামে সাধুসঙ্গ ও ধর্মচর্যা লইয়া বাস করিতেছিলেন। তাঁহার সরল, অমায়িক ও সপ্রেম ব্যবহার এবং ভগবন্নিষ্ঠা বহুজনের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিত। প্রথম জীবনে কিছুকাল তিনি বেলুড়মঠে ব্রহ্মচারিরূপে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯১১ সালে কোঠারে পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের কৃপা লাভ করেন। তাঁহার কর্মস্থল ছিল রাঁচি। স্থানীয় বহু জনহিতকর কাজের সহিত তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিহার সরকারের সহকারী একাউণ্ট্স্ অফিসারের কাজ হইতে ১৯৪৫ সালে অবসর গ্রহণ করিবার পর অধিকাংশ সময় শাস্ত্রালোচনা ও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে কাটাইতেন। গত ৬ই বৈশাখ রাঁচিতে তাঁহার দেহাবসান ঘটিয়াছে। যতীন বাবু খুলনার লোক ছিলেন। রাঁচি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতেন। তাঁহার উদার দৃঢ় চরিত্র বিশেষ লক্ষ্যণীয় ছিল।

শ্রীভগবানের অভয় পাদপদ্মে এই প্রাচীন ভক্তদ্বয়ের আত্মার চিরশান্তি প্রার্থনা করি।

বোধন

বন্ধন ও মুক্তি

তদা বন্ধো যদা চিত্তং কিঞ্চিদ্বাঞ্ছতি শোচতি।
কিঞ্চিন্মুঞ্চতি গৃহ্ণাতি কিঞ্চিদ্ হৃষ্যতি কুপ্যতি ॥
তদা মুক্তির্যদা চিত্তং ন বাঞ্ছতি ন শোচতি।
ন মুঞ্চতি ন গৃহ্ণাতি ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি ॥
তদা বন্ধো যদা চিত্তং সক্তং কাস্বপি দৃষ্টিষু।
তদা মোক্ষো যদা চিত্তমসক্তং সর্বদৃষ্টিষু ॥
যদা নাহং তদা মোক্ষো যদাহং বন্ধনং তদা।
মত্বেতি হেলয়া কিঞ্চিৎ মা গৃহাণ বিমুঞ্চ মা ॥

(অষ্টাবক্র সংহিতা, ৮।১-৪)

তখনই বন্ধন, যখন চিত্ত কোন কিছু আকাঙ্ক্ষা করে, আবার উহা না মিটিলে শোকাকুল হয়—মনের মতো নয় বলিয়া কোন কিছু পরিহার করে অথবা রমণীয় বলিয়া কোন কিছু আঁকড়াইয়া ধরে—কোন কিছু পাইয়া উল্লাসে মাতিয়া উঠে, কিংবা কোন কিছু দেখিয়া ক্রোধে নিজকে হারাইয়া ফেলে। (ইচ্ছা-শোক, ত্যাগ-গ্রহণ, হর্ষ-কোপ—এ সকলই অজ্ঞানের অভিব্যক্তি।)

তখনই মুক্তি, যখন চিত্ত কোন কিছুই চায় না, কোন কিছুরই জন্য (করায়ত্ত হইল না বলিয়া) পরিতাপ করেনা—কোন কিছু বিরূপ বলিয়া বর্জন অথবা মনোরম বলিয়া গ্রহণ করিতে যায় না—কোন কিছুতেই হৃষ্ট বা কুপিত হয় না। (তত্ত্বজ্ঞানে যে চিত্ত প্রবুদ্ধ হইয়াছে উহা সর্বদাই, সকল অবস্থাতেই সাম্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে।)

তখনই বন্ধন, যখন চিত্ত কোন কিছু ইন্দ্রিয়-বিষয়ে আসক্ত হয়—আর মুক্তি তখনই, যখন চিত্ত সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-বিষয়ে নিজকে নির্লিপ্ত রাখিতে পারে। (বিষয়ের জ্ঞান হইবে না বা বিষয় সম্মুখে থাকিবেনা এমন নয়—কিন্তু বিষয়ের প্রতি বিন্দুমাত্রও আসক্তি যেন না থাকে।)

যখন 'আমি-আমি' নাই তখনই মোক্ষ; যতক্ষণ 'আমি-আমি' ততক্ষণই বন্ধন। এই নিগূঢ় রহস্য জানিয়া সহজভাবে আসক্তি বা বিরাগ এই দুয়েরই পারে চলিয়া যাও। (কোন কিছুকে ভাল লাগা বা না লাগা—দুইই ঘটে ক্ষুদ্র 'অহং' এর কুহকে।)

কথাপ্রসঙ্গে

দেবত্ব বনাম মনুষ্যত্ব

ধর্মের আঙিনায় আসিয়া আমরা অহরহ শুনি 'দেবত্বে'র কথা, কিন্তু দেবত্ব জিনিসটা কি তাহা আমরা অনেক সময়ে যথার্থ হৃদয়ঙ্গম করি না, আমাদের জীবনের দিব্য-সত্তা কোথায় দাঁড়াইয়া আছে তাহা তলাইয়া দেখিবার সুযোগ হয় না; আমরা চাই লাফ দিয়া গাছে চড়িতে—পরিশ্রম না করিয়া, মূল্য না দিয়া বহুপ্রযত্ন-লভ্য অমূল্যকে হাতে পাইতে। কিন্তু তাহা তো হইবার নয়। তাই দেবত্ব তো আমরা লাভ করিই না, যেটুকু বরং অপেক্ষাকৃত সহজে পাইতে পারিতাম—খাঁটি মনুষ্যত্ব—পাইয়া নিজের দিক দিয়া এবং সমাজের দিক দিয়া প্রচুর লাভবান হইতাম, তাহাও খোয়াইয়া বনিয়া যাই 'অসুর'—ভোগোন্মত্ত, জড়-দৃষ্টি, স্বার্থপর নরপশু-বিশেষ। তবুও হয়তো আমরা মনে মনে ভাবি আমরা ধার্মিক, আমরা দেবতার পূজা করিয়াছি, দান-ধ্যান-তীর্থবাস-ব্রত-উপবাস-পুরশ্চরণ করিয়াছি, সংকীর্তনে নাচিয়াছি—আমরা ভগবানের প্রিয়জন, দেবলোকে আমাদের স্থান সুনির্দিষ্ট আছে! ভগবান অলক্ষ্যে হাসেন আমাদের শোচনীয় আত্মপ্রবঞ্চনা দেখিয়া।

দেবত্ব মানুষের ব্যক্তিত্বের একটি বিপুল পরিবর্তন—একটি স্বচ্ছ সর্বপ্রসারী জ্ঞানময় সত্যে উহার সুস্থির প্রতিষ্ঠা। এই পরিবর্তনে আর কিছু হউক না হউক, যে অন্ধ ভোগবাসনা ও ক্ষুদ্র স্বার্থসংঘাত মানুষকে সতত ছুটাইয়া মারে, একটুও বিশ্রাম দেয় না—উহাদের যে সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবত্বের বিকাশে অদ্ভুত প্রশান্তি, অপূর্ব হৃদয়-প্রসার মানুষের প্রতিটি আচরণে ফুটিয়া উঠে। যে সত্যের সহিত তাহার নিবিড় সংস্পর্শ ঘটে উহার যেন কোন সীমা নাই—সমগ্র মানুষ, জীবজন্তু এমন কি অচেতন পদার্থনিচয়কেও যেন উহা আচ্ছন্ন করিয়া আছে। কোন কিছুই তখন আর দূর নয়। সারা বিশ্বসংসার যেন সরিয়া সরিয়া অতি নিকটে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে ঢুকিয়া পড়িয়াছে—গলিয়া গলিয়া নিজের রক্তপ্রবাহের সহিত মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছে। এই অতি-গহন একত্বে ক্ষয়-বৃদ্ধি জন্ম-মৃত্যু যেন অর্থহীন। এই সত্য যেন অজর, অমর, অভয়, বিশোক।

মানব-সত্তার এই বিশাল রূপান্তর, এই ভূমা সত্যে নিজেকে আবিষ্কার—ইহাই আধ্যাত্মিক সাধনার বিশিষ্ট লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে পৌঁছানো নিশ্চিতই সহজ নয় এবং সহজ নয় বলিয়াই উপনিষদ্ বলিয়াছেন—ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। কিন্তু তাই বলিয়া ঐ লক্ষ্যকে নামাইয়া আনিবারও আমাদের কোন অধিকার নাই। বেশী স্বার্থত্যাগ না করিয়া, ক্লেশ না সহিয়া যাহা হউক একটা কিছু করতলগত করিয়া উহারই গায়ে দেবত্বের মার্কা মারিয়া দিয়া আমরা লোক ঠকাইতে পারি কিন্তু ভগবানের চোখে ধুলা দিতে পারি না। আচার্য শঙ্কর 'বিবেক চূড়ামণি' গ্রন্থে বলিয়াছেন—

> অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।
> রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি॥
>
> (৬৪ নং শ্লোক)

শত্রুসংহার না করিয়া, ভূসম্পত্তিনিচয়ের অধিকারী না হইয়া শুধু 'আমি রাজা' এই শব্দমাত্র

আওড়াইয়া কেহ কথনও রাজা হইতে পারে না।

অতএব 'দেবত্ব' বিষয়টির প্রকৃত মর্ম বুঝিয়া এবং উহাতে ভয় না পাইয়া শনৈঃ শনৈঃ উহার অভিমুখে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়স্কর পন্থা। 'দেবত্ব'-লাভের প্রথম সোপান 'মনুষ্যত্বের' বিকাশ সাধন। ইহারই নাম 'ধর্ম'। দুঃখের বিষয় আমরা বেদ-উপনিষদ্-স্মৃতি-পুরাণাদি হিন্দুশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত ধর্মের মূল তাৎপর্য এখন ভুলিতে বসিয়াছি এবং শুধু জপ-তপ-পূজাদিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছি। আমাদের শাস্ত্রে ধর্ম বলিতে মানুষের জীবনের সংধারক সেই সামগ্রিক শক্তি বুঝায় যাহা মানুষের অন্তর্নিহিত কল্যাণকর ক্ষমতানিচয়কে বিকশিত এবং পরিপুষ্ট করে—মানুষকে ব্যষ্টি এবং সমষ্টির কল্যাণে যথাযথ গড়িয়া তুলে। ধর্মের দৃষ্টি শুধু আকাশে নয়—বরং প্রধানত এই মাটির পৃথিবীতেই। ধর্ম জীবনকে উড়াইয়া দেয় না—উহাকে মানিয়া, সম্পূর্ণ করিয়া লইয়া পরে উহারই অবলম্বনে উহার অতীত সত্যের জন্য মানুষকে প্রস্তুত করে। তখনই দেবত্ব, তাহার পূর্বে নয়।

মনু বলিতেছেন—

ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্॥
(মনুসংহিতা, ৬।৯২)

সন্তোষ, ক্ষমা, চিত্তস্থৈর্য, অন্যায়পূর্বক পরধন গ্রহণ না করা, পবিত্রতা, ইন্দ্রিয়সংযম, বুদ্ধির নির্মলতা, আত্মবিবেক, সত্য, অক্রোধ—এই দশটি হইতেছে ধর্মের লক্ষণ।

কই, এখানে জপতপ, ব্রত-উপবাস, স্নান, তীর্থভ্রমণের কথা তো বলিলেন না? অতএব বুঝিতে হইবে মনুষ্যত্ব-সৌধের বনিয়াদ ওগুলিতে নয়—মনুষ্যত্বের উপরোক্ত চারিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিতেই। উহাদের অর্জন করিতে হয় মাটির দুনিয়ায় বসিয়াই—দেবলোকে তাকাইয়া নয়। আর দশলক্ষণলক্ষিত উপরের বৈশিষ্ট্যগুলি যদি কেহ আয়ত্ত করিতে পারে তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পরিবারে ও সমাজে কতটা কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে তাহা সহজেই অনুমেয়। সে কি চতুষ্পার্শ্বের আর্ত-পীড়িত-অসহায় নরনারীর দুঃখকষ্ট দেখিয়া গৃহকোণে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে? অপর দশজনের স্বার্থকে পদদলিত করিয়া নিজের বিত্তবিভব-পারিবারিক-স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধিতে মত্ত হইতে পারে? অন্যায়-অসদুপায়ে সঞ্চিত পুঁজিতে মোটর হাঁকাইতে, পাঁচতলা ইমারত খাড়া করিতে পারে? তাহার আচার-বৃত্ত-ব্যাপৃতি দ্বারা সমাজে আসে শান্তি, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য। তাহার সংস্পর্শে মানুষ পায় শক্তি, সাহস, আত্মপ্রত্যয়।

যথার্থ মনুষ্যত্ব-যুক্ত এই রূপ মানুষ চাই দলে দলে। ইহাই ধর্মের লক্ষ্য—মানুষ তৈরী। চারি প্রকার পুরুষার্থের মধ্যে ধর্ম প্রথম পুরুষার্থ। ইহা সকল মানুষের জন্যই প্রয়োজন। কেননা সকল মানুষকেই গোড়ায় প্রকৃত মানুষ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে মোক্ষ কিন্তু সকল মানুষের জন্য নয়। ধার্মিক—অর্থাৎ যথার্থ মানুষ না হইলে কেহ মোক্ষের অধিকারী হয় না। মনুষ্যত্বের ধাপ ডিঙাইয়া গিয়া কেহ দেবত্বলাভ করিতে পারে না—করিবার চেষ্টা করিলে উল্টা ফল হয়।

দেবত্ব লাভ করিতে গেলে মনুষ্যত্বের উপর ভাল করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। তবেই আমরা সতেজ-সংযত ইন্দ্রিয়গ্রাম, চিত্তের শুচিতা, চিন্তা ও আচরণের সত্যতা লইয়া জগৎ ও জীবনের উচ্চতর সত্যে ধীরে ধীরে পৌঁছিতে পারিব। তখনই আমরা 'মানুষে'র সমস্ত কাজ সারিয়া মানুষের অন্তরতম পরিচয়—'দেবতা'কে স্পর্শ করিতে পারিব। তখনই আমরা ঠিক ঠিক

আধ্যাত্মিকতার অধিকারী হইব। সেই আধ্যাত্মিকতাতে কোন মেকী থাকিবে না।

পুরীর চিঠি

সমুদ্রতীরে স্বাস্থ্যলাভ করিতে গিয়া পুরী হইতে জনৈক পত্র লিখিয়াছেন—

"বিদেশে এসেও আমার ভয়ানক কষ্ট হয়, অর্ধেক দিন খাওয়া হয় না। রাতে ঘুমুতে পারি না। এত দরিদ্র এদেশবাসী—আহার পায় না দিনান্তে, দুর্দান্ত পরিশ্রম, বসতি দেখলে মনে হয় মানুষ প্রায় পশুর স্তরে জীবন যাপন করে। * * * নানাদিক ঘুরে ঘুরে মনে হয় সরকার বলে দেশে কোনও বস্তু নেই, আর সমস্ত পৃথিবী পাষণ্ডে ভর্তি। হৃদয় বলে কারুর কোনও বালাই নেই।"

এই পত্রে বর্ণিত বিষয় নির্মম সত্য। ইহা শুধু উড়িষ্যারই চিত্র নয়,—সারা দেশে—সহরে, গ্রামে সর্বত্র এই দৃশ্য চোখ খুলিয়া চলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহা যে সম্প্রতি আরম্ভ হইয়াছে তাহাও নয়—ষাট বৎসর আগে স্বামী বিবেকানন্দ এই দৃশ্যের দিকে দেশের ধনী, শিক্ষিত, অভিজাত সম্প্রদায়ের চোখ ফিরাইতে চাহিয়াছিলেন। দেশের রাষ্ট্রে, সমাজে, চিন্তা-ধারায়, কর্মরীতিতে কত পরিবর্তন ঘটিয়া গেল কিন্তু দেশজোড়া এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য মুছিল না। তবে এই টুকু শুধু আশার কথা যে, যে অভিজাত শ্রেণীর বহু শতাব্দীর নিষ্পেষণের ফলে সহস্র সহস্র লোকে আহার পায় না, জঘন্য বসতিতে পশুর জীবন যাপন করে তাঁহাদেরই কেহ কেহ আজ জনগণের শোচনীয় অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হইতেছেন। আমেরিকায় ভারতের দুঃখ-দারিদ্র্যের চিন্তায় বিনিদ্র স্বামী বিবেকানন্দের মতো রাত্রে বিছানায় পড়িয়া তাঁহাদের চোখে ঘুম আসিতেছে না। আজ তাঁহারা বিবেকের দংশন অনুভব করিতেছেন। প্রার্থনা, এই দংশন দ্বারা ব্যাপকভাবে ধনী, শিক্ষিত ও উচ্চবর্ণগণ আক্রান্ত হউন। বিবেকানন্দের রুষ্টবাণী শত-সহস্র অভিজাত ব্যক্তির মর্মে মর্মে আঘাত করুক—

"যতদিন লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে ও অশিক্ষায় রহিয়াছে ততদিন তাহাদেরই আত্মত্যাগের দ্বারা শিক্ষালাভ করিয়া তাহাদিগের প্রতি যাহারা একটুও তাকাইতে চাহে না উহাদের প্রত্যেককে আমি বলিব বিশ্বাসঘাতক। যাহারা গরীবের নিষ্পেষণ-দ্বারা লব্ধ অর্থে বাবুগিরি করিয়া বেড়ায় তাহারা ক্ষুধার্ত বনমানুষের দশায় উপনীত বিশ কোটি লোকের জন্য যতদিন না কিছু করিতেছে ততদিন তাহাদিগকে আমি বলিব শয়তান।"

কিন্তু ইহাই পর্যাপ্ত নয়। স্বামিজী বলিতেন—সমবেদনা অনুভব মাত্র গোড়ার কথা। সেই সমবেদনাকে অনুভূতির পর্যায় হইতে টানিয়া আনিতে হইবে ক্লান্তিহীন প্রচণ্ড নিঃস্বার্থ কর্মে। শুইয়া শুইয়া কাঁদিলেই তুমি দরিদ্রের বন্ধু হইলে না। দরিদ্রের জন্য কিছু কর—যতটুকু হউক—যত সামান্যই হউক তোমার শরীরের, সঞ্চয়ের, স্বার্থের প্রত্যক্ষ নিয়োগ দেখাও। তবে তো বুঝিব তুমি দেশ-দরদী। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন—

"যে কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনো দিন ডাকিয়া কথা কহে নাই, তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো। তাহাকে জানাইয়া দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎ-সংসারে অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞানতা তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে। সেই সকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও।"

স্বামিজী তাঁহার জনৈক সন্ন্যাসি-শিষ্যকে বলিয়াছিলেন, তুই আর কিছু না পারিস পথের ধারে এক কলসী জল নিয়ে বসে পিপাসার্ত পথিকদের খাওয়া। এই শিষ্য আমরণ বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত মিশনের একটি সেবাশ্রমে অক্লান্তভাবে পীড়িতদের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

সেদিন মধ্যবিত্ত পরিবারের একটি বৃদ্ধা মহিলা বলিতেছিলেন,—"সারা জীবন তো সংসারের সেবা করলাম, এবার বড় ছেলে সংসারের ভার নিলে একটি উদ্বাস্তু কলোনীতে গিয়ে থাকবো আর ছোট ছোট গরীব ছেলেমেয়েদের পড়াবো। আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে তবুও একটু দেশের কাজ হবে।" এই মহিলার মনোবৃত্তি সকল 'শিক্ষিত' 'ভদ্র' এবং 'বিত্তশালী'দের চিত্তকে আচ্ছন্ন করুক। শুধু অশ্রুমোচন নয়—অজস্র সেবার ক্ষেত্রের যে কোনটিতে যে কোন অংশে যতটুকু সম্ভবপর বাস্তব আত্মনিয়োগ।

বিপ্লবের আহ্বান

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁহার একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতায় দেশের যুবকগণের কথায় বলিয়াছেন—

"তাহাদের মধ্যে উৎসাহ প্রচুর, তাহাদের মুখে চোখে বিপ্লব নাচিতেছে। তাহাদের বিপ্লব দেখিতে পাওয়া যায়—বাগবিতণ্ডার উপর। কিন্তু আজ যখন আমাদের সামনে এই বৃহৎ বিপ্লব উপস্থিত (ভূদান যজ্ঞ) তখন আমরা উহা যদি না চিনিতে পারি তাহা হইলে বড়ই পরিতাপের কথা। * * আমি যুবকদের বলিতে চাই যে এক বৎসরের জন্য তাঁহারা স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া এই কাযে ব্রতী হউন।"

ভূদান-যজ্ঞ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের মতো একটি অহিংস সামাজিক বিপ্লব সন্দেহ নাই। কিন্তু যুবক ও ছাত্র সমাজ এই কাজের জন্য কতটা উপযোগী তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বিত্তশালী জমিদারগণের স্বেচ্ছায় ভূমিদান করিবার মতো হৃদয়ের পরিবর্তন আনিতে হইলে দৃঢ় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বয়স্ক সেবাব্রতীর প্রয়োজন। যে সকল যুবকের মধ্যে কাজের উৎসাহ উদ্দীপ্ত হইয়াছে তাহাদিগকে বরং বয়স্ক শিক্ষাপ্রসারে নিয়োজিত হইতে বলা উচিত। উড়িষ্যার রাজ্যপাল জনাব সৈয়দ ফজল আলী সম্প্রতি একটি ভাষণে (কটক, ৪ঠা জুন) যুবকগণকে এই আহ্বানই জানাইয়াছেন—

"আমাদের সরকার আজ বহুতর সমস্যায় জড়িত। অশিক্ষিত বয়স্ক লোকদের শিক্ষাদানের ভার জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের এবং শিক্ষিত যুবকসম্প্রদায়ের লওয়া উচিত। আমি আশা করি আমাদের তরুণগণ স্বদেশের এই মহৎ কল্যাণকর কাজটির জন্য কিছু কিছু সময় ব্যয় করিবেন।"

জনাব ফজল আলীর এই আহ্বান বেগ সঞ্চয় করুক, ইহাই প্রার্থনা। ইহাও এক বিপুল বিপ্লবের আহ্বান, যদিও ইহাতে সাময়িক উত্তেজনা নাই। যুবকগণকে দেশের স্থায়ী কল্যাণকর গঠনমূলক সেবাকার্যে ব্রতী হইতে অভ্যস্ত করাই সর্বাপেক্ষা উত্তম।

ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের সাম্প্রতিক ভ্রমণ

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ ইউরোপে এবং আমেরিকায় ব্যাপক ভ্রমণ করিতেছেন। পারস্পরিক শুভেচ্ছা-বিনিময় এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতিগত আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গীর আদান প্রদানই এই সফরের উদ্দেশ্য। নানাস্থানের বহু বিদগ্ধ সমাজ ভারতের এই সৌম্যদর্শন, জ্ঞান-তপস্বী, দার্শনিক রাষ্ট্র-সেবকের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য এবং অন্তর্দৃষ্টিপ্রসূত ওজস্বী ভাষণ শুনিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। ঐ সকল বক্তৃতার কিছু কিছু এখানকার সংবাদপত্রে মাঝে মাঝে প্রকাশিত হইতেছে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ ভারত-ভারতীর সুযোগ্য প্রতিনিধি। তাঁহার কথা শুধু 'বাগ্-বৈখরী শব্দঝরী' নয়—উহার পশ্চাতে শক্তি আছে, কেননা তাঁহার নিজের সত্যনিষ্ঠ জীবনে 'ভাবের ঘরে চুরী' নাই। সকল মানুষের ভিতরে যে জন্মমৃত্যুহীন চেতন আত্মসত্তা বাস করিতেছে—যাহা ভারতের ঔপনিষদ্ বিজ্ঞানে বহু-

বিস্তারিতভাবে ঘোষিত হইয়াছে বিশ্ববাসীকে আজ তাহার অন্তরের সেই বিরাট সত্যের দিকে তাকাইতে হইবে। তবেই মানুষ মানুষকে চিনিবে, ভালবাসিবে। মানুষের সমাজ, রাষ্ট্র, শিক্ষা, ধর্ম আজ যদি মানুষের এই যথার্থ সত্যের উপর না দাঁড়ায় তাহা হইলে সভ্যতার সংঘর্ষগুলি কিছুতেই মিটিবে না—বিশ্বশান্তি অতি দূরে রহিয়া যাইবে। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন ভারতের এই শাশ্বতী বাণী নির্ভীকভাবে বলিতেছেন। ইন্দ্রিয়ভোগৈক-লক্ষ্য শিল্প-বিজ্ঞান-বাণিজ্যাভিমানী পাশ্চাত্যের লোক এ কথায় কতটা কান দিবে বা কান দিয়াও কতটা মানিবে তাহা অবশ্য বলা কঠিন, কিন্তু ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ নিঃসঙ্কোচে সার্বভৌম সত্য, মৈত্রী ও শান্তির বার্তা সকলকে শুনাইয়া চলিতেছেন। আমরা বলি—শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

শ্রীমন্দিরে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মন্দিরের শিল্পকলা ঘুরে ঘুরে চারি দিকে
করি নিরীক্ষণ
পশিলাম শ্রীমন্দিরে শ্রান্ত দেহে লয়ে মোর
অবিশ্বাসী মন।
পুণ্যলোভী নর-নারী চারিদিকে সারি সারি
করিয়াছে ভিড়,
তাহাদের পানে হানি' কৃপাদৃষ্টি, দাঁড়ালাম
উঁচু করি শির।
শঙ্খ বাজে, ঘণ্টা বাজে, বাজে খোল করতাল,
সবে কৃতাঞ্জলি,
আরতির দীপশিখা বিগ্রহের মুখখানি
তুলিল উজলি'।
জগমোহনের তলে মধুর কীর্তন চলে,
বাজিছে খঞ্জনী,
পূজারীরা বসি দ্বারে স্তব-মন্ত্র পাঠ করে
উঠে জয়ধ্বনি।
এই পরিবেশ মাঝে আমার অজ্ঞাতসারে
নত হয় শির,
ভারতীয় চিত্ত মোর হুঙ্কারি জাগিয়া উঠে
ঠেলি সব ভিড়।

নরনারী কোটি কোটি যুগে যুগে হেথা জুটি
হইল প্রণত,
নিবেদিল হৃদয়ের ব্যাকুলতা আর্তিভরা
আকিঞ্চন যত।
কোটি কোটি মানুষের শুচি শুভ্র হৃদয়ের
যত ভক্তিধারা
ও বিগ্রহে কেন্দ্রীভূত, এই পরিবেশ মাঝে
হইয়াছে হারা।
কোন দেবদেবী এরে রচিয়া তুলেনি কভু
মহাতীর্থভূমি,
মানুষই রচেছে এরে মহাতীর্থ যুগে যুগে
এর ধূলি চুমি।
দারুর বিগ্রহ মাঝে শ্রীমন্দিরে ভগবানে
নাই দেখিলাম,
কোটি কোটি মানুষের ভক্তিপূত হৃদয়ের
নাই কিছু দাম?
কোটি কোটি নরনারী যে বিগ্রহে করিয়াছে
ভক্তি নিবেদন,
কোথা আর ভগবানে মিলিবে এ বিশ্বে, যদি
সেথা নাহি র'ন?

জন্ম জন্মান্তর পানে　　সহসা খুলিয়া গেল
　　মানস নয়ন,
মনে হ'ল দূরে কাছে　　যাহারা দাঁড়ায়ে আছে
　　সবাই আপন।
আত্মীয় জনের দলে　　দাঁড়ায়ে মন্দির তলে
　　হ'ল মোর মনে,
কতকাল পরে পুন　　ফিরিয়া আসিনু যেন
　　আপন ভবনে।
ভারত-সন্তান আমি　　এই গর্ব চিত্তে মোর
　　জাগিল তখন,
মনে হ'ল মন্দিরের　　বাহিরে শুধুই যেন
　　পশুর জীবন।
মন হ'তে গেল ভাসি　　আবর্জনা রাশি রাশি
　　বিদেশী শিক্ষার,
স্বধর্মে নিধনও মানি　　ভয়াবহ পরধর্মে
　　দিলাম ধিক্কার।
আমার উদ্ধত শির　　সহস্র শিরের সাথে
　　নমিল ভূতলে,
বহু দিনকার জমা　　মালিন্য চাহিল ক্ষমা
　　তপ্ত অশ্রুজলে।

ঔপনিষদিক সমাজে নীতি ও ব্রহ্মজ্ঞানের স্থান

স্বামী বাসুদেবানন্দ

উপনিষদ্ সাধারণের জন্য ধর্মোপদেশ করছেন— "সত্যং বদ"—সত্য কথা বলবে। "ধর্মং চর"—ধর্মাচরণ করবে। "স্বাধ্যায়ান্মা প্রমদঃ"—অধ্যয়ন হতে বিরত হবে না। "আচার্যায় প্রিয়ং ধনমাহৃত্য প্রজাতন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ"—অধ্যয়ন সমাপন হলে, আচার্যকে তাঁর অভীষ্ট ধনদান কোরে, বিবাহ করবে, সন্তানধারা অবিচ্ছিন্ন রাখবে। "সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্"—বাক্যদান কোরে তা থেকে বিচলিত হবে না। "ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্"—স্বকর্তব্য হতে বিচলিত হবে না। "কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্"—শুভকর্ম হতে বিচলিত হবে না। "ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্"—ঐশ্বর্য সম্পাদনে প্রমাদগ্রস্ত হবে না। "স্বাধ্যায়প্রবচনাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"—অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হতে বিচলিত হবে না। "দেবপিতৃকার্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যম্"—দেব পিতৃকার্য হতে বিরত হবে না। "মাতৃদেবো ভব"—মাতা যেন তোমার দেবতা হন। "পিতৃদেবো ভব"—পিতা যেন তোমার দেবতাস্বরূপ হন। "আচার্যদেবো ভব"—আচার্য যেন তোমার দেবতাস্বরূপ হন। "যান্যনবদ্যানি কর্মাণি। তানি সেবিতব্যানি"—অনিন্দিত কর্মই সেবা করবে। "নো ইতরাণি"—অন্য কর্ম নয়। "যান্যস্মাকং সুচরিতানি। তানি ত্বয়োপাস্যানি॥"—আমাদের যা সদাচার তাই তোমার অনুষ্ঠেয়। "নো ইতরাণি"—অপর সকল নয়। "যে কে চাস্মচ্ছ্রেয়াংসো ব্রাহ্মণাঃ। তেষাং ত্বয়াসনেন প্রশ্বসিতব্যম্।"—যে সকল ব্রাহ্মণেরা আমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ, তাদের তুমি আসনাদির দ্বারা শ্রমদূর করবে। "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্। অশ্রদ্ধয়াঽদেয়ম্। শ্রিয়া দেয়ম্। হ্রিয়া দেয়ম্। ভিয়া দেয়ম্। সংবিদা দেয়ম্।"—শ্রদ্ধাসহকারে দান কর্তব্য, অশ্রদ্ধায় দান অকর্তব্য। নিজের ঐশ্বর্যানুরূপ দান করা উচিত। বিনয় সহকারে দান করা উচিত। পাছে কোন দোষ হয়, এইরূপ চিন্তাপূর্বক সভয়ে দান করা উচিত। প্রেমের সহিত দান করা

উচিত। "অথ যদি তে কর্মবিচিকিৎসা বা বৃত্তি-বিচিকিৎসা বা স্যাৎ"—আর যদি কর্ম ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে তা হলে—"যে তত্র ব্রাহ্মণাঃ সম্মর্শিনঃ যুক্তা আযুক্তাঃ। অলুক্ষা ধর্মকামাঃ স্যুঃ। যথা তে তত্র বর্তেরন্। তথা তত্র বর্তেথাঃ।"—সেখানে যে সকল বিচারক্ষম, কর্তব্যপরায়ণ, শুভকর্মে ও সদাচারে নিযুক্ত, অনিষ্ঠুর, ধর্মকাম ব্রাহ্মণ থাকেন, তাঁরা যে ভাবে জীবন যাপন করেন, তখন সেখানে সেই ভাবেই জীবন যাপন করবে।…"এতদনুশাসনম্"—এই হলো সাধারণের প্রতি বেদের অনুশাসন।—(তৈঃ উঃ ১।১১)।

কিন্তু এই চারিত্র-নীতিগুলির অনুসরণেই কর্তব্য শেষ নয়—নৈতিক জীবন উচ্চতর অধ্যাত্মজীবনের প্রস্তুতি মাত্র। ক্রমে অনুশীলনের দ্বারা আত্মার ক্ষুদ্র গণ্ডী সকল চূর্ণ কোরে (ত্রিশংকু ঋষির ন্যায়) ওগুলিকে সমষ্টি আত্মায় বিলয় করতে হবে।—

"অহং বৃক্ষস্য রেরিবা। কীর্তিঃ পৃষ্ঠং গিরেরিব। ঊর্ধ্বপবিত্রো বাজিনীব স্বমৃতমস্মি। দ্রবিণং সবর্চসম্। সুমেধা অমৃতোক্ষিতঃ।" –(তৈঃ উঃ ১।১০)—

আমিই এই সংসার-বৃক্ষের প্রেরয়িতা। কীর্তি আমার গিরিপৃষ্ঠের ন্যায়। আমার মূল (ঊর্ধ্ব) পবিত্র পরমব্রহ্ম। সূর্যের ন্যায় আমি সু-অমৃত স্বরূপ। আমি দীপ্তিমৎ (বর্চস) জ্ঞানবিত্ত। আমি অমৃতসিক্ত সুমেধা ব্রহ্মবিৎ।

উপনিষদের মতে অন্নের সাত্ত্বিক (সূক্ষ্ম) পরিণাম মন (ছাঃ উঃ ৬।৫।১); অতএব আহার-শুদ্ধি হলে চিত্তশুদ্ধি হয় (ছাঃ উঃ ৭।২৬।২)। বৃথা দান গ্রহণ করা নিষিদ্ধ এবং আপৎকালে সকলের দান গ্রহণ করা যায় (ছাঃ উঃ ১।১০।৪)। অতিথি-সৎকার ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় জ্ঞান (কঠ ১।১।৭—৯); একমাত্র সত্যবাদিতাই ব্রহ্মণ্যধর্মের পরিমাপ (ছাঃ উঃ ৪।৪।৫); সত্য-মিথ্যা জানবার জন্য তপ্ত পরশু গ্রহণ (ছাঃ উঃ ৭।১৬।২), স্ত্রীলোকের ব্রহ্মবিদ্যাধিকার (বৃঃ উঃ ৩।৬, ৩।৮, ৪।৫); শূদ্রের বেদাধিকার (ছাঃ উঃ ৪।৪,৪।১-৩) ইত্যাদিও উপনিষদে দেখা যায়।

আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের অন্তরঙ্গ সাধন, উপনিষদ বলেন—জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ। ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের মধ্যে পরস্পর অধ্যয়ন, অধ্যাপনা চলত। তবে সাধারণতঃ দেখা যায় ক্ষত্রিয়েরা সংক্রমণ, দেববিদ্যা বা উপাসনাতেই পারদর্শী ছিলেন। চরম ব্রহ্মজ্ঞান সম্বন্ধে ব্রাহ্মণেরাই উপদেষ্টা। উপনিষদে বহুস্থলে ধ্যানাভ্যাসের দ্বারা চিত্ত-মল-স্খালনের কথা আছে, যথা, "অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন"—(কঠ উঃ ১।২।১২), "দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া"—(কঠ উঃ ১।৩।১২), "যচ্ছেদ্ বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্ যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি"—(কঠ উঃ ১।৩।১৩)—বাক্যকে মনে, মনকে জ্ঞানাত্মায় (বুদ্ধিতে), বুদ্ধিকে মহতে অর্পণ করবে। "শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ"—(মুণ্ডক উঃ ২।২।৪), "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা, সম্যগ্-জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্যেন নিত্যম্। অন্তঃশরীরে জ্যোতি-র্ময়ো হি শুভ্রো, যং পশ্যন্তি যতয়ঃ ক্ষীণদোষাঃ॥" (মুণ্ডক উঃ ৩।১।৫), "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"—(শ্বেঃ উঃ ১।৩), "ন তস্য রোগো ন জরা ন মৃত্যুঃ, প্রাপ্তস্য যোগাগ্নিময়ং শরীরম্"—(শ্বেঃ উঃ ২।১২) ইত্যাদি।

চতুর্বিধ আশ্রমের মধ্য দিয়ে সেই পরম তত্ত্ব লাভ করতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত মেধাবী ও বৈরাগ্যবান হলে প্রথম আশ্রম হোতেই চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু এটা বিশেষ বিধি। যথা—"ব্রহ্মচর্যং পরিসমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ।

যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা॥ অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—(জাবালোপনিষৎ ৪)।

সন্ন্যাসীরা কথনও রাজনীতিতে যোগ দিতেন না, তথাপি তাঁরা সম্রাটের মত সম্মানিত হতেন। কেন?—"তাঁরা স্বর্গের আলো পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, অনন্ত জীবন-উৎসের রহস্য-বার্তা তাঁরা আবিষ্কার করে সকলকে সন্ধান দিয়েছেন—" (Evelyn Underhill, Mysticism p. 172).

সন্ন্যাসীরা হলেন তৃষ্ণার্তদের নিকট সহস্রার পদ্মের অমৃতধারার পরিবেশনকারী, তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক সুতুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণকারী তপস্বী ভগীরথ, দুর্গম হিমালয় শীর্ষে পুঞ্জীভূত ধর্মতুষারের তপ-উত্তাপে বিগলিত জাহ্নবীরূপে মর্ত্যলোকে পরিবহনকারী জীব-বন্ধু।

ডয়সন্ (Paul Deussen) তাঁর "উপনিষদ্ দর্শনে" নৈতিকতাটা গৌণ বলেন; কারণ ব্রহ্ম যথন স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, তথন উহা নিশ্চয়ই কতকগুলো নৈতিক কর্তব্যের পরিণাম স্বরূপ হতে পারে না। জীব অজ্ঞানহেতু স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না; এই অজ্ঞান-নাশের প্রধান কারণ জ্ঞান, অর্থাৎ মিথ্যা-দৃষ্টি অপসারিত হলেই সত্যের প্রভাত সুনিশ্চিত। সত্য-সূর্য সেখানে সৃষ্টি হয় না, সত্য সেখানে অনাদি হয়েই আছেন। নৈতিক কর্তব্য আত্মার সচ্চিদানন্দ অনুভূতির কারণ বা ব্যাপার নয়, জ্ঞানের সহকারী মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান যদি কর্তাকরণোপাদানব্যাপারবৎ অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধে উৎপন্ন হোত, তা হলে ঘটবৎ নশ্বর হয়ে পড়ত। ডয়সন্ বলেছেন, "moral conduct cannot contribute directly but only indirectly to the attainment of the knowledge that brings emancipation. For, this knowledge is not a becoming, something which had no previous existence and might be brought about by appropriate means, but it is the perception of that which previously existed from all eternity," (পৃঃ ৩৬২)। অর্থাৎ, মুক্তি-বিধায়ক (আত্ম) জ্ঞানলাভের প্রতি নৈতিক চরিত্রের সাক্ষাৎ অবদান নেই—পরোক্ষভাবে উহা সহায়ক মাত্র। কেননা এই জ্ঞান এমন কোন বস্তু নয় যা পূর্বে ছিল না এবং এখন উপায়-বিশেষ-অবলম্বনে 'উৎপাদ্য'। এই জ্ঞান হচ্ছে অনন্তকাল ধরে বর্তমান তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণ।

কিন্তু উপনিষদে জ্ঞানের তুলনায় সব কিছুই গৌণ হলেও, নিম্নাধিকারীরা উপনিষদের পূর্ব-কথিত নৈতিক তত্ত্বগুলি বাদ দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানে কথনও উপস্থিত হতে পারে না,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"—(মুণ্ডক উঃ—৩।২।৪)

'দুর্বল, প্রমাদশীল বা নিয়ম-শৃঙ্খলা-আচার-রহিত তপস্বী এই আত্মাকে লাভ করতে পারেনা। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীসমূহ-অবলম্বনে যে সাধন করে সেই জ্ঞানীব্যক্তির আত্মাই, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।'

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"—
(কঠ উঃ ১।২।২৪)

'পাপাচরণ ও ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হতে যে বিরত হয়নি, যার চিত্ত একাগ্র নয় এবং ফল-লাভের চিন্তায় অশান্ত, সে কথনও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে লাভ করতে পারে না।'

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
—(শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)*

'পরমেশ্বর এবং আচার্যের প্রতি যার ভক্তি আছে সেই মহাত্মার কাছেই উপনিষদুক্ত এই সব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।'

আর শ্রীভগবান গীতায় (১৩।৭-১১) নৈতিক বিধি, উপাসনা বা মনঃসংযোগ বিধি এবং সদসৎ বিচারগুলিকেই "জ্ঞান" বলেছেন, আর সব অজ্ঞান। অর্থাৎ সাধনের স্তুতির জন্য সাধনকেই সাধ্যের নামে আখ্যাত করেছেন। শ্রীরামানুজাচার্যও "জ্ঞান" অর্থে "ধ্যান" বা উপাসনাকেই গ্রহণ করেছেন, (ব্রঃ সূঃ উপক্রমণিকা)।

তবে জ্ঞান ভিন্ন অন্য যা কিছু সাধন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সবই গৌণ, কারণ শ্রুতি বলছেন—"নান্যৈর্দেবৈস্তপসা বা"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৮); "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৮)—অন্য কোন দেবতা বা তপস্যা দ্বারা তিনি লভ্য নন। জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ধ্যানশীলেরাই নিরবয়ব ব্রহ্মকে জানেন। এই শুদ্ধসত্ত্ব মনই হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য রাহস্যিকদের ভারজিন মেরী, সেখানে "Divine communion" জীব ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি ঘটে, "যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৯)—যে চিত্ত নির্মল হলে আত্মা বিশেষ ভাবে সেখানে প্রকাশিত হন। রাহস্যিকরা এই যোগোৎপন্ন জ্ঞানকে "Spiritual birth of Christ" বলেন। একহার্ট তাঁর "আত্মার দুর্গ" (The Castle of Soul) নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "and his substance, his nature and his essence being mine, therefore I am the son of God." মুণ্ডকোপনিষদের "বিশুদ্ধসত্ত্ব", "ধ্যায়মানঃ" হচ্ছে খ্রীষ্ট সাধকদের "রাহস্যিক জীবনের পঞ্চম স্তর", যাকে তাঁরা "union" (মিলন) বলে থাকেন। খ্রীষ্টীয় নানা সাধকেরা এটিকে নানা নামে আখ্যাত করেছেন, "Mystical Marriage" (রাহস্যিক উদ্বাহ), "Deification" (দেবভাবপ্রাপ্তি) "Divine Fecundity" (দিব্যাবির্ভাব)—এ অবস্থায় জীব কর্তৃক কেবল প্রাতিভালোকে অব্যয় জীবনের দর্শন ও স্পর্শন নয়, পরন্তু একীভূত হওয়া।

যা হোক উপনিষৎ প্রবর্তকদের জন্য কর্ম-ব্যবস্থা করেছেন, সেটাও অবিধিপূর্বক নয়, বিধি ও জ্ঞানপূর্বক—(মুণ্ডক উঃ ১।২।১-১১ দ্রঃ)। কিন্তু পরিশেষে উপনিষৎ বলছেন, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নেই, "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্"—(কঠ উঃ ১।২।১৭), এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এই হচ্ছে পরম গতি। "অশব্দমস্পর্শম্… নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"—(কঠ উঃ ১।৩।১৫), 'অশব্দ, অস্পর্শ…সেই তত্ত্বকে জেনে মৃত্যুমুখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।' "তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"—(কঠ উঃ ২।২।১২), 'যে ধীর ব্যক্তিগণ নিজের আত্মাতে সেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন তাঁরাই শাশ্বত সুখ লাভ করেন, অপরে নয়।' "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্…তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—(মুণ্ডক উঃ ১।১।১২), 'সকামকর্ম-লভ্য লোকসমূহের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে এর অতীত ধ্রুব শাশ্বত বস্তুর জ্ঞান-লাভের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হতে হবে।' "যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥"—(শ্বেঃ উঃ ৬।২০)—যে দিন চর্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করা যাবে সেই দিন ব্রহ্মদেবকে না জেনেও দুঃখের অন্ত হবে।

যতক্ষণ অহংকার আছে ততক্ষণ নৈতিকতার রাজত্ব, নিম্ন প্রকৃতিটাকে শাসন কোরে রাখা। কিন্তু যখন এই অহমাত্মা নিজের ভেতর চিদাত্মার সন্ধান পায়, তখনই নৈতিক রাজত্বের অবসান এবং আধ্যাত্মিক রাজত্বের আরম্ভ হলো।

আধ্যাত্মিকলক্ষ্যহীন নৈতিকতা একটা নিরুদ্দেশ সংগ্রাম, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু কিসের জন্য তা আমরা জানি না। অর্থাৎ নৈতিক আইন-কানুন যদি অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য বাস্তব জীবনে প্রযুক্ত না হয়, তা হলে সেগুলো সারা জীবনের একটা উদ্দেশ্যহীন কৃচ্ছ্রতা স্বীকার ছাড়া তার আর কিছু উপযোগ্যতা থাকে না। ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান হলেই তবে নৈতিকতার সার্থকতা, ব্রহ্মজ্ঞানেই ভালমন্দ, শুভাশুভ কর্মের, পাপপুণ্যের অবসান—"তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্বং আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্বং পাপ্মানং তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।"—(বৃঃ উঃ ৪।৪।২৩)। 'এই জন্যই এইরূপ জ্ঞানী শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন—নিখিল বস্তুকে আত্মা বলে সন্দর্শন করেন; পাপ এঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ইনি সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ এঁকে সন্তপ্ত করে না, ইনি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ ও বিগতসন্দেহ ব্রহ্মজ্ঞ হন।' "কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীই 'কেন আমি সাধুকর্ম করি নি, কেন আমি পাপ করেছি' বলে অনুতাপ করে না"—(তৈঃ উঃ ২।৯)।

খ্রীষ্টীয় মরমিয়া-তন্ত্রেও (Mysticism) ভাগবত জ্ঞানে এই পাপপুণ্যের নির্লিপ্তির উদাহরণ রয়েছে। সেণ্ট ক্যাথারিনের যখন প্রথম দিব্য দর্শন হলো, তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আর সংসার নয়! আর পাপ নয়! হে প্রেমময়! একি সম্ভব! তুমি এত ভালবেসে আমায় ডেকেছ, এবং এক মুহূর্তে এমন জিনিষ জানালে যা জগৎ প্রকাশ করতে পারে না।" অব্যয়-মূলক এই বোধির সহিত তাঁর আর একটা আন্তর দর্শন হলো, ক্রুশবাহী খ্রীষ্ট, জগতের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত; তাতে তাঁর চিত্তে এলো আরও দীনতা, আরও অনুরক্তি। "হে প্রভু! হে প্রিয়তম! আমার জন্য এত কষ্ট তোমার, আর না! আর কখনও পাপ করব না প্রভু!" এই তত্ত্বটির উপর খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্র ব্যবস্থিত, যত মহাপাপই হোক তা কখনও মুক্তির বাধা হবে না, যদি অনুতাপ আসে, যদি শরণাগতি আসে। "সাধুরেব স মন্তব্যঃ"—(গীতা ৯।৩০), "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—(গীতা ৯।৩১), "তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্"—(গীতা ৯।৩২)। জ্ঞানী ভক্তের অহংকার না থাকায় তার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিণত হয়, তার জীবনে ঈশ্বরীয় জীবন প্রকটিত হয়, পূর্ণে সংযুক্ত হওয়ায় সে পূর্ণ হয়ে যায়, তার সর্ব কর্মের প্রেরণা সেই অব্যয়-উৎস থেকেই বেরুচ্ছে।

"আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে

(এক)

মহাশক্তিরূপিণী মা

শ্রীমতী মীরা দেবী

বহু জন্মের পুণ্যফলে মাকে দর্শন স্পর্শন করবার ও তাঁর স্নেহ-বিগলিত কৃপা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, কিন্তু তিনি যে ভাগবতী মহাশক্তি—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীব-উদ্ধার কাজে সাহায্য করে তাঁর লীলা পুষ্ট করতে নারীদেহ ধারণ করেছিলেন, তা আমরা তখন কিছুই বুঝি নি। আমরা তাঁর স্নেহে ভরপুর হয়ে তাঁকে শুধু মমতাময়ী মা বলে জেনেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। অন্য কিছু ভাববার প্রয়োজন বা যোগ্যতাও তখন ছিল না।

মায়ের ভাণ্ডারে কত মণিরত্ন আছে আমরা সে খবর তখন রাখিনি, তাঁর কাছে গেলে জগৎ-সংসার ভুল হয়ে যেতো। সে মাত্র অনুভবের বস্তু, ভাষা তা ব্যক্ত করতে পারে না। একমাত্র ঠাকুরই দুচার কথায় তাঁর মহিমা ব্যক্ত করেছেন। তিনিই মাকে জেনেছিলেন, চিনেছিলেন, সেজন্য আমরা আজ ঠাকুরকেই মায়ের প্রথম ও প্রধান প্রচারক বলতে দ্বিধাবোধ করবো না।

মা তাঁর সাধন, ভজন, ভাব, সমাধি ইত্যাদি মহাশক্তিবলে গোপন করে রাখতে পেরেছিলেন, সর্বসাধারণ সে সব কিছুই জানতে পারে নি। সেইজন্য ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও ভক্তদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ঠাকুরকে অবতার বলে পূজা করলেও মাকে একজন সাধারণ লজ্জাশীলা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক বলেই মনে করতেন। এইরকম কোন এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরের ঈশ্বরকোটী প্রিয় সন্তানদের অন্যতম স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) বলেছিলেন:—"মাকে কে বুঝবে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের তবুও বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, ভাব, সমাধি লেগেই থাকতো, কিন্তু মার ঐ ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত,—এ কি মহা শক্তি! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মার কাছে চালান করে দিচ্ছি, মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাসী হয়েও স্ত্রীকে ত্যাগ করেন নি; নিজ গর্ভধারিণী মাতাকে যেমন কাছে রেখে সেবা যত্ন করেছেন তেমনি স্ত্রীকেও অতি যত্নের সহিত, অত্যন্ত মান্যসহকারে নিজের কাছে রেখে তপস্যা দ্বারা তিনি যাতে নিজ মহিমায় বিকশিতা, মহিমান্বিতা হয়ে লোককল্যাণ সাধন করতে পারেন তার উপযোগী শিক্ষা ও সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং শ্রীশ্রীমাও তেমন আধার বলেই তা সম্যকরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। শিক্ষকের একার কৃতিত্ব থাকলেই শিক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হয়না, গ্রহীতারও সমান কৃতিত্ব থাকা চাই।

পত্নীর সঙ্গে আট মাস এক শয্যায় শয়ন করে ঠাকুর নিজের মনকে বহু রকমে পরীক্ষা করেও যখন দেখলেন স্ত্রীর প্রতি শ্রীশ্রীজগদম্বা ভিন্ন অন্য কোন ভাব তাঁর মনে এলো না, তখন তিনি পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ মনে করে পত্নীকে

তৃতীয় মহাবিদ্যা "ষোড়শী" জ্ঞানে আলপনাযুক্ত দেবীপীঠে বসিয়ে গভীর নিশীথে ফলহারিণী কালী-পূজার দিন ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং তাঁর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের কঠোরতম সাধনার সকল ফল এমন কি জপের মালাটি পর্যন্ত মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ করলেন এবং বার বার প্রণাম করে প্রার্থনা করতে লাগলেন—যেন জীব-কল্যাণে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়।

আমরা একবার চিন্তা করে দেখতে পারি, এই নারী-রূপধারিণী কত বড় শক্তির আধার ছিলেন! ১৮।১৯ বছরের একটি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, শহুরে ভাব, শিক্ষা যার কিছুমাত্র জানা নেই, তিনি কেমন করে-সেই 'পতি পরম গুরু'র যুগে, এক দিকে স্বামী ও অন্য দিকে এত বড় একজন গণ্যমান্য মহাপুরুষের পূজো নিঃসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে গ্রহণ করলেন? বর্ণিত আছে, পূজক ও পূজ্যা উভয়েই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবার পরও আমরা মাকে দেখি তিনি পূর্বে যেমন স্বামী ও শাশুড়ীর সেবিকা ছিলেন, পরেও তেমনি সেবিকাই রইলেন। প্রাণপণে সেবাই করতে লাগলেন। কিছুমাত্র অহংকার তাঁর মধ্যে মাথা তুলতে পারল না,— তাঁর মাথা বিগড়েও গেল না। তিনি যেমন ধীর, স্থির, সেবাপরায়ণা, অক্লান্ত কর্মী, নিরভিমানা, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, তেমনই থেকে গেলেন। তাঁর এই চারিত্র মাধুর্য হতে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন "আদর্শ হিসেবে যা করতে হয় তার বাড়া করেছি।" (অর্থাৎ অনেক বেশী করেছি)। এর থেকে বোঝা যায় তাঁর জন্ম-পরিগ্রহ করাটাই লোক-শিক্ষার জন্য হয়েছিল।

ঠাকুর তাঁর ছেলেদের কাছে বলেছিলেন, "ও যদি এত ভাল না হোত,—তা হলে দেহ-বুদ্ধি আসতো কি না কে বলতে পারে?"

ঠাকুর আরও বলেছেন, "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। জীবের অমঙ্গল আশঙ্কায় এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" আবার কখনও, মহাশক্তি যে ক্ষুদ্র দেহের আবরণে লুকিয়ে আছেন তা বুঝাবার জন্যে বলেছেন, "ও ছাই চাপা বেড়াল।" আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই:—ভাগে হৃদয় আমাদের মাকে সাধারণ মানুষ, তাঁর মামী মনে করে সময় সময় মার প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহার করতেন দেখে ঠাকুর তাঁর অকল্যাণ আশঙ্কা করে তাঁকে একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"-রচয়িতা অক্ষয় বাবুর ভাষাতেই সে কথা বলি:—

"একদিন মিষ্ট ভাষে বিনয় করিয়া।
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া॥
ইনি যদি রুষ্ট হন রক্ষা নাহি আর।
সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইষ্ট এবং গুরুরূপে লাভ করে মা তাঁর আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ঠাকুর ছাড়া তাঁর কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে—তা কখনও কোনও আচরণেই প্রকাশ পায়নি; তবু শেষ-জীবনে মায়ের মুখ থেকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ২।১ টা কথা শুনতে পাওয়া গেছে যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন:— "আমার জন্মও তো ঐ রকমের" অর্থাৎ ঠাকুরের জন্মের মত অলৌকিক। রোগ যন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে— কোন অন্তরঙ্গ শিষ্যাকে বলছেন,— "এসব শরীরে কি মা রোগ হয়, দেব শরীর, লোকের পাপ গ্রহণ করে এ-সব হয়েছে।" রামেশ্বর দর্শনের পর, কেমন দেখলেন এই প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে মা বলে ফেলেছিলেন, "যেমনটি রেখে এসেছিলাম তেমনটিই রয়েছে দেখলুম।"

ঠাকুর যদি একাধারে রাম ও কৃষ্ণের শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তবে সীতা ও রাধিকার শক্তি একাধারে মিলিত হয়ে যে আমাদের মাতৃরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন—তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের যুগ, বিদ্বান-বুদ্ধিমানের যুগ, এ যুগে কারো স্বামী পুত্র শত প্রশংসা করলেও, কিম্বা তিনি নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ভাবের শব্দ প্রয়োগ করলেও, মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো কথা বিশ্বাস করতে চায় না—শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করা তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং আমাদের মাতাঠাকুরাণী কি ভাবে তাঁর ৬৭ বছরের জীবন যাপন করে গেলেন, বাঙ্গলার নারী-সমাজের আজ তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সাধারণতঃ নারীজীবন কন্যা, ভার্যা ও মাতা—এই তিন রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। মায়ের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এই তিন জীবনেই তিনি লোকশিক্ষার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। নারী-জীবনের কঠিন কঠিন পরীক্ষায় তিনি কি ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। নারী-জাতি বিশেষ করে বাঙ্গালী নারী যে অলঙ্কারে ভূষিতা হলে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, সেই দয়া, তিতিক্ষা, ক্ষমা, সংযম, নিঃস্বার্থপরতা, নিজ শরীরের সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, সহানুভূতি প্রভৃতি নিজ আচরণের দ্বারা মা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষা তিনি দেন নি, নিজে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করলে প্রকৃত সুখী হবো তা ঠিক করতে পারছি না। চতুর্দিকে আপাত-মনোরম প্রলোভন আমাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে! এই সময় অতি সুযোগ্য কর্ণধার বিনা আমাদের জীবনতরী লক্ষ্যস্থলে পৌছুতে পারবে না। যতই দিন যাচ্ছে—ততই আমরা বুঝতে পারছি যে, একমাত্র তিনিই এই তরীর কর্ণধার হয়ে আমাদের দিক নির্ণয় করে দিতে পারবেন। আমরা দেখি, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের লীলা-সহচরী রূপে এসে নারী-জাতিকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। বিশ্বের নারীশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি নারীসুলভ লজ্জা ও সেবা-ধর্ম বজায় রেখে অতি গোপনে নহবতে বসে কঠিন তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। ঠাকুরের তো ডঙ্কামারা তপস্যা কিন্তু মায়ের তা ছিল না, অতি সঙ্গোপনে এবং গৃহস্থালীর সকল কর্তব্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে লোক-লোচনের অন্তরালে তাঁর সাধনা। এতটুকুও তাঁহার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। কখনও কোনও ভক্তের চোখে তাঁর ঈশ্বরীয় ভাবের সামান্যমাত্রও ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা সংবরণ করে ফেলেছেন। এই তো প্রকৃত নারীশক্তির বিকাশ,—মহাশক্তিকে অনায়াসে ধারণ ও প্রকাশ করতে পারা।

(দুই)

প্রথম দর্শন ও কৃপালাভ

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার

খ্রীঃ ১৯১০ সালে আমার বেলুড়মঠ দর্শনের সুযোগ ঘটে এবং তথাকার আবহাওয়ায় মুগ্ধ হই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাখাল মহারাজ) তখন মঠের প্রথম প্রেসিডেণ্ট। যদিও মহারাজকে তখন আমি দেখি নাই, তবু আমার মনে হইল তিনি যদি আমাকে কৃপা করেন তবে আমি কৃতার্থ হইব।

১৯১৩ সালে, (বাঙ্গলা ১৩২০ সন) আমি রাঁচি একাউন্টেন্ট্ জেনারেল আফিসে অস্থায়ী-ভাবে কেরানীর কাজ করি। বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে। মন্ত্র-দীক্ষার জন্য আমার প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতা আসিল। কেবল মনে হইত গুরু-কৃপা না পাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। তখন আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন (শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান) আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য উপদেশ করেন। তাঁহার উপদেশ আমার চিত্ত আকর্ষণ করিল না। আমি কিসে রাখাল মহারাজের কৃপা লাভ করিতে পারি সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে ইন্দুবাবুরই উপ-দেশানুযায়ী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে এক সুদীর্ঘ পত্রে মহারাজের কৃপা প্রার্থনা করিলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। আমি পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলাম।

আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে এক গভীরা রজনীতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম ঘর স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত, আর জগন্মাতা কালীঘাটের মহাকালীরূপে চারিহস্তে আমায় কোলে তুলিয়া লইয়া, "ভয় কি বাবা, আমিত রয়েছি" বলিতে বলিতে এক নারী-মুর্তিতে রূপান্তরিতা হইলেন। তাঁহার পরিধানে লাল চুলপেড়ে কাপড়, হাতে বালা। তিনি আমাকে একটি বীজসহ নাম ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি ইহা করিয়া যাও, আর যাহা করিতে হয় আমিই করিব।"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে আমি 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠি। পরে শান্ত হইয়া বাকী রাতটুকু ঐ নাম জপ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া যাই। এই ঘটনা কাহাকেও বলিলাম না। এমন কি ইন্দুদাদাকেও নয়। শুধু এই চিন্তাই প্রবল হইল কোথায় কিভাবে আমার এই মাতৃমূর্তির দর্শন পাইব।

রাঁচিতে তখন প্রতি শনিবারে কথামৃত পাঠ ও ঠাকুরের কীর্তন হইত এবং আমি ইহাতে যোগদান করিতাম। এক শনিবার এই পাঠ ও কীর্তনে ৺সুরেন্দ্র নাথ সরকার উপস্থিত হন। তিনি ছুটিতে ছিলেন এবং ফিরিয়া আসার পথে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট মায়ের বহু কথা শুনিতে শুনিতে আমার চিত্ত আনন্দে নাচিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল এই মাই কি আমার স্বপ্নদৃষ্টা সেই মা? তাঁহার নিকট হইতে মায়ের দেশে যাওয়ার রাস্তা-ঘাট সব জানিয়া লইলাম। কিছুদিন পরে আমার মায়ের দেশে যাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। সামান্য কিছু বেলা থাকিতে জয়রামবাটী পৌছিলাম। কোয়ালপাড়া মঠ হইতে একটি ছেলে সঙ্গে গিয়াছিল। সে সোজা মায়ের বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইবার জন্য প্রসন্ন মামার পুকুরঘাটে গেলাম। তথা হইতে যেন শুনিতে পাইলাম, ছেলেটি বলিতেছে, "একজন ভক্ত আসিয়াছে"। হাত মুখ ধোওয়া হইলে আমি মায়ের বাড়ীর সদর দরজা পার হইয়া উঠানে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম বারান্দায় কতিপয় মহিলা বসিয়া আছেন, আর একজন বঁটিতে তরকারী কুটিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই উক্ত মহিলারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন আর যিনি তরকারী কুটিতেছিলেন তিনি সেই কাজেই লিপ্ত রহিলেন। পরে যখন আমি উঠানের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সেই মা! সেই চাহনি! সেই ভাব! মুহূর্তে আমার সব উলট্-পালট্ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল মা-ই জগজ্জননী, বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বেশ্বরী। নির্বাক, নিস্পন্দ হইয়া জড়ের মতো

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা তখন বঁটিখানা কাত করিয়া উঠিলেন এবং ঘরের দরজার শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া হাতের ইশারায় আমাকে ডাকিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত অগ্রসর হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা, আমায় কি করে চিন্‌লে?" এই আমার জীবনে মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রথম বাণী শোনা। আমি সাশ্রুনয়নে রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলাম.—"মা, তোমাকে চিনিবার মত আমার কি সাধ্য আছে? তবে কৃপা করিয়া যতটুকু চিনিয়েছ ঠিক ততটুকুই চিনিয়াছি।" মা হাসিলেন। সে হাসিতে আমার জড়ত্ব দূর হইয়া গেল। আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম, আর অমনি তাঁহার শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া দুই হাতে চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলাম। মা আমাকে তাঁহার পদ্মহস্তে ধরিয়া তুলিলেন এবং বারান্দায় আনিয়া একখানি আসনে বসাইলেন, পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া এক গ্লাস ঠাকুরের প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ লইয়া আসিয়া তাহা হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। আমি সানন্দে তাঁহার ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গ্লাসটি রাখিতেই মা নিজে উহা তুলিয়া ধুইয়া রাখিলেন এবং পুনরায় বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন। আমার সঙ্গে নানা কথা হইতে লাগিল। প্রসঙ্গক্রমে মা তাঁহার রাঁচির সন্তানদের নাম করিয়া কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি যতটুকু জানি বলিতে লাগিলাম। তাহার পর মা যেন কাহাকেও বলিলেন,—"ছেলে রুটী খাবে।" পরে আমাকে বলিলেন,—"এবার তুমি একটু ফাঁকায় যাও।" আমি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া বাহিরে আসিলাম। রাত্রে মা স্বয়ং পরিবেশন করিলেন এবং নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। কালীমামার বৈঠকখানায় আমার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরের দিন কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসিবার সঙ্কল্পের কথা বলিলে মা সম্মতি দিলেন।

পরদিন প্রাতে (৩০শে আষাঢ়) স্নান করিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলে মা বলিলেন, "ওর জন্যে ভাবনা নেই। ওর জন্যে ভাবনা নেই। তুমি কামারপুকুর ঘুরে এস। আজই চলে আসবে। ওখানে থেকো না।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া রাস্তার সব বিবরণ জানিয়া লইয়া মহানন্দে শ্রীধাম কামারপুকুর রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুস্মৃতি-জড়িত কামারপুকুরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিলাম। এক হাঁড়ি জিলিপি আনিয়াছিলাম। মা উহা নামাইয়া লইলেন। পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় বসিলাম। মা ঠাকুরের এক গ্লাস প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ আনিয়া উহা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। এদিনও তিনি নিজে গ্লাসটি ধুইয়া তুলিয়া রাখিলেন। পরে আমার সঙ্গে শ্রীধাম কামারপুকুর সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। পরে মা আমায় বলিলেন,—"কাল তোমার দীক্ষা হবে।"

পরদিন প্রাতে (১৩২০।৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, দ্বাদশী তিথি। ইংরেজী ১৯১৩।১৫ই জুলাই) আমি বাঁড়ুজ্যেপুকুরে স্নান করিয়া অপর একটি পুকুর হইতে অনেক সাদা পদ্ম সংগ্রহ করিয়া মায়ের কাছে আনিলাম। মা ঐ পদ্ম হইতে সিংহবাহিনীর জন্য কিছু, ভানুপিসীর জন্য কিছু এবং নিজের পূজার জন্য কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট আমার জন্য রাখিয়া দিলেন। পরে বলিলেন,—"এখন একটু ফাঁকায় যাও। আমি সময় মত তোমায় ডেকে পাঠাব।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মা আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘরে যাইয়া দেখি একটি পিতলের ছোট সিংহাসনে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। সামনে ৪।৫টি জলের ছোট ঘট, দুইখানি আসন পাতা আর মা দাঁড়াইয়া আছেন। আমি ঘরে যাইতেই আদেশ করিলেন,—"ঠাকুর প্রণাম কর।" সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। পরে মা ঐ প্রত্যেকটি ঘট হইতে জল লইয়া আমার মস্তকে ও সর্বাঙ্গে ছিটা দিলেন এবং পুনরায় ঠাকুর প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। তখন মা আমার মস্তক ও সর্বাঙ্গে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এখন মনে মনে ভাব, তোমার জন্ম জন্মান্তরীণ পাপ ভস্ম হয়ে গেল। তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা।" আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম এবং মায়ের আদেশানুযায়ী ভাবিতে লাগিলাম আমার সর্ব পাপ ধ্বংস হইয়াছে। আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা। আনন্দে আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মা আমাকে পুনরায় ঠাকুর প্রণাম করিতে আদেশ করিয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলেন। আমিও সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলাম। মা তখন বলিলেন,—"তোমার ত হয়েই গেছে। ঐ মন্ত্রই ১০৮ বার জপ করবে। আর তোমার কিছুই করতে হবেনা, বাকী সব আমিই করব।" আমি তখন সাশ্রুনয়নে ও কম্পিত কলেবরে বলিলাম,—"মা, আমি তোমার শ্রীমুখে ঐ মন্ত্র শুনিতে চাই। মা তখন আমাকে তাঁহার স্বপ্নে দেওয়া মন্ত্র শুনাইলেন ও জপ-প্রণালী দেখাইয়া দিলেন এবং শ্রীপ্রভুর মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরই সব। ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। ঠাকুরই ইহকাল, ঠাকুরই পরকাল। তুমি ঠাকুরের, ঠাকুর তোমার। আমাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন ভাববে।" আনন্দে আত্মহারা হইলাম, ধন্য হইলাম। আসন হইতে উঠিয়া মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। মাও আসন হইতে উঠিয়া তক্তা-পোশের উপর রাঙ্গা পাদুখানি ঝুলাইয়া বসিলেন। আমি তখন আমার জন্য রক্ষিত পদ্মফুল হইতে কতক লইয়া একটি বেদী সাজাইয়া তাহার উপর মায়ের চরণ দুখানি রাখিয়া অবশিষ্ট পদ্ম দিয়া তাঁহারই প্রদত্ত মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিলাম। মা তখন সস্মিত হাস্যে বলিলেন,—"বাবা, কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরেছ। ঘুরতে ঘুরতে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌছেছ। আর ভাবনা কি?"

"মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।
অহংকারব্যাঘ্রব্যথিতমিমত্যান্তকৃপয়া
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মামসি গুরো॥"

'সুদীর্ঘ স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলাম। মায়াকৃত জন্ম-জরা-মৃত্যু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারারণ্যে কত না ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, দিনের পর দিন বহুতর সন্তাপে কত না ক্লিষ্ট, অহংকার-ব্যাঘ্র দ্বারা কত না নির্যাতিত হইতেছিলাম। হে গুরো, আজ তুমি তোমার অপার কৃপায় আমার সেই গাঢ় মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিলে, একান্তভাবে আমায় রক্ষা করিলে।'

(শঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি)

উদ্‌গীথ-আবাহন

অনিরুদ্ধ

[বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে উদ্‌গীথ (বেদমন্ত্রবিশেষ) গান করিয়া দেবতারা অসুরগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উদ্‌গীথ-উপাসনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।—লেঃ]

জাগো উদ্‌গীথ উত্থান-গীত উত্তাল বেগ ভঙ্গে
ঊর্ধ্ব প্রাণের নৃত্য-ছন্দে মৃত্যু-বিজয়-রঙ্গে।
শিহরো মন্ত্র তোল উদাত্ত নিনাদ মধ্য মন্দ্রে
ভরো অভিনব স্বরের বিভব অযুত হৃদয়-তন্ত্রে।
বিনাশো সুপ্তি আত্মলুপ্তি মিথ্যা স্বপ্ন-দাত্রী
এস দিবালোক দূর হোক শোক
অন্ধ-ব্যামোহ-রাত্রি।
উদ্‌গীথ চলো বহি কল কল আনো দুর্বার বন্যা
যাউক ভাসিয়া যত ছল-কায়া খণ্ডিত-সীমা-জন্যা।
জাগো আনন্দ অখিল-বন্দ্য উৎসারি ছাও বিশ্ব
এস গো পূর্ণ হউক চূর্ণ দীন রিক্ততা নিঃস্ব।
উঠ গম্ভীর উদ্‌গীথ ধীর গহন গভীর সত্যে
ঘুচুক বিভেদ দ্বেষ-ভয়-খেদ স্বার্থ-কলুষ চিত্তে।

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন যে, ভাল মন্দ সব কাজেই ভগবানের সহিত যুক্ত হও। তাঁহার সহিত যোগ না থাকিলে আমাদের কোন অস্তিত্বই থাকে না। কিরূপ ভাবে এই যোগ সাধন করিতে হয়—তাঁহাকে সর্বদা স্মরণ ও মনন করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন যে, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নিবিষ্টচিত্ত ও তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্যযুক্ত এবং সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীভগবানকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিবে। হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই আত্মজ্ঞানের

নিমিত্ত যত্নবান হয়। আবার ঐ প্রকার সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে যথার্থ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"যোগং যুঞ্জন্" —"কোন রকম করে তাঁর সঙ্গে যোগ হ'য়ে থাকা। দুই পথ আছে—কর্মযোগ ও মন-যোগ। যারা আশ্রমে আছে; তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আর যে কর্ম কর, ফল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর, কামনাশূন্য হয়ে করতে পারলে, তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। আর এক পথ মনযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরে কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক; ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত; ৪।২৩৮, ২৩৯) যিনি এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে না ভুলিয়া তাঁহার উপর মন রাখিয়া, এই সংসারে থাকিবার নাম যোগ। জীবনের সব কাজেই —আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনে—ছোট-বড়; ভাল মন্দ সকল কাজেই আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিব—তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না বা আমাদের কল্যাণ হইবে না—এই জ্ঞান মনে মনে সদা অনুভব করার নাম যোগ।

গীতাকার আবার বলিয়াছেন,—"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। (গীতা ৭।৪) ইয়ং-তু-অপরা (নিকৃষ্টা অপ্রধানা) অর্থাৎ এই আট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি অপ্রধানা। ইতঃ অন্যাৎ—ইহা হইতে ভিন্ন ভাবাপন্না আমার আর একটি জীব-স্বরূপ পরা অর্থাৎ চেতনময়ী প্রকৃতি আছে, যাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। এই যে আমাদের স্থুল দেহ, ইহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম দেহ আছে (১৩ অঃ ৫-৬) তাহা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এই ১৮টি সূক্ষ্মতত্ত্বে গঠিত। "স্থুল দেহই মৃৎ পিণ্ডের ন্যায় মলিন—ইন্দ্রিয়ের গোচর। অপরা প্রকৃতি দেহ রচনা করে, পরা-প্রকৃতি সেই দেহে ভূতভাবের বিকাশ করাইয়া সর্বভূতের প্রাণ ধারণের নিমিত্তভূতা হয় ও প্রাণিগণকে প্রাণযুক্ত করে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমি ইহাঁর প্রলয়-কর্তা। (গীতা, ৭-৬) হে ধনঞ্জয়। আমার বাহিরে, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। (ঐ ৭।৭)। হে কৌন্তেয়! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্যে প্রভারূপে, সমুদয় বেদে-ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে ও মানুষগণের ভিতরে পৌরুষ-রূপে অবস্থান করিতেছি (ঐ ৭।৮)।

ঐ এক কথাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহজ ও সরল ভাবে বলিয়াছেন—"তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব; তার থেকে অহঙ্কার এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরই মায়া জীব জগৎ এই সব হ'য়েছেন, অনুলোম তার পর বিলোম।" (কথামৃত ৩।৭৭)। "যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই বিদ্যা—আর সব মিছে। তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে তো আনন্দ হবে, খেলে তবে তো বল হবে—লোকে হৃষ্টপুষ্ট হবে। ভগবান দর্শন করলে তবে তো শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবে তো আনন্দ হবে, শক্তি বাড়বে। (ঐ, ৩।৬৯)। তিনিই উপাদান-কারণ তিনিই নিমিত্তকারণ। তিনিই জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন

আবার জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বা পুরুষ বলি; আর যখন ঐ সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন"। (ঐ, ৫।১৭৩)। শব্দ ব্রহ্ম; ঋষি, মুনিরা ঐ শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন; সিদ্ধ হলে শুনতে পায় নাভি থেকে উঠ্‌ছে অনাহত শব্দ।" (৫।১৪৫)

ভগবানকে তবে আমরা কোথায় অন্বেষণ করিব গীতাকার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"রসনায় যে রস আস্বাদন কর তিনিই সেই রস-স্বরূপ। শশীসূর্যের যে প্রভা জগৎ আলোকিত করে, সে-প্রভারূপেও তিনি। কর্ণে যে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, নাসিকায় যে গন্ধ আঘ্রাণ কর, সেই শব্দ রূপে, গন্ধ রূপে তিনি বিরাজিত।" তিনিই তোমার তপঃশক্তি, তোমার বুদ্ধি ও তোমার তেজ। তিনি সকলের জীবন, সকলের সৃষ্টির বীজ। তোমরা তাঁহাকে দেখিতে জান না, তাই দেখিতে পাও না। তিনি সর্বত্র সুপ্রকাশ, তাঁহাকে সর্বত্র দর্শন কর। তিনি বলবানের কামনা- ও আসক্তি-রহিত বল এবং সর্বভূতের ধর্মানুগত কাম। জীবমাত্রেরই যে বল তাহা মূলতঃ ঐশী শক্তি কিন্তু তাহারা তাহাদের জীবনের কর্মে যখন ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে তখনই কামরাগাদির অধীন হইয়া পড়ে। সপ্তম অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি।"

তবে আমাদের কামক্রোধাদি কি যায় না? কিরূপে আমরা এই কাম ক্রোধাদির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিব? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে শুধু ঈশ্বর আছেন এইটি জানিয়া জ্ঞানী হইলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্বত্র ও সর্বদা দর্শন করিতে হইবে। তোমাকে বিজ্ঞানী হইতে হইবে, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে হইবে। "তখন আর তোমার কোন পাশ থাকবে না—লজ্জা, ঘৃণা সঙ্কোচ প্রভৃতি। ঈশ্বর দর্শনের পর এই অবস্থা হয়। যেমন চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে—পেরেক আলগা হ'য়ে খুলে যায়। ঈশ্বর-দর্শনের পর কাম ক্রোধাদি আর থাকে না।" (শ্রীরাঃ কঃ ৫।১৪৫)। "ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে, রাঁধা খাওয়া, হেউ ঢেউ হয়ে যাওয়া যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী! কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্ট পাশ খুলে যায়—কাম ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে। এ অবস্থা হ'লে কাম ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না, অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে হবে সব, কিন্তু ভিতর ফাঁক ও নির্মল। বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে তাই এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা হ'তে নিত্যতে যায়।" (ঐ, ৩।৮৮-৮৯)। বিজ্ঞানী সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ করিয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে। ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছে। তাঁহাকে চিন্তা করিয়া অখণ্ডে মন লয় হইলেও আনন্দ—আবার মন লয় না হইলেও আনন্দ।

এমন যে ভগবান্, যিনি আছেন "বিটপী লতায়,···শশী তারকায় তপনে"—তাঁহাকে কেন আমরা জানিতে পারি না? গীতাকার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের ত্রিগুণময়ী অলোকিক মায়াশক্তি, জগতের সমুদয় লোককে ত্রিগুণাত্মকভাবে বিমোহিত করাতে তাঁহাকে আমরা জানিতে সমর্থ হই না। এই

অলৌকিক গুণময়ী মায়া দুস্তরা—যাহারা ভগবানকে আশ্রয় করিয়া একান্তভাবে তাঁহার শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।

অহং করোমি—অর্থাৎ আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ কর। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির অভিমান ছাড়, তোমাকে সন্ন্যাসের পথও অবলম্বন করিতে হইবে না; কেবল তোমার অহঙ্কারের উচ্চ শিরকে নত করিয়া, তাঁহার শরণাগত হও। তাহা হইলেই তুমি মুক্তিলাভ করিবে ও মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এই মায়ার দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুরভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সকল দুষ্কর্মকারী নরাধম, মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আর্ত, আত্মজ্ঞান-অভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকারের পুণ্যবান লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। অসুরভাব হইলে আর ভগবানকে মনে থাকে না। তন্মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্তি-ও যোগ-যুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ জ্ঞানী আমার একান্ত প্রিয়। তিনি সদেকচিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তমগতি জানিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। বহুজন্ম অতিক্রম করিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি, বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব—এইরূপ তত্ত্ববোধে আমাকে প্রাপ্ত হন।

এই মায়া কি? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'জ্ঞানযোগে' লিখিয়াছেন,—"ভবিষ্যতের আশা মরীচিকার মত আগে আগে ছুটিতেছে। কখনও তাহাকে ধরিতে পারি না—আমরা তাহার পাছে পাছে ছুটিতেছি। আমরা যত যাই, সেও তত আগাইয়া যায়। এই-ভাবেই দিন যায়। শেষে কাল আসিয়া সব শেষ করে। অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, আমরা রূপরসাদি বিষয়ের অভিমুখে অবিরত ছুটিতেছি—যদি সুখ পাই। কিন্তু সুখ কোথায়? রূপ রস ইত্যাদি—সবই অনলরাশি, দেহ মন দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু তথাপি নিবৃত্তি নাই। আবার আশার কুহকে নবীন উদ্যমে সেই অনলে পুড়িতে যাই। ইহাই মায়া। স্বার্থে বা নিঃস্বার্থে, সৎ বা অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি বা করিতেছি, সেইগুলি স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে আমরা উহা না করিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই ঐ সকল করিয়াছি ও করিতেছি। ইহাই মায়া। যে তাঁর একান্ত ভক্ত, সেই কেবল এই মায়ার প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"তিনি তিন অবস্থার পার; সত্ব, রজ তম তিন গুণের পার। সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।" (শ্রীরাঃ কঃ,৫।১৬১)। "তাঁর কৃপা হ'লে, সবই হয়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই।" (৫।১৬২)। "ঈশ্বরের দিকে ঠিক মন রাখবে। সব মন তাঁকে না দিলে, তাঁকে দর্শন হয় না।" (৫।১০২)। "কামিনী কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। দুএকটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই ভগ্নীর মত থাকতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তা হলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে। আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন। যদি আন্তরিক হয়।"

ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এবং তাঁকে ভালবাসার নামই বিজ্ঞান। ঠাকুর অতি সরলভাবে এই জ্ঞানের মানে

বলিয়াছেন—"ঈশ্বর আছেন এইটী যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আস্‌তে হয়, কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান লাভ হলে ঈশ্বর দর্শন হ'লে মুক্তি হ'য়ে যায়—আর আস্‌তে হয় না। সিদানো ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেউ হয়, তাকে নিয়ে সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না। তার তো কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই! সিদানো ধান আর ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে?" (৫ পঃ ৫৭)। তাঁর কি ইচ্ছা যে সকলেই শিয়াল-কুকুরের মত কামিনী কাঞ্চনে মুখ ডুবড়ে থাকে? কোন্‌টী তাঁর ইচ্ছা, কোনটা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্যবোধ হয় আবার নিত্যকে অনিত্যবোধ হয়। সংসার অনিত্য—এই আছে, এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয় এই ঠিক। তাঁর মায়াতে আমি কর্তা বোধ হয়, আর আমার এই সব—স্ত্রী,পুত্র, ভাই, ভগিনী, বাপ, মা, বাড়ী, ঘর—এই সব আমার বোধ হয়। মায়াতে বিদ্যা, অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যার সংসার ভুলিয়ে দেয়; আর বিদ্যামায়া—জ্ঞান, ভক্তি, সাধুসঙ্গ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। তাঁর কৃপাতে যিনি মায়ার অতীত, তাঁর পক্ষে সব সমান—বিদ্যা অবিদ্যা সব সমান। সংসার আশ্রম ভোগের আশ্রম। কামিনী কাঞ্চন ভোগ কি আর করবে? সন্দেশ গলা থেকে নেমে গেলে টক কি মিষ্টি মনে থাকে না। (পঃ ৫।৭৯)।

এই সংসারে শ্রীভগবানকে দর্শন হয় না তাহার কারণ যোগমায়াতে শ্রীভগবান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন। সকলের সম্মুখে কদাচ প্রকাশমান হন না। গীতাকার বলিয়াছেন যে এই জন্যই মূঢ়েরা তাঁহাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারেন না। কিন্তু এই যোগমায়া তাঁহারই শক্তি। অন্যকে মুগ্ধ করিলেও তিনি তাহাতে মুগ্ধ হন না। প্রত্যেকের অতীত কালের ঘটনাবলী তিনি জানেন—আমাদের আগে কি হইয়াছে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না!

তাঁহাকে কেন কেহ জানিতে পারে না? আমার হয়ত কোন বিষয়ে প্রবল অনুরাগ বা ইচ্ছা হইল এবং কোন বিষয়ে বা প্রবল বিরাগ বা বিদ্বেষ হইল—এই ইচ্ছা বা দ্বেষ রূপ দ্বন্দ্ব ভাব জনিত, "আমি সুখী" বা "আমি দুঃখী" এই ভাবিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। এই যে ইচ্ছা ও দ্বেষ—ইহা জন্মকালীন সংস্কার-বশে মানুষের মনে উদিত হয়। পূর্ব সংস্কারের অনুরূপ এই যে ইচ্ছা বা অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—ইহাতেই দ্বন্দ্বরূপী মোহে মানুষ মোহিত হইয়া ভগবানকে জানিতে চাহে না। এই সকল দ্বন্দ্বভাবে আমরা আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত মুগ্ধ আছি। এই মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, তবে তাহার পশ্চাতে ভগবানের যে পরম ভাব রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি হয় এবং তখনই তাঁহাকে ঠিক ভজনা করা যায়। গীতাকার বলিয়াছেন,—"যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা, মৃত্যু হইতে বিনির্মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সমগ্র জগতের পশ্চাতে যে পরম সত্য নিহিত আছে, উহা অবগত হইতে সমর্থ হন।" (গীতা, ৭।২৯)। শ্রীভগবানই যে জগৎময় বিরাজিত, স্থাবর জঙ্গম সমুদয় যে তাঁহার ভাবান্তর, ইহা জানিতে পারিয়া যে তাঁহার শরণাগত হইতে পারে, সেই তাঁহার কৃপায়, সেই মায়ার কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে। এইরূপ সমাহিত-

চিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালেও তাঁহাকে বিস্মৃত হন না। মৃত্যুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমরা "গেলাম রে, মরলাম রে"—এই তো চীৎকার করি। কিন্তু যিনি তাঁহার শরণাগত, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহার বিশ্বাস ও জ্ঞান, মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে ধীর ও স্থির থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণী আমরা স্মরণ করিব। তিনি বলিয়াছেন,—"তিনিই সব হয়েছেন—তাই বিজ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাই চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা হ'তে নিত্যতে যায়। বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ ক'রেছে। শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন সতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো ক'রে একবার ঘুঁটি উঠ্‌লে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে। জ্ঞানীর মুক্তি কামনা, এই সব থাকে বলে দুহাত তুলে নাচতে পারে না। নিত্য লীলা দুই নিতে পারে না। আর জ্ঞানীর ভয় আছে পাছে বদ্ধ হই—বিজ্ঞানীর ভয় নাই। মৃত্যু ভয়ও নাই। কেউ দুধ খেয়েছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ শুনেছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে, আর খেয়ে আনন্দলাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

"অনেক জানার নাম অজ্ঞান—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য ও সর্বভূতে আছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।" (শ্রী রাঃ কঃ ৪।২৭৬)

মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসা। ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার দয়া হইবেই হইবে এবং আমরা প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

[প্রথম চিঠিখানি এবং পরবর্তীটিও কাশী-নিবাসী জমিদার বাবু প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

(১)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

বরাহনগর

১৬ই বৈশাখ

(April 28 '90)

মহাশয়

গতকল্য বেলা প্রায় ১০টার সময় আমি বরাহনগরের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রিতে যাত্রা করায় বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় কাশীতে গাড়ীতে আরোহণ করি, সমস্ত রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইয়া বেলা প্রায় ৭টার সময় Mokamah Stationএ নামি। তথায় আহারাদি করিয়া সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া বেলা ৬টার সময় পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করি। সে রাত্রিতেও বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। তৎপর দিন বেলা প্রায় ১০টার

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

সময় Ballyতে নামি এবং Bally হইতে নৌকা করিয়া বরাহনগরে আসি। এক্ষণে শরীর অনেকটা ভাল আছে। ভাত খাইতেছি, কাশি প্রভৃতি যে সকল অসুখ ছিল তাহা দিন দিন কম পড়িতেছে, বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই কিছু বল পাইতে পারি। বাবুরাম বাবাজী এখানে জ্বরে খুব ভুগিতেছেন, এক্ষণে একটু ভাল আছেন। নরেন্দ্র বাবাজী এই স্থানেই আছেন; তাঁহার শরীর এক্ষণে বেশ সুস্থ আছে, বোধ হয় তিনি গরমে শীঘ্র পশ্চিমে যাইবেন না। আমাকেও এক্ষণে কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতে হইবে। আপনার স্তব পাঠ করিয়া এখানকার সকলেই অতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার পরমহংসদেবের উপর ভক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আপনার নিকট যদ্যপি গঙ্গাধর বাবাজীর কোন পত্রাদি আইসে তাহা হইলে আমাদের সংবাদ দিবেন কারণ গঙ্গাধর বাবাজীর সংবাদ পাইবার জন্য সকলেই উৎসুক আছেন। আমাদের নমস্কার জানিবেন।—ইতি। নিঃ অভেদানন্দ

(২)

"শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি"

বরাহনগর
২৫শে বৈশাখ
May 7' 90

মহাশয়

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে ৺বশিষ্ঠদেবের মন্দিরে প্রত্যহ যাইয়া নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় পরমানন্দ অনুভব করেন তাহা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। সে স্থানটী বড়ই মনোরম এবং তথায় বসিলে (এমনি স্থানের মাহাত্ম্য) মনের স্বতঃই এক অপরূপ ভাব হয় এবং বিনা চেষ্টায় ভগবচ্চিন্তার উদয় হয়। সে স্থানটী আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এখনও ইচ্ছা হয় যে তথায় বসি এবং আপনার সহিত ভগবৎ কথায় সময় অতিবাহিত করি। আপনি যে তথায় বসিয়া হৃষীকেশের সুখ অনুভব করেন তাহা হইতেই পারে। এমনি স্থানই বটে। যথার্থই এরূপ স্থানে কিয়ৎকাল বসিলে সাংসারিক ভাব সকল দূর হইয়া যায় এবং সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। আমি এক্ষণে এই মঠেই আছি। শরীর দিন দিন কিছু কিছু বললাভ করিতেছে। এক্ষণে শরীরে আর কোন অসুখ নাই। যাহা একটু দুর্ব্বলতা আছে তাহা বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে। প্রেমানন্দ বাবাজী এখন বেশ সারিয়া উঠিয়াছেন, এখন কোনও অসুখ নাই। নরেন্দ্র স্বামীর মধ্যে একটু জ্বরভাব হইয়াছিল, এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অদ্য (বুধবার) গঙ্গাধর বাবাজীর একটী পত্র ও একটি parcel (যাহা তিনি রাওলপিণ্ডী হইতে পাঠাইয়াছিলেন) পাইলাম। পার্শ্বেলটিতে একটি শাক্যথুবা বুদ্ধদেবের মুর্ত্তি (যাহা তিনি তিব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন) এবং অমরনাথের ভস্ম ও বিল্বপত্রাদি পাঠাইয়াছেন। মুর্ত্তিটি অতি প্রাচীন এবং দেখিলেই বোধ হয় ইঁহার পূজা সর্ব্বদাই হইত। গঙ্গাধর ভায়া এক্ষণে রাওলপিণ্ডীতে আছেন এবং লিখিয়াছেন যে আমি শীঘ্রই এস্থান হইতে যাত্রা করিতেছি এবং অল্পদিনের মধ্যেই ৺কাশীধামে যাইতেছি। বোধ হয় এতদিনে আপনার বাটীতে আসিয়াছেন। এক্ষণে ৺কাশীধামের অসহ্য উত্তাপ তাঁহার পক্ষে অত্যন্তই কষ্টকর হইবে, কারণ তিনি বহুকাল শীত-প্রধান দেশে কাটাইয়া আসিতেছেন। যাহা হউক আপনার বাটীতে আসিলেই আপনি তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন।

এ স্থানের গ্রীষ্ম তাঁহার তাদৃশ কষ্টকর হইবে না, কারণ ৺কাশীধামাপেক্ষা এ স্থানের গরম অনেক কম এবং এটি তাঁহার স্বদেশ, এ স্থানের জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কখনই অনিষ্টকর হইবে না। মঠস্থ সকলেই তাঁহার এস্থানে আসাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছেন। আপনি তাঁহার যদি কোন পত্র পাইয়া থাকেন তাহা হইলে শীঘ্রই লিখিবেন এবং আপনার বাটীতে আসিলেই আমাদের সংবাদ দিবেন। মঠস্থ স্বামী সকলেই ভাল আছেন। তাঁহাদের সকলের নমস্কার জানিবেন এবং আমারও। গঙ্গাধর ভায়ার জন্য আমরা সকলেই চিন্তিত রহিলাম। এক্ষণে ৺কাশীধামে কিরূপ গরম পড়িয়াছে ও আপনি কেমন আছেন লিখিবেন।

ইতি নিঃ
অভেদানন্দ

(৩)

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

New York
Nov. 4th 1897

My dear Rajah Saheb (প্রিয় রাজা সাহেব),

বহুকালের পর তোমার পত্র পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

এখানকার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তাহে ৪টা lecture (বক্তৃতা) দিতেছি। লোকসংখ্যা মন্দ নহে। গত বুধবারে ৭৬ জন, তাহার আগের বুধবারে ১২৮ জন লোক আসিয়াছিল। হল পরিপূর্ণ! Subject (বিষয়) ছিল Concentration (একাগ্রতা), বোধ করি লোকের ভাল লাগিয়াছিল। যথাসাধ্য কার্য্য করিতে ক্রটী করির না, তবে ফলাফল শ্রীশ্রীগুরুদেব জানেন।

Mr. Sturdyর অসন্তোষের কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। যতদিন Englandএ ছিলাম Mr. Sturdy কিছুই বলে নাই। এক্ষণে কত কথাই শুনিতেছি। কাহার মুখে হাত চাপা দিব বল? আমি যথাসাধ্য Sturdyর মতানুযায়ী কার্য্য করিতে ক্রটী করি নাই। ইহাতেও যদি তাহার অসন্তোষ হয় তাহলে নাচার। আমার বোধ হয় এসব Mrs Sturdyর influence (প্রভাব)। Mrs Sturdy বেদান্তের উপর এবং নরেন্দ্রের উপর হাড়ে চটা; Indiaর নামে চটে; সে Mr. Sturdyকে গিলে আছে এবং সর্ব্বদাই শশব্যস্ত, পাছে Mr. Sturdy সন্ন্যাসী হয়ে পালায়।

যাহা হউক ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত—পত্র লিখিবার অবকাশ নাই, ক্ষমা করিবে—আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিও।

ইতি
দাস কালী

পথহারা

শান্তশীল দাশ

আঁধারের মাঝে ঘুরে ঘুরে মরি,
পথ পাই না যে হায়;
এমনি করেই দিনগুলি মোর
একে একে কেটে যায়।
হে প্রিয় আমার, দেবে না কি তুমি দেখা,
চলিব কি শুধু আঁধারের মাঝে একা?
পরাণ যে মোর আশাহত হয়ে
কেঁদে মরে বেদনায়।

মায়া-অঞ্জন পরায়েছ তুমি
দুইটি নয়নে মোর;
আলোকের রেখা তাই তো জাগে না
কাটে না আঁধার ঘোর।
সরাও বন্ধু, সরাও সে আবরণ,
সহজ দৃষ্টি দাও ভরে দু'নয়ন;
তোমার ধরণী চির আলোময়,
যেন সে দেখিতে পায়।

কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

জন্মরহিত যিনি অকুটিল মন
যাঁর পুর একাদশ দ্বার*
ধ্যান করি যাঁরে লোকে দুঃখ নাহি পান
মুক্তি লভি হ'ন মুক্তভার
ইনি সেই ॥ ১ ॥

আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু
তাঁর নাম
বেদীতে তিনিই হোতা, গৃহে তিনি
অতিথি ও দ্বিজ,
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তাঁর
অবস্থান
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ
মহাসত্য তিনি সুমহান ॥ ২ ॥

প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধলোকে সঞ্চালিত করি
অপানেরে নিক্ষেপ করিয়া অধঃস্তরে
মধ্যস্থলে যে বামন রহেন আসীন
সকল দেবতা তাঁর উপাসনা করে ॥ ৩ ॥

শরীরস্থ দেহ-স্বামী শরীর করেন যবে ত্যাগ,
সম্পর্ক করেন পরিহার,
অবশিষ্ট কিবা থাকে আর ?
ইনি সেই ॥ ৪ ॥

* ব্রহ্মরন্ধ্র, দুই চক্ষু, নাসিকার দুই ছিদ্র, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি এবং মলমূত্রের দ্বারদ্বয়।

প্রাণ বা অপান দ্বারা কোন জীব
করে নাকো জীবন-ধারণ
প্রাণ ও অপান কিন্তু আশ্রিত যাঁহার
তিনিই তো জীবন-কারণ ॥ ৫ ॥

শোন তবে, হে গৌতম, বলিব তোমারে
সনাতন গুহ্য ব্রহ্ম কথা
এবং মৃত্যুর পর আত্মার গতি হয় যথা ॥ ৬ ॥

শরীর গ্রহণ তরে যোনিতে প্রবেশ করে
কত জীবগণ
স্থাবর কেহ বা হয় কর্ম্মফল জ্ঞানফল
যাহার যেমন ॥ ৭ ॥

বহুবিধ কামনারে করেন নির্ম্মাণ
যে পুরুষ সুপ্তি মাঝে জাগ্রত রহিয়া
তিনি শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত
সর্ব্বশাস্ত্রে গিয়াছে কহিয়া।
অতিক্রম কেহ তাঁরে করিতে না পারে
সর্ব্বলোক স্থিত সে আধারে।
ইনি সেই ॥ ৮ ॥

একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহু রূপ হ'ন
সর্ব্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী,
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন ॥ ৯ ॥

একই বায়ু ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্ব্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন ॥ ১০॥

সর্ব্বলোক-চক্ষু-সূর্য্য অশুচি-দর্শনে যথা
না হ'ন মলিন
সর্ব্বভূতস্থিত আত্মা নির্লিপ্ত তেমনি
জাগতিক দুঃখমাঝে স্বতন্ত্র অ-লীন ॥ ১১ ॥

সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা, এক যিনি, নিয়ন্তা সবার,
আপনার একরূপে করেন বহুধা
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়,—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা ॥ ১২ ॥

অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক, কাম্য যিনি করেন বিধান
তাহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়,—তাঁহারাই চিরশান্তি পান ॥ ১৩॥

অনির্দ্দেশ্য আনন্দ পরম
"এই তিনি"—বলি যাঁরে জানে যোগীজনে,
জানিব কেমনে তাঁরে? তিনি কি স্বয়ম্প্রভ?
অথবা প্রদীপ্ত হ'ন অন্যের কিরণে? ॥ ১৪ ॥

সূর্য্য চন্দ্র তারকার নাহি সেথা আলো
বিদ্যুৎ বা অগ্নি তাঁরে নারে প্রকাশিতে
তিনি দীপ্যমান তাই অনুদীপ্ত সব
সমস্তই উদ্ভাসিত তাঁহার জ্যোতিতে ॥ ১৫ ॥

(ক্রমশঃ)

বসুধারা

স্বামী সূত্রানন্দ

এক দিন, দুদিন—ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন যাবৎ বসে আছি বদ্রীনাথে, বৃষ্টি আর ধরছে না। যদি বা বৃষ্টি থামছে, পাহাড়ের গলিত বরফ ঝরে পড়ছে, কিন্তু আকাশ আদৌ পরিষ্কার হচ্ছে না। অবশেষে ষষ্ঠ দিনে ভোরবেলা অরুণোদয় হ'ল। চূড়াবলম্বী সুরঞ্জিত প্রভাত-কিরণে গিরিরাজের তুষারধবল অঙ্গে সৌন্দর্য আর ধরে না। চারিদিক আনন্দময়—যে যার কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। 'জয় বদ্রিবিশাল লাল কি জয়' বলে দলে দলে লোক রাস্তায় বের হয়ে পড়ছে। সবাই ঘরমুখো—নীচে নামছে।

আমরাও 'জয় বদ্রিবিশাল লাল' বলে নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়—তবে নীচের দিকে নয়—উর্ধ্বাভিমুখী। যাব ওখান থেকে সাড়ে চার মাইল উপরে বসুধারায়। আমরা মোট যাত্রী-সংখ্যা ছিলাম এগার জন। তিনজন বেরিলি-নিবাসী এবং ৭ জন বোম্বেওয়ালা। নদীতীরস্থ রাস্তা ধরে আমরা পূর্ব দিকে রওনা হলাম, ডান পাশে 'ব্রহ্মকপাল'—যেখানে পিণ্ডদান বা তর্পণ করলে আর কোথাও করতে হয় না। গয়া আদি তীর্থস্থানের পিণ্ডদানের ফল অপেক্ষা এখানে নাকি কোটিগুণ বেশী ফল লাভ হয়। দুদিকে আবাদী জমি, তার মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা। সেই মস্ত মাঠটার উপর থেকে হিমশিলাখণ্ড অপসারিত হতে না হতেই চাষীরা তাদের পাহাড়ীয়া লাঙ্গল দিয়ে তার বুকটাকে চিরে ফালি ফালি করে দিচ্ছে। প্রায় ১॥০ মাইল হেঁটে যখন

শঙ্খক্ষেত্র-বাহী সাধারণ পথ অতিক্রম করলাম তখন বাঁ দিকে পেলাম 'মাতা' মন্দির। ছোট মন্দিরের চারিদিকে তখনও কিছু কিছু বরফ রয়ে গেছে। মন্দিরে প্রস্তরমূর্তি বেশ সুন্দর, কিন্তু ইনি যে কোন্ দেবতা তা কেউ বলতে পারে না। হয়তো শক্তির আরাধনাই এখানে করা হয়। দেবী দর্শন করে আমরা অগ্রসর হলাম গন্তব্যস্থলে। ডানদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল অলকানন্দার উপর ঝোলা-সেতু। অতি জীর্ণ। প্রায় সব কাঠই খসে পড়ে গিয়েছে—আছে শুধু লোহার দড়িগুলো। হাঁটতে দোলে—নীচে তরঙ্গিনীও আবার খরস্রোতা ফেনিল-কল্লোলপূর্ণ, কারণ একটু উপরেই একটি সঙ্গম। এ বৈতরণী অতিক্রম করতে হবে বলে অনেক যাত্রী এখান থেকেই ফিরে আসেন—বসুধারা যাওয়া হয় না। আমাদের ৭ জন সাথী এখানে কেটে পড়লেন। যা' হোক, বাকী চার জন কোন প্রকারে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম। অপর পারে মানাগ্রাম। আদিবাসী সবই তিব্বতী। এ গ্রামই এ দিককার উত্তর সীমানায় শেষ ভারতীয় জনপদ। কিন্তু সীমারেখা আরো ৩০ মাইল দূরে। শুনলাম ৫ দিনের পথ। ৫০ মাইল দূরে আছে তিব্বতের বস্তি। গ্রামের উপরের পর্বত "স্বর্গারোহিণী"তেই বিখ্যাত মানা পাস। এদিকে মানস সরোবর যাবারও একটি পথ আছে। এ পথে দূরত্ব কম কিন্তু অত্যধিক বিপদের সম্ভাবনা। প্রবাদ আছে পঞ্চপাণ্ডব এই স্বর্গারোহিণী পর্বত অতিক্রম করেই মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

গ্রামের উত্তর সীমাতে কেশব প্রয়াগ। দক্ষিণাভিমুখা অলকানন্দার সহিত পশ্চিমগামিনী সরস্বতীর সঙ্গম। অতি মনোরম এ সঙ্গমটি। পশ্চিমে নীচু সেই আবাদী জমি—পূর্বে জনপদ আর উত্তরে তুষার-ধবলমৌলী পর্বতের শোভা—তারই মধ্যস্থলে কর্দমাক্ত সাদা অলকানন্দার সঙ্গে নীল সরস্বতীর মিলন। কিন্তু মিলিত হ'লেও কিছুদূর না যাওয়া পর্যন্ত মা সরস্বতী তাঁর নিষ্কলঙ্ক দেহ মলিন হতে দেন নি। আমরা স্কুল গৃহের পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে আবার সরস্বতী অতিক্রম করলাম। এবার আর জরাজীর্ণ পুল নয়—এ পুল স্বয়ং বিশ্বকর্মার স্বহস্তে নির্মিত। প্রকৃতি এখানে নদী মধ্যবর্তী দুটী পাহাড়ের যোগাযোগ এমনভাবে করেছেন যে, অনেকেই বুঝতে পারে না—যে এ মানুষের হাতে-গড়া পুল নয়।

সরস্বতী পার হয়ে আমরা আবার অলকানন্দার পূর্ব তীর ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলাম। এখানের দৃশ্যাবলী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। জনমানববিহীন—এমন কি প্রায় পশুপক্ষীবিহীন হিমালয়ের এই নিভৃত প্রদেশে যেন নিজের অস্তিত্বেরও স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। নদীর দু পারে উচ্চ হিমগিরি—যেন গলিত রৌপ্য। রাস্তার এপাশে ওপাশে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভেঙে পড়া পাহাড়ের ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে মধ্যে আবার বরফের চাঙর। যেখানে পাথর নেই, বরফও নেই সেখানেই কত সদ্যপ্রস্ফুটিত রং বেরংয়ের মনোহর কুসুমনিচয়। সম্মুখে দৃশ্যপটের অন্তর্ভুক্ত যা আছে—রজতশুভ্র—একরূপ। ও রূপের অতীত ও আগামী কালেতে কোন ভেদাভেদ নেই। তখনও আমাদের সম্মুখে ২ মাইল রাস্তা। ক্রমশঃ চড়াই। সবারই বুক ধরেছে। একটু দম নিয়ে আবার চললাম। কি শীত! বেলা ১০টা বাজে—বেশ রৌদ্র। কিন্তু কন্‌কনে হাওয়া। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসছে। সূতী, পশমী, রেশমী কোন পোষাকেই শীত ঠেকাতে পারছে না। আরো এক মাইল চলার পর একটি তৃণাচ্ছাদিত ও কুসুমাস্তীর্ণ সুন্দর মাঠ পাওয়া গেল। সেখানে তিন চারিটা তাঁবু

খাটিয়ে তিব্বতী লোক বাস করছে। ছাগল, গরু, ঘোড়া চরাচ্ছে। বসুধারা এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। সকলেই খুব উৎসাহের সহিত এগিয়ে যাচ্ছি।

এখানে একটি বরফের নদী অতিক্রম করতে হয়। জমাট বাধা তুষারের নীচে দিয়ে সেই বসুধারার প্রবাহিণী প্রবাহিত হয়ে গিয়ে অলকানন্দায় পড়েছে। সমতল নয় ঢালু। খুবই বিপজ্জনক। পা একবার পিছলে গেলেই একেবারে অলকানন্দায়! এখানে আমাদের সাথী আরো দুজন বসে পড়লেন। আমরা বাকী দুজনও যেতে পারতাম না, যদি চোখের সামনে আর একদল যাত্রীকে বসুধারা দর্শন করে ফিরে আসতে না দেখতাম এবং তাদের উৎসাহবাক্য না পেতাম। তাঁরা বললেন—"কষ্ট করে যখন এতদুর এসেইছেন, তখন এইটুকু রাস্তার জন্য ফিরে যাবেন? আমরা এ রাস্তায় ত যাতায়াত করেছিই—এই দেখুন আমাদের একজন সঙ্গী সাধু নিঃসঙ্গ হয়ে চলে যাচ্ছেন শতপন্থ।" আমরা ভয়ে ভয়ে সেই হিমানীর উপর নেমে পড়লাম। কিছুদুর যেতে না যেতেই সেই ভদ্রলোক দেখি গড়িয়ে যাচ্ছেন নিম্নাভিমুখী। কোন প্রকারেই পা সামলাতে পারছেন না। হাত পা দিয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছেন —পারছেন না, উপর থেকে অন্য যাত্রীসকল চিৎকার করছে। যাক, ভাগ্য ছিল ভাল—তিনি ছিলেন আমার উপরে। গড়িয়ে এসে শেষে আমার উপর ঠেকলেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। দণ্ডটি বেশ করে পুঁতে দৃঢ় হস্তে তাঁকে ধরলাম। একটু শান্ত হয়ে—আমার যষ্টীতে একে একে কায়দা মাফিক পা ফেলে দুজনই পার হলাম। তিনি ছিলেন একটু বয়স্ক। বেরিলির পশুবিদ্যালয়ের একজন উচ্চ কর্মচারী, নাম—এম, এন, উপাধ্যায়। বেশ সাহসী ও উৎসাহী।

বসুধারাতে পৌছলাম। প্রচণ্ড ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঝরে পড়ছে। এত উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে যে তার অর্ধেক জল বাষ্পাকারে ও বৃষ্টির আকারে উড়ে যাচ্ছে। সে ধারাতে স্নান করবার মত সাহস হল না—তবে সে বৃষ্টিতে ভিজেছি। শীত ত ছিলই—তাছাড়া সে সময়ে বসুধারার জলে নামা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কিছুদিন পরে আরও বরফ গললে নামা যেতে পারে। সঙ্গে পাত্র ছিল, পবিত্র ধারার জল কিছু নিয়ে আমরা নীচে নেমে আসলাম।

বসুধারা থেকে আরও দেড় মাইল দু-মাইল উত্তরে অলকাপুরী। সে নয়নাভিরাম দৃশ্য এখান থেকে দেখেই তৃপ্ত হলাম। যেতে সাহসী ছিলাম কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না। ওখানে যেতে হলে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। রাস্তায় কিছু পাবার আশা নেই। এক দিনে গিয়ে বদ্রীনাথে ফিরে আসা—তাও সম্ভব নয়। অলকাপুরীর স্বর্গীয় শোভা অত্যন্ত সুন্দর। মধ্যস্থলে যেন বিভূতিভূষিত বা ঘৃত-সিক্ত হয়ে স্বয়ং কেদারনাথ বসে আছেন, অথবা সমুদ্রমন্থনের মন্থনদণ্ড পাষাণকায় মন্দরগিরিসদৃশ অচল অটল এক পর্বত ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হয়ে উর্ধ্বদিকে উঠেছে। তার পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি প্রশস্ত উপত্যকা বহুদুর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পূর্ব উপত্যকাটির বুকের উপর দিয়ে নেমে এসেছে গিরিনদী অলকানন্দা। পশ্চিম উপত্যকা তার অঙ্গে শুভ্র বরফের শয্যা সাজিয়ে চলে গেছে শতপন্থ। উপত্যকা দুটির পর পর আবার হিমগিরি গগনস্পর্শী শৃঙ্গ উন্নত করে দণ্ডায়মান। সেই শোভা দেখলে মনের মধ্যে একটা কেমন পরিপূর্ণতার উদ্রেক করে, তা বর্ণনার বস্তু নয়—অনুভবের। শতপন্থ ওখান থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী একটি মনোরম হ্রদ।

বসুধারা মাহাত্ম্য :—শাস্ত্রে আছে, অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে ভগবান বশিষ্ঠ ক্ষণমাত্র ধ্যান করে বললেন—"এই সর্ববেদময় ও বেদধারাময় তীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি-নিবারক, পিতৃপুরুষের মুক্তি-দাতা এবং সম্পূর্ণ পাপনাশক। পাপীদের মস্তকে উহার জলবিন্দু কখনই পড়ে না। হে বরাননে! এখানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। এইস্থানে ধর্মশিলা নামক শিলা আছে যেখানে আট বৎসর ধরে আট লক্ষ জপ করলে বিষ্ণুর রূপ প্রাপ্তি হয়। সর্বতীর্থফলদাতা সোমতীর্থ বিখ্যাত। চন্দ্রের সহিত ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হে মহাভাগে! পূর্বে এখানে চন্দ্র তপস্যার প্রভাবে সর্বলোকদুর্লভ অতি সুন্দর রূপ পেয়েছিলেন। সর্বলোকদুর্লভ সত্যপদতীর্থ এখানেই অবস্থিত; স্নান, জপ ও দান করলে অনন্ত ফলপ্রাপ্তি হয়।"

গঙ্গার বাঁধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ঘুচাতে দৈন্য সব মালিন্য
আবার দেশশ্রীর,
ভাগীরথী বাঁধা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
করণীয় বাঙালীর।
সর্ব্ব অগ্রে করিতে হইবে তাই,
তাহা বিনা আর অন্য পন্থা নাই,
অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে
পুনঃ সুরধুনী নীর।

২

পেয়েছি এ ধারা মহামানবের
কঠিন তপস্যায়,
মহাকাল-জটা নিঙাড়িয়া আনা
বঙ্গের আঙিনায়।
পরাধীনতার বেড়ি খসে গেছে আজ,
ধৌত করিয়া সব গ্লানি, সব লাজ,
বহাতে হইবে দিব্য ও স্রোত
উচ্ছল মহিমায়।

৩

ভাগীরথী লয়ে ঘর করি মোরা,
আমাদের ভাগীরথী,
মর্ত্ত হইতে স্বর্গ যাবার
সোপান স্রোতস্বতী।
শ্রেষ্ঠ মোদের বিত্ত দেবোত্তর,
দাবী ও ধারার প্রতি বিন্দুর পর,
সলিলরূপা ও লক্ষ্মী মোদের
সব অগতির গতি।

৪

গঙ্গামাটির বঙ্গ মোদের
কান্তিমতী এ ধরা,
আমরা মাটির মানুষ কিন্তু
গঙ্গামাটিতে গড়া।
আমরা শরীরী জল-বিদ্যুৎ তাঁর,
আগুলি রাখিব পুণ্য সলিল ধার,
কল্পতরুর তলে বাস করি
ফলে আছে অধিকার।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি*

ইডা আন্‌সেল

(২)

[পূর্বপ্রকাশিত অংশের (উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৯) চুম্বক :—

১৮৯৯ সালের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাবার সময় তাঁর অন্যতম গুরু-ভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাশ্চাত্য দেশের কাজে সহায়তার জন্য নিয়ে যান। প্রথমে ডেট্রয়েটে এবং পরে সান্‌ফ্রান্‌সিসকোতে তুরীয়ানন্দজী কাজ আরম্ভ করেন। আন্তরিক আগ্রহবান ধর্মজীবনযাপনেচ্ছুগণের ধ্যানধারণাদির সুবিধার জন্য শহর থেকে দূরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। মিস্ মিনি সি বুক্, সান্ অ্যান্টন উপত্যকায় পুরোণো একটি কাঠের ঘরসহ তাঁর এক খণ্ড জমি এই বাবদ দিতে চাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র ও ছাত্রী সেই জায়গায় গিয়ে আশ্রমটি গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে এক সন্ধ্যায় রওনা হলেন এই অভিযাত্রিকদল দুর্গম পথে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত পরিবেশের উদ্দেশে। লেখিকাও ছিলেন এই দলের একজন। পার্বত্য ও আরণ্য পথের বহু কষ্ট সয়ে তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা পরে পৌছুলেন গন্তব্যস্থানে। মনোরম নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের পবিত্র আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ তাঁদের সকল শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর করে দিল।]

এর পর সব কিছুরই সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত রইলাম। কাঠের একখানি ছোট কুঠরি আর একটা তাঁবু পাওয়া গেল রাত কাটাবার জন্যে। এগারো জন লোকের পক্ষে খুবই অপর্যাপ্ত; কিন্তু আমাদের সেটা সমস্যা বলেই মনে হল না। বর্ষীয়সী দুইজনকে ঐ কুঠরিটি দেওয়া হ'ল। আগুনের কুণ্ডটার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে ডাঃ লোগ্যান শুয়ে পড়লেন। ধীরা (মিসেস্ বার্থা পিটারসন্) আর আমি উপত্যকাটির কিছুদূর নীচে একটা খড়ের গাদা আবিষ্কার করে ফেললাম। বললাম, ঐ খড়ের গাদাতেই আমরা শোব। অপরদেরও আমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু মিসেস্ এমিলি অ্যাস্‌পিনাল (Emily Aspinal) ও শ্রদ্ধা, মিস্ বুক্ আর মিস্ বেলের সাথে তাঁবুর মধ্যে থাকাই সিদ্ধান্ত করলেন। কেবল মিঃ ক্রুরব্যাক্ ও আমাদের পরম স্নেহময় আচার্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী আমাদের আমন্ত্রণ রাখলেন। খড়ের গাদাটির এক পাশে ওঁরা দুজন এবং অপর পাশে আমি আর ধীরা শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে গল্প চলল। কারো চোখেই ঘুম নেই। সুদূর এই জনমানবহীন স্থানে আমাদের দলের অভিনব পরিস্থিতি সকলেরই চিত্তে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল। তন্দ্রা আদৌ আসবার কথা নয়। প্রত্যেকের একখানি করে পাতলা কম্বল ছিল; রাত কাটানর পক্ষে যথেষ্ট, কারণ রাতটা ছিল গরম আর পোষাক-পরিচ্ছদও আমরা কেউ খুলিনি। আমাদের যেন আনন্দের সীমা ছিল না। শেষ রাতের দিকে ঘন্ কুয়াসা পড়েছিল, এটা ঐ সময়ে খুবই অস্বাভাবিক।

* হলিউড্ বেদান্ত-কেন্দ্রের 'Vedanta and the West' পত্রিকার Sept-Oct, 1952 সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত।

সে রাত্রি ঐভাবে কাটলো। ঠাণ্ডায় ধীরা ও আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে আশঙ্কায় পরের দিন থেকে আর আমাদের বাইরে শুতে দেওয়া হল না। অপর চার জন মহিলার সঙ্গে আমাদেরও তাঁবুতে শোবার আদেশ হল। মিঃ রুরব্যাক্ ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী কিন্তু যথারীতি খড়ের গাদার উপরেই রাতে শুতে লাগলেন। সবদিক গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে নিতেই কেটে গেল কয়েকদিন।

আজ বার্ধক্যের প্রান্তে এসে ভক্তদের যখন কোন ছোটখাট অসুবিধার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখি, তখন আমার মনে মনে হাসি পায়। মনে পড়ে যায় সেই সুদূর অতীত ঘটনাগুলির কথা। কতই না অসুবিধা আমরা প্রথমে ভোগ করেছিলাম—কিন্তু ক্রমশঃ মোটামুটি সব অভাবই আমাদের কি ভাবে পূরণ হয়ে গিয়েছিল!

ছয় মাইল দূরে একটি কুয়ো থেকে পিপে ভর্তি করে জল আনা হত। এক পিপে জলের দাম পড়ত পঁচাত্তর সেণ্ট্। কয়েকদিনের মধ্যে তিনটি ঝরণার সন্ধান পাওয়া গেল। এদেরই একটাকে পরিণত করা হল কুয়োতে। আমাদের 'বালতি-বাহিনী'র সভ্যেরা রোজ সকালে প্রাতর্ভোজনের আগেই আধ মাইল সরু রাস্তা ধরে চলে যেতেন ঐ কুয়োর কাছে। সারাদিনের প্রয়োজনের জন্য প্রত্যেকেই এক এক বালতি জল বয়ে আনতেন। কাপড় জামা কাচা প্রভৃতি করতে হত ঐ কুয়োতলাতে গিয়ে আর ওসব রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হত ঝোপঝাড়ের উপর মেলে। স্নানাদি করতে খুব ভোরেই পুরুষেরা চলে যেতেন ঐ কুয়োতে। মেয়েরা স্নান করতেন তাঁদের তাঁবুতে।

মিস্ লুসি বেক্হাম্ (Miss Lucy Beckham) আর মিস্ ফ্যানি গাউল্ড (Miss Fanny Gould) কয়েকদিন পরেই এসে পৌঁছুলেন। মাউন্ট হ্যামিল্টনে আমাদের ফেলে আসা জিনিসগুলোও ক্রমে এসে গেল। ছোট একটি চালাতে আমাদের রান্নাঘর করেছিলাম, আর রান্নাঘরের ছাদ থেকে কাঠের ঘরটার উপর পর্যন্ত একটা ক্যাম্বিস কাপড় ঝুলিয়ে তার তলায় আমাদের বাইরের খাবার ঘর তৈরী হল।

মিঃ রুরব্যাক্ তক্তা দিয়ে কয়জন লোকের বসার মত একটি খাওয়ার টেবিল তৈরী করে ফেললেন। রান্না চালার তলায় জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার জন্য মাটি খুঁড়ে ফেলে একটা ভূগর্ভ-ভাণ্ডার তৈরী হল। প্রধানতঃ আহারের ব্যবস্থা ছিল নিরামিষ; তবে ডিম, মাছ পনীরও খাওয়া হত। দুধ পেতাম মিঃ গারবারের পাঁচ মাইল দূরবর্তী খামার থেকে। আমরা দুধ ও মাখন একটা তারের জালতির বাক্সের মধ্যে পুরে দক্ষিণ দিককার একটি গাছের নীচে ঝুলিয়ে রাখতাম। আর সেগুলো ঠাণ্ডা রাখার জন্য বাক্সটির চার পাশে জড়িয়ে দিতাম ভিজে কাপড়। রান্নাবান্না, রুটি সেঁকা এবং বাসনপত্র ধোয়ার কাজ ভাগ করা থাকত। মেয়েরা সকলে কাজ করতেন দুজন দুজন মিলে। পুরুষদের ভাগে পড়তো ভারী-ভারী কষ্টকর কাজগুলো, যেমন কাঠ জোগাড় করা, কাঠকাটা, এবং কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করার জন্য মিঃ রুরব্যাককে সাহায্য করা। প্রত্যেককে নিজের তাঁবু ঠিক রাখতে হত। রাঁধুনীদের হাতে ছিল রান্নাঘরের দায়িত্ব। আমি দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা ছিলাম বলে আমার উপর আচার্যদেবের তাঁবুর সমস্ত ভার ন্যস্ত ছিল। আসবাবপত্র ছিল ছোটখাট কয়েকটি ক্যাম্প-খাট, টুল, চেয়ার খানকতক আর কাপড়চোপড় রাখবার জন্য কাঠের দুএকটা বাক্স। ভিতরকার আলোর জন্যে ছিল মোমবাতি আর তেলের প্রদীপ বাইরে যেতে হ্যারিকেন ব্যবহার করা হত।

প্রথমেই ধ্যানঘর তৈরী করার কথা হল। অনতিবিলম্বে মিঃ রুরব্যাক এর নির্ম্মাণকার্য আরম্ভ করে দিলেন। অমসৃণ তক্তার একটা চৌকো ঘর, তিন দিককার জানলাই বাইরের দিকে খোলা। পরে এই ঘরের মেঝে ঢাকবার জন্য খড়ের মাদুর পাওয়া গিয়েছিল। একটা গোলাকার ছোট কাঠের উনান জ্বেলে ঘরটি গরম রাখা হত। আমাদের উপাসনার বেদী তৈরী হল দাবাখেলার চৌনা ছক-টেবিল দিয়ে। তার ওপর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং ফুলদানি আর ধূপাদি জ্বালার ব্যবস্থা। কোন আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা হ'ত না। প্রাচ্য রীতির মধ্যে শুধু একটিই পালিত হত—বাইরে জুতো খুলে রেখে উপাসনা ঘরে প্রবেশ করা।

এর পরে দুখানা বেঞ্চ তৈরী করে ঘরের বাইরে, দরজার দুপাশে পেতে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সবাই বসে জুতো খুলতে পারেন। আরও পরে বর্ষাকালে এই প্রবেশ-পথটির উপরে ক্যাম্বিসের একটা আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। ধীরা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বসবার ক্যাম্বিসের কুশনটিতে 'শান্তি'—এই কথাটি সূচিকর্ম্মসাহায্যে তুলে দেন। শিষ্যেরা আসনপিঁড়ি হয়ে বসবার জন্যে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী আসন পেতে বসতেন। কেউ বসতেন নীচু বাক্সর ওপর, কেউ বা পাইন পাতায় ভর্তি বিভিন্ন আকারের কুশনে। দরজার উল্টো দিকের জান্‌লার নীচে ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বসবার স্থান।

আমরা সকলে দেয়ালের চারদিকে বসতাম। অশ্বচালক যেমন ঘোড়াকে আয়ত্তে রাখার জন্য রাশ টেনে ধরেন, স্তবোচ্চারণের আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ ঠিক তেমনি করেই আমাদের এই ব্যূহটার উপর দিয়ে নিজের দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করে নিতেন। তারপর সুর করে আবৃত্তি আরম্ভ করতেন; উপাসকমণ্ডলীর সব অস্থিরতা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আবৃত্তি চলতো। একদিন জনৈক তাঁকে শুধালেন,—"এই আবৃত্তির তাৎপর্য কি?" তিনি উত্তর দিলেন,—"এ হচ্ছে অস্থির মনের গতিকে কশাঘাত করে আপনার বশে আনা।" আবৃত্তির ঝঙ্কারের সাথে সাথে আমাদের মনও স্থির হয়ে আসত। ঘণ্টাখানেক পরে স্বামিজীর কণ্ঠে যখন আবার স্তবধ্বনি গুণগুণিয়ে উঠত তখন মনে হত—এ সুরধারা যেন কোন এক সুদূর রাজ্য থেকে আসছে ভেসে। কদাচিৎ আমরা এই পুরো এক ঘণ্টা সময় ধীর ও শান্ত ভাবে বসে থাকতে পারতাম। মশা, মাছি এবং আরও সব পোকামাকড় আমাদের বেশ ব্যতিব্যস্ত কোরতো। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দকে এরা কখনও বিচলিত করতে পারত না। বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধে কোন হুঁশই থাকতো না তাঁর। একটা দারুণ বিষাক্ত পোকা এক দিন তাঁর হাতে দিল বিঁধে। ঐ জায়গাটা পরে ফুলে উঠ্‌তে লাগলো। পরের দিন সকালে সারা হাতখানাই স্ফীত হয়ে উঠল ভীষণভাবে। আমরা সবাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। সব চেয়ে কাছের ডাক্তারটি তো থাকেন পঞ্চাশ মাইল দূরে। সেখানে যাবার কোন যানও নেই—একটি দু-চাকার গাড়ী ছাড়া। যে ঘোড়া ঐ গাড়ী টানবে সে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছে দূরের বিরাট মাঠগুলোয়। একে ধরে এনে গাড়ীতে জুততে হলে বহু লোকের সমবেত চেষ্টার দরকার! যাহোক এই সময় হঠাৎ একটা যেন যাদুর মত ব্যাপার ঘটে গেলো। নিউইয়র্কের একটি তরুণ ডাক্তার আশ্রমে আসবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন; পত্রাদি লিখে যানবাহনের যথাযথ বন্দোবস্ত করার সময় পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারলেন না। লিভারমোর থেকে পঞ্চাশ মাইল রাস্তা হেঁটে ঠিক আমাদের এই বিপদের সময়টিতে তিনি উপস্থিত হলেন যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দের পীড়িত হাতখানির সেবার জন্যেই! তিনি পৌঁছে তাঁর ছোট ব্যাগটি থেকে কিছু ওষুধপত্র বের করে ওঁর হাতে লাগিয়ে দিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একজন অত্যন্ত অনুরাগী শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন। আচার্য এঁর নাম দেন আত্মারাম—আত্মাতেই যার পরম আনন্দ। (ক্রমশঃ)

কর্ম্মের প্রকারভেদ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে কর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কর্ম্মানুষ্ঠান আমাদের ইহ-জীবনের অপরিহার্য্য ব্রত। কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ, বৈধ ও অবৈধ। বৈধ কর্ম্ম করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়; অবৈধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হয়। বৈধ কর্ম্ম তিন প্রকার: (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক এবং (৩) কাম্য। সন্ধ্যা-বন্দনা, পিতামাতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম না করিলে পাপ সঞ্চয় হয়। কোন নিমিত্ত বা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গাদি অভীষ্ট ফল লাভ হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম। নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিলে কোন না কোন অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ আছে, তাহাকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে, যেমন নরহত্যা, পরস্ত্রী-গ্রহণ ইত্যাদি।

বৈধ কর্ম্মের ফল,—স্বর্গ, অর্থাৎ সুখ ও শান্তি। অবৈধ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল,—নরক অর্থাৎ নানাবিধ দুঃখভোগ। স্বর্গ ও নরক আমাদের মনে। ইহজীবনেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল ও কুফল সদ্য সদ্য ঘটে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বে ঘটে। সুকর্ম্ম ও কু-কর্ম্মের যে সকল ফল ইহ-জীবনে ঘটে না, বহু লোকের বিশ্বাস, তাহা পরজন্মে ঘটে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

পুণ্যকর্ম্ম-হেতু স্বর্গ এবং পাপকর্ম্ম-হেতু নরক,—এই দ্বিবিধ কর্ম্মবন্ধই সৃষ্টির নিমিত্ত। তদ্ভিন্ন সৃষ্টি বৈচিত্র্যবিহীন হয়। বিধাতার উদ্দেশ্য, বোধ হয়, তাহাতে সিদ্ধ হয় না। সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে, পুণ্যকর্ম্মফলে সুখ ও শান্তি এবং পাপকর্ম্মফলে দুঃখ ও দুর্দ্দশা ঘটে। এই জন্য সুখার্থী ব্যক্তি অতিশয় যত্নসহকারে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান-ফল যদি ইহজীবনেই শেষ হইত, এবং একটি মাত্র জীবনেই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য নষ্ট হইত। বৈচিত্র্য-হীন সৃষ্টি নিস্ফল। বৈচিত্র বিধানের উদ্দেশ্যেই বিশ্বস্রষ্টা "একমেবাদ্বিতীয়মের' এক হইতে বহু হইবার বাসনা ও বিলাস। বহুর সৃষ্টি। ইহাই তাঁহার লীলা।

এই কারণেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি; এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রুচির লোকের বিভিন্ন কর্ম্মের বিধান। এই জন্য গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ ও বৈচিত্র্য; প্রধানতঃ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি প্রধানতম শ্লোকার্দ্ধ এখানে উল্লেখযোগ্য:—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল; এবং বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন ভোগ। সকল কর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার ফলভোগ ইহজীবনে সম্ভবপর নহে। এই জন্য এই জগৎ-প্রপঞ্চ; অর্থাৎ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পৌনঃ-পুনিক লীলা-বিলাস। ইহজীবনের কৃতকর্ম্মের ভুক্তাবশেষ ফল-ভোগের নিমিত্ত পুনর্জ্জন্ম। শাস্ত্রে আছে পাপভোগের অবসানে, এই সংসারে জীবের অনেকবার জন্ম হয় এবং পুণ্যভোগের

অবসানেও জীবের অনেক পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা হয় না। আমরা অন্যান্য ধর্ম্ম-পুস্তকের প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি উৎকলন করিব :

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ। জাতমাত্রের মরণ নিশ্চিত এবং মৃতেরও পুনর্জ্জন্ম নিশ্চিত। পুনশ্চ :—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

(গীতা ২।১৩)

দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি, অর্থাৎ মৃত্যু—মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মও তদ্রূপ। ভারত ব্যতীত অন্যান্য অনেক দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে পুনর্জ্জন্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে পুণ্যরূপ কর্ম্মের এবং পূর্ব্বজন্মকৃত পাপানুসারে পাপ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গভোগের পর পুণ্যস্থলে জন্মগ্রহণ করে এবং পাপকর্ম্মের ফলে জীব নরকভোগের পর কুৎসিতস্থলে জন্ম পরিগ্রহ করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী মূঢ়গণ জন্ম-জন্ম তির্য্যক কিংবা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। সর্ব্ব-প্রযত্নে এই তিনটিকে সংযত করিতে না পারিলে, পুনঃ পুনঃ নরকভোগ করিতে হয়। প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের ইতরবিশেষে জীব পুণ্য ও পাপশীল হয়। সত্ত্বগুণের প্রভাবে লোকে পুণ্যশীল এবং সুখশান্তি ভোগ করে। রজোগুণের প্রভাবে লোকে লোভ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মে আসক্ত হয়। তমোগুণের প্রভাবে লোকে প্রমাদ ও মোহে নিবদ্ধ হয়। রজ ও তমকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণের উদয় হয়, সত্ত্ব এবং তমোকে পরাভূত করিয়া রজোগুণের প্রাবল্য ঘটে এবং সত্ত্ব ও রজকে পরাভূত করিয়া তমোগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব জীবকে সুখে, রজ জীবকে কর্ম্মে এবং তম জীবকে মোহে নিবদ্ধ করে। এই গুণত্রয়ের ইতর-বিশেষে জীব সদসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। স্থূলতঃ, বৈধ কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়। জীব সেই পুণ্যবলে উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া পিতৃ কিংবা দেবলোকে তাঁহাদিগের সহিত সুখভোগ করে। সাধারণতঃ জীব মিশ্র কর্ম্ম করে। সুতরাং পুণ্য কর্ম্মের যথোপযুক্ত ফলভোগের অবসানে, সে মর্ত্ত্যলোকে উত্তম গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। পক্ষান্তরে, অবৈধ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মকারীদিগের পাপ সঞ্চয় হয়। সেই পাপের পরিমাণানুযায়ী জীব নরক ভোগ করে। তৎপরে সে ইহলোকে অধম গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় পাপ-কর্ম্মে নিরত হয়। কিন্তু জীব যদি পাপের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ ঘটে; এবং মোহ কিংবা প্রমাদ বশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেও তৎকৃত পুণ্য-কর্ম্মফলের কোন হানি ঘটে না। গীতায় আছে, 'কল্যাণকৃৎ' কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

"যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ অর্জ্জিত পুণ্যফলে স্বর্গভোগ করিয়া পরে শুচি ও শ্রীমান, অর্থাৎ পূতচরিত্র লোকের গৃহে, অথবা যোগী ও জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহে, দুর্লভ জন্ম লাভ করে। তথায় পূর্ব্বদেহজাত ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ অনুশীলন করিয়া মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হয়। অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদেহ-জাত অভ্যাসই তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। কোন অন্তরায় ঘটিলেও তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির হানি ঘটে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর

হয়।" পক্ষান্তরে পাপকর্ম্মশীল লোকের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইলে, তাহার অধোগতি ঘটে।

প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, এবং ক্রোধ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে অগ্রাহ্য করিয়া সৎপথবর্ত্তী সাধুদিগের হিংসা করে। সেই সকল ক্রূর নরাধম ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ তির্য্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বর কাহাকেও পাপ দেন না কিংবা কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না। কেহ তাঁহার দ্বেষ্যও নহে, কেহ তাঁহার প্রিয়ও নহে। তিনি নিরপেক্ষ। তাঁহার নিকট সকলেই সমান। জীব স্ব স্ব কর্ম্মফলে, উত্তম অথবা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি ও বিবেক দিয়াছেন, যাহা দ্বারা আমরা সহজেই কর্ম্ম নিরূপণ করিতে পারি। কর্ম্ম-নিরূপণ হেতু, শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কর্ম্মরহস্য দুজ্ঞের্য়। কোন্‌টি কর্ম্ম এবং কোন্‌টি অকর্ম্ম—এ বিষয়ে বিবেকিগণও বিভ্রান্ত হন। গীতায় কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম,—এই তিনের উল্লেখ আছে,—

কর্ম্মণোহ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
(গীতাঃ ৪।১৭)

কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম—এ তিনেরই তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। কর্ম্ম বলিলে আমারা বিহিত কর্ম্ম বুঝি। বিহিত কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। নিষিদ্ধ কর্ম্মই বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম অর্থ কর্ম্মত্যাগ। যাঁহারা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত হন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই; কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে দৃঢ় নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহাকেই নৈষ্কর্ম্ম্য আখ্যা দিয়াছেন। সংসারে মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা অতি অল্প। মুখ্যতঃ, জীবমাত্রই প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত। সুতরাং, সকাম কর্ম্মই আমাদের উপজীব্য। গৃহীমাত্রই সকাম কর্ম্মে লিপ্ত। সকাম কর্ম্ম দ্বিবিধ, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয়। স্নানাহার, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্বাভাবিক কর্ম্ম। সন্ধ্যাহ্নিক, পূজা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। বিহিত ও নিষিদ্ধ হিসাবে, এই কর্ম্মদ্বয় শ্রৌত ও স্মার্ত্তরূপে বিভক্ত। সুতরাং কর্ম্মের বিভাগ হইল অষ্ট প্রকার। বেদোক্ত কর্ম্ম শ্রৌত; এবং স্মৃতি-বিহিত কর্ম্ম স্মার্ত্ত। ইতিহাস, পুরাণ এবং মন্বাদি প্রণীত সংহিতাদি স্মৃতি নামে পরিচিত। এগুলি বেদ-বিরুদ্ধ নহে। শাস্ত্রবিহিত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম; উভয়ই পুনরায় চতুর্ব্বিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত। সন্ধ্যাবন্দনাদি, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য শ্রৌতকর্ম্ম। ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ স্মার্ত্ত নিত্যকর্ম্ম। শাস্ত্রের আদেশে বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ। হোম প্রভৃতি দৈবযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ। অতিথি সেবা নৃযজ্ঞ। জীবোদ্দেশে অন্নদান ভূতযজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থ পঞ্চ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গৃহীমাত্রই পঞ্চ পাপে পাপী। আকাশে, বাতাসে ও মৃত্তিকায় সর্ব্বদা লোকচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বিরাজ করে। গৃহস্থ, অজ্ঞাতসারে চুল্লী, জাঁতা, উদূখল, জলকুম্ভাধার এবং সম্মার্জ্জনী—এই পঞ্চ নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু ব্যবহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হয়। কারণ, এই সকল ব্যবহারে প্রাণীবধ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। এই নিমিত্ত গৃহস্থের এই পঞ্চযজ্ঞ অবশ্য পালনীয়। ব্রহ্মচারী, বিপত্নীক ও বানপ্রস্থাবলম্বী প্রথম তিনটি পালন করেন; এবং বিবিদিষা, অর্থাৎ জ্ঞান-সাধনহেতু, সন্ন্যাসী ব্রহ্মযজ্ঞ পালন করেন। পুত্রেষ্টি-যাগাদি শ্রৌত নৈমিত্তিক কর্ম্ম; অগ্নিহোত্র দশপূর্ণ শ্রৌত কাম্য কর্ম্ম। যজ্ঞাদিতে শ্রৌত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম বিহিত আছে। শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, শক্তি ও গণেশ,—এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা স্মার্ত্ত নিত্য-

কর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরমব্রহ্মের আরাধনা পঞ্চ দেবতার উপাসনা। ইহার মধ্যে একটি ভাব ইষ্ট; অপর চারিটি তাহার সহযোগী। গ্রহণেতে স্নান স্মার্ত্ত নৈমিত্তিক কর্ম্ম। ব্রত, দান প্রভৃতি স্মার্ত্ত কাম্য কর্ম্ম। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি স্মার্ত্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম। এই সকল শাস্ত্রীয় বিহিত কর্ম্ম। ব্রহ্মহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। শাস্ত্রে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। শাস্ত্রসম্মত, অর্থাৎ নিয়ম ও নীতি সঞ্জাত, আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক বিহিত কর্ম্ম। যোগাভ্যাস কৌশলাদি ইহার অন্তর্গত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি স্বাভাবিক নিষিদ্ধ কর্ম্ম। অতি ভোজন, অতি জাগরণ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবন প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত। স্বাভাবিক কর্ম্ম, শ্রৌত ও স্মার্ত্ত উভয়বিধ। বর্ণাশ্রম ভেদে বিহিত কর্ম্মের প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে।

কর্ম্মপ্রকরণ আমরা বর্ণন করিলাম। প্রকার-ভেদে এই কর্ম্মের প্রযোক্তা কে? জীবদেহস্থিত পরা প্রকৃতি। দেহ রথ,—দেহী রথী। পার্থসারথি যেমন স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া, পার্থের দ্বারা যুদ্ধ করাইয়াছিলেন, আমাদের দেহের রথী আত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতির সাহায্যে কর্ম্ম করেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
(গীতা ৭।৪)

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্তা। মন, প্রাণ, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সকল আত্মার চৈতন্যধর্ম্মে সক্রিয় হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার; এই অহঙ্কারই কর্ম্মের কর্ত্তা। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি কারণস্বরূপ। কিন্তু কর্ম্মকালে তাহারাই কর্ত্তার রূপ ধরে। আত্মা অবশ্য সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়। দেহাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় প্রধান। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। কামাদি বিকার-বুদ্ধি-প্রসূত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি। যতদিন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও সত্ত্বাদি গুণগণের অনাদি পরিণাম বর্ত্তমান থাকে, ততদিন "আমি" ও "আমার" এই অভিমান যায় না। ফলতঃ, অহঙ্কার বশেই জীব সর্ব্ব কর্ম্ম করে; এবং কর্ম্মের নিগড়ে বদ্ধ হয়। কিরূপভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মবন্ধন ঘটে না, তাহা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

গান

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

অসীমের গান মাতায় এ প্রাণ
আকুল করে গো চিত্ত,
সুরে সুরে তার মরম বীণার
পরতে জাগায় নৃত্য।

কি আবেশে মরি আঁখিধারা ঝরি'
আবেগে অপার অন্তর ভরি'
কোন্ সে অরূপে সব নামরূপে
হারাইয়ে হৃদি তৃপ্ত!

কে মিলিবে তবে নিতি উৎসবে
ধরণীর এই যত কলরবে
সে আমি তো নাই তাহারে যে পাই
'আমি'র শ্মশানে নিত্য।

শ্রীযামুনাচার্য

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দক্ষিণভারতে 'শ্রী'-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণ-স্বরূপ যে কয়জন ঐশ্বরিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বলা হয় 'আলোয়ার'। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন দ্বাদশজন। এঁদের পর বৈষ্ণবধর্মের রক্ষা ও প্রচারের জন্য আরও এক দল মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁদের বলা হয় 'আচার্য'। আচার্যদের সংখ্যা নিরূপিত হয়নি। আলোয়ারদের সর্বপ্রধান আলোয়ারের নাম নম্মালোয়ার এবং আচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে এসেছিলেন শ্রীরামানুজ। শ্রীরামানুজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন খৃষ্টীয় ১০১৭ সালে। দাক্ষিণাত্যে শ্রীবৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে শ্রীরামানুজ ছিলেন চতুর্থ। এই প্রবন্ধের আলোচ্য শ্রীযামুনাচার্য শ্রীরামানুজেরই অব্যবহিত পূর্বে তৃতীয় আচার্য-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথম বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনাথমুনি ছিলেন যামুনাচার্যের পিতামহ। উত্তর ভারতে তীর্থপর্যটনকালে পূতসলিলা যমুনা-তীরে ইনি মাতৃগর্ভে আসেন বলে এঁর নাম রাখা হয় যামুন। দক্ষিণ আর্কট জেলার বীর-নারায়ণপুরে শ্রীঈশ্বরভট্টের পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৯১৬ খৃষ্টাব্দে। আচার্য-কুলতিলক নাথমুনির বংশে আবির্ভূত হয়ে যামুন সে পবিত্র বংশের খ্যাতি ও মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবন-প্রভাবে বরং উহা বৃদ্ধিই করেছিলেন। অষ্টম বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে উপবীত গ্রহণের পর তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমহাভাষ্য ভট্টের নিকট বেদাধ্যয়নে রত হন। এর দুবছর পরেই তাঁর পিতা অল্পবয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করলে পিতামহ নাথমুনিও সংসার-বিমুখ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পিতা ও পিতামহের একমাত্র স্নেহের দুলাল শ্রীযামুন সামনে অকূল সমুদ্র দেখলেও অমিত তেজ ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে অল্প কালমধ্যেই ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে স্ববশে আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন। মাত্র বার বছর বয়সে কি ভাবে তিনি চোল রাজ্যের অর্ধাংশের অধীশ্বর হন সে বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হবে। অসাধারণ মেধা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য অল্প বয়সেই তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর আচার্য-পদবীতে আরূঢ় হওয়া এবং সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্জন করার প্রধান কারণ ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর নিরন্তর যোগ। কথিত আছে, তাঁর হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণু সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকতেন, কাজেই উহা বিষ্ণুর সিংহাসন-স্বরূপ ছিল এবং বৈষ্ণবগণ যামুনাচার্যকে সিংহাসনাংশ বলে পূজা করতেন।

যামুনাচার্যের শিক্ষক মহাভাষ্যভট্ট সুপণ্ডিত হলেও এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির কথা সকলে জানলেও তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে কদাচিৎ একত্র বাস করেন ইহা তারই প্রমাণ।

তদানীন্তন চোল রাজার রাজধানী গঙ্গাই-কোণ্ডাপুরমে একজন দুর্দান্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন, যাঁর নাম ছিল অক্কি আলোয়ান বা বিদ্বজ্জন-কোলাহল। বিশেষ রাজানুগ্রহ লাভের ফলে তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের ওপর অযথা যে

কেবল অত্যাচারই করতেন তা নয়, পরন্তু তাঁদের নিকট হতে বার্ষিক সেলামীও আদায় করা হত। অত্যাচারে সকলে অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লেও অক্কি আলোয়ান রাজানুগ্রহপুষ্ট বলে কেউ কিছু বলতেও সাহস করতেন না।

এক দিন মহাভাষ্যভট্টের অনুপস্থিতিতে অক্কি আলোয়ানের লোক সেলামী নিতে এলে বালক যামুন বলে পাঠালেন,—'সেলামী দেওয়া হবে না, তোমার মনিবকে গিয়ে বল'। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তেজস্বী যামুন বল্লেন,—'বিচারে তোমাদের পণ্ডিতকে আমরা পরাজিত করতে সক্ষম'। যথাকালে একথা কোলাহলের কানে গেল, তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রগল্‌ভ বালককে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক বিতর্ক-সভার আয়োজন রাজাকে বলে করলেন। রাজ-প্রেরিত পাল্কীতে সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমার যামুনকে সদলবলে রাজ-সভায় উপস্থিত দেখে ধর্মপ্রাণা চোলরাণী তাঁকে 'আলাওন্দার' (বিজয়ী-বীর) বলে স্বাগত জানালেন, তখন হতে তাঁকে আলাওন্দার বলেই অনেকে ডাকতেন। বিতর্কসভায় বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত—সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত। মনে মনে সকলেই চাইলেন অহঙ্কারী অক্কি আলোয়ানের পরাজয়। রাজা ঘোষণা করলেন, বিজয়ী পণ্ডিত তাঁর অর্ধেক রাজ্যের মালিক হবেন। বিতর্ক আরম্ভ হল। আলোয়ানের সব প্রশ্নের জবাব অনায়াসেই যামুন দিতে লাগ্‌লেন—প্রথম পক্ষের প্রশ্নপর্ব শেষ হলে যামুন অদ্ভুত তিনটি প্রশ্নেই অহঙ্কারী আলোয়ানকে চুপ করিয়ে দিলেন। নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন যামুন সভাপণ্ডিত কোলাহলকে করেছিলেন। যামুন তাঁকে বল্লেন, "আপনি খণ্ডন করুন (১) আপনার মাতা বন্ধ্যা নন, (২) মহারাজ ধর্মশীল ও (৩) মহারাণী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী।" এই অত্যদ্ভুত প্রশ্নত্রয় শুনে কোলাহল হয়ে গেলেন একেবারে হতবাক। নিজের গর্ভধারিণী মাতাকে কি করে তিনি বন্ধ্যা বলবেন! যে রাজা এতদিন তাঁকে পালন করেছেন, তাঁর সব রকম আবদার ও অত্যাচার সমর্থন করেছেন তাঁকেই বা কি করে তিনি অধর্মাচারী বল্‌বেন, আর সতীকুলশিরোমণি রাণীকেই বা কি করে তিনি বল্‌বেন যে তিনি সতী নন—বল্লেও তার বিষময় ফল ভেবে তিনি শিউরে উঠ্‌লেন! লজ্জায়, গ্লানিতে, ক্ষোভে তিনি অধোবদন হয়ে রইলেন। রাজা তখন বালক যামুনকে তার নিজের প্রশ্ন খণ্ডন করতে বলায় যামুন সভাপণ্ডিতকে বল্লেন,—

(১) আপনার মাতা বন্ধ্যা, কারণ তিনি একপুত্র-প্রসবিনী। এ প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য—"অপুত্র একপুত্র ইতি শিষ্ট প্রবাদাৎ" অর্থাৎ যাঁর একপুত্র তাঁকে বন্ধ্যাই বলা হয়।

(২) মহারাজ অধর্মাচারী, কারণ রাজাকে প্রজার পাপ ও পুণ্যের ভাগ গ্রহণ করতে হয়। কলিতে ধর্ম একপাদ এবং অধর্ম তিন-পাদ, কাজেই রাজার অধর্মের অঙ্ক ক্রমশঃই বাড়ছে, সুতরাং তিনি অধর্মাচারী।

(৩) রাণী সতী নন, কারণ শাস্ত্রানুসারে বিবাহের পুর্বে কন্যাকে প্রথমে অগ্নি, বরুণ ও ইন্দ্রকে উৎসর্গ করার বিধি আছে। তা ছাড়া,

'সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥

(মনু ৭।৭)

অর্থাৎ রাজা প্রভাবতঃ সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র। কাজেই রাজার পাণিগৃহীতা পত্নীকে উপরোক্ত অষ্টলোক-পালেরও পত্নী বলা হয়। সুতরাং তাঁকে সতী বলব কি করে?

বালকের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অমিত তেজ ও অপূর্ব মেধা দর্শনে সকলেই পুলকিত। কোলাহলের

অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁর মুখ হয়ে উঠ্‌ল আরক্তিম—সভাশুদ্ধ সকলে বাহবা দিয়ে জয়মাল্য যামুনের গলাতেই পরিয়ে দিলেন। রাজাও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্ধেক রাজত্ব দিলেন যামুনকে। মাত্র বার বৎসর বয়সে যামুন রাজা হলেন এবং বীরদর্পে রাজ্যপালন ও প্রজাবর্গের অশেষ কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সুনাম চারিদিকে। গুণগানে সকলে হয়ে উঠল বিভোর।

কিন্তু রাজ্য পেয়ে যামুন তাঁর আদর্শ ভুলে গেলেন—বিবাহ হল, চারটি সন্তানও জন্ম নিল, এভাবে ভোগে তিনি ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলেন। তাঁর ঋষিকল্প পিতামহ আচার্য নাথমুনির কথা পর্যন্তও তিনি ভুললেন। কিন্তু বিধাতার অশেষ কৃপায় তাঁর এ মোহ অচিরেই ঘুচে গেল, তাঁর পিতামহের প্রধান শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষের প্রচেষ্টায়। তিনি বুঝেছিলেন ভোগসুখের জন্য যামুনের জন্ম হয়নি। অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে তিনি তাঁর ভেতরের সুপ্ত উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রামমিশ্রকে পাঠালেন তাঁকে ভোগের পথ হতে ফিরিয়ে আনতে। রাজা যামুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও ছিল এক কঠিন সমস্যা; কিন্তু কুশলী রামমিশ্র অশেষ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং এক অদ্ভুত উপায়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হল। রামমিশ্র বল্লেন,—"তোমার পিতামহের অনেক গুপ্তধন আমার কাছে গচ্ছিত আছে এবং উহা তোমারই।" যামুনেরও তখন টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। রামমিশ্রকে সেই প্রয়োজন সময়ে সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত খুসী হলেন এবং অবিলম্বে সেই গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় রামমিশ্রের অনুসরণ করতে লাগলেন। পথে যেতে যেতে সুকণ্ঠ রামমিশ্র গীতা থেকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক শ্লোকগুলি আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে যামুন যতই সেগুলি শুন্‌তে লাগলেন ততই কমে আসতে লাগল তাঁর আসক্তি ও ভোগলিপ্সা। আত্মবিশ্লেষণ সুরু হল, চম্‌কে উঠলেন তিনি এই ভেবে যে কি ছিলেন আর কি হয়েছেন! গুপ্তধনের প্রতি তাঁর স্পৃহা অন্তর্হিত হল, কিন্তু রামমিশ্রও ছাড়বার পাত্র নন। তাঁকে ত দায়মুক্ত হতে হবে, এই বলে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। অবশেষে তাঁরা পুণ্যতোয়া কাবেরীতটে এসে উপস্থিত হলেন। স্নানান্তে কাবেরী ও কোল্লেরুন নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সপ্তপ্রাকার বিশিষ্ট শ্রীরঙ্গনাথজীর বিশাল মন্দির প্রান্তে উপনীত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। আগে আগে চলেছেন রামমিশ্র, আর পেছনে যুক্ত-করে প্রেমমদিরোন্মত্ত অশ্রুপূর্ণলোচন ভক্তিগদগদচিত্ত যামুন তাঁর অনুসরণ করছেন; সে এক অপূর্ব দৃশ্য! রামমিশ্র পূর্বেই যামুনকে বলেছিলেন যে 'দুটি নদীর মধ্যস্থিত সাতটি প্রাকারের অভ্যন্তরে উক্ত অর্থ স্থাপিত আছে এবং এক মহানাগ স্বীয় ফণারূপ ছত্রদ্বারা সর্বদাই উহা রক্ষা করছে'। এক, দুই করে ছয়টি তোরণ অতিক্রান্ত হল। সপ্তম তোরণের পুরোভাগে এসেই রামমিশ্র অঙ্গুলি-নির্দেশে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে দেখিয়ে আলোয়ান্দারকে বললেন, 'হে নির্মলাত্মন! আপনার পিতামহ-প্রদত্ত গুপ্তধন ঐ সামনে শেষ শয্যায় শয়ান আছেন, উহা গ্রহণ করুন। পিতামহ আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদই রেখে গেছেন! যাঁর পদসম্বাহন করছেন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, আদিকর্তা জগৎকারণ ব্রহ্মা যাঁর নাভিকমলে সমাসীন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে, যিনি পরম আনন্দ ও চরম শান্তির মূল উৎস, সেই শ্রেষ্ঠ রত্নেরই অধিকারী ছিলেন আপনার স্বর্গত স্মরণীয় পিতামহ।

আপনি তাঁরই বংশকুলতিলক, কাজেই এ ধনে আপনারই অধিকার; যান—গ্রহণ করে আমায় ঋণমুক্ত করুন। আপনার সামনেই সেই পরম ধন—যার জন্য রাজ্য ছেড়ে আপনি এতদূর এসেছেন।" রামমিশ্রের কথা শুনতে শুনতে যামুন ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন—ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে আসছিল তাঁর এবং 'যান গ্রহণ করুন' বাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ামাত্র তিনি উন্মত্তের ন্যায় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গে স্বীয় অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন। দুচোখ দিয়ে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হতে লাগল—পিতামহপ্রদত্ত মহাধনকে তিনি মন প্রাণ দিয়ে সর্বতোভাবেই গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা ফিরে এল—তখন তিনি এক নূতন মানুষ—যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির সঙ্গে পরিচয় ও একাত্মতা লাভ করে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র জাগতিক রাজ্যে আর ফিরলেন না। সাধারণত লোকে রাজ্য হতে নির্বাসিত হয়, কিন্তু আলোয়ান্দার তাঁর মন থেকে রাজ্যকেই চিরতরে নির্বাসিত করে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় বাকী জীবন উৎসর্গ করলেন। শিষ্যের আকূতি রামমিশ্রকে মুগ্ধ করল, তিনি তাকে অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়" প্রদান করলেন। জপ, ধ্যান ও সেবায় নিজেকে হারিয়ে ফেল্লেন যামুন। ক্ষুদ্র আমিত্বের বিসর্জন হলেই বৃহৎ আমিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। দেবতার কৃপায় অজ্ঞান অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ফুল ফুটলে ভ্রমরের আগমনের ন্যায়, যামুনের হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ায় বহু ভক্ত-মধুকর ভক্তিমধু পানের আশায় তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হলেন। রাজা যামুন পরিণত হলেন আচার্য যামুনরূপে। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তিনি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, দেব-সেবায় ও গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর প্রথম ও সর্বপ্রধান রচনা সিদ্ধিত্রয় নামে খ্যাত। এতে আত্মসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি ও সম্বিৎসিদ্ধি নামে তিনটি অধ্যায় আছে।

এ ছাড়াও 'আগমপ্রামাণ্য', 'গীতার্থ-সংগ্রহ' 'মহাপুরুষ নির্ণয়,' 'স্তোত্ররত্ন' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পাণ্ডিত্য- ও ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। শেষোক্ত পুস্তকে লেখকের হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির উচ্ছ্বাস অতি সরল ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে যা পাঠ করলে সাধারণের মনেও সহজে ভক্তিভাব জাগরূক হয়। আচার্য যামুন ছিলেন একাধারে তীক্ষ্ণ বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিত, কবি, ভক্ত ও দার্শনিক। এক আধারে এত দুর্লভ গুণের অপূর্ব সমাবেশ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

শেষ জীবনে যামুনাচার্য যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি শ্রীপদ্মনাভজীর দর্শন আশায় পশ্চিম উপকূলে ত্রিবাঙ্কুরে গমন করেন এবং ফিরবার পথে তিনেভেলী, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির দর্শনে পরম প্রীত হন। জীবন-সায়াহ্নে তিনি কাঞ্চীপুরমে আসেন এবং তথায় নিজ অচ্ছুৎ শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণের মারফৎ তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রীরামানুজের সাথে মিলিত হন। জহুরী জহর চেনে—বালক রামানুজকে দেখেই আচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মধ্যে অসীম শক্তি ও অমিত তেজ লুক্কায়িত। যদিও যাদবপ্রকাশ নামক অদ্বৈতবাদী গুরুর নিকট রামানুজ তখন শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিলেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যামুনাচার্য বুঝেছিলেন যে এই বালকই কালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান সমর্থক ও প্রচারক হবে। তাই তিনি শরীর পরিত্যাগের পূর্বে শিষ্যদের কাছে তাঁর শেষ আশা ব্যক্ত করেছিলেন যাতে শ্রীরামানুজকে অচিরেই শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুদীর্ঘ জীবন যাপনান্তে খৃষ্টীয় ১০৪০

সালে এই মহাপুরুষ প্রায় ১২৪ বছর বয়সে শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় শরীর পরিত্যাগ করেন। তাঁর বহু শিষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, শৈলপূর্ণ ও মালাধর অশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

মহাপুরুষেরা জগতে আসেন সকলকে শান্তির ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে। তাঁদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবনই তাঁদের শিক্ষা। শত শত জিজ্ঞাসু ও তাপিত প্রাণ এঁদের পূত সংস্পর্শে এসে অপার্থিব সুখের সন্ধান পেয়ে থাকেন; তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। এ সব মহাপুরুষ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করলেও এঁদের পবিত্র আদর্শ ও মধুর স্মৃতি যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়—ধন্য এঁদের জীবন, সার্থক এঁদের আগমন!

আলো, গান ও প্রাণ

"বৈভব"

অরুণ আলোতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
তোমারি বারতা ভাসে
তোমারি হাতের অমৃত পরশ
সুদূর বাহিয়া আসে!
আমি দেখি শুধু অন্ধের চোখে
মত্ত রয়েছি কী জানি কী ঝোঁকে
বুঝেও বুঝিনা দেখেও দেখিনা
কী বা আসে যায় পাশে!

আমি জানিতাম তব আসা যাওয়া
তোমাকে আমার মাঝখানে পাওয়া
বুঝি ফুরায়েছে সব সুখ টুকু
গিয়াছে হইয়া শেষ
ভেবেছিনু আমি হে জীবন-স্বামি,
তোমার সুরের রেশ
জীবনবীণায় আর বাজিবেনা
গিয়াছে হইয়া শেষ!

আজ একি, একি! সহসা যে দেখি—
অরুণ আলোর বান
তোমারি শুভ্র পুণ্য পরশ
ধ্বনিয়া তুলিল গান!
জাগো ওগো মন, জাগো জাগো আজ
ঠেলে ফেলে দাও যত কিছু কাজ
বহুদিন পরে হৃদয়ের মাঝ
পেয়েছি হারানো প্রাণ,—
সাগ্রহে তুলি লও তারে লও
চির-প্রিয়তম-দান!

ধর্ম ও মর্ম

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী

ধর্মের কথা বলা বড় কঠিন। ধর্মের কথা বলিতে গিয়া স্বয়ং মহর্ষি কণাদকে আমাদের দেশে বিদ্রূপের কশাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। "অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—'ধর্ম ব্যাখ্যা করিব' —এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"—যাহা হইতে 'অভ্যুদয় (সাংসারিক উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (সংসারমুক্তি) সিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম'—ধর্মের এই লক্ষণ বলিয়া কণাদ তৎপরে ছয় প্রকার পদার্থের বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন। এই অপরাধে কণাদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্‌গমনোপমম্॥

অর্থাৎ, ধর্মব্যাখ্যা করিব বলিয়া ষট্‌পদার্থ বর্ণনা করা ও সাগরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া হিমালয়ে গমন করা একই প্রকার। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে উপাদানে গঠিত, এবং যে ধর্মের অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্য চলিতেছে কণাদ তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন; কেন না, বিশ্বপ্রকৃতির সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলে তবেই উহার অতীত সত্যকে ধরিতে পারা যায়। প্রথমে অভ্যুদয়, তৎপরে নিঃশ্রেয়স। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের উপর বিস্তর ভাষ্য ও টীকা রচিত হইলেও কণাদের বক্তব্যের যথেষ্ট মর্যাদা আমরা দিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। আমরা ধর্মের মর্ম বুঝি নাই। বুঝিলে, সত্যই আমাদের অভ্যুদয় হইত, যুগ যুগান্তর ধরিয়া বৈদেশিক আক্রমণকারীদের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইত না। ধর্মের ফলই অভ্যুদয়, কিন্তু আমরা ধর্ম যেভাবে বুঝিয়াছি ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি তাহাতে সত্যই আমাদের কোন অভ্যুদয় হইয়াছে কি?

এখন ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের 'নিষেকাদি শ্মশানান্ত' যাবতীয় কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। মনু বেদের অনুবর্তন করিয়া গিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার মতই প্রমাণ। যদি কেহ মনুর মতের বিপরীত কিছু বলেন তাহা প্রমাণ নহে—শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা অন্তত ইহা বলিয়া থাকেন। এই মনু কে? মনু নামে বহু লোক ছিলেন কি না, যে মনুর বাক্য ঔষধের ন্যায় উপকারী বলিয়া বেদ বলিয়াছেন সেই বৈদিক ঋষি ও সংহিতাকার মনু অভিন্ন কিনা, মনু সংহিতা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভৃগুর রচনা কিনা অথবা বর্তমান মনুসংহিতা গুপ্তযুগে রচিত কিনা এই সকল জটিল আলোচনার বর্তমানে প্রয়োজন নাই,—ধর্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে মনুই প্রমাণ; ধর্ম বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহাই দেখিতে হইবে। মনুর মতে সচ্চরিত্র নিরপেক্ষ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ধর্ম। কিন্তু—'এঁহো বাহ্য'; ধর্মের শেষ প্রমাণ মানুষের হৃদয়। ধর্ম যুক্তিহীন হইলে তাহার অনুসরণ করা উচিত নহে, এবং বুদ্ধি বা হৃদয় ব্যতীত যুক্তিও সিদ্ধ হয় না। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন —'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ', অর্থাৎ বুদ্ধির শরণ লও, কেন না "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" বুদ্ধি নষ্ট হইলে বিনাশ উপস্থিত হয়।

বাঙলার পণ্ডিতগণ ধর্ম ও সমাজ শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিতেন ও যতটুকু যে ভাবে মানিতেন

আমাদের বাঙলার রঘুনন্দন স্বীয় নিবন্ধে তাহারই সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে রঘুনন্দনের স্থায় পণ্ডিত বিরল হইলেও তাঁহার সময়ে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। সুতরাং স্বীয় নিবন্ধে তিনি কোন নূতন ও স্বাধীন মত প্রচার করিলে তাঁহার নিবন্ধ-সমূহ গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল নিবন্ধে আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধিবল অপেক্ষা বচনবলই অধিক মর্যাদা পাইয়াছে। গরু একটা প্রাণী, তাহার বদলে নিষ্প্রাণ কড়ি দেওয়া কিরূপে সমর্থন করা যায়? পণ্ডিতেরা এই সকল নিয়া দীর্ঘ তর্ক-প্রবাহ চালাইয়াছেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোনও পুরাণ বা সংহিতার বচন তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—'বচনবলাৎ সিধ্যতি', অর্থাৎ যখন এইরূপ বচন রহিয়াছে তখন ইহা হইবেই।

মানুষমাত্রেরই ত্রুটি বিচ্যুতি আছে, মহাপণ্ডিত হইলেও রঘুনন্দন প্রভৃতি ভ্রম-প্রমাদযুক্ত মানুষই ছিলেন। হয়তো যুগোপযোগী শাস্ত্র তাঁহারাও প্রণয়ন করিতে পারেন নাই, ধর্মের উপরে মর্মের আসন দানে তাঁহারাও কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যুগোপযোগী করিয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহারা নমস্য। আমাদের বর্তমান সমাজের ব্যবস্থাপকগণকেও এইরূপ করিতে হইবে। সমাজের প্রবৃত্তি, ক্ষুধা ও পিপাসার মূল্য বুঝিতে হইবে, সমাজ যে সময়ে পিপাসার্ত হইয়া ব্যবস্থাপকগণের নিকট বিশুদ্ধ পানীয়ের জন্য আর্তনাদ করিতে থাকে, তখন তাঁহারা হয় বধিরতা অবলম্বন করেন, নতুবা প্রহারে উদ্যত হ'ন; সুতরাং সমাজকে বাধ্য হইয়াই অবাঞ্ছিত হস্ত হইতে মলিন পানীয় গ্রহণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেহ সমুদ্রপারে গমন করিলে তাঁহারা কিরূপ হৈ চৈ করিতেন তাহা আমাদের বেশ মনে আছে। কিন্তু তখন সমাজ তাঁহাদের নিকট অনুমতি চাহিত, আজ আর কেহ সে অনুমতি চাহে না এবং পূর্বে ধর্ম গেল বলিয়া যাঁহারা গণ্ডগোল করিতেন এখন তাঁহারা নীরব হইয়াছেন। এখন লোকে যথেচ্ছ সমুদ্র লঙ্ঘন করে, কেহ তাঁহাদের মুখাপেক্ষ হয় না, ইহাতে কি তাঁহাদের গৌরব বাড়িয়াছে? সতীদাহের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ইতিহাস-বিশ্রুত; কিন্তু আজ যদি আইনের দিক্ হইতে নিষেধ তুলিয়াই লওয়া হয় তাহা হইলেও কোন নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত পিতার শবদাহের সহিত জীবিতা মাতাকে ভস্মসাৎ করিবেন কি? ধর্ম অপেক্ষা মর্ম যে বড়—অন্তত এইরকম অনেক বিষয়ে তাঁহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্তমান সমাজে জাতিভেদ, অসবর্ণ-বিবাহ, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সমাজ তৃষ্ণার্ত, নব্যস্মৃতিতে এই তৃষ্ণা নিবারণের পানীয়ের ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাচীন স্মৃতিতে আছে; পণ্ডিতেরা তাহার মর্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের পথ নির্দেশ করিবেন কি?

প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের প্রতিকূলে আমাদের কতকগুলি ধারণা আছে, সেই সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমত অনেকে আমাদের ধর্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করেন। বলা বাহুল্য ধর্মমাত্রই সনাতন। যীশুখ্রীষ্ট বা মহম্মদ কেহই একথা বলেন নাই যে এই ধর্ম আমি আবিষ্কার বা নির্মাণ করিলাম; প্রত্যেকেই প্রাচীনের দোহাই দিয়াছেন, এবং ধর্মকে সনাতন বলিয়াছেন। অতএব একমাত্র হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম নহে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্থায় যাহা প্রকৃত ধর্ম তাহা সনাতন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক ধর্ম সনাতন ইহা বলা প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে একই রূপ থাকে, তাহার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, সনাতন শব্দের ইহাই অর্থ।

বিবাহ, জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্য, পুত্রোৎপাদন, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশে ও সমাজে যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল শাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যুগে যুগে যাহার পরিবর্তন হইয়াছে তাহা কখনও সনাতন নহে। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে শাস্ত্র-প্রদর্শিত পথে এখনও তাহার পরিবর্তন হইতে পারে। দ্বিতীয় ধারণা, শাস্ত্র ঋষিবাক্য; ঋষিবাক্য অখণ্ডনীয় ও অলঙ্ঘনীয়, এবং ভারত ভূখণ্ডের ও বৈদিক সমাজের বাহিরে কখনও কোন ঋষি আবির্ভূত হ'ন নাই। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, স্মৃতিশাস্ত্রে ও তাহার টীকা-টিপ্পনীতে যাঁহাদের মত উদ্ধৃত দেখা যায় তাঁহারা সকলেই যে ঋষি ছিলেন ইহার প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত যাঁহারা বিভিন্ন দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে এক ঋষির বাক্য অন্য ঋষি খণ্ডন করিয়াছেন। ঋষিবাক্য যদি অখণ্ডনীয়ই হইত তাহা হইলে কদাপি তাহা সম্ভব হইত না। ঋষিবাক্য আপ্ত-বাক্য, এবং আপ্তবাক্য বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য। ন্যায়ভাষ্যে মহামুনি বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে অর্থের সাক্ষাৎকারই আপ্তি; যাঁহারা আপ্তিদ্বারা চালিত হ'ন তাঁহারাই আপ্ত, এবং কি আর্যঋষি কি ম্লেচ্ছ সকলেই আপ্ত হইতে পারেন। আচার্য বরাহমিহিরও "ঋষিবৎ যবনাঃ" বলিয়া যবন জ্যোতির্বিদদিগকে আপ্তোচিত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বাগ্‌ভট স্পষ্টই বলিয়াছেন ঋষিবাক্যেই যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে চরক ও সুশ্রুত ত্যাগ করিয়া ভেল-জতুকর্ণ-হারীত ইত্যাদির অনুসরণ করিলেই তো চলে; কিন্তু তাহা তো ঠিক নহে, ভাল কথা যেই বলুক তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বাগভট চরক ও সুশ্রুতকেও ঋষি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অন্তত ঋষিহিসাবে তাঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভেল প্রভৃতিকে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন। পুত্রাদি কঠিন রোগগ্রস্ত হইলে প্রতীচ্যের ঋষিদের শিষ্যদের শরণ না লইয়া অথর্ববেদোক্ত চিকিৎসায় তুষ্ট হইয়া থাকিবেন এমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কেহ আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সাহিত্যের আর্ষ প্রয়োগের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, কিন্তু তাহার অনুকরণ করি না। রক্তমাংসের শরীরটা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যেমন অথর্ববেদের ঋষিদের শরণ না লইয়া আধুনিক ঋষিদের দ্বারস্থ হইতে হয়, সমাজ ও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, অভ্যুদয়-লক্ষণ ধর্মের সাধনা করিতে গেলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই সুবুদ্ধির প্রয়োজন। সকল সময়েই মনে রাখিতে হয় "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।"

বর্তমানে আমরা যে ধর্মের অনুষ্ঠান করি তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ইহা বলাও ভুল। পঞ্চনদের আর্যসমাজ আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী বেদোক্ত ধর্মের অনুসরণ করে। আমাদের বর্তমান সমাজে লোকাচার ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে, এবং তাহা হওয়াও উচিত। মনু বেদের অনুসরণ করিয়াছেন; মনুর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ স্মৃতি মান্য নহে, ইহাও সত্য নহে। অনেক স্মৃতিতেই বহু বিষয়ে মনুর সহিত অসঙ্গতি আছে—কেন না যুগোপযোগী করিয়া সংস্কার করিবার কালে এই সকল স্মৃতিনিবন্ধ প্রণেতারা বহু নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মনুসংহিতার মধ্যেও পরস্পর বিরুদ্ধ মতের অভাব নাই। ইহা হইতে এই কথাই বুঝিতে পারা যায় যে, সময়ে সময়ে প্রচলিত বহু বিধানকে স্মৃতির মর্যাদাদানের জন্য মনুসংহিতার অন্তর্নি-বিষ্ট করা হইয়াছে। স্বয়ং কুল্লুকভট্টকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে মনুসংহিতায় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় বেদে তাহার সকল বিষয়েই অনুরূপ সমর্থক বাক্য নাই। কুল্লুক বলিয়াছেন যে সমর্থক বাক্য না থাকিলেও মনু বেদের

অনুসরণ করেন নাই ইহা বলা যায় না। কারণ বেদের সকল অংশ এখন পাওয়া যায় না। কুল্লুকের অবশ্য ইহা বিশ্বাসমাত্র, ইহা লইয়া বহু তর্কের অবকাশ থাকিলেও সেইরূপ তর্ক নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু সমাজ যতদিন বাঁচিয়াছিল ততদিন প্রয়োজনানুসারে যুগে যুগে ব্যবহারিক শাস্ত্রের সংস্কার হইয়াছে, এখনও সেই সংস্কার আবশ্যক।

ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে চোর একটি সুদৃঢ় কাষ্ঠনির্মিত মুদ্গর লইয়া রাজার নিকট গমন করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী হইবে এবং রাজা এই মুদ্গরের একটি আঘাতে চোরকে বধ করিবেন, তাহা হইলেই চোরের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বলা বাহুল্য এমন সাধু চোর ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক একালে দুর্লভ, এবং কোন কালেই সুলভ ছিল কিনা তাহাতেও সন্দেহ। কিন্তু এখনও আমাদের স্মার্তগণ যত্নপূর্বক এই সকল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। শূদ্রান্ন অভোজ্য, অসবর্ণবিবাহ অকার্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনীয়; কিন্তু কাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম প্রকৃতই পালিত হয় কিনা, অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে নূতন অথবা প্রাচীন কোনও বিধি অবলম্বিত হওয়া উচিত কি না এসম্বন্ধে আধুনিক স্মার্তগণের চিন্তাশীলতার কোন পরিচয় পাই না। সমাজে একদিকে যেমন দেখিতেছি উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরাও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিতেছেন তেমনই আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বেও বহু নিম্নবর্ণের মধ্যে যে সকল কদাচার ছিল, শিক্ষার ক্রমবিস্তারের ফলে তাহারা সেই সকল কদাচার বর্জন করিয়া উচ্চতর সংস্কৃতি গ্রহণ ও পালন করিতেছেন; ফলে আজ আর তথাকথিত উচ্চকে উচ্চ ও তথাকথিত নিম্নকে নিম্ন বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে না—এরূপ ক্ষেত্রে সমাজকে নূতন করিয়া নির্দেশ প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। যে ব্যবস্থা এখন অচল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে যাহা চলিতেছে বা চলিবে, যাহা বাধা দেওয়ার শক্তি কাহারও নাই তাহাকে শাস্ত্রসম্মত করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা সমাজের শিরোভাগে আছেন সেই শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা করিতে পারিলে শাস্ত্রের প্রতি সমাজের উদাসীনতা বা শ্রদ্ধার অভাব নিশ্চয়ই দূর হইবে। সমাজকে অশাস্ত্রীয় উচ্ছৃঙ্খলপথে কাহারা ঠেলিয়া দিতেছেন ইহা ভাবিবার বিষয়। প্রাচীন শাস্ত্রকার বহু বিষয়ে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বলিয়া প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া নিয়াছেন ও নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হইতে উৎকৃষ্ট ইহাই বলিয়াছেন। বর্তমানে অনেকে বিবাহের জন্য ধর্ম অস্বীকার করিয়া রেজিষ্ট্রারের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন; বলা বাহুল্য এই সকল দম্পতি নিবৃত্তিমার্গের পথিক নহেন। কিন্তু যেমন ইহাদের প্রবৃত্তিকেও অস্বীকার করা যায় না, তেমনই শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাদের প্রশ্রয় দিলে সকলেই এই পথে ধাবিত হইবে এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। আমাদের সমাজ তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহ অনুমোদন করিয়া এইরূপ প্রবৃত্তিপন্থীদের আশ্রয় দিলে ইহাদের ধর্মকে অস্বীকার করিতে হইত না।

বর্তমানে স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া যাহা পরিচিত তাহার মধ্যে যে বহুযুগের বিভিন্ন মার্গের স্বাক্ষর রহিয়াছে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং বৃথা পাণ্ডিত্যের কচ্‌কচির সৃষ্টি করিয়া গায়ের জোরে বহু প্রয়োজনীয় সংস্কার উপেক্ষা করা হইয়াছে ইহারও প্রমাণের অভাব নাই। বহু ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সত্যসংবাদী নহে—তাহাতেও সন্দেহ নাই। বর্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজনবোধে ও স্থানাভাববশতঃ ইহার আলোচনা বাঞ্ছিত নহে। শাস্ত্রের যে স্থানে

কোন আপত্তি নাই সেইরূপ বহুক্ষেত্রেও আমরা সামাজিক ঐক্যবিঘাতী কতগুলি বিধির সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের সমাজে যাহারা রাঢ়ি, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উত্তররাঢ়ি, দক্ষিণরাঢ়ি বা বঙ্গজ কায়স্থ, রাঢ়ি বা বঙ্গজ বৈদ্য ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন আপত্তি নাই, অথচ সমাজ এখনও এ সম্বন্ধে কুণ্ঠিত। যাহারা আপনাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই ঐক্য স্থাপন করিতে পারেনা বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে তাহারা সংহতি আনিবে কিরূপে? ইতিহাসে দেখিতে পাই শৌর্য ও বীর্য এবং অগণিত জনবল থাকিতেও যুগোপযোগী সাংগ্রামিক রীতিনীতির পরিবর্তন করিতে পারে নাই বলিয়া বিদেশীয় ও বিজাতীয় মুষ্টিমেয় শত্রুর নিকট বার বার হিন্দুদের পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্তমানেও পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অভাব না থাকিলেও সমাজের রথচক্র মনুপ্রবর্তিত রেখা ধরিয়া চালাইতে গেলে জাতিহিসাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। কালিদাস যাহাই বলুন চিরকাল এক পথে রথচক্র চলিলে এমন খাতের সৃষ্টি হয় যে, সে পথে রথ চালাইতে গেলে চাকা ডুবিয়া যায়, ঘোড়া সে রথ টানিতে পারে না, আরোহী বিপন্ন হয়। বর্তমানে ধর্মের সহিত মর্মের যোগসাধনের প্রয়োজন। নিজের হৃদয় ও সমাজের হৃদয় এই উভয় মর্মের সন্ধান লইয়া যাহাতে জাতি বাঁচিতে পারে, অভ্যুদয়ের আগম হয় সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। চণ্ডীদাস যাহারা 'মরম না জানে ধরম বাখানে' তাহাদের ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। প্রাচীন-শাস্ত্র আমাদের সহায়, দেশে প্রতিভার অভাব এখনও হয় নাই। আমরা কি ধর্মের সহিত মর্মের আদর করিতে পারিব না?

শিশু-মানস

শ্রীমতী গায়ত্রী বসু

বর্তমান যুগে সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে শিশুসাহিত্যের একটা সুনির্দিষ্ট স্থান স্বীকৃত হয়েছে। শিশুসাহিত্য শিশুদের নিয়ে, শিশুমানস প্রতিভার বিভিন্নরূপের -বিন্যাসকে নিয়ে। শিশুরা বয়স্ক মানুষের মত চিন্তা করতে পারে, কল্পনা করতে পারে, মনের মণিকোঠায় সম্ভব-অসম্ভবের ঊর্ণনাভ সৃজন করতে পারে। বয়সে তারা ছোট, তাই তাদের চিন্তাধারার মধ্যে যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বিচারের প্রখরতা কোন নীতিকে অনুসরণ করে চলে না। তবুও তাদের জগতে তাদের কার্যপরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্য নেই একথা কি করে বলি?

শিশুর মানসিক গঠন কোন ক্রমেই অবহেলা করবার মত নয়, বরং তাদের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহা বড়দের মধ্যেও সম্ভব নয়। কারণ শৈশব অবস্থায় কৌতূহল এমনই প্রবল থাকে যে শিশু সব কিছুকেই নিজের ব'লে, আন্তরিকরূপে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। সব কিছু তার কাছে সম্ভব, সবই তার জীবনে ঘটতে পারে, সবই তার ইচ্ছার জগতে তার কাছে ধরা দিতে পারে। স্নেহ, ভালবাসা, ভয় একই সঙ্গে মনের অলি-গলির পথে এমন বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চার করে যে কে তাকে ভালবাসে, কাকে সে ভয় করবে, কার কাছে সে তার মনের কক্ষ-বাতায়নকে উন্মুক্ত করে তার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিবেশকে

করবে সবই সে তার স্বভাব থেকে বুঝতে পারে।

শিশুজীবনের মূল্যবান পাথেয় হলো কৌতূহল। মানুষের জীবন-যাত্রার সমগ্র কালেই এই কৌতূহল তার ক্রিয়া করতে সক্ষম। তবুও মানবের শৈশবজীবনাবস্থা অতিক্রান্ত হ'লে কৌতূহল ছাড়াও মানুষ অন্যান্য বহুবিধ ভাব-প্রবণতার দ্বারা চালিত হ'তে পারে—যা জানবার প্রয়োজন নেই, যা জানা অনুচিত তার প্রতি সংযম শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু শিশুর কাছে কৌতূহলের রূপ সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। তাই শিশুকে শুরু থেকেই ঔৎসুক্য সংবরণ করতে শেখানোর অর্থ তার ভবিষ্যৎ জ্ঞানতৃষ্ণাকে চিরতরে বিনষ্ট করে দেওয়া। যাঁরা সমাজ-জীবনে পরবর্তী-কালে খুব বড় হয়েছেন বা যশস্বী হয়েছেন তাঁদের শিশু অবস্থা থেকেই সব কিছু জানবার ও বুঝবার অসীম আগ্রহের কথা আজও গল্পের আকারে আমরা ছোটদের কাছে উত্থাপন করে তাদের বিস্ময় উৎপাদন করি। গৃহে, পথে বা প্রান্তরে যেখানেই তারা তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরে কোন নূতন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তারা তখনই সেটা কী তা জানবার জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন ও অনুসন্ধান চালিয়েছে। আর তাদের অভিভাবক, পথপ্রদর্শক ও শিক্ষা-দাতাগণ তাদের সেই জ্ঞানপিপাসানলে যথার্থ-ভাবেই ইন্ধন যোগ করতে পেরেছেন। তবে এর মধ্যে একটা বিশেষ কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই কৌতূহলকে ঠিক পথে চালানো। মন্দ বস্তুকে শিখতে মানুষের বিলম্ব হয় না, কারণ তার প্রতি এক অতি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। অবশ্য আমার মনে হয়—মন্দ বস্তু যাতে কেউ না শিখে ফেলে তার জন্যে অতি অস্বাভাবিক গোপনীয়তা মানা হয়—আর তার জন্যেই সেগুলি জানবার জন্যে আকর্ষণ ও আকুলতা এত প্রবল থাকে। যাই হোক, কৌতূহলকে যদি কল্যাণকর বিষয়-বস্তুলাভের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলতে পারা যায় তবেই শিশুশক্তির সম্যক বিকাশ-সাধনের পথে সঞ্জীবনী সঞ্চারিত করা হলো বলা যেতে পারে। কেন না, যে সঞ্চয় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ভালভাবে গঠিত করতে সাহায্য করবে সেই পাথেয়কে লাভ করবার জন্যে, সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানের রাজ্যে আনবার জন্যে যদি অন্তরের ঔৎসুক্য দুর্নিবার হয়ে ওঠে তবেই শিশুর জীবন-ভিত্তি ভাল ভাবে তৈরী হচ্ছে বলে মনে করা যেতে পারে।

বর্তমান যুগের শিশুসাহিত্য এই দিক থেকে কতটা কল্যাণকর গঠনমূলক কর্মধারা অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে সে বিষয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পেরে। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের আলোচনার ভাণ্ডার নানা সম্ভারে পূর্ণ, সুতরাং তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে বহুবিধ বস্তুর সন্নিবেশ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে নিতান্তই শিশু। আমরা শিশুর কৌতূহলপ্রথর এই যুক্তিতে লোমহর্ষণ রোমাঞ্চকর অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এ্যাড্‌ভেঞ্চার অভিযানকাহিনী অনেক পরিমাণে পরিবেশন করছি। তাতে তাদের পাঠতৃষ্ণা বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয় বাড়ছে না। রুচিবোধ, ভালমন্দের প্রতি প্রাথমিক বিচার-শক্তি, রসবোধ, সৌন্দর্যানুভূতি, কবিত্বশক্তি প্রভৃতি কিছুই লাভ হচ্ছে না। অসম্ভবের দেশে হাসি-খুশী-মন নিয়ে আনন্দের সঙ্গে তারা বিচরণ করতে পারছে সত্যি, কিন্তু তা থেকে শাশ্বত মূল্যবান কিছু আহৃত হচ্ছে বলে মনে হয় না। অতি আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে কয়েকজন সাহিত্যিক কৌতূহলকে কেন্দ্র ও বাহন করে মানবসেবা, সহৃদয়তা, পরোপকার, দয়া, আত্মত্যাগ, স্বার্থবিসর্জন প্রভৃতি

নানা সদ্‌প্রবৃত্তির অনুশীলন-সম্ভাবনাকে তাদের দৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার প্রয়াস করেছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই কার্যকরী হ'বে। কৌতুহলের রথে চড়ে যেমন বিস্ময়কর রোমাঞ্চ-কাহিনীর অনুধাবন আনন্দময় তেমনি কৌতুহলের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপস্থাপন ভবিষ্যতের দিক হ'তে কল্যাণ-সম্ভাবনাময়। যুগটা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, চলেছে অনাগত কালকে বর্তমানের গণ্ডী দিয়ে বাঁধতে, চলেছে দূর ভবিষ্যৎকে সীমার মধ্যে আনতে। সেই যুগজয়-যাত্রার সন্ধিক্ষণে শিশু-মানস শুধু কল্পলোকের ফানুসে চড়ে মায়ার দুরবীনে তার দুনিয়াটাকে লক্ষ্য করে বেড়ালে নিরর্থক অলস ভাবপ্রবণতার আবেশজালে বদ্ধ হওয়া ছাড়া আর বেশী কী লাভ করতে পারে? তাই তার পরিক্রমার মধ্যে তাকে বস্তুর সন্ধান দিতে হ'বে, আদর্শের লক্ষ্য উদ্‌ঘাটিত করতে হ'বে। এরা যে শিশু, তুচ্ছতার উর্ধ্বে এদের স্থান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি—এই দৃষ্টিভঙ্গী ওদের বুদ্ধিকে পঙ্গু করে দেবে, ব্যাহত করে দেবে। তাই তাদের কৌতুহলকে অসম্ভবের দেশ থেকে টেনে এনে সম্ভবের আনন্দমেলার পরিবেশন করতে হ'বে।

শিশুমানসের আর একটা দিকের কথা আলোচনা করে এই প্রবন্ধের আপাত যবনিকা টানবো। সৌন্দর্যপ্রীতি শিশুর মানস লোককে একেবারে পূর্ণ করে রেখেছে। এই সূক্ষ্মরস-শিল্পকলার অনুশীলন সহজ নয় এবং বড়ই দুঃসাধ্য। কেন না সৌন্দর্যের অনুভূতি নিতান্তই আপেক্ষিক। একজন যাকে বললে সৌন্দর্যের পিরামিড, অপর একজন তার দিকে নাসিকা কুঞ্চন করলে তাকে অকিঞ্চিৎকর ভেবে। অতি স্থূল শিল্পকলা বা রসবৈচিত্র্য অনেক সময় পরিবেশ-সাহচর্যে উচ্চশ্রেণীর জাতে উঠে যায়। শিশুর মানসিক সৌন্দর্যলিপ্সার স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণই বার বার অসুন্দর থেকে, সুন্দরের প্রতি টেনে নিয়ে যায়। অবশ্য এর জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হতে পারে। সেটা হ'চ্ছে কৃত্রিম পরিবেশ গঠন বা স্বাভাবিক পরিবেশের সন্ধান। আমি অতি আধুনিক নামকরা শিশুবিদ্যালয় দেখেছি। অনাড়ম্বর নীরস সজ্জাহীন কক্ষ, সাদা দেওয়াল,—শিশুর দৃষ্টি বার বার কিসের সন্ধান করে যেন ফিরে আসছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কৌতুহলী চক্ষুর্দ্বয় কোথায় তার মনের আনন্দ সৌন্দর্যের দ্বারে গিয়ে অভিনন্দন জানাবে। সাদা দেওয়ালের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা নির্লিপ্ত নিরাকার। তা দিয়ে পরম ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান যতটা সহজ, শিশুর মনোজগতে আনন্দলহরী তোলা ততটা সহজ নয়। তাকে চিনতে হবে সাদা, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে হ'বে লাল গোলাপ আর আকাশের নীলিমা। ছড়া পাঠের ধ্বনিমাধুর্য, শব্দ ঝঙ্কারের লালিত্য, সঙ্গীতের দোলা, রঙতুফানের বৈচিত্র্য—সকলগুলিকে বিভিন্ন, বিরুদ্ধ, সমধর্মী সর্বরকম পরিবেশের মধ্য দিয়েই পরিচিত করে তুলতে হ'বে। তারপর সেই পরিবেশ তাকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে দেবে কোন্‌টা সত্যিকার আনন্দ দিতে পারে, কোন্‌টা মনের খুশির তারে সুর দেয় না। এই সৌন্দর্যবোধের প্রকৃত ও যথার্থ অনুশীলন যদি সার্থকভাবে তার জীবনে প্রতিক্রিয়া তুলতে পারে, শিশুমানসের প্রতি গঠনের মধ্যে, প্রতিটি অণু ও পরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে, তাহলে তার শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভে সত্যিকারের সদ্‌গুণের বীজ একটা রোপিত হ'ল বলে মনে করা সম্ভব। সত্যিকার সৌন্দর্যজ্ঞানহীন মানুষ সমাজ-জীবনে অর্থহীন প্রহসন। সেই প্রহসন-অভিনয়ের মহলা দেবার ক্ষেত্র যদি হয় শিশুমানস তাহলে সেটা সত্যিই দুঃখের।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৌতুহলকে বিপথগামী আর সৌন্দর্যবোধকে দমিত না করে অনুপ্রেরণা দিয়ে কল্যাণের পথে চালিয়ে দেবার জন্য ছোট অবস্থা থেকে একটা ঠিক পথ নির্দিষ্ট করতে পারা অত্যাবশ্যক। এদেশের সঙ্গে প্রগতিশীল অপরাপর দেশের অনেক পার্থক্য। এদেশের শিশুশক্তি অবহেলিত আর শিশু-মানস অবজ্ঞাত। যখন শিশুর জীবন শৈশবের কোমলতা থেকে মুক্ত হ'বে, তখন তাকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যেতেও পারে, তার আগে কিন্তু নয়। সুতরাং এর ফলাফল হচ্ছে কোমল মনের কমল-বনে কাঁটাগুলো অক্ষয় হয়ে থাকছে। মানস লোকের ভাবালোকে শিশুরা শিশু কিন্তু সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ জগতে তারা যে অনেক বড়, অনেক দীপ্ত, জ্যোতির্ময় আর ভাস্বর। সেই দিকটা ভাববার যুগ কি আসেনি?

সমালোচনা

বেদান্ত-পরিচয় (২য় সংস্করণ)—হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীকনকেন্দ্র নাথ দত্ত; ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; পৃষ্ঠা—২৫৭; মূল্য—২।০ আনা।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় যে কয়খানি অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এই বইটি তাহাদের অন্যতম। এগারো বৎসর পূর্বে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। এখন ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশক বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদ-ভাজন হইলেন। জীব, জগৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে উপনিষদের বিবিধ সিদ্ধান্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সবল যুক্তিসহ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং কিছু কিছু অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেও সানুবাদ প্রচুর উদ্ধৃতি পুস্তকের ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সংক্ষেপে বেদান্তের সহজ এবং সুসমঞ্জস পরিচয় উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থটি সত্যই সার্থক-নামা।

কর্মবাদ ও জন্মান্তর (৩য় সংস্করণ)—লেখক ও প্রকাশক—পূর্বপুস্তকোক্ত। পৃষ্ঠা—৩০৪ +।০; মূল্য আড়াই টাকা।

কর্মবাদ ও জন্মান্তর সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হীরেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে বহু প্রমাণ এবং মনোজ্ঞ যুক্তিসহায়ে নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তুলনামূলক নিবন্ধগুলি বিশেষ মূল্যবান। বহু স্থানে জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ স্বচ্ছ ভাষা এবং উপস্থাপনের গুণে উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উপনিষদ্—জড় ও জীবতত্ত্ব—লেখক ও প্রকাশক—ঐ। পৃষ্ঠা—৫৬৪+৷৷৵০; মূল্য—পাঁচ টাকা।

হীরেন্দ্রবাবুর পরিণত বয়সের লেখা এই বৃহৎ গ্রন্থটি তিনি জীবৎকালে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। জীব ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদে যে সকল উক্তি বিকীর্ণ আছে তাহাদিগকে প্রসঙ্গানুযায়ী সাজাইয়া বিস্তারিত সুসমঞ্জস আলোচনা দ্বারা উহাদের তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। ঔপনিষদ সিদ্ধান্তে জীব এবং প্রকৃতি উভয়ই তত্ত্বত ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলেও যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ হইতেছে ততদিন ইহাদিগকে মানিতে হয়, উহাদের নানা স্তর অতিক্রম করিতে হয়। জীবদেহকে আশ্রয় করিয়া প্রাণশক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি এবং ঐ অভিব্যক্তির পথে প্রকৃতির বহুতর সূক্ষ্মস্তরে সংস্পর্শের কথা উপনিষদে বর্ণিত আছে। এই সকলের যথার্থ মর্ম প্রাচীন ভাষ্যটীকা-সমূহের ব্যাখ্যা হইতে বর্তমান পাশ্চাত্ত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত মন ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় চিন্তাধারায় অগাধ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার বর্তমান কালোপযোগী করিয়া সেই মর্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টা যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে তাহা বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই। এই উৎকৃষ্ট দার্শনিক (এবং বৈজ্ঞানিকও বটে) গ্রন্থ কঠিন হইলেও উপনিষদের ভাবধারার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রের অবশ্য পাঠ্য।

প্রেমাঞ্জলি (গীতি-সংগ্রহ)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রচিত এবং শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২; পৃষ্ঠা—১৯৯+৪৩; মূল্য—৪৲ টাকা।

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম নিবাসিনী ভাব-সাধিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর স্বতঃ উৎসারিত হিন্দীভজনগুলির পরিচয় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত শ্রুতাঞ্জলি বইটিতে আমরা পাইয়াছি। এই গ্রন্থের ভজনগুলিও অনুরূপ আধ্যাত্মিক দ্যোতনাপূর্ণ এবং মাধুর্যরসে ভরপুর। হিন্দী গানগুলির বাংলা গীতিকায় রূপদানে শ্রীদিলীপকুমারের আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। মূল রচয়িত্রীর স্মিতহাস্য-রঞ্জিত নিমীলিত-নয়ন 'সমাধি' মূর্তির আলেখ্যদ্বয় এবং অনুবাদকের ভাব-বিহ্বল সাধক-বেশের আলোকচিত্র পুস্তকের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পীড়িত সেবা— মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনাধীনে সর্বসাধারণের জন্য পীড়িত-সেবা-প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাদ্রাজ শহরে একটি বৃহৎ চিকিৎসা-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। এখানে শুধু বহির্বিভাগই আছে। ১৯৫১ সালে এই চিকিৎসালয়ের সুযোগ এবং সেবা গ্রহণ করেন ৮১,৭৪২ জন রোগী। এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি, এই দুই ধারাতেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ অস্ত্রোপচারের সাহায্য লইয়াছিলেন ৩,৬২২জন রোগী; ১২,২০৪ জন দুঃস্থ স্ত্রীলোক ও শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আচার্য শঙ্করের জন্মস্থানে অনুষ্ঠান— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জয়ন্তী এবং ভগবান শংকরাচার্যের আবির্ভাবোৎসব কালাডী (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য) অদ্বৈত আশ্রমে ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) পর্যন্ত সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন বেলা ১০ ঘটিকায় উৎসবের উদ্বোধন করেন 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ব্যারিষ্টার শ্রী কে, পি, কেশবমেনন। অপরাহ্নে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ভি মাধবনের নেতৃত্বে আয়ুর্বেদ সম্মিলনের সমারম্ভ এবং হরিপাদের রাজা-কর্তৃক আশ্রম-গুরুকুলের নবনির্মিত ছাত্রাবাসগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল হরিজন-সম্মেলন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কে কোচুকুট্টন হরিজনদের সর্বপ্রকার সামাজিক উন্নতিকল্পে দেশের শিক্ষিত এবং বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবেদন জানান। পরদিবস শিক্ষাবিষয়ক একটি সভার অধিবেশন বসে; উহার সভাপতি ছিলেন এরণাকুলম্ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় কে, এস্, গোবিন্দ পিল্লাই। আশ্রম হইতে প্রকাশিত মালয়লম্ মাসিকপত্র 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' কার্যালয়ের নবনির্মিত গৃহেরও তিনি উদ্বোধন করেন। ঐ দিবসেই আয়োজিত মহিলা-সভায় ডাক্তার শ্রীমতী কমলা রামআয়ার সভা-নেত্রীর অভিভাষণ-প্রসঙ্গে শ্রীশংকর ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তাঁহাদের মাতা ও সহধর্মিণীর প্রভাব বিষয়ে এবং সমাজে নারীগণের স্থান-সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সভাপতির পদে বৃত হইয়া চতুর্থ দিনে আয়োজিত হিন্দুধর্ম-সম্মেলনে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে এক প্রাণবন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামী পরমানন্দ তীর্থপাদ, স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দ, পণ্ডিত গোবিন্দন্ নাম্বিয়ার, স্বামী আদিদেবানন্দ, শ্রী এ, আর দামোদরন নাম্বিয়ার এবং স্বামী শুদ্ধসত্বানন্দ যথাক্রমে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্য, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর টি, এম, পি, মহাদেবন, শ্রীশংকরাচার্য প্রসঙ্গে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

উৎসবের শেষদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের একটি সম্মেলন বসিয়াছিল। স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ছিলেন অন্যতম বক্তা। ঐ দিন অপরাহ্নে একটি ধর্ম সম্মেলনেরও আয়োজন হয়। পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসবসূচির মধ্যবর্তী সঙ্গীত, হরিকথা, ভাগবৎ-পাঠ, গীতালোচনা, 'উত্তান তুলাল,' কথাকলি-নৃত্য এবং তরবারী ও বর্শা-ক্রীড়া ইত্যাদির অবতারণা কালোপযোগী ও সর্বজনোপভোগ্য হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ-সেবা — আহমদনগর জেলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে মিশন ১৬ই মার্চ হইতে সেবাকার্য পরিচালিত করিতেছেন; উহার জুন মাসের উত্তরার্ধের বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম সপ্তাহে চারিটি কেন্দ্র হইতে ১০,৭৩৩ নরনারীকে রন্ধিত খাদ্য এবং ৩৫টি গ্রামের ৪৬১টি পরিবারের ১০৮৯ ব্যক্তিকে অরন্ধিত খাদ্য বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ১১,১৯৩; ৩৫; ৬৪৬ এবং ১৩৮৫।

কেদার বদরীর পথে প্রচার—১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্যন্ত কেদারনাথ ও বদরী-নারায়ণের পথে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ৯টি স্থানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবালোকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীনগরে শ্রোতৃ-সংখ্যা ছিল ৫০০, অন্যান্য স্থানে ১০০ হইতে ৩৫০ পর্যন্ত।

বালিয়াটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উৎসব ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তিন দিন ধরিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বার শতেরও অধিক হিন্দু মুসলমান নরনারীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছে। জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ,স্বামী যোগস্থানন্দ এবং স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেন। এই সভাতে বালিয়াটী ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। তৎপরদিন মহিলাবৃন্দের জন্যও একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে বালিয়াটীর যুবকবৃন্দ কর্তৃক "মানুষ" নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

কলম্বোয় উৎসব—কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে মাননীয় মন্ত্রী মিঃ এ, রত্নায়েকের পৌরোহিত্যে একটি জনসভা হইয়াছিল। মিঃ কে, আম্বাপিল্লাই এবং মিঃ ভি সৎশিবম (তামিল ভাষায়) যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের নব জাগরণ' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ' সম্পর্কে সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ডক্টর এ, সিন্নাতাম্বী সিংহল দ্বীপের নানা স্থানে মিশনের সেবাকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২৮শে মার্চ প্রহ্লাদচরিত বিষয়ক 'কথাপ্রসংগম্' বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম স্মৃতিবার্ষিকী পালিত হয় ২৯শে মার্চ। অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় মন্ত্রী মিঃ এস্ নটেশন্। ঠাকুরের জীবনীর বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা দেন মুদালিয়র এস্ সিন্নাতাম্বী, মিঃ এফ রুস্তমজী, ডক্টর কুমারন্ রত্নম্ এবং মিস্ এইচ চাল টন্। ৫ই এপ্রিল রবিবার তামিল ও সিংহলী ভাষায় বক্তৃতা করেন স্বামী বরানন্দ এবং মুহন্দীরম্ পি বাকওয়েল্লা। আশ্রমে প্রায় এক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়। উৎসবের সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, মিঃ টি, এস্ সান্ত্রশেখরম ও তাঁহার দল এবং কুমারী কমলা রত্নাকরম্ ও মিঃ কে বাকওয়েল্লা।

মার্কিণ বেদান্ত-কেন্দ্রের স্থায়ী আবাস—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সেণ্ট লুই বেদান্ত সমিতির নূতন গৃহ এবং উপাসনালয় উৎসর্গকল্পে গত ১০ই ডিসেম্বর একটি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে ঐদিন প্রাতে বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বৈকালিকী জনসভায়

সভ্যবৃন্দ, পৃষ্ঠপোষকগণ, এবং বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি মণ্ডলী উপস্থিত থাকেন।

বাদ্যসংযোগে উদ্বোধনী প্রার্থনান্তে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী সমবেত অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি সংস্কৃতে প্রার্থনা (ইংরেজী অনুবাদসহ) পাঠ করিয়া গৃহ ও ভজনালয়টি ভগবৎ উদ্দেশে নিবেদন করেন এবং সর্বধর্মের মহান আচার্য, সাধু-সন্ত, প্রত্যক্ষদ্রষ্ট'দের ও ঈশ্বর এবং মানবের সেবায় আজীবন ব্রতী নরনারীগণের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ এবং আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রপরিচালকগণের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

বোষ্টন বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী প্রধান অতিথিপদে বৃত হইয়া 'বেদান্ত এবং চলতি সময়ের সমস্যা' সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর এল পি চেম্বার্স মানবগোষ্ঠীর একের প্রতি অপরের হৃদয়-হীন আচরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে যুদ্ধের এবং তদানুষঙ্গিক উৎপাতগুলির জন্য দায়ী মানুষের জঘন্য লোভ এবং দম্ভ। একমাত্র ভগবদ্‌বিশ্বাসই মানবকে প্রকৃত শান্তি এবং বিশ্বপ্রেমের পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং বেদান্ত এই জগৎপ্রীতির লক্ষ্যপথ সকলকে শিখাইয়া চলিতেছে। সেণ্ট লুই-এর প্রথম ইউনিটেরিয়ান গির্জার আচার্য ডক্টর থাদ্দিয়ুস্ ক্লার্ক (Thaddeus Clark) তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান এবং বেদান্ত সমিতির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং উদার ভাবের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সমস্ত মতের এবং ধর্মের মধ্যে এইরূপই সৌহার্দ থাকা বাঞ্ছনীয়। আওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এল্, এ, ওয়্যার (L. A. Ware) বলেন,—"সেণ্ট লুই বেদান্ত সমিতির কর্মপরিধি এই নূতন উপাসনালয়টির নির্মাণের সাথে সাথে আরও আগাইয়া গিয়াছে। এদেশবাসীর জন্য বেদান্ত সমিতিগুলি যে কাজ করিতেছেন, তাহা আমাকে কয়েক বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই সন্ন্যাসীরা যে সভ্যতার ভবিষ্যৎ আশার একটি উৎস-স্থল—একথা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।"

নিউইয়র্ক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্রের বিংশতিবর্ষ পূরণ—গত ১৬ই মে এই কেন্দ্রটির বিংশতিতম স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এইদিন সন্ধ্যা ৭টায় একটি প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা হয়। উহাতে ১৫০ জনেরও অধিক অতিথি যোগদান করেন।

বিখ্যাত ভারতীয় গায়ক শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের একটি জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রীতিভোজের পরবর্তী কর্মসূচী ছিল কয়েকজন খ্যাতনামা বক্তার ভাষণ। প্রধান বক্তার আসন অলংকৃত করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারতীয় রাজদূত মাননীয় শ্রী জি. এল. মেহতা। স্বামী নিখিলানন্দ পরিচালিত এই বেদান্ত কেন্দ্র তাহার সফল জীবনের বিশ বৎসর অতিক্রম করায় তিনি অভিনন্দন জানান। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী উল্লেখপ্রসঙ্গে শ্রীমেহতা বলেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ঐতিহ্যানুসরণে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমেরিকায় ভারতের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত। নিউ-ইয়র্ক ক্রাইষ্ট চার্চের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ওয়েণ্ডেল ফিলিপস্ বর্তমান জগতে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হোরেস্ এল্ ফ্রীস্ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসৃষ্টিকল্পে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সমিতির কার্যের সমূহ প্রশংসা করেন। অতঃপর স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া

আমেরিকায় সম্ভ আগত এবং কেন্দ্রের অতিথিরূপে অবস্থিত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অনন্তর সারা লরেন্স কলেজের অধ্যাপক জোসেফ ক্যাম্পবেলের ভাষণান্তে স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে সমবেত বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কেন্দ্রের পূর্বের কয়েকজন কর্মীর পূত স্মৃতি আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রীদিলীপ রায় শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের 'নির্বাণষট্‌কম্' এর সুরাবৃত্তি ও নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দ সমাপ্তি প্রার্থনা করেন।

আশ্রমের পুনর্নির্মিত উপাসনালয়টি উৎসর্গ ১৭ই মে সকালবেলা মহাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীজি. এল. মেটা 'ভারত এবং আমেরিকা', এই বিষয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক সংযোগের একটি সুন্দর বিবরণা প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন যে, আমেরিকার নিকট ভারতবাসীর শিক্ষার দুইটি বিষয় আছে; প্রথম হইতেছে সজীব আশার ভাব, আত্মপ্রত্যয়, উদ্যম ও সাহস এবং দ্বিতীয় হইল মানব-সম্পর্কে মৌলিক প্রজাতন্ত্র এবং শ্রমের মর্যাদা।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী—শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিগৃহীত হইয়াছে—

(১) ১৩৬০ সালের পৌষ মাস হইতে ১৩৬১ সালের পৌষ মাস পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে।

(২) ভারতের মহীয়সী নারীদিগের জীবনী-সম্বলিত একখানি বিস্তৃত জীবনী মুদ্রিত হইবে।

(৩) বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী-ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক বিস্তৃত জীবনী মুদ্রিত হইবে।

(৪) ভারতীয় ও বৈদেশিক বিভিন্ন ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী মুদ্রণের ব্যবস্থা।

(৫) হিন্দীভাষায় "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" মুদ্রণ।

(৬) শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন অবস্থার এবং তাঁহার স্মৃতি-জড়িত প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ফটো সম্বলিত একখানি এলবাম্ প্রকাশ।

(৭) শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ স্থান-গুলিতে 'স্মৃতি-ফলক' রাখিবার ব্যবস্থা।

(৮) শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

(৯) সার্বভারতীয় নারী-কৃষ্টি-অধিবেশন এবং শিল্প ও কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।

(১০) সর্বসাধারণ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের নারী-ভক্তবৃন্দের দ্বারা একটী ধর্মসম্মেলনের ব্যবস্থা।

(১২) শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

(১৩) মহিলা সঙ্গীত-সম্মেলনের ব্যবস্থা।

(১৪) কামারপুকুর, জয়রামবাটী এবং শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে তীর্থযাত্রার আয়োজন করা হইবে।

সহানুভূতিশীল জনসাধারণের নিকট এই নিবেদন জানান যাইতেছে যে, এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য, তাঁহাদের কোন প্রস্তাব থাকিলে শতবর্ষ জয়ন্তীর সম্পাদকের নিকট যেন অনতিবিলম্বে প্রেরণ করেন।

(স্বাঃ) স্বামী অবিনাশানন্দ
সম্পাদক,
শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী
বেলুড়মঠ, হাওড়া

পরলোকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গমাতার বড় দুর্দিনে তাঁহার কৃতী বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদকে ৯ই আষাঢ় (২৩শে জুন) বঙ্গজননীর স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদূর কাশ্মীরে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার ন্যায় আন্তরিক দেশপ্রেম- এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তি-সম্পন্ন দৃঢ়চরিত্র নির্ভীক নেতার অভাব সত্যই অপূরণীয়। বাঙ্গালী আজ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক—ত্রিবিধ জীবনেই বিবিধ সঙ্কটের উপর্যুপরি নির্মম আঘাতে মুমূর্ষু। নিঃসীম নৈরাশ্যের নীরন্ধ্র অন্ধকারে শ্যামাপ্রসাদের গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্ব ছিল বাঙ্গালীর অন্যতম আশা-বর্তিকা। সে দীপ অকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিভিয়া গেল।

শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে তাঁর মহাপ্রাণ পিতা স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যে উদার কীর্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদ স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা উহাকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠই করেন নাই, দেশসেবার আরও বহুতর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের এইরূপ যুগ্ম যশস্বিতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-সেবার আদর্শে শ্যামাপ্রসাদের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কাজে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে যোগ দিতেন ও সহায়তা করিতেন। এই বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট্ হলে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় তিনি বলিয়াছিলেন,—ভারতকে আজ জগতের পথপ্রদর্শকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতের নব জাগরণের বিপ্লবী নায়ক স্বামিজীর বাণী ও আদর্শের অনুসরণই একমাত্র পন্থা।

শ্যামাপ্রসাদের গৌরবময় কর্মজীবনের অনেক কথা বিবিধ সংবাদ ও সাময়িকপত্রে বিস্তারিত-ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এস্থলে আমরা আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। প্রার্থনা,—জাতির ধর্ম ও ঐতিহ্যে অটুট-আস্থাসম্পন্ন এইরূপ স্বদেশসেবৈকলক্ষ্য অক্লান্ত কর্মযোগী বাংলা এবং ভারতে বহুসংখ্যক দেখা দিক।

বিবিধ সংবাদ

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি—গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সমিতির বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও ব্রহ্মচারী নেপাল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। পাঁচ-শতের অধিক লোক বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছে। অপরাহ্নে সেবাসমিতির বাৎসরিক সভা হয়। পূর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীমুনীন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সমিতির ১৩৫০ সনের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করা হয়। উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ, ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন, জনাব

গোলাম রসুল খন্দকার এবং সভাপতি মহাশয় সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা দান করেন। এই উপলক্ষে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া আশ্রম ভবনে জগতের বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণের প্রসংগ আলোচিত হয়। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী সত্যকামানন্দ আশ্রম ভবনে পদার্পণ করেন। ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সম্বুদ্ধানন্দজী দিঘলী গান্ধী আশ্রমে "আমাদের বর্তমান কর্তব্য" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্— ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্প্রতি চার সপ্তাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এসে পূর্বাঞ্চলের ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে ক্যালিফোর্ণিয়া পর্যন্ত সমগ্র দেশটির এক দিক থেকে আরেক দিককার সমুদয় বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বক্তৃতা দিয়েছেন।

এই বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা বিশ্বগণতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সভ্যতার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বহু বিচিত্র বিষয়ে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন তাদের কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া যাচ্ছে: হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়াশিংটনের বিখ্যাত নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়); মেরি ওয়াশিংটন কলেজ, ফ্রেডারিক্সবার্গ (ভার্জিনিয়া); কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউইয়র্ক সিটি); ওবের্লিন কলেজ (ওহায়ো); ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে) এবং ক্যালিফোর্ণিয়ার অন্তর্গত ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (পালো আল্‌টো); শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় (ইলিনয়েজ) ইত্যাদি।

সানফ্রান্সিসকোতে ৫০০ নাগরিকের এক বৈঠকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন: পৃথিবী এক মহা সংকটের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্ব বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসা অতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পরমাণু-শক্তিকে আমরা কাজে খাটাতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এ সবের চরম লক্ষ্য কি? কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এই ক্ষমতাকে? এই পৃথিবীকে নিয়ে আমরা কি করবো? স্বাভাবিক বসবাসের যোগ্য ভূমি-রূপে গড়ে তুলবো অথবা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবো।

বর্তমান সভ্যতার লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নটির উত্তর অতি সুস্পষ্ট: আমাদের ধর্মানুরাগ এবং অন্তর্নিহিত শক্তিকে দ্বিগুণ বলিয়ান না করে তুললে, মানুষ তার নিজস্ব চরিত্রকে, মতামতকে সমষ্টিগত স্বার্থপরতাকে সংযত না রাখতে পারলে আমাদের এই সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করবার কিছু নেই।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অতি সুদীর্ঘ-কালের। যীশুখৃষ্টের জন্মের ২ হাজার বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত, প্রতি পর্যায়ে পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রভাবিত করে এসেছে এই সভ্যতা।

বন্য পশুবেষ্টিত, ধ্যানমগ্ন একটি দেবতার মূর্তি আছে; বিদেশীরা ভারতে এসে ঐ মূর্তিটির কাছে এই ইঙ্গিত লাভ করেন: নগরবিজয়ী বীরের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর সে, যে আত্মজয়ী। এই বাণী বিতরিত হচ্ছে স্মরণাতীত কাল থেকে। ভারতের এই বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন আলেক-জাণ্ডার। আজও বহু সুমার্জিত, ধীসম্পন্ন মনীষী এই বাণীটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

(আমেরিকান রিপোর্টারের সৌজন্যে)

উদ্বোধন

আর্তি

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে ॥

জন্মে তব ব্রজভূমি লভি চলে জয় হতে জয়
শাশ্বত কালের তরে সেই পুর লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত।
তোমা লাগি কোন মতে দেহে প্রাণ রাখি দিশ-চয়
ব্যাকুল খুঁজিয়া ফিরি, দেখা দাও জীবন-দয়িত।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥

এসেছে কঠিন মৃত্যু বিষ-জলে রাক্ষসের গ্রাসে
প্রবর্ষণে ঝঞ্ঝা-বাতে অগ্নিপাতে তীব্র বিদ্যুতের;
এসেছে অনর্থ শত ধরাতলে, সুদূর আকাশে,
সব ভয় হতে প্রভু, বার বার বাঁচালে মোদের।

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥

গোপিকানন্দন শুধু নহে তব এই পরিচয়
অখিল জীবের হৃদে বিরাজিছ অন্তর-চেতনা।
ব্রহ্মার আহ্বানে সখা যদুকুলে তোমার উদয়
আসিলে মানব-দেহে ঘুচাইতে বিশ্বের বেদনা।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥

সুধামাখা তব কথা তাপিতেরে দেয় নব প্রাণ
নিমেষে কলুষ হরে, ধন্য করে কবির লেখনী—
শুনিলে মঙ্গল আর শান্তি, যাঁরা প্রচারিয়া যান
দিকে দিকে এ ভুবনে—তাঁহাদেরি শ্রেষ্ঠ দাতা গণি।

(গোপী-গীতি শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।১,৩,৪,৯)

কথাপ্রসঙ্গে

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি বৎসরান্তে পুনরায় হিন্দু-ভারতের হৃদয়ে বিচিত্র আবেগ-সম্ভার জাগাইবার জন্য আগতপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণ বালক-বালিকার ক্রীড়া-সাথী, তরুণ-তরুণীর প্রেমের দেবতা, গৃহীর দুর্গম সংসার-পথে কর্তব্য-প্রেরণা- ও অভয়-দাতা, সন্ন্যাসীর মোক্ষোপদেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের। এই লোকোত্তর পুরুষ মানুষের জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রে কী ব্যাপকভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার যাবতীয় সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে আমরা যেন দেখিয়াছি, একান্তভাবে মানুষরূপে। মা যশোদার মতো ভাবি,—গোপাল, তুমি মুখ বন্ধ কর—তোমার মুখের ভিতর 'সূর্য-চন্দ্র-বহ্নি-বায়ু-সমুদ্র-পর্বত-দ্যাবাপৃথিবী-আকাশ-সমন্বিত স্থির-জঙ্গমাত্মক' কী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উঁকি মারিতেছে তাহা দেখিবার আমার প্রয়োজন নাই। তুমি শিশুটি হইয়া আমার কাছে থাকো। ব্রজ-গোপিকার ধারায় উদ্ধবের সহিত তর্ক করি,—তিনি নিখিল বিশ্ব-নিয়ন্তা ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান হইতে পারেন, কিন্তু সে বিভূতি ভাবিয়া আমাদের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। তিনি যে আমাদের প্রাণের কৃষ্ণ, আমাদের মনের মানুষ, আমাদের প্রিয়। অর্জুনের ন্যায় মিনতি জানাই,—হে প্রভু, তোমার বিশ্বরূপ সংবরণ কর, আমার চক্ষু তোমার যে রূপ দেখিতে অভ্যস্ত সেই 'সৌম্য মানুষমূর্তি' ধরিয়া আমায় প্রকৃতিস্থ কর।

মানুষ নিজে বহুতর দ্বন্দ্ব-সমাচ্ছন্ন জীব। যুগপৎ তাহার ভিতর আলোক-আঁধার, ভালবাসা-ঘৃণা, শৌর্য-ভয়। মানুষের এই চিরন্তন সাথীটির ব্যক্তিত্বেও প্রকট হইয়াছিল বিপুল বৈপরীত্য-চয় সীমাহীন ক্রীড়া-চাপল্য আবার উত্তুঙ্গ গাম্ভীর্য, প্রচণ্ড কর্ম-ব্যাপৃতি আবার অদ্ভুত জ্ঞান-স্তব্ধতা, অসংখ্য পাত্রের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ আবার সর্ববন্ধন-মুক্ত নির্মম নির্লিপ্ততা। কৃষ্ণ পীতাম্বর শিখিপুচ্ছভূষণ বংশীধর বনমালী—কৃষ্ণ রাজপরিচ্ছদ-পরিহিত শস্ত্রপাণি ধৃতাশ্ববল্গ পার্থ-সারথি। কিন্তু মানুষে আর এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠে বৈপরীত্য-সমন্বয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ ত্রিগুণের অধীন বলিয়া দ্বন্দ্ব তাহাকে 'আচ্ছন্ন' করে, আলোক-আঁধারে সে মিশিয়া যায়—উহাদের ঊর্ধ্বে পৃথক করিয়া সে নিজেকে তুলিয়া রাখিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ভগবান—ত্রিগুণের অতীত; তাই ভাব-দ্বন্দ্ব তাঁহার চরিত্রে অভিব্যক্ত হইলেও তিনি উহাদের 'বশীভূত' ছিলেন না। ঐ দ্বন্দ্ব বাস্তবিক দ্বন্দ্ব নয়। তাঁহার প্রত্যেকটি ভাবই নিবিড় মঙ্গলানুস্যূত। 'যুগপৎ' তিনি কোমল-কঠোর, রুদ্র সংগ্রাম-পরিচালন-মূর্তির পাশে পাশে তাঁহার স্নিগ্ধ বেণুবাদনরত বঙ্কিম-রূপও যেন সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আমরা আজ তাঁহার কোন্ মূর্তির ধ্যান করিব? অবসর না থাকিলে খেলা জমে না, স্বাচ্ছন্দ্য না আসিলে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠ হয় না, নির্বাধ অবকাশ না পাইলে সঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না। সর্ব-সাধারণের জীবনে আজ অবসর নাই, স্বস্তি নাই, নিরাপত্তা নাই। ভিতরে বাহিরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলিতেছে। তাই বৃন্দাবন-লীলা শান্তচিত্তে এখন সকলের পক্ষে অনুভব করা সুকঠিন। সর্বসাধারণের জন্য এখন আমাদের চাই পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণের

আবির্ভাব-কালে বিশাল ভারতবর্ষে বহু মত, বহু স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে যে একতা আনিবার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নেতৃত্বে যাহা সংসাধিত হইয়াছিল আজ ভারতে সেই সমস্যাই নবতর রূপে দেখা দিয়াছে। উহা মিটাইবার জন্য যে অকুণ্ঠিত কর্মোদ্যম, দুর্বার সাহস-বীর্য, যে দূরপ্রসারী সত্যদৃষ্টি, উদার সহিষ্ণুতা-প্রেম আবশ্যক তাহা আসিবে মহা-কীর্তি, মহা-ধীর, মহা-শূর শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া। আজিকার ভারতে তাই আমাদের কর্ণ উন্মুখ থাকুক পার্থ-সারথি হৃষীকেশের পাঞ্চজন্য-নিনাদ শুনিবার জন্য। শুনিয়া আমাদের দেহ-মন-প্রাণের সকল ক্লীবতা দূর হউক—আমরা ভারতে পুনরায় 'প্রোজ্ঝিতকৈতব শিবদ পরম বাস্তব ধর্ম'—সুপ্রতিষ্ঠার মহাব্রতে আত্মনিয়োগ করি। এই যুগকর্ম সংসাধন করিলে পর অবসর আসিবে—সেই শাশ্বত বেণুবাদকের বাঁশী শুনিবার অবসর। কুরুক্ষেত্র হইতে তখন আমরা পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইব। তবে এই বিশ্বাসও যেন আমাদের সুস্থির থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিভূতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—তাঁহার অপার্থিব প্রেমলীলা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ হইতে মুছিয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব একটি সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব—তাই, তাঁহার অনুসরণকারী আমাদিগেরও জ্ঞান ও কর্ম কখনও প্রেম হইতে বিযুক্ত হইবে না।

দুই কোণ হইতে

পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। মন্দিরের সম্মুখ-দ্বার হইতে কাতারে কাতারে নরনারী দাঁড়াইয়া—বৃহৎ প্রবেশ-প্রাঙ্গন, দূরবিস্তৃত রাজপথ, চতুষ্পার্শ্বের দ্বিতল-ত্রিতল গৃহের বারান্দা, ছাদ—সর্বত্র মানুষ, মানুষ—বসিয়া, দাঁড়াইয়া, চলিয়া-ফিরিয়া। উদগ্র-আবেগ-বিহ্বল দেবদর্শনে প্রতীক্ষমাণ বিপুল জনতা। ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, উদাসী-গৃহী—বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রকৃতির প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাগম। এই জন-সমুদ্রের একটি কোণে দাঁড়াইয়া কলিকাতা হইতে আগত জনৈক প্রৌঢ় স্তব্ধ-বিস্ময়ে উৎসব-উত্তেজনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে পুলিস আসিয়া ভিড়কে নির্মমভাবে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতেছে—বিগ্রহ যে রাস্তা দিয়া আসিবেন উহা ফাঁকা রাখিতে হইবে। এক একবার চাপে লোকগুলির যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার অবস্থা। কিন্তু সে কষ্টের দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। দেহের আরামকে উপেক্ষা করিয়া দেহাতীত কোন অনুভূতির প্রত্যাশায় সকলে যেন ব্যাকুল। সকলেরই চোখ মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে—কখন দ্বার উন্মুক্ত হইবে, মন্দির-বিহারী ভগবান মন্দিরের বাহিরে আসিয়া রথে উঠিবেন, তাঁহাকে লইয়া সহস্র সহস্র ভক্তকর্তৃক বাহিত রথ রাজপথ দিয়া চলিবে।

শঙ্খ ঘণ্টা তূর্য প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মন্দিরতোরণের দিকে অভিনব উত্তেজনা। ঐ—ঐ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বলভদ্র আসিতেছেন। শুভ্র মূর্তি—কী নয়নাভিরাম শৃঙ্গার! মস্তকে কৌষেয় ছত্র ধরিয়া সেবকগণ ধীরে ধীরে রাস্তার উপর দিয়া হাঁটাইয়া লইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ রথে চড়িয়া সিংহাসনে বসিলেন। তাহার পর সুভদ্রাদেবীর বিগ্রহ সেবকগণ কোলে করিয়া লইয়া মাঝখানের রথে স্থাপন করিল। অবশেষে প্রভু জগন্নাথ আসিতেছেন। কৃষ্ণ মূর্তি। মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে—সারা অঙ্গে নানা আভরণ ঝলমল করিতেছে—গলায় কুসুম-মাল্য দুলিতেছে। জগতের স্বামী সম্মিলিত ভক্তের নয়ন তৃপ্ত করিয়া পদব্রজে রথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

সেই কোণ হইতে কলিকাতার প্রৌঢ়টি সব দেখিতেছেন। তিন বিগ্রহকে তিনটি রথে উচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছে। দলে দলে

নরনারী কাঠের ঢালু পাটাতন দিয়া রথের উপর চড়িতেছে। বিগ্রহত্রয়কে স্পর্শ, আলিঙ্গন এবং পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিতেছে। দশদিকে জয়ধ্বনি—জয়, জয়, জয়, জগতের নাথ জয়। কলিকাতার প্রৌঢ়, অসংখ্যের উদ্বেল হৃদয়াবেগের মধ্যে নিজের বিচার ও অহমিকাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—জড় ও চৈতন্যের, সসীম ও অসীমের এ কী অভিনব বিলাস! কে বলিবে, বিশ্বস্রষ্টা চৈতন্যঘন ভগবান আজ এই জড় কাষ্ঠনির্ম্মিত বিগ্রহে আবির্ভূত হন নাই? কে বলিবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজ এই সসীম দেবমূর্তির পশ্চাতে অসীমকে বাস্তব করিয়া তুলে নাই?

* * *

রাস্তার এক পার্শ্বের একটি ত্রিতল গৃহের বারান্দার এক কোণে ২।৩টি সাহেব মেম বসিয়া আছেন। খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টান মিশনরী। চোখে-মুখে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা। বার বার ক্যামেরা ঠিক করিতেছেন। একবার মন্দিরের তোরণের দিকে, একবার সজ্জিত রথের দিকে, কখনও বা সম্মিলিত জনতার কোন একটি অঞ্চল লক্ষ্য করিয়া ক্যামেরা ঘুরাইয়া বোতাম টিপিতেছেন। নীচে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার ফটো উঠিয়া যাইতেছে। পরে হয়তো সুযোগমত কোন বৈদেশিক কাগজে সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইবে—হিন্দুরা কি করিয়া কাঠের পুতুল সাজাইয়া, ধূলিবিকীর্ণ রাস্তায় দড়ি দিয়া টানিতে টানিতে রথে চড়ায়—ঐ পুতুল সাজাইয়া অন্ধ আবেগে হাততালি দেয়, ছুটাছুটি করে—কি করিয়া হাজার হাজার জীর্ণ-বসন, অর্ধোলঙ্গ বাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুক্তিহীন একটা বিশ্বাসে স্থূল জড়োপাসনায় মাতিয়া ধর্মকে আদিম বর্বরতায় নামাইয়া আনে!

প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে এই শেষের দৃষ্টি-ভঙ্গী কত পৃথক! খ্রীষ্টানরা প্রতিমা-পূজার পটভূমিকা ও মর্মের ভিতর আন্তরিকভাবে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন না বলিয়াই বাহিরের কতকগুলি জিনিস দেখিয়া অপসিদ্ধান্ত গঠন ও প্রচার করেন। পক্ষান্তরে হিন্দুরা কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষাকে কখনও ভুল বুঝেন না।

প্রার্থনায় আন্তরিকতা

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—'মামনুস্মর যুদ্ধ চ'—নিজের কর্তব্য-কর্ম অতন্দ্রিত ভাবে করিয়া চলো কিন্তু উহার পটভূমিকা হউক ঈশ্বর-স্মরণ—তাঁহার উপর বিশ্বাস, নির্ভরতা—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ। আধ্যাত্মিক-দৃষ্টি-বিযুক্ত কর্ম ভারত-সংস্কৃতির দৃষ্টিতে অকর্ম—যত চোখ-ঝলসানোই হউক, উহার মূল্য মাত্র এক পয়সা। স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতে গীতোক্ত এই কর্মযোগ বিশেষভাবে অনুশীলিত ও আচরিত হউক ইহাই চাহিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনে এই আদর্শ বিশেষভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেশকর্মিগণকে তাঁহাদের সেবাকর্ম ঈশ্বর-চিন্তার উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিতেন। নিজে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সকলকে লইয়া প্রার্থনা-সভা করিতেন। দেশের নানা স্থানে সহস্র সহস্র কর্মী এবং সাধারণ দর্শক নরনারীও গান্ধীজীর সহিত বসিয়া এই প্রার্থনায় যোগ দিবার সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। গান্ধীজীর গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসের শক্তি সেই সময়ে সাময়িক-ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্পর্শ করিত।

কিন্তু গান্ধীজীর প্রার্থনা এবং দলে পড়িয়া নিয়ম-রক্ষার প্রার্থনা—এই দুইয়ে যে পার্থক্য কত তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়। আচার্য বিনোবা ভাবে সম্প্রতি সর্বোদয় কর্মিগণের একটি সম্মিলনে এই বিষয়টি অতি সুন্দররূপে বিবৃত করিয়াছেন। হরিজন পত্রিকা (১৮ই জুলাই,

৫৩) হইতে আমরা উহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সকাল-সন্ধ্যা যে প্রার্থনা আমরা করি তাহা আনুষ্ঠানিক আচারে পরিণত হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, বহু প্রতিষ্ঠানে সদাচার হিসাবে, দিনচর্যার অঙ্গস্বরূপে উপাসনা করা হয়। সদাচার ভাল জিনিস, কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করিলে তাহার সুখকর ফলস্বরূপে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, মাত্র সদাচার হিসাবে প্রার্থনা করিলে তাহা পাওয়া যায় না। নিজের জীবন, এমন কি মৃত্যুর ভিতর দিয়াও বাপু এ বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়াছেন। মৃত্যুসময়ে তাঁর মন প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিল এবং প্রার্থনামগ্ন অবস্থাতেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। গুলিতে আহত হইয়া তিনি ঈশ্বরেরই নাম নেন। ইহা আকস্মিক কোন কিছু নয়। তাঁর মন সর্বদাই জাগ্রত থাকিত। দিনে দুইবার তিনি যে প্রার্থনা করিতেন তাহা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না। তিনি অন্তর দিয়া উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে তাঁহার প্রার্থনা চলিতে থাকিত। ইহা কল্পনা বা অহমিকার প্রকাশ নয়। ইহা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান চর্যা। আমাদের প্রার্থনায় আমরা অনুষ্ঠানই পালন করি, গভীরতায় প্রবেশ করি না।

ভাল করিয়া প্রার্থনা করিতে হইলে যে বাহিরের দিকের কাজ বেশি কিছু করার দরকার হয় এমন নয়। সকল প্রস্তুতিই হয় অন্তরে এবং তাহাতে বেশি সময় লাগে না; এক মিনিট সময়ের মধ্যেও তাহা ভাল করিয়া করা যাইতে পারে। ইহা আমাদের মহতী শক্তি দান করিবে। আমাদের জানা উচিত, আমাদের সামনে যে সকল কঠিন কাজ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া অন্য কোন শক্তির উপর আমরা নির্ভর করিতে পারিব না। ঈশ্বরে আন্তরিক বিশ্বাস না রাখিলে, সত্য ও অন্যায় যে সকল সংযম আমরা নির্ভীকচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি তাহা আমরা পালন করিতে পারিব না।"

অভিনব আত্ম-চিকিৎসা

চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘকাল নানা অসুখে (অনেকগুলি কল্পিত) ভুগিয়া, অ্যালোপ্যাথি হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদের ইন্‌জেকশন্-পিল-বটিকায়, তথা, নানা স্থানে চেঞ্জে বহু টাকা খরচ করিয়া যখন কোনই আশার আলোক দেখিতে পাইলেন না তখন অবশেষে মরিয়া হইয়া স্থির করিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহটার জন্য আর অর্থব্যয় করিবেন না, জন্মভূমি হুগলী-জেলার সেই গণ্ডগ্রামটিতে চুপচাপ পড়িয়া থাকিবেন, মরিতে হয় সেখানেই মরিবেন। কলিকাতার এক বনিয়াদী পল্লীতে তাঁহার নিজস্ব ত্রিতলবাটিতে যখন তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন একপঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্ক চৌধুরী মহাশয়কে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের মতো দেখাইতেছিল। শরীর কৃশ, মুখে হাসি নাই, চক্ষুর্দ্বয় দীপ্তিহীন।

সেই চৌধুরী মহাশয় চার মাস পরে যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে প্রথমটা চেনা কঠিন হইয়াছিল। শরীরে বেশ মাংস লাগিয়াছে—যুবকের ন্যায় হাঁটিতেছেন, মনের আশ্চর্য প্রফুল্লতা—চৌধুরী মহাশয় যেন নূতন জীবন পাইয়াছেন!

কি উপায়ে এমন অদ্ভুত আরোগ্য-লাভ সম্ভবপর হইল জিজ্ঞাসিত হইলে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"আত্ম-চিকিৎসা"। সেই অভিনব আত্ম-চিকিৎসার নিষ্কর্ষ এইরূপ :—

গ্রামে গিয়া প্রথম প্রথম মুক্ত আলো-বাতাসে খানিকটা মনের স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু ব্যাধির উপসর্গ তেমন কিছু কমিল না। কলিকাতার মতোই শারীরিক দুর্বলতা এবং প্রাণের নিস্তেজভাব লইয়া ঘরের কোণে বসিয়া নিরানন্দে দিন কাটে। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দূরের একটি সংকীর্তনের আওয়াজ কানে আসিল। অতি মিষ্ট কণ্ঠ। খোঁজ লইয়া জানিলেন বাগ্দীপাড়ায় কীর্তন হইতেছে—মতি বাগ্দীর দল। তাহার পর প্রতি

সন্ধ্যাহেই নিজের অজ্ঞাতে চৌধুরী মহাশয় উৎকর্ণ হইয়া থাকেন কখন কীর্তনের সুর কানে আসে। বেশ লাগে। দূর হইতে শুনিয়া তেমন তেমন তৃপ্তি হয় না। আসরে গিয়া বসিতে ব্যাকুলতা জাগে। কিন্তু বাগ্দীপাড়া—তাহার পর তাঁহার প্রজা। আভিজাত্যে বাধে। কিন্তু 'ভগবানের নামে উঁচু নীচু কি?' এই বিচারই অবশেষে জয়ী হয়। এক দিন লোকলজ্জা এবং বৃথা-মর্যাদাবোধ দূর করিয়া বাগ্দীপাড়ায় গিয়া হাজির হন।' 'কর্তা'কে নিজেদের মধ্যে পাইয়া দরিদ্র প্রজাদের সে কী আনন্দ! জমিদার চৌধুরী মহাশয়েরও জীবনে যেন এক নূতন প্রভাতের উদয়। সমাজের অবহেলিত দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর জনগণের জন্য ক্রমে ক্রমে একটি উদ্বেল সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—উহা রূপ নেয় বাস্তব কর্মে। কীর্তন-উপলক্ষ্য ছাড়াও তাহাদের সহিত মিশিবার, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিবার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সমাজ-কল্যাণ সম্বন্ধে তাহাদিগকে নির্দেশ দিবার সুযোগ ও সময় চৌধুরী মহাশয় করিয়া নেন। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, ব্যাধির কথা কোন্ ফাঁকে কবে যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা আবিষ্কার করেন চার মাস পরে কলিকাতায় ফিরিবার প্রাক্কালে। কী আশ্চর্য, বিনা ঔষধে, বিনা তদবিরে তিনি অদ্ভুত আরোগ্য লাভ করিয়াছেন!

ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া

সম্প্রতি কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া কিছুদিন খুব আন্দোলন চলিল, এখনও (শ্রাবণের মাঝামাঝি) উহার জের মিটে নাই। ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলনে বেপরোয়া ভাবে যোগ দিতে দেখিয়া এবং বিশেষতঃ তাহাদের যোগদানের প্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে এই ধরনের ব্যাপক বিশৃঙ্খল উত্তেজনা জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড আমাদের তরুণদিগের মধ্যে সংক্রামিত হওয়া মঙ্গলকর কি না। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছে। যে সময়ে শরীর-মন-হৃদয়-চরিত্রকে ব্যষ্টিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতির যন্ত্ররূপে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে উহা একটি সাধনার কাল-বিশেষ। ব্যাপক দ্বন্দ্ব, ঘৃণা এবং ক্রোধ সমন্বিত নানা বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে ঐ সাধনা যে ব্যাহত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। তরুণ-মন স্বভাবতই আবেগ-প্রবণ। সেই আবেগকে অতি যত্নে কল্যাণকর শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হয়। একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, উচ্চ ভাব ও আদর্শসমূহের অনুশীলন, শরীর-চর্চা, হৃদয়ের বিস্তার, চরিত্র-গঠন এই সকল ব্যাপৃতিতেই ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে পারে ইহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। অবসর সময়ে কিছু কিছু জন-শিক্ষা ও পল্লী-উন্নয়নরূপ সেবাকার্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা অবশ্যই বিধেয়। তাহারা তাহাদের 'বিশেষ সাধনা' সম্পন্ন করিয়া যথার্থ চরিত্রবান কর্মী হইয়া উঠুক—তাহার পরে নিজদের পরিণত বুদ্ধি-বিবেক লইয়া দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে—এই পরিকল্পনাই কল্যাণকর। বাহিক উত্তেজনা হইতে ছাত্র-ছাত্রীগণকে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। বলিষ্ঠ রাজনীতি, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সার্থক দেশসেবা যদি তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যতে আমরা দেখিতে চাই তাহা হইলে এখন হইতেই উপরোক্ত সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি*

ইডা আনসেল

(৩)

আমাদের পৌছোনর প্রথম রবিবারের দু' সপ্তাহ পরেই সান্ ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকল্ পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার (নাম ব্লাঞ্চ পার্টিংটন্) এসে হাজির হলেন। তিনি এসেছিলেন এই আশ্রমের একটি বিবরণী তাঁদের কাগজের জন্য লিখে নিতে। এই সময়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ক্লাশগুলো বেশ নিয়ম-মাফিকই চলছিল। ভোর পাঁচটার সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর স্তবপাঠে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেতো আর নতুন উপাসনা ঘরটিতে গিয়ে আমরা এক ঘণ্টা করে ধ্যানে বসতাম। প্রাতরাশ হত বেলা আটটায়। দশটা বাজলেই চলত এক ঘণ্টা ধরে পাঠ, আলোচনা—অতঃপর আবার এক ঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হয়ে যাবার পর বিকাল পর্যন্ত আমাদের আর কোন সমবেত 'রুটিন' থাকত না। দিনের শেষ দুই ঘণ্টা আবার আমাদের ধ্যানঘরেই কাটত। সকলের শয্যা নেওয়ার রীতি ছিল রাত দশটায়। প্রতিটি ব্যাপারে আচার্যদেবের সঙ্গে ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তিনি প্রত্যেক কাজে সবাইকে সাহায্য করতেন। প্রত্যেককে উৎসাহ দিতেন, আর সর্বদা থাকতেন স্তবমুখর হয়ে। সুন্দর ছন্দে, উদাত্ত সুরে এবং গুরুগম্ভীর গলায় চলত তাঁর আবৃত্তি। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম 'স্বামী'র সমর-স্তোত্র।

কেউ যদি কখনও বলতেন, "কী আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বামি, নানা মতের ও নানান ভাবের এতগুলি পুরুষ ও নারী কী করে এমন একযোগে শান্তিপূর্ণচিত্তে জীবনযাপন করছে?" —আচার্য তুরীয়ানন্দজী উত্তর দিতেন,—"তার কারণ, সকলকে আমি শাসন করি ভালবাসা দিয়ে। তোমরা সকলেই প্রেমের গ্রন্থিতে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। তাছাড়া কি করে এসব সম্ভব হ'ত? দেখনা, সবাইকে কী রকম বিশ্বাস করি—সকলকে কিরূপ অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি? এ আমি করতে পেরেছি, কারণ জানি তোমরা সবাই আমায় ভালবাস। কারুর মনে কোন খটকা নেই—সকলেই বেশ ধীর স্থির ভাবে চলেছে। কিন্তু মনে রেখো সমস্তই জগজ্জননীর কাজ। আমার কিছুই করবার নেই। যাতে তাঁর কাজ চলতে পারে সেজন্য তিনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে দিয়েছেন ভালবাসা। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে আমরা বিশ্বস্ত থাকবো ততক্ষণ কোনও-রকম ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। যে মুহূর্তে তাঁকে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্তেই ঘনাবে বিপদ। সেইজন্যই তোমাদের বারবার বলি মাকে মনে রাখতে।"

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আত্মসংযমে আচার্যদেব খুব উৎসাহ দিতেন। প্রত্যেকের নানা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে সবাইকে পরিচালিত করতেন। কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম (তিন দিনের

* হলিউড্ বেদান্ত-কেন্দ্রের 'Vedanta and the West' পত্রিকার Sept-Oct, 1952, সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত।

বেশী নয়), অথবা কিছুকাল উপবাস, কিম্বা ধ্যানভজনে সারা এক রাত্রি কাটানো বা মানসিক জড়ত্ব দূর করবার জন্য নিঃসঙ্গে লম্বা একটি ভ্রমণ—ক্ষেত্রবিশেষে এসব ব্যবস্থায় আচার্যদেবের সহানুভূতি ছিল। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নীরব থাকার শপথটিও ছিল একটি সর্বজনপ্রিয় এবং উপকারী বিধান। একা অথবা সবায়ের একযোগে আপ্রাণচেষ্টায় এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করান সম্পূর্ণ নিয়মসঙ্গত বলে মানা হয়েছিল। একদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিগণের উৎপীড়ন-রীতিতে সমাবেশ হত নানাবিধ কলাকৌশল—অন্যদিকে শপথকামীকেও নির্বাক থাকবার জন্য অবলম্বন করতে হত তীক্ষ্ণ সচেতনতা। ধ্যান-ধারণার ক্লাশে সকলে অফুরন্ত উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করতেন। আচার্য তুরীয়ানন্দজী প্রত্যেককে আলাদা আলাদা শিক্ষা দিতেন, এর মধ্যে কোনও লৌকিকতার বালাই ছিল না। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারতো তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাদান, তবে সাধারণত এটা ঘটতো গোধূলিকালে বাইরের দরজার অভিমুখে বেড়াতে বেড়াতে। আবার অনেক শিক্ষোপদেশ আমরা পেতাম বিভিন্ন তাঁবুর মাচায় বসে থাকার সময় এবং প্রাতঃভ্রমণকালে।

এক দিন আমরা সকালে আমাদের আশ্রমে আসবার নানারকম কারণ নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছি—এমন সময় আচার্যদেব সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কি নিয়ে আলোচনা চলছে জিজ্ঞাসা করলেন। সব কথা তাঁকে বলতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা যদি নদীতে পড়ে যাও, বা নিজেরা লাফিয়ে পড় কিংবা কেউ ছুড়ে ফেলে দেয়, ফল কিন্তু একই—জলে ভিজে যাবে। আসবার কারণ যাই থাক না কেন—পালাবার কোন উপায়ই এখন আর তোমাদের নেই। গোখরো সাপে তোমাদের দংশন করেছে—মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

ক্লাশে তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু লিখে রাখতে আমায় বলেছিলেন। তদনুযায়ী প্রস্তুত হবার জন্যে একটি ভোঁতা ছুরী দিয়ে লেখার পেন্‌সিলটি কেটে নিয়েছি, পেন্‌সিলের মুখটা হয়ে দাঁড়িয়েছে খাজকাটা, অসমান। ঠিক এই সময়টিতে আচার্যদেব আমার তাঁবুতে এসে হাজির হলেন। পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে মন্তব্য করলেন, "এই বুঝি তোমার কাজের নমুনা।" তারপর নিজেই ঐ অমসৃণ জায়গাটি সেই ছুরীটি দিয়ে কেটে ঠিক সমান ও সুচালো মুখ করে দিলেন। আমার হাতে ওটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "যে কোনও কাজ কর না কেন, মনে করবে জগন্মাতার পূজা করছ।"

সকালে এক দিন নিজের তাঁবুতে বসে পড়ছি, আচার্যদেব এসে কি পড়ছি জিজ্ঞাসা করলেন। বইটি এমার্সনের রচনাবলী জানালাম। শুনে বললেন, "একেবারে প্রত্যক্ষ আসলটি না নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করছ কেন? অভিষ্টপ্রাপ্তির জন্যে মাকে জোর করে ধর।"

আর একবার তাঁবুতে আসবার সময় আবৃত্তি করছিলেন কবি লংফেলোর পদ্যাংশ:

যদিও বিদ্যা রয়েছে দাঁড়ায়ে অনন্ত
চঞ্চল কাল চলে যে নিয়ত মাতিয়া
যদিও হৃদয়ে শক্তি সাহস চূড়ান্ত
স্পন্দন তবু ঘোষিছে থাকিয়া থাকিয়া;—
শবঢাক বাজে—জীবনের হ'ল বিলয় তো
জানায় কফিন, চলিছে কবরে লুটিতে—
শুনে নে এ আয়ু সেইরূপই প্রতিনিয়ত
আগায়ে ছুটিছে মৃত্যু-সাগরে ডুবিতে।

'বিসর্জনের ঢাকের বাজনার মত', আচার্যদেব অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলেন, তারপর বল্লেন—'জীবন-সঙ্গীত'।

"আচ্ছা, তুমি কি 'জীবনসঙ্গীত' কবিতাটি জানো?"—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তৎকালীন আমেরিকার স্কুলগুলির প্রতিটি ছাত্রীর 'জীবন-সঙ্গীত' মুখস্থ থাকতো। আমিও ঐ কবিতাটির নয়টি স্তবক তাঁকে আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি আমার উপর খুব খুশী হয়ে বললেন, "বেশ, বৎসে, বেশ।"

এক দিন বৈকালে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়েছে, আচার্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "উজ্জ্বলা, তুমি গভীর চিন্তাশীলা না লঘুচিত্তা? আজীবন শুধু কি তুমি 'কথা' নিয়েই কাটাবে, না তোমার আদর্শকে দৃঢ় আঁকড়ে ধরে থাকবে?" কি প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় ভাবার আগেই পুনরায় বললেন, "মতামতের কথা উঠলে অপরকে সায় দেওয়ায় কোনও বাধা নেই, কিন্তু আদর্শগত বিষয়ে পর্বতের মত অটল থাকতে হবে।" ব্যস্‌! ঐ ক্ষণেকেই তাঁর নিকট হতে সারাজীবনের চলবার পাথেয় পেয়ে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়

(এক)

অবতার

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

রূপহীন চেতনার মানস-ইঙ্গিতে
সৃজনের সংবেদনে রূপ ওঠে জেগে
মহাব্যোমে গর্জমান স্ফোট-বৃত্ত হ'তে।
সেই ক্ষুব্ধ তরঙ্গের প্রতিঘাত লেগে
চিরন্তন সৃষ্টি-রজ্জু আজো চলে বেড়ে :
ছুটে চলে সংখ্যাহীন স্থাবর জঙ্গম
প্রাক্তনের আকর্ষণে। সেই মোহ ছেড়ে
আদি আত্মরূপ সাথে অন্তিম সঙ্গম

বিধাতার অভীপ্সিত। তাই ভাঙ্গি' ভুল
ভুবনের লোকে লোকে সর্বচেত্ত নিজে
আসে সৃষ্টি-প্রাগ্ররূপে বোধি অনুকূল
ফিরাইতে আত্মজেরে সারূপ্যের বীজে।

পরম পুরুষ তাই নরনারায়ণ
যুগে যুগে মানুষের নিত্য প্রয়োজন।

(দুই)

শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে,
এই ধরণীর রবি-শশীর হাস্যমুখর শূন্য বাটে।
বাতাসে বয় সে-সুর-প্রীতি,
আকাশে রং ঝরায় নিতি,
ভুবন জুড়ি' গোপন সে যে—বাজায় বেণু ঘাট-অঘাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে।

গোঠে-মাঠে গো-খুর ধূলায় ঐ সে ফিরে ক্লান্তজনে,
ক্লান্ত বাঁশীর সুরের রেশে ম্লান করে সাঁজ সন্ধ্যাখনে।
সেই বাঁশীরই সুরের নেশা
সান্ধ্য শাঁখের ধ্বনি-মেশা,
সেই সুরেতেই পোহায় দিবা—দিগ্বলয়ে নিশি কাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে।

কান থাকে ত' শুনতে পারি এই ধরণীর জীবনভোলা
বাঁশীতে তার সে-সুর ধরি' দুলছে কেমন দোদুল দোলা।
দৃষ্টিদানে দেখতে পারি
তাহার দেহ চিত্তহারী,
জগৎ-জীবন অন্তরালে কেমন বাঁকা পথ সে হাঁটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে।

জীবন জুড়ি', ভুবন জুড়ি' চলছে তাহার সুরের খেলা,
কেমন করে ভুলব তাহার বিশ্বে বিরাট শ্রীনাথ-মেলা!
সেই বাঁশীরই মোহন ডাকে,
জীবন যে মোর হারিয়ে থাকে,
শেষের খেয়ায় সব পাশরি নামিয়ে বোঝা ধরার হাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এইধরণীর বিশাল নাটে।

সেই বাঁশীরই সুরের ধারা তাই ত' আমি ভুলতে নারি,
এই ধরণীর বিশাল বুকে প্রাণের প্রণাম জানাই
তারি'।

তাহার গানে, তাহার তানে
হৃদয় আমার আপনি টানে,
তাহার চরণ স্মরণ করি বিশ্ববিহীন বিজন বাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে

(তিন)

আমার কৃষ্ণ

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর

আমার কৃষ্ণেরে তোরা এইরূপে কেন বার বার
অসম্ভব হীন ক'রে ছোট ক'রে করিলি প্রচার ?
ভক্তির দোহাই দিয়ে সত্যেরে যে দিলি নির্বাসন
জানি না এ ভক্তিতত্ত্ব বৈষ্ণবত্ব তোদের কেমন !
বিশ্বভারতের মহারাষ্ট্রগুরু দ্বারকাধিপতি,
অসীম অনন্ত বীর্য অক্রুরন্ত অনন্ত শকতি,
বিশ্বজয়ী বাসুদেবে ভুল ক'রে নন্দের দুলাল—
ননীচোরা, গোপীনাথ বলেই তো কাটাইলি কাল।

আর কেন ? চোখ মে'লে চে'য়ে দেখ্ যোগ্যতার কাছে
নিয়তির আস্ফালন কি রকম হার মানিয়াছে।
"গোপাল" যে ছিল, আজ—সে হয়েছে মহাপৃথিবীর—
মহাভারতের পতি। একখানা শুধু অঙ্গুলির
ইঙ্গিতে পৃথিবী ঘুরে ;—কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী, মালব,
নত হয়ে জয় গায় ; ভয় পায় তার নামে সব
শিশুপাল, বক্রদন্ত। বাঁশী নয়—অসি চক্র যার
মহাবীর-কর-ভূষা। জ্ঞান-মূর্তি, শৌর্যের আধার,
প্রপন্ন-বান্ধব,—শিষ্ট-ত্রাণকারী, অশিষ্ট-তাপন,
অধর্মে অশনি হানি' যুগে যুগে যে করে স্থাপন
শান্তিময় ধর্মরাজ্যে ; জয়ধ্বনি যার বিশ্বময়
সেই তো আমার কৃষ্ণ,—তো'দিগের এই
কৃষ্ণ নয়।

(চার)

ঝুলন-পূর্ণিমা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বাদলের মেঘ জমেছে আকাশে,
আঁধারের নাই সীমা ;
তবু মনে জাগে আজ যে তোমার
ঝুলনের পূর্ণিমা !
হে মোর কৃষ্ণ, তোমারি লাগিয়া,
অন্তর-রাধা রয়েছে চাহিয়া,
হেরিতে যে সাধ নয়ন ভরিয়া
শ্রীমুখের মাধুরিমা !

ব্যথার যমুনা ব'য়ে যায় আজ,
গাহে বিরহের গান,
দুকূল ছাপিয়া আকুলি' উঠিছে
উজানের কলতান !
কোথা তুমি আজ শ্যামল কিশোর,
দেখা কি দিবে না ওগো চিত্ত-চোর,
মিলনের মধু-রজনী আজি কি
হ'বে বৃথা অবসান ?

ঝর ঝর ঝর ঝরে বারি-ধারা,
কাঁদে সারা চরাচর !
তা'র সাথে কাঁদে বেদন-আতুর
আজি মোর অন্তর !
ব্যাকুল আজিকে পুবালী বাতাস,
জাগে না কোথাও পুলক-আভাস,
চাঁদের আলোকে ভরে না আকাশ,
যেন ব্যথা-জর্জর !

এস এস প্রিয়, হৃদি-নীপ-তলে
এস সুন্দর শ্যাম !
নিবিড় আঁধারে ফুটাও তোমার
রূপ-ভাতি অভিরাম !
আকাশের শশী নাহি থাক্ আজ,
তবু তুমি এস হে হৃদয়-রাজ,
এস বাঁশি-হাতে মধুর ধ্বনিতে
সাধি' "রাধা" "রাধা" নাম !

প্রজাপতির সৃষ্টি-কাহিনী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত আছে—"নৈবেহ-কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুঃ" (১।২।১)। এই জগৎ নাম-রূপাকারে পরিণত হইবার পূর্বে শব্দস্পর্শরূপ রস-গন্ধাত্মক কোন বিষয়ই ছিল না, সকল প্রকার অভিব্যক্তি আবৃত ছিল মৃত্যুর দ্বারা। অশনায়া —ক্ষুধারূপী মৃত্যু। প্রকাশ হইবার, বহুরূপে ব্যক্ত হইবার দুর্নিবার অব্যক্ত ক্ষুধা। আর যাহা কিছু ব্যক্ত, একদিন তাহার মৃত্যু অনিবার্য, অতএব মৃত্যু এবং ক্ষুধা অভিন্ন। এই মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ—ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রকাশের প্রথম প্রতিনিধি। ইনি আত্মন্বী অর্থাৎ মনোযুক্ত হইয়া 'মনস্বী' হইলেন। পর্যালোচন-স্বরূপ মন সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুরূপ প্রজাপতি এই কৃতিত্বে লাভ করিলেন প্রচুর আত্মপ্রসাদ।

তাঁহার এই আত্ম-সন্তোষের ফলে জল উৎপন্ন হইল। জল উৎপন্ন করিয়া প্রজাপতি পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। অপরের উপদেশাদি ব্যতীতই তিনি সহজাত জ্ঞান, বৈরাগ্য, এবং ধর্ম-ঐশ্বর্যযুক্ত সিদ্ধসংকল্প। ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেন না, মানুষের মতো তাঁহাকে বাহিরের কোন বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহার সৃষ্টির তিনিই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুই-ই।[১] এই জগতে ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত মাকড়সা; সে যখন তাহার জাল তৈয়ার করে তখন তাহার নিজের ভিতর হইতেই লালা বাহির করিয়া উহা সৃষ্টি করে। প্রয়োজন হইলে আবার উহা নিজের ভিতরে গুটাইয়া লয়। এই মৃত্যুরূপী প্রজাপতিও বাহিরের কোন সাহায্য না লইয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি ও সংহার করিতে সমর্থ হন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহর্তা। ক্রিয়াভেদে নামভেদ। যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ। যখন সংহার করেন তখন মহাকাল, মহেশ্বর, রুদ্র, মৃত্যু।

পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইলেন। পরিশ্রান্ত হওয়াতে তাঁহার শরীর হইতে তেজ নির্গত হইল। তেজরূপী অগ্নি দেবতাদিগের মুখ-স্বরূপ বলিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে কোন বস্তু অর্পণ করিতে হইলে তাহা হোমাগ্নিতে আহুতি দিবার বিধি। এই অগ্নিই ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ-লোক ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আকাশে অবস্থিত যে বিরাট তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ্মান্ সূর্যরূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত ও উত্তপ্ত করিতেছেন তিনিও ঐ তেজস্বরূপ অগ্নিই। আচার্য শঙ্কর এইখানে উপনিষদের ভাষ্যে বলেন—ইনিই বিরাট পুরুষ; ইনিই প্রথম শরীরী।[২]

প্রজাপতি তাহার পর ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমার আর একটি শরীর উৎপন্ন হউক। তিনি মনে মনে বেদজ্ঞান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। বেদ ও মনের সংযোগে তখন অণ্ডাকারে

(১) নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ—যেমন ঘট গড়িবার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার, উপাদান-কারণ মাটি।

(২) মনু-স্মৃতিতে আছে, প্রজাপতি প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির অনুকূল কর্মবীজ সন্নিবেশিত করিলেন। সেই কর্মবীজ-যুক্ত জল হইতে সহস্র সূর্য-প্রভাযুক্ত স্বর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল; সেই অণ্ড হইতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

সম্বৎসররূপী কাল আবির্ভূত হইল। ইহার পূর্বে কাল বলিয়া কিছু ছিল না। সম্বৎসর পূর্ণ হইতেই প্রজাপতি অণ্ডটি বিদীর্ণ করিলেন। তাহা হইতে বৈরাজ অগ্নি কুমাররূপে উৎপন্ন হইলেন। ক্ষুধারূপী মৃত্যু সেই কুমারকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া মুখব্যাদান করিতেই শিশু ভীত হইয়া 'ভাণ'—এই ভীতিসূচক শব্দ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রথম বাক্য উৎপন্ন হইল।

অগ্নি-সূর্য এবং বিরাট এই ত্রিমূর্তিতে প্রকাশিত প্রজাপতি জাগতিক সর্ববস্তুর মধ্যে অনুস্যূত বলিয়া ইনি আবার সূত্রাত্মা। বিভিন্ন ফুলের মধ্যে যেমন একই সূত্র অনুস্যূত হইয়া মালা গ্রথিত হয় তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি সকলের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া বায়ু বা সূত্রাত্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রজাপতি সর্বনিয়ন্তা হইলেও জগতের অন্তর্গত, কারণ ইনি 'প্রথম শরীরী', ইনি 'ইচ্ছা করিলেন', একাকী 'ভীত হইলেন', 'একাকী আনন্দিত হইতে পারিলেন না'—এই সকল কথা তাঁহার সম্বন্ধে বেদে রহিয়াছে বলিয়া ইনিও পূর্ণ নহেন, জগতের অন্তর্গত। জ্ঞানকর্মোপাসনারূপ যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাপতিত্ব লাভ সম্ভব বলিয়া অন্যান্য কর্মফলের মত ইহাও বিনশ্বর। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন' গীতার এই কথাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মলোক—প্রজাপতিলোকও ক্ষয়িষ্ণু। তবে এই প্রজাপতিলোক বিনশ্বর হইলেও জাগতিক অন্যান্য বস্তুর তুলনায় দীর্ঘকালস্থায়ী। আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই পঞ্চভূতের মিলিত অবস্থাতে জগতের সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি। প্রজাপতি এই পঞ্চভূতেরও স্রষ্টা কারণং কারণানাম্। আমাদের অপেক্ষা প্রজাপতির জীবন সুচিরকাল-স্থায়ী। আমরা কেহই জানি না কবে পৃথিবী সমুদ্র আকাশ বাতাস অগ্নি সৃষ্টি হইয়াছে, কতকাল ঐগুলি থাকিবে, অতএব তাহাদেরও যিনি স্রষ্টা তাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মার তুলনাতেই বিনশ্বর বলা হইল। জীবের তুলনায় তাঁহাকে নিত্য বলাও কিছু অন্যায় নয়।

মৃত্যুরূপী প্রজাপতি চিন্তা করিলেন যদি ক্ষুধার তাড়নায় এখনই এই শিশুকে খাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমি আমার 'অন্ন'কে (অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে কম করিয়া ফেলিব। এই শিশুকে ভক্ষণ করিলে বীজ নষ্টে শস্য নষ্টের মত হইবে। এই চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় বাক্য ও মনের সহায়ে ঋক্ যজু সাম প্রভৃতি মন্ত্র এবং গায়ত্রী উষ্ণিক প্রভৃতি ছন্দ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন সেই সমস্তই তিনি ভক্ষণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুই তাঁহার ভক্ষ্য হইল। তিনি সকলের অত্তা, ভোক্তা বলিয়া তাঁহার অপর নাম অদিতি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ—সমস্তই তাঁহার ভোগ্য। তিনিই সকলকে গ্রাস করেন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই অত্তা। অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতিই পিতা। অদিতির এই সর্বাত্মভাব দ্বারা তিনিই তাঁহার অন্ন-স্বরূপ জগতের স্রষ্টা ও অত্তা। জগতের সমস্ত বস্তুই ভোক্তৃভোগ্যাত্মক হইলেও কেহ একাই সমস্ত বস্তু ভোগ করিতে পারে না। ভোক্তারও ভোক্তা নিশ্চয় রহিয়াছে। একমাত্র সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত প্রজাপতির পক্ষেই ইহা সম্ভব।

প্রজাপতির অপত্য দুই শ্রেণীর—দেব ও অসুর। দেবতাগণ কনিষ্ঠ—অল্পসংখ্যক। অসুরগণ জ্যেষ্ঠ—বহুসংখ্যক। দেবতাগণ দ্যুতিমান, অসুর-গণ রাজসবৃত্তিবিশিষ্ট। দেব ও অসুর পরস্পর একে অপরকে অতিক্রম করিবার স্পর্ধা করিল। তাহাদিগকে দেবাসুর বলিয়া কিসে জানা যায়? শাস্ত্রনির্দিষ্ট জ্ঞানকর্মানুষ্ঠানলব্ধ-সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারা দ্যুতিমান—প্রকাশবাহুল্য-নিবন্ধন দেবতা নামে অভিহিত। লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও

অনুমানের সাহায্যে ইহলোকের ভোগ-সাধক কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত—কেবল মাত্র নিজ নিজ মনপ্রাণের পরিতৃপ্তির চেষ্টায় রত বলিয়া অসুর। অসুরগণ স্বাভাবিক আসক্তিমূলক ভোগে আকৃষ্ট। ইহকালের ভোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহারা ইহকাল-সর্বস্ব হয়। পক্ষান্তরে দেবতারা মনে করেন, শাস্ত্রনির্দিষ্ট মার্গে চলাই শ্রেয়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন না করাতেই দেবগণের দেবত্ব। দেবাসুর-সংগ্রামের মর্মকথা এই যে আমাদের মতো প্রজাপতির নিজের মধ্যে যে সদ্‌গুণ ও স্বাভাবিক গুণসকল রহিয়াছে তাহাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই দেবাসুরের জয়-পরাজয়। দেবগণ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উদ্গীথের বেদমন্ত্রবিশেষ দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ নিজেদের জন্য কল্যাণতম—শ্রেষ্ঠতম উদ্গান করিয়া যাহা সাধারণ তাহা দেবতাদিগের জন্য উদ্গান করাতে এই স্বার্থপরত্ব দোষে দুষ্ট হওয়ায় অসুরগণ তাহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিল। দেবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অসুরগণকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া মনের সাহায্যে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়া মনকে তাহাদের জন্য উদ্গান করিতে বলিলেন। কিন্তু মনও যাহা সাধারণ তাহা দেবতাগণের জন্য উদ্গান করিয়া যাহা শ্রেষ্ঠতম, কল্যাণতম তাহা নিজের জন্য উদ্গান করিল। এই স্বার্থপরতাদোষে অসুরগণ তাহাকেও পাপবিদ্ধ করিল। মন এখনও যে অশুভ চিন্তা করে তাহা সেই পাপ। দেবতাগণ মনের দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া মুখ্য-প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। প্রাণ তথাস্তু বলিয়া দেবতাগণের জন্য উদ্গান করিল। অসুরগণ বুঝিল দেবতারা এই প্রাণের সাহায্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, অতএব তাহাকেও পাপবিদ্ধ করি। এই ভাবিয়া তাহাকে পাপে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাটির ঢেলা যেমন পাষাণে নিক্ষিপ্ত হইয়া। চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় অসুরগণও সেইরূপ মুখ্যপ্রাণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেরাই বিনষ্ট হইল। এইভাবে দেবতারাই জয়ী হইলেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ও মন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—বিষয়াসক্তিরূপ পাপবশতঃ অসুরগণকে অতিক্রম করিতে পারিল না। কিন্তু পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিশূন্য প্রাণ বিরাটপুরুষরূপে নিজেকে ভাবনা করিয়া অসুরগণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রজাপতির নিজের মধ্যে যে দৈবীসম্পদ আসুরীসম্পদরূপ[৩] শুভাশুভ মনোবৃত্তির অভিভব পরাভব হইয়াছিল তাহা এখনও মানুষ-মাত্রেই অনুভব করিতেছে ; ইহাই দেবাসুর-যুদ্ধ।

দেবতাগণ মুখ্যপ্রাণের সাহায্যে অসুরগণকে পরাভূত করিয়া তিনি কোথায় অবস্থান করিতে-ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়া-ছিলেন মুখের মধ্যে যে আকাশ আছে মুখ্য প্রাণ তাহাতেই অবস্থিত। এই মুখ্যপ্রাণ বাক্ প্রভৃতি কোন বিশেষ প্রকার অবস্থা অবলম্বন না করিয়া মুখের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান রহিয়াছেন বলিয়া অয়াস্য এবং দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত অঙ্গসমূহের রস (সার) বলিয়া আঙ্গিরস নামে কথিত হন, কারণ প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়। এই প্রাণ দেহেন্দ্রিয়ের এবং মনেরও নির্বিশেষ আত্মস্বরূপ, ভোগাসঙ্গদোষ-রহিত এবং বিশুদ্ধ। যেহেতু ভোগাসক্তিরূপ পাপ ইঁহা হইতে দূরে থাকে সেইহেতু প্রাণের অপর নাম 'দূর'। এই প্রাণের তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি পাপরূপ মৃত্যু হইতে দূরে থাকেন। এই প্রাণ স্ত্রী পুরুষ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পিপীলিকা মাতঙ্গ সকল শরীরের মধ্যেই সমান বলিয়া সম বা সাম। এই প্রাণ

৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ আসুরী সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

বাক্ প্রভৃতি দেবতাকে অপরিচ্ছিন্ন সীমাহীন অগ্ন্যাদি দেবতাস্বভাব লাভ করাইয়াছিলেন। বাগাদি দেবতা যখন মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিল তখন অগ্ন্যাদিস্বরূপ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। বাগাদি শব্দে চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়, তথা মন এবং অগ্ন্যাদি শব্দে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। মনও কলুষমুক্ত হইয়া চন্দ্রদেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রজাপতির এই সকল ইন্দ্রিয় সৃষ্টি 'অতিসৃষ্টি,' কারণ, প্রজাপতি নিজে মরণশীল হইয়াও এই সকল অমরগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সকল ইন্দ্রিয় বা দেবতাগণ কোন কর্মফলের দ্বারা উদ্ভূত নয়। ইহারা জীবের কর্মফল-ভোগের সহায়ক মাত্র। জীব স্বকর্মফলের বশে যেমন যেমন শরীর ধারণ করে এই ইন্দ্রিয়গণও তদনুরূপ হইয়া সেই সেই শরীরের ভোগ-সাধনের সহায়ক হয় মাত্র। শরীর নাশ হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হয় না, কারণ ইন্দ্রিয়গণ অবিনাশী। পার্থিব জীবদেহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়, পৃথিবীতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু কর্মফল-ভোগের সহায়ক পঞ্চপ্রাণ, দশেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ দেহী জীবাত্মার ভোগ-সাধনের জন্য তাহার সঙ্গে স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়: অতএব ইন্দ্রিয়গণ এই হিসাবে অমর।

প্রজাপতিসৃষ্ট পদার্থ-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা সকলই প্রজাপতির নিজ শরীর-সংক্রান্ত। এখন প্রজাপতি কর্তৃক অন্য শরীর কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাই বলা হইতেছে। প্রজাপতি নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন। হঠাৎ তিনি ভয়াবিষ্ট হইয়া আলোচনা করিলেন আমি কেন ভীত হইতেছি; আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ ত নাই, দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়! যাহা হউক তিনি একাকী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সেইজন্য মানুষও একাকী তৃপ্ত হইতে পারে না। তিনি নিজের শরীর হইতে তাঁহার দ্বিতীয়রূপ—স্ত্রী-শরীর উৎপন্ন করিলেন। প্রজাপতি নিজেই পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিলেন। তাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পত্নীরহিত নিজ দেহকে অর্ধ-যুগলের মত—অর্ধাংশ শূন্য শস্যবীজের মতো বলিয়াছিলেন। শূন্যপ্রায় এই দেহ স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। এইজন্যই বৈদিক দশবিধ সংস্কারের মধ্যে পত্নী-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ সংস্কার বলিয়া অভিহিত।

প্রজাপতিই পুরুষ-স্ত্রীরূপে—পতি-পত্নীরূপে—মনু-শতরূপা নামে অভিহিত হইলেন। নিজ শরীরার্ধভূতা স্ত্রীতে—শতরূপাতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইল। মনু-শতরূপা-রূপী পুরুষ-প্রকৃতির মিলনেই সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। একা পুরুষ কিম্বা একা স্ত্রী কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল প্রাণীই পিতা-মাতাস্থানীয় মনু-শতরূপা হইতে সৃষ্ট হইল। প্রথমে মনু-শতরূপা হইতে মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পর, শতরূপা মনে মনে চিন্তা করিলেন মনু নিজের দেহ হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া আবার আমাতেই উপগত হইলেন, অতএব আমি অন্তর্হিত হই। এই ভাবিয়া শতরূপা নিজরূপ পরিবর্তন করিয়া গাভীর রূপ ধারণ করিলেন; মনুও তখন বৃষভরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতে উপগত হইলেন। এই মিথুন হইতে গো-জাতির উৎপত্তি হইল। শতরূপা ঘোটকীর রূপ ধারণ করিলেন, মনুও ঘোটকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতে ঘোটকজাতি উৎপন্ন করিলেন। শতরূপা যে যে স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন মনুও নিজে সেই সেই পুরুষদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাতে উপগত হইয়া সেই সেই জাতি সৃষ্টি করিয়া চলিলেন। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলই মনু-শতরূপা হইতে সৃষ্টি হইল। এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি হইতে বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। এই প্রাণি-

গণকে সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমিই 'সৃষ্টি'। মাটির তৈয়ারি ঘট-শরাবাদি যেমন মাটি ভিন্ন অন্য কিছু নয় তেমন আমার সৃষ্ট পদার্থসমূহ আমিই। তাঁহার সেই চিন্তার ফলে তাঁহার 'সৃষ্টি' নাম হইল। যে ব্যক্তি প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব জানেন তিনি এই প্রজাপতিসৃষ্ট জগতে প্রভুত্ব লাভ করেন।

এই যে প্রজাপতির সৃষ্টি-আখ্যায়িকা ইহা একটি বৈদিক উপাসনামাত্র। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য সৃষ্টিক্রম-বর্ণনায় নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। কিন্তু পরমাত্মা হইতে পঞ্চভূত সৃষ্টির কথা বৃহদারণ্যকের এই আখ্যায়িকায় নাই। এখানে প্রথমেই জলসৃষ্টির কথা আছে। অতএব বুঝিতে হইবে প্রথমে জল সৃষ্টির কথা থাকিলেও তৎপূর্বে অন্যশ্রুতিতে উল্লিখিত আকাশ বায়ু অগ্নির উৎপত্তি নিশ্চয়ই হইয়াছে; কাজেই এই আখ্যায়িকার সৃষ্টিক্রম বর্ণনায় তাৎপর্য নহে। আচার্য শঙ্করের মতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা মুক্তিকামী তাঁহারা প্রজাপতির এই তত্ত্ব জানিয়া প্রজাপতি-পদলাভেও তুষ্ট না হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। ইহাই প্রজাপতি ও তাঁহার সৃষ্টি-বর্ণনায় শ্রুতির তাৎপর্য।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী

শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁকে পূজো করে নিজের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ অবধি তাঁর শ্রীচরণদর্শনাভিলাষ হয়। মা কেমন ও কি করে তাঁর কৃপালাভ হয়,—এ চিন্তা সব সময় আমাকে ব্যাকুল করে রাখত। থাকি দূরে, কুচবিহারে; সরকারী কাজ করেন স্বামী, সুতরাং যোগাযোগের অপেক্ষা ক'রতে হ'ল। কিন্তু বেশী দিন নয়।

১৯১৪ সাল, মার্চ (ফাল্গুন) মাস, তারিখ ঠিক মনে নেই। কলকাতায় আসা হ'ল, কিন্তু আশ্রয়স্থলের পরিবেশ তেমন অনুকূল না থাকায় কয়েকদিন বৃথাই গেল। তাগাদা দিয়ে স্বামীকে মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন-বাড়ী) পাঠালাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ 'মঙ্গলবার দিন মার কাছে নিয়ে এস' বলে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে বাগবাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে সকাল সকাল স্নান সেরে উঠেছি, আজ মার চরণপ্রান্তে উপনীত হব। এমন সময় একজন স্ত্রীলোক, বেশ বড় বড় চোখ, এসে বল্লেন,—"মার কাছে যাবে? এস, আমিও যাচ্ছি।" বয়স তখন অল্প, অপরিচিতার এরূপ ভাষণে আশ্চর্য হয়ে তাঁর কথায় সায় মাত্র দিলাম। ভাল করে চিনে রাখলাম, তাঁকে মার কাছে দেখতে পাই কিনা।

গাড়ী মায়ের বাড়ীর দরজায় এসে থামল। পূঃ শরৎ মহারাজ রোয়াকেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখেই বললেন,—"রাধু, একে মার কাছে নিয়ে যাও।" ছোট একটি মেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লে,—"আসুন"। তার সঙ্গে আমি উপরে দোতলায় গেলাম।

গঙ্গাতীরে যাঁকে দেখেছিলাম, উপরে উঠে

দেখি তিনি সম্মুখে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। আমাকে বল্লেন,—"এস"। ইনিই যোগীন মা।

রাধু ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসতে ব'লে চলে গেল। পূজার আসনে বসে মা ধ্যান করছিলেন। একটু বাদেই ফিরে চেয়ে বল্লেন,—"এসেছ? এস, তোমারই জন্যে বসে আছি, মা।" প্রাণে কি একটা আনন্দ হ'ল। আমারই জন্যে বসে আছেন? এমন মিষ্টি কথা ত কখনও শুনিনি! আনন্দে চোখে জল এল। মা আসন ছেড়ে উঠে কাছে এসে দাঁড়ালেন, আমি প্রণাম করলাম। বললেন,—"কি মা, দীক্ষা নেবে? এস।" চোখের জল মুছে বললাম,—"হ্যাঁ মা, আপনার কৃপা পাব বলেই এসেছি।" মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে ফিরে জোড়হাত করে বল্লেন,—"আমি কে মা কৃপা করবার? ঠাকুরই সব। এই দেখনা তোমায় আগেই কৃপা ক'রে টেনে এনেছেন এখানে।" পরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"কতদূর থেকে এসেছ মা? কোথায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?" ইত্যাদি। আমি যথাযথ উত্তর দিলাম। স্বামী ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন জয়রামবাটীতে ৺তাঁর কাছে কৃপালাভ করেছেন শুনে মা বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লেন,—"কি জানি কেন মনে প'ড়ছে না; কত দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর টানে সব আসছে। নামটি তবে কেন মনে আসছে না।" ডাঃ কাঞ্জিলাল, স্বামী নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীদের নাম করায় বলে উঠলেন,—"ও, সেই লোকটি কি? কি জানি মা, কি হ'ল?" আবার ঠাকুরের দিকে চেয়ে করজোড়ে বলতে লাগলেন,—"ঠাকুর, তুমি জান। কত সব টেনে আনছ।"

তারপরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি ভাল লাগে?" বল্লাম,—"সবই ভাল লাগে মা, তবে জবা-বিল্বদলের পূজো খুব ভাল লাগে।"

"হ্যাঁ, তুমি তো শাক্তই হবে,"—মা বল্লেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আমি আশৈশব বৈষ্ণব আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত-পালিত।

রাসবিহারী মহারাজকে ডেকে মা জিজ্ঞাসা করলেন,—"রাসবিহারী, মঠে ঠাকুরের পূজার কত দেরী?" উত্তর এল,—"এইবার হোম হবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-জন্মতিথি, শুভক্ষণ সমুপস্থিত। এইবার কি মা আমার বাসনা পূর্ণ ক'রবেন? দীক্ষার সময় বাঁ দিকে একখানি আসন দিয়ে বল্লেন,—'বোসো'। মা আসন দিচ্ছেন, আমি তাতে ব'সব, সঙ্কোচ হচ্ছে মনে। দেখে মা বল্লেন,—'বোসো, বোসো, তাতে দোষ নেই।" তখন আমি ব'সলাম। গঙ্গাজল দিয়ে আচমন করতে দিলেন ও কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। বললেন, "সংসার করে কি হবে?" আমি চুপ করে আছি। "আচ্ছা, তাই যদি হয় ত এই এই ক'রবে···। এই মন্ত্র সব সময় জপ ক'রবে। আঁতুড় হলেও করবে। জানবে আজ থেকে ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন।" তারপর নিজে প্রার্থনা করে গুরু ও ইষ্ট দেখালেন। আমার বুদ্ধিতে উদয় হ'ল গুরু-ইষ্ট একাধারে মা নিজেই।

দীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে কি করে ঠাকুরের পূজাদি ক'রব? উত্তরে মা বল্লেন,—"যা করতে পারবে তাতেই হবে; মন্ত্র-তন্ত্র কি মা, ভক্তিই সব। তুমি ভক্তি করে বল্বে, ঠাকুর এই নাও, খাও। এই ভক্তিই সার বস্তু। আজ হ'তে ঠাকুর সব ভার নিয়েছেন, কোন ভাবনা নেই, শেষ সময় তিনি আছেন; আমি আছি।"

এমন সময় সুধীরাদি এলেন; মা তাঁকে বল্লেন,—"মেয়েটির খুব ভক্তি" ইত্যাদি। আমি লজ্জিত হয়ে মাকে প্রণাম করে পদধূলি নিলাম। প্রণামী দিতে গেলে বল্লেন,—"এ কেন? ও না দিলে কি? ও দিও না।" শুনতে পেয়ে গোলাপ মা

বল্লেন,—"গুরুদক্ষিণা দেবে না?" এই বলে এসে রেখে দিলেন, বল্লেন,—"ঠাকুর-সেবাতে লাগবে।"

পরে মা গঙ্গাস্নানে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে আমাকে নিজ প্রসাদী ফলমিষ্টি খেতে দিলেন। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। কত ভক্ত আসছেন। মা খুব ব্যস্ত। মাষ্টার মহাশয় এক হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়েছেন। ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ দিলেন। আমার সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে ছিল। নীচে কল খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গোলাপমার কাছে ধমক খেয়ে এখন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মেয়েটি কে?" আমি বল্লাম,—"আমার মেয়ে।"

"না, এত বড় মেয়ে তোমার হ'তে পারে না, কে—ভাসুরঝি?"

আমি তখন বল্লাম,—"সৎ মেয়ে।" মা আমাকে বল্লেন,—"সৎ অসৎ কি মা? দুষ্ট মনের কাজ।' মার কোন দোষ নেই। মন্থরার কাজ, কৈকেয়ীর কোনও দোষ ছিল না।" মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্লেন,—"মা, মা, মা—যে।"

ও ঘরে মেয়েরা সব পান সাজছেন। কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় থাকার পর মাকে দেখতে না পেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গেছি। দেখি, মা একা ছাদে দাঁড়িয়ে কেশরাশি রৌদ্রে শুকোচ্ছেন। আমাকে দেখেই বল্লেন,—'এস, তোমারি কথা ভাবছিলাম।" খুব খুশী হয়ে মার কাছে দাঁড়ালাম। মা হাত তুলে ৺দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বেলুড় মঠের দিকে নির্দেশ ক'রে দেখালেন; বললেন,—"ঐ দেখ দক্ষিণেশ্বর, আর ঐখানে বেলুড় মঠ। তুমি কখনও গেছ?" "না মা।" মা বললেন,—"হ্যাঁ যাবে। জান তো, ঠাকুর নরেনকে কি বলেছিলেন? 'তুই আমায় মাথায় করে যেখানে রাখবি, আমি সেইখানে থাকব—জগতের কল্যাণের জন্য, বহুকাল ধ'রে থাকবো।' বইয়ে পড়েছ না? বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় ঐখানে তিনি থাকবেন। ওখানে তাঁর সন্তানেরা, আমার ছেলেরা সব আছেন। তুমি যাবে, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।" আমি বল্লাম,—"হ্যাঁ মা, যাব।" ছাদে ইতস্ততঃ যেতে মা বললেন,—"ওদিকে যেও না, নীচে ঠাকুর আছেন।" এদিকে 'ভোগ নিবেদন করোগে মা',—বলে গোলাপ মা ডাকছেন। একটি মেয়েও মাকে এসে ডাকলেন। "এসো গো",—বলে মা নীচে দোতলায় নামলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

সিঁড়ির এদিকের ঘরে প্রসাদ পাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। আলমারির দিকে দুখানি পাতা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ হতে আগত একটি মহিলা ও আমি সেদিকে বসলাম। অন্য সকলের পাতে মার প্রসাদ দেওয়া হ'ল, কিন্তু আমাদের দুজনকে বাদ দেওয়া হ'ল। হাত গুটিয়ে বসে আছি। কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোলাপ মা বল্লেন,—"তোমরা বামুন, তাই দিই নি।" বললাম,—"সে কি, আজ আমি মার কৃপা পেয়েছি। তিনি গুরু। বামুন বলে তাঁর প্রসাদ পাব না?" চোখে জল এল। সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। কথাটা খুব সম্ভব মার কানে গিয়েছিল। তখন মায়ের প্রসাদ আমাদের এনে দেওয়া হ'ল।

প্রসাদ পেয়ে মার ঘরে গিয়ে সেই দরজার কাছে বসলাম। অনেক লোক। মেয়েরা সবাই মাকে ঘিরে কথা বলছেন। মা বিপরীত দিকে দরজাটির কাছে উপবিষ্টা। দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ, সব কথাবার্তার মধ্যেও। তাতে একটু লজ্জাও হচ্ছে। ছেলেমানুষ বয়স। ভাবছি, বইয়ে ত ঠাকুরের কথা পড়লাম, মার মুখে তাঁর কথা ত শুনতে পেলাম না।

এইরূপ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মা বলে উঠলেন,—"আচ্ছা মা, ঠাকুর বলতেন, 'মাড়োয়ারী ভক্ত বলেছিল, সংসার করলে না, ছেলে-পুলে না হলে শেষ গতি কে করবে, দেহের শেষ কাজ?' ঠাকুর উত্তরে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন,—(সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কণ্ঠস্বরও উত্তেজিত হয়ে উঠল) 'কি, এই দেহের জন্য সন্তান উৎপাদন?' ছিঃ ছিঃ করে থুতু ফেলতে ফেলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। মাড়োয়ারী ভক্ত ত দেখে অবাক! একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌ছেন,—'দেহ পচলে আপনি টেনে ফেলে দেবে। শালা বলে কিনা দেহের জন্য সংসার। পুড়ে দেড় সের ছাই বইত নয়।' আহা, কি বৈরাগ্য তাঁর ছিল বলত, মা? যত বড় দেহ হোক না কেন, সেই দেড় সের ছাই! এরই এত দম্ভ—অহঙ্কার! কিছুই কিছু না মা, ভগবানই সত্য। তবে যারা সাধন করে তাঁকে লাভ করবে, যারা তাঁর নাম করবে, তাদের দেহে যত্ন রাখা চাই। দেহকে কষ্ট দিলে কি করে হবে? দেহকে কষ্ট দিও না, মা। কিছু কিছু খাবে। অত উপোস করা ভাল নয়, দেহে রোগ হবে। সাধনভজন করবে কি দিয়ে, দেহ না থাকলে?" কি করে জানলেন জানি না। কথাগুলি কিন্তু মা সব আমাকেই লক্ষ্য করে বল্‌লেন।

মনে হচ্ছে, মার একটু সেবা কিছু করতে পারলাম না। অমনি উঠে এসে মা বিছানাটিতে শুলেন, চরণ দুটি একটু ঝুলিয়ে। একটি মহিলা কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সুযোগ গ্রহণ করে সেবায় রত হলেন, আমার ভাগ্যে আর হ'লো না।

এরই মধ্যে সবাই সরে গেল। মা বললেন,—"যেখানটিতে বসেছিলাম ঐখানে একটু শুয়ে নাও।" তখন তাঁর আদেশ মতো আমি বারাণ্ডায় সেই জায়গাটিতে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। একেবারে গভীর নিদ্রা!

গায়ে রোদ এসে পড়েছে। আর কে যেন নাম ধরে বার বার ডাক্‌ছেন, তবু যেন ঘুম ভাঙ্‌ছে না; কোন রকমে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মার কাছে গিয়ে বসলাম। দরজার কাছে মা বসে। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) ওঘরে দরজার অপরদিকে উপবিষ্ট। মার সঙ্গে কথা হচ্ছে। মা বলছেন,—"হ্যাঁ বাবা, ভক্তকেই বড় করেছেন। দেখনা, সীতা উদ্ধার করতে রামচন্দ্রকে সেতু বাঁধতে হয়েছিল। আর ভক্তবীর হনুমান 'জয় রাম' বলে এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। ভক্ত দেখালেন, নাম—ভগবানের নামের মহিমা কত।" মাষ্টার মহাশয় সজল নয়নে শুনছেন আর 'আহা, আহা,' করছেন।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে একটি ছোট ছেলে বসে শুনছিল। মা তার চিবুক ধরে বললেন,—"ভক্ত, ভক্ত।" এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছেন খুব পরিচিতের মতো। একজন প্রৌঢ়া, লালপাড় শাড়ী পরিধানে, হাতে শাঁখা। সঙ্গে তিন চারটি মেয়ে, বড় দুটি গেরুয়া পরা। জানলাম ইনি গৌরীমা। আমায় বার বার বলছেন, "চল্, আমার কাছে যাবি চল্।"

গৌরীমা তখন হ্যারিসন রোডস্থ বাড়ীতে থাকেন। পরিচয় নেই, নামমাত্র শোনা ছিল। তা ছাড়া মা অনুমতি না দিলে যাই কি করে। তখন গৌরীমা বলছেন,—"মঠ থেকে আসছি, মাকে বল্, তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরবো।" বুঝলাম মঠে আমার স্বামীর পরামর্শ মত গৌরীমা তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য বলছেন।

বললাম,—"মা এখন কথা বলছেন, তাঁর চরণামৃত নেবো।" গৌরীমা বার বার বলছেন, কাজে কাজেই অবসরমত মাকে বল্‌লাম,—"আমি এঁদের সঙ্গে যাব মা?" মা গৌরীমার দিকে চাইলেন। গৌরীমা ও তাঁর সঙ্গী মেয়েরা মাকে প্রণাম করলেন। গৌরীমা পুনরায়

বললেন.—"মাকে চরণামৃত করে দেবার কথা বল্।"

মা আমাকে বললেন,—"আমি জানি, তুমি এখানে থাকবে। তুমি কোথায় যাবে?"

গৌরীমা শিখিয়ে দিচ্ছেন,—"বল্ না 'আবার আস্‌ব'।"

অবশেষে মা উঠে চরণামৃত করে দিলেন। প্রণামান্তে গৌরীমা এবং তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে তাঁদের আশ্রমে গেলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হ'ল। তথাপি হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরপুর।

দেখতে দেখতে কয়দিন কেটে গেল।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঠে সাধারণ উৎসব। মঠপ্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত। গৌরীমার সঙ্গে সঙ্গে মঠে এসেছি। মঠবাড়ীর পূর্ব দিকের বারাণ্ডায় বসে কন্‌সার্ট শুনছি। এমন সময় শ্রীশ্রীমা রাধু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম ক'রতে মা আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহকরুণা-ভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। মঠে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন। আজ মঠে দেখে খুব খুশী হ'য়ে হেসে আদর করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোথায় আছ?" গৌরীমাকে দেখিয়ে বললাম,—"এঁদের আশ্রমে।" বল্লেন,—"যেখানে থাক ভাল থাক।"

মঠে ছাদে দাঁড়িয়ে মা কালীকীর্তন শুনছেন। এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী এসে সংবাদ দিলেন,—"মা, এক নৌকা লোক ডুবেছে, তার মধ্যে একটি ছোট ছেলেও ছিল।" এই সংবাদে মা গঙ্গার দিকে চেয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলতে লাগলেন,—"আজ এই শুভদিনে একি বিপদ ঠাকুর।" কিছুক্ষণ পরে সেই ব্রহ্মচারী আবার এসে বল্লেন,—"সকলে প্রাণে বেঁচেছে মা, সেই ছোট ছেলেটি পর্যন্ত।" মার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, নয়ন তখনও অশ্রুসিক্ত। বল্লেন,—"তাই ত বলি, আজ কি শুভদিন! মঙ্গলময়ের জন্মোৎসব, আজ কি অমঙ্গল হতে পারে?" এই বলে চোখ মুছতে লাগলেন।

একটি মেম সাহেব এলেন (মিসেস্ বুল্?) কী ভক্তি! মার চরণ ধরে মাথা রাখলেন। সুধীরাদি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিনি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলেন।

মা আহার করলেন পূর্বদিকের ছোট ঘরটিতে। তাঁর আহারান্তে গৌরীমা আমায় ডেকে বললেন,—"আয় মার উচ্ছিষ্ট তোল্। নতুন দীক্ষা হ'য়েছে—মার সেবা কর্।" আদেশ পালন করলাম। পরে মাকে প্রণাম করে প্রসাদ পেতে গেলাম।

কর্মস্থলে ফিরে যাবার সময় এল। যোগসূত্র রইল পত্রাদির মারফৎ। একবার ব্যাকুল হয়ে পত্র লিখি,—"মা, আমি কি পথ হারালাম?" উত্তরে মা লিখেছিলেন,—"পথ হারাবে কেন, পথ পাবার জন্যই ত আসা।"

"আমাদিগের সনাতন ধর্মপ্রণালীতে কতকগুলি অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে অনেকস্থলেই কেবল আচারের আঁটাআঁটি বাড়িয়া ধর্মভাবের অন্তঃসারশূন্যতা জন্মিয়াছে; আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কতকগুলি কুসংস্কার সমাজের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সকল দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কর্তব্য যে, কায়মনোবাক্যে ঐ সকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন।"

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্ধ

সত্যানুসন্ধানী

দিবাকর সেন রায়

তোমার মহিমা কতো না রূপেই নিতি প্রকাশিত হয়—
চিরন্তনী যে একই খেলা তব—সৃজন স্থিতি ও লয়।
প্রকাশ তোমার অতি বিচিত্র—কভু সুখে কভু দুখে,
স্থান যে তোমার অন্তরে জানি, নয় মন্তরে—মুখে।
সকলেরি মাঝে পরা ও অপরা—দুইরূপ আছে জানি,
পরা-অপরার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন যোগী ও জ্ঞানী।
অপরা-প্রকৃতি-ছলনায় বুঝি সব কিছু দেখি ভুল,
পরিণামে তাই বিচলিত হই, খুঁজে দেখিনাতো মূল।
লঙ্ঘিলে বিধি লভিতেই হবে প্রকৃতির প্রতিশোধ,
পরা যে প্রকৃতি তাইতো বলিছে—'করো প্রবৃত্তি রোধ।'
পরা-অপরার এই খেলা চলে নিতি মানুষের মাঝে—
অপরার ভুল, পরা যে শিখায় সংগতি সব কাজে।
জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানের গরিমা—বলাভিমানীর বল—
সৃষ্টি রাখিতে ঠেকে শিখাইতে প্রকৃতির এই ছল।
'মরা'-'মরা' বলে জানি সেই যুগে বাল্মীকি পেলো 'রাম,'
সব অভিমান শেষ হলে জ্ঞানী লভে বাঞ্ছিত ধাম।
যুগে যুগে এলো সাধকেরা কতো এই পৃথিবীর মাঝে,
তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাণী আজো শুনি হেথা বাজে—
'রোগ-শোক ভরা এই ধরাতেই স্বর্গ গড়িতে পারো
তার আগে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্যেরে ছাড়ো।'
অজ্ঞানতা ও তামসিকতার বেড়াজালে ধরা পড়ি
মোহের রঙেতে রাঙা করে আঁখি সকলে বিচার করি।
সূর্যের আলো চাঁদে আলো দেয়—সে নহে চাঁদের আলো,
মন যা ভাবায়—চোখ যাহা দেখে—সবি কি সত্য ভালো?
রাতের আঁধারে দড়ি দেখে যদি সাপ বলে মনে হয়,
যে দেখে তারি তো মনের বিকার—দড়ি কভু সাপ নয়।
মহাপুরুষেরা বলে গেলো তাই—"স্বরূপ চিনিতে শেখো,
যার যেই রূপ সেই রূপ চিনে স্বরূপে তাহাকে দেখো।
স্বরূপেই পাবে 'সত্য'কে খুঁজে—নিজেরি ভিতরে পাবে,
চিনিলে স্বরূপ নিজেরি ভিতর গভীরেতে ডুবে যাবে।"
নিজেরে জেনে যে অপরেও জানে—মহৎ তাহারে মানি,
সকলেরি মাঝে 'সত্য'কে খোঁজে সত্যানুসন্ধানী।

বাংলার সংস্কৃতি ও প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্-এ, সাহিত্যবিনোদ

বাংলার গঠন ও প্রকৃতি—নদীমেখলা বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। বাংলা দেশের মাটির মতো এমন শ্যামল কোমল মাটি দুর্লভ। নদীর পলিমাটিতে তৈরী বাংলা, তাই তার মাটি সরস, আর উর্বর। এই জন্যই বাংলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ভারতের অংশ হলেও বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। নবনব চেতনাকে আশ্রয় করে, সে নবীন জীবনস্রোতে এসে মিশেছে। বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি কি বা তার খাঁটি প্রাণধর্ম কী যার বলে বাংলার এই স্বকীয়তা, এই বৈশিষ্ট্য সেইটিই আমাদের ভালো করে বুঝে দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই নিজস্ব প্রকৃতি-সম্বন্ধে বলেছেন,—

'বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবন-সাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশী করেই দিয়েছেন। তার দেশ যে পলিমাটির উর্বর ভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হ'তে পারবে না।...প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিলবে। ...বাংলাদেশের এই উদার বিস্তৃতি দেখা যাবে সর্বক্ষেত্রে, তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই, অথচ কী গভীর উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও তার তুলনা মেলে না।...

'বাংলাদেশে চিত্রে ও পাষাণ-মূর্তিতে যে প্রাণের লীলা দেখা যায় তা সর্বভাবে পুরাতন শাস্ত্র ও বৃথা ভার হ'তে মুক্ত। অথচ তাতে নূতন পুরাতন এদিক ওদিকের সবরকম জীবন্ত উপকরণগুলি প্রাণশক্তির রহস্যময় কৌশলে সংগত হয়েছে, তার মধ্যে কোনটা বাদ দিলে প্রাণধর্ম ও বাংলাদেশের সাধনার স্বধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে।...বাংলার সকল সাধনাতেই রয়েছে প্রাণের একটি সহজ আবেদন। বাংলার সংগীত শিল্পকলা সর্বত্রই এই সত্যকেই আমরা দেখ্‌তে পাই।...

'মাধুর্যের সঙ্গে এদেশের চিরযোগ। নীরস শুষ্কপথ এদেশের নয়। জলপথের পথিক আমরা, শুষ্ক ধূলোর পথে চল্‌তে পারিনে। আমাদের পথও সরস জীবন্ত জলধারা, সর্বত্র সে প্রাণ সঞ্চার করে, শুকিয়ে মারবার নীতি সে জানে না।... এদেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে। বাংলার শিবদুর্গায় বাঙালী চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গাগৌরীর কোন্দলে আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া। ভালো-মন্দ সব নিয়েই শিব আমাদের আপন মানুষ। বাঙালীর রাম বাল্মীকির রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুঁজে পাইনে। অথচ আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই। দেবতায় মানুষে এখানে কোনো অনৈক্য নেই। মানবতাধর্মই যে আমাদের ধর্ম—একথা আমি দেশবিদেশে উচ্চ-কণ্ঠেই ঘোষণা করেছি।'

বাঙালী জাতি—বাংলার কথা বল্‌তে গেলে ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারতবর্ষ যেন সপ্তস্বরা বীণা, বাংলা তার মধ্যে যেন বিশিষ্ট একটি

সুর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতির সাধনাই ভারতের বিশেষ সাধনা, নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনাই ভারতের ব্রত। ভারতে এসেছে নানা জাতি, নানা সংস্কৃতি। উঁচু নীচু সব ধর্ম-সাধনাই পাশাপাশি রয়েছে। ভারতের মহাপুরুষেরা নানা বিরোধের মধ্যে যোগ-সাধন করেছেন। এই যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় 'ভারতপন্থ'। এই সমন্বয়চেষ্টা যুগে যুগে হয়েছে, এবং বাংলার দান তাতে কম নয়। ভারতের বহুতন্ত্রী বীণায় একটি বিশিষ্ট সুর সংযোগ করলেও নিজ অন্তঃপ্রকৃতির গুণেই বাংলা ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্যে যে বিশিষ্ট হয়েই আছে। এই স্বাতন্ত্র্যই বাংলার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দুইই বহন করে এনেছে। বাঙালী চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য যার জন্যে বাঙালী পুরোপুরি ভারতীয় না হয়ে বাঙালীই রয়ে গেল—এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব আগে নির্ণয় করা দরকার। কিন্তু এমন কোন ঐতিহাসিক উপাদান নেই যার সাহায্যে সহজেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করে পণ্ডিতেরা এই জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতে নানা জাতির মিশ্রণ চলেছে বহু প্রাচীন কাল থেকেই, এবং এই বহু মিশ্রণের ফলে নানা জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একত্র গ্রথিত হয়ে নানা বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং যদি কেউ বিশুদ্ধ আর্যরক্তের গর্ব করেন, তিনি যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি ?

ভাষাতত্ত্ব থেকে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে আর্যভাষা প্রসারের আগে অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষাই ছিল এ দেশের ভাষা। ভারতে অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই যে একটি লক্ষণীয় সভ্যতার পত্তন করেন, এ বিষয়ে বহু পণ্ডিত একমত। 'গঙ্গা' নামটি অষ্ট্রিক জাতির শব্দ বলেই ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি বাবু মনে করেন। সুনীতি বাবুর মতে উত্তর ভারতের সভ্য কৃষি-জীবী অষ্ট্রিকেরাই পরে কিছু পরিমাণ দ্রাবিড় ও অল্পসল্প আর্যদের সহিত মিশ্রিত হয়ে হিন্দুজাতিতে পরিণত হয়। উত্তর ভারত তথা বাংলাদেশের অধিবাসীরা দ্রাবিড় তথা আর্যরক্তে ও সভ্যতায় প্রভাবান্বিত অষ্ট্রিক জাতি। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, ভাবুক, কামপ্রবণ, কল্পনাশীল, অলস ও দৃঢ়তা-বিহীন, ও সংঘশক্তিতে হীন ছিল। অন্যপক্ষে দ্রাবিড়েরা অষ্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য ও সংঘ-শক্তিতে পূর্ণতর ছিল বলেই মনে হয়। অষ্ট্রিকেরা গ্রামীণ সভ্যতার পক্ষপাতী ছিল, আর নাগরিক সভ্যতার দিকেই প্রবণতা ছিল দ্রাবিড়দের।

মহেন-জো-দাড়োর প্রাচীন কীর্তি দ্রাবিড় সভ্যতারই নিদর্শন। বিষ্ণু, শ্রী, শিব, উমা, মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা। দ্রাবিড় সাহিত্য থেকে দ্রাবিড় চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে দ্রাবিড়েরা কর্মঠ অথচ ভাবপ্রবণ, অধ্যাত্মশিল্পী ও সংগঠনশীল জাতি ছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই দুই সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছিল সব চাইতে বেশী। বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামের মধ্যে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় শব্দের সন্ধান মেলে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে মনে হয় এখন থেকে আড়াই হাজার বৎসর আগে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি বাংলায় বসবাস করতো। তখনও এদেশে আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার প্রসার হয়নি।

খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতকে আর্যেরা ভারতে আসেন বলে কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান। যা'হোক উত্তর ভারত থেকেই সুরু হয় আর্য অভিযান। আর্যেরাই বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ প্রচার

করেন। আর্যদের ভাষা ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর ভারতে বিহার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনার্য জাতি আর্যের ভাষা ও ধর্ম মেনে নিলেন, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি নিঃশেষ হয়ে গেল না। আর্য সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রণ হলো অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির—এই দুয়ে মিলে হিন্দু সভ্যতার পত্তন হলো। আর্যের ভাষা হলো এই সংস্কৃতির বাহন। খৃঃ পূ ৩০০ থেকে খৃঃ জন্মের পর ৫০০ অব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে আর্যসভ্যতার সংক্রমণ চলে; ফলে বাংলাদেশ আর্যসভ্যতার ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে। এইরূপে উত্তর ভারতের আর্যকৃত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের মিলনে বাঙালী-জাতির সৃষ্টি হয়। বাংলার অধিবাসী মুখ্যতঃ অনার্য। আর্যরক্ত উত্তর ভারতে পূর্বেই মিশ্রিত। সেই মিশ্রিত রক্তের সঙ্গে অষ্ট্রিক বাঙালীর যেটুকু রক্ত-সংমিশ্রণ হলো, তাতে বাঙালী পেল একটি নূতন মানস প্রকৃতি, একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর্য discipline বা আর্য নিয়মাচারকে বাঙালী পুরোপুরি কোনকালে গ্রহণ করে নি। তাদের আপন মৌলিকতা—যা তার আদিম অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় রক্তের দান—সেই ভাবুকতা, সেই কল্পনাশীলতা ও হৃদয়-প্রবণতা আর্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়েই দেখা দিল। বাংলার মাটিই এই জন্য কম দায়ী নয়। এই মিশ্রণের ফলে বাঙালীর মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় যা বলেছেন তাই এখানে উদ্ধৃত করছি:

'গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনক্ষেত্রে। এই দেশ তাই নানা দিক দিয়ে মিলনের ক্ষেত্র। দিন ও রাত্রি মেলে সকাল ও সন্ধ্যায়। সেইরূপ সন্ধ্যার মিলন ক্ষেত্র যেমন ধ্যানযোগের সময়, বাংলা দেশের মিলনতীর্থে রয়েছে তেমনি বহু তপস্যার জন্য প্রতীক্ষা। কোন লঘুতা চপলতা এখান চলবে না। এখানকার উপযুক্ত সাধনা হলো ব্যাহৃতি মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষ বিশ্বচরাচরে বিস্তৃত হোক আমাদের ধ্যান। কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই।'

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি—বাংলার বৈশিষ্ট্য তার জীবন-সাধনার মধ্যে এ কথা সত্যি—কিন্তু ভাষা তার মস্ত বড় একটা বাহন—সুতরাং ভাষাকে অর্থাৎ তার জীবন-সাধনার একটা বিশিষ্ট বিকাশকে আমাদের ভালো করে জানা দরকার। আমরা দেখতে পাই বিজেতৃ জাতির মর্যাদা নিয়ে আর্য-ভাষা সারা উত্তর ভারতে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তখনও বাংলা আপনার আদিম সংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক মিশ্রিত ভাষার মাধ্যমে আপন সত্তাকে প্রকাশ করে চলেছে। বাংলাদেশ আর্য ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেও পুরোপুরি আর্য হয়ে উঠ্‌লো না। সংস্কৃত-ভাষায় গ্রথিত বেদ-পুরাণাদি পণ্ডিত সমাজে অবশ্য স্বীকৃত হলো, সংস্কৃত চর্চাও শুরু হলো, কিন্তু যা ব্যবহারিক, যা জনগণের ভাব-প্রকাশের বাহন—তা সৃষ্টি হওয়া একটু সময়-সাপেক্ষ। একটা জাতির অভ্যুত্থানের মত ভাষারও সৃষ্টি হয়—নানা ভাঙ্গা-গড়া ও বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার প্রচার ও প্রসার। আজ যে বাংলা ভাষার গৌরব আমরা করি, তা কিন্তু আসলে সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে মাগধী-প্রাকৃত ও প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে। অবশ্য পরবর্তী কালে সংস্কৃতের আওতায় বর্ধিত হয়ে সংস্কৃতের শব্দ-ভাণ্ডার থেকে অজস্র সম্পদ আমরা আহরণ করে নিয়েছি। ভাষার ইতিহাসে এ নূতন নয়। যাহোক বাংলা ভাষার পত্তন হলো এমনি করেই। তারপর বৌদ্ধ প্রচারকদের

হাতে এই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার মাধ্যমে দোঁহাবলী দোঁহাকোষ প্রচার ও সাহিত্যসৃষ্টি হতে লাগলো। অবশ্য বৌদ্ধদোঁহার ভাষার সঙ্গে আজকের বাংলাভাষার বিরাট অমিল দেখা গেলেও এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, বাংলা ভাষার কাঠামো সেই আমলেই তৈরী হয়েছিল। বৌদ্ধ মহাযান ও জৈনবাদ পাশাপাশি বাংলায় স্থান পেয়েছে। মহাযান সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ গুরু জন্মেছেন এই বাংলাদেশে। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ শীলভদ্র বাংলাদেশেরই ছেলে। শান্তরক্ষিত, দীপংকর, শ্রীজ্ঞান, অতীশ—সবই বাংলায় জন্মেছেন। আর্যপূর্ব বহু সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে পূর্বদিকে এসে স্থান পেলো—সেইগুলিই পরে জৈনধর্মের সাথে মিশে বাংলায় পাহুড় দোঁহা প্রভৃতি মরমীবাদের সৃষ্টি হলো। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও দেখা গেল যে মানুষই সব—এই দেহেই বিশ্বলোক—"অসরির কোই সরিরহি লুক্কো" (—দোঁহাকোষ)

অথবা—

এথু সে সুরসুরি জমুনা
এথু সে গঙ্গাসা অরু।
এথু সে বা আগ বনারসি
এথু সে চন্দ দিবা অরু।

(অর্থাৎ এই দেহেই গঙ্গা-যমুনা সাগর সংগম, এই খানেই প্রয়াগ বারাণসী, এই খানেই চন্দ্রদিবাকর।)—মহাযান বৌদ্ধদের মত পরবর্তী জৈনধর্মে কায়াযোগ প্রেমসাধনাই বড় হয়েই দেখা দিল। লক্ষ্য করলে এই দোঁহাকোষের মধ্যেই বাংলাভাষার প্রথম পত্তনের সূচনা পাওয়া যাবে।

পাল ও সেনরাজাদের আমলে বাংলা সংস্কৃতির একটা মোটামুটি ভিত্তি স্থাপিত হলো। নানা সভ্যতা, নানা ভাবধারার সংমিশ্রণের ফলে বাংলা তার নিজের বিশিষ্ট পথ ক্রমাগত খুঁজে নিল—সে পথ হচ্ছে মানবতার পথ, তথাকথিত ধর্মের ঐকান্তিক বিধিনিষেধ কণ্টকিত জীবনযাত্রা নয়। এর পর বাংলার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল প্রবল তুর্কী আক্রমণের ঝড়। মুষ্টিমেয় তুর্কী পারসিক ও পাঞ্জাবী মুসলমান যারা রয়ে গেল বাংলার বুকে, বাঙালীর সাহায্যেই তারা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো বাংলায়। বাঙালী রমণী বিয়ে করে' তারাও বাঙালী হয়ে গেল দুই তিন পুরুষেই। অনেক হিন্দু, অনেক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্তরিত হলেও বাংলায় যে মুসলমান ধর্মের প্রচার হলো, তা ঠিক কোরাণের খাঁটি ইসলাম নয়। বাংলাদেশে ইসলামের সুফীমতেরই বেশী প্রাধান্য। সুফীমত বাংলার চিত্তধর্মের ঠিক বিরোধী ছিলনা বলেই প্রাকৃতজনের সাথে সুফীমতবাদের একটা আপোষরফা হয়ে গেল। পরবর্তীকালে যে বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তার মধ্যে দেখ্‌তে পাই হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমানের শিষ্য হিন্দু—এমনি করে শিষ্য-পরম্পরা নেমে এসেছে। বাংলাদেশেই এই সহজ মিলনটি সম্ভবপর হয়েছে, কারণ বৈদিক কর্মকাণ্ড মধ্যযুগেও বাংলায় তেমন করে' প্রচারিত হয়নি। সপ্তম শতকে শংকরাচার্য তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) হয়ে পূর্ববঙ্গের পথে কামরূপ যান—বাংলায় বৈদিক ধর্ম বা শাংকর অদ্বৈতবাদ ঐ যুগে বেশী প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে অবশ্য বাংলার বুধমণ্ডলী বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বা দর্শন আলোচনায় মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। ১৩০০ থেকে ১৬০০ শতকের মধ্যে বাংলায় বিশেষ করে শাস্ত্রচর্চা শুরু হয়। বাঙালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্য ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, অদ্বৈতবেদান্তে তেমনি দেখা যায় মধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ ভাষ্য ও টীকাকারগণের মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

New York
19 W. 38th St.
Jan. 25th, 1898

ভাই শশী

বহুকাল পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবে। শরৎ মাতৃভূমি দর্শনে যাত্রা করিয়াছে। এ পত্র পৌঁছিবার আগে শরৎ পৌঁছিবে। শরতকে ও আমাকে তুমি এক পত্র লিখিয়াছিলে of course (অবশ্য) বহুকাল পূর্ব্বে। সেই পত্রের তারিখ 13th Oct. 1897. সেই পত্র আমি পাইলাম Jany (1898) মাসে। ইহা পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। ইচ্ছা করে যে সর্ব্বদাই উহা পাঠ করি। ভাই, মধ্যে মধ্যে যদি ঐ রকম দুটো সুখের দুঃখের কথা লেখ তাহ'লে বড়ই সুখী হই। আমার ঘাড়ে এত কাজ পড়িয়াছে যে চিঠি লিখিবার অবকাশ নাই। ক্রমাগত lecture, lecture. (বক্তৃতা, বক্তৃতা)। বাবা! আর পারা যায় না। তোমরা ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলে এখন আমি শালা খেটে মরি। যাহা হউক সকলি তোমারি ইচ্ছা বলে মনকে প্রবোধ দিই। তোমার কার্য্যকলাপ ও বক্তৃতাদির বিবরণ পাঠে বড়ই সুখী হইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে তুমি এখানে এসে একবার লেগে যাও, দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হউক। শরৎ ছিল, মধ্যে মধ্যে দেখা হ'ত। তাহাও ঠাকুরের প্রাণে সইল না। এখানকার লোকে বেদান্তের ভাবগুলি গ্রহণ করিতে বিশেষ প্রস্তুত। এখানে উদার ভাবের বড়ই আদর। উদার ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে এবং উহার ঢেউ প্রধান প্রধান church (গির্জ্জা)-এ লাগিতেছে। পরিণাম যে ভাল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। Missionary (ধর্ম্মযাজক) ও গির্জ্জাওয়ালারা উঠে পড়ে লেগেছে। নরেনের বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেক Paper (কাগজ)-এ কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে। * * * ইহাতে আমাদের কার্য্যের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। "From Colombo to Almora" নামক পুস্তকে নরেনের সমস্ত কথা না ছাপাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাড়িয়া দিয়া ছাপাইলে অতি সুন্দর হইত। যা হবার তা হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এরূপ ভুল না হয়। আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে একটু সাবধান করিয়া দিও। আলাসিঙ্গা আমাকে প্রায়ই পত্র লিখিত। এক্ষণে বুঝি চটে গেছে। তাহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার ভালবাসা দিও। Miss Waldo (মিস্ ওয়াল্‌ডো) তোমাকে নরেনের London address (লণ্ডনে বক্তৃতা) এক set (খণ্ড) পাঠাইয়া দিয়াছে। * * গুপ্ত যখন মাদ্রাজে ছিল একটি ফটো পাঠাইয়াছিলাম, তাহা কি হইল জান কি? নরেন এক্ষণে কোথায় ও কেমন আছে? Goodwin (গুড্‌উইন) এক পোষ্ট কার্ড Miss Waldo-কে লিখিয়াছে। তাহাতে নরেন্দ্রের Diabetes (বহুমূত্র) আবার চাগিয়াছে—ইহা লিখিয়াছে। ইহা কি সত্য? আমেরিকার সমস্ত কাগজে ছাপিতেছে যে "Swami Vivekananda is seriously ill. etc :" (স্বামী বিবেকানন্দ কঠিন ভাবে পীড়িত)। Goodwin মধ্যে মধ্যে ঐরূপ যে লেখে তাহা কতদূর সত্য জানিতে ইচ্ছা।

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

শরতের সঙ্গে Miss Ole Bull (মিস্ ওলি বুল) এবং Miss McLeod (মিস্ ম্যাক্‌লাউড) India (ভারতবর্ষ) দেখিতে গিয়াছে। আমার class-এ আজকাল লোক বড় মন্দ হয় না। নায়েক ছেলেই বল আর মাতব্বর পণ্ডিতই বল কিছুই কিছু নয়। আমি একটি ঘর ভাড়া করিয়া থাকি। আর একটি boarding house (ভোজনাগার)-এ আলুসিদ্ধ অথবা গাজরসিদ্ধ খাইয়া দিনাতিপাত করিতেছি। আমি Strict Vegetarian, (সম্পূর্ণ নিরামিষাশী) মাছ মাংস ছুঁই না। এখানকার climate (জলবায়ু) খুব ভাল বলিয়া টি'কে আছি। London হইলে মারা যেতুম। অরুচি দাঁড়াইয়াছে। এবারকার শীত বড়ই mild (মৃদু)। Snow fall (তুষারপাত) নাই বলিলেই হয়। তবে February মাসে কি হয় বলা যায় না। আমি অভয়ানন্দকে[১] দেখি নাই। তাহার চেলা কে তা জানি না। কৃপানন্দ[২] এক্ষণে বেদান্তের এবং নরেনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। যোগানন্দ হুজুগপ্রিয়, crystal gazing, thought reading etc. করে বেড়াচ্ছে। অতি মুর্খ, *** সরল কিন্তু common sense (সাধারণ বুদ্ধি) বড়ই অল্প। এখানে জনকতক খুব sincere (আন্তরিক) বলে বোধ হয়। Miss Waldo বুড়ো বয়সে সংস্কৃত শিখিতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। খুব অধ্যবসায়। * * * তোমার পত্রের খুব প্রশংসা করে। * * * শরতের মুখে সকলই শুনিবে, আমার লেখা বাহুল্যমাত্র। সত্য কথা বলে চলে যাব যাহার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিবে। Intellectually (বুদ্ধি দিয়া) অনেকেই বেদান্ত গ্রহণ করে থাকে কিন্তু practically (বাস্তবক্ষেত্রে) বড়ই কঠিন—ঐ দশা সকলেরই।

"পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপং ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্ব্বন্তি যত্নতঃ।"

সেইরূপ বেদান্তের ফল অনেকে চায় কিন্তু অতি অল্প লোকেই উহা practise (অভ্যাস) করিতে চায়। Female education (স্ত্রী-শিক্ষা) সম্বন্ধে নরেন্দ্র কি কোন রকম movement start (আন্দোলন শুরু) করেছে? সত্বর সবিশেষ লিখিবে। Miss Muller কি করছে? মাতাজীর Girls' School (বালিকা বিদ্যালয়) কেমন চলছে? Gandhi[৩] বেদান্তের against এ (বিরুদ্ধে) বক্তৃতাদি দিয়া পয়সা উপায়ের চেষ্টায় আছে। তাহার রঙ্গ বেরঙ্গের পোষাক দেখে অবাক্। Dharmapala[৪] হিন্দুদের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করে পলায়ন করেছে। Annie Besant এর চেলারা বিবেকানন্দের নিন্দা না করে জলগ্রহণ করে না। মিশনারীরা "Vivekananda and his Guru" বলে এক পুস্তিকা ছাপাইয়াছে, তাহা কি দেখিয়াছ? উহা এখানকার সকলের নিকট পাঠাইতেছে। উহা "The Christian Literature Society for India, London & Madras" হইতে ছাপান হইয়াছে। উহার এক কপি লয়ে যদি review (সমালোচনা) করে Brahmavadin এ ছাপাতে পার তাহলে বড় ভাল হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই করে লিখেছে। এই ত এখানকার সমস্ত খবরই দিলাম। তুমি আজকাল কেমন আছ? তোমার গায়ের সেইগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে লিখিবে। আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে এবং শ্রীশ্রীমাকে আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দিবে। ইতি Yours Kali. (তোমার কালী)।

শরতের Photo (আলোকচিত্র) সাণ্ডেলের নিকট হইতে বোধ হয় এতদিনে পাইয়াছ। আমার photo চাহিয়াছিলে, পাঠাইলাম।

১ স্বামী বিবেকানন্দের জনৈকা মার্কিণ শিষ্যা
২ স্বামী বিবেকানন্দের জনৈক আমেরিকান শিষ্য
৩ বীরচাঁদ গান্ধী
৪ অনাগারিক ধর্মপাল

জড়-বিজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব

শ্রীসুধীর বিজয় সেনগুপ্ত

এ জগৎযন্ত্রে ঈশ্বরের স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করা হলে ফরাসী জ্যোতিবিদ লাপ্লেস বলেছিলেন, "ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার প্রয়োজন হয় নি।" আধুনিক বিজ্ঞানের সেটা ছিল প্রাথমিক যুগ, দর্শনের সীমানা ছেড়ে বিজ্ঞানের বেরিয়ে আসার সন্ধিক্ষণ। তখনকার ইউরোপীয় দার্শনিকেরা পৃথিবীকে সারা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলে ধরে নিয়ে এ জগৎযন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন যেটা ছিল বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিপন্থী। বিজ্ঞান তাই তার নিজস্ব পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই নূতন ভাবধারার পরিপোষক হয়ে কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছিলেন।

পৃথিবীকে সারা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলে ধরে নেওয়ার অবৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কোপারনিকাস। তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবী গতিহীন ত নয়ই বরং এর দু'প্রকারের গতি তাঁর গবেষণায় ধরা পড়েছে। একটা, পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময়ে ঘোরা ও অপরটা তার সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট সময়ে একবার পরিক্রমণ করে আসা। অবশ্য কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তগুলি দোষমুক্ত ছিল বলা চলে না। কারণ তাঁর মতে পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসার অক্ষপথ বৃত্তাকার ও সূর্যের অবস্থিতি এই বৃত্তের কেন্দ্রে, যা পরে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটা পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর অক্ষপথ ডিম্বাকার বা elliptical ও সূর্য পৃথিবীর অক্ষপথের ভিতরে একপাশে অবস্থিত। সে যাই হোক্ কোপারনিকাসই প্রথম বলেছিলেন যে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী-গ্রহের মূল্য খুবই কম। পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণে বড় গ্রহনক্ষত্র অনেকগুলো রয়েছে। আবার আমাদের সৌরজগতের মত জগৎ আরও আছে। এ অসীম শূন্যে আমাদের সৌরজগৎ মোটেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত সূর্য কোন এক তারকাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি অতি নগণ্য জ্যোতিষ্ক ছাড়া কিছুই নয় এবং এরূপ তারকাগোষ্ঠীও এ ব্রহ্মাণ্ডে শুধু একটি নয়, অসংখ্য।

এর পর গেলিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীন ধারণাগুলিতে এক বিপ্লব নিয়ে এলেন তাঁর নতুন আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। বহু অভিনব তথ্যও তিনি আবিষ্কার করলেন। সৌর-জগৎ যে পৃথিবী-কেন্দ্রিক নয়, সূর্য-কেন্দ্রিক, কোপারনিকাসের এই মত তিনি তো সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করলেনই—এ ছাড়া আরও তিনিই প্রথম জানালেন যে বৃহস্পতিগ্রহেরও পৃথিবীরই মতো উপগ্রহ আছে। চন্দ্রে ঠিক এখানকারই মতো পাহাড় আছে, এবং সূর্যে তিনি কয়েকটি কালো চিহ্নের সন্ধান পেয়েছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকদের কাছে এসব আবিষ্কার বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী বলে অসহ্য অপরাধ রূপে মনে হয়েছিল যার ফলে গেলিলিওকে এ অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে পরিত্রাণ পেতে হয়।

দার্শনিক কান্টই সর্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উৎপত্তিতত্ত্বের একটা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, আমাদের দৃষ্টিসীমার

অন্তর্গত সবগুলো নক্ষত্রই এক গোষ্ঠীভুক্ত যার নাম ছায়াপথ বা নেবুলা। আমাদের সৌরজগতের গ্রহউপগ্রহাদির মত এই তারকাগোষ্ঠীরও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। আদিতে এরা সকলেই ছিল এক বাষ্পীয় পদার্থ। পরে নানা কারণে এদের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং ঘনপদার্থটি খুব জোরে ঘুরতে থাকে, ফলে এ গ্রহনক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়। এসব সিদ্ধান্তের গাণিতিক ভিত্তি দুর্বল ছিল বলে পরে এর কিছুটা পরিশোধন করা হয়। লাপ্লেস বলেন যে, আদি বাষ্পীয় পদার্থের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় এর কেন্দ্রাপসারী বা সেন্ট্রিফিউগাল শক্তির প্রভাবে প্রথমে নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে একই পদ্ধতিতে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

কোন একটা বস্তু দেখলেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কে এর সৃষ্টিকর্তা? কোন এক জন সৃষ্টিকর্তা না থাকলে ত এটা সৃষ্ট হতে পারে না।' ধরুন, কলম হাতে নিয়ে এরূপ প্রশ্ন উঠলো। এর উত্তর হিসেবে আমরা প্রধানতঃ দু'টি কারণ পাই। উপাদান এর একটি কারণ আর এর কারিগর দ্বিতীয় কারণ। কলমের ক্ষেত্রে উপাদান পৃথিবীতে প্রথম থেকেই আছে। অতএব প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারিগর। কারণ উপাদান থাকলেও কারিগর না থাকলে ত কলমটি আমাদের হাতে আস্‌ত না। এবার আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত করে দিলে ঠিক এরূপ একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ এক্ষেত্রেও একজন সৃষ্টিকর্তা না থাকলে ত জগৎ তার বর্তমান রূপ পেতে পারত না। নাস্তিক দার্শনিকরা এর উত্তরে বলেন যে শুধু উপাদানই এ বিশ্বের আদি কারণ। যে সৃজনীশক্তির জন্যে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করি সে শক্তি উপাদানগুলির একটা আভ্যন্তরীণ স্বভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। এর জন্যে পৃথক একজন কারিগর—'ঈশ্বরের' কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানও এ যুক্তি প্রচ্ছন্ন-ভাবে মেনে নিয়েছিল। পূর্বোল্লিখিত লাপ্লেসের জগৎব্যাখ্যায় তাই ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় নি।

এরপর জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। জ্যোতির্বিদেরা এতদিন যে জগতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন প্রায় সেরূপ আরেকটি জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে—অতি ক্ষুদ্র পরমাণু জগৎ। পদার্থের পরমাণু (atom)রূপী যে সূক্ষ্মতম অংশকে অবিভাজ্য বলা হত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড দেখিয়ে দিলেন যে সেটা মোটেই অবিভাজ্য নয়। একেও ভাঙ্‌তে পারা যায়। পদার্থের সেই সূক্ষ্মতম অংশ বা পরমাণুতে তিনি সৌরজগতের অনুরূপ আর একটি জগতের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে সেই অতি ক্ষুদ্র জগতেরও একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা আছে। রাদারফোর্ডের এ আবিষ্কারে বিজ্ঞানজগতের প্রসারতা আরও অনেকটা বেড়ে গেল। দেখা গেল যে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে গ্রহ নক্ষত্রাদির জগৎ ঠিক সেরূপ অসংখ্য জগৎ পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুতেও রয়েছে। সৌরজগতের শৃঙ্খলা যেরূপ আকর্ষণী শক্তির আয়ত্তাধীন, পরমাণুজগতেও প্রায় সেরূপ আকর্ষণী শক্তির প্রভাব। এবার পদার্থবিজ্ঞানীরা পরমাণুজগতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পরমাণুজগতের বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার হতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল, যে গতিবিজ্ঞান বা ডাইনামিক্সের সাহায্যে গ্রহ-নক্ষত্রাদির জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় পরমাণু-জগতে সেরূপ পারা যায় না, অনেক কিছুই অমীমাংসিত থেকে যায়। এছাড়া নক্ষত্রজগতেরও কতকগুলো ঘটনাকে পুরনো ডাইনামিক্সের

সাহায্যে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। বিজ্ঞানের এরূপ থমকে দাঁড়ানো অবস্থায় আইনষ্টাইন এক নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে এর সমাধান করতে এগিয়ে এলেন।

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আলোচনা হয় দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। এতদিন দেশ ও কালের পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে নিত্য (absolute) বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আইনষ্টাইন বল্লেন যে দেশ ও কালের পরিমাপ আমাদের নিযুক্ত মাপকাঠির উপরই নির্ভর করে। কাজেই দেশ ও কালের ধারণা আপেক্ষিক। দেশের ধারণা নির্ভর করে পরীক্ষকের (observer-এর) গতির উপর আর কালের পরিমাপ নির্ভর করে তার বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটি লম্বা ধাতব টুকরোকে যদি খুব বেশী গতিশীল অবস্থায় নেওয়া যায় ও তার গতিরেখার উপর খাড়া অবস্থায় টুকরোটির মাপ নেওয়া হয় এবং পরে টুকরোটিকে গতির একই রেখায় রেখে তার দ্বিতীয়বার মাপ লওয়া হয় তা'হলে দুটি মাপ এক হয় না। দ্বিতীয় মাপ প্রথমের চেয়ে কিছুটা কম হয়। সাধারণ অবস্থায় ব্যবহারিক জগতে আমাদের এ তারতম্যটুকু চোখে পড়ে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটাকে অবহেলা করা যায় না।

দু'টি জায়গার দূরত্ব মাপতে হলে আমরা সাধারণতঃ স্কেল ব্যবহার করি। কিন্তু এক্ষেত্রে স্কেলের পাশাপাশি দাগের দূরত্ব নির্ভর করবে স্কেলটির গতি ও অবস্থানভঙ্গীর উপর। কাজেই কোন এক বিশেষ দূরত্ব দুজন লোকের দু'টি বিভিন্ন স্কেলের দু'টি বিভিন্ন গতি ও বিভিন্ন অবস্থানভঙ্গীর উপর নির্ভর করবে। একই দূরত্ব দু'জন লোকের কাছে তাই দু'টি বিভিন্ন রাশিতে প্রকাশিত হতে পারে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে কোন এক বিশেষ দূরত্ব আমাদের কাছে যা মনে হবে অন্য কোন গ্রহস্থ জীবের তা মনে হবে না। যদি কোন এক গ্রহের গতি সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল হয় তাহলে সঙ্কোচনের পরিমান হবে প্রায় অর্ধেক। ৮" ইঞ্চি দীর্ঘ একটি বস্তুর সঙ্কোচনের পর দৈর্ঘ থাকবে ৪" ইঞ্চি। আবার আমাদের কাছে যে গ্রহের গতি সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল, সেই গ্রহে যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে তা'হলে তাদের কাছে যে আবার আমাদের পৃথিবীর গতি সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল! কার গতি ঠিক তাত বোঝার কোন উপায় নেই। কাজেই দূরত্বের ধারণা নিত্য নয়, আপেক্ষিক। দূরত্বের কোন একটি মাপকাঠিকেই নিত্য বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন গতিশীল পরীক্ষকের কাছে তাই দেশ পরিমাপের কাঠামো বিভিন্ন।

কাল সম্বন্ধেও আমরা একই সত্যে উপনীত হই। আমাদের ধারণা—কাল একটি নিরপেক্ষ নিত্য বস্তু, আমাদের অনুভূতির উপর এটা নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আসলে তা নয়। যদি আমাদের কোন এক যুবক বন্ধু প্রচণ্ড গতিশীল যানে আরোহণ করে পৃথিবী থেকে বহু দূরের কোন এক গ্রহে গিয়ে বেড়িয়ে আসে তা'হলে সে এসে দেখবে যে আমরা বৃদ্ধ হয়ে বসে আছি যদিও তার নিজের শরীরে জরার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নি। আমাদের অনুভূতিতে যে সময় ষাট বা সত্তর বছর তার অনুভূতিতে সেটা হয়ত দশ বছর। এর কারণ, আমাদের সৌভাগ্যবান বন্ধুর বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া আমাদের চেয়ে মন্থর।

আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বস্তু থেকে আসা আলোই আমাদের সেই বস্তুটির ধারণা জন্মিয়ে দেয়; অর্থাৎ

আমাদের সম্বন্ধ বস্তুটির সঙ্গে নয়, বস্তুটি থেকে বেরিয়ে আসা আলোর সঙ্গে। বহু বছর আগে কোন এক দূরবর্তী তারকা থেকে সেখানকার তথ্যরাশি বহন করে যে আলোর তরঙ্গ রওনা হয়েছিল তা এতদিন ভ্রমণের পর আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। এই আলোর মাধ্যমে আমরা তারকার বহু বছর আগের ঘটনাটি এখন প্রত্যক্ষ করছি। কাজেই আমাদের কাছে যেটা বর্তমান, তারকাটির কাছে তা অতীত। অতীতের বহু ঘটনার স্মৃতি বহন করে আলোতরঙ্গ মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। আমরা যদি আলোর গতির কয়েক লক্ষ গুণ অধিক গতিশীল যানে আরোহণ করে সেই আলোর পিছনে ধাওয়া করি তা'হলে কয়েক লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর নানা ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে। কাজেই আমাদের সাধারণ অনুভূতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য নেই।

উপরোক্ত বিচারগুলি থেকে আইনষ্টাইন্ তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্বের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর মতে দেশ ও কালের পরিমাপ স্বতন্ত্র বিচারে আপেক্ষিক। কিন্তু দেশ-কালের সমন্বয়ের কাঠামো সকল পরীক্ষকের কাছে সকল অবস্থাতেই সমান।

এরপর মিন্‌কাউস্কি দেশের তিনটি মাত্রার সঙ্গে কালের এক মাত্রা যোগ করে চতুর্মাত্রিক সত্তার সৃষ্টি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু অমীমাংসিত তথ্যের উত্তর পাওয়া যেতে লাগল। মহাকর্ষ (Gravitation) সম্বন্ধে গাণিতিক বিচার করে আইনষ্টাইন্ বল্‌লেন যে, মহাকর্ষ আসলে টানাটানির ব্যাপারই নয়। দেশ এবং কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে তৈরী হয়েছে একটি চতুর্মাত্রিক সত্তা (Time-Space Continuum : দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ এই তিন মাত্রা+কাল এক মাত্রা)। এই সত্তার মধ্যে যদি কোথাও কোন জড় পদার্থ না থাকে তবে তার হয় সাম্যাবস্থা এবং বিস্তার হয় অনন্ত। কিন্তু এই শূন্যের ভিতরে একবার জড়ের আবির্ভাব ঘটলে শূন্য আর অনন্তবিস্তৃত থাকে না; উহা হয়ে পড়ে সান্ত। যেখানেই জড়পিণ্ডের অবস্থান সেখানেই তার আশেপাশের সত্তা যেন বেঁকে চুরে যায়। এক গতিশীল পদার্থ যখন অপর কোন পদার্থজনিত এরূপ বাঁকাচোরার মধ্যে এসে পড়ে তখন আর ঋজুভাবে চল্‌তে পারে না, বাঁকাচোরার রকম অনুযায়ী তার গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল। গ্রহনক্ষত্রের কক্ষপথ রচনার উহাই আসল কারণ।

আইনষ্টাইনের এই চতুর্মাত্রিক সত্তার আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আবার অব্যাহত গতিতে বয়ে চল্‌ল।

যদি আমরা একটা ঢিল আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারি তা'হলে কিছুক্ষণ পরে ঢিলটি মাটিতে ফিরে এসে আঘাত করে। ঢিলটির মাটিতে পড়ার জায়গায় যদি কোন স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তু না থাকে তা'হলে ঢিলটা অনেক ক্ষেত্রে ভেঙ্গে চুরমার হয়, একটা শব্দ উত্থিত হয় ও জায়গাটি কিছুটা উত্তপ্ত হয়। আকাশে থাকা অবস্থায় ঢিলটির যে 'সমষ্টিগত একতা' (organised property) ছিল তা বদ্‌লে যায় অর্থাৎ এর সংগঠনী শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এর অণুপরমাণুগুলি একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সব পদার্থ তাপ বিকীরণ করে তাদেরও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনবরতই বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হয় ও তাদের শক্তি বেরিয়ে এসে অসীম শূন্যে মুক্ত অবস্থায় মিলিয়ে যায়।

থারমডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র বলে যে, প্রতিটি উচ্চতাপবিশিষ্ট বস্তুই তার আশেপাশের অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপবিশিষ্ট বস্তুকে তাপ বিলিয়ে

দিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে একটি 'তাপের সাম্যাবস্থা' সৃষ্টি করছে। এই সূত্র থেকেই এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে সময় যতই বয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের বিশৃঙ্খলতাও ততই বেড়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, আমরা যতই অতীতের দিকে পিছিয়ে যাই ততই পদার্থের 'সমষ্টিগত একতা'র (organised property-র) বৃদ্ধি লক্ষ্য করি। এভাবে উত্তরোত্তর পিছিয়ে গেলে আমরা পদার্থের এমন একটি অবস্থা লক্ষ্য করব যেখানে পদার্থের বিশৃঙ্খলতা মোটেই থাকবে না। কিন্তু পদার্থের সেই আদিম সুসম অবস্থা সৃষ্টির জন্যে এক্ষেত্রে এক জন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। Eddington এ সম্বন্ধে বলেছেন, "There is no doubt that the scheme of Physics as it has stood for the last three quarters of a century postulates a date at which either the entities of the universe were created in a state of high organisation or pre-existing entities were endowed with that organisation which they have been squandering ever since. Moreover, this organisation is admittedly the antithesis of chance. It is something which could not occur fortuitously......... It has been quoted as scientific proof of the intervention of the creater at a time not infinitely remote from today. But I am not advocating that we draw any hasty conclusions from it. Scientists and theologians alike must regard as somewhat crude the naive theological doctrine which (suitably disguised) is at present to be found in every text book of thermodynamics, namely, that some billions of years ago God wound up the material universe and has left it to chance ever since.........It is one of those conclusions from which we can see no logical escape—only it suffers from the drawback that it is incredible.*

জড়বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে বলে কোন সিদ্ধান্ত সত্যিই করা যায় না। তবে প্রচ্ছন্নভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানকে মেনে নিতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আরও উন্নত অবস্থায় হয়তো আমরা এ বিষয়ে স্পষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

* ভাবার্থ :—

গত ৭৫ বৎসর ধরে পদার্থবিজ্ঞানের যে ধারা চলছে তা থেকে বিশ্ব-প্রকৃতির এমন একটা অতীতের আভাস পাওয়া যায় যখন সব বস্তুই অত্যন্ত সুসম্বদ্ধ অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিল। সেই আদিম সংহতি—যা তারপর থেকেই নষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছে 'আকস্মিকতা'র কঠি বিপরীত জিনিস। আপনা আপনি ঐ সংহতি কখনো ঘটে নি। তবে কি বিশ্বপ্রকৃতির সেই প্রথম অবস্থায় সৃষ্টিকর্তা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন? কেউ কেউ এইটাকেই ঈশ্বরের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলে উদ্ধৃত করেন। আমি এইরূপ কোন ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলছি না। এইরূপ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানী এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণেরও কাছে 'অপরিণত' বলে মনে হবে। অবশ্য থার্মডিনামিক্স-এর বইতে আজকাল এই রকম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখা যায় যে, কোটি কোটি বছর আগে ভগবান যেন জড়প্রকৃতিকে গুটিয়ে নিয়ে তারপর আকস্মিক গতিপথে ছেড়ে দিয়েছেন।...ন্যায়-যুক্তির দিক দিয়ে এ সিদ্ধান্ত দুর্বার, যদিও এর ত্রুটি এই যে, এটা আমরা বিশ্বাসে আনতে পারি না।

অর্বুদা দেবী

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

রাজপুতানার মরুভূমিতে সুবিখ্যাত আবু পাহাড়ের শুদ্ধ নাম অর্বুদ পর্বত। এই পর্বতের একটি গুহার মধ্যে 'অর্বুদা দেবী' বিরাজমানা। (অব্বর দেবীও বলা হয়)। এই দেবীর নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হইয়াছে 'অর্বুদ পর্বত'। কেহ কেহ বলেন, যেমন শরীরের যে কোন স্থানে বর্দ্ধিত মাংসপিণ্ডকে আব (টিউমার) বলা হইয়া থাকে সেইরূপ রাজস্থানের মরুভূমিতেও এই পাহাড়টি অস্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হইয়া আবের মত দেখায় বলিয়াই ইহার নাম অর্বুদ পর্বত। মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে ফলেফুলে সুশোভিত গাছপালা, লতাগুল্ম, ছোট ছোট ঝরণা ও হ্রদ সমন্বিত সুদৃশ্য এই পাহাড়টি অতি স্বাস্থ্যকর স্থানও বটে। পশ্চিম ভারতের বহু লোক এখানে বায়ুপরিবর্তনে আসিয়া থাকেন। রাজাদের স্বাস্থ্যনিবাস আছে। দিল্‌বারা মন্দির অদ্যাবধি জৈনধর্মের অক্ষয়কীর্তি প্রদর্শন করিতেছে। পর্বত চূড়ার নাম 'গুরুশিখর'। তথায় একটি মন্দিরে গুরু দত্তাত্রেয়ের শ্রীপাদুকা পূজা হয়। আবু পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট।

আবু পাহাড় সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্ত আছে:—

পাহাড়ের তিন মাইল দূরে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। পুরাকালে ঐ অঞ্চল সমতল ও মুনিঋষিদের তপোভূমি ছিল। একবার বশিষ্ঠদেবের প্রিয় কামধেনু নন্দিনী, আশ্রমের কিয়দ্দূরে একটি গর্তে পড়িয়া যায়। মুনিবর তাঁহার কামধেনুকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর ঐ গর্তের ভিতর নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। নন্দিনী বলিল, প্রভো! আপনি সরস্বতীর বন্দনা করুন। তিনি আসিলেই আমি উদ্ধার হইব। বশিষ্ঠদেব সরস্বতীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া গর্তে প্রবেশ করিলেন। নন্দিনী উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু সরস্বতী আর উঠিতে পারেন না, ঐ গর্তেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। সরস্বতী তখন ঋষিবরকে বলিলেন, আপনি আমায় উদ্ধার করুন। বশিষ্ঠদেব করযোড়ে বলিলেন, মা! আপনি আজ্ঞা করুন কি উপায়ে আপনাকে উদ্ধার করিব। সরস্বতী বলিলেন, হিমালয়ের এক ছেলে এখানে আসিলেই আমি উঠিতে পারিব। মুনিবর হিমালয়ের নিকট সব ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার এক ছেলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। হিমালয় বলিলেন, ঋষিবর, আপনার আদেশ শিরোধার্য করিলাম। যে কোন ছেলেই আপনার কাজে যাইতে পারে, আমার কোনই আপত্তি নাই। তবে আজকাল ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আমার বশ নয়। বশিষ্ঠ একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। একমাত্র ছোট ছেলে নন্দিবর্ধন বলিল, প্রভু, আমি আপনার কাজের জন্য প্রস্তুত আছি, তবে আমি পঙ্গু। বশিষ্ঠদেব তাহাকে দেখিয়া খুবই চিন্তান্বিত হইয়া ভাবিলেন যে এমতাবস্থায় তাহাকে কি করিয়া লইয়া যাইবেন। নন্দিবর্ধন মুনিবরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, চিন্তার কোনই কারণ নাই। আপনার আশ্রমের নিকটে আমার

বিশেষ বন্ধু নাগরাজ নামে এক জন সদাশয় রাজা আছেন। তাঁহাকে বলিলেই তিনি আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন। বশিষ্ঠদেব নাগরাজের নিকট আসিয়া সকল ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন করিলে নাগরাজ বলিলেন, 'ঋষিবর! আপনার কাজের জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত; তবে আমার একটি নিবেদন আছে। তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমি হিমালয়ের ছেলেকে কাঁধে করিয়া আনয়ন-পূর্বক গর্তে প্রবেশ করিলেই সরস্বতী উদ্ধার হইবেন নিশ্চিত—কিন্তু তাহাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করিলেই আমি আপনার আদেশ পালন করিতে পারি'। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাহার ব্যবস্থা হইবে।' অতঃপর নাগরাজ হিমালয়ের ছেলেকে আনিয়া গর্তে প্রবেশ করিলেন। সরস্বতী মুক্ত হইয়া কচ্ছভুজের দিকে সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর মরুভূমির বালুকারাশিতে তিনি মিশিয়া গেলেন। অদ্যাবধি তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে গর্ত ভরিয়া গেল। কেবলমাত্র নন্দিবর্ধনের নাকটি জাগিয়া রহিল। ঐ নাকই বর্তমান আবু পাহাড় নামে খ্যাত। নাগরাজের মৃত্যু হওয়ায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি-অনুসারে বশিষ্ঠদেব নাগরাজের চারি পুত্রকে একটি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত করিয়া ঐ নূতন রাজ্য তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। পরিহর, শোলাঙ্কি, পরমার ও চৌহান—এই চারি জন নাগরাজের পুত্র। ইঁহারাই রাজপুতগণের পূর্বপুরুষ। ইঁহারা ঋষিদের যজ্ঞানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই 'অগ্নিকুল' নামে পরিচিত।

এদিকে আশ্রমে ঋষিগণ বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, 'এখানে আমরা আর থাকিব না। এবারে হিমালয়ে যাইয়া তপস্যাদি করিব স্থির করিয়াছি। কারণ হিমালয়ে ফলফুলের কোনই অভাব নাই।' তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি এই পাহাড়কেই হিমালয়ের মত করিয়া দিতেছি।' অতঃপর ঋষিবর নানারকমের বৃক্ষ-লতা, আম, জাম, লিচু ও খেজুর প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের গাছ এবং প্রস্রবণাদি সৃষ্টি করিলেন। তাহাতেও ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইলেন না—বলিলেন, 'হিমালয় শিবের স্থান, সেইখানেই আমরা যাইব'। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মুনিবর বিশ্বনাথের বহু স্তবস্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'প্রভো! দয়া করিয়া আপনি এই পাহাড়ে আগমন করুন'। শিব বলিলেন, 'আমার যাওয়া অসম্ভব'। বশিষ্ঠদেব তাহাতেও পশ্চাৎপদ না হইয়া বিশেষভাবে শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি যখন তাণ্ডব-নৃত্য করিব, তখন আমার পায়ের গোড়ালী ওখানে উঠিবে।' এই ঘটনা হইতেই অচলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা হয়। শিবের নাম হইতেই ঐ স্থানের নাম হয় 'অচলগড়'। ইহা আবু বাজার হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজস্থানের ইতিহাসে আছে, ঋষিগণ অর্বুদ পর্বতশিখরে তপস্যা করিতেন। তাঁহারা বনের ফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন। দৈত্যগণ তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইত। তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিগণ যজ্ঞাদি করিলেন। তাহাতে দৈত্যগণ দমন হওয়া ত দূরের কথা বরং তাহাদের অত্যাচার আরও বাড়িয়া গেল। ইহাতেও ঋষিগণ আপন আপন ধর্মকর্ম হইতে বিরত না হইয়া হোমানল জালিয়া শিবধ্যানে রত রহিলেন। ঐ হোমানল হইতে এক সুপুরুষের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ তাহার 'পরিহর' নামকরণ করিয়া তাহাকে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহার দ্বারা কোনই কাজ সফল হইল না। পর পর আরও দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাহাদের নাম হইল 'শোলাঙ্কি' ও 'পরমার'। তাহারাও ঐ কার্যে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু তাহাদের কেহই ঋষিদের এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইল না। একে একে সকলেই এইভাবে অকৃতকার্য হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বেদমন্ত্রোচ্চারণে হোমানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শস্ত্রধারী এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইল। ঋষিগণ তাহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া 'চৌহান' নামকরণে শত্রুনিধনে আদেশ করিলেন। সেই সময় মুনিগণ সুফলাভিলাষে কালিকাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। মা স্তুতিতে সন্তুষ্টা হইলেন এবং সিংহ-বাহিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া অভয়বাণী প্রদান-পূর্বক তিরোধান করিলেন। মহামায়ার শুভাশীর্বাদে 'চৌহান' দৈত্যগণকে নিহত করিয়া শান্তি স্থাপন করিল। অতঃপর ঋষিগণও নিশ্চিন্তমনে ব্রহ্ম-ধ্যানে তৎপর হইলেন। ঐ চার পুরুষ অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই উহাদের অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া আখ্যা দেয়া হইয়া থাকে। ইঁহাদেরই বংশধরগণ রাজপুত নামে পরিচিত। আর ঐ দেবীই তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী বা ইষ্টদেবীরূপে পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই অর্বুদা দেবী।

সেই অবধি পরমার রাজগণ এই আবু পাহাড়ে রাজত্ব করিতেছিল। ইষ্টদেবীকে পাহাড়ের মনোরম স্থানে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার্চনা করিত। অনন্তর তাহাদের রাজশক্তির হ্রাস হয়। সেই সময় জৈনধর্মের খুবই প্রতিপত্তি হইয়াছিল। গুজরাটের জৈনধর্মাবলম্বী রাজার মন্ত্রী এই পার্বত্য রাজ্য অধিকার করেন। পরমাররাজ উক্ত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তাব করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, 'ওখানে জৈনধর্মের মন্দির করিতে দিলে রাজ্য ফিরাইয়া দিতে পারি।' রাজা তাহাতেই রাজী হইলেন। মন্ত্রী ঐ অর্বুদা দেবীর মন্দিরের নিকটে জৈন মন্দির নির্মাণ করিলেন। উহাই বর্তমানে 'দিল্‌বারা' মন্দির নামে বিখ্যাত। কিছুকাল পরে পরমার বংশীয় জনৈক রাজা দেবীকে অপর এক পাহাড়ের গুহায় স্থাপন করেন। ঐ গুহাতেই বর্তমানে অর্বুদা দেবীর পূজা-অর্চনা হইতেছে। পূর্ব দেবী-মন্দির অদ্যাবধি দিল্‌বারা মন্দিরের পশ্চাতে ধ্বংসাবস্থায় বর্তমান।

জৈন ধর্মের 'অর্বুদ পুরাণে' আছে,— বশিষ্ঠদেবের আবু পাহাড়ে তপস্যাকালীন এক দিন তাঁহার কামধেনু গর্তে পড়িয়া যায়। উঠিবার কোনই উপায় নাই দেখিয়া নিজের দুগ্ধে গর্তটি ভরিয়া উপরে চলিয়া আসে। কিন্তু ঐ গর্ত মানুষ ও জীবজন্তুর পক্ষে বিপদের খুবই আশঙ্কা হইয়া রহিল। তজ্জন্য উহা পূরণ করিবার মানসে বশিষ্ঠদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার ছোট ছেলে নন্দিবর্ধনকে প্রার্থনা করিলেন। নন্দিবর্ধন পঙ্গু ছিল। বশিষ্ঠদেব অর্বুদ নামে এক বিশাল সর্পের সাহায্যে তাহাকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু সর্পের সহিত এরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, ঐ স্থানের নাম নন্দিবর্ধন না হইয়া অর্বুদ হইবে। সর্প নন্দিবর্ধনসহ গর্তে প্রবেশ করিল। গর্ত ভরিয়া গেল। কেবলমাত্র নন্দিবর্ধনের নাকটি জাগিয়া রহিল। উহাই পাহাড়ে পরিণত হয়। পূর্ব সর্তানুসারে ইহার নাম হইল অর্বুদ পর্বত। কেহ কেহ ইহাকে নন্দিবর্ধন পর্বতও বলিয়া থাকেন। প্রবাদ এই যে, ঐ সর্প ছয় মাস পরে পরে এক বার পাশ পরিবর্তন করে, তাই আবুতে ভূমিকম্প হয়।

আবার জৈন শাস্ত্রে আছে, ভগবান ঋষভদেব ও তীর্থঙ্কর নেমিনাথ পূজ্যপাদ-দ্বয়ের দর্শনার্থে অর্বুদ অর্থাৎ দশ কোটি ঋষি ঐ স্থানে তপস্যায় রত ছিলেন। তাই এই পাহাড়ের নাম অর্বুদ পর্বত।

কেহ কেহ বলেন, ঋষভদেব ও নেমি-নাথের সেবার্থে প্রত্যেক বস্তু যাহা অর্পিত হইত তাহার (পুণ্য) ফল অর্বুদ গুণ অর্থাৎ দশ কোটী গুণ দাতা বা সেবক পাইত—ইহ ও পরলোকে। এই জন্যই পাহাড়ের নাম হয় অর্বুদ পর্বত।

আবু রোড ষ্টেশন হইতে রেলপথে সিদ্ধপুর প্রায় ত্রিশ মাইল। ঐ স্থানেই অম্বাদেবীর আদি মন্দির ছিল। এক সময় দেশের শান্তি রক্ষার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণগণ মায়ের সম্মুখে যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই সময় মুসলমানগণ আক্রমণ করে। পূজারীদের মধ্যে কেহ কেহ মায়ের উৎসববিগ্রহসহ পলায়নপূর্বক ঘোর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া স্বধর্ম রক্ষা করে এবং পাহাড়ের গুহায় মায়ের পূজা-অর্চনা করিতে থাকে। এই মূর্তিই অম্বাদেবী নামে বর্তমানে পূজিত ও খ্যাত। এই দেবীস্থান আবু রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় বার মাইল—বাসে যাইতে হয়।

এদিকে শত্রুপক্ষ মায়ের মূল বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। অনতিকাল পরে তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাতে রাজী হন নাই। এই কারণে অদ্যাবধি তাহারা ব্রাহ্মণদের জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না। বর্তমানে তাহারা 'বোহরা' নামে পরিচিত। তাহাদের নাম ও আচার-ব্যবহার হিন্দুদের ন্যায় কিন্তু নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহারা নামের পরিবর্তন করিতেছে। তাহারা সংখ্যায় খুবই কম। এই অল্প সংখ্যক লোকই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম এই সমাজের মধ্যেই হইয়া থাকে। এমন কি প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহই অভুক্ত থাকিতে পারে না। পরস্পরে কাজকর্মের ব্যবস্থাদি করিয়া দেয়। যাহাদের খাওয়ার কোনই সংস্থান নাই তাহাদের জন্য লঙ্গর (ছত্র) আছে। দিনান্তে যাইয়া আহার করিয়া আসে। এই সব তাহাদের সমাজ হইতেই ব্যবস্থা আছে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

তোমারি চরণে এনেছি আজিকে—নিঃশেষে মোরে নাও,
আকাশ-আবরী নিশি-বিভাবরী, হে তপন! তুমি চাও।
আগলবিহীন মোর খোলা দ্বার—
তোমার আসন করো অধিকার,
সকল গভীরে অমল রবিরে কিরণে আজি বিছাও;
তোমারি চরণে এনেছি আজিকে—নিঃশেষে মোরে নাও।

স্বর্ণ-উদয় অস্ত-গোধূলি এনেছি অর্ঘে তুলি',
পাবক-গরিমা আঁধার-আরতি সুর তব যায় খুলি'।
টোটে কুসুমিকা ফুলের বাঁধন
ভোলে অভিসারী কূলের কাঁদন,
জানি হয় সোনা গানে তব হাসি অতল অশ্রু—তা-ও;
তোমারি চরণে এনেছি আজিকে—নিঃশেষে মোরে নাও।

কর্ণেল টড্-মহারাণা কুম্ভ-মীরাবাঈ

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সাহিত্যভূষণ

মীরাবাঈর জীবনীলেখক ও নাট্যকারগণ অধিকাংশই রাজস্থানের ইতিহাসপ্রণেতা কর্ণেল টড্ সাহেবের অনুসরণ করিয়া মীরাবাঈ জীবনী ও নাটক লিখিয়াছেন। মহারাণা কুম্ভ মীরাবাঈর স্বামী, পরন্তু মহারাণা কর্তৃক মীরা প্রপীড়িতা হইয়াছিলেন—ইত্যাদি লেখকগণের প্রধান বিষয়বস্তু। রাজস্থানের ইতিহাস রচনায় টড্ সাহেবের অবদান যথেষ্ট। ভারতবাসী সেজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তবে এক জন বিদেশী লেখকের পক্ষে প্রকৃত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা কত দূর সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সব ইতিহাস রচিত হইয়াছে—তাহার প্রকৃত তথ্য উদ্ঘাটন করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।

কর্ণেল টড্ Annals of Mewar গ্রন্থে (৩০৩ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—মহারাণা কুম্ভ মেড়তার রাঠোর কুমারীকে বিবাহ করেন। মীরাবাঈ তৎকালে সৌন্দর্য ও কবিত্বে শ্রেষ্ঠ রাজরাণী ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে তাঁহার পতি গীত-গোবিন্দের টীকা লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন··· ইত্যাদি। টড্ সাহেবের মীরাবাঈর জীবন-বৃত্তান্ত—বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও নাট্যকারগণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাজ-স্থানের ইতিহাস ও পরবর্তীকালের রাজস্থানের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের গবেষণা হইতে দেখা যাউক—মহারাণা কুম্ভ মীরাবাঈর পতি পরন্তু কর্ণেল টডের যুক্তি সমর্থজনক কি না?

"বীর বিনোদ" বলিতেছেন যে টড্ সাহেব মীরাবাঈকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী লিখিয়াছেন—তাহা ঠিক নহে। যেহেতু রায় যোধাজী ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে যোধপুর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণা কুম্ভের দেহান্ত হয়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে রায় দুদাজী যোধাবতের মেড়তা-প্রাপ্তি ঘটে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণা সাঁগা ও রায় দুদাজীর দুই পুত্র রায়মল ও রত্নসিংহ (মীরাবাঈর পিতা) বাবরের সহিত যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হন। মহারাণা কুম্ভের সময়ে (জন্ম ১৪১৮—মৃত্যু ১৪৬৮) দুদাজীর মেড়তা-প্রাপ্তিই ঘটে নাই—তবে দুদাজীর পৌত্রী মীরাবাঈ মেড়তনী মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী কিরূপে হইতে পারেন? মহারাণা কুম্ভের দেহান্তের ৫৯ বৎসর পরে বাবর ও মহারাণা সাঁগার যুদ্ধে মীরাবাঈর পিতা (১৫২৭ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। টড্ সাহেবের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মহারাণা কুম্ভের সময়ে রত্নসিংহের বয়স কম পক্ষে ৪০ বৎসর হইবে। তবে রত্নসিংহের মৃত্যুকালীন বয়স এক শত হওয়া প্রয়োজন—যদি তাহাই হয় তবে এত বৃদ্ধ বয়সে সমরে সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুবরণ কি বিশ্বাস্য ব্যাপার?

মহারাণা কুম্ভ হইতে ১০০ বৎসর পরে মীরাবাঈর খুল্লতাত ভ্রাতা জয়মল্লের মৃত্যু হয়; তাহা হইলে জয়মল্লের ভগিনী মীরা কিরূপে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী হইতে পারেন? মীরাবাঈ মহারাণা বিক্রমাজিৎ, উদয়সিংহের সময় পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

টড্ সাহেব ধাঁধাতে পড়িয়া লিখিয়াছেন, মহারাণা কুম্ভ চিতোরগড়ে যে কুম্ভশ্যাম নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহার পার্শ্বে

যে মন্দির রহিয়াছে তাহা মীরাবাঈর মন্দির নামে পরিচিত। এই দুই মন্দির পাশে পাশে থাকায় টড্ সাহেব মীরাবাঈকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী লিখিয়াছেন। 'মীরা মাধুরী' লেখক বলিতেছেন, "রাণা কুম্ভের বিদ্বত্তা পরন্তু মীরাবাঈর কবিত্বশক্তি দেখিয়া কুম্ভের প্রতিষ্ঠিত কুম্ভশ্যাম মন্দির মীরাবাঈর মন্দির নামে খ্যাত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুইই প্রমাণবিহীন। দম্পতির মধ্যে যে দুই জনকেই বিদ্বান হইতে হইবে ইহার কোনো যুক্তি নাই। পরন্তু এক জন বিদ্বান হইলে অপরকেও বিদুষী হইতে হইবে—ইহাও যুক্তিবিহীন। কাহারো নির্মিত মন্দির তাহার পরবর্তীকালে অন্যের নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারে। ইহাও অসম্ভব নহে।"

মীরাবাঈ স্বয়ং "নরসীকা মায়রা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—তিনি মেড়তার ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা রাঠোরবংশ-সম্ভূতা। তাঁহার বিবাহ মেবারের মহারাণার সহিত হইয়াছিল। এখন দেখা প্রয়োজন যে মেড়তায় ক্ষত্রিয় রাজত্ব কথন হইয়াছিল। রায় যোধাজীর পুত্র রায় দুদাজী—১৪৬১ ইংরেজী সালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মেড়তা রাজ্যের অন্ত হয়। মাত্র ৯৩ বৎসর মেড়তা রাঠোর রাজগণের অধিকারে ছিল। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারিণী মীরার ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উদ্ভব সম্ভবপর নহে। ১৪৬১ খৃঃ হইতে ১৫৫৪ খৃঃ মধ্যে জন্মগ্রহণ-কারিণী মীরাবাঈ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুগামী মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী কোনো প্রকারেই হইতে পারেন না।

মহারাণা কুম্ভ পঞ্চাশ বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তথন দুদাজীর প্রথম সন্তান ৬।৭ বৎসরের হইবে। মীরার পিতা রত্নসিংহের জন্ম ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে, রাণা কুম্ভের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে হইয়াছিল। সুতরাং মীরার রাণা কুম্ভের স্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তার পিছনে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

মহারাণা কুম্ভের ইষ্টদেব 'একলিংগ' হইলেও তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি গীতগোবিন্দের "রসিকপ্রিয়া" নামে টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির কুম্ভস্বামী বা কুম্ভশ্যাম নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের পার্শ্বেই আরো ১২টি মন্দির রহিয়াছে। ছোট একটি মন্দির মীরাবাঈর মন্দির নামে পরিচিত। এই কারণে লোকে মহারাণা কুম্ভ ও মীরাবাঈ পতি-পত্নী বলিয়া অনুমান করেন। মহারাণার গীতগোবিন্দের টীকাতে কুম্ভল্লদেবী ও অপূর্বদেবী নামে তাঁহার দুই রাণীর উল্লেখ রহিয়াছে। চারণ মুখে—প্যার কুঁয়র, অপরমদে, হর কুঁয়র ও নারংগদে নামে তাঁহার চার রাণীর কথা শুনা যায়। (ওঝাকৃত রাজপুতনার ইতিহাস খণ্ড ২, পৃঃ ৬৩৪) কিন্তু মীরাবাঈর নাম কোথায় নাই। পরম ভক্ত মহারাণা কুম্ভ তাঁহার সহধর্মিণী তপস্বিনী মীরাবাঈর নাম কি উল্লেখ করিতে পারিতেন না?

"মীরা মাধুরী" বলেন—রায় যোধাজীর কন্যা শৃংগার দেবীর বিবাহ—রাণা কুম্ভের পুত্র রায়মলের সহিত হয়। এই অবস্থাতে রায় যোধাজীর প্রপৌত্রী মীরাবাঈর বিবাহ মহারাণা কুম্ভের সহিত হওয়া প্রলাপ মাত্র।

"মীরা মন্দাকিনী" লেখক বলিতেছেন—মীরাবাঈকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী স্বীকার করিয়া তাঁহার পরম পবিত্র চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে। পরন্তু তাঁহাকে পতিবিমুখ ও পতিদ্রোহী করা হইয়াছে। এরূপ ভ্রমপূর্ণ কথা পুষ্টিকারিগণ—অনেক পদ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পদাবলীতে জুড়িয়া দিয়াছেন। মীরার দ্বারা তাঁহার পতিকে এরূপ কটু বচন প্রয়োগ করা হইয়াছে যে কোনও ভারতীয় ললনা আপন পতিপ্রতি এরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহেন; যদি মহারাণা কুম্ভকে পতি স্বীকার করা যায় তবে মহারাণা

কর্তৃক এরূপ অত্যাচার সম্ভবপর নহে। যেহেতু মহারাণা স্বয়ং বিদ্বান ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন; স্বয়ং গীতগোবিন্দের টীকা করিয়াছেন।

চিতোরগড় ভ্রমণকারী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন (প্রতিক আষাঢ় ১৩৫৮ বাং)—মহারাণা কুম্ভের মন্দিরে বরাহ অবতারের বিষয় বর্ণিত ছিল। ইহার দক্ষিণে মীরাবাঈর মন্দির; ইহাতে মীরাবাঈ শ্যামনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন—মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের স্ত্রী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি ভোজরাজের স্ত্রী ছিলেন। রাণা কুম্ভের মন্দিরের নির্মাণকাল ১৪৪৮ খৃঃ, আর মীরাবাঈর মন্দির নির্মিত হয় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে। প্রায় ১০০ বৎসরের পার্থক্য।

কর্ণেল টড্ সাহেবের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়া গুজরাটের গোবর্ধনরাম—মাধবরাম ত্রিপাটী তাঁহার Classical Poets of Guzrat পুস্তকে ও কৃষ্ণলাল মোহনলাল থরেরী—"গুজরাটী সাহিত্যনো মার্গসূচক স্তম্ভো" পুস্তকে মীরাবাই—মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী লিখিয়াছেন।

রাজপুতনার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুন্সী দেবীপ্রসাদজী "মহকমে তয়ারীখ মেয়াড়" গ্রন্থের প্রমাণে কর্ণেল টড্ সাহেবের সব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া মীরাবাঈ ভোজরাজের যুবরাজ্ঞী প্রমাণ করিয়াছেন। মুন্সীজী লিখিত "মীরাবাঈকা জীবন চরিত্র" গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"মীরাবাঈর বিবাহ ১৫৭৩ বিক্রম সংবৎ (১৫১৬ খৃঃ) রাণা সাঁগার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সহিত হইয়াছিল।"

মুন্সীজীর সিদ্ধান্ত রাজস্থানের ওঝাজী, গহলৎজী, সারড়াজী প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সমর্থন করিয়াছেন।

টড্ সাহেব রাজপুতনার ইতিহাস রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী যুগে রাজপুতনায় বহু ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছে। রাজপুতনা পরন্তু তৎসমীপবর্তী স্থানসমূহের ঐতিহাসিকগণ যেরূপ প্রকৃত রাজপুতনার ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ—অন্যের দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক কালনির্ণয় পরন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মীরাবাঈ মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী কোনো প্রকারেই হইতে পারেন না। মীরাবাঈ বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব হিন্দী সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম ও হিন্দী সাহিত্যজগতে মীরাবাঈ জয়দেব, চণ্ডীদাস, সুরদাস, কবীর প্রভৃতি সন্তের মত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং মীরাবাঈর জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা কালে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।*

* লেখকের মীরাবাঈ গ্রন্থ হইতে প্রকাশিত।

"গোপীপ্রেমে ঈশ্বররসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু শিষ্য শাস্ত্র উপদেশ ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্ন মাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন

অধ্যাপিকা শ্রীসান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ

সর্বদা পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব-সংসারের কোথায় আরম্ভ, কোথায় অবসান—তাহা আমরা দেখিতে পাই না। এই জন্যই ইহাকে আমরা একটি রহস্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই রহস্য-ভেদে মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। কেন এই পরিবর্তন? এই পরিবর্তনের রীতি নীতিই বা কি? ইহার অর্থ কি? আদিকাল হইতে মানুষ এই সকল প্রশ্ন করিয়াছে। নানা ধর্মে, দর্শনে এবং বিজ্ঞানেও এই সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে আধুনিক বিবর্তনবাদ্ (Theory of Evolution) এইরূপই একটি প্রচেষ্টা। আমাদের দেশে প্রাচীন সাংখ্যদর্শন কর্তৃক বিবৃত সৃষ্টিতত্ত্ব বহু-জন-মান্য হইয়াছে। সাংখ্য-মতে শূন্য হইতে কোনও কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না। কার্য থাকিলে তাহার কারণও থাকিবে। কিন্তু কার্য ও কারণ দুটি ভিন্ন পদার্থ নয়, কারণই কার্যে বিকশিত। একই বস্তু 'অব্যক্ত' অবস্থায় কারণ এবং 'ব্যক্ত' অবস্থায় কার্য। কারণের কার্যে অভিব্যক্তিকেই আমরা বিবর্তন বলি। যাহা কিছু অভিব্যক্ত তাহা কারণে এক সময়ে বীজাকারে অথবা সুপ্তাকারে নিহিত ছিল। অভিব্যক্ত অবস্থা হইতে আবার কারণে পুনর্গুপ্তি (involution) ঘটিতে পারে। Evolution বা বিবর্তন থাকিলে involution বা ক্রমসঙ্কোচকেও থাকিতে হইবে, কারণ যাহা কিছু সৃষ্ট তাহার বিনাশ ঘটিবে। কিন্তু বিনাশ মানে নিশ্চিহ্নতা নয়—কারণে লয়। কার্য আবার গুটাইয়া কারণাকার গ্রহণ করে। অতএব, বিবর্তন ও পুনর্গুপ্তি—ইহাই সৃষ্টির মূলরহস্য। সৃষ্টির পর সৃষ্টি-ধারা চলিয়াছে, কিন্তু তাহা সরল-রেখায় নহে, তরঙ্গের ন্যায় ক্রম-প্রাপ্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের উন্নতানত রেখায়। এক একটি সৃষ্টির অবস্থিতি-কালকে এক একটি কল্প (cycle) বলা হয়। অসংখ্য কল্প পূর্বে হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বিবর্তনবাদ আবিষ্কৃত হইলে ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিল। এই তত্ত্বের আলোকে ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি পারম্পর্য, খণ্ড ও আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য দেখা গেল; ইতিহাস শুধু অর্থহীন ঘটনাপঞ্জী না হইয়া বিপুল অর্থপূর্ণ মনে হইতে লাগিল। সমাজবিজ্ঞানীরা চিরপরিবর্তনশীল সমাজের গতির রীতি ও প্রকৃতি খুঁজিয়া পাইলেন। প্রাচীন ভারতেও বিবর্তন-পুনর্গুপ্তি-তত্ত্ব তখনকার সমাজব্যাখ্যাতাগণকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। নানা গ্রন্থে তাঁহারা সমাজের পরিবর্তনের রীতি-প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগাবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ পরিবর্তিত হয়—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। আবার কলিযুগ হইতে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। এই তত্ত্বকে চক্রাকার-তত্ত্ব বা উত্থান পতনের তত্ত্ব (Theory of Cycle বা Theory of Rhythm) বলিতে পারা যায়। মনু-সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে (৮৯—৮৬ শ্লোক) প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য বাখ্যা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানুসারে সত্যযুগে সকল ধর্মই সম্পূর্ণ ছিল; অধর্ম, অসত্যাচারণ ছিল না, তপস্যাই ছিল

প্রধান ধর্ম। ত্রেতায় জ্ঞানই ধর্ম, দ্বাপরের ধর্ম হইতেছে যজ্ঞ, আর কলিতে দানই ধর্ম। ত্রেতায় অধর্ম দ্বারা ধন ও অর্থদ্বারা বিদ্যাদির আগম হইতে থাকায় ধর্ম মলিন হইল। অতএব ত্রেতায় ত্রিপাদ ধর্ম, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে একপাদ মাত্র ধর্ম রহিল। ইহার মধ্যে একটি ক্রমাবনতির ধারণা সুস্পষ্ট। কিন্তু কলিতেও একপাদ ধর্ম অবস্থান করিল ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাসের একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহা অনেকাংশে এই প্রাচীন তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বিবেকানন্দ সমাজ-বিবর্তনের ধারা নিম্নোক্তরূপ বলিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণ যুগ→ক্ষত্রিয় যুগ→বৈশ্য যুগ→শূদ্র যুগ→ব্রাহ্মণ যুগ→এইভাবে ক্রমাগত সমাজ পরিবর্তিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণযুগ অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের যুগ (ব্রাহ্মণ বলিতে বর্তমান কালের ব্রাহ্মণ জাতি বা Caste অর্থে ধরা হয় নাই)। ক্ষত্রিয়-যুগ অর্থে যে সময়ে সমাজে দেখা যায় বাহুবলের প্রাধান্য। বৈশ্যযুগে প্রাধান্য ঘটে অর্থবলের। তাহার পর শূদ্রযুগ অর্থাৎ সর্বসাধারণের অধিকারের যুগ।[১]

ইহা ছাড়া একটু ভিন্ন প্রকারে যুগাবর্তনের আর একটি ব্যাখ্যা স্বামিজী দিয়াছেন। তাহা জড়বাদের ও আধ্যাত্মিকতার ঢেউয়ের আকারে আগমন ও নিষ্ক্রমণ। ঢেউয়ের মাথা-তোলা—উন্নতি, গর্ত-সৃষ্টি—অবনতি; সমাজে আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাবে উন্নতি, উহার অবসানে অর্থাৎ জড়বাদের আবির্ভাবে অবনতি সূচিত হয়। "All progress is in successive rise and falls"[২] "Civilisation means manifestation of divinity in man"[৩] "Materialism and spirituality in turns prvail in society"[৪] অর্থাৎ, "সমস্ত উন্নতিই ঘটে ক্রমিক উত্থান-পতনের পদ্ধতিতে।"

"মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশের নামই সভ্যতা।"

১ বিবেকানন্দের নানা লেখায় এই মতের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার পত্রাবলী হইতে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হইল :—

"মানব-সমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার-রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ব্যতীত বিদ্যা শিখবার কারও অধিকার নেই, বিদ্যাদানেরও কারও অধিকার নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নন্। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়ত সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।"

(পত্রাবলী ২য় ভাগ, ৬৫ নং পত্র)

২ Jnana Yoga

৩ Conversations & Dialogues

৪ Paramakudi Lecture

"সমাজে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ একের পর এক আসে।"

বিবেকানন্দের মতে শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জড়বাদের প্রভাব ভারতবর্ষে বিশেষ প্রকট হইয়াছিল। তখন 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', চার্বাক দর্শনের এই ঘোষণা দেশে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া অধ্যাত্ম-বাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আবার প্রায় সহস্র বৎসর পরে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বেও এই দেহাত্মবাদের ভাব ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস করে; শঙ্করাচার্য উপনিষৎ-নির্দিষ্ট বেদান্তধর্মের বহুল প্রচার দ্বারা দেশকে সেই সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন।, অতএব Rhythm অথবা ঢেউয়ের আকারে উন্নতি-অবনতি বা অধ্যাত্মবাদ-জড়বাদ আসিতেছে। ইহা হইতে বিবেকানন্দ এই একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই প্রত্যেক জাতির প্রাণ-শক্তি, আধ্যাত্মিকতার মালিন্যে সমাজের পতন এবং তাহার বিকাশকেই সভ্যতা বলে। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের এক স্থানে তিনি বলিতেছেন:—

"প্রত্যেক সমাজেই এমন এক দল ব্যক্তি থাকেন যাঁহারা স্থূল বিষয়-ভোগে আনন্দ পান না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই তাঁহাদের প্রীতি। মাঝে মাঝে তাঁহারা জড় অপেক্ষা উচ্চতর এক সত্যের আভাস পান। ঐ সত্যের অনুভূতিলাভের জন্য তাঁহারা অবিরাম চেষ্টা করিয়া চলেন। আমরা যদি মানব জাতির ইতিহাস পাঠ করি তাহা হইলে দেখিব যে, এইরূপ মানুষের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইলে জাতির উন্নতি এবং যখনই তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায় তখনই তাহার অধঃপতন ঘটে।" 'জ্ঞানযোগ'-এর অন্যত্র আছে:—

"প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে।"

সমাজে ঢেউয়ের আকারে এই পরিবর্তনের ফলে যে কোনও প্রাচীন জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পদের বারবার উৎকর্ষ-সাধনের সুযোগ ঘটে। ফলে ক্রমশঃ একটি "pattern of life" বা "cultural pattern" অর্থাৎ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ গড়িয়া উঠে। ভারতের এই cultural pattern সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"ভালই হউক আর মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীপ্ত স্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি, ভারতাকাশ ধর্মতত্ত্বের সাধনায় পরিব্যাপ্ত; ভালই বলো আর মন্দই বলো, আমাদের জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্মাদর্শের সাধনক্ষেত্রে। ফলে ঐ সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত, শিরায় শিরায় উহা স্পন্দিত হইতেছে এবং আমাদের প্রকৃতির সহিত, জীবনীশক্তির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্মশক্তিকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ার কি গভীর শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ! সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে উহা না বুজাইয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা চলে কি? তোমরা কি বলিতে চাও, হিমতুষারালয়ে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্বার নূতন পথে প্রবাহিতা হইবে? তাহাও যদি বা সম্ভব হয়—তবুও জানিও, আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থসাধনরূপ বিশেষ জীবন-খাতটি পরিহার করা অসম্ভব, এবং রাজ-নৈতিক বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।"[৫]

৫ কুম্ভকোণমে প্রদত্ত বক্তৃতা

ধর্ম-অধর্মের ক্রমান্বয়ে প্রাদুর্ভাব—এই কল্পনা দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, সংস্কৃতি বা সমাজ স্থিতিশীল (static) নহে। পরিবর্তন, গতি ও অগ্রগতি, বিবর্তন ও পুনরুত্থিতির ধারণার মধ্যেই রহিয়াছে। গতির মধ্যেই যে প্রাণ ইহা বেদে নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের বিখ্যাত শ্লোক একটি: "চরন্ বৈ মধু বিন্দতি, চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রায়তে চরন্॥ চরৈবেতি চরৈবেতি॥" "যে চলিতেছে সেই মধুলাভ করিতেছে, অমৃতময় ফল প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ দেখ সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব, পথে চলিতে চলিতে সে কখনও তন্দ্রালু হয় না, অতএব হে মানব, পথে চল, পথে চল।" গতির মধ্যেই আছে শ্রেয়ের সন্ধান বা উন্নতি—এই বৈদিক ঘোষণার অনুবর্তন করিয়া সমাজ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"Progress is its watchward"। "অগ্রগতিই সমাজের মূল কথা।" কিন্তু অগ্রগতির একটি রূপ আছে। তাহা আধ্যাত্মিকতার পথে বারংবার অনুবর্তন। ভারত-সংস্কৃতির এই রূপ (cultural pattern) চিরন্তন বটে কিন্তু static অথবা স্থিতিশীল নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপে dynamic বা গতিময়। কারণ, অধ্যাত্ম-উপলব্ধি বা জড়বাদের প্রকাশ প্রতি অনুবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ঠিক পূর্বের যুগের অনুরূপ হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অধ্যাত্ম-যুগ মানেই ত 'পূর্ণতা'র বা 'আদর্শে'র ভিত্তিতে গঠিত সমাজ, অর্থাৎ সে সমাজে সবই ভাল, কিছুই মন্দ নাই। তাহা হইলে সেই আধ্যাত্মিকতা হইতে আবার বিচ্যুতি কি করিয়া ঘটে? পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটিলে তাহা হইতে বিচ্যুতি আসা ত উচিত নয়। কিন্তু, এখানে মনে রাখিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত সমাজের কল্পনা পূর্ণতার কল্পনা নহে। এ বিশ্ব-সংসার কখনও যথার্থ পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। এখানে ভালমন্দ, সু-কু চিরদিনই থাকিবে। বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"The sum-total of good and evil in one world remains ever the same. The yoke will be lifted from shoulder to shoulder by new systems, that is all".[৬] অর্থাৎ, "জগতে ভাল-মন্দের পরিমাণ চিরদিনই সমান থাকিবে; শুধু তাহা এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর স্কন্ধে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র।" অতএব সংসারে মানুষ চিরদিনই অপূর্ণ, মানুষের সমাজও অপূর্ণ। মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সংসারকে অতিক্রম করিতে হয়। "Perfection means infinity, and manifestation means limit and so it means that we shall become unlimited limits, which is self-contradictory".[৭] অর্থাৎ, "পূর্ণতার স্বরূপ অনন্ত কিন্তু বিকাশ মানেই সীমাবদ্ধতা, অতএব এই সংসারের মধ্যে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব বলা মানে যুগপৎ আমরা অসীম ও সসীম হইব। ইহা ত পরস্পর বিরোধী।" এই বাক্যের দ্বারা বিবেকানন্দের সহিত হেগেলের আদর্শবাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যাইতেছে। হেগেলের মতে মানব-সমাজ ও মানুষ এক দিন পূর্ণতা লাভ করিবে, বিবেকানন্দের মতে তাহা নহে। ভালমন্দ চিরদিন থাকিবে, শুধু তাহার রূপান্তর ঘটিবে,—কোনও অবস্থায় অনেক মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটিবে, কোনও অবস্থায় তাহা ঘটিবে না। পূর্বেরটির নামই অগ্রগতি। আদর্শ সমাজেও মন্দ কিছু

৬ Letters p. 320

৭ Jnana Yoga

থাকে বলিয়াই জড়বাদের পুনরাবর্তন ঘটে। না হইলে গতি বন্ধ হইয়া যাইত।

বর্তমান-যুগ-প্রকৃতির বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ বহুবার এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতে কিছুকাল জড়বাদ আধিপত্য করিয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীরাম-কৃষ্ণের আবির্ভাব তাহার অবসান সূচিত করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বর্তমান জড়বাদের প্রাদুর্ভাব এবং তাহার সংযোগে ভারতে আলোড়ন ও সংস্কৃতি-সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং এই সঙ্ঘর্ষের ফলেই ভারতে আবার অধ্যাত্ম-যুগ প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশকেও এবার এই অধ্যাত্মবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। "Europe is standing on the verge of a volcano."—"ইউরোপ আগ্নেয়গিরির মুখ-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছে।" যে কোনও দিনই ইহা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। "Materialism prevails in Europe to-day. The salvation of Europe depends on a rationalistic religion."[৮] অর্থাৎ, "বর্তমান ইউরোপে জড়বাদের আধিপত্য। যুক্তি-প্রতিষ্ঠ একটি ধর্মের উপরই ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।" মনু-সংহিতার ভাষায় বর্তমানকে 'যুগ-সন্ধ্যা' বা আধুনিক ঐতিহাসিকদের ভাষায় "an age of crisis" বলা চলে। ইউরোপের মুক্তি ভারতের বেদান্ত-ধর্ম গ্রহণে ঘটিবে। নূতন সভ্যতার উদয়ের ফলে ভারতবর্ষ এইবার জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"—বিবেকানন্দের বহু-উচ্চারিত বাণী।

এই আলোচনায় মোটামুটিভাবে আমরা বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের নিম্নলিখিত ধারা দেখিতে পাই :—

(১) জগতে আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে ঢেউয়ের আকারে আসে।

(২) সকল দেশেই ইহা ঘটে।

(৩) যে দেশে ইহা বারবার ঘটে তাহার পক্ষে একটি cultural pattern (সংস্কৃতির আকৃতি) গড়িয়া উঠে। প্রাচীন দেশে উহা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। ভারতে তাহাই হইয়াছে। এই 'প্যাটার্ণ' স্থিতি-শীল নহে; অর্থাৎ, প্রতি অধ্যাত্মযুগে আধ্যাত্মিক অনুভূতি নূতনভাবে হইবে।

(৪) আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাবই উন্নতি, জড়বাদের প্রাদুর্ভাব অবনতি।

(৫) অতএব, সভ্যতার নিহিতার্থ আধ্যাত্মিক-তার বিকাশ।

(৬) এক যুগ হইতে অন্য যুগ আবির্ভাবের সময় যুগ-সঙ্কটের সময়।

(৭) আগামী যুগে জনসাধারণের অধিকার লাভ ঘটিবে—অর্থাৎ শূদ্রযুগ আসিবে।

(৮) সংসারে কোন সমাজই পূর্ণ নয়, ভাল মন্দ সর্বত্র বিরাজ করিবে।

(৯) অগ্রগতিই সমাজের লক্ষ্য।

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের উপরোক্ত চিন্তাধারার অনুরূপ চিন্তাপ্রণালী অতি-আধুনিক কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে রুশ দার্শনিক পিটিরিম সোরোকিন (Pitirim Sorokin), জার্মান দার্শনিক অস্‌ওয়াল্ড স্পেংগ্লার (Oswald Spengler) (1880 1936), ইংরেজ দার্শনিক টয়েন্‌বী (Toyenbee, 1889—) মার্কিণ দার্শনিক ক্রোয়েবার (Kroeber, 1876—) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা পরে ইঁহাদের মত আলোচনা করিতেছি।

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপর একটি চিন্তাধারার গুরু কার্ল মার্ক্স।[৯]

৮ Jnana Yoga

৯ এই চিন্তাধারায় ভারতবর্ষে যাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সমাজ-বিবর্তন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে বর্তমানে আরও একটি মৌলিক চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ৺অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের। তাঁহার "Villages and Towns as Social Patterns," "Creative India," "Political Philosophies since 1905", "নয়া বাংলার গোড়াপত্তন" প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। তিনি মার্ক্সীয় ও অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উভয়কেই ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার Positivism বা বস্তুবাদ সেইজন্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাঁহার চিন্তাধারার উপরও কিছু কিছু গ্রন্থ এদেশে রচিত হইয়াছে—যথা, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল কৃত "Sarkarism," নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী রচিত "Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology," অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় কৃত "বিনয় সরকারের বৈঠকে।"

অতএব তিনটি চিন্তাধারা বা School of thought আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখিতেছি। যথা:—(১) অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদ—(এদেশে) গুরু বিবেকানন্দ, (২) মার্ক্সবাদ বা জড়বাদ—গুরু কার্ল মার্ক্স (৩) বস্তুবাদ—গুরু (এদেশে) বিনয় সরকার। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করিয়াছি। এখন মার্ক্স, তৎপরে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুরূপ কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও শেষে অধ্যাপক বিনয় সরকারের চিন্তাধারা আলোচনা করিব। পরিশেষে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

কার্লমার্ক্সএর সমাজতত্ত্বের ভিত্তি তাঁহার জড়বাদ (Materialism)। তাঁহার মতে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে সমাজ-পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এইজন্য এই মতকে 'Economic Determinism'ও বলে। আর্থিক জীবনে পরিবর্তন যন্ত্রাদির আবিষ্কার দ্বারা ঘটে—অর্থাৎ শিল্পবিজ্ঞান (technology) বা উৎপাদন প্রথার পরিবর্তনই সকল পরিবর্তনের মূল। এই পরিবর্তন ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিভাগেও পরিবর্তন আনে। মার্ক্স বলেন, সংস্কৃতির তিনটি অঙ্গ। প্রথম—বাস্তব উপকরণসমূহ (material means), দ্বিতীয়—সমাজযাত্রার ব্যবস্থা (social structure), শেষ—মানস-সম্পদ—শিল্পকলা সাহিত্য ইত্যাদি—সমাজ-সৌধের শিখর চূড়া (social super-structure)। প্রথম অঙ্গ—'বাস্তব উপকরণে'র পরিবর্তনে অপর দুটি অঙ্গের অর্থাৎ 'সমাজ-ব্যবস্থা' ও 'মানস-সম্পদে'র আমূল পরিবর্তন ঘটিবে। সমাজ-পরিবর্তনের পন্থা বা processকে তিনি দ্বন্দ্ববাদ বা ডায়েলেকটিকবাদ বলিয়াছেন। সমাজে দুই বিপরীত পরিস্থিতির (Thesis and Antithesis) সংঘাতে পরিবর্তন (Synthesis) সাধিত হয়। মার্ক্স এই সঙ্ঘাতকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিয়াছেন। সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন যুগও তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। যথা,— (১) আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ (২) দাস-প্রথার যুগ (৩) সামন্ত-তন্ত্রের যুগ (৪) পুঁজিতন্ত্রের (Capitalism) যুগ (৫) সমাজতন্ত্রের যুগ। তাঁহার মতে বর্তমান যুগ-প্রগতি আমাদিগকে এই শেষোক্ত বিবর্তনের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই আগামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হইবে ইহাতে শ্রেণী-বৈষম্য থাকিবে না,

সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'মানব সমাজ' (মূল হিন্দীতে), 'From Volga to Ganga'; গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর'; অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা' সরোজ আচার্যের 'মার্ক্সীয় দর্শন'; অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ' প্রভৃতি গ্রন্থে জগতের তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজের মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, ধর্ম থাকিবে না, রাষ্ট্র থাকিবে না। মার্ক্সের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্র অত্যাচারের যন্ত্রমাত্র। আদিম সাম্য-সমাজ বর্বর সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরবর্তী তিনটি যুগ ছিল শোষণ ও শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের যুগ।

মার্ক্সবাদের বহু সমালোচনা দেশে ও বিদেশে হইয়াছে। তাঁহার সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন-সম্বন্ধীয় মতের নিম্নলিখিতরূপ সমালোচনা আমরা এই সকল পাঠে পাই :—

(১) মার্ক্স ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, কি কারণে সাংস্কৃতিক জীবনের একদিক অর্থাৎ আর্থিক জীবনে পরিবর্তন আপনা হইতেই হয় অথচ অন্য দিকগুলি—ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির আপনা হইতেই হয় না। সেই হিসাবে পিরামিডের আকারে সংস্কৃতির কল্পনা মনগড়া :—যথা, ভিত্তি—বাস্তব উপকরণ, সৌধ—সমাজ ব্যবস্থা, সমাজ চূড়া—মানস-সম্পদ। সোরোকিন প্রভৃতি দার্শনিকেরা দেখাইয়াছেন, সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সের বিশ্লেষণানুযায়ী প্রতীয়মান যে সমাজ-সংস্কৃতির সৌধের ভিত্তি পরিবর্তিত হইলে সমগ্র সৌধটি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইবে। কিন্তু মার্ক্স-অনুবর্তী লেনিনের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একটি পরস্পর-বিরোধিতা (self-contradiction) এই মতের মধ্যে আছে। লেনিনের এর মত নিম্নোক্ত রূপ :—

"Soviet Culture, Lenin pointed out, is not an invention of experts, but a logical development of the cultural heritage which the proletariat received from preceding generations. ......Lenin relentlessly flayed the so-called Proletkutts who spurned the finest cultural creations of the past solely on the grounds that thay were produced in a slave-owning, landlord or bourgeois society. He called them utopians detatched from real life and said that their 'queer ideas' were capable of doing irreparable damage of the Soviet State and the people."[১০] অর্থাৎ, প্রাচীন সংস্কৃতির স্বাভাবিক পরিণতিই আধুনিক সোভিয়েট সংস্কৃতি, ইহা কোনও বিশেষজ্ঞের সৃষ্ট পদার্থ নহে। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃতিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দ্বারা প্রসূত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে লেনিন কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনা-বিলাসী বলিতেছেন, তাঁহার বিবেচনায় এই মত দ্বারা তাঁহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারেন।

(৩) মার্ক্সীয় মতবাদ সরলরেখায় উন্নতি (Linear Progress) পরিকল্পনা করিয়াছে। ইহা অবৈজ্ঞানিক। কারণ, উন্নতি থাকিলে অবনতি থাকিতেই হইবে, অনুবর্তন থাকিলে পুনর্গুপ্তি থাকিবে—সৃষ্টি থাকিলে বিনাশ থাকিবেই।

(৪) মার্ক্স সাম্যবাদী সমাজকে শ্রেণীহীন আদর্শ সমাজ বলিয়াছেন। সমাজ কখনও আদর্শ হইতে পারে না, তাহাতে ভাল মন্দ উভয়ই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পরবর্তী স্তর বা বিকাশ কিরূপ হইবে মার্ক্স তাহা বলেন নাই। অর্থাৎ, এইখানেই যেন সমাজ বিবর্তনের শেষ। কিন্তু সত্যই ত মার্ক্সের

১০ Soviet Literature No. I, 1951

কথাতেই সমাজ-বিবর্তন শেষ হইবে না। তাহার রূপ কি হইবে ইহা আলোচনা না করিয়া সমাজ পরিবর্তনের রীতি প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে না।

মার্ক্স তাঁহার অমর গ্রন্থ 'Das Capital' রচনা করেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাহার প্রায় এক শত বৎসর পরে পিটিরিম্ সোরোকিন 'Social & Cultural Dynamics' (1937) লেখেন, অসওয়াল্ড স্পেংগ্লার 'Decline of the West' (1918) লেখেন, টয়েনবী লেখেন 'A study of History' (six volumes—1934-1939), ক্রোবেবার লেখেন, 'Configuration of Cultural Growth' (1944)। ইহা ছাড়া আমরা নরথ্রপ (Northrop), শুবার্ট (Schubert), স্থইট্জার (Schweitzer) প্রভৃতি দার্শনিকদেরও নাম করিতে পারি। ইঁহারা সকলেই এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইতিহাস আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সোরোকিন তাঁহার ১৯৫১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে 'Social Philosophies of an age of crisis'এ ইঁহাদের মতামত আলোচনা করিয়াছেন। তারিখের দিকে দেখিলে বোঝা যায় এই মত সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় ইঁহাদের মতের সহিত পূর্বোক্ত বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রচুর মিল আছে। দুইটি চিন্তাধারা একেবারে এক নহে, কিন্তু একেবারে সমান্তরাল বলা চলে এবং উহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সুগভীর ঐক্য আমাদিগকে বিস্মিত করে। বিবেকানন্দ তাঁহার চিন্তাধারা ১৯০২ সালের মধ্যে দিয়া যান। অবশ্য ভারতবর্ষে এই চিন্তাধারা বহু পুরাতন, বিবেকানন্দ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সোরোকিন তাঁহার গ্রন্থাদিতে হেগেল ও ফিক্টে (Fichte)-র নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, যদিও সোরোকিনের পরিবেশিত তত্ত্বে ও হেগেলের আদর্শবাদে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। এই কারণে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহিত এই সাদৃশ্য খুবই আশ্চর্য। বিবেকানন্দ হেগেলের আদর্শবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, গ্রহণ করেন নাই। সোরোকিন প্রভৃতির চিন্তাধারার সূত্র যাহাই হউক, তাঁহাদের পরিবেশিত তত্ত্বকে বলিতে হয় more Vivekanandian than Hegelian (বিবেকানন্দেরই বেশী অনুসরণ করিয়াছে হেগেলের অপেক্ষা)। সোরোকিন ২৮০০ পাতার গ্রন্থ "Social and Cultural Dynamics"এ বিপুল পরিশ্রমসহকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আদিকাল হইতে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য হইতে রচনা, শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্র প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের (Statistics) সহায়তায় তাঁহার সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন। আর তাঁহার এই তথ্য-সংগ্রহে বিবেকানন্দ-বর্ণিত তত্ত্ব সমর্থিত হইতেছে। এই জন্য এই চিন্তাধারার আলোচনার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে। টয়েনবীও তাঁহার ছয় খণ্ডে বিভক্ত সুবিশাল গ্রন্থে বহু তথ্য-প্রমাণাদি আমদানি করিয়াছেন।

ইঁহাদের মতে[১১] সমাজ-সংস্কৃতির গতি উত্থান-পতনের নিয়মে প্রবাহিত। সোরোকিন ইহাকে Theory of Rhythm বলিয়াছেন। স্পেংগ্লার ও টয়েনবী-র মতে সমাজ একটি প্রাণিদেহের মতো। একটি প্রাণিদেহের যেরূপ জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে সমাজেরও সেইরূপ জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। সোরোকিন অবশ্য সমাজকে প্রাণিদেহের অনুরূপ মনে করেন না। তাঁহার মতে সংস্কৃতি মানে যে কোনও বস্তু যাহা মানুষ মূল্যবান বা সুন্দর বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে; অর্থাৎ যাহা "সত্য, শিব ও

১১ এই চিন্তাধারা বর্ণনায় Cowell-প্রণীত History, Civilisation and Culture এবং Sorokin-প্রণীত Social Philosophies of an age of crisis এর সাহায্য লইয়াছি।—লেখিকা।

সুন্দর*; যাহা কল্যাণকর তাহাই সংস্কৃতি। এই সকল মূল্য (values) মানুষের সমাজ-জীবনে লভ্য। সেইজন্য তিনি "সমাজ সংস্কৃতি" (Socio-cultural) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বদা সংযুক্ত। বিভিন্ন দিকে এই সকল মূল্যের অভিব্যক্তিকে তিনি Cultural Systems (সংস্কৃতির শাখা) বলিয়াছেন। পাঁচটি এইরূপ শাখা আছে (১) ভাষা (২) বিজ্ঞান (৩) ধর্ম (৪) শিল্পকলা (৫) নীতি। এক 'ভাষা' ব্যতীত অপর প্রত্যেকটি শাখার নিম্নোক্ত প্রশাখা (sub-system) আছে—(১) সাহিত্য (২) সঙ্গীত (৩) স্থাপত্য (৪) ভাস্কর্য (৫) চিত্রকলা (৬) চারুশিল্প (৭) আইন (৮) নীতিশাস্ত্র। সংস্কৃতির এই বিভিন্ন দিকে বিকাশের মধ্যে একটি ঐক্য থাকিবে, সমগ্র একটি রূপ থাকিবে। এই সমগ্র একটি রূপসমন্বিত যে সংস্কৃতি তাহাই স্থায়িত্বলাভ করে বা পূর্ণবিকশিত হয়। ক্রোয়েবার ইহাকে "High-value Cultural pattern" (উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি) নাম দিয়াছেন। কিন্তু, সর্বকালে একই দেশে একই ধারা বজায় থাকিবে ইহা সোরোকিন মানেন না। টয়েন্‌বীর মতে দেশভেদে আমরা এই সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাই যথা, ভারতীয়, চীনা, মিশরীয়, গ্রীসীয়, রোমক ইত্যাদি। সোরোকিন কালভেদে সংস্কৃতির রূপ বিভাগ করিয়াছেন; কিন্তু তিনি সকল দেশে একই কালে একই সংস্কৃতির রূপের অনুবর্তন ঘটিবে তাহা মনে করেন না। তাঁহাদের মতে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রভাব বিস্তার করে। টয়েন্‌বী বলেন এইরূপে প্রাচীন এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার জন্মদান করে। এই সামগ্রিক সংস্কৃতির রূপকে সোরোকিন Cultural Super-system নাম দিয়াছেন। এই 'সুপার-সিষ্টেম্' তিনটি: (১) Ideational (অধ্যাত্ম-যুগ) (২) Idealistic (অধ্যাত্ম-বস্তুবাদী যুগ) ও (৩) Sensate (বস্তুবাদী বা জড়বাদী যুগ)। এই তিনটি অবস্থার সহিত স্পেংগ্লার ও টয়েন্‌বীর সমাজ-সংস্কৃতির শৈশব যৌবন বার্ধক্যকালের তুলনা করা চলে। শেষ অবস্থার নাম স্পেংগ্লার দিয়াছেন Civilisation (সভ্যতা)। Ideational যুগের বৈশিষ্ট্য-চিত্রনে সোরোকিন বলেন ইহা ধর্ম-বিশ্বাসের যুগ। অন্যেরাও ঐরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এই যুগে মানুষ আধ্যাত্মিক-সত্যে বিশ্বাস করে, ঐহিক সুখ-ভোগকে বড় মনে করে না এবং তপস্যাদি ধর্মাচরণকে খুব বড় স্থান দেয়। 'Sensate' culture এর যুগ ঠিক বিপরীত। এই যুগে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যকেই একমাত্র সত্য মনে করে, অতীন্দ্রিয় বা অতিমানস অনুভূতিতে বিশ্বাস করে না, ঐহিক সুখভোগকে জীবনের লক্ষ্য মনে করে, এবং মানুষের পরিবর্তনে বিশ্বাস করে না। 'Idealist' যুগে এই দুইয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এ যুগে ত্যাগ-ভোগ, যুক্তি-বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়াতীত সত্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ উভয়েই লোকে মানে। ক্রোয়েবারের মতে প্রথম যুগে ধর্মের খুবই প্রাধান্য থাকে। টয়েন্‌বীর মতে 'সভ্যতা'র শেষ সময়ে ধর্মের প্রবল আন্দোলন দেখা দেয় এবং তাহার পরই তাহা নিশ্চিহ্নতা প্রাপ্ত হয়। ক্রোয়েবারের মতে ধর্মই প্রধান শক্তি হিসাবে এক যুগ হইতে অন্য যুগ-প্রবর্তন-কার্য সাধন করে। সোরোকিন দেখাইয়াছেন যে, এক যুগ হইতে অন্য যুগ বিক্ষিপ্ত হয় এবং এই পরিবর্তন সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার একত্বে একই গতিতে সাধিত হয়। টয়েন্‌বী ও স্পেংগ্লারের মতে প্রাণি-দেহের স্বাভাবিক নিয়মে একের পর এক অবস্থা আসে। যাহাই হউক, মোটের পর ইঁহাদের মতে পরিবর্তনের বীজ সে যুগের মধ্যেই নিহিত থাকে

ইহাকে ইঁহারা "Theory of Immanent Change" (আভ্যন্তরীণ শক্তিবলে পরিবর্তন) বলিয়াছেন। পরিবর্তনের বীজ সে যুগেই নিহিত থাকার কারণ—সোরোকিনের মতে, কখনও কোনও পরিবর্তন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না। পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না বলিয়া সত্যের পাশে অসত্য বাস করে। সেইজন্য কিছুকাল পরে অবনতি সুরু হয়। এখানে সোরোকিন কিছু অস্পষ্ট। সোরোকিনের মতে বিবর্তনের পথে অনন্ত সম্ভাবনা নাই, কাজেই Sensate যুগের পর আবার Ideational যুগ ফিরিয়া আসে। টয়েন্‌বী পরবর্তী যুগের রূপ সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ নন। স্পেংগ্লারের মতে আবার নূতন এক সমাজ-সংস্কৃতি জন্মলাভ করিবে এবং তাহাতে সমাজ-সংস্কৃতির শৈশবের সকল গুণ থাকিবে। টয়েন্‌বী দেখাইয়াছেন যে, এইরূপে বহু সভ্যতা মৃত অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। এইরূপ আবর্তন ইউরোপীয় সভ্যতায় দুইবার ঘটিয়াছে সোরোকিন ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। Sensate যুগের শেষ অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বিবর্তন (minor change) হইতেছে কম্যুনিজ্‌ম্ বা জড়বাদী সাম্যবাদের বিস্তার, ইহাও সোরোকিনের অভিমত।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে অবসান-প্রায় ইহা উঁহারা একসঙ্গে দেখাইয়াছেন। সোরোকিনের মতে বর্তমানে তিনি Ideational যুগের সূচনা দেখিতে পাইতেছেন। দুই যুগের মিলন-সন্ধিক্ষণ এই বর্তমান কালকে তিনি যুগ-সঙ্কট (age of crisis) আখ্যা দিয়াছেন। টয়েন্‌বী ধর্মগুণ-সম্ভূত নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় সম্বন্ধে অত সুস্পষ্ট কথা বলেন নাই। তাঁহার মত—"We can only say that something which has actually happened once, in another episode of history, must at least be one of the possibilities that lie ahead of us".[১২] অর্থাৎ, যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা ঘটিবার পুনর্বার সম্ভাবনা আছে। ইঁহারা একমত যে, যে ভূমিতে সমাজ-সংস্কৃতির এক রূপের অবসান ঘটে, অপর রূপের আবির্ভাব সেখানেই হয় না। অর্থাৎ, আগামী নূতন সভ্যতার বিকাশ পশ্চিম-ইয়োরোপে ঘটিবে না, ঘটিবে অন্যত্র। নানা জনে নানা দেশের নাম করিয়াছেন,—যথা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ও জাপান।

৮অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "Villages and Towns as Social Patterns" এ সোরোকিন ও স্পেংগ্লারের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে মার্ক্স, কোঁতে (Comte) ও গীতা-উপনিষদের মত ইঁহারাও পূর্ণতাবাদী (finalist)। অর্থাৎ, মানব সমাজ Ideational বা পূর্ণতার যুগে পৌঁছিবে ইঁহারা তাহাই মানেন। অতএব ইঁহারা কল্পনাবিলাসী। বিনয় সরকারের মতে কোনও সমাজ-সংস্কৃতি কখনও পূর্ণ বা দোষবিহীন হইতে পারে না; তাহার কারণ, সব সমাজেই শিব-অশিব, ভাল-মন্দ সমভাবে বিরাজমান এবং সব মানুষই পশু ও দেবতার সমন্বয়। তাঁহার বিশ্লেষণে তিনি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যই অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সত্যতায় তিনি বিশ্বাসী নহেন, সোরোকিন বিশ্বাসী। যাহাই হউক আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সোরোকিন বলেন নাই যে 'Ideational' সমাজ একেবারে পূর্ণতার আদর্শ, সেখানেও সত্য ও অসত্য পাশাপাশিই থাকিবে। স্পেংগ্লারের প্রাণিদেহবাদ অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু, অধ্যাপক

১২ B. B. C. Reith Lectures—Toyenbee —quoted in the Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, May, 1953.

সরকার মার্ক্স-এর সমালোচনা ঠিকই করিয়াছেন যে, মার্ক্স পূর্ণতাবাদী, তাঁহার সমাজতান্ত্রিক সমাজে অভাব থাকিবে না, মানুষ লোভ করিবে না, মানুষ হইবে আদর্শ মানুষ—এ যুক্তি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

অধ্যাপক সরকার নিজস্ব একটি পরিবর্তন-তত্ত্ব (Theory of Change) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন "Theory of Creative Dis-equlibrium";[১৩] ইহার মূলকথা সব সমাজেই ভালমন্দ সমান থাকিবে। ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বে নূতন সমাজ সৃষ্টি হইবে এবং এই নূতন অবস্থায়ও সমান ভালমন্দ থাকিবে। শুধু তাহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভালমন্দ হইতে ভিন্নরূপ। ভালমন্দের এই রূপান্তরই উন্নতি। এই দ্বন্দ্বই সৃষ্টির কারণ। নব নব সৃষ্টি ছাড়া অগ্রগতির কোনও অর্থ নাই। অধ্যাপক সরকারের এই মতের উপর বিবেকানন্দের বেদান্ত-বাদ ও আমেরিকার Pragmatism (মূল্যবাদ)এর ছায়াপাত সুস্পষ্ট। অধ্যাপক বিনয় সরকার অনেক খানিই বেদান্তবাদী। তাঁহার বস্তুবাদ ও অধ্যাত্ম-সত্যকে বাচনিক অস্বীকার সত্ত্বেও ইহাকে জড়বাদ বলা চলে না। বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকারের অভিমত এই যে, ১৯০৫ সাল হইতে নূতন উন্নতি জগতে সূচিত হইয়াছে, এবং এই উন্নতিতে এশিয়া তথা ভারতবর্ষ অগ্রণী। ইহা তাহাদের জয়যাত্রার যুগ। এই যুগের তিনি নাম দিয়াছেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ'। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সহিত হিন্দুভারতের চিরন্তন "চরৈবেতি" বাণীরূপ শক্তি পুনর্বার ক্রিয়াশীল হইয়াছে এবং দেশে দেশে তাহার জয়পতাকা এইবার উড়িবে।[১৪]

এই সমস্ত আলোচনার শেষে আমরা বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহিত উপরোক্ত বিভিন্ন চিন্তাধারার সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার গুরুত্ব দেখিতে পাইব।

(ক) সোরোকিন প্রভৃতির চিন্তাধারা ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সাদৃশ্য :—

(১) সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন উত্থান-পতনের ধারায় সংঘটিত হয়।

(২) উত্থান-পতন অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের প্রাধান্য যথাক্রমে প্রকট করে।

(৩) আধ্যাত্মিকতা-প্রাধান্যের যুগই মানুষ কামনা করে।

(৪) উচ্চাঙ্গ-সংস্কৃতির মূলগত একটি ঐক্য বা প্রাণ থাকে।

(৫) কোনও পরিবর্তনই সম্পূর্ণ নয়। ভাল-মন্দ সব অবস্থাতেই বর্তমান।

(৬) পরিবর্তনের কারণ সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত।

(৭) ইউরোপে এখন জড়বাদী সভ্যতা অবসান-প্রায়।

(৮) অধ্যাত্ম-সম্পদময় সংস্কৃতির আগমন আসন্ন বা সুরু হইয়াছে।

(৯) জড়বাদী সভ্যতার শেষকালে সর্ব-সাধারণের অধিকার-লাভ ঘটিবে।

(১০) এই নূতন অধ্যাত্ম-সভ্যতার আগমন সম্ভবতঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘটিবে।

বৈলক্ষণ্য :—

(১) সোরোকিন প্রভৃতি Involution বা পুনর্গুপ্তিবাদের কথা বলেন নাই। সেইজন্য ইঁহাদের Theory of Immanent Change (অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা পরিবর্তনবাদ) অনেকটা অস্পষ্ট। কিন্তু বিবেকানন্দের মতবাদে ইহার ছায়াপাত হওয়ায় আধ্যাত্মিকতার বারম্বার আবির্ভাবের সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

১৩ Benoy Sarkar—Villages & Towns as Social Patterns Part V.

১৪ Benoy Sarkar—Creative India.

যাহা স্পষ্ট তাহা কারণ অবস্থায় বা বীজাকারে গুটাইয়া থাকে, একেবারে বিনষ্ট হয় না। সমাজদেহে জড়বাদের প্রসারকালেও আধ্যাত্মিকতা অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত প্রবাহিত হয়, আঘাতে সঙ্ঘাতে আবার পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সোরোকিন বলিয়াছেন যে অনুবর্তনের অনন্ত সম্ভাবনা নাই, কয়েকটি 'টাইপ' বারম্বার ফিরিয়া আসে। ইহার কারণ Involution-বাদ ব্যতীত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চলে না। কার্য ও কারণ একই পদার্থ; কার্য কারণে গুটাইয়া যায়, আবার প্রকাশিত হইলে উহার রূপান্তর ঘটিলেও প্রকারান্তর ঘটিতে পারে না। কারণ, একই গুণান্বিত কারণ বারম্বার আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

(২) ইঁহারা সংস্কৃতির সঙ্কটকালে প্রবল ধর্ম-আন্দোলনের কারণ যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ ইহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(খ) মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সহিত বিবেকানন্দের মতের সাদৃশ্য :—

(১) বর্তমান যুগে সর্বসাধারণ অধিকার লাভ করিবে এবং শ্রমিক শ্রেণী আধিপত্য করিবে। ইহা সমাজধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিবেই।

(২) শ্রমিক যুগের পূর্ববর্তী যুগ বৈশ্য যুগ (Capitalist age)।

(৩) (তথাকথিত) ধর্ম পুরোহিত তন্ত্রের কালে অত্যাচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

বৈলক্ষণ্য :—

(১) মার্ক্স ধর্মকে অপরিণত মানব-মনের কু-সংস্কার ও অত্যাচারের যন্ত্রমাত্র বলিয়াছেন। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের মাধ্যম।

(২) সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনে বিবেকানন্দ ধর্মের শক্তি প্রধান বলিয়াছেন, মার্ক্স তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার কারণ মার্ক্স Sensate যুগের পরিবর্তন লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

(৩) মার্ক্স সরলরেখায় উন্নতির (linear progress) কথা বলেন, বিবেকানন্দ উত্থান-পতনের ধারার কথা বলেন। সরলরেখায় উন্নতির কল্পনা অবৈজ্ঞানিক ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

(৪) মার্ক্সের মতে বিবর্তনের শেষ শ্রেণী-বৈষম্যহীন সমাজ, বিবেকানন্দের মতে বিবর্তনের শেষ নাই, শূদ্র যুগের অবসানে আবার ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রাধান্য ঘটিবে।

(৫) মার্ক্স শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজের কথা বলিয়াছেন। বিবেকানন্দের মতে শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজের ধারণা কল্পনা-বিলাস-প্রসূত। সমাজের শ্রেণীবিভাগ চিরকাল থাকিবে। সাম্যতন্ত্রে বিশেষ সুবিধার (privileges) অবসান ঘটে কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্য লোপ পায় না।

(৬) মার্ক্সের মতে আর্থিক উন্নতিতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা, বিবেকানন্দের মতে আধ্যাত্মি-কতার বিকাশেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

(গ) বিনয় সরকার ও বিবেকানন্দের চিন্তা-ধারার সাদৃশ্য :—

(১) সংসারের প্রকৃতি-নির্ণয়ে বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন বিনয় সরকার তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র।

(২) উন্নতি মানে 'ভাল মন্দের রূপান্তর'। ইহাও বেদান্তের positivism (যাহা বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন) ছাড়া কিছুই নহে।

(৩) আগামী সমাজে এশিয়া তথা ভারতের প্রাধান্য সম্পর্কেও বিনয় সরকার বিবেকানন্দেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

(৪) ইতিহাসে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের গুরুত্ব সম্বন্ধেও ঐরূপ।

বৈলক্ষণ্য :—

(১) বিনয় সরকার অধ্যাত্মবাদ অস্বীকার

করিয়াছেন, যদিও তাহার নিগলিতার্থ বা positivism (বাস্তব অর্থ) টুকুই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তত্ত্বটুকু বাদ দিয়া। বিবেকানন্দ পুরাপুরি অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী।

(২) বিনয় সরকার বিভিন্ন সমাজের স্তর-ভেদ করেন নাই,—অতএব তাঁহার ভালমন্দের রূপান্তর কি তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

(৩) অধ্যাপক সরকার "Linear Progress" বা সরলরেখায় উন্নতির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই মত ভ্রান্ত ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

এই সকল আলোচনার শেষে আমরা কি এই সিদ্ধান্তেই পৌছাই না যে, উত্থান-পতনের তত্ত্ব এবং অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের আবর্তন-তত্ত্ব অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক? অতি-আধুনিক বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা সহকারে ইহা প্রমাণ-সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই মতের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের দেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানীরা বিশেষ কেহ গবেষণায় অগ্রসর হন নাই, যদিও মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইতিহাসের রচনাই নূতন, তাহার ব্যাখ্যা আরও নূতন। আশা করা যায় যে, বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যাহা বৈজ্ঞানিকত্বে সোরোকিন প্রভৃতির মত হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ—ভারতের সমাজ-বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করিবে।

তুমি

শ্রীমনকুমার সেন

(১)

প্রভাত-শিশির আর স্নিগ্ধ সমীরণ,
ধরণীর কোলে কে বা করে বরিষণ?
শিউলি, গোলাপ, বেল, বকুলেতে আর,
রূপ ও সৌরভ দেন কোন্ রূপকার?
রাতের বাঁধন কাটি আশায় উছল
করিছে জীবের প্রাণ, কে সে নিরমল?
দুপুরের খর তাপে প্রসন্ন প্রভাত
লুপ্ত করি দেয় কার অলক্ষিত হাত?
'জীবনে জিনিয়া লহ হয়ে দণ্ডপাণি',—
ক্ষমাহীন রুদ্ররূপে কাহার এ বাণী?
কালো আবরণে ঢাকি আভরণ কার
জাগাইছে পৃথ্বী ভরি ভাবনা উদার?
আকাশের চাঁদ আর অগণিত তারা,
কোন্ সত্য ধ্যানে নিশি যাপে তন্দ্রাহারা?

(২)

(যবে) ব্যথা আর হতাশায় ব্যর্থ হয়ে চলে
জীবনের উচ্ছধারা ভাঙে পলে পলে;
দিগন্ত-বিস্তৃত মেঘে বিদ্যুৎ চমকে
পথ খুঁজে নাহি পায় পথিক সমুখে;
ঝড়ের গর্জন-মাঝে জাগে হাহাকার,
আঘাতে আঘাতে যেন টুটিছে সংসার;
স্তব্ধ হয়ে যায় দাঁড়ী, ছিঁড়ে তার পাল,
নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে ভেঙে পড়ে হাল—
অকস্মাৎ কোথা হতে কাহার এ বাণী
মূকেরে মুখর করে, ভাসায় তরণী?
কল্যাণ-বিধৃত বিশ্বে তুমি লীলাময়,
এক হাতে কর সৃষ্টি, আর হাতে লয়।
সভ্যতার অভিমান নিজ অহংকারে
বৃথাই খুঁজিছে তোমা পুঁথির আগারে।

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে

শ্রীগগনবিহারী লাল মেহতা

[গত ১৬ই মে, (১৯৫৩) নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের বিংশবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারী লাল মেহ্‌তা কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারসংকলন। অনুবাদক : শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের মহান ঋষি- ও মরমি-গণের (mystics) অন্যতম। যে ভারত চৈতন্যশক্তির যথার্থ মূল্য দিয়া থাকে, যে ভারতের পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও যমুনায় প্রচণ্ড শীতের প্রত্যুষে অগণিত নরনারীকে স্নান ও পূজা করিতে দেখি, যে ভারত, তাহার শ্রেষ্ঠ নরনারীগণের জাগতিক সর্ববস্তুতে নশ্বরত্ব উপলব্ধির জন্যই, যুগযুগান্তর ধরিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে—সেই ভারতের প্রতীক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

একটি প্রাচীন সংস্কৃত প্রবচনের মর্মার্থ এই : 'সর্বতঃ জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।' অর্থাৎ, সকলের নিকট জয় ইচ্ছা করিবে কিন্তু নিজের পুত্রের নিকট চাহিবে পরাজয়—তোমার উত্তরাধিকারী তোমা অপেক্ষা মহত্তর হউক। তেমনি, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুবর্তী ছিলেন ভারতের নব জাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি অনুষ্ঠানবহুল ধর্মাপেক্ষা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আত্মোৎসর্গ-পূত সেবার ধর্মে অধিকতর বিশ্বাস করিতেন। বিবেকানন্দকে আমরা বলিতে পারি মার্কিনদেশে ভারতের প্রথম সংস্কৃতি-দূত। মহান বৌদ্ধ শ্রমণগণ যেরূপ শুভেচ্ছা, প্রেম ও সৌভ্রাত্রের বাণী বহন করিয়া এক দিন সুদূর বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দও সেইরূপ প্রতীচ্যদেশগুলিতে ভারতের আধ্যাত্মিক বার্তা লইয়া গিয়াছিলেন।

* * * কিন্তু ধর্মেরও বিভিন্ন রূপ, প্রকাশ ও দিক আছে। বিবেকানন্দের নিকট ধর্ম ছিল আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ও সমাজের কল্যাণসাধন। হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধে প্রায়শঃ এই অভিযোগ আনীত হয় যে, ইহা অত্যধিক নির্বস্তুক-তত্ত্ববহুল, রহস্যাবৃত, অতি সূক্ষ্ম, অনুন্নত ও পরলোক-সর্বস্ব। কোন কোন সমালোচকের মতে হিন্দু-ধর্ম নির্বাণ বা পরলোকের অনুসন্ধান করিতে গিয়া জাগতিক অভ্যুদয় ও পার্থিব কর্তব্য-পালনের প্রতি জোর দেয় না। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতে আমি সমর্থ হইলেও বর্তমান উপলক্ষ তদুপযোগী নহে। তথাপি অনধিকারী হইলেও আমি বলিতে পারি, বেদান্তের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত—ইহা 'নেতি'-মূলক ও নিষ্ক্রিয় নহে; ইহা শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র প্রতি কার্যেরই নহে, পরন্তু প্রতি বাক্যের, এমন কি, প্রতি চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল আছে এবং ইহলোকে বা পরলোকে মানুষ ইহার ফলভোগ করে। বুদ্ধ স্বর্গে শাশ্বত ধামের সন্ধান ও প্রচার করেন নাই—তিনি প্রচার করিয়াছিলেন ইহজন্মে ও বর্তমানেই দুঃখনাশের বাণী। বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, ধর্মকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও আচরণে রূপায়িত করিতে হইবে, ধর্ম পৃথিবী হইতে অত্যাচার-নিপীড়ন, ভোগাধিকার ও বিরোধ-ব্যবধান দূর করিয়া দিবে। তিনি মনীষী বার্ণার্ড শ'র ভাষায় বলিতে পারিতেন : যে মানুষের ঈশ্বর শুধু আকাশে থাকেন তাহার সম্বন্ধে সাবধান (Beware of the man whose God is in the skies!)! বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'জীবসেবা'র মাধ্যমেই প্রকৃষ্টতম ভগবদুপাসনা হয়; মন্দির হস্তিদন্তনির্মিত হর্ম্য হওয়া উচিত নয়।

যে 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি গান্ধীজী জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহা মূলতঃ তাঁহার পূর্বগ স্বামী বিবেকানন্দেরই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটিতে আর্ত-দুর্বল-দীন-হীনদের প্রতি বিবেকানন্দের গভীর প্রেম ও করুণা নিহিত আছে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জনসাধারণের উন্নতি-সাধনই বেদান্তের সর্বাপেক্ষা কার্যকর রূপায়ণ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ ছিলেন গান্ধীজীর যথার্থ পূর্বগামী। * * *

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সমন্বয়, পরমত-সহিষ্ণুতা, যুক্তিবাদ ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর জোর দিতেন। ভারতীয়গণের দৃষ্টিতে ধর্ম কোন অতি-প্রাকৃত বিশ্বাসবলে লব্ধ অনুপ্রাণনা নহে; পরন্তু ইহা গভীর অপরোক্ষানুভূতি ও সৎকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার। এজন্যই হিন্দুধর্ম কাহাকেও নিজ বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম অনুসরণ করিতে বাধা দেয় না এবং দলবৃদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগেও বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষের ঈশ্বরলাভের স্বকীয় পদ্ধতি আছে—'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। কবি রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'পথ বিভিন্ন কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ এক ও অদ্বিতীয়'। ধর্ম আমাদিগকে বিনয় ও পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ভগবান সকলের মধ্যে বাস করেন, সেজন্যই মানুষ তাঁহাকে জানিবার জন্য নিজের সংস্কার ও রুচি-সম্মত পথ অনুসরণ করিতে পারে। ইহাতে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীরতর আত্মবিশ্বাস লাভ হয়।

এরূপ 'ইতি'-মূলক ধর্ম ও সমাজ-হিতকরী বাণী প্রচার ও কার্যে রূপদান করিবার জন্যই ১৮৯৭ খৃঃ কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইয়াছে। মিশনের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সমাজ-হিতকর কর্মপ্রচেষ্টা আছে—নানাদিকে ইহার কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে। হাসপাতাল, ডিস্পেন্সারী, শিল্প ও কৃষি-বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, পুস্তক-প্রকাশন প্রভৃতি মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, আধি-ব্যাধি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মিশনের কর্মিগণ আর্তসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। মিশন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবাকার্য করেন—ইহা আমি ১৯৪৩ সনের বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-পরিভ্রমণের অনতিকাল পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম বেদান্তকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্তমানে মার্কিনদেশে একাদশটি কেন্দ্রে বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। কতকগুলি দুরূহ কঠোর তত্ত্বপ্রচারের অথবা ধর্মান্তরিতকরণের কোন চেষ্টা করা হয় না। এই বেদান্তকেন্দ্রগুলি জ্ঞান, সংস্কৃতি ও শান্তির মহাপীঠস্থান—ইহারা মার্কিনজাতি ও ভারতীয়গণের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে সচেষ্ট।

সমালোচনা

নিগম-প্রসাদ—স্বামী সিদ্ধানন্দ-সম্পাদিত। প্রকাশক: সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ, (যোরহাট) আসাম। পৃষ্ঠা—১১৪; মূল্য ১৷০ আনা।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-সংকলন। আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে এই স্বচ্ছ, সহজ ও সতেজ উক্তিগুলি আমাদিগকে বিশেষ তৃপ্তিদান করিয়াছে। যাঁহারা সক্রিয়ভাবে ধর্মজীবন যাপন করিতেছেন তাঁহারা বইটি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর—দক্ষিণ-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণা) হইতে স্বামী সত্যানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৬; মূল্য—দশ আনা।

মৃত্যু মানুষের নিকট তাহার জীবনের অপেক্ষা জটিলতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান সহজ নয় বলিয়াই মানুষ সাধারণতঃ উহা তাহার মনে উঠিতে দেয় না। ইহা মানুষের জীবনের এক মর্মান্তিক

প্রহসন। মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার ভাবা উচিত, উহার জন্য জ্ঞানপূর্বক প্রস্তুত হওয়া উচিত। শ্রীমৎ নিগমানন্দ পরমহংসদেবের কথিত এবং লিখিত এই উপদেশ-সংকলনে উক্ত বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণ প্রচুর আলোক পাইবেন।

মিলন-বাণী (দ্বিতীয় খণ্ড)—স্বামী সিদ্ধানন্দ-প্রণীত। প্রকাশক : কলিকাতা সারস্বত সঙ্ঘ, ৯৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা—৯৬; মূল্য—১৲ টাকা।

স্বরচিত কবিতা-গুচ্ছে লেখক স্বীয় গুরু শ্রীমৎ নিগমানন্দ পরমহংসদেবের কতকগুলি সুনির্বাচিত উপদেশ এই বইটিতে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের 'পরিচয়ে' লেখক বলিতেছেন :—

ভোজনের সাথে ভজনের তরে, প্রধানতঃ এই
ভাবরাশি ঝরে
সম্মিলনীর মিলনানন্দ মধুর করিতে চায়।
দিকে দিকে দিকে এই ভাবরাশি, মিলনের পথ
দিবে গো প্রকাশি
এই ভাবে যেন বিশ্বসেবায় জীবন বহিয়া যায়॥

ছন্দোবদ্ধ এই সুপাঠ্য মূল্যবান উপদেশ-গ্রন্থের মাধ্যমে রচয়িতার উক্ত শুভেচ্ছা ফলবতী হউক ইহাই প্রার্থনা।

(১) সাধু-প্রসঙ্গ (২) আধুনিক ভক্ত-মাল (৩) ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস ও রূপ—শ্রীমতী সরোজবাসিনী সেন-প্রণীত; প্রকাশক—স্বর্ণময় সেন, ১১, ফার্ণ প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৮০+৷৷০, ৩১৫ এবং ৫৮৫; মূল্য যথাক্রমে—৷৷০ আনা, ৸০ আনা এবং ১৷৷০ টাকা।

এই পুস্তকত্রয়ের মাধ্যমে বহুশ্রুতা, চিন্তাশীলা প্রবীণা লেখিকা ভারতের সনাতন ধর্ম-সাধনা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রের এবং সাধুমহাপুরুষদের বাণী অবলম্বনে সরল এবং ওজস্বিনী বিবৃতি দিয়াছেন। দ্বিতীয় বইটি কবিতার আকারে লেখা। রচয়িত্রীর চোখে-দেখা সাধু-সন্তের কাহিনীগুলি সরস এবং শিক্ষাপ্রদ। ছাপা এবং বিষয়-সজ্জার ত্রুটিগুলি খুবই চোখে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বৃন্দাবনে সেবাকার্য—১৯০৭ সালে স্থাপিত জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান—বৃন্দাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। এই সেবাকেন্দ্র ৪৬ বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণভাবে শিবজ্ঞানে মানব-সেবা করিয়া আসিতেছে। ৫৫টি রোগিশয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বৎসরে ৮০৭ জন রোগীকে চিকিৎসার্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। বহির্বিভাগে নূতন ও পুরাতন চিকিৎসিতের সংখ্যা ছিল—৯৭,৬৯৮; অস্ত্রোপচারের সংখ্যা—৪,৩৯৭।

১৯৪৩ সাল হইতে এখানে চক্ষুরোগের চিকিৎসার্থে আধুনিক সাজসরঞ্জামসমন্বিত একটি পৃথক হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই 'নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতালে'র বহির্বিভাগে ২৬,৫৯৩ জন এবং অন্তর্বিভাগে ১,১০৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। রঞ্জন রশ্মি এবং তড়িৎপ্রবাহ সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও এখানকার উল্লেখযোগ্য বিষয়। রোগ নির্ণয় এবং তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার অনুসন্ধান ইত্যাদির জন্য একটি পরীক্ষাগারও হাসপাতালটির সর্বাঙ্গীনতা প্রকাশ করে।

ভদ্রপরিবারের নিঃস্ব বিধবাদের এবং দুঃস্থদিগকেও মাসে মাসে এবং অন্যসময়েও কখনও কখনও অর্থসাহায্য করা হইয়া থাকে।

মেদিনীপুর সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠান—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ২৪শে আষাঢ় মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শুভাগমন পূর্বক এক পক্ষকাল অবস্থান করেন। ২৮শে আষাঢ় আশ্রম-পরিচালিত হাইস্কুল 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে'র নবনির্মিত গৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান পূজ্যপাদ মহারাজজীর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর অবস্থান-কালে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ভক্ত পরিবার তাঁহার দর্শন এবং সঙ্গলাভ মানসে আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ উদ্দীপনাময় ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

ধর্ম-প্রচার—জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোম্বাই শাখা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কলিকাতায় ৪টি, ঢাকা জেলার নানাস্থানে ৯টি এবং ইম্ফলে (মণিপুর) ৪টি ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দিয়াছেন। আষাঢ় মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ বৃন্দাবন ও মথুরায় ছায়াচিত্রযোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বাঙলা ও হিন্দীতে ৫টি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামী অচিন্ত্যানন্দ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কুশমুণ্ডী, গঙ্গারামপুর এবং কালিয়াগঞ্জে কয়েকটি ধর্ম-বক্তৃতা দেন।

বলরাম-মন্দিরে ধর্মালোচনা-সভা—বাগবাজার, 'বলরাম মন্দিরে' (৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট) সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা সভায় প্রতি শনিবার স্বামী সাধনানন্দ, "গীতা"; স্বামী দেবানন্দ, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"; স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, "উপনিষদ"; অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, "মহাভারত"; অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবতরত্ন, "শ্রীমদ্ভাগবত" ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিতেছেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে কলিকাতায় বিখ্যাত গায়কগণ ভজন ও কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গত কয়েকমাসে বিশেষ কয়েকটি ধর্মসভার অধিবেশনে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী সৎস্বরূপানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, দার্শনিক শ্রীরমণী কুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীহরিকুমার কাব্যতীর্থ বাচস্পতি ও পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও বিদ্বজ্জন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

যক্ষ্মা আরোগ্যালয়ে রাজ্যপাল—গত ২রা শ্রাবণ, বিহারের রাজ্যপাল শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর মিশনের রাঁচি টি, বি, স্যানাটোরিয়াম পরিদর্শন করেন। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের অতন্দ্রিত উদ্যমে দ্রুত বিস্তারশীল প্রতিষ্ঠানটির পরিচ্ছন্নতা, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী এবং কঠিন ব্যাধিতে পীড়িত শঙ্কাতুর রোগিগণের প্রতি আত্মীয়বৎ সেবাযত্নের ব্যবস্থাদি দেখিয়া রাজ্যপাল বিস্ময়াবিষ্ট হন। আরোগ্যালয়ের প্রধান সেবক স্বামী বেদান্তানন্দ, সহকারী কর্মসচিব স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের সহিত রাজ্যপাল কিয়ৎকাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্বন্ধেও কথাবার্তা বলেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Vivekananda—A vivid and authentic biography by Swami Nikhilananda.

Published from the Ramakrishna-Vivekananda Center.
17 East 94th Street, New York, U.S.A.
Cloth bound. 224 pages. Price $ 3.50

বিবিধ সংবাদ

'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'-স্মরণে—ভগবান বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর সারনাথে (মৃগদাব) তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনা বৌদ্ধগণ 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'-উৎসবের মাধ্যমে স্মরণ করিয়া থাকেন। গত ৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই) কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির ধর্মরাজিক বিহারে এই উৎসব বহু বৌদ্ধ এবং হিন্দু জনসাধারণেরও উপস্থিতিতে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় আহূত জনসভায় নেতৃত্ব করেন শ্রীপি, আর, দাশগুপ্ত।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যু-বার্ষিকী—গত ১৩ই শ্রাবণ, কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের উদ্যোগে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ৭২তম তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কলেজ স্কোয়ারস্থিত মর্মরমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। সায়াহ্নে বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তা যুগপ্রবর্তক, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বদান্যতা, দেবদুর্লভ করুণা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত জনগণের প্রতি পরম সহানুভূতি, কর্তব্যপালনে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করেন। ১৩এ, চক্রবেড়িয়া রোড-স্থিত বিদ্যাসাগর হাসপাতালে এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি স্মৃতিসভায় কলিকাতার পৌর-সভার অধ্যক্ষ শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব এবং মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

পরলোকে বিশিষ্ট সেবাব্রতী—গত ৩২শে আষাঢ় জামশেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রাণস্বরূপ অক্লান্ত কর্মযোগী শ্রীউপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় কলিকাতার আর, জি, কর কলেজ হাসপাতালে ৫৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনিই শোকাবহ। ঢাকায় পাঠ্যজীবন হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ১৯২০ সালে কর্মস্থান জামশেদপুরে অনেকগুলি যুবককে লইয়া উপেন্দ্রলাল 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র মাধ্যমে নানাপ্রকার সেবাকার্যে ব্রতী হন। এই প্রতিষ্ঠান পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শাখাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। উপেন-বাবুই ছিলেন সোসাইটির সেক্রেটারী এবং তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মধারা প্রভূত প্রসার লাভ করে। অকৃতদার উপেন্দ্রলাল পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং উন্নত চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার এবং উদার সহানুভূতির জন্য ছোটবড় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

স্বর্গীয় রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আদর্শচরিত্র শিক্ষাব্রতী চিরকুমার অধ্যাপক রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় গত ২রা শ্রাবণ, কলিকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে আনুমানিক ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বেলুড়-মঠের সংস্পর্শে আসেন এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের বিশেষ স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেন। রাস-বিহারীবাবু কলিকাতায় কয়েকটি কলেজে বিভিন্ন সময়ে রসায়ন-শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিবার কালে ছাত্রসমাজের প্রভূত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি বিজ্ঞানকলেজেও গবেষণা-কার্যে ব্রতী ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরলোকগতের আত্মার ঊর্ধ্বগতি কামনা করি।

শ্রীশ্রীদুর্গা

উদ্বোধন

দুর্গা

নির্লেপা নির্মলা নিত্যা নিরাকারা নিরাকুলা। নিশ্চিন্তা নিরহংকারা নির্মোহা মোহনাশিনী।
নির্গুণা নিষ্কলা শান্তা নিষ্কামা নিরুপপ্লবা ॥ নির্মমা মমতাহন্ত্রী নিষ্পাপা পাপনাশিনী ॥
নিত্যমুক্তা নির্বিকারা নিষ্প্রপঞ্চা নিরাশ্রয়া। নিষ্ক্রোধা ক্রোধশমনী নির্লোভা লোভনাশিনী।
নিত্যশুদ্ধা নিত্যবুদ্ধা নিরবদ্যা নিরন্তরা ॥ নিঃসংশয়া সংশয়ঘ্নী নির্ভবা ভবনাশিনী ॥
নিষ্কারণা নিষ্কলঙ্কা নিরুপাধির্নিরীশ্বরা। নির্বিকল্পা নিরাবাধা নির্ভেদা ভেদনাশিনী।
নীরাগা রাগমথনী নির্মদা মদনাশিনী ॥ নির্নাশা মৃত্যুমথনী নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহা ॥

নিস্তুলা নীলচিকুরা নিরপায়া নিরত্যয়া।
দুর্লভা দুর্গমা দুর্গা দুঃখহন্ত্রী সুখপ্রদা ॥

—শ্রীললিতাসহস্রনামস্তোত্রম্ (৪৪-৫০)

জগজ্জননী দুর্গা স্বরূপতঃ নিত্য নিরাকার নিরবয়ব নির্গুণ পরব্রহ্ম। কোন কিছুতেই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, তাই তিনি সর্বপ্রকার মালিন্য-রহিতা—কোন কিছুরই কামনা তাঁহার নাই, তাই তিনি চির-শান্তা, অক্ষুব্ধা। নিত্যই তিনি মুক্তা, নিত্যই তিনি শুদ্ধা, নিত্যই তিনি জ্ঞান-দীপ্তা। তাঁহাতে কোন বিকার নাই, ছেদ নাই, নিন্দনীয় কিছু নাই। সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে তিনি, তাই তাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না—তিনি নিরালম্বা। সব কিছুর কারণ আছে, তাঁহার আর কোন কারণ নাই; সব কিছুরই কিছু-না-কিছু কলঙ্ক আছে, মা আমার নিষ্কলঙ্কা। তাঁহাকে চিহ্নিত করিবার জন্য কোন পরিচায়ক (উপাধি) নাই, তাঁহাকে শাসনে রাখিবার জন্য অপর কোন ঈশ্বর নাই। নিজে রাগ (আসক্তি)-মুক্তা—সাধকের সকল বিষয়রাগ তিনিই দেন মথন করিয়া, নিজে তিনি মদশূন্যা—মুমুক্ষুর কুটিল মিথ্যাদম্ভ তাই তাঁহারই কৃপায় হয় উন্মূল।

নিশ্চিন্তা তিনি, নিরহঙ্কার তিনি। মোহ নাই, তাই মোহনাশিনী; মমত্বাভিমান নাই, তাই সংসার-মমতাহন্ত্রী; অপাপবিদ্ধা, তাই পাপ-বিদারিণী। জন্মরহিতা মা শরণাগতের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারক্লেশ দূর করিয়া দেন। ক্রোধ-লোভ-সংশয়-নির্মুক্তা তিনি, তাইতো (তাঁহার চরণকমল ধ্যান করিয়া) চিত্তের ক্রোধ-লোভ-সংশয় হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি। মায়ের নির্বিকল্প স্বরূপে কোন সন্তাপ নাই, ভেদ নাই, বিনাশ নাই, ক্রিয়া নাই, পরিগ্রহ নাই। সেই স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলে সকল ভেদ ও মৃত্যুর অবসান হয়।

যিনি দুর্লভ, যিনি দুর্গম, সেই অবিচ্যুতা অনতিক্রম্যা মহামায়া দুর্গা ভক্তের দুঃখ হরণ করিবার জন্য অতুলনীয় ভাগবতী মূর্তিতে নীল কেশজাল বিস্তার করিয়া ভক্তের সম্মুখে প্রত্যক্ষা আবির্ভূতা।

কথাপ্রসঙ্গে

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শারদীয়া দুর্গাপূজার কয়েক দিন বাঙলার আকাশ-বাতাস জগজ্জননীর প্রণাম-মন্ত্রের সুললিত গম্ভীর গীতি-ছন্দে ভরিয়া উঠে। বহু জাতি, বহু সামাজিক স্তরে বিভক্ত বাঙালী হিন্দু এখনও যে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া এক, তাহাদের মধ্যে বোধ করি, তাহার শক্তিপূজা—মাতৃপূজাই প্রধান। শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বাঙালী হিন্দুর জাতীয় উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙলার যখন সুদিন ছিল তখন এই উৎসব তাহার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে প্রতি বৎসর একটি নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিত, আর উহার ক্রিয়া চলিত সারা বৎসর ধরিয়া। দশভুজাকে বাঙালী পূজা করিত শুধু পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়, তাহার পৃথিবীর জীবনকে সংহত, সমৃদ্ধ—অথচ সংযত, সুনিয়োজিত করিবার প্রেরণা ও শক্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে। সে জানিত, মা 'ভোগ-স্বর্গাপবর্গদা'—সাংসারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ, আবার ইহলোক ও পরলোক—এই দুয়ের অতীত যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মুক্তি, তিনটাই তাঁহার কৃপায় সে পাইতে পারে। দেবীর নিকট সে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই প্রার্থনা করিত—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"— রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, অশুভ বিনাশ কর। "বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্"—হে দেবী, দিকে দিকে কল্যাণ বিস্তীর্ণ কর, বিপুল শ্রীর বিধান কর। গদ্‌গদ-কণ্ঠে সে উচ্চারণ করিত, বিশ্বসংসারে যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু শক্তিমান, যাহা কিছু আকর্ষণীয় সবই সেই জগদম্বার বিভূতি—নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।

আজ আর বাঙালীর সে দিন নাই। দুর্গাপূজা আজও সে করে বটে, কিন্তু সে পূজায় প্রাচীন দিনের সে প্রতীক্ষা, সে হৃদয়াবেগ, সে ভক্তি-বিশ্বাস, সে আনন্দ-তৃপ্তি নাই। প্রতিমা গড়িয়া, পূজামণ্ডপ সাজাইয়া, দেবীর পূজার পদ্ম আহরণ করিয়া, ঢাকঢোল সানাইএর বাদ্য, যাত্রাগান শুনিয়া, নানা উপচার-মন্ত্র-অনুষ্ঠানযুক্ত পূজা-হোমাদি দেখিয়া, চিড়া মুড়কী নারিকেল-নাড়ুর সম্ভার সাজাইয়া, বিলাইয়া আজ আর তাহার হৃদয় পুরে না। পূজার পরিবেশ তাহার কাছে আজ মনে হয় রসহীন, অপূর্ণ। উহাকে সরস করিতে, পরিপূর্ণ করিতে তাহার তাই আমদানী করিতে হয় আধুনিক হালকা ব্যসনসমূহ—বাহিক বহুতর বিলাস-আড়ম্বর। দেবী আজ আর তাহার নিকট জীবন্ত মাতৃ-মূর্তি নন—তাহার মৃত্তিকা-শিল্পে মুন্সীয়ানা দেখাইবার মডেল মাত্র!

প্রগতি-পন্থী বাঙালীকে এই ভাব-সাঙ্কর্য হইতে সাবধান হইতে হইবে। প্রাচীনকালে পূজা ছিল, আবার অন্য দশ রকম সামাজিক আমোদ-প্রমোদও ছিল—কিন্তু পূজার পরিবেশের বিশুদ্ধতা ও গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া আমোদ-প্রমোদকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। বাঙালী বহুবার তাহার হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, শ্রদ্ধা বিশ্বাস ব্যাকুলতা দিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। এখনও উহা সে পারে। শুধু চাই কিছু অন্তর্মুখীনতা, বিশ্বাস, আত্মবিশ্লেষণ,

সংযম, শান্ত বিচারবুদ্ধি। উহাদের অতন্দ্রিত প্রয়োগে সে তাহার মাতৃপূজা পুনর্বার সার্থক করিয়া তুলুক— জাগ্রত জীবন্ত মায়ের বেদির সম্মুখে বাঙালীর সকল দুর্বলতা, বিচ্ছিন্নতা, ঈর্ষা, স্বার্থ-পরতা দূর হউক—বাঙালী আবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার দীপ্ত গৌরব লাভ করুক।

পরধর্মে বাস্তব সহানুভূতি

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যদেশ হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় (কলম্বো, জানুয়ারী, ১৮৯৭) ভারত-সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"পরধর্মে বিদ্বেষরাহিত্য এবং ধর্মভাবের উপর সহানুভূতি জগতে এখনও যতটুকু আছে তাহা কার্যতঃ এখানেই—এই আর্যভূমেই দেখিতে পাওয়া যায়—অন্যত্র ইহা দুর্লভ। এখানেই কেবল ভারতবাসীরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ এবং খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়—আর কোথাও নয়। যদি তুমি অন্যান্য দেশে গিয়া মুসলমানগণকে বা অন্য ধর্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির তৈরী করিয়া দিতে বল, দেখিও তাহারা কিরূপ সাহায্য করে! তৎপরিবর্তে তাহারা সেই মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। অতএব জগতের পক্ষে এই এক মহতী শিক্ষা ভারতের নিকট লওয়ার প্রয়োজন আছে—উহা এই দৃষ্টি যে, পরধর্মকে শুধু সহিয়া যাওয়া নয়, উহার উপর প্রবল সহানুভূতি।"

ধর্মের প্রতি এই উদার মনোভাব ভারতবাসী মাত্রেরই থাকা উচিত—তিনি হিন্দুই হউন বা অহিন্দুই হউন। অবশ্য হিন্দুদের ইহা অনেকটা স্বভাব-সিদ্ধ—কিন্তু ভারতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক, শিখদেরও মধ্যে ইহা পরিলক্ষিত হওয়া বিচিত্র নয়। একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত বৎসর শরৎকালে যখন দার্জিলিং-এ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন স্থানীয় অনেক নেপালী হিন্দুর রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারেন হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে তাহারা একান্তই অজ্ঞ। নেপালী ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাপাইয়া নেপালী-সমাজে উহার প্রচারের সঙ্কল্প তাঁহার চিত্তে উদয় হয়। অতঃপর কি করিয়া তিনি উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞ নেপালী পণ্ডিতদের দ্বারা গীতার অনুবাদ করাইলেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজ ও মুদ্রণাদির জন্য অর্থ-সংগ্রহান্তে দশ হাজার গীতাগ্রন্থ প্রকাশ ও পাহাড়ীয়াদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন তাহা শ্রীজীবনজী দেশাইকে লিখিত সাম্প্রতিক তাঁহার একখানি পত্রে (যাহা ৮ই আগষ্টের হরিজন পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে) পড়িতে পড়িতে এই উদারহৃদয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্মের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তিনি উহার শাশ্বত সত্যকে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত 'মতুয়ার বুদ্ধি' তাঁহার নাই।

সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ

সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের সংস্কৃতানুরাগী অনেক মনীষী আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করিতেছেন। সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি বৃহৎ পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন।

কিন্তু বুঝা এক, আর কার্যে পরিণত করা ভিন্ন কথা। শুধু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধ্যানে তো পেট ভরে না, সাংসারিক অভাব মেটে না। এই পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের যুগে সংস্কৃত শিখিয়া পয়সা রোজগার করা যায় না। অতএব সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী এমন একটা কিছুও শিক্ষা চাই যদ্দারা অর্থাগম হয়,

এইরূপ একটা সিদ্ধান্তে শিক্ষাবিদ্‌গণ কমবেশী একমত হইতেছেন। কিন্তু ইহার পক্ষে বাধাও আছে প্রচুর। সংস্কৃত-শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রণালী এ পর্যন্ত যাহা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় উহা ঐরূপই রাখিলে, শিক্ষার্থীর অবসর এবং শক্তির এমন একটা ফালতু অংশ খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন যদ্দ্বারা সে সংস্কৃত-শিক্ষার রুটীন যথাযথ অনুসরণ করিবার পরও উহার বাহিরে অপর কিছুতে কার্যকরী ভাবে মন দিতে পারে। অতএব সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদিগকে সংস্কৃত-শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রণালীতে কতটা কি কালোপযোগী পরিবর্তন সাধন করা যায় তাহাও ভাল করিয়া ভাবিতে হইবে। আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁহার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৫৩) সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই বিষয়ে প্রভূত আলোকসম্পাত করে। আচার্য সরকার বলিতেছেন :—

সংস্কৃত-চর্চা যদি ভারতবর্ষে একটি জীবন্ত শিক্ষাধারারূপে চালু না থাকে তাহা হইলে ভারত তাহার আত্মাকে হারাইয়া বসিবে। * * *

সংস্কৃতের একটি চলনসই জ্ঞান, এমন কি ব্যাকরণের বা অলঙ্কারের কলাকৌশল ছাড়িয়া সহজ শুদ্ধভাবে ঐ ভাষায় কিছু কিছু লিখিতে পারা—ইহা এই দেশে আমাদের সকলের পক্ষেই একটি প্রকাণ্ড মানসিক সম্পত্তি। সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাবধারা আমাদের হৃদয়ের পরম সান্ত্বনা। আমাদের পূর্বপুরুষগণের সরল জীবন-ধারার সময়ের তুলনায় বর্তমান যান্ত্রিক যুগে ইহার প্রয়োজন কমে তো নাইই, বরং বাড়িয়াছে। সংস্কৃতকে এই দেশে একটি 'জীবন্ত' শিক্ষা-বস্তু করিয়া তুলিবার আমি পক্ষপাতী। ইহা দ্বারা আমি ইহাই বলিতে চাই যে, বহুতর শিক্ষিত নরনারী এই ভাষা একটি আনন্দের বস্তু এবং সংস্কৃতির অঙ্গরূপে চর্চা করিবেন, এই ভাষার সাহিত্য ও দর্শন হইতে তাঁহাদের অন্তর্জীবন গঠনের উপাদান এবং তাঁহাদের নিজস্ব মাতৃভাষার সমৃদ্ধিতে প্রেরণা সংগ্রহ করিবেন। * * * * * ভারতীয় শিক্ষিত জনসাধারণকে সংস্কৃত শিখিবার উৎসাহদানের জন্য আমার কয়েকটি কার্যকরী ইঙ্গিত এই :—

(১) স্কুল এবং কলেজে সংস্কৃত-শিক্ষণরীতিতে ব্যাকরণ একান্ত যেটুকু অপরিহার্য ততটুকুই মাত্রা রাখা। মুখস্থ করার প্রয়োজন কমাইয়া আনা। ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট বিষয়বস্তুটি খুব চিত্তাকর্ষক করিয়া উপস্থিত করা, সাহিত্যের মর্মে যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিতে পারে। কোন প্রাচীন 'ক্লাসিক'এর সম্পূর্ণটি পাঠ্য না করিয়া সুনির্বাচিত অংশবিশেষ পড়িবার ব্যবস্থা। এক একটি অধ্যায়েরও কোন কোন শ্লোক বাদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যগুলি সহজভাষায় পুনর্লিখন। সংস্কৃত-পরীক্ষারীতিকে বর্তমান প্রণালীতে লইয়া আসা।

(২) সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থগুলির দেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রচার। মূল সংস্কৃত, পৃষ্ঠার অপর দিকে রাখিলে চলিবে।

(৩) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ অংশসমূহের সঙ্কলন অনুবাদাকারে প্রকাশ। এই অনুবাদ ইংরেজীতে হইলে ভারতের সকল রাজ্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ঐ গ্রন্থ চলিবে। যেমন—Warren's Buddhism in Translation.

(৪) সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ এবং বিক্রয়ের জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা।

ষাট বৎসর পরে

গত সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ঐতিহাসিক আবির্ভাবের ষাট বৎসর পরিপূর্ণ হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পরাধীন ভারতের ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক এক অজ্ঞাত অনাহূত সহায়-সম্বল-পরিচয়-হীন কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী পাশ্চাত্ত্য ঐশ্বর্য-বিভব-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্য-দীপ্ত আমেরিকায় পৃথিবীর নানা স্বাধীন দেশের বিদগ্ধ বুধমণ্ডলীর সম্মুখে 'হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'—এই সম্বোধন এবং পরবর্তী দশমিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণে চিরন্তন ধর্মের উদার সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর

চিকাগো ধর্ম-মহাসম্মেলনের কয়েকজন ভারতীয় প্রতিনিধিসহ স্বামী বিবেকানন্দ
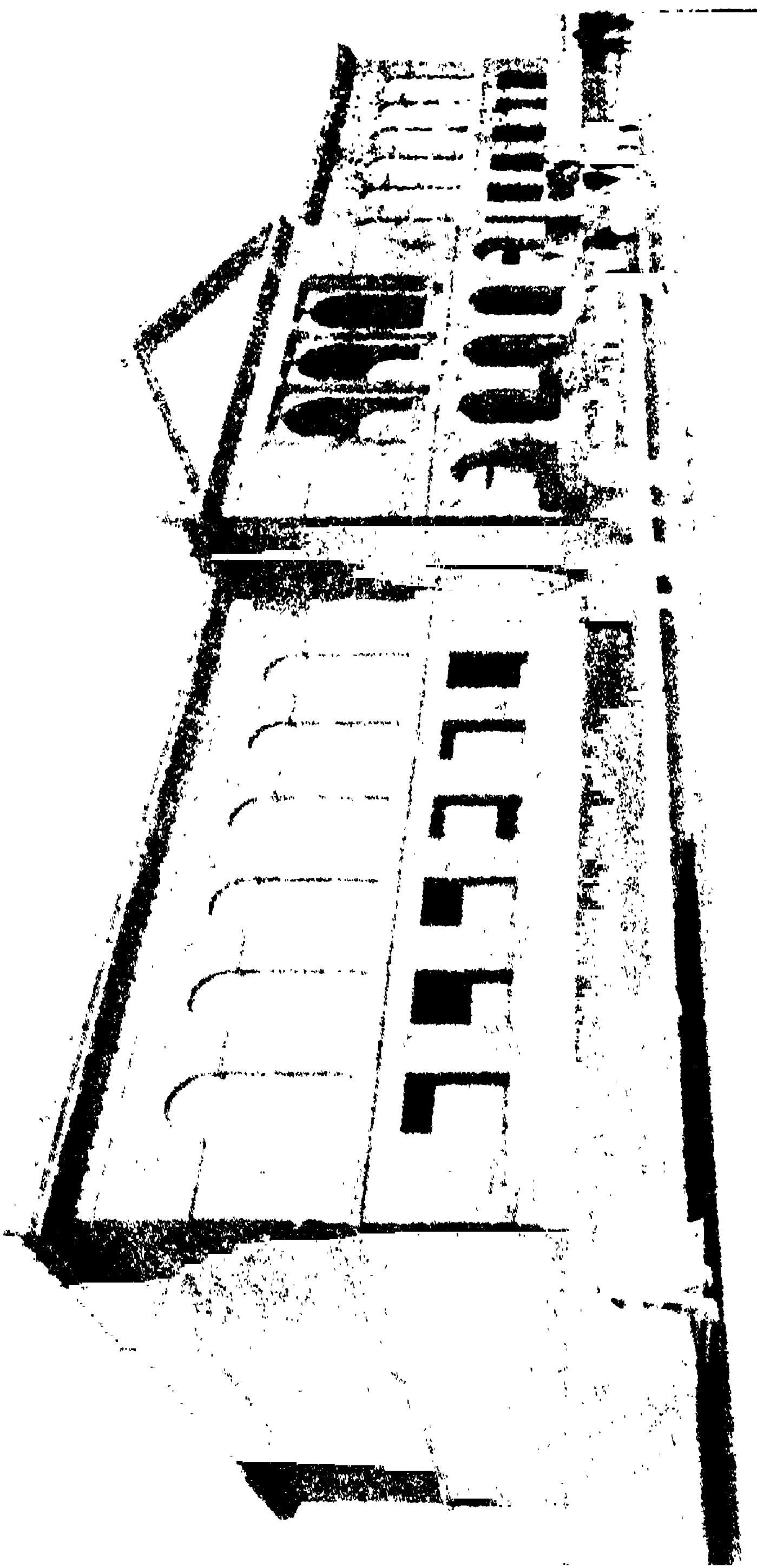
ঘোষণা দ্বারা ছয় সাত হাজার সুশিক্ষিত শ্রোতৃগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব বিস্ময় ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা মানুষের ধর্মেতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নাই। মহাসম্মেলনে স্বামিজী পরে আরও ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন (১৫ই, ১৯শে, ২০শে, ২২শে, ২৬শে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর)। ১৯ তারিখের বক্তৃতাটি 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত লিখিত ভাষণ। এই সকল বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামিজী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ধর্ম লইয়া নানা মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান, বাগ-বিতণ্ডা প্রভৃতির পশ্চাতে সকল জাতির সকল মানুষের মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় সর্বজনীন শাশ্বত সত্য রহিয়াছে; উহারই অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি হইতেছে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য। ভারতবর্ষের বেদান্ত-প্রতিপাদিত মানবাত্মার এই অমর মহিমার কথা স্বামিজীর মুখে শুনিয়া পাশ্চাত্যজগৎ যেন তাহার আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল।

"হে ভ্রাতৃগণ, 'অমৃতের অধিকারী'—এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই।...তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরা এই মর্ত্যভূমির দেবতা। তোমরা পাপী? ইহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ।"

ধর্মের প্রকৃত মর্ম কি—কি প্রণালীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্নধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে প্রেম ও পারস্পরিক সহানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—বর্তমান জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের আদর্শ ও সাধনাকে কি ভাবে কতটা পরিবর্তিত করা প্রয়োজন—বিশ্বসভ্যতায় ধর্মের আদিজননী ভারতের অবদান কি—বর্তমান পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতায় বিপদ কোথায়—উহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি—ইত্যাদি বিষয়ের সতেজ, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত স্বামিজীর বাণী হইতে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। অন্তিম বক্তৃতায় তাঁহার শেষ কথাগুলি :—

পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উন্নত চরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ হহেও ভাবেন যে, সকল ধর্ম উচ্ছিন্ন হইবে, শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি ও এই কথা বলি যে, শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে,—'সমর নহে—সহায়তা', 'বিনাশ নহে—বরণ', 'দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি।'

বিগত ষাট বৎসরে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্ত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কথিত বাণীগুলি ধীরে ধীরে মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বিশ্বসভ্যতার সঙ্কটমোচনে উহাদের উপযোগিতা গভীর ও দূরপ্রসারী। শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে স্বামিজীর আবির্ভাব তাই বিশেষভাবে অনুধ্যানের যোগ্য।

ঈশ্বরের ও বিষয়ের সেবা একসঙ্গে হয় না *

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

হৃদয়ে যথার্থ ভগবৎপ্রেমের বিকাশ না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি টান যখন সাংসারিক আকর্ষণের অপেক্ষা প্রবল হয় তখনই হয় ধর্মের আরম্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, দেহের ভিতর দুইটি চুম্বকপাথর রহিয়াছে—একটি নীচে, অপরটি উপরে। আর মাঝখানে মন যেন এক টুকরা লোহা। নীচের পাথরটির আকর্ষণ প্রবল হইলে মনকে নীচের দিকে টানিয়া আনে—আর উপরের পাথরটি যদি অধিকতর শক্তিশালী হয় তাহা হইলে উহা মনকে টানিয়া উপরে তোলে। বেশীর ভাগ লোকেরই ঐ নীচের পাথরটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাই সহজেই মনকে নীচের দিকে টানিয়া রাখে—আর উপরের পাথরটি তমোগুণে আচ্ছন্ন—অর্থাৎ অজ্ঞান ও অশুচিতায় ধূলিধূসরিত, তাই ইহার আকর্ষণী শক্তিও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ঐ তমোগুণের ধূলাবালি ঝাড়িয়া ফেল, দেখিবে মন স্বতই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

* লেখকের ইংরেজী রচনা হইতে সঙ্কলন : সান্ ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতি। বঙ্গানুবাদ : শ্রীনৃত্যগোপাল রায়।

বিষয়ী লোকদের সকলেরই মনের গতি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখ ও সাংসারিকতার প্রতি। নীচের চুম্বকপাথরের আকর্ষণ শিথিল হইলে বুঝিতে হইবে অপর কোন প্রবলতর শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বরই সেই প্রবলতর শক্তি। ঈশ্বরোন্মুখ এই আকর্ষণের নামই ধর্ম। কাজেই যাহার প্রাণে প্রবল ভগবৎপ্রেমের উদ্রেক হয় নাই, যথার্থ ধর্মজীবন তাহার পক্ষে অসম্ভবই হইতে পারে না।

এই দুই আকর্ষণকে কিন্তু মিলিত করা যায় না। যেমন আলো ও অন্ধকারের একত্রীকরণ সম্ভবপর নয়, তেমনি ভগবান ও বিষয়ের ভজনা একসঙ্গে হয় না। পার্থিব আকর্ষণ অহমিকার নামান্তর, পক্ষান্তরে ঈশ্বরানুরাগ অর্থে ভগবানে আত্মসমর্পণ। 'অহং'-'অহং'-ভাব থাকা মানেই বুঝিতে হইবে যে মানুষ পার্থিব বন্ধনের দাস। 'পার্থিব' বলিতে কি বুঝায়? বুঝায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ, ধনৈশ্বর্য, নাম ও যশ। বিষয়বস্তু নিয়তই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আমরা বলিয়া উঠি "আমি ইহা চাই, উহা চাই।" কিন্তু আরও হয়তো এমন শতশত ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা ঐ একই জিনিস চায়, কাজেই আমরা উহার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। এইরূপে আসে প্রতি-যোগিতা ও সংগ্রামের সূচনা। এই সংগ্রাম হইতে 'আমার' অধিকার, 'আমার' সম্পত্তি, 'আমার' সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান স্বার্থবুদ্ধির উদ্ভব। কিন্তু ইহা অহমিকার সক্রিয় উদগ্র অবস্থা। পরন্তু ঈশ্বরীয় আকর্ষণের সূচনায় যে ভাবের অভ্যুদয় হয় তাহা হইল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের। লৌহ যখন চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় নিজে তখন সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সেইরূপ মানুষ যতক্ষণ স্বীয় অধিকারের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম করে এবং ভাবে সে-ই সর্বকর্মের নায়ক ততক্ষণ সে ঈশ্বরীয় আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে না। যখন সে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে বলে,—"হে প্রভু, আমি তো শুধু যন্ত্রমাত্র—কী আমার ক্ষমতা! তুমিই যন্ত্রী, তুমি তোমার কর্ম কর"—সেই মুহূর্তেই উপরের চুম্বকপাথর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নিরবচ্ছিন্ন। কিরূপে ইহা জানা যায়? কারণ আমরা আমাদের মনে আতঙ্ক ও ভয় দিই। ভগবানে এবং তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা ও অপার করুণায় বিশ্বাস থাকিলে আমরা কখনও কোন-প্রকার ভয়ে অভিভূত হইতে পারি না। একমাত্র তিনিই আমাদিগকে বাসনা ও ভীতির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। এইজন্যই তাঁহার নাম পরমপাবন। মন কিসে কলুষিত হয়? বাসনায়। মনকে বাসনামুক্ত কর—অমনি মন শুদ্ধ ও নির্মল হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহার প্রাণে ঈশ্বরীয় ভাবের দ্যোতনা আসে নাই সে কখনও বাসনামুক্ত হইতে পারে না। সে বরং বলিবে, "বাসনাই আমার সর্বসুখের আকর। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে চর্ব্য-চুষ্যাদি খাদ্য আস্বাদনের সুখ পাইতাম না; তৃষ্ণা যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্নিগ্ধ পানীয়ের আনন্দ বুঝিতাম কি? অতএব বাসনার মাধ্যমেই আমি এই জগৎকে উপভোগ করি।" এইরূপ বিশ্বাসের ফলে সে কখনও বাসনা ত্যাগ করিতে চাহে না।

অপর পক্ষে যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি দেখেন যে, এই সকল বাসনা সুখের আকর না হইয়া বরং মানুষকে বহুতর দুঃখে আচ্ছন্ন করে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, একমাত্র ভগবানই নিঃসীম আনন্দের আধার, পার্থিব অপরাপর সুখ সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী। আনন্দই হইতেছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। আর ভগবান যখন আনন্দস্বরূপ, তখন কেহই আর নাস্তিক নহে—কেন না, প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষমাত্রেরই ঈপ্সিত আদর্শ সচ্চিদানন্দ—অনন্ত জীবন (চিরন্তন সত্তা)—অখণ্ড জ্ঞান—শাশ্বত আনন্দ। সে চাহে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে, সব কিছু জানিতে—আর সর্বপ্রকারে সুখী হইতে। সুতরাং ঈশ্বরই প্রকৃতপক্ষে সকলের ঈপ্সিত আদর্শ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—মানুষ তাহার অসীম স্বরূপ আগে জানুক, পরে সীমা লইয়া খেলা করিবে। আগে ভগবান চাই, তারপর সংসার। ঈশদূত যীশুও বলিয়াছিলেন,—প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান কর। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের চেয়ে অহংএর ছটাকেই বেশী করিয়া প্রদীপ্ত করিয়া তুলি এবং ঈশ্বরকে নেপথ্যে ফেলিয়া রাখি। আমরা প্রথমে ছুটি বিষয়বস্তুর সন্ধানে—পরে ভাবি

আত্মার কথা। ঠিক ইহার বিপরীত পথটিই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের অন্তরকে বিষয়বস্তুর স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের ঈশ্বরানুরাগের উদ্দেশ্য যদি হয় পার্থিব সুখসম্পদলাভ, তবে সেই অনুরাগ ঈশ্বরের জন্য নয়—পার্থিববিষয়বস্তুর জন্য। তবে আমরা আর যথার্থ ভক্ত হইতে পারিব না। একনিষ্ঠ ভক্তের ঈশ্বরপ্রেম অহেতুক—প্রেমের আনন্দের জন্যই সে ভগবানকে ভালবাসে—কেন না, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র প্রেমাস্পদ।

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"

স্বামী বাসুদেবানন্দ

(প্রশ্নোত্তর)

প্রশ্ন :—মহামায়ার উপাসনার এত কি প্রয়োজন? একেবারে ঈশ্বরকে ধরলেই ত হলো?

উত্তর :—মহামায়া পথ ছেড়ে দিলে তবে হয়, নইলে কিছুই হয় না। তিনিই জীবের বুদ্ধিরূপে আছেন, আবার ভ্রান্তিরূপে আছেন।

প্রশ্ন :—কিন্তু, ভগবান যে গীতায় বলছেন 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

উত্তর :—হাঁ বলেছেন বটে, তবে আবার এও তো বলেছেন—'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা' (মায়া দ্বারা জ্ঞান অপহৃত) 'মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্' (গীতা, ৭।১৩)। (ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে জীব ত্রিগুণের অতীত আমার অব্যয় পরম স্বরূপ জানতে পারে না।) 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।' (গীতা, ৭।২৫) (যোগমায়া কর্তৃক সমাবৃত বলে আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না।) ভাগবত বললেন,—

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।৩৩)

অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কল্পিত জগৎ। যখন এই সদসদ্রূপা বিক্ষেপাবরণাত্মিকা অবিদ্যা, স্বরূপের সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিলয়প্রাপ্ত হন, তখনই ব্রহ্মদর্শন হয়।

কিন্তু সরষের ভেতর ভূত ঢুকে থাকলে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়া যাবে কি করে? যে বুদ্ধি দিয়ে তাঁর ধ্যানভজন করবো তিনি যদি তাকে বিষয় দিয়ে চঞ্চল করে তোলেন তখন কি উপায়? তাঁর দয়া হলে তবে ভগবদ্ভক্তি হয় বা ব্রহ্মদর্শন করা যায়। 'বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।' ভাগবতকার এই তত্ত্ব বুঝেই বলেছেন—

"যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।৩৪)

বিশারদ্ মানে সর্বজ্ঞ ভগবান। তাঁর যে দৈবী মায়া তিনি হলেন বৈশারদী—ইনি অবিদ্যারূপে বিক্ষেপ আবরণ করেন, ততক্ষণ জীবত্ব যায় না, আর যখন ব্রহ্মবিদ্যারূপ 'কৃষ্ণমতি' রূপে প্রকাশ পান তখন অবিদ্যাকৃত জীবোপাধি নাশ পায় এবং আগুন যেমন কাঠকে দগ্ধ ক'রে নিজেও উপশম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মমতি অবিদ্যোপাধি নাশ ক'রে উপরত হন, আর তখনই জীবও ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

ভাগবতের আর এক জায়গায় মৈত্রেয় বিদুরকে মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির কথা বলছেন,—

"অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৬।৩৮)

এই ভাগবতী মায়া ব্রহ্মরুদ্রাদি মায়ীদেরও মোহিনী। এমন কি যিনি স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীহরি তিনিও নিজের আত্মবর্ত্ম অর্থাৎ স্বীয় মায়ার গতি কতদূর তা জানেন না; অপরের আর কা কথা!

যদিও এটা অত্যুক্তি, কারণ ভগবানের ইচ্ছা বা বিভূতি বা বিস্তারই হচ্ছে মায়া, তথাপি তিনি যে কিরূপ 'দুরত্যয়া' সেইটাই জীবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মৈত্রেয় আবার বলছেন—

"সেয়ং ভগবতো মায়া…" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৭।৯)

ভগবানের এই মায়া 'নয়' অর্থাৎ যুক্তির বিরোধী। কেন না যিনি ঈশ্বর, বিমুক্ত সর্বজ্ঞ—তাঁর এই জীবভাব অর্থাৎ বন্ধন এবং কার্পণ্য যিনি ঘটান তাঁকে তর্কদ্বারা কি করে বোঝা যাবে?

তা হলে ঈশ্বর ও জীবে ব্যবহারিক জগতে ভেদ করব কি করে? ব্রহ্ম যখন বিদ্যামায়াশ্রিত হন তখন তাঁকে বলি ঈশ্বর আর তিনি যখন অবিদ্যা-মায়াশ্রিত হন তখন তাঁকে বলি জীব। অবিদ্যা-হেতু জীব প্রকৃতির ধর্ম নিজের বলে গ্রহণ করছে, আর ঈশ্বর বিদ্যামায়া আশ্রয় করাতে প্রকৃতিধর্ম তাঁতে আরোপিত—এই জ্ঞান থাকায় তাঁকে বিদ্যা বা অবিদ্যা কোন মায়াই মুগ্ধ করতে পারে না, তিনি উদাসীনবৎ, বালক্রীড়াবৎ সৃষ্টিস্থিতিলয় করছেন। মৈত্রেয় বলছেন,—

"যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৭।১১)

যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের জলোপাধিকৃত কম্পাদি দেখা যায়—জল দুলছে তাতে মনে হচ্ছে চন্দ্রও দুলছে, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব দেহ মন বুদ্ধির কম্পন নিজেরই বলে বোধ করে। সেটা অসৎ হলেও সৎ বলে দেখা যায়, কারণ আকাশের চাঁদ কখনও জলের দোলনে দোলে না; সেইরূপ দ্রষ্টা জীবাত্মার অনাত্মা প্রকৃতির গুণ নিজের বলে বোধ হয় পরন্তু ঈশ্বরের হয় না।

প্রশ্ন:—কিন্তু তার পরে যে রয়েছে,—

"স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্‌ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৭।১২)

বাসুদেবের অনুকম্পায় নিবৃত্তিধর্ম ভক্তিযোগের দ্বারা ধীরে ধীরে সেই অজ্ঞানের তিরোধান হবে?

উত্তর:—ভগবানের অনুকম্পা হলে মহামায়ার অনুকম্পা হবেই। মহামায়ার অনুকম্পা হলেই তখন ব্রহ্মমতি উপস্থিত হবে। যার ভগবানের প্রতি মন গিয়েছে তার প্রতি মহামায়া খুশী হয়েছেন বুঝতে হবে। সদ্‌বুদ্ধি যদি মা না দেন, তা হলে ভগবানকে ডাকবে কেন? মার কৃপায় সদ্‌বুদ্ধি আসায় ভগবানকে ডাকতে পারা এবং তারপর তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে। তাঁর কৃপা ত সর্বক্ষণই রয়েছে, অথচ জীব বুঝতে পারছে না কেন? 'মায়য়াবৃতং জ্ঞানং', 'মোহিতং নাভিজানাতি'। সদ্‌বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত ভগবান 'তদ্‌দূরে', কিন্তু মহামায়া যে কি, তা আমরা সকলে সর্বক্ষণ বুঝেও বুঝতে পারছি না। সেইজন্য মেধস্ ঋষি বললেন,—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" সেই মহামায়া প্রসন্ন হলেই মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়।

এস তুমি মংগলে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বিশ্বজননি জাগো, জাগো তুমি কল্যাণি!
মোহ-ঘন-আবরণ নিজ করে লও টানি!
গগনের দিকে দিকে, আঁখি মেলো অনিমিখে,
সুপ্তির ঘোর ভাঙি, দূর কর সব গ্লানি!

দানবের নিপীড়নে শংকিত চরাচর,
আর্তের হাহাকারে জাগে সকরুণ স্বর!
বেদনায় ম্রিয়মান কাঁদে তব সন্তান,
নয়নের বারিধারা ঝরে আজি ঝর্ ঝর্!

দুর্গতিহরা এস, এস মাগো চণ্ডিকা!
বুকে বুকে জ্বালো তুমি দীপ্তির হোম-শিখা!
দাও জ্ঞান, দাও বল, কর প্রাণ উজ্জ্বল,
অংকিত কর ভালে বীর্যের জয়টীকা!

হুংকারি এস তুমি, অশুভের কর নাশ,
দম্ভের শির টুটি, হও তুমি পরকাশ!
দশায়ুধ ধরি করে, এস ধরণীর পরে,
দূর কর নিখিলের সব ব্যথা, সব ত্রাস!

বোধনের ক্ষণে আজ হ'ক তব জাগরণ,
নব প্রাণ-উপচারে হ'ক পূজা-আয়োজন!
শূন্য বেদীর তলে, এস তুমি মংগলে,
দনুজদলনি এস, করি হৃদি মণ্ডন!

ঈশ্বরের মাতৃভাব

স্বামী নিরাময়ানন্দ

আবার আশ্বিন আসিয়াছে! আকাশের ছায়াপথে ও কাহার জ্যোতির্ময় পদরেণু? বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে ও কাহার আগমনী গান? ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের বিচিত্র সংমিশ্রণে ও কাহার পূজার শত-সহস্র উপচার রচিত হইতেছে? রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের এ কি মহা-সমারোহ মানব-মনকে কাহার পূজার জন্য প্রস্তুত করিতেছে?

ছোট বড়, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই মনে কখনও না কখন একবার না একবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়—কে এ?—যাহাকে ঘিরিয়া আমাদের আনন্দ, আবার তিনটি দিনের পর যাহাকে ঘিরিয়া আমরা কাঁদি—কে এই আনন্দময়ী—মায়াময়ী?

'কেন—এ আমাদের মা'—এই ত সরল সহজ উত্তর। এই উত্তরেই কোটি কোটি মন নিরস্ত হইয়া যায়, শান্ত হইয়া যায়। আবার অশান্ত মনে প্রশ্ন ওঠে—কে মা?—কার মা? 'সকলের মা, জগতের মা—চিরকালের মা।'—অসীম নীরবতা হইতে এই উত্তর ভাসিয়া আসিয়া বুদ্ধি-চঞ্চল মনকে আবার শান্ত করিয়া দেয়।

একাক্ষর 'মা' শব্দটি কি অসংখ্য শব্দরাশি অপেক্ষা বেশীই প্রকাশ করে না? রহস্যময় 'মা' শব্দটি কি অব্যক্ত অনির্বচনীয়ার সহিত একার্থক নয়? এই সেই মহাশক্তি বা মহামায়া, যাহা সমস্ত সৃষ্টির উর্ধ্বে ও পারে—আবার সারা সৃষ্টির অণুতে মহতে অনুস্যূত, ওতপ্রোত। ইনিই সকলের মাতা, নির্মাতা; জন্মদায়িনী, জীবনবিধায়িনী; ইনিই সকলের লক্ষ্য, সকলের পথও।

আমাদের পৃথিবীর লৌকিক মায়ের কাজকর্ম ও মনোভাবের আলোচনা করিলেই আমরা বিশ্বজননীর একটি ইঙ্গিত পাইতে পারি; জল কি জিনিস জানিতে গেলে যেমন সমুদ্র মন্থন করিতে হয় না, একটি শিশির-বিন্দুই যথেষ্ট; সেখানেই সমগ্র জগৎ প্রতিফলিত—ইহাও যেন সেইরূপ।

এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের মা বা জননী সৃষ্টি ও পালনশক্তির প্রতীক বা প্রতিমূর্তি, লয়ের ভাব এখানে অব্যক্ত। মাতা সন্তানকে স্বীয় অন্তরে ধারণ করেন, জন্ম দেন ও পালন করেন। মাতাকে প্রতিক্ষণে জীবন বিসর্জন দিতে হয় যাহাতে সন্তান জীবনলাভ করে, ইহাতেই মায়ের পরিপূর্ণতা, সফলতা; মৃত্যুর মাঝেও জীবনের আস্বাদন, এ এক অপূর্ব অনুভূতি। শিশু যে মায়েরই সত্তা—মা যে শিশুরই আত্মা! শিশুর অধরে মা যে অমৃত পান করেন—শিশুর চক্ষে তিনি অসীমের প্রতিচ্ছবি দেখেন—তাহাতে তিনি আত্মহারা হন, কিন্তু ভুলিয়া যান তিনি কোন্ মহাশক্তি!

ইহাই সেই মহামায়ার মায়া। এ কথা সত্য, বিশ্বজননী প্রতিটি জননীর মাঝে প্রতিবিম্বিত। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের জননীর মাধ্যমে সেই এক জননীশক্তিই কাজ করিতেছে; তিনিই বিভিন্নরূপধারিণী হইয়া বিভিন্ন আকার ও প্রকারের সন্তানকে গর্ভে ধারণের কষ্ট সহ্য করিতেছেন—জন্ম দিয়া লালন পালনের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন—তাই ত পদকর্তা স্বীয় অনুভূতির আতিশয্যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় দিব্য দর্শনের ইঙ্গিত দিয়াছেন—'প্রতি-মা'য় মাকে দেখ।

দেখিব সেই পালনীশক্তি কতখানি ত্যাগ ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত—নিজে না খাইয়া সন্তানের মুখে আহার যোগাইতেছেন—নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে পাহারা দিতেছেন, আহার নিদ্রা উভয়ই ত্যাগ করিয়া রোগে শুশ্রূষা করিতেছেন—তাই ত আদিকবি জননী ও জন্মভূমিকে কল্পিত স্বর্গের বহু উচ্চে আসন দিয়াছেন।

এইখানেই আমরা মাতৃপূজার মূল সূত্র খুঁজিয়া পাই। সভ্যতার প্রথম উষাতেও নারী শুধু মাত্র কুটীররাণী বা গৃহলক্ষ্মী রূপেই প্রতিভাত হন নাই, মানবীয় মূর্তিতে দেবীর গৌরব লইয়াই তিনি মহিমময়ী মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নীরব ত্যাগ, সেবা, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির জন্য না চাহিয়াও তিনি সংসারের সকলের সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছেন। স্বীয় রক্তধারা দিয়া মানব-সমাজকে জন্ম দিয়া তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাহাকে লালন করিতে করিতে মানবের জীবন চরিত্র তিনিই গঠন করিতেছেন। তিনি শুধু জন্মদাত্রী নন, ভাগ্যবিধাত্রীও।

ঈশ্বরভাব কি? এ প্রশ্নটি যত গম্ভীর—তদপেক্ষা জটিল। এই প্রশ্নের উত্তরে পর্বত-প্রমাণ দর্শনশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে; তাহারই দু-একটি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া আমাদের কাজ শেষ করিব।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী; তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, সর্ব-নিয়ামক, বিচারক,—আরো কত কি! কেহ বা উপহাস করিয়া বলেন, তবে তিনি বিশ্ব-মুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি!!

মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি অনুযায়ী এবং হৃদয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ঈশ্বরভাবও পরিবর্তিত হইয়া যায়—ধর্মেতিহাসের পাঠকের নিকট ইহা স্পষ্ট; তাই ত মানুষ আজ বলিতে শিখিয়াছে—'man made God in his own image' (মানুষ তার নিজের প্রতিরূপে ভগবানকে গড়িয়াছে)। বড় বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরকে এক জন গণিতজ্ঞ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না। কবি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই অনুভব করেন। শিল্পী সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সুন্দর রচনার মুগ্ধ অনুকরণ করিয়া থাকেন। কাহারও ধারণা ঈশ্বর এক চিরশিশু—নির্জনে খেলা করিতেছে—আপন মনে বিশ্ব ভাঙিতেছে, গড়িতেছে। আবার এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁহাদের সিদ্ধান্তে তিনি নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র।

আমাদের মনের বিকাশ-অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরে বিভিন্ন ভাব আরোপ করি। সত্যই ত ঈশ্বরভাবই আমাদের মনের কল্পনার আদর্শের শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিমাপ! ইহার পর আমরা আর কিছু চিন্তা, কল্পনা, আলোচনা করিতে পারি না।

আমাদের এই ধরার ধূলি হইতে তুলিয়া ধরিবার জন্য আমাদের একজন ঈশ্বর প্রয়োজন, যিনি আমাদের মলিনতা মুছিয়া দিয়া পবিত্র করিবেন, হৃদয়ে মনে শান্তি দিবেন, অভয় আশ্রয় দিবেন; এইখানেই দর্শনের শেষ, সাধনার আরম্ভ। বিচারের শেষ, বিশ্বাসের আরম্ভ, আচরণের আরম্ভ। এই ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহার নিকটতা অনুভব করিবার জন্য কত মত কত পথ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে—সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্য—মানবজীবনে ঈশ্বরানুভূতি বা মানবাত্মারই দিব্যভাব প্রাপ্তি।

মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিব কেন? এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'মা বাপের থেকে আপন—সব থেকে নিকট, মায়ের কাছে জোর চলে। মা যতটা বোঝেন কোন ছেলের কখন কি দরকার তত আর কে বোঝে?' 'আমার মা সব জানেন, সব পারেন—মাকে বলে দেব'—প্রভুপুত্রের সহিত বিবাদেও

দাসীপুত্র মায়ের বড়াই করে, দোহাই দেয়। শিশু মাকে সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার অলঙ্কারে বিভূষিত করে—এই সূত্র হইতেই ধীরে ধীরে মাতায় ঈশ্বরভাব, এবং তাহারই অনুসিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরে মাতৃভাব আসিয়া যায়। মাতৃভাব প্রকৃতপক্ষে শক্তিভাব, অতএব পুরুষ অপেক্ষা নারীমূর্তিই শক্তির প্রতীক।

শিব নিষ্ক্রিয় পুরুষ মহাকাল, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহারই উপর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের লীলা-নৃত্য করিতেছেন—এই ত জগতের প্রকৃত ছবি,—উদ্‌ঘাটিত মহারহস্য! পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির উপর বিশ্ব জন্মিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে—আবার উঠিতেছে। তাহারই আন্দোলনে জীবজগৎ—পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, কৃমিকীট, দেবমানব—জন্ম মৃত্যুর চক্রনৃত্যে ঘুরিতেছে। আমরা যেন কাহার হাতের পুতুল, যে আমাদের নাচাইতেছে তাহার সহিত দেখা নাই; তবে—

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে
আসে।' (বিবেকানন্দ)

মা ত শুধু সুন্দর ও কোমলহৃদয়া নন; তিনি ভীষণা ভয়ঙ্করী নির্দয়া কঠোর—তিনিই সুখদুঃখবিধায়িনী, সম্পদ-বিপদ-স্বরূপিণী। আমরা ভুলিয়া যাই—দিন ও রাত্রির মত ভাল ও মন্দ একই কারণে সংঘটিত—বিশ্বজননীর একই মুখের দুই দিক। বিপরীতের এই মিলন হিন্দুর ঈশ্বরধারণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রের কালীমূর্তিতেই ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শান্ত শিবের উপর নৃত্যপরা শক্তি। সুন্দরের সহিত ভয়ঙ্করের এ কি মহামিলন! জীবের কর্মফল অনুযায়ী তিনি জন্ম দিতেছেন, তাই কটিদেশে তিনি করমালা বিভূষণা। জীবকে লালন পালন করিতেছেন, তাই তিনি পীনোন্নতপয়োধরা; আবার করাল মুখব্যাদান করিয়া মৃত্যুকালে তিনিই সংহার করিতেছেন—বিশ্বপ্রকৃতির এই নিত্যলীলার রহস্য যাঁহাদের ধ্যানদৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহাকে অসিমুণ্ডধরা বরাভয়করা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধারে জ্ঞান, ভক্তি, ভোগ ও মুক্তি সকলই দিতেছেন।

বর্তমান যুগ একটি সংকটময় সন্ধিক্ষণ। মায়ের পূজার শুভ মুহূর্ত সমাগত। জড়বাদজাত ভোগবাদের জালে মানবজীবন আজ জড়িত জর্জরিত। মদোন্মত্ত সবলের স্বার্থপরতায় শোষণে দুর্বল প্রবঞ্চিত নিপীড়িত,—বারংবার বিশ্বযুদ্ধের আয়োজনে মানব আশাহত।

এ ত আজ নূতন নয়। বহুবারই অশিবকারী দানবশক্তি দেবশক্তিকে নির্জিত পরাজিত করিয়া জগতের উপর তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছে। দেব ও ঋষিগণ নিরুপায় হইয়া জগজ্জননীর পালনীশক্তিকে আহ্বান করিয়া আরাধনা করিয়াছেন। মাও সংহত দেবশক্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, কৃষ্টি ও সভ্যতার শত্রু দেবারি-সৈন্যসমূহ লীলাচ্ছলে নিধন করিয়াছেন। মায়ের এই নিধন-যুদ্ধে নিষ্ঠুরতার সহিত কৃপার অপূর্ব সংমিশ্রণই তাঁহার সর্বজননীত্ব প্রমাণ করিতেছে; অসুরও মায়ের সন্তান—'মায়ের দুষ্টু ছেলে'—মাকে অস্বীকার করিয়া, দৈবীশক্তিকে অস্বীকার করিয়া, স্বার্থভোগে প্রমত্ত হইয়া সে মায়ের অন্যান্য সন্তানদের বঞ্চিত বিরক্ত করে। মা তাহার আসুরী-বৃত্তি বিনষ্ট করিয়া তাঁহার দৈবী সত্তায় তাহাদের ফিরাইয়া লইলেন। জগতে স্বর্গরাজ্য, দেবরাজ্য স্থাপিত হইল—কিছুদিন বেশ চলিল; আবার নূতন উৎপাত—আবার মায়ের নূতন লীলা।...

এই চলিয়াছে—চলিবে। আধ্যাত্মিকভাবের মহাশত্রু মহাসুর নিপতিত হইলে দেব ও ঋষিগণ সেই সমরক্ষেত্রেই মহিষঘ্নী মহামায়ার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। মাও প্রসন্না হইয়া

হাসিমুখে বলিলেন—"তোমরা কিছু বর চাও"। এত দিয়াও মায়ের আশা মিটিতেছে না—সন্তানকে সব কিছু দিয়াই যে মায়ের আনন্দ। কৃতকৃত্য দেবর্ষিগণ বলিলেন,—"কি আর বর চাহিব মা, তুমি ত আমাদের সব আশা পূর্ণ করিয়াছ, সব বিপদ দূর করিয়াছ; শুধু এইটুকু করিও যখনই আমাদের আপদ বিপদ আসিবে—আমরা যেন তোমাকে স্মরণ করি, আর তুমি আসিয়া আমাদের দুর্গতি দূর করিও।" 'তথাস্তু' বলিয়া জননী দুর্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

সন্তান না চাহিলে মা তাঁহাকে সবটুকু দেন না। পরাজিত সুরথ মায়ের পূজা করিয়া হৃতরাজ্য লাভ করিলেন এবং জন্মান্তরে মানবজাতির উপর আধিপত্য লাভ করিয়া মনু হইলেন। আর সমাধি চাহিলেন 'আমি-আমার রূপ আসঙ্গবিচ্যুতিকারক তত্ত্বজ্ঞান'; মাও তাঁহাকে বলিলেন,—'তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি'—তোমার জ্ঞান হইবে।
'সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।' সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সম্পদ ঐশ্বর্য দেন—আর চাহিলে পর তিনি জ্ঞানও দিয়া থাকেন।

মা চাহেন খেলাটা চলুক। ছেলেরা মায়ায় ভুলিয়া খেলায় মজিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক,—যখন আর চুষিকাঠি ভাল লাগিবে না 'মা' বলিয়া শিশু কাঁদিবে, মা তখন ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ছুটিয়া আসিবেন, শিশুকে কোলে করিয়া স্তন্যপান করাইতে। মায়ের মত কে বোঝে সন্তানের কখন কি প্রয়োজন? তাই তো মনে হয় এই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের পিছনে যে সনাতনী শক্তি রহিয়াছে সে কোন নির্লিপ্ত সাক্ষী নয়—নিরপেক্ষ বিচারক নয়—কোন শাসক রাজা প্রভু নয়—সে মা, সন্তানস্নেহ-বিহ্বলা, 'সর্বস্যার্তিহরা' 'পরিত্রাণপরায়ণা' মা।

মায়ের মত ভালবাসার পাত্র আর কে আছে? আর কি থাকিতে পারে?—মায়ের মত মধুর মায়ের মত পবিত্র? মায়ের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয়? মা শক্তি ও শান্তির ঘনীভূত মূর্তি!

তাই তো সাধনার পথে মাতৃভাব সহজ ও নিরাপদ পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মাতৃভাব শুদ্ধভাব। আর সকল ভাবে ভয় আছে, নয় বিপদ আছে, দেনা পাওনা আছে, কিন্তু মাতৃভাব অতি সহজ সরল, সকলের অনুভূতির মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এই মাতৃভাবেরই বিস্তৃত লীলা। এখনও যদি প্রশ্ন হয়—কি এই মাতৃভাব? তাহার উত্তরে বলি—

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন
ঠারে ঠোরে॥

"সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম,—সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা। * * * রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! * * * দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতো-মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা। * * * দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল! তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!

উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী। মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (কমলাকান্তের দপ্তর)

কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

'বনফুল'

সনাতন এ অশ্বত্থ নিম্নে শাখা প্রসারিয়া
উর্দ্ধমূল রহে
ইনি শুক্র, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে
অতিক্রম কেহ এঁরে করিতে না পারে
সর্ব্বলোক স্থিত এ আধারে ॥ ১ ॥

তাঁহা হ'তে নিঃসৃত জগতে যা' কিছু সবই
প্রাণ-স্পন্দমান
উদ্যত বজ্রসম ভয়ঙ্কর তাঁরে
প্রত্যক্ষ করেন যিনি অমরত্ব পান ॥ ২ ॥

এঁরই ভয়ে অগ্নি সূর্য্য করে তাপদান
ইন্দ্র, বায়ু, পঞ্চম মৃত্যুও
এঁরই ভয়ে সদা ধাবমান ॥ ৩ ॥

শরীর-নাশের পূর্ব্বে কেহ যদি তাঁরে
না জানিতে পারে
জীবলোকে জন্ম তার ঘটে বারে বারে ॥ ৪ ॥

দর্পণে অথবা স্বপ্নে কিম্বা সলিলেতে
হয় যথা প্রতিবিম্বাভাস
আত্মায় পিতৃলোকে গন্ধর্ব্বলোকেতে
অনুরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ
ব্রহ্মলোকে তিনি নিরুপম
আলো-ছায়া সম ॥ ৫ ॥

উৎপত্তি পৃথক জানি প্রতি ইন্দ্রিয়ের
তাহাদের উদয়াস্ত করি প্রণিধান
বীতশোক হ'ন জ্ঞানবান ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে রহে মন,
তার উর্দ্ধে বুদ্ধি উত্তম
বুদ্ধি হ'তে আরও উর্দ্ধে মহান আত্মাই
উর্দ্ধতম অব্যক্ত পরম ॥ ৭ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অ-কায়
এঁরে জানি মুক্ত হয় জীব, অমরত্ব পায় ॥ ৮ ॥

এঁর রূপ দর্শন-অতীত
চক্ষু দিয়া দেখা নাহি যায়
হৃদয়েতে মনীষায় মানসেতে ইঁহার প্রকাশ,
যে জানে সে অমরত্ব পায় ॥ ৯ ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যবে মন সহ স্থির ভাবে করে অবস্থান
বুদ্ধি যবে অচেষ্টিত রহে
তারেই পরমাগতি কহে ॥ ১০ ॥

এই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণ—এরই নাম 'যোগ'
অপ্রমত্ত ইহার লক্ষণ, এরও আছে উৎপত্তি বিয়োগ
॥ ১১ ॥

বাক্য দিয়া মন দিয়া চক্ষু দিয়া মেলে না তাঁহারে
"আছেন" বলেন যাঁরা তাঁহারা ব্যতীত অন্যে
উপলব্ধি করিতে না পারে ॥ ১২ ॥

আস্তিক্য-বুদ্ধি আর তত্ত্ব-রূপেতে
দুইভাবে বুঝিবার আছে অবকাশ
"আছেন" ভাবেন যাঁরা তাঁহাদেরই কাছে এঁর
প্রকৃত প্রকাশ ॥ ১৩ ॥

যে সব কামনাকুল মানবের হৃদয়ে আশ্রিত
সে সবের করিলে মোচন
মর্ত্ত্যই অমৃত হয়, ঘটে এই দেহে
ব্রহ্ম-দরশন ॥ ১৪ ॥

হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হলে এই জীবনেই
মর্ত্ত্যই অমৃত হয়—শাস্ত্রের উপদেশ এই ॥ ১৫ ॥

একশত এক নাড়ী আছে হৃদয়ের
তন্মধ্যে একটিরই * মূর্দ্ধামুখী গতি
এরই দ্বারা ঊর্দ্ধলোকে গমন করিয়া
পায় লোকে অমর-সদ্গতি
ভিন্ন দিকে প্রসারিত অন্যগুলি দিয়া
হয় বহির্গতি ॥ ১৬ ॥

পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মা তিনি
সর্ব্বজন-অন্তর-নিহিত
মুঞ্জ শীর্ষ † সম তাঁরে দেহ হ'তে করহ পৃথক
হয়ে অবহিত
জান জান ইনি শুক্র, ইনিই অমৃত
জান জান ইনি শুক্র ইনিই অমৃত ॥ ১৭ ॥

নচিকেতা মৃত্যু-উক্ত এই বিদ্যা লভি
প্রাপ্ত হয়ে সর্ব্ব-যোগ-ফল
মৃত্যুহীন রজঃহীন ব্রহ্ম-লাভ করিলেন
পবিত্র নির্ম্মল
অন্য কেহ এ অধ্যাত্মজ্ঞান যদি লভে
তাহারও ওই গতি হবে ॥

* ইহার নাম সুষুম্না

† মুঞ্জ একপ্রকার ঘাস

সমাপ্ত

শক্তিপূজারী ভারতবর্ষ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

ভারতবর্ষ মাতৃপূজার ভূমি। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোথাও নারীমাত্রই মাতৃদৃষ্টিতে অবলোকিত হন না। পৃথিবীর সর্বদেশেই স্ত্রীলোক ভোগ্যারূপে সর্বাগ্রে সমাদৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা একমাত্র ভারতেরই বৈশিষ্ট্য যে, এখানে নারী জগন্মাতার অংশরূপে পূজিতা হন।

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে আধ্যাত্মিকতার অতুল সম্পদ নিহিত রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্মসাধনায় এবং দার্শনিক চিন্তায় ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম শক্তিবিহীনরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতে সমর্থ নন। সুতরাং ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নরূপতা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ নানাভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপিনী শক্তির উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। এই শক্তির উপাসনাই ভারতের প্রাণ এবং শত শত ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষত থাকিবার কারণ।

বেদে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনার কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টক দশম মণ্ডলে রাত্রিসূক্তের মধ্যে দেখিতে পাই ব্রহ্ম শক্তিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখানে শক্তিরূপিণী দেবীর

যে রূপের বর্ণনা এবং উহার যে ভীষণতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, বৈদিক যুগেও কালীরূপে শক্তির উপাসনা অবিদিত ছিল না। রাত্রিসূক্তের মধ্যে বিশ্বশক্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে—

আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরং প্রায়ু ধামভিঃ
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ততে তমঃ
যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
রাত্রীং প্রপদ্যে জননীং সর্বভূতনিবেশিনীম্॥
ইত্যাদি

রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। রাত্রিদেবী সকলকেই আচ্ছন্ন করিলেন। সকল ভূতবর্গ তাঁহাতে আশ্রয় লইয়াছে।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে ঋষি কন্যা 'বাক্' আত্মসাক্ষাৎকারের পর বিশ্বশক্তির সহিত নিজেকে অভিন্ন উপলব্ধি করিয়াছিলেন—রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনী, বিশ্বদেব, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির প্রশাসিতারূপে নিজেকে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। যে সৃজনী, পালনী, এবং সংহরণী শক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের সেই অনন্ত শক্তির সহিত তাদাত্ম্যবোধ হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং,
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা,
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্,
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা,
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥"

এই দেবীসূক্তের মধ্যে ব্রহ্মই শক্তিরূপে বিরাজমান। ঋক্ বেদের সপ্তম মণ্ডলে ৭৬, ৭৭, ৭৮ সূক্তে যে উষার স্তুতি করা হইয়াছে, তাহাতে দেবী মূর্তির কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই শক্তিরূপিণী দেবীমূর্তি সমস্ত বিশ্বের পালয়িত্রীরূপে স্তুতা হইয়াছেন। দেবগণের চক্ষুঃস্থানীয়া সুভগা, স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা উষা সকলকে রমণীয় মহৎ ধন দান করেন।

উপনিষদের যুগকে বেদ হইতে পৃথক করিয়া বিচার করিলে অযৌক্তিক হইবে। কারণ বেদেরই অন্তভাগ উপনিষদ—উপনিষদে শক্তি ভিন্নরূপে উপাসিত হইয়াছে। জ্ঞানমূলক উপনিষদ শক্তিরূপিণী অবিদ্যা অথবা মায়াকে কোন বিশিষ্টরূপে রূপায়িত করিয়া আরাধনার বিধান দেয় নাই, কিন্তু এই অবিদ্যাকেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের সাক্ষাৎ কারণ রূপে নির্দেশ করিয়াছে। আবরণবিক্ষেপাত্মিকা অবিদ্যাই নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে প্রধান সহায়। মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে কিছু পৃথক বস্তু নহে; যদি পৃথক বস্তু হইত তবে নিত্য, নির্গুণ, অদ্বয় ব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্টি-কার্যে অন্য নিত্য পদার্থের অপেক্ষা করিলে সেই বস্তুও নিত্য হইয়া পড়িত এবং তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বে বাধা হইত; আরও একটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি ঘটিত। সুতরাং মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের সৃজনী শক্তির রূপমাত্র। এই ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নতা পরমহংসদেব উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অতি লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া গেলেন—'সাপ আর তার তির্যকৃগতি। অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি।' ইত্যাদি। বেদ এবং উপনিষদকে পৃথকরূপে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। কারণ, উপনিষদ অখণ্ড বেদের অংশমাত্র। কেনোপনিষদের মধ্যে উক্ত হইয়াছে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি

সকলেই একে একে ব্রহ্ম কি বস্তু জানিতে যাইতেছেন, কিন্তু কেহই শেষ পর্যন্ত জানিতে পারিলেন না। অতঃপর ইন্দ্র গেলেন এবং এক স্ত্রীমূর্তি দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্র জানিতেন এই হৈমবতী মূর্তি ব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং তিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনে সমর্থা হইবেন। (কেনোপনিষদ)

বৃহদারণ্যকোপনিষদে গার্গীর আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় যে আত্মজ্ঞানলাভের অধিকারিণী নারী সর্বজনপূজিতা হইতেন। মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইল মনুষ্যত্বের অনন্তকালের জিজ্ঞাসা,—

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'

বহু স্ত্রী-ঋষির পরিচয় হইতে বুঝা যায় ভারতীয় ভাবধারায় শক্তির আদর প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় নারীর মধ্যে এই ব্রহ্মের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে যে পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, বাস্তব জগতে আমরা নারীকেই এই প্রকৃতিরূপে দেখিতে পাই। দেবকুল হইতেই ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলে নারীমূর্তির কামগন্ধহীন পূজার প্রথম প্রচার। উপনিষদপ্রাণ ঋষি দেবীমহিমা প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া গাহিলেন—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

শুক্লকৃষ্ণরক্তবর্ণা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, অনন্যসম্ভবা এক অপূর্বা নারী অনন্যসম্ভব এক পুরুষের সহিত সংযুক্তা থাকিয়া আপনার অনুরূপ বহু প্রকারের প্রজাসকল সৃজন করিতেছেন।

আত্মস্বরূপে বর্তমানা দেবীমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

'ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।'
(বৃঃ উঃ, ৪-৫-৬)

ঋষিবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ভগবান মনু আবার গাহিলেন—

'দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥'
(মনু—১-৩২)

নারীর ভিতর জগৎ-প্রসূতির বিশেষ শক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াই ভারতের ঋষিকুল উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা—জগজ্জননীর হ্লাদিনী, সৃজনী ও পালনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

তারপর রামায়ণে ভগবানের শক্তি সীতা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। অনন্তলীলাময় ভগবান তাঁহার শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই লীলা করিয়া থাকেন।

'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।'
(গীতা ৪।৬)

সীতা যে জীবন ভারতের ইতিহাসে প্রদর্শন করিলেন তাহাই ভারতবাসীর পক্ষে আদর্শ হইয়া রহিল। উনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রবর্তক স্বামিজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী।' এই ভারতভূমি সে আদর্শ যে ভুলিতে পারে না,—ভারতভূমির আকাশে বাতাসে প্রতিটি মৃত্তিকা ও উপলখণ্ডে সীতার জীবনাদর্শের প্রাণবন্ত স্পর্শ সজীব ও সতেজ রহিয়াছে। পুনরায় স্বামিজী বলিলেন,—"যতদিন ভারতে একটি নদী বা একটি পর্বতও থাকিবে ততদিন সীতার আদর্শ চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" এই সীতা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্র সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শৌর্য, বীর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, শীলতা, নম্রতা, পবিত্রতা ভারতীয় সমস্ত গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন

নারীচরিত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কৌশল্যার আত্মত্যাগ, সুমিত্রার সহনশীলতা ইতিহাসে উজ্জ্বল কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। আজিও ভারতবাসী মহীয়সী নারীর চরিত্র প্রদর্শনকালে ইঁহাদেরই স্থান সর্বাগ্রে প্রদান করে।

মহাভারতেও এই ব্রহ্মশক্তি নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিতে পাই। বিভিন্ন নারীচরিত্রে তাহার বিভিন্নরূপ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। গান্ধারীর চরিত্রে অপূর্ব ধর্মভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সাহসিকতা, বীর্য, ধৃতির প্রতিমূর্তি বিদুলা,—ভক্তি ও সহনশীলতার আদর্শ কুন্তী প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে নারীচরিত্রের ঔজ্জ্বল্য ভারতীয় শক্তি বিকাশের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত সাবিত্রী, শৈব্যা দময়ন্তী ইত্যাদি স্ত্রীচরিত্রে অনন্তশক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগে শক্তির বিকাশ যে হইয়াছিল তাহার বিশেষ পরিচয় মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। দেবাসুর সংগ্রামে অসুরের পরাভবের নিমিত্ত মহামায়া (শক্তি) দেবতাদির তপস্যার পুঞ্জীভূত ফলস্বরূপ আত্মরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

'অতুলং তত্র তত্তেজো সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥'

সমস্ত দেবতার শরীরজাত যে তেজ তাহাই নারীমূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই দেবীমূর্তি বিশ্বের সমস্ত শক্তির আধারভূতা। সেইজন্য 'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ...।' ইত্যাদি শ্লোকে যে স্তুতি করা হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—

'সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ।'

তন্ত্রের যুগে শক্তির যে বিশেষ উপাসনা ভারতবর্ষ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তন্ত্রমধ্যে স্ত্রীচক্রের প্রবর্তন নারীকে বিশ্বশক্তি রূপে পরিকল্পনা করিবারই পরিচায়ক। তন্ত্রের মধ্যে আত্মাশক্তির বিভিন্নরূপে উপাসনার বিধান রহিয়াছে। তন্ত্রে নির্দিষ্ট মাতৃভাব, বীরভাব ইত্যাদি সাধনায় এই ব্রহ্মশক্তিকে মাতৃরূপে বা স্ত্রীরূপে আরাধনার বিধান করা হইয়াছে।

'প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাঽসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥'

ইত্যাদি স্তুতির মধ্যে শক্তিরূপিণী কালিকা দেবীকে সমস্ত জগতের স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহর্তা রূপে স্তুতি করা হইয়াছে। ভারতের তন্ত্র নারীর মাতৃ ও জায়ারূপ উভয় ভাবের উপাসনার প্রবর্তন করিয়া নারীপ্রতীকে বিশ্বজননীর উপাসনা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিলেন।

বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই তন্ত্রের প্রভাব সমস্ত দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কোন একটি ভাবের উত্থান হইলে কিছুকাল পরে দেশের জনগণ যখন তাহার যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে না তখনই সেই ভাব বিকৃত হয়। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবরাজ্যেও বিপ্লব সুরু হয়। ভগবান বুদ্ধ যে অমোঘ প্রেমের বাণী লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন যুগের প্রয়োজনে তাহার আবির্ভাব এই ভারতবর্ষেই অনিবার্য ছিল। ভগবান বুদ্ধ সন্ন্যাসধর্মের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গেলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি, ভারতের বৈদিক যুগ হইতে অনুসৃত যে সকল শক্তি-উপাসনা, তাহার পক্ষে তো কোন কথাই বলেন নাই, কোন দেবদেবীর উপাসনার বিধান তো তিনি দেন নাই, এমন কি শক্তি-মূর্তির কল্পনাও তিনি করেন নাই। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ স্ত্রীলোককেও সন্ন্যাসের অধিকার

প্রদান করিয়া দেখাইলেন যে তাহাতেও চিৎশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের সুযোগ দান করিয়া নারীশক্তির মর্যাদা বাড়াইয়া গেলেন। "সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২-১-৩০)*—আমরা এই ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাই—উপেতা এখানে স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার হইয়াছে। দার্শনিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা যায় পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসা সমস্ত কার্যের সম্পাদিকারূপে শক্তি স্বীকার করিয়াছে। কার্যের কারণের যে কারণত্ব তাহাও শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে কার্যের অনুকূল শক্তি যাহাতে নাই তাহা সেই কার্যের কারণ হইতে পারে না। এজন্য পূর্বোত্তর মীমাংসা দর্শনে কারণতা বিচারে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, শক্তি সমস্ত কারণের কারণত্ব-সম্পাদিকা। আর একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেতাশ্বতর উঃ)। এই শক্তির অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু বাদ-বিবাদ দর্শনশাস্ত্রে থাকিলেও পূর্বোত্তর মীমাংসা দর্শন বহুতর শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে এই শক্তির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তাঁহার আনন্দলহরীর শ্লোকে শক্তির মহিমা এইভাবে প্রচার করিয়াছেন—

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥'

শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের ৫০০ বৎসরের ঘটনা-সংঘাতে যে আবিলতা ধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দূরীভূত করিবার জন্যই যেন আবির্ভূত হইলেন। প্রপঞ্চসার তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে শঙ্করাচার্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই সত্য, আর সকল বস্তুর কোন পারমার্থিক সত্ত্বা নাই এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন তিনিই আবার দেবী-স্তুতি-রচনাকালে দেবীর উদ্দেশে বলিতেছেন—

"যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্বৈশ্বর্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

* * *

মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী * * *
ওঙ্কারবীজাক্ষরী"·· ইত্যাদি।

শঙ্করের পরবর্তী অবতারপুরুষাদির জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা প্রায় সকলেই শক্তির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশেষভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। অন্যান্য অবতারপুরুষাদির আলোচনা না করিয়া বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভগবান যে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারই বিষয় আলোচনা করিব। যে ভারতবর্ষ আবহমানকাল হইতে শক্তির উপাসনা করিয়া আসিয়াছে সেই ভারতভূমিতে শক্তির অবমাননা দেখা দিয়াছিল। ধনমদে মত্ত, ভোগৈকলক্ষ্য, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী তাহার শাশ্বত সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নারীমূর্তিকে যখন সম্পূর্ণরূপে ভোগ্যদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং অনন্ত-শক্তির আধার স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে কিছুই চিন্তা করিল না, তখনই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিজের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ-রূপধারণ করিলেন। নিজে নরলীলায় শক্তির মর্যাদা কিরূপে করিতে হয় তাহাই দেখাইয়া গেলেন। তাঁহার জীবন ও বাণীর যথোপযুক্ত

---

* এই সূত্রে ব্রহ্মকে স্ত্রীলিঙ্গ পদ দ্বারা নির্দেশ করায় শক্তিই জগজ্জননী ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় প্রকটিত হইয়াছে। অন্যথা সূত্রকার কখনও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ করিতেন না। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য তাঁহার শ্রীকণ্ঠভাষ্যে শক্তিপ্রাধান্যেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

টীকা ও ভাষ্য করিবার জন্য যুগপ্রবর্তক আচার্যের প্রয়োজন হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ রূপ পরিগ্রহ করিলেন। শ্রীরাম-কৃষ্ণাবতারের গূঢ় রহস্য স্বামিজীর বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল— "* * সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে— স্ত্রীগুরুগ্রহণ, নারীভাবসাধন। সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" "মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পার নি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এইরূপ শুদ্ধ ভাবের শক্তিপূজা বিশ্বের কোন জাতিই প্রত্যক্ষ করে নাই। সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করাই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ-রূপ গ্রহণ করিয়া এই সাধনা অনুষ্ঠানে লোকশিক্ষা প্রদান করিলেন। এই ভারতভূমি মাতৃশক্তিতে শক্তিমতী। আবহমান কাল হইতে শক্তির পূজা করিয়া ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে মহাশক্তির অনুরণন ধ্বনিত হইতেছে। মহাশক্তির আধার ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। শক্তির মর্যাদা যথাযথ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এ সকল সৃষ্টির মধ্যে যে মহাশক্তির বিকাশ, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করার মধ্যেই আমাদের পরম শ্রেয় নিহিত রহিয়াছে।

অন্নদাত্রী আজি অন্ন মাগে

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ রায়, কাব্যশ্রী

শতাব্দীর ক্লীবতার তলে সভ্যতার কাল হলাহল,
অবিচার, অত্যাচার, ছল,
আপন শিয়রে তু'লে মরণেরে ক'রেছে বরণ,
ভুখার শ্মশান-বুকে বেঁচে রহে ধ্বংসের বাহন
সর্বহারা বাঙ্গালা আমার!
অবিরাম ব্যগ্রতায় খোঁজে কোথা' পথ বাঁচিবার।
জীবনের সকল আস্বাদ
নিবিড় নৈরাশ্যে শুধু আজ, তো'লে তা'র ব্যর্থ আর্তনাদ

২

বুভুক্ষুরে করিয়া বঞ্চিত কণ্ঠে গাহে যৌবনের গান,
এ পৃথিবী নির্মম পাষাণ।
বিকৃত পৌরুষ ল'য়ে উদ্ধত সে দস্যুর গৌরবে,
সুরা ও সাকীর মোহে দৃষ্টি তা'র হারা'য়েছে কবে!
এ দশা সে দেখিবে কেমনে
দ্বারে তা'র ভিখারী বাঙ্গালা মাগিতেছে সজল নয়নে
দু'মুঠি ক্ষুধার অন্ন ?···হায়!!
ক্ষুধাতুর ধূলায় লুটায় মত্তা ধরা ফিরে নাহি চায়!

৩

কিবা তা'র নাহি ছিল ওরে, জীবনের সহায়-সম্পদ
প্রেম শান্তি বিপুল বিশদ।
বিশ্বেরে বিলা'য়ে দে'ছে আপনারে আপনার করে,
যোগা'য়ে এসেছে অন্ন যুগে যুগে সস্নেহে আদরে;
(সেই) অন্নদাত্রী আজি অন্ন মাগে,—
তা'র মুখে ওরে পৃথ্বি, অন্ন দাও, প্রাণ দাও আগে,
কণ্ঠে দাও আনন্দের গান,
স্বপ্ন ছাড়ি' চে'য়ে দেখ আজ, মা যে কাঁদে রাত্রি-দিনমান।

প্রাচীন ভারতে নারী*

স্বামী বিরজানন্দ

প্রাচীন ঋষিগণের যুগে—যে সময়ে ছিল বেদ এবং পুরাণের অভ্যুদয় ও প্রসার, সনাতন ভারত-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় দীপ্তিময়ী বহু প্রতিভাশালিনী মহীয়সী নারী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। এই রমণীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রের সহিত সামান্য পরিচয় থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, তাঁহারা যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—উহা নারীশিক্ষার বিশেষ অনুকূল ছিল, পুরুষের ন্যায় নারীকেও তখন বিদ্যার্জনে এবং জীবনের সর্বপ্রকার উন্নতিলাভে সমান সুযোগ দেওয়া হইত। 'পুরুষের সেবা করিবার জন্যই নারীর জন্ম ও গৃহকর্ম-সম্পাদনেই তাহার সকল সার্থকতা, অতএব তাহার শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই'—আজকালকার একশ্রেণীর হিন্দুগণের এই ধারণা নিতান্তই অসার। এই

* Prabuddha Bharata পত্রিকায় বহুবৎসর পূর্বে প্রকাশিত লোকান্তরিত লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীমতী আশা দেবী, এম্‌-এ কর্তৃক অনূদিত।

শোচনীয় ভ্রান্তির মূল কারণ স্বার্থপরতা ও একদেশদর্শিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উক্ত মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা এ দেশের পূর্বতন নারীগণের কীর্তিকলাপে সমুদ্ভাসিত প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের সহিত পরিচিত নহেন অথবা তাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধঃপতিত যুগের অস্বাস্থ্যকর প্রথাকে অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। ইতিহাসের ছাত্রেরা জানেন, মধ্যযুগে হিন্দুস্থানে মুসলমানগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে দেশের কোমলস্বভাবা নারী-জাতিকে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বহু শতাব্দীর সন্ত্রাস-শাসন ও অরাজকতার কুফলেই নারীগণ বর্তমান দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, যে অবস্থার বিষময় ফলে নারীগণের প্রকৃত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল বর্তমানে সে অবস্থা আর নাই। দীর্ঘকালব্যাপী দমন এবং নির্যাতনের পরিণামে হিন্দুনারীর জীবন-প্রগতিতে যে অচল অবনত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এখন আমাদিগকে তাহার সহিত দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

যে যুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জড়তা এবং অধোগতি হয় প্রবল, সে যুগে ইহাই বোধ করি ভবিতব্য যে, নিজেদের দুর্বল ও পঙ্গু অবস্থার জন্য যে সকল সমস্যার প্রতীকার মানুষের সাধ্যাতীত, সেই সব বিষয়ে নানা প্রকার নির্বোধ ধারণা জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া বসে। নারী প্রাচীন আর্যগণের জ্ঞান-ভাণ্ডারস্বরূপ বেদপাঠ করিবে না এবং এমন কোন কাজে ব্যাপৃত হইবে না যাহা দ্বারা তাহাদের মন ও বুদ্ধি পূর্ণভাবে বিকশিত ও উন্নত হয়, যাহাতে তাহারা উচ্চতম গুণরাজিতে পুরুষের সমকক্ষ বা তাহাদের চেয়েও বড় হইতে পারে—জনসাধারণের এই ধরনের সংকীর্ণ মনো-ভাবের উহাই বোধ করি প্রকৃত ব্যাখ্যা। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নাই ইহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি অনায়াসেই জানিতে পারেন।

প্রাচীনকালে পবিত্র শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় নারীগণের সর্বপ্রকার অধিকার এবং সুযোগ ছিল। এখনই বরং উহা পুরুষজাতির একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গরূপে বিবেচিত হইতেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ঋগ্বেদের ৫।৬১।৬ মন্ত্র, উহার সায়ণভাষ্য; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।৩।৩ মন্ত্র এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।৪।৩ উক্তি উল্লেখ করিতে পারি। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৩১ সংখ্যক সূক্তে স্ত্রী যে স্বামীর সমান তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের শেষে সৃষ্টিকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া যত ঋষি-মাতা ও তাঁহাদের পুত্রদিগের ধারাবাহিক বংশপরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এই অংশের উপর আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে বলেন,—"এক্ষণে বংশপরিচয় সম্পূর্ণ হইল। প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অধ্যায়ে নারীগণের বিশেষ প্রাধান্যের জন্য মাতার পরিচয় দ্বারাই আচার্যগণের পরম্পরাক্রম বর্ণিত হইয়াছে।"

মনু বলেন—

'দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥'

(মনুসংহিতা, ১।৩২)

অর্থাৎ :—সেই ব্রহ্মা নিজ দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একার্ধে পুরুষ ও অপরার্ধে নারী হইয়া-ছিলেন এবং সেই নারীতে বিরাট (বিশ্বপ্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণেও এই বিষয় বর্ণিত আছে। এইসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা নরনারীর সমানত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, সাম্যনীতির মৌলিক ভিত্তি অনুসারেও সমভাবে বিভক্ত বস্তু-মাত্রের দুই অংশই উক্ত বস্তুর গুণ সমভাবে ধারণ করে। যেমন, একটি ফলকে যদি দুই

সমান অংশে ভাগ করা হয় তাহা হইলে দুই টুকরাতেই ফলটির নৈসর্গিক ধর্ম ও গুণ সমান-ভাবে থাকে না কি? উপরোক্ত আলোচনা হইতে নর ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার ও সুবিধা দৃঢ়ভাবেই সমর্থিত হয়।

নারীর যে সকল অধিকার লইয়া মতভেদ আছে তাহাদের মধ্যে বিদ্যার্জনই প্রধান। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের কি উক্তি প্রথমে তাহা দেখা যাক্। হারীত বলেন—

'দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোদ্বাহাশ্চ,
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং
স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি ॥'

অর্থাৎ পুরাকালে দুই প্রকার স্ত্রীলোক ছিলেন, ব্রহ্মবাদিনী এবং বিবাহিতা; ব্রহ্মবাদিনীগণের উপবীত ধারণ, যজ্ঞাগ্নি পরিচর্যা, বেদপাঠ এবং স্বগৃহে ভিক্ষচর্যার অধিকার ছিল।

যমস্মৃতিকার প্রায় একরূপই লিখিয়াছেন। যমস্মৃতি স্পষ্টতই নারীগণের সমগ্রবেদপাঠ অনুমোদন করেন, নতুবা, "তোমার পত্নীকে বেদশিক্ষা দান কর এবং তাহার নিকট উহা ব্যাখ্যা কর"—এই প্রকার উপদেশের কোন অর্থ হয় না। সত্য, এই বিষয়ে কোন কোন শাস্ত্রে (যথা—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৪।২৫ শ্লোকে) নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, কিন্তু ঐ নিষেধাজ্ঞা কেবল অতিশয় সাধারণ নারীগণের জন্যই। তাহাদের জন্য পুরাণ এবং ইতিহাস শ্রবণের নির্দেশ করা হইয়াছে। উহার দ্বারাই তাহারা ধর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ উন্নত প্রকৃতির নারীগণের বেদপাঠে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁহারা যে উচ্চ জীবন যাপন এবং তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন তাহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ব্যোম-সংহিতার ঘোষণা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট মনে হয়। যথা,—"রমণী, শূদ্র এবং নিম্নতর ব্রাহ্মণগণের কেবল তন্ত্রেই অধিকার। শ্রেষ্ঠতর নারীগণের বেদপাঠে অধিকার আছে। উর্বশী, যমী, শচী এবং অন্যান্য নারীগণের বিষয়ে উহা জানা যায়।" ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে আমরা জানিতে পারি মাতাই তাঁহার পুত্রগণের বিদ্যা-দানের প্রথম আচার্য। উক্ত বেদের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে মমতা নামে এক রমণী বেদমন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শিনী ছিলেন। আবার অপর একটি স্থলে ধর্মশিক্ষয়িত্রীরূপে ইলা নামে জনৈক মহিলার কথা উল্লিখিত আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের, সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানের কাহিনী সর্বজনবিদিত।

যদিও ঋগ্বেদে একথা বলা হইয়াছে যে, নারীগণ তাহাদের স্বামীর সহিত একত্রে ধর্মানুষ্ঠান করিবে কিন্তু বিশ্ববারার ক্ষেত্রে (ঋঃ বেঃ, ৫।২৮) দেখিতে পাই তিনি স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্ত্রী, স্বয়ং যজ্ঞে আহুতি দিতেছেন এবং পুরোহিত-গণকে অভিষিক্ত করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, যজ্ঞের বিশদ পরিচালনায় তিনিই পুরো-হিতগণের উপদেষ্ট্রী। উক্ত বেদেই আমরা জানিতে পারি যে ঘোষা, অপালা, ঘৃতাচী, প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ স্বাধীনভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোক যদি সমর্থা এবং কুশলা হইতেন তাহা হইলে কখনও তাঁহাকে কোন অধিকার হইতে তখন বঞ্চিতা করা হইত না।

ঋগ্বেদে (১।১২৪) নারীর দায়াধিকারের বিষয় বর্ণিত আছে। দরিদ্র নারীগণ কায়িক-শ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতেন, রাজাও তাঁহাদিগকে কাজ দিতেন। উক্ত বেদেই (১০।১০৮) উল্লিখিত আছে, কিরূপে সরমা নাম্নী জনৈকা মহিলা স্বামী কর্তৃক দস্যুগণের অন্বেষণে প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইলেন

এবং নিহত করিলেন। রাজা নমুচী তাঁহার পত্নী সৈনিকীকে শত্রুদমন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। (ঋঃ বেঃ, ৫।৩০)। বোদ্ধ্মতী (১।১১৭) নামে অপর একজন নারীর বিষয়ও এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্পালা নাম্নী অপর একজন রমণীও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্তমান হিন্দুগণের এবং হিন্দু-নারীগণের এ সকল কথা বিশ্বাস হইবে কি? ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ১২৬ সূক্তের ঋষি ছিলেন রোমশা। ঐ মণ্ডলেরই ১৭৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী দেখিতে পাই লোপমুদ্রা। অদিতি অপর একজন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন (ঋগ্বেদ, ৪র্থ মণ্ডল, ১৮।৫,৬,৭; ও ১০ম মণ্ডল ৭২ সূক্ত)। সংক্ষেপে বিশ্বাবারা, শাশ্বতী, অপালা, শ্রদ্ধা, যমী, ঘোষা, অগস্ত্যস্বসা সূর্যা, দক্ষিণা, সরমা, যুহু, বাক্ প্রভৃতির নাম বেদের মন্ত্রদ্রষ্ট্রীরূপে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগকে দেখিতে পাই ধর্মপ্রাণা, কর্তব্যপরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া, বেদজ্ঞা, যাগযজ্ঞাদিরতা, গৃহকর্মে দক্ষা আবার যুদ্ধশাস্ত্রেও নিপুণা, পবিত্রবেদমন্ত্রের গায়িকা এবং আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বিচারে সমর্থা। যে হিন্দুনারী অধুনা শিক্ষাদীক্ষাহীনা, 'অবলা' তাঁহারাই বৈদিকযুগে কিরূপ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ এই সকল নারীগণের এবং আরও বহু নারীর নাম সমগ্র ঋগ্বেদে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

নারীগণ যে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিতেন এবং যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত ও রক্ষা করিবার অধিকারিণী ছিলেন তাহা অশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্র হইতেও জানিতে পারা যায়। বিবাহের সময় পুরোহিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট আদেশসমূহ উচ্চারণ করিতেছেন, "ধর্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম্" অর্থাৎ, এই বধূ ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ লাভের জন্য কর্মানুষ্ঠানে তোমা কর্তৃক পশ্চাতে রক্ষিতা হইবেন না। বর উত্তর প্রদান করিতেছেন, "নাতিচরামি" অর্থাৎ, না, আমি তাঁহার অগ্রে যাইব না। এই কথাগুলি যথেষ্টরূপে প্রমাণ করে যে ধর্মার্থকামের জন্য কর্মানুষ্ঠানে নারীগণের পূর্ণ অধিকার ছিল। সাংখ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র ও উহার ভাষ্য হইতেও ইহা দেখানো যাইতে পারে।

যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় পবিত্র অগ্নির সম্মুখে পাঠ করিবার জন্য কতকগুলি মন্ত্র ও প্রার্থনা আছে। এইগুলি বিশেষরূপে নারীদের জন্যই লিখিত (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।১।১০)। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের কতকগুলি মন্ত্রে (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যথা,—৩।৮।১০; ৩।৯।৫—৮) নারী-গণের মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা উচ্চতর জ্ঞান, বিচার, কর্মদক্ষতা, উপাসনানুরাগ, অসৎ হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য, পতির প্রিয়পাত্রী হইবার এবং ঐশ্বর্য ও সন্তানলাভ করিবার জন্য এবং আবৈধব্য আহারের পূর্বে আদিত্যের অর্চনার জন্য ঐ মন্ত্রগুলি ব্যবহার করিতেন।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের (১১।৬।১৮) মতানুসারে পতি এবং পত্নীর মধ্যে স্বার্থের কোন পার্থক্য নাই (১৬)। বিবাহের সময় হইতেই সকল কার্য একত্রে অনুষ্ঠিত হইবে (১৭), ধর্মানুষ্ঠানের ফললাভের বিষয়েও তাহাই, (১৯)। পতি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, পত্নী দানকার্য ও প্রাত্যহিক কর্তব্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন এবং ঐরূপ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা পত্নীর যাহা নিজের নহে তাহা লওয়ার অর্থাৎ চৌর্যের অপরাধ হয় না (৩০), ইত্যাদি। এই বিষয়ে উজ্জ্বলদত্ত তাঁহার ভাষ্যে বলেন,—"সম্পত্তি যদি কেবল পতির বলিয়াই গণ্য হইত তাহা হইলে এই কার্যের দ্বারা পত্নীর চৌর্যাপরাধ হইত।"

প্রাচীন ভারতে নববিবাহিতা বালিকার প্রতি কিরূপ সম্মান, স্নেহ এবং সৌহার্দ্যের ভাব

পোষণ করা হইত সে বিষয়ে সামবেদ সংহিতার কতকগুলি মন্ত্র (১, ৪, ৫) সাক্ষ্য প্রদান করে। কয়েকটি মন্ত্রের সায়নভাষ্য হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত অনুবাদে ইহা প্রমাণিত হইবে। "হে মহাভাগে, পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল হইয়া শত বৎসর জীবিত থাক এবং আমার সকল ধনসম্পদ ভোগের অধিকারিণী হও (৬)। হে সর্বগুণ-সম্পন্নে বালিকে, আমার জীবন-সঙ্গিনী হও, আমি যেন তোমার সৌহার্দ্য লাভ করিতে পারি, অপর নারীগণ যেন আমাদের উভয়ের প্রীতিবন্ধন ভঙ্গ করিতে না পারেন এবং এই সৌহার্দ্য আমাদের শুভানুধ্যায়িগণ কর্তৃক বর্ধিত হউক (৭)। শ্রেষ্ঠা এই বধূ, হে ইক্ষ্বাকু, এই কন্যার প্রতি সৌভাগ্য এবং তোমার অনুগ্রহ সমর্পণ কর (৮), হে ধাত্রী এবং অন্যান্য দেবগণ, আমাদের দুইটি হৃদয়কে একত্রে মিলিত কর (৯); হে বধূ, তোমার দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ হউক, তুমি বৈধব্যরহিতা হও, গৃহপালিতা পশুগণের রক্ষয়িত্রী হও, উচ্চহৃদয়া, মহিমান্বিতা, দীর্ঘায়ু সন্তানগণ দ্বারা পরিবৃতা, পঞ্চ-যজ্ঞানুষ্ঠান পালনের অভিলাষিণী, এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্না হও। সংক্ষেপে, তুমি আমাদের, এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণ-দাত্রী হও (১১)। হে বধূ, তোমার এই গৃহে তুমি সহিষ্ণুতার সহিত বিরাজ কর, এই গৃহে তুমি আত্মীয়গণের সহিত আনন্দে অবস্থান কর (১৪)।"

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৮ম অধ্যায়ে এই কথাগুলি আছে—"যিনি ইচ্ছা করেন যে দীর্ঘায়ু এবং অগাধ বিদ্যাসম্পন্না কন্যালাভ করিবেন ইত্যাদি।"

গোভিল গৃহ্যসূত্র, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, এবং উহাদের ভাষ্যাদি হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহা বিদ্যা, বেদজ্ঞান এবং স্বাধীন জীবিকা অর্জনে নারীর অধিকার সপ্রমাণিত করে। ভাষ্যকার "স্ত্রী চাবিশেষাৎ" (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১।১।৭) এই সূত্রের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেন, "যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ স্বর্গলাভের অভিপ্রায় করেন সেই সকল অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম স্ত্রীলোকগণও অবাধে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।"

উক্ত গ্রন্থেরই অন্যান্য সূত্র এবং তাহাদের ভাষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নারীগণ বেদাধ্যয়ন করিতে পারিতেন, স্বাধীন ভাবে দ্রব্যের আদান প্রদানে তাঁহাদের অধিকার ছিল এবং পুরুষগণ যেরূপ সহধর্মিণী ব্যতীত ধর্ম-অর্থ-কামপ্রাপক কর্মের অচ্ছিদ্র অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না, নারীগণও সেইরূপ পতির সাহচর্য ব্যতীত ঐ সকল কর্মা-নুষ্ঠানের অধিকারিণী হইতেন না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সকল কার্যে কেবল একপক্ষের একচেটিয়া অধিকার ছিল না।

আরও বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকগণকে যদি তখন শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস এবং পুরাণ সমূহে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে যে সকল বিধান আছে (যথা– তাহারা এই সকল কর্ম করিবে এবং উহা করিবে না, ইত্যাদি) তাহাদের কোন অর্থই হয় না, কারণ যাহাদের জন্য ঐসকল বিধানের ব্যবস্থা, তাহারা যদি উহার অর্থ বুঝিবার উপায় হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে ঐ সকল আদেশের মূল্য কি? অবশ্যই আজকাল পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষই অনেক ক্ষেত্রে যাহা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তোতাপাখীর ন্যায় মুখস্থ বলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ঐগুলি লিখিত হয় নাই! ঐ সকল কর্তব্য তো সামান্য ও অবহেলনীয় ছিল না এবং উহাদের দায়িত্বও সহজ এবং লঘু ছিল না; পরন্তু উহা পরিবারের যিনি নেত্রী তাঁহার উপযুক্ত সংযম এবং কর্তব্যপরায়ণতা জ্ঞাপন করিত। বাৎস্যায়ন সূত্র (২১শ অধ্যায়, অধি ৪) এবং উহার জয়মঙ্গল ভাষ্যে এই সকল কর্তব্যের বিষয় বর্ণিত

আছে। অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া এস্থলে ঐ সকল উল্লেখ করা গেল না।

অশ্বলায়ন গৃহসূত্রে গার্গী, বাচক্নবী, বড়বা, প্রাচিতেয়ী, সুলভা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম আচার্য অথবা আধ্যাত্মিক বিদ্যাদাতৃগণের সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়ায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সেই প্রাচীন কালে ভারতীয় নারীগণও ধর্ম ও বিদ্যাদানে ব্রতী ছিলেন। অমরকোষে দ্বিতীয় কাণ্ডে মনুষ্যবর্গে 'উপাধ্যায়' শব্দের এই দুইটি বিভিন্ন স্ত্রী-আকার দেখিতে পাওয়া যায়—'উপাধ্যায়া' এবং 'উপাধ্যায়ী' ; ইহা দ্বারা যাঁহাদিগের নিকট অপরে বিদ্যালাভ করিতে আসিত এইরূপ নারী-আচার্যই বুঝায়। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে ইহা পরিষ্কাররূপে লিখিত আছে যে, যে সকল অধ্যাপিকা স্বাধীনভাবে অপরের নিকট শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারাই আচার্যা বলিয়া অভিহিতা হইতেন। উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে জানা যায় যে, নারীগণের কেবলমাত্র যে বিদ্যালাভের অধিকার ছিল তাহা নহে পরন্তু বিদ্যাদান এবং অধ্যাপনা করিবার অধিকারও তাঁহাদের ছিল। নারী কেবল মাত্র বিদ্যার্থিণীরূপেই গৃহীতা হইতেন না, অধিকন্তু আচার্যের সম্মানিত পদও গ্রহণ করিতেন!

ভোগবতীকূলে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ভাগীরথী হেথা ভোগবতী
তীরে তীরে শত শত হর্ম্যমাঝে ভোগীর বসতি।
বিরাট নগরী রাজে আঢ্য যানবাহনে মুখর,
উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে, পণ্যেভরা আপণনিকর,
বিলাসের লীলাভূমি, ক্রীড়াক্ষেত্র, চারু উপবন,
রঙ্গালয়, পানশালা। রাজপথ বিচিত্র শোভন
লইয়া বিরাজ করে। সহস্র সহস্র নর নারী
তার মাঝে ভোগতৃষ্ণা প্রাণপণে নিঃশেষে নিবারি
রোগার্ত হইয়া শেষে দগ্ধ হয় চিতার অনলে
ভেসে যায় ভোগবতীজলে।

লক্ষ লক্ষ দীন পুরবাসী
সে ভোগে বঞ্চিত হ'য়ে, লয়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী
পথে পথে প্রাণপণে করে সেই ভোগ্যেরই সন্ধান,
স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, সহে লজ্জা ঘৃণা অপমান।
তারি লাগি কাড়াকাড়ি মারামারি নিয়ত সংগ্রাম,
ক্ষমা নাই দয়া নাই নাহি সন্ধি জানে না বিশ্রাম।
জানে তারা জীবনের সারব্রত ইন্দ্রিয়ের ভোগ,
তাহারি সন্ধানে করে সর্বশক্তি নিঃশেষে নিয়োগ
ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে শেষে এই ভোগবতীকূলে
অনন্ত নিদ্রায় সবি ভুলে

বহুদূরে গিরির ছায়ায়
ডাকিল আশ্রম মঠ—শান্তি চাস্ রে তাপিত আয়।
কেহ শুনিল না, কেহ ছুটিল না প্রাণের আগ্রহে,
তাই বলি সে সবের ব্রতলক্ষ্য ভুলিবার নহে।
মন্দির, আশ্রম, মঠ, সেবাসত্র, ভক্তপরিষদ্
তাই ত্যজি গিরিবন শান্তিময় দূর জনপদ,
আসে তাপিতের টানে শুনাইতে শান্তিমন্ত্র-বাণী
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে উচ্চে তুলি আশ্বাসের পাণি,
এই তপ্ত নগরীরে একে একে ফেলিতেছে ঘিরে
যোগজালে ভোগবতী-তীরে।

এ যুগের এই ব্যতিক্রম,
যেথা মানুষের শ্রম সেখানেই তাহার আশ্রম।
যোগে ভোগে আর নাই বিভাগের প্রথা,
স্ফীত ভোগ্যরাশি সনে যুঝে নিত্য আয়ুর হ্রস্বতা।
আজিকার যোগাশ্রম নয় তাই বনে গিরিতটে,
যেখানে মানুষ করে আর্তনাদ জীবনসংকটে,
যেখানে ভোগের পঙ্কে যাপে নর শূকর জীবন,
এই ধূলিধূমক্লিন্ন, ত্বরা তপ্ত, অশুচি পবন
নগরেরই উপকণ্ঠে ভোগবতীকূলেই পেলাম
আধ্যাত্মিক সাধনার ধাম।

"কলি ধন্য, শূদ্র ধন্য, নারী ধন্য"

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

শাস্ত্রগ্রন্থে একটি পুরাতন প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, এক সময়ে মুনি-সমাজে একটি বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং বিতর্কের বিষয় ছিল তিনটি :—(১) চতুর্যুগের মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ? (২) চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ? (৩) নারী ও পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? বিতর্কটি উঠিয়াছিল দ্বাপর ও কলির যুগ-সন্ধিতে। কলিযুগ তখন আসিবার উপক্রম করিতেছে। মুনি-সমাজ আশঙ্কান্বিত। কলিযুগের অগ্রদূতেরা অভিনব ভাবধারা প্রচার আরম্ভ করিয়াছে। সমাজে বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুনিগণের মধ্যেও মতভেদ দেখা যাইতেছে। প্রাচীন যুগের ও সমুন্নত সমাজের প্রচলিত মতবাদের বিরোধী শক্তিসমূহ ক্রমশঃই যেন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। মানবজগতের কল্যাণকল্পে আগামী যুগের সুনিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যে একটি সুমীমাংসা আবশ্যক।

তখন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্বশাস্ত্র-মর্মার্থদর্শী সর্বকালতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য বলিয়া আর্যসমাজে স্বীকৃত। তিনি সমগ্র বেদকে সংগ্রথিত ও সুসজ্জিত করিয়া এবং তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুনিপুণ ব্যবস্থা করিয়া আর্যসমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন; বেদের কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া এবং মানবের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সাধনার ক্ষেত্রে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়া, বেদবাদী ও উপনিষদ্‌বাদীদের অবান্তর কলহের সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী ধর্ম-সাধনার পথ প্রদর্শন এবং প্রত্যেক বর্ণের স্ব স্ব ধর্মের মর্যাদাস্থাপন দ্বারা সমগ্র জাতিকে আত্মকলহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; মহাভারত পুরাণাদি রচনা ও প্রচার করিয়া জাতি ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ঋষি-মুনি-যোগি-তপস্বীদের সাধনলব্ধ তত্ত্বসমূহকে কাব্য-ইতিহাস-গল্প-উপন্যাসাদির সাহায্যে জাতি ও সমাজের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নিম্ন নিম্নতর নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; বেদান্ত-রচনা দ্বারা আর্যসাধনার নিগূঢ় চরম কথা ব্যক্ত করিয়া সমগ্র জাতিকে অধ্যাত্মভাবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের আচার্যত্ব অনন্যসাধারণ। ভারতীয় সাধনায় তাঁহার গুরুপদ চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

মুনিগণ তাঁহাদের বিতর্কের সুমীমাংসার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তখন সরস্বতী নদীজলে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানে চিত্তকে সুসমাহিত করিয়া পরমানন্দে বিরাজিত ছিলেন। ধ্যান কথঞ্চিৎ শিথিল হইলে, তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে মুনিগণের জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়া হইল। আপনা হইতে তাঁহার মুখ দিয়া তিনটি বাণী উচ্চারিত হইল :—(১) কলি ধন্য; (২) শূদ্র ধন্য; (৩) নারী ধন্য। বাণী তিনটি জিজ্ঞাসু মুনিগণের শ্রবণগোচর হইল। ইহা যে তাঁহাদেরই বিতর্কের মীমাংসা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল না। কিন্তু একি! তিনটি বাণীই যে চিরকাল প্রচলিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত! যে কলিযুগে ধর্মের মাত্র একপাদ অবশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে যুগে ধর্মের গ্লানি পূর্ণমাত্রায় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমবর্ধমান, সেই যুগকে মহর্ষি ধন্য বলিয়া প্রণাম জানাইলেন! যে শূদ্র ও নারী বৈদিক জ্ঞানে ও কর্মে সম্পূর্ণ অনধিকারী, একমাত্র সেবা করাই যাহাদের ধর্ম—সেই শূদ্র ও নারীকে তিনি ধন্য বলিয়া

শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিলেন! এ যে ভীষণ বিপ্লবের বাণী! ইহাই কি নবযুগের বাণী? কলিযুগ কি এই আদর্শ লইয়াই সমাগত হইতেছে? মানবীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই আদর্শের যথার্থ স্বরূপটি কি? মুনিগণের কতকাংশ অবশ্য এই বাণী শুনিয়া পুলকিত হইলেন, অনেকেই বিমর্ষ হইলেন। সকলেই সাগ্রহে মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ ও আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি নদী হইতে সমুত্থান করিয়া প্রসন্নচিত্তে আসিয়া মুনিবৃন্দের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন এবং যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ তাঁহাদের বিতর্কের বিষয় নিবেদন করিলেন, এবং বিতর্কের মীমাংসাও যে তাঁহার মুখ হইতে পাইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। কিন্তু মীমাংসা এমনই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যে, তাহার মর্মগ্রহণের নিমিত্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণী তিনটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস হাসিমুখে মুনিগণের নিবেদন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সংশয়ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"করুণাময় ভগবান্ আমার মুখকে যন্ত্র করিয়া তোমাদের নিকট যে মহতী বাণী ঘোষণা করিলেন, তাহা আপাততঃ বিপ্লবের বাণী বলিয়াই প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু ভাগবতী বাণী চিরন্তন সত্য। প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী কোন ভাব যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহা বিপ্লবাত্মক বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক মতবাদ, সত্যের প্রত্যেকটি রূপ প্রথম আবির্ভাবের কালে বিপ্লব-আকারেই উপস্থিত হয়। তাহাই যখন সমাজ-মনকে প্রভাবিত করিয়া স্থায়ী আসন গ্রহণ করে, তখন প্রচলিত সংস্কাররূপে পরিণত হয়। মানবসমাজে আপাত-বিপ্লবের ভিতর দিয়াই সত্যের নূতন নূতন রূপ প্রকটিত হইয়াছে, নূতন নূতন ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছে, নরনারীর চিত্তে নূতন নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ এইরূপেই যুগে যুগে মানুষের নিকট নূতন নূতন বাণী প্রেরণ করিতেছেন, মানুষকে সত্যের নূতন নূতন মূর্তির সহিত পরিচিত করাইতেছেন। সুতরাং বিপ্লবের নামে ভীতচকিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

যে তিনটি বাণী সম্প্রতি উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা হয়ত একটি নব ভাবপ্রবাহেরই সূচনা করিতেছে। হয়ত কালক্রমে ধীরে ধীরে ইহার তাৎপর্য সমাজ-জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। কিন্তু ইহা সনাতন সত্য ও ধর্মের বিরোধী নয়, সনাতন সত্য ও সনাতন আর্যসংস্কৃতিরই একটি নবরূপে আত্মপ্রকাশ। মুনিগণ নিজ নিজ বিচারের উপর গভীরতর বিচারের আলোক-সম্পাত করিলেই সন্দেহ ও বিবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

ভগবদ্‌বিধানে যুগপরম্পরা প্রবাহিত হইতেছে, বর্ণবিভাগ সংঘটিত হইতেছে, পুরুষ-নারী-বিভাগ ত চিরকালই আছে; ইহার মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ ও কোন্ যুগ নিকৃষ্ট, কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ ও কোন্ বর্ণ নিকৃষ্ট, পুরুষের স্থান উচ্চে কিংবা নারীর স্থান উচ্চে—এই জাতীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয় কোথা হইতে? তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করিলে এই সব প্রশ্নের কোন সার্থকতা আছে কি? সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নিত্যানন্দময় সত্যশিবসুন্দর শ্রীভগবান্ এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন, আপনিই এই সংসারের লালনপালন করিতেছেন, আপনারই লীলাবিধানে ইহাকে পরিচালিত করিতেছেন, আপনারই অন্তর্নিহিত আনন্দের

প্রেরণায় প্রতিনিয়ত ইহার মধ্যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছেন, কত সংহার করিতেছেন, কত সংস্কার-বিকার করিতেছেন। বস্তুতঃ আপনার আনন্দে তিনি আপনিই সব হইতেছেন; আপনি বিচিত্র নাম, রূপ, উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনারই সঙ্গে আপনি বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র রসের খেলা খেলিতেছেন; আবার আপনার মধ্যেই সবকে সংহরণ করিয়া লইতেছেন। এখানে শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠের ভেদ কোথায়? সকলের মধ্যেই ত সত্যশিবসুন্দরের আত্মপ্রকাশ, সবই ত তিনি। তিনিই সকল যুগ, তিনিই সকল মানুষ, তিনিই দেশে কালে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করেন। কাহাকে বড় বলিব, কাহাকে ছোট বলিব?

কালপ্রবাহে যুগের আবর্তন হইতেছে; প্রত্যেক যুগের প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অসংখ্যপ্রকার জীব জাতির উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে; প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক শ্রেণীর, প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানবসমাজের মধ্যেও কত প্রকার আকৃতি, কত প্রকার প্রকৃতি, কত প্রকার শক্তিতারতম্য, বুদ্ধিতারতম্য। অবিশেষের মধ্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব—ইহার নামই ত সৃষ্টি, ইহাই ত সংসার। এই সব বৈশিষ্ট্য নিয়াই ত ভগবানের লীলা। তাঁহার লীলাবিধানে সব বিশিষ্টতারই স্থান আছে, সার্থকতা আছে, নিজস্ব গৌরব আছে। প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি, নিজের বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়া ভগবানের লীলার পুষ্টিসাধন করিতেছে, ভগবানের রসসম্ভোগে উপকরণ যোগাইতেছে।

তত্ত্বদৃষ্টিতে সব বৈচিত্র্যের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশ দর্শন করিলে, সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁর লীলাবিলাস দর্শন করিলে, সব ভেদের মধ্যে অভেদ দর্শন করিলে, শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিসংবাদ কি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না? যথার্থ সত্যদর্শীর বিচারে উচ্চ-নীচ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, মহান্-ক্ষুদ্র, এসবের কোন ভেদ নাই। আছে শুধু অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একের লীলাবিলাস, সর্বদ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্বাতীতের আত্মপ্রকাশ।

মানুষ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, প্রয়োজনের তুলা-দণ্ডে, উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট প্রভৃতি ভেদের বিচার করিতে থাকে। ব্যবহারক্ষেত্রে এই বিচারের মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু মানব-বুদ্ধি যতই তত্ত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে থাকে, ততই এই সব ভেদের বিচার অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে থাকে। ব্যবহারিক জগতে সব প্রয়োজনের কেন্দ্রে থাকে মানুষের অহংকার ও বাসনা; ভেদের বিচারও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মানুষের অহংকার ও বাসনা নূতন নূতন রূপ ধারণ করে, প্রয়োজনবোধের বহুল পরিবর্তন হয়, মূল্য-নিরূপণের মানদণ্ডও বিভিন্নপ্রকার হয়। এক যুগে, এক দেশে বা এক জাতির মধ্যে যাহাদের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে, অপর যুগে কিংবা অপর দেশে অথবা অপর জাতির মধ্যে তাহাদের সমাদর কম দৃষ্ট হইলে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। অভ্যাসের দাসত্বহেতু যাহা বিপ্লব বলিয়া মনে হয়, তাহাও ভগবানের বিধান ও প্রকৃতির নিয়ম অনু-সারেই হয়। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ব্যবহারক্ষেত্রে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় বা সব চেয়ে বেশী মূল্যবান, তাহা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, অসম্ভব বলিলেও হয়। মানুষের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিচিত্র প্রয়োজনের মধ্যে যখন যে জিনিসটির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়, তখন সেইটিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হইয়া উঠে। যাহারা সেই অভাবের পূরণে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়, সমাজে তৎকালে তাহাদের সম্ভ্রম ও আদর বেশী হয়।

মানবসমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য করিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, মানুষের জীবনধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্র-গৃহাদির আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকার্য এবং তন্নিমিত্ত যাহারা পরিশ্রম করে, তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য যথেষ্ট। সমাজের পক্ষে এই পরিশ্রমকে এবং শ্রমিকদিগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা অবশ্য কর্তব্য। সভ্য মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে পার্থিব সম্পদ্‌বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যাহারা কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পাদির উৎকর্ষসাধন দ্বারা জাতি ও সমাজের ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির কার্যে আত্মনিয়োগ করে, সমাজের পক্ষে তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন সমুচিত। জাতির মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিভিন্ন-প্রকার স্বার্থের সমন্বয়-সাধন করা, বিভিন্নশ্রেণীর ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রকার বিরোধের সমাধান করিয়া তাহাদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করা, সকলকে স্ব স্ব মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা, দেশ-জাতি-সমাজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখা—ইহাও এক অত্যাবশ্যক কার্য। যাহারা এই কার্যে আত্মনিয়োগ করে, তাহাদের যেমন শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য ও সংগঠনশক্তি আবশ্যক, তেমনি ন্যায়নিষ্ঠা ধর্মপরায়ণতা মানবপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। মানবসমাজে তাহাদের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম থাকা বিধেয়। মানুষের যেমন বহির্জীবনের প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্তর্জীবনের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র—এ সবই উন্নতিশীল মানবসমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যাহারা এ সকলের গবেষণায় নিরত, তাহারাও সমাজের সুমহৎ সেবায় নিয়োজিত এবং সকলের সম্মানার্হ। যাহারা মানবজাতির অন্তর্জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়ানুসন্ধানে ডুবিয়া থাকে, তাহাদের বহির্জীবনের প্রয়োজন-সাধনের দায়িত্ব সমাজের ও রাষ্ট্রের গ্রহণীয়। সুতরাং শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সকলেই সমাজের প্রয়োজন সাধন করিতেছে বলিয়া সমাদরণীয়।

অতএব মানবসমাজের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বিচার করিলেও, কোন শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ ও কোন শ্রেণীকে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিবার কোন হেতু নাই। সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সমষ্টি-জীবনের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। জীবন্ত সমাজদেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শ্রদ্ধার্হ—কেহই বড় বা ছোট নয়। যে-কোন অঙ্গ বিকল হইলেই সমাজের স্বাস্থ্যহানি হয়, ধর্মহানি হয়, অভ্যুদয়ের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রয়োজনের মানদণ্ডেও সকল শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি সমদর্শিতা-অনুশীলন আবশ্যক। সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যেও শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ-বিচারের কি কোন অর্থ আছে? পুরুষ ব্যতীত যেমন নারীর নারীত্ব-বিকাশ অসম্ভব, নারী ব্যতীতও তেমনি পুরুষের পুরুষত্ব-বিকাশ অসম্ভব। পুরুষ ও নারীর মিলিত সত্তাতেই মানবত্বের বিকাশ সাধিত হয়। মুনিগণের পক্ষে সর্বতোভাবে সমদর্শিত্ব-অভ্যাস বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, কলি, শূদ্র ও নারীকে যে ধন্য বলা হইল, ইহার তাৎপর্য কি? মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবান্‌কে লাভ করাই,—জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভগবানের সত্য-শিব-সুন্দর-স্বরূপ অনুভব করাই,—চরম ও পরম লক্ষ্য। তত্ত্ব-বিচারে নিরূপিত হইয়াছে যে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে আপনাকে লীলায়িত করিয়া বিচিত্রভাবে আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতেছেন। ভগবানের এই বিশ্বরূপের মধ্যে মানুষেরই অনন্যসাধারণ অধিকার ভগবান্‌কে লাভ করা, ভগবান্‌কে নিজের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে সাক্ষাৎ অনুভব করা। তত্ত্ব-বিচারে যাহা চরম সত্য, সাধনবিচারে তাহাই

চরম লক্ষ্য, জীবনের চরম আদর্শ। ভিতরে বাহিরে সর্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিলেই মানুষ আপনার পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সাধন-সাধ্য-বিচারে যাহাদের জীবনে ভগবান্ যত সহজলভ্য, তাহারা তত ধন্য, তত সৌভাগ্যবান্, এবং যে যুগে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার পক্ষে যত অনুকূল হয়, সেই যুগকে তত ধন্য বলা চলে।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ভগবানকে লাভ করিবার পথে সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায় মানুষের অহংকার এবং সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতম উপায় সর্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ। অহংকারই ভগবানের জগতে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে দেয় না, ভগবানের আত্মপ্রকাশের মধ্যে ভগবানকে ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি করায়। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়া এই অহংকারকে ভগবানের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারিলেই ভগবৎকৃপায় তত্ত্বদৃষ্টি খুলিয়া যায়, ভগবানের সত্যশিবপ্রেমানন্দময় সুন্দর মধুর স্বরূপ তাঁহার সকল লীলা-বিলাসের মধ্যে প্রতিভাত হইয়া উঠে। অহংকারের মধ্যেই অবিদ্যা ঘনীভূত আকারে বিদ্যমান থাকিয়া সব অনর্থ সৃষ্টি করে। ভগবানে আত্মসমর্পণ অভ্যাস দ্বারা অহংকারমুক্ত হইতে পারিলেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি, সব অনর্থের নিবৃত্তি। অহংকারই ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। অহংকার যেখানে যত প্রবল, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে দূরত্ব সেখানেই তত বেশী। অহংকার যত নতি স্বীকার করে, ভগবান্ তত সমীপবর্তী হন। অহংকার সম্পূর্ণরূপে ভগবদনুগত হইলে, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। মানুষ তখন 'ভাগবত' হইয়া যায়, সমস্ত বিশ্ব-জগৎই 'ভাগবত' হইয়া যায়।

প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস এই যে, অতি প্রাচীন কালে সত্য ও ত্রেতাযুগে মানুষ স্বভাবতঃ সরল ও ধর্মশীল ছিল, তাহাদের সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বলিষ্ঠ দেহ ছিল, তাহাদের তপঃশক্তি জ্ঞান-শক্তি কর্মশক্তি যোগশক্তি অনেক বেশী ছিল, তাহারা দীর্ঘকাল বাতাহারী হইয়া তপস্যা করিতে পারিত, জ্ঞানসাধনা করিতে পারিত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিত। ক্রমশঃ যুগাবর্তনে মানুষের জীবনযাত্রা জটিল হইয়াছে, পরমায়ু ক্ষীণতর হইয়াছে, দেহেন্দ্রিয়মনের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, কুটিলতা ও অধর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ-তপস্যাদির সামর্থ্য কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং শক্তি-সামর্থ্যের বিচারে এবং সরলতা ও ধর্মানুষ্ঠানাদির বিচারে সত্যযুগের মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং কলিযুগের মানুষ সর্বাপেক্ষা অবনত, এই ধারণা আর্যসমাজে চির-প্রচলিত। যদিও এই ধারণার অনুকূলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ কোথাও মিলে না, তথাপি যদি এই প্রচলিত সংস্কারকে যথার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও মানবজীবনের চরম কল্যাণের বিচারে কলিযুগের মানুষকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কোন হেতু নাই।

পূর্ব পূর্ব যুগের মানুষদের যেমন শক্তিসামর্থ্য, সাধনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ (প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে) যথেষ্ট ছিল, তেমনি তাহাদের অহংকারও পরিপুষ্ট ছিল। তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল আপনাদের সাধনশক্তির উপর, ভগবানের করুণার উপর নয়। তাহারা তপস্যার শক্তিতে ভগবান্‌কে জয় করিতে চাহিয়াছে, যাগযজ্ঞাদির সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, জ্ঞানসাধনার

প্রভাবে মোক্ষলাভের জন্য অগ্রসর হইয়াছে, আপনাপন সামর্থ্যের সম্যক ব্যবহার করিয়া সর্ববিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রযত্নশীল হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম ছিল মানবধর্ম, তাহাদের ব্রত ছিল মানব-সামর্থ্যের সম্যক বিকাশ। তাহাদের এই পুরুষকার, এই আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মসামর্থ্যে পুরুষার্থ-সিদ্ধির প্রয়াস, মানবজীবনের সার্থকতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নব নব উপায়োদ্ভাবন, কর্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও যোগশক্তির বিচিত্র বিকাশ, এ সকলই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় ও কীর্তনীয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবৎতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব তাহারা সুনিপুণ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছে; চরম তত্ত্ব ছিল তাহাদের অনুসন্ধেয়, বিজ্ঞেয়, ধ্যেয়। মানবাহংকারকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের সর্ববিধ জ্ঞানতপস্যা, যোগাদির অনুশীলন, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান। তাহারা ভগবৎকৃপাপেক্ষী ছিল না, স্বীয় সাধনার উপযুক্ত ফলের উপরই তাহাদের দাবী ছিল। কাজেই করুণাময় ভগবান্, প্রেমময় ভগবান্, সুন্দর মধুর ভগবান্, 'আপন-জন' ভগবানের সহিত তাহাদের বিশেষ পরিচয় হয় নাই। বিশ্বের পরম কারণ ভগবান্, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ও ন্যায়বান্ ভগবানের সহিতই পরিচয় ছিল।

যুগাবর্তনে মানুষের শক্তিসামর্থ্য যদি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে মানুষের অহংকারও দুর্বল হইয়াছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও শিথিল হইয়াছে, আপন পুরুষকারের উপরে ভগবদ্‌করুণাকে স্থান দিতে মানুষ শিখিয়াছে। এটা লোকসান নয়, দুর্ভাগ্যের নিদর্শন নয়; এটা একটা মহান্ লাভ, মহা সৌভাগ্য। অহংকার প্রশমিত হওয়াতে, ভগবানের সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠতর নিবিড়তর পরিচয় সংঘটিত হইয়াছে। মানুষ আপন অহংকারকে যে পরিমাণে ভগবৎ করুণার কাছে বলি দিতে শিখিয়াছে, সেই পরিমাণে ভগবান্ আপনার করুণাঘন প্রেমঘন সুকোমল সুমধুর মূর্তি প্রকটিত করিয়া মানুষের নিকটে নামিয়া আসিয়াছেন, মানুষের আপন-জন হইয়াছেন, মানুষের কাছে সহজ-লভ্য হইয়াছেন। পূর্বে পূর্বে পুরুষকার-প্রধান যুগ অপেক্ষা কলি-যুগের দুর্বল আত্মপ্রত্যয়বিহীন মনুষ্যের পক্ষে ভগবানে আত্মসমর্পণ অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক। তাহার আত্মবিশ্বাস যত কমিতেছে, চিত্ত যত দীনভাবাপন্ন হইতেছে, ভগবদ্‌বিশ্বাস তত বাড়িতেছে, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবদ্‌-লাভের জন্য ভগবানেরই করুণার উপর নির্ভর করা তত সহজ হইতেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ সাধন করিত ভগবানের সংসারোর্ধ্ব স্বরূপের কাছে উপনীত হইবার জন্যে, সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবানের নিত্য নির্বিকার নিষ্ক্রিয় স্বরূপের সহিত মিলিত হইবার জন্যে; কলিযুগে মানুষ আপন পুরুষকার-সামর্থ্যে আস্থাহীন হইয়া সংসারের মধ্যেই ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্যে ভগবানের করুণার দিকেই একলক্ষ্য হইয়া (তৎ তেঽনুকম্পাং সুসমী-ক্ষমাণঃ) চাহিয়া থাকে, ভগবানের কাছে দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি নিবেদন করিয়া দিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবং করুণাঘনতনুধারী ভগবান্ নিজে নামিয়া আসেন এই নিরভিমান দীনাতিদীন ভক্তের সহিত মিলিত হইবার জন্যে। এটা কলিযুগের মানুষের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্য!

ইহা কি কল্পনা করা অসমীচীন যে, বিশ্ব-বিধাতা ভগবান্ হয়ত মানুষের অহংকারকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ প্রশমিত করিয়া, ক্রমশঃ শুদ্ধ, স্বচ্ছ, দীনভাবাপন্ন ও আত্মানুগত করিয়া মানুষের কাছে আপনার করুণাঘন প্রেমঘন

স্বরূপ প্রকটিত করিবার এবং আপনার ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই এই যুগাবর্তনের বিধান করিয়াছেন? ইহা কি সম্ভব নয় যে, যুগাবর্তনের ইতিহাস—মানুষের নিকট ভগবানের ক্রমশঃ নামিয়া আসারই ইতিহাস, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে অহংকারঘটিত ব্যবধানের ক্রম-সঙ্কোচেরই ইতিহাস? সত্য-যুগের অনুসন্ধেয় ভগবত্তত্ত্ব কলিযুগে মানুষের চক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত প্রেমঘনমূর্তি নরলীলাময় জীবন্ত ভগবান্।

কলিযুগে ধর্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এ কথাও নিরর্থক নয়। কলিযুগের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানতপস্যাময় সাধনা, যোগতপস্যাময় সাধনা, যাগযজ্ঞাদি-কর্মবাহুল্যময় সাধনা লুপ্তপ্রায় হইতেছে ও হইবে। বাকী একপাদ ভক্তিসাধনা। কলিযুগের ধর্ম পূর্বযুগানুযায়ী মানবধর্ম নয়,—কলিযুগের ধর্ম ভাগবতধর্ম। ভাগবতধর্মের মুখ্য সাধনাই হইল মানবীয় অহংকারকে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। এই ধর্মে ভগবান্ মানুষের ধ্যেয়, জ্ঞেয়, অনুসন্ধেয় নয়। সারা মন-প্রাণ-হৃদয় দিয়া ভগবান্‌কে সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াই এই ধর্মের প্রারম্ভ। ভগবান্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না; ভগবান সামনে উপস্থিত, তাঁহাকে হৃদয়মনবুদ্ধিদেহ সব নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। ধর্মের এই একপাদেরই এই মাহাত্ম্য, যে, ইহাতে ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে সব ব্যবধান তিরোহিত। ভগবান্‌কে লইয়াই সাধনার আরম্ভ, ভগবান্‌কে লইয়াই সাধনার প্রগতি, ভগবান্‌কে লইয়াই সাধনার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সাধক ভগবানের করুণার কাছে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াই খালাস। তাহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। তাহার অহংকারকে নিঃশেষে আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া তাহাকে আপনার স্বরূপগত পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সৌন্দর্য-মাধুর্যে ভরপুর করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবান্‌ই তাহার দ্বারা তাহা করাইয়া লন। ধর্মের এই একপাদেরই গৌরবে কলির মানব ধন্য ধন্য হইয়া যায়।

এই ভাগবতধর্মের গৌরবে কলির মানবের আরো কত সৌভাগ্য, তাহা বিবেচ্য। তাহার কাছে ভগবান্ শুধু নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপও নহেন, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধাতাও নহেন, পরম ন্যায়বান্ কর্মফলদাতাও নহেন, এমন কি, অনুপম মহিমামণ্ডিত উচ্চাসনে সমাসীন করুণাবিতরণকারীও নহেন। তাহার কাছে ভগবান্ স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, সৌহার্দময় সখা ও ক্রীড়াসহচর, আনন্দঘন পুত্র ও কন্যা, প্রেমময় স্বামী বা প্রেমময়ী স্ত্রী। সংসারে যতপ্রকার সুমধুর সম্বন্ধ আছে, ভগবান্ সর্বপ্রকার সম্বন্ধে সুশোভিত হইয়া কলির আত্মনিবেদনকারী ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সর্বপ্রকার আনন্দের আস্বাদনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লন। আর, এ ধর্মে অনধিকারীও কেহই নয়। আত্ম-সমর্পণ করিতে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই সমান অধিকারী। সুতরাং কলিযুগে সর্বারাধ্য ভগবান্ সবার দ্বারে উপস্থিত, সকলের সহিত সমান হইয়া উপস্থিত। তাই তো কলি ধন্য।

যে দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া কলি-যুগকে ধন্য বলা হইয়াছে, সেই দৃষ্টিকোণ হইতেই শূদ্র ও নারী ধন্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। জ্ঞানবল, তপোবল, বীর্যবল, ধনবল, কর্মবল প্রভৃতির প্রাধান্যে সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থান নীচে রহিয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডাদির অনুষ্ঠানে শূদ্র ও নারীর অধিকার নাই। উপনিষদের জ্ঞান-বিচারে তাহাদের অধিকার নাই। সামাজিক

অনেক ব্যাপারে তাহারা অধিকারবঞ্চিত। কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্য করুণাবিধানে জাগতিক উচ্চাধিকারে বঞ্চিত হইয়াই শূদ্র ও নারী ভগবানের সান্নিধ্যলাভের অধিকার সহজে অর্জন করিয়াছে। সংসারে তাহাদের অভিমান করিবার বিশেষ কিছুই নাই। জ্ঞানকর্মমূলক ধর্মশাস্ত্র এবং সমাজবিধান তাহাদিগকে চিরকাল নীচে রাখিয়া তাহাদের অহংকারকে কখনও মাথা তুলিতে দেয় নাই। আত্মসমর্পণযোগ তাহাদের পক্ষে প্রায় স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে এবং নিরভিমানে তাহাদিগকে সেবা করিতে অভ্যস্ত। নারী স্নেহপ্রেমভক্তিনিষ্ঠার সহিত পুরুষকে সেবা করিতে এবং পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে যুগযুগান্তর অভ্যস্ত। সুতরাং অহংকারকে প্রশমিত করিতে ও আত্মসমর্পণ অভ্যাস করিতে তাহাদের বিশেষ কোন প্রয়াসই করিতে হয় না। জাগতিক জীবনে যে ভাবসাধনায় তাহারা সিদ্ধ, সেই ভাবটি ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হইলেই তাহারা অতি সহজে ভগবান্‌কে লাভ করিতে, ভগবানের সহিত ঐকান্তিকভাবে মিলিত হইতে, সমর্থ হয়।

ভাগবত শাস্ত্রের বিচারে শূদ্র ও নারীর উন্নত অধিকার স্বীকৃত। কর্মের সাধনায়, জ্ঞানের সাধনায়, যাগযজ্ঞ যোগ তপস্যার সাধনায়, তাহারা অপেক্ষাকৃত অপটু বলিয়াই প্রেমের সাধনা, ভক্তির সাধনা, বিশ্বাসের সাধনা, সেবার সাধনা, আত্মসমর্পণের সাধনা তাহাদের পক্ষে সহজ, এবং এই সাধনাই অতি সহজে ভগবান্‌কে কাছে টানিয়া আনে, ভগবানকে অতি সহজে প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ, নিতান্ত আপন-জন করিয়া তোলে। ভগবানের করুণাময় প্রেমমধুর স্নিগ্ধ স্বরূপ এই নিরাভিমান সেবাব্রতী একান্ত শরণাগত ভক্তদের নিকটই সহজে প্রতিভাত হয়। ভাগবত-শাস্ত্র বৃন্দাবনের গোপবালক ও গোপবালিকাদিগকেই মানবসমাজে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। তাহারাই ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে আপন-জন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই স্থূলদেহে স্থূলজগতে সম্যক ভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। আর্যসমাজের শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিতপস্বিগণও এই গোপগোপীদিগকে আদর্শরূপে স্বীকার করিয়াছেন। কলিযুগ এই ভাগবত ধর্মেরই যুগ,—মানুষ ও ভগবানের নিবিড়ভাবে মেলামেশার যুগ, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপগোপীর নিরাবিল প্রেমসম্বন্ধ ও প্রেমলীলা এই ধর্মের চিরন্তন আদর্শ। তাই কলি, শূদ্র, নারী ধন্য।

অভিমানের একটা স্বভাব এই যে, সে নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াই তৃপ্তিবোধ করে না; সে অপরকে ছোট দেখিতে চায়, ছোট রাখিতে চায়। নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যাহাকে সে ছোট দেখিয়া আসিতেছে, সে যদি গৌরব অর্জন করিতে চায়, সমাজে যদি কোন দিক দিয়া তাহার গৌরব স্বীকৃত হয়, অভিমানের তখন অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হয়, সমাজের ভিতরে তখন সে বিপ্লবের লক্ষণ দেখিয়া ভীত-চকিত হয়। কলিযুগে ভাগবতধর্মের প্রচার এবং শূদ্র ও নারীর গৌরবখ্যাপন দেখিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি অভিজাত ও জ্ঞানকর্মধনোন্নত সম্প্রদায়সমূহের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ইহাই কারণ। ভাগবতশাস্ত্র ঘোষণা করিতেছে,—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" যে সব অন্ত্যজ জাতি আর্যগোষ্ঠীতে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণিত ও বর্জিত হইয়া আসিতেছে, ভাগবতধর্ম তাহাদেরও ভগবানকে লাভ করিবার, ভগবানের লীলাসহচর হইবার, মনুষ্যোচিত অধিকার ঘোষণা করিতেছে। ভাগবতধর্মের অনুশীলনে কোন জাতিগত, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত অধিকারভেদ নাই, বীর্যৈশ্বর্যগত ও

জ্ঞানশক্তিগত কোন অধিকারভেদ নাই, মানবমাত্রেরই ইহাতে সমান অধিকার। এই দৃষ্টিতে সব মানুষই একজাতির। ভগবান্‌কে দর্শন স্পর্শন ভজন পূজন করিতে এবং ভগবানের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে, মানুষমাত্রেই অধিকারী।

ভাগবতধর্মের এই মহতী বাণী বুকে করিয়া কলিযুগ সমাগত হইতেছে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি অভিমানী সম্প্রদায়সমূহ সংস্কারবশে এই বাণীকে বিপ্লবের বাণী ও এই যুগকে বিপ্লবের যুগ মনে করিয়া বর্তমানে ভীত হইতে পারে; কিন্তু কালক্রমে তাহারাও এই বাণীকে হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইবে, তাহারাও ভগবানের সান্নিধ্য অনুভবের নিমিত্ত যাগ-যোগ-জ্ঞান-তপস্যা অপেক্ষা ভগবানের করুণায় বিশ্বাস ও ভগবানে আত্মসমর্পণকে প্রকৃষ্টতর উপায় বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহারাও আত্মসমর্পণ-যোগ শিক্ষার নিমিত্ত শূদ্র ও নারীর নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইতে কুণ্ঠিত হইবে না। ভাগবতধর্মের সুমধুর আস্বাদন লাভ করিলে, তাহারাও জাত্যভিমান জ্ঞানাভিমান বীর্যাভিমান ধনাভিমান কৃতিত্বাভিমান বিসর্জন দিয়া শূদ্রচণ্ডালাদি সকল মানুষকে আপনাদের সমান বোধ করিতে শিখিবে এবং প্রেমে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবে। ভাগবতধর্ম সকল মানবজাতিকে এক জাতি করিয়া তুলিবে, এবং মানুষ ও ভগবানের মধ্যে অবিদ্যাজনিত ও অহংকারপোষিত সমস্ত ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিবে। মানুষ মানুষের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিয়া মানুষের মধ্যেই ভগবান্‌কে পূজা করিতে শিখিবে, জাগতিক সকল কর্তব্য-কর্মকে ভগবৎকর্ম বোধে ভক্তিপূত দেহমনে সম্পাদন করিতে অভ্যস্ত হইবে, এবং বিশ্বের সর্বত্র ভগবানের মধুর লীলাবিলাস দর্শন করিয়া ভগবানের মধ্যে আপনার সত্তা ডুবাইয়া দিবে। তখনই কলিযুগের যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হইবে, কলিযুগ সার্থক হইবে, মানুষ কৃতার্থ হইবে।

মহাকবি ভাসঃ ভাব-রূপ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে মহাকবি ভাস ভারতীয় সুধীসমাজের হৃদয় অধিকার করে চিরসম্রাট রূপে বিরাজমান। যুগে যুগে কত কবি, কত ক্রান্তদর্শী মনীষী—তাঁর কত স্তুতি রচনা করে গেছেন। সর্বযুগের কবিসম্রাট মহাকবি কালিদাস স্বয়ং তাঁর স্তুতিগান করে গেছেন, বলেছেন প্রাচীনকবি "ভাস—সৌমিল-কবিপুত্র" তাঁর বন্দনীয়।

অথচ এ সর্বযুগের বন্দন-যোগ্য কবিকেও কতই না অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। খল কুচক্রী বিদ্বেষ্টারা তাঁকে করেছেন কটূক্তির অনলে দগ্ধ। রাজশেখর তাঁর কবি-বিমর্শে ভাসের অগ্নিপরীক্ষার কথা উল্লেখপূর্বক বলেছেন—

"ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভূন্ন পাবকঃ॥"

অর্থাৎ শঠেরা ভাসের নাটকচক্র পরীক্ষার জন্য অগ্নিতে নিয়োগ করলে—স্বপ্নবাসবদত্তম্ গ্রন্থ দগ্ধ হলো না, স্বগৌরবে বিরাজ করতে লাগলো। মহাকবি জয়ানকও "পৃথ্বীরাজ-বিজয়" মহাকাব্যের

প্রারম্ভিক একটী কবিতায় ভাসের এ অগ্নিপরীক্ষার কথা বলেছেন,[১] এবং টীকাকার জোনরাজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, খলদের মুখের আগুনে ব্যাস ও ভাস উভয়েই সমান কষ্ট পেয়েছেন।[২] কিন্তু আনন্দের বিষয়, ব্যাসের মত ভাসও হয়েছেন কল্পান্তস্থায়ী। পার্থক্য এই—ব্যাসদেব সর্বদা স্বশরীরে স্বপ্রকাশ; ভাসের এরূপ সশরীরে স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে এখনও অনেকেই সন্দিহান। বর্তমানে ভাসের নামে প্রচলিত ত্রয়োদশ গ্রন্থ সকলি ভাসের কিনা, বা ভাসগ্রন্থের রূপান্তর কিনা—এ নিয়ে মতদ্বৈধের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যুগে যুগে ভাসের সরল ভাষা, ভাষণৈক্য, পদ্ধতির ঐক্য অবলম্বনে কি প্রকারের অত্যাচার যে তাঁর উপরে চলেছে—তার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ—কিছুকাল পূর্বে গোণ্ডাল থেকে রাজবৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী প্রকাশিত যজ্ঞফল নামক গ্রন্থ। ভাসের নামে প্রচলিত এই যজ্ঞফল গ্রন্থটি যে বিংশ শতাব্দীতেও ভাসের নামে জালিয়াতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

(১) ভাসের নাটকের উৎকর্ষ-বিষয়ে বল্‌তে গিয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাকবি বাণভট্ট বলেছেন—

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহু-ভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরিব॥

(হর্ষচরিত, প্রারম্ভ শ্লোক ১৬)। অর্থাৎ, ভাসের নাটকের আরম্ভ সূত্রধারের দ্বারা; তাঁর নাটকে পাত্রপাত্রী বহু; পতাকা-নায়কও অনেক। এ নাটকসমূহের দ্বারা, দেবকুলের দ্বারা যেমন, তিনি যশোলাভ করেছিলেন॥ উদাহরণ-ক্রমে বলা যেতে পারে যে, তাঁর স্বপ্নবাসবদত্তায় ১৬টী নাটকীয় চরিত্র, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণেও ১৬টী, অবিমারক, অভিষেক এবং পঞ্চরাত্রের প্রত্যেকটীতে প্রায় ৩০টী, চারুদত্তে বার এবং বালচরিতে প্রায় ত্রিশটী চরিত্র। এরূপ বিরাট বাহিনী অন্যান্য সমাকৃতি নাটকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কিন্তু এ সকল চরিত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র-গুলিরও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার আগ্রহে ভাসের সমকক্ষ কেও নাই। অন্যদিকে চরিত্র-সংখ্যা কমানোর দিকেও ভাসের কঠোর দৃষ্টি দেখা যায়। যেমন, অবিমারকে কাশীরাজ বা সুচেতনার মঞ্চে আবির্ভাব প্রত্যাশিত হলেও, তাঁদের বক্তব্য থাকলেও, তিনি তাঁদের রঙ্গমঞ্চে এনে নাটকীয় পাত্রের সংখ্যা বাড়াননি। তাঁর বাক্‌সংযমপ্রচেষ্টাও অনুকরণীয়। অভিষেক-নাটকের অন্তভাগে সীতা যদিও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন, তথাপি তিনি কোনও ভাষণে প্রবৃত্ত হননি।

(২) ভাস বহু নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা। রামায়ণ-অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন (১) প্রতিমা (২) অভিষেক। মহাভারত অবলম্বনে—(১) মধ্যমব্যায়োগ (২) দূত-ঘটোৎকচ (৩) কর্ণভার, (৪) দূতবাক্য (৫) উরু-ভঙ্গ (৬) বালচরিত ও (৭) পঞ্চরাত্র। প্রাচীনকাহিনী ও ইতিহাস অবলম্বনে রচনা করেছেন তিনি—(১) অবিমারক (২) চারুদত্ত (৩) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও (৪) স্বপ্ন-বাসবদত্তা। এতগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন—কিন্তু কোথাও জড়তা নেই, ভাবের দৈন্য নেই, নব নব চিন্তোন্মেষের বিরতি নেই, ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারার মতই পাঠকমণ্ডলীর হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে পতিতপাবনী তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সাগর-সঙ্গমে—অসীমের

---

১ সৎকাব্যসংহারবিধৌ খলানাং দীপ্তানি বক্ত্রৈরপি মানসানি। ভাসস্য কাব্যংখলু বিষ্ণুধর্মান্ সোঽপ্যাননাৎ পারতবন্মুমোচ॥

২ ভাস-ব্যাসয়োঃ কাব্য-বিষয়ে স্পর্ধাং কুর্বতোঃ সর্বোৎ-কর্ষবর্তিত্বেন পরীক্ষান্তরাভাবাৎ পরীক্ষার্থমগ্নিমধ্যে তয়োর্দ্বয়োঃ কাব্যদ্বয়ং ক্ষিপ্তম্। তয়োর্মধ্যাদগ্নির্বিষ্ণুধর্মান্না-দহিতি প্রসিদ্ধিঃ। খলৈস্তু প্রাপ্তং সৎকাব্যং দহ্যতে ইত্যগ্নেঃ সকাশাৎ খলানাং দাহকত্বমিত্যর্থঃ॥—জোনরাজকৃত-বিবরণ॥

সন্ধানে। তিনি তেরটী নাটকের রচয়িতা—প্রত্যেকটাই নাট্যপ্রয়োগে, ভাবাবেগে, ভাষার সাবলীলতায় অনবদ্য। তাঁর ভাবগতির আরো বৈশিষ্ট্য এই—তা' আপন গতিতে আপনি অগ্রসর—রাখে না অপেক্ষা অন্য কারো। কেবল রামায়ণের কাহিনীমূলক নাটকদ্বয়ে তিনি খুব বেশী নাট্যবস্তুতে নব নব বস্তুকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। অন্য সব গ্রন্থে বর্ণিত নাট্যবস্তুতে মৌলিকগ্রন্থ থেকে তিনি অনেক নূতন বস্তু সংযোজন, প্রয়োজনবশে অনবদ্যভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। মধ্যমব্যায়োগে মধ্যমপুত্রের আত্মত্যাগের প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সমস্ত নাটককে একদিকে যেমন সুমধুর করে তুলেছে—তেমনি স্বামীর প্রতি হিড়িম্বার প্রেম ও পুত্রের মায়ের প্রতি আকর্ষণও নবীন রসের সঞ্চার করেছে। কর্ণভারে কর্ণের চরিত্রে অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে; মহাভারতের কর্ণ ইন্দ্রের কাছে স্বকীয় বর্ম উৎসর্গ করে প্রতিদানে চেয়েছিলেন অভ্রান্ত-লক্ষ্যভেদী শর; কর্ণভারে কর্ণ দান করেই মুক্ত; প্রতিদানে তাঁর কিছুই আর চাওয়ার নেই। দূতবাক্যে কৃষ্ণ ও দুর্যোধনের চরিত্রের পার্থক্য অতি পরিস্ফুট; এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত হয়েছেন। উরুভঙ্গে দুর্যোধন-চরিত্র অতি মর্মস্পর্শী রূপে অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবমাননা-প্রদর্শনের চরম শাস্তি দুর্যোধনের হয়েছে সত্য, কিন্তু তথাপি যখন মৃত্যুসময়ে নিজের প্রাণাধিক পুত্র দুর্জয়কে কোলে নিতে না পেরে তাকে সরিয়ে দিতে হয়, সে দৃশ্য সত্যি হয়ে উঠে যেন দুঃসহ—

হৃদয়প্রীতিজননো যো মে নেত্রোৎসবঃ স্বয়ম্।
সোঽয়ং কালবিপর্যাসাচ্চন্দ্রো বহ্নিত্বমাগতঃ ॥ ৪৩ ॥

তবে এটী সত্য যে মৃত্যুকে দুর্যোধন সানন্দে নিল বরণ করে', তবু নিজের দর্প ছাড়েনি।

বালভারতে ভাসের কবিপ্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করেছে অন্যভাবে। এখানে কবি দর্শকমণ্ডলীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন নানা বর্ণ বৈচিত্র্য—কাত্যায়নীর অনুচরবৃন্দ, বৃষ, অরিষ্ট, সর্পাসুর, কালীয়—নানা সজ্জায় সজ্জিত। কংসবধ অত্যন্ত সাধু সঙ্কল্প—তবে সে বীররসের অনেকটা শৃঙ্গার ও অদ্ভুত রসেরও ঘটেছে সংমিশ্রণ। অবিমারকে কবির একটী বৈশিষ্ট্য—তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ফুটে উঠেছে—সেটী হচ্ছে দ্রুতগতি, কার্যে তৎপরতা ও অনবচ্ছিন্ন বেগ। সংস্কৃত নাটক অনেক সময়ে এ বিষয়ে দোষদুষ্ট; কিন্তু ভাসের নাটক—বিশেষ করে অবিমারক এ ধারার পূর্ণ ব্যতিক্রম। নিজের দৃঢ়সঙ্কল্পকে কার্যে রূপান্তরিত করার অপ্রাণ চেষ্টায় অবিমারকের নায়ক সৌবীররাজপুত্র কুন্তীরাজ ভাগিনের বিষ্ণুসেন কখনও বা প্রবেশ করছেন দাবাগ্নিতে, কখনও শৈলাগ্র থেকে লম্ফপ্রদানে উদ্যুক্ত। স্বীয় প্রাণ তার কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ; মাতুলকন্যা কুরঙ্গনয়না কুরঙ্গী তার চিন্তাসর্বস্ব। অন্যদিকে নায়িকা কুরঙ্গীও মরণোদ্যতা। এ পালা দিয়ে মৃত্যুকে বরণ-করে-নেওয়া প্রেমিক-প্রেমিকার শুভমিলন দর্শকমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-নির্ঝর স্বরূপ। কিন্তু মানবপ্রেম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে স্বপ্নবাসবদত্তায়। এ গ্রন্থের নায়িকা বাসবদত্তা সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মতই চিরশ্রদ্ধেয়া, চিরবন্দনীয়া। পদ্মাবতী সতীকুল-শিরোমণি, রূপে গুণে অতুলনীয়া, স্বামীর হিতসাধনমানসে আত্মবিহ্বলা। পদ্মাবতীর প্রতি উদয়ন-রাজের মমতা স্বাভাবিক; কিন্তু পদ্মাবতীর কাছে তো রাজা উদয়ন কিছুতেই ঘোষবতী বীণা বাদন করলেন না। বিদূষকের কাছে রাজা একদিন নিজের মনের কথা স্পষ্ট বল্লেন—পদ্মাবতী রূপ, স্বভাব মাধুর্যে সত্যি বহুমানযোগ্য, কিন্তু তাঁর প্রাণ সতত পড়ে রয়েছে সেই মুগ্ধ

চোখের প্রথম আলো, সকল ভালোর প্রথম ভালো — বাসবদত্তার কাছে :—

"পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।
বাসবদত্তাবদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি॥"

বাস্তবিক পক্ষে—বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও উদয়ন-রাজের চরিত্র সম্পূর্ণ অতুলনীয়। ভাসের অতুলনীয় লেখনী চরম সার্থকতা লাভ করেছে বাসবদত্তা-চরিত্রাঙ্কণে। বাসবদত্তায় বিকীর্ণ হয়েছে প্রেমের শ্রেষ্ঠ দ্যুতি—নিরুপম, প্রোজ্জ্বলতম, সর্বত্র রঙে রঙে আলো-করা পূর্ণ বিভা।

তাঁর চারুদত্তে চিত্রিত হয়েছে আর একটী নূতন দিক্—তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা। গণিকা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির চিত্রণে এ সামাজিক নাটক উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

নানা ভাবে, নানারূপে, পরমসমুজ্জ্বল ভাস-নাটক-চক্রকে লক্ষ্য করে তাই দণ্ডী তাঁর অবন্তি-সুন্দরী কথায় বলেছিলেন—

"সুবিভক্ত-মুখাদ্যঙ্গৈ র্বক্তৃলক্ষণবৃত্তিভিঃ।
পরতোঽপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ॥"

ভাস সর্বদা রয়েছেন আমাদের চোখের সামনে বর্তমান; তাঁর এক একটী নাটক তাঁর অতি সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুবিভক্ত মুখাদিযুক্ত, বক্তৃ-লক্ষণ-বৃত্তি-সমন্বিত। তিনি চিরকাল অমর॥

(৩) মহাকবি ভাসের নাটকাবলীর যেমন অপূর্বরূপ, তেমনি রসবৈচিত্র্য ও পূর্ণতা। প্রসন্ন-রাঘবের কবি একদিন তাঁকে বড়ই আনন্দে, বড়ই গৌরবের সঙ্গে সরস্বতী দেবীর হাস্য বলে বর্ণনা করেছিলেন।[১]

কবির এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কবির মধ্যে এমন একটি অন্তর্লীন হাস্যরস আছে, যা' কাব্যরসিকমাত্রেরই প্রভূত আনন্দ দান করে বিনা প্রয়াসে, নিমিষেই। যেমন সুভাষাবলীতে উদ্ধৃতভাসের নিম্নলিখিত কবিতায়—

"কপালে মার্জার পয় ইতি করাঁল্ লেঢ়ি শশিনঃ
তরুচ্ছিদ্রপ্রোতান্ বিসমিতি করী সংকলয়তি।
রতান্তে তল্পস্থান্ হরতি বনিতাঽপ্যংশুকমিতি
প্রভামত্তশ্চন্দ্রো জগদিদমহো বিপ্লবয়তি॥"

যে অন্তর্নিহিত হাস্য রয়েছে, তাই হয়ে উঠে সহৃদয়-হৃদয় পরিতৃপ্ত। কবি এ কবিতায় বল্‌ছেন—

"চন্দ্রের কিরণ এসে ছড়িয়ে পড়েছে মার্জারের গণ্ডস্থলে, সে তা'কে দুগ্ধভ্রমে লেহন করছে। গাছের ছিদ্রমধ্যে অবস্থিত চন্দ্রকররাশিকে মৃণাল ভেবে হস্তী তাকে কেড়ে নিতে হয়েছে উদ্যত। প্রেমবিনোদনরতা বনিতা শয্যাস্তীর্ণ চন্দ্রবিম্বকে নিজের বস্ত্রাঞ্চল ভেবে তাকে নিচ্ছে কুড়িয়ে। অহো!—প্রভোন্মত্ত চন্দ্র সমগ্র বিশ্বকে করে তুলেছে বিভ্রান্ত, বিপ্লবগ্রস্ত।" এরূপ সুদূর-প্রসারী কল্পনার মাধ্যমে সূক্ষ্মসঞ্চারী হয়েছে হাস্য-রসের উন্মেষ। বীর, শৃঙ্গার, করুণ বা অদ্ভুত রস বহুলভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে তাঁর নানা গ্রন্থে নানাভাবে। কিন্তু সুষ্ঠু ভাবে যে রস-পরিবেশনে বড় বড় অনেক কবি প্রায় অসমর্থ, ভাস সে রস পরিবেশে একেবারে সিদ্ধহস্ত। মহাকবি ভব-ভূতি করুণরস পরিবেশনে সম্পূর্ণ অদ্বিতীয়; কিন্তু হাস্যরসের অবতারণায় তিনি অপারগ। ভাসের রসপরিবেশনে কোনও স্থানে দৌর্বল্য নেই। ভাসের বিদূষক-চরিত্র অতি মনোরম। ভাসের নিপুণ তুলিকাঙ্কনে বিদূষক কেবল হাস্যরসপ্রবণ নায়কচ্ছায়ামাত্র নন, অবিমারকের কথায় বলতে হয়—বিদূষক যুদ্ধে অস্ত্রবিশারদ, দুঃখে চরম সান্ত্বনা-দাতা, শত্রুদের দুর্ধর্ষ শত্রু—অন্যদিকে, পরম সুহৃৎ। অবিমারকে কুরঙ্গীর অশ্রুর সঙ্গে স্বীয় অশ্রু সংমিশ্রণের জন্য বিদূষক অত্যন্ত কাতর; কিন্তু যে বিদূষক বলে যে এমন কি, নিজের পিতার

---

(১) যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরঃ
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥

মৃত্যুন্তেও বের হবে না এক ফোঁটা শুকনো চোখের জল—তার অশ্রু-উদ্গমের সম্ভাবনা কোথায়? তবু পুরুষ বলে সম্বোধন করলে সে নিজকে নারীরূপে পরিচয় দিতে পরম ব্যগ্র। সে—

ধন্না সুরাহি মত্তা ধন্না সুরাহি অণুলিত্তা।
ধন্না সুরাহি হ্নাদা ধন্না সুরাহি সংএবিদা॥[১]

(প্রতিজ্ঞা-যৌগ, ৪.১)

অর্থাৎ সুরায় যারা মত্ত, তারাই ধন্য; পানীয় দ্বারা যারা অনুলিপ্ত, তারাই ধন্য; পানীয় দিয়ে যারা স্নাত—তারাই ধন্য, ইত্যাদি বলে এক দিকে সেধেই সেই করে নাচ্ছে, কিন্তু আসলে একেবারে ঠিক—নিজে এক ফোঁটা মদ কস্মিন্ কালেও সে পান করে না। পানভোজনন্যৃত্যপরায়ণ উন্মত্তক-বেশে কূটরাজনীতিবিদ্ যৌগন্ধরায়ণের চিত্র এবং শ্রমণক-বেশে রুমণ্বানের চরিত্রও পরম কৌতুকাবহ। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে গাত্রসেবক এবং চাকরের দৃশ্যে উদয়ন-বাসবদত্তার নীরব পলায়নের নিমিত্ত ভদ্রবতী হস্তিনীর সাজসজ্জাকরণ অন্যতর হাস্যোদ্দীপক ঘটনা। হস্তিনীর সাজসজ্জায় মহাসেনের রক্ষিগণের সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কথা নয়। মধ্যমব্যায়োগে ঘটোৎকচ কর্তৃক ভীমসেনের হিড়িম্বার নিকট আনয়নেও রয়েছে কৌতুকোদ্দীপক চমৎকারিত্ব। অবিমারকের অন্ত্যভাগে সমস্ত ঘটনাসন্নিবেশে কুন্তিভোজের এমন অবস্থা হয়েছে যে তিনি নিজের সম্বন্ধে, নিজের রাজধানী সম্বন্ধে সবি ভুলে গেছেন। তাঁকে বলে দিতে হচ্ছে যে তিনি নিজেই কুরঙ্গীর পিতা, দুর্যোধনের পুত্র, এবং বৈরন্ত্যেশ্বর কুন্তিভোজ।

অদ্ভুত রসপরিবেশনেও ভাসের দক্ষতা প্রচুর এবং তাঁর উপায়ও অভিনব। অভিষেক-নাটকে শঙ্কুকর্ণকে হনুমানের বিরুদ্ধে সহস্র সৈন্য প্রেরণের জন্য আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কুকর্ণ এসে খবর দিল যে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই তারা হয়েছে নিহত। রামায়ণ-মহাভারতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, সে ভাবে ভাসও যাদু-অস্ত্র প্রয়োগে ব্যগ্র। দূতবাক্য, মধ্যমব্যায়োগ প্রভৃতি নাটকে এর প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। অবিমারকে কবি এমন এক অঙ্গুরীয়কের উদ্ভাবন করেছেন যার জোরে নায়ক শুদ্ধান্তঃপুরে সকলের অজ্ঞাতে প্রবিষ্ট হতে পারেন এবং কুরঙ্গীর সঙ্গে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু এ সমস্ত ক্ষেত্রেই কালিদাস এমন সহজ-সুগমভাবে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যাতে দর্শকমণ্ডলী পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে ভাসের বর্ণিত ঘটনাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে।

(৪) নাট্যরূপাবতারণায় ভাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্ববাদিসম্মত। তিনি নাট্যশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির কোনও ধার ধারেন না। মঞ্চে যুদ্ধের বা মৃত্যুর দৃশ্য তিনি অসঙ্কোচেই অবতারণা করেন, কৃষ্ণ ও অরিষ্টের যুদ্ধ নারীদেরও দর্শনযোগ্য। দশরথের মৃত্যু; চাণূর, মুষ্টিক, কংস প্রভৃতির মৃতদেহ রঙ্গমঞ্চে স্থাপন—এতে তাঁর আপত্তি নেই। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, স্থাপনা বা প্রস্তাবনা প্রভৃতি সর্বত্রই তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিই তাঁর একমাত্র অনুসরণীয়।

(৫) ভাসের ভাব যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ভাষাও তেমনি অনির্বচনীয়, সরল, সাবলীল। উচ্চারণ-মাত্রই করে মর্মস্পর্শ—ভরতের রামভক্তি দুটী পঙ্ক্তিতে কি সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে—

তত্র যাস্যামি যত্রাসৌ বর্ততে লক্ষ্মণপ্রিয়ঃ।
নাযোধ্যা তং বিনাযোধ্যা সাযোধ্যা যত্র রাঘবঃ॥

অর্থাৎ আমি সেখানেই যাব, যেখানে আছেন লক্ষ্মণপ্রিয় রাম। তাঁকে বিনা অযোধ্যা অযোধ্যা নয়; তিনি যেখানে আছেন, তাই অযোধ্যা॥

বর্ণনভঙ্গিমা, চরিত্রচিত্রণ, ভাবমাহাত্ম্য, শব্দ-প্রয়োগকৌশল প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে একক, অতুলনীয় বরণীয় মহনীয় এ কবিসম্রাটকে আমরা হৃদয়ের অনবদ্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

---

(১) ধন্যাঃ সুরাভির্মত্তা ধন্যাঃ সুরাভিরনুলিপ্তাঃ।
ধন্যাঃ সুরাভিঃ স্নাতা ধন্যাঃ সুরাভিঃ সংজ্ঞাপিতাঃ॥

জীবনের গুরু-লাভ

(শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে)

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত, এম্-এ,
পি-আর্-এস্, পিএইচ্-ডি

জ্যোতির্ম্ময় সৌম্যকান্তি উদাসীন তরুণ তাপস
প্রজ্ঞামূর্তি অপ্রমত্ত—বালভাবে আনন্দ-বিবশ
ভ্রমিতেছে নিঃশঙ্ক হৃদয়
ইচ্ছামুখে—অন্যমনা—একান্ত নির্ভয়।
চারিদিকে বাসনার দাবাগ্নির মাঝে
গঙ্গানীরে ভাসমান করী হেন অসঙ্গ বিরাজে।
মর্ত্তে তাঁর দেহের বিহার—
কোন্ ধ্রুব-একতানে চিত্ত বদ্ধ তাঁর !

ধর্ম্মবিদ্ যদু তাঁরে শুধালেন শ্রদ্ধানত চিতে,—
এই পৃথিবীতে
স্পর্শহীন বন্ধহীন ফিরিতেছ আপনার মনে—
আনন্দ উল্লাসে ভালে—বিদ্যুৎ শিহরে নবঘনে !
কোথা হ'তে এ আনন্দ—কেমনে লভিলে তারে তুমি ?
কহ যদি বিন্দুমাত্র—ও চারু চরণ দু'টি চুমি।

দীপসম আঁখি দু'টি উজ্জলিল স্নিগ্ধ স্মিতহাসে,
কহিলা তাপস মৃদু ভাষে,—
বৃহৎ জীবন-পথে যবে মোর যাত্রা হ'ল শুরু
পদে পদে লভিয়াছি গুরু;
তাঁহারা দিয়েছে জ্ঞান—নিগূঢ় অশেষ
পরমের দিয়েছে নির্দ্দেশ;
খুলেছে আঁখির আবরণ—
অন্তরের অফুরন্ত আনন্দের তাহাই কারণ।

গুরু মোর এ পৃথিবী—গুরু মোর বায়ু ও আকাশ,
গুরু মোর জল অগ্নি—উর্দ্ধে চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ;
বনের কপোত গুরু—গুরু মোর সর্প অজগর,
বিরাট সমুদ্র গুরু—গুরু যে পতঙ্গ, মধুকর;
ফুলে ফুলে গুঞ্জরিছে ভ্রমর যে—সে আমার গুরু—
চকিত হরিণ গুরু—সুরে যার বুক দুরু দুরু !
গুরু মোর মীন,
পতিতা পিঙ্গলা গুরু—মোর চক্ষে সেও নয় হীন।
গুরু যে কুরর—বনপাখী,
ছোট শিশু জ্ঞান দিল ডাকি;
নবীনা কুমারী
শিক্ষা দিল আচরণে তারি;
তীর গড়ে অনন্যমানস
সেও লভে প্রাজ্ঞ-গুরু-যশ।
বিবরের সাপ
জ্ঞান দিল—নহে বিষতাপ;
ঊর্ণনাভ—ক্ষুদ্র কীটপোকা
প্রজ্ঞা দিল—বিমলা অশোকা !
জীবনের যেই দিকে চাই—
সত্যদাতা জ্ঞানদাতা গুরু ছাড়া নাই !

চেয়ে দেখ পৃথিবীর পানে—
সে কখনো রোষ নাহি জানে।
লক্ষ লক্ষ জীবগণ নিশিদিন করে উৎপীড়ন—
ধৈর্য্যময়ী মাতার মতন
সহে তাহা অকাতরে
স্থির বক্ষ 'পরে।
অচলপ্রতিষ্ঠা এই ক্ষমাব্রতে তার,
এ-শিক্ষায় গুরু সে আমার।
ওই গিরি—ওই বৃক্ষ—পৃথ্বীর সন্তান—
একান্তে নির্জনে দেখ তাহাদের শুধু আত্মদান;

পলে পলে পরহিত লাগি
অতন্দ্র রয়েছে তারা জাগি।
পরার্থে সর্বস্বত্যাগে কি মহিমা আছে
শিখিলাম তাহাদের কাছে।

সর্বত্র বিচরে বায়ু—সর্ববিধ বিষয়ে প্রবেশ—
তবু নাই আসক্তির লেশ।
ভালমন্দে উদাসীন—নির্লিপ্ত সদাই,
অনাসক্ত অনুরাগে সেও মোর গুরু হ'ল তাই।

বিপুল আকাশ
এনে দেয় সীমাহীন সর্বব্যাপী সত্যের আভাস।
ক্ষুদ্রের মাঝারে আছে—তবু আছে অনন্ত বাহিরে—
কোথা তার ছেদ নাই—কোথা তার বন্ধন নাহিরে।
বাতাসের বেগ
সহসা ছড়ায়ে দিল ঘনকৃষ্ণ মেঘ;
মনে হয়—আবৃত অম্বর
কাঁপে থর থর;
পরক্ষণে দেখি তার স্বচ্ছ নীল নির্মল বিস্তার—
কালহীন দেশহীন স্বপ্রকাশ সত্য নির্বিকার!

স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জল
মুনির মানস যেন করে টলমল;
স্পর্শে তার মহাশান্তি—দর্শনেও প্রীতি সুপ্রচুর,
মহতের প্রকৃতি যে আপনাতে এমনি মধুর।
পুণ্যতীর্থ জল,
মহতের চিত্ত তীর্থ— অবগাহি' লভি পুণ্যফল।
এই জল—তারে গুরু জানি,
কলস্বনে উপদেশ—শ্রদ্ধাসহ মানি।

অগ্নি দিল তেজোময়—তপস্যার দীপ্তি সমুজ্জ্বল—
দিল উগ্র দুর্ধর্ষতা—মহতে পূত বীর্যবল।
সর্বগ্রাসী—সবভুক্—তবু
পাপলেশ নাহি স্পর্শে কভু;
হেমকান্তি স্পর্শে দেয় সর্ব পাপ মুছি—
তপস্বী যে—নিত্যকাল অগ্নিসম শুচি।

কখনো প্রচ্ছন্ন রহি, কভু সুপ্রকাশ—
অর্ঘ্য নেয় পরেচ্ছায়—সর্ববিধ পাপ করি' গ্রাস।
অগ্নি পর-সত্যের স্বরূপ—
প্রবেশি' বস্তুর মাঝে ধরে তার রূপ;
আপনাতে রূপহীন কায়া—
বুঝিলাম অনির্বাচ্য মায়া।

দূর নভে চন্দ্র হেরিলাম—
স্নিগ্ধজ্যোতি সৃষ্টির ললাম।
কালে কালে বাড়ে কলা—কালে কালে ক্ষয়,
বাহিরের হ্রাস-বৃদ্ধি—আপনাতে নয়।
বুঝিলাম, দেহপিণ্ড—মাটির এ ডেলা—
ভাঙে কাল—গড়ে কাল—কালের এ খেলা;
স্থির অচঞ্চল
পিণ্ডমাঝে পুরুষ কেবল।

সূর্যের দেখেছি আচরণ—
বিকিরিয়া সহস্র কিরণ
আকর্ষণ করে বারি রাশি—
হাসি' হাসি'
পুনর্বার দেয় তারে ছড়াইয়া এ-বিশ্বভুবনে
লাভক্ষতি কিছু নাহি মনে।
নিস্পৃহ এ-যোগিচর্যা নিত্যকাল তার—
পাত্র তাই পরম শ্রদ্ধার।
আরও দেখ, সুদীপ্ত ভাস্বর
মহাব্যোমে এক দিবাকর;
নিম্নে হের ক্ষুদ্র বড় অনন্ত আধার—
প্রতিপাত্রে ভিন্নরূপে প্রতীত অনন্ত জ্যোতি তার
মহাশূন্যে মহাকালে বিরাজিত এক জ্যোতির্ময়—
তারি পরিচয়
সৃষ্টির অনন্ত ভেদে—বৈচিত্র্যের মণিরশ্মিজালে
কালের নৃত্যের তালে তালে।
এই সূর্য—এই চন্দ্র—গুরু এরা সবে—
জ্যোতির্বাণী রূপে চিত্তে রবে।

অরণ্যের একপ্রান্তে বৃক্ষশাখে পল্লব-ছায়ায়
কপোত বেঁধেছে নীড় গভীর মায়ায়।
প্রীতিময়ী অতি
সাথী তার বনের কপোতী।
বাঁধা তারা আঁখিতে আঁখিতে —
অঙ্গে অঙ্গে—দেহে মনে,—ঠাঁই কোথা
এ প্রেম রাখিতে!
এক সঙ্গে উড়ে চলে যায়
বহুদূর ঘনবনচ্ছায়
যেথায় মন্থরা নদী আঁকাবাঁকা চলে,
তৃণে ঢাকা শ্যাম কূলে খেলা করে
স্বচ্ছ কালো জলে।
অস্ফুট কূজনে আলাপন
ঠোঁটে ঠোঁটে প্রেম-সম্ভাষণ।
এক প্রাণ বহে দুই দেহ—
সুখ-স্বপ্নে বাঁধা ছোট গেহ।
ছোট তাহাদের সুখ-নীড়,
তারি মাঝে কচি কচি শাবকের ভিড়;
পালকের কোমল পরশ—
মুগ্ধচিত্তে গভীর হরষ!
কম্রকণ্ঠে অধস্ফুট কলকল ভাষা
স্পন্দিত করিয়া দেয় সুনিবিড় অচেতন আশা।

নীড়ে রাখি স্নেহের পুত্তলি
কপোত-কপোতী গেল চলি
এক দিন দূর বনে
খাদ্য অন্বেষণে।
হেন কালে
ব্যাধ আসি তার ঘনজালে
বাঁধে যত কপোত-শাবক—
জাগিল করুণ আর্তরব।
আহার লইয়া মুখে ফিরে এল বনের কপোতী—
দূরশ্রুত আর্তরবে আশঙ্কিতা অতি;

তারপরে অন্ধস্নেহভরে
ঝাঁপায়ে পড়িল তার সন্তানের পরে;
ব্যাধ হেন কালে
কপোতী বাঁধিল তার জালে।
খাদ্যমুখে কপোত আসিল গৃহে ফিরে
করুণ ক্রন্দন শুধু জাগিয়া উঠিল তারে ঘিরে;
নিজে আসি ধরা দিল ঘনমায়াজালে
স্নেহপাশে ব্যাধপাশ—এই ছিল ভালে!

এ-কপোত গুরু শিক্ষাদাতা;
বলে দিল, দিকে দিকে মায়াজাল পাতা।
স্নেহপ্রীতি ডোর
নয় নয় সুকোমল—বন্ধ সুকঠোর—
যত দিন যবনিকা তুলি
না লভি সন্ধান তাঁর—যাঁরে আছি
মোহস্বপ্নে ভুলি।

শিক্ষা দিল ধৈর্যবান্ বন-অজগর—
যথালব্ধ ভোগ্যে চিত্ত পরিতৃপ্ত রাখ নিরন্তর।
অল্প হোক, বেশী হোক, যাহা আসে
তাতে রহ খুশী—
ক্ষুব্ধ খিন্ন নাহি হও অদৃষ্টেরে দুষি';
নিজেরে অতন্দ্র রাখ—বীর্যবান্ ওজস্বী উৎসাহী—
তবু রহ ধৈর্যবান্ বীতস্পৃহ—সন্তোষ-
সলিলে অবগাহি'।

এই বাণী স্থির জলধির—
প্রকাশে প্রসন্ন হও—চিত্তমাঝে গহন গম্ভীর!
অপার রহস্য রাখ অন্তরের অন্তস্তলে ঢাকি',
বিপুল ঔদার্যে স্তব্ধ থাকি।
মহান্ অনতিক্রম্য ধীর—
স্তিমিত-অতলস্পর্শ নীর!
স্ফীত নহে কামনার বেগে
অভাবেও অবিকার—চিত্ত রহে এক সত্যে জেগে।

বাসনার বহ্নিমাঝে দহি'
পতঙ্গ কহিল, আমি বরণীয় নহি।
ফুলে ফুলে ভ্রমিয়া ভ্রমর
বিন্দু বিন্দু আহরণে নিজেরে করিছে মহত্তর।
জীবনের পাত্রখানি ধীরে ধীরে নিতে হবে ভরি'
যাহা বিশ্বে মধুময় তাহা হ'তে করি মাধুকরী।
দূর হোক লোভের সঞ্চয়—
লুব্ধতার ক্ষুব্ধতায় আত্মার ঘৃণিত পরাজয়।
করিচিত্তে দুর্নিবার করিণীর অঙ্গসঙ্গ-আশ—
কামনার পঙ্কগর্তে ঈর্ষাক্লিন্ন আপন বিনাশ।
সুরমোহে ব্যাধপাশে আবদ্ধ হরিণ;
সে নহে সঙ্গীত—যার সুরে চিত্ত নহে বন্ধহীন।
রসনা-মোহিতচিত্তে মীনের বন্ধন—
নির্লোভসংযতচিত্তে আনন্দ-স্পন্দন।
রূপমত্তা কামান্ধ চঞ্চলা
বিদর্ভের বিত্তলোভী পতিতা পিঙ্গলা
কাটাইল বহুকাল নিশি জাগরণে
সুখ-অন্বেষণে।
তৃপ্তিহীন শান্তিহীন দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
চিত্তের অসহনীয় নৈরাশ্যধূসর রিক্ততায়
তার বুকে নেমে এল ডাক—
থাক্ থাক্—সব প'ড়ে থাক্!—
জীবনের শূন্য অন্ধকারে
ঊর্ধ্বে তুলি দুই বাহু শুধু খোঁজ তারে—
করুণায় যে আসিবে নেমে
সর্ব তব দেহমনে—নিবিড় আনন্দে আর প্রেমে।
পতিতা পিঙ্গলা—
সেও মোর শিক্ষা-গুরু—স্নিগ্ধ সুমঙ্গলা।

ফলমূলভোজী পাখী নিরীহ কুরর,
তারা মাংসখণ্ড নিয়ে হানাহানি করে পরস্পর!
তারে ত্যজি' লভে শান্তিধন—
শিখিলাম, সুখিশ্রেষ্ঠ নিঃস্ব অকিঞ্চন।

নাহি মান অপমান—নাহি কোনো
দুশ্চিন্তা কঠোর—
আপনাতে আপনি বিভোর—
আত্মরতি সদানন্দ বালক সুন্দর
গুরু সেই গুণাতীত নর।

প্রেমোদ্বিগ্না কিশোরী কুমারী
নিজগৃহে বরিয়াছে দয়িত তাহারি;
তারি পরিতোষ-আয়োজনে
গৃহকাজ করে সঙ্গোপনে;
হাতে তার দুইটি কঙ্কণ
বাজে ঝন্ ঝন্
প্রেম-সাধনায়
'দুই' তার হ'ল অন্তরায়।
দূরে ফেলি একটি তাহারি
একান্তে সাধনমগ্ন রহিল কুমারী।
শিক্ষা দিল কুমারীর একটি কঙ্কণ—
একান্তে নিভৃতে চাই একতান মন।

মুগ্ধচিত্তে একদিন হেরিলাম শরের নির্মাণ;
নির্মাতার মনঃপ্রাণ
একাগ্র শরের সম—এক লক্ষ্যে স্থির—
সর্ব কোলাহল মাঝে অচঞ্চল ধীর!

নিকেতনহীন সর্প—বাসস্থান পরের বিবর,
নীরব অলক্ষ্যমান—সুখী স্বেচ্ছাচর—
গূঢ় মৌন স্বচ্ছন্দ বিহার
সেই সর্প—গুরু সে আমার!

হেরিলাম, শিল্পী ঊর্ণনাভ
লীলাচ্ছলে প্রকাশিছে নিখিলের অন্তর্লীন ভাব।
আপনারে ঘিরি'
নিজেরে রচিছে ফিরি' ফিরি'
নিত্য নবকালে
তন্তুময় সূক্ষ্ম জালে জালে।

পরক্ষণে কোন্ যাদুবলে
সংহারিছে সৃষ্টি তার আত্মমাঝে অপূর্ব কৌশলে !
সীমাহীন শূন্য হ'তে ঝরা
সৃষ্টির রহস্য দিল ধরা।
দেশহীন কালহীন সঙ্গহীন পরম দেবতা
চন্দ্রে সূর্যে গ্রহে গ্রহে বিঘোষিছে আপন-বারতা ;
একের স্পন্দনে জাগে শূন্যে শূন্যে
স্তরে স্তরে কাল—
জাগে দেশ—জাগে বস্তু—জাগে মহা-
সৃষ্টি-বিশ্বজাল !
একের মাঝারে পুনঃ সর্ব সংহরণ—
এক মহা-উর্ণনাভ নিত্য আত্মলীলা-নিমগন !

কীট তুচ্ছ অতি
গুরু ব'লে সেও পেল মোর শ্রদ্ধানতি।
এই কীট—অপরের স্পর্শ লভি' একে
আপন বিবরে পশি ধ্যাননেত্রে শুধু তারে দেখে ;
ধ্যানে মগ্ন দেহমন—নিভৃতে নিশ্চুপে
ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ পরিণতি ধ্যেয়বস্তুরূপে।
সত্য যিনি প্রেম যিনি তাঁরি শুদ্ধধ্যানে নিরন্তর
সত্যে প্রেমে দেহ-মন লাভ করে দিব্য রূপান্তর।

বাহিরে খুঁজিব কত—সর্বতত্ত্ব-গেহ
গুরু মোর আপন এ দেহ।
দেহাশ্রয়ে ক্রমে হয় লাভ
শুচিশুভ্র এ-অসঙ্গ ভাব।
এই দেহ অকুণ্ঠিত অশ্রান্ত সতত
প্রিয়জন-সেবাব্রতে রত ;
তারপরে নিজে
বৃক্ষসম পরিণতি লভে নব বীজে।

এই আমি—এই বিশ্ব—যেদিকে চাহিরে—
গুরু মোর সত্যদাতা—গুরু মোর
অন্তরে বাহিরে।

"যো দেবনামান্যখিলানি ধত্তে"

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষৎ)

জপের আধ্যাত্মিক মূল্য জীবনে উপলব্ধি করিতে এখনও সমর্থ হই নাই, কিন্তু বহুদিন হইতে কতকগুলি দেব-নাম, তৎসংশ্লিষ্ট ভাবরাজির প্রতীক রূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, এই ভাবরাজির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রতীক-স্বরূপ নামগুলির মোহেও আমি পড়িয়া গিয়াছি। মালা-জপের পদ্ধতি মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে বোধ হয় খুব প্রাচীন নহে। বৈদিক যুগে ইহার কোনও উল্লেখ পাই না। পরবর্তী-কালে, আগম-প্রোক্ত পৌরাণিক ভাগবত ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বোধ হয় জপ এবং মালার সাহায্যে জপের রীতি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই মালা-জপের স্থান হইয়া যায়, পরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার প্রচার ঘটে। মালা প্রথমটায় বোধ হয় চিত্ত-প্রসাদের সহায়ক রূপেই প্রচলিত হয়—আমি আমার প্রিয় নামটী এতবার উচ্চারণ করিলাম—মালাতেই তাহার হিসাব সহজে হইয়া থাকে। পরে এই প্রকার জপের পুণ্যফলের কথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

হিসাব রাখিয়া জপ করিবার বিরুদ্ধেও সাধকদের উক্তি পাওয়া যায়—

"মালা জপে সালা। কর জপে ভাঈ।
মন মন জপে। বলিহারী জাঈ॥"

মালা, এবং মালার সাহায্যে জপ,—আমাদের এখনকার ধর্মানুষ্ঠানের বাতাবরণের মধ্যে ইহার বিশিষ্ট স্থান এবং মূল্য এখন সর্বজন-স্বীকৃত। শাক্ত ঘরের ছেলে, ছেলেবেলায় আমি ঠাকুরমাকে এবং কাশীবাসিনী বৃদ্ধা পিসিমাতাকে রুদ্রাক্ষ মালা পরিতে ও সেই মালা জপ করিতে দেখিয়াছি। কি মালা, কিসের দানা, কোন্ দেবতার জপ ঐ রূপ মালায়—অতি শিশুকালে এসব কথা মনেই হইত না। পরে দেখিলাম, বৈষ্ণব ভিক্ষুক এবং বৈষ্ণব গোস্বামীদের কণ্ঠে কাঠের দানার মালা; জানিলাম, তুলসীকাঠের মালা। বৈষ্ণবের কণ্ঠের পক্ষে তুলসী কাঠের মালার সমীচীনতা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম —জানিলাম, শিবকে পার্বতীকে বিল্বদলে পূজা করে, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে তুলসীপত্র দিয়া। ক্রমে জানিলাম—রুদ্রাক্ষ হিমালয় পর্বতে জন্মে, এক প্রকার গাছের বীজ, হিমালয় বিশেষ করিয়া মহাদেবের স্থান, সেই জন্য হিমালয় অঞ্চলে জাত রুদ্রাক্ষ শৈবের কাছে মান্য। হিমালয়ের রুদ্রাক্ষ নেপাল হইতেই বেশী করিয়া আমদানী হয়, এগুলি আকারে বিশেষ বড়; রঙ্গ এগুলির কালো। আবার ছোট রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায়, রঙ্গ বাদামী, কাশীর রুদ্রাক্ষের আড়তের মালিক-দের কাছে শুনিয়াছিলাম—বিদেশ হইতে ঐগুলির আমদানী হয়—মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি হইতে। এই কথার সত্য মিথ্যা যাচাই করি নাই।

শিবের আর শক্তির জন্য জপমালা হয় রুদ্রাক্ষের এবং কচিৎ স্ফটিকের; এবং নারায়ণের তুলসীকাঠের। বিশেষ-দেব-কল্পনা বা দেব-নাম নিরপেক্ষ এমন জপমালা কি নাই, যাহার সাহায্যে যে কোনও দেবতার নাম লইয়া জপ করা যায়? কাশীর বিশ্বনাথের গলির মালা-বিক্রেতাদের কাছে জানিলাম, একমাত্র "বৈজয়ন্তী" মালাতেই সমস্ত দেবতারই জপ করা চলে—এই বৈজয়ন্তী হইতেছে এক প্রকারের ছোট কালো দানা, কোনও ফলের বীজ। কাশীতেই এক-শ'-আট দানার এইরূপ একটী বৈজয়ন্তী-মালা কিনিলাম। পরে তাহা সরু রূপার তার দিয়া গাঁথাইয়া লইলাম। মালা হইতে মালান্তরে না গিয়া, এখন এই একই মালায়, যে শক্তি "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে", বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং আমার অস্তিত্বের অন্তরতম প্রদেশেও যাহা বিদ্যমান, তাহার নাম-রূপাদির যে-সমস্ত মনোহর কাব্যময় ও আধ্যাত্মিকতাময় কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে, সেই কল্পনা যে কতকগুলি নামের মধ্যে সংক্ষেপে যেন ঘনীভূত হইয়া আছে—সেই নামগুলি বার বার আবৃত্তি করিয়া একটু তৃপ্তি পাই—"শিব, উমা; শ্রী, বিষ্ণু।"

কেবল "শিব, উমা; শ্রী, বিষ্ণু" নহে, আরও অনেক।

ইরান দেশ, মুসলমান ভারত ও তুর্কীস্থানকে যিনি আধ্যাত্মিকতার সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সূফী সাধক জলালুদ্দীন রূমী বলিয়াছেন—

"ব-নাম-ই-আন্, কি নামে ন-দারদ্"—

—তাঁহারই নামে, যিনি কোন নামই ধারণ করেন না।—যিনি নাম-রূপের অতীত, তিনিই তো সমস্ত নামের অধিকারী—"যো দেবনামানি অখিলানি ধত্তে।" এই যে বিভিন্ন নাম, তা তো আর কিছুই নয়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কতকগুলি, আমাদের মানব-চিত্তে মানব-কল্পনায় যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহারই নির্দেশক বা প্রতীক মাত্র। একই চিন্তা, একই কথা—সব মানুষের

সমস্ত সমাজের মধ্যে একই ভাবে প্রকাশিত হয় না, আধার বা পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ-ভঙ্গীতেই কিছুটা বিভিন্নতা আসিয়া যায়। ভাবের স্বরূপ এক, ভাষায় প্রকাশ বহু।

বিবেকানন্দ কোথায় যেন বলিয়াছিলেন, different Religions are like so many different Languages. অ-বাঙ্-মনো-গোচর শাশ্বত সত্তা বা সত্য স্বরূপে, "স্বে মহিম্নি" বিরাজ করিতেছে। মানুষ নিজের ভাষার দ্বারা সেই সত্যের নাগাল পাইবার চেষ্টা করিতেছে, ভাষা তাঁহাকে ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছে না, ছুঁই-ছুঁই করিয়াও ছুঁইতে পারিতেছে না। বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বর্ণনায় আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাই। হস্তিদর্শনে অন্ধের উপলব্ধির মত, বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক জগতের বস্তুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিভিন্ন শব্দ পূরা সদ্‌বস্তুকে প্রকাশিত করিতে পারিবে, এইরূপ বিচার ধৃষ্টতা মাত্র; বিশেষতঃ যখন আমরা নাম-রূপ-গুণাদির আরোপ করিয়া কল্পনার চোখে সদ্‌বস্তুকে নিজের বোধগম্য করিয়া ধরিবার চেষ্টা করি। পরব্রহ্ম, রাধাসোআমী, "পরমাৎমা", ঈশ্বর, কর্টরুল্, যাহ্‌বেহ্ বা য়িহোৱাহ্, এল্, শাঙ-তী, অল্লাহ্, খুদায় বা খোদা, তেন্‌রি, দেউস্, থেওস্, বোগ, গড, আদিবুদ্ধ—এ সমস্ত শব্দ যেমন ভিন্ন, সেই রকম এই সমস্ত শব্দের দ্যোতনাও ভিন্ন, যদিও সকল শব্দেরই লক্ষ্য হইতেছে বাঙ্‌মনোঽতীত শাশ্বত বস্তু। তেমনি বিভিন্ন ধর্মে যে সমস্ত দেব-কল্পনা আছে, সেগুলিও শাশ্বত সত্তাকে নব হইতে নবতর চিত্রের সাহায্যে প্রকাশের চেষ্টা মাত্র। এই-সব কল্পনা পরস্পরের পূরক—নির্গুণ মৌলিক সত্তার জন্য "নেতি", "নেতি"—ইহা নহে, ইহা নহে—শব্দের যেমন আবশ্যক, তেমনি মানুষের চিত্তের রঙ্গীন কাচের মধ্যে প্রতিভাত এই-সমস্ত কল্পনাময় প্রকাশকে "ইত্যপি", "ইত্যপি"—ইহাও, ইহাও—শব্দের প্রয়োগও আমাদের করিতে হয়। যাহা এক, এবং অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তাহাই বহু, এবং অনুভূতিগম্য ও আস্বাদনীয়।

এই জন্যই, যেমন বলে to learn a new language is to acquire a new soul; তেমনি বিশ্বমানব যেখানে যে দেব-কল্পনা তাহার মনের আকুলতা দিয়া, আবেগ দিয়া, ভাবুকতা দিয়া, তাহার জাতীয় চেতনার ভাল-মন্দ সব কিছু দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আংশিক উপলব্ধিও "যো দেবনামানি অখিলানি ধত্তে" সেই শাশ্বত বস্তুর সান্নিধ্যলাভের অন্যতম পথ বলিতে দ্বিধা হয় না। এই বোধের বশবর্তী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেবল শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব নহে, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান পন্থ ধরিয়াও সেই সেই পন্থের বিশেষ রস আস্বাদন করিয়া পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য আকুল হইয়াছিলেন।

এই জন্য আমার বৈজয়ন্তী-মালায় "অখিলানি দেবনামানি"-র স্মরণ করিয়া, কত মনোহর কল্পনার মধ্য দিয়া আমি নামরূপ-হীন, যেখানে সমস্ত নাম সমস্ত কল্পনা গিয়া মিলিয়াছে, তাহার আভাস নিজের ব্যক্তিগত কল্পনার মাধ্যমে গড়িয়া তুলিতে পারি। এবং সেই আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিশ্বমানবের হৃদয় মন্থন করিয়া আমার পরিচিত যে সমস্ত দেব-কল্পনা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ও এক-একটী নামকে আশ্রয় করিয়া বা সেই নামকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, আমার জপমালায় আমি তাহাদেরও স্মরণ করি, এবং এই ভাবে বিশ্বাত্মার সর্বগ্রাহী প্রকাশকে আমার অন্তরের প্রণাম জানাই। আমার মনে হয়—এটী আমার ব্যক্তিগত কথা,

অনেকে আমার সঙ্গে একমত হইবেন, অনেকে হইবেন না—পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের যে-সমস্ত মানবধর্মানুসারী কল্পনা এক ঈশ্বরের নাম করিয়াই হউক, অথবা সেই এক ঈশ্বরের বহুবিধ প্রকাশ কল্পনা করিয়াই হউক, গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের শিব-উমার মত বিশ্বঙ্কর বিশ্বম্ভর সর্বগ্রাহী বিরাট্ বিশাল অতলস্পর্শী ব্যোমচুম্বী কল্পনা আর তো কোথাও দেখিনা—

"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদ-প্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥"

এই কল্পনাকেই আশ্রয় করিয়া মানুষের নিঃশ্রেয়স-সাধন হইতে পারে—কিন্তু উপরন্তু আমার মানব-ভ্রাতা প্রাচীন-কালে, মধ্য-যুগে, আধুনিক যুগে, নানা ভাবের ভাবুক হইয়া যে-সমস্ত মহনীয় দেব-কল্পনা গঠিত করিয়াছে, সেই-সব দেবনাম-জপের দ্বারা বা অনুধ্যানের দ্বারা নব নব রস আস্বাদন করিতে পারিলে আমার আমিত্বের—আত্মারই প্রসার হয়—কাহাকেও নিজের থেকে পৃথক বা দূর বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই আমার বৈজয়ন্তী-মালায় আমি বিশ্বমানবের গঠিত সুধর্মা দেবসভার তাবৎ দেবতাগণকে আহ্বান করি, তাঁহাদের মূল সেবকদের ভাবের আভাস-কণা পাইবার প্রয়াস করি। সুতরাং কেবল শিব উমা, শ্রী বিষ্ণু নহেন; সীতা রাম, কৃষ্ণ রাধা নহেন; উপরন্তু সব জাতির অখিল দেবনাম, আমার জপের অঙ্গ হইয়া উঠে।

এই বস্তুকে যদি ঐতিহাসিক ভাববিলাস বলা যায়, আপত্তি করিব না—কারণ ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়া, মানব-সমাজের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়া চির-সারথি তাঁহার রথ চালাইয়া আসিয়াছেন; এবং প্রাচীন মানুষ যেমন আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে, তেমনি তাহাদের দেব-কল্পনার পর্যবসানও আমাদের এ যুগের বিভিন্ন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের দেব-কল্পনারই মধ্যে; সেই প্রাচীনকে স্বরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাহা আত্মদর্শনেরই সহায়ক হইবে।

আমি এখানে নানা দেশের মানবের হৃদয় হইতে উত্থিত বিভিন্ন দেবতার নাম করিতে বসিব না—তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া যে-সমস্ত ভাবরাজ্য বিদ্যমান তাহার বর্ণনা বিচার বিশ্লেষণ-ও এখন সম্ভবপর নহে। তবে সব দেশের সব শ্রেণীর মানুষের কল্পিত দেবরূপ, সেই অব্যক্তেরই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা হইতেই উদ্ভূত, এই বোধ লইয়া আমি নিভৃতে যথাজ্ঞান তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করি, জপ করি, এবং বাহিরে সর্বদেবময় শাশ্বত পুরুষকে প্রণাম করি॥

"জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটী কড়া ধরে ধরে গিয়ে, ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সঙ্গীত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সেই সঙ্গীত শুনিবারে আমি আকাঙ্ক্ষী অভিলাষী।
—সেই সজ্জন-সঙ্গতি ভালবাসি।
পাণ্ডার মত আঙুলিয়া উৎসুক,
ডাকি' যে দেখায় দেবতার চাঁদমুখ,
যার মীড়ে মীড়ে শরীর শিহরে মণিকোঠা ঘুরে আসি।

২

আপাত মধুর, লালসা-নাচানো, নহে সে চটুল সুর,
শিব-সঙ্গীত শিবেতর করে দূর।
'গোরখ্‌নাথের মৃদঙ্গ বাজে তায়,
নগর 'কদলীপত্তন' গলে যায়,
ভোগে নিমগন যোগী মীননাথ কেঁদে মরে ব্যথাতুর।

৩

জন্মান্তর সৌহার্দের সেই দেয় সন্ধান।
সত্য, সে গীতে জাতিস্মর হয় প্রাণ।
হয় অশ্বিনী-উর্বশী উদ্দাম,
মনে পড়ে তার বৈজয়ন্ত ধাম,
সেই গীতই দেয় অভিশপ্তকে হারাণো অভিজ্ঞান।

৪

অশোক-কাননে সীতাকে স্মরায় প্রাসাদ অযোধ্যার,
স্বয়ম্বরের শুভ-সভা মিথিলার।
তপস্যা-রত ভগীরথের সে কানে,
অনাগত ভাগীরথার ধ্বনি যে আনে,
জড়ভরতের গত-মৃগ-মায়া মনে পড়ে বারবার।

৫

রিষ্টি হরে সে, সৃষ্টি করে সে, সে অনির্বচনীয়,
পথহারা সব পথিকের আত্মীয়।
যোগভ্রষ্টে ডাকে সে সাধন-পথে,
স্থানভ্রষ্ট 'মাতলি'কে তার রথে,
নির্বাপিতকে সেই করে দেয় জ্যোতির্ময়ের প্রিয়।

৬

তাহার সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে বাহিরায় মোর মন,
করি ধ্রুপদের ধ্রুবলোক দর্শন।
কতই সত্য কতই স্বপ্ন সাথ,
চেনা হারাণোর পাই সেথা সাক্ষাৎ
করি সেই সুর-সাগরেতে শত জনমের তর্পণ।

ব্রহ্ম-পুরাণ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সংস্কৃত-সাহিত্যে পৌরাণিক সাহিত্য একটী অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং মতভেদে ন্যূনাধিক অষ্টাদশ উপপুরাণকে আশ্রয় করে এই সাহিত্য গড়ে উঠেছে। পৌরাণিক সাহিত্যের এরূপ কয়েকটী বৈশিষ্ট্য আছে, যা' সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে দেখা যায় না। প্রথমতঃ, পুরাণসমূহের ন্যায় সর্ববিদ্যা-সংগ্রহ সংস্কৃত-সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারেও বিরল। একাধারে ধর্ম, দর্শন, নীতিতত্ত্ব, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ-বিধি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির এরূপ অপূর্ব সমাবেশ সত্যই বিস্ময়কর। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান হিন্দুধর্মের বহু অংশই—যথা, প্রতিমা-পূজা, এবং অন্যান্য নানাবিধ শ্রাদ্ধ, ব্রত; ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি বেদোপনিষদ্‌মূলক নয় পুরাণ-

মূলক। সেজন্য বেদোপনিষদের ন্যায় পুরাণ-সমূহও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থরূপে যুগে যুগে সম্মানিত হয়েছে। যিনি বেদ ও মহাভারত রচনা করেন, সেই একই বেদব্যাস অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করেছিলেন এই লোকের সাধারণ বিশ্বাস, এবং মহাভারতে (১২—৩৪৯) ও বেদান্তসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যেও (৩-৩-৩২) এই মতের উল্লেখ আছে। তৃতীয়তঃ, পুরাণসমূহের বহুস্থলেই প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য ও কল্পনার এরূপ সংমিশ্রণ অতি উপভোগ্য। পৌরাণিক কাহিনীগুলি মহাভারতাদির গল্পের মতই সমান মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় সাধারণতঃ ব্রহ্ম-পুরাণেরই উল্লেখ আছে সর্বপ্রথম। সেজন্য ব্রহ্ম-পুরাণকে 'আদি-পুরাণ' বা প্রাচীনতম পুরাণ বলে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। পদ্ম-পুরাণের একস্থানে (১-৬২), অষ্টাদশ মহাপুরাণকে বিষ্ণুর দিব্যদেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে, ব্রহ্ম-পুরাণকে বিষ্ণুর মস্তক, পদ্ম-পুরাণকে তাঁর হৃদয় প্রভৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকেই, পুরাণসমূহের মধ্যে ব্রহ্ম-পুরাণের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে সাধারণে গৃহীত হ'ত, তা প্রমাণিত হয়।

অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, ব্রহ্ম-পুরাণেও পুরাণের পঞ্চলক্ষণ দৃষ্ট হয়—যথা, সর্গ বা সৃষ্টিবর্ণন; প্রতি-সর্গ বা প্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টি-বিবরণ; বংশ বা দেব ও ঋষিগণের বংশবৃত্তান্ত; মন্বন্তর বা বিভিন্ন মনুসৃষ্ট বিভিন্ন যুগের মনুষ্যজাতির বিবৃতি; এবং বংশানুচরিত বা সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের ইতিহাস।

ব্রহ্ম-পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, বেদব্যাস-শিষ্য সূত লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞরত মহর্ষিগণের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে, তাঁরা সকলেই পরমজ্ঞানী লোমহর্ষণকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে যথাযথরূপে প্রকাশ করে বল্‌তে অনুরোধ করেন। সেই অনুসারে, লোমহর্ষণ তাঁদের নিকট পুরাকালে দক্ষপ্রমুখ মুনি-শ্রেষ্ঠগণের প্রশ্নের উত্তরে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত ব্রহ্ম-পুরাণ-সম্মত সৃষ্টি-রহস্য বিবৃত করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে জগৎসৃষ্টি, তাঁর দেহের একার্ধ থেকে পুরুষ ও অপরার্ধ থেকে নারীর সৃষ্টি, আদি মানব মনু ও মনু থেকে প্রজাসৃষ্টি, দেব-দানবাদির উৎপত্তি, প্রভৃতি নানারূপ সৃষ্টি-বৃত্তান্ত দ্বিতীয় থেকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বহু বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তারপরে মুনিগণ ভূমণ্ডল এবং সাগর, দ্বীপ, পর্বত, বন প্রভৃতির সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হলে, সূত লোমহর্ষণ সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, পর্বত, নদী, পাতালাদি সপ্ত-লোক, নরক প্রভৃতি বিষয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে দ্বাবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণনা করেন। ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ অধ্যায়ে গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান সম্বন্ধে বিবরণী আছে।

উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূহ প্রায় সব পুরাণেই একই ভাবে পাওয়া যায়, এবং এগুলি অবশ্য সবই কাল্পনিক। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, পুরাণকারদের কল্পনার এই পরিধি ও বিস্তৃতি সত্যই আমাদের মুগ্ধ করে। যে সত্য বস্তুটী তাঁরা এই কল্পনার মাধ্যমে উপলব্ধি ও প্রকাশ করে গেছেন, তা' হ'ল দেশ ও কালের কল্পনাতীত বিরাটত্ব ও অসীমত্ব। সমগ্র ভারতীয় দর্শনই এই দেশকালের অসীমত্বের ভিত্তিতেই তার তাত্ত্বিক ও নৈতিক, দু'টী দিকই গড়ে তুলছে। পুরাণমতে, একটী ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ লোক বা ভুবনের সমাহার:—ঊর্ধ্বে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপো-লোক, সত্যলোক; নিম্নে অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল—প্রত্যেকটী থেকে প্রত্যেকটীর কোটী কোটী যোজন ব্যবধান। এরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমাহারই হ'ল জগৎ

বা বিশ্বচরাচর। সুতরাং দেশের পরিধির শেষ নেই, দেশ অসীম, অনাদি ও অনন্ত। একই ভাবে, কাল সম্বন্ধে পৌরাণিক বর্ণনা এই যে, ব্রহ্মার এক দিন সৃষ্টিকাল, এক রাত প্রলয়কাল। এই একদিন ও একরাত প্রত্যেকটাই সহস্র যুগ বা লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী—এবং দিনের পরে রাত, রাতের পর পুনরায় দিন—এই ভাবে চলেছে অসীম, অনাদি, অনন্ত কালের অবিচ্ছিন্ন যাত্রা।

দেশ ও কালের এই অসীমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন বর্তমান জীবনের নিরতিশয় ক্ষুদ্রতা ও মূল্যহীনতা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়ের মধ্যে একটী মাত্র ব্রহ্মাণ্ডের, চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে একটী মাত্র ভুবনের, লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একটী মাত্র ক্ষুদ্রতম প্রাণী 'আমি' —এই অসীম দেশকালের পটভূমিকায় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানবজীবনের মূল্য ও সার্থকতা কতটুকু, যদি না আত্মিক বলে সেই ক্ষুদ্রত্ব ও তুচ্ছত্ব অতিক্রম করা যায়?—এই চিন্তাই আকুল করে তুলেছে যুগে যুগে প্রত্যেক ভারতীয় মনীষীকে; এবং তারই ফলে আমরা পেয়েছি উপনিষদের সেই অপূর্ব বাণী— "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—যা বিরাট, তাই সুখ; যা ক্ষুদ্র তাতে সুখ নেই। দেহের দিক্ থেকে এক অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌লেও, আত্মার দিক্ থেকে আমরা ভূমার, অনন্ত অসীম আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী; কিন্তু যদি আমরা পার্থিব ভোগবাসনায় লিপ্ত হয়ে পার্থিব গণ্ডীতেই মাত্র পরিভ্রমণ করি, তাহলে সেই নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্বেই হ'বে আমাদের লজ্জাকর পরিসমাপ্তি—পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিরাট কল্পনার মধ্যে এই সত্যেরই আভাস পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানও দেশকালের বিশালত্ব ও সেই অনুপাতে আমাদের পৃথিবীর নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সেইদিক্ থেকেও পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব কাল্পনিক হ'লেও সম্পূর্ণ হাস্যকর নয়।

ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণের উনবিংশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের একটী সুন্দর, স্বতন্ত্র বর্ণনা আছে। পুরাণকারের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতের সেই অতি নিজস্ব, চিরন্তন আধ্যাত্মিক রূপটী। সেজন্য তিনি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পুণ্য ভারতভূমির স্তুতি করছেন—

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্মভূরেষা যতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষা মনুষ্যাঃ॥ (১৯।২৪-২৫)

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ; কারণ এটীই হ'ল একমাত্র কর্মভূমি, অন্যান্য সকল দেশ ভোগভূমিই মাত্র। এখানে সহস্র জন্মের পরে কদাচিৎ কোনো জীব পুণ্যসঞ্চয়ের ফলে জন্মগ্রহণ করে। দেবগণও এরূপ গান করে থাকেন যে, স্বর্গ ও মুক্তির কারণস্বরূপ ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই ধন্য!

ব্রহ্ম-পুরাণের বহুলাংশে তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে 'তীর্থ ও পুণ্যস্থান কি', এই প্রশ্নের উত্তরে সূত সুন্দর ভাবে বল্‌ছেন—

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥"
(২৫।২)

"মনো বিশুদ্ধং পুরুষস্য তীর্থং
বাচাং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ।
এতানি তীর্থানি শরীরজানি
স্বর্গস্য মার্গং প্রতিবোধয়ন্তি॥" (২৫।৩)

"ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র যত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা॥"
(২৫।৬)

অর্থাৎ, যাঁর হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, যাঁর বিদ্যা, তপশ্চর্যা ও কীর্তি আছে, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। বিশুদ্ধ মন, বাক্যসংযম ও ইন্দ্রিয়-দমন—এই কয়টী মানুষের শরীরজাত তীর্থ ও স্বর্গ-লাভের উপায় স্বরূপ। যার মন অশুচি, তীর্থস্থানেও তার শুদ্ধি লাভ হয় না। আত্মসংযমী ব্যক্তি যে স্থানেই বাস করুন না কেন, সেই স্থানই তাঁর পক্ষে মহাতীর্থস্বরূপ।

পরে অবশ্য ১০৮ অধ্যায় থেকে পরবর্তী বহু অধ্যায়ে ইলা-তীর্থ, চক্রতীর্থ, পিপ্পলেশ্বর তীর্থ, নাগতীর্থ, মাতৃতীর্থ প্রমুখ বহু তীর্থস্থানের বিশদ বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-পুরাণে বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণ—এই তিন দেবতারই বিবরণী ও স্তুতি আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে সূতের মুখে এক অথচ বহু, সূক্ষ্ম অথচ স্থুল, অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত-স্বরূপ পরমাত্মা বিষ্ণুর স্তব (১-২১)। পরে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যানে (৫২ ও পরবর্তী অধ্যায়ে) বহু বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা, স্তবস্তুতি ও বৈষ্ণব ধর্মের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে। ৩৪-৪০ অধ্যায়ে রুদ্রমহিমা বর্ণন, সতী ও উমার উপাখ্যান, দেবগণ কর্তৃক মহেশ্বর-স্তুতি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ১৮০—২১২ অধ্যায়ে কৃষ্ণের জন্ম ও জীবন-বৃত্তান্ত, বিষ্ণুপুরাণসম্মত ভাবে, বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য পুরাণের ন্যায় ব্রহ্ম-পুরাণও বহুলাংশে কাল্পনিক সৃষ্টি-প্রলয়াদি বর্ণনা, আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হ'লেও এই গ্রন্থের শেষাংশে কিছু দার্শনিক আলোচনাও পাওয়া যায়। ২৩৩-২৩৪ অধ্যায়ে পুরাণকার বিষ্ণু-স্তুতি-প্রসঙ্গে পরম পুরুষ, পরমব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। পরমব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। তিনিই আদি, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বব্যাপী, অক্ষয়পুরুষ; তিনিই সর্বাধার ও সর্বভূতাত্মা। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উভয়স্বরূপ। সৃষ্টিকালে তিনি জীবজগতে পরিণত হয়ে ব্যক্তরূপ ধারণ করেন; প্রলয়কালে পুনরায় জীবজগৎ তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াতে তিনি অব্যক্তরূপে বিরাজ করেন। (২৩৩ অধ্যায়)।

২৩৪ অধ্যায়ে ব্রহ্ম-পুরাণকার উপনিষৎ-সম্মত ভাবে পরমাত্মাকে প্রধানতঃ নঞ্-মূলক বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করে বল্‌ছেন যে, যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ, অপাণিপাদ, সর্বগতি, নিত্য, ভূতযোনি, কারণ, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য ও সর্বস্বরূপ, বিবেকী বুধগণ তাঁকেই সর্বদা দর্শন করেন। তিনিই 'ভগবান্' নামে কথিত হয়ে থাকেন। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ প্রভৃতি ভগবত্ত্ব-প্রতিপাদক বাক্যের তিনিই একমাত্র বাচ্য। তিনি সম্পূর্ণরূপে হেয়গুণশূন্য। সর্বভূতের প্রকৃতি ও সগুণ হয়েও তিনি সমস্ত দোষগুণের অতীত।

বন্ধ-মুক্তি আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণকার ২৩৪ অধ্যায়ে বল্‌ছেন যে, সংসার অশেষ ক্লেশের আকর—জীবিত অবস্থায় যে যে বস্তু পুরুষের অতি প্রীতিকর হয়, ভাবী কালে সে সবই তার দুঃখবৃক্ষের বীজস্বরূপই হয়ে থাকে। এরূপে সংসার-দুঃখরূপ মার্তণ্ডের তাপে তাপিত জনগণের পক্ষে—মুক্তি-পাদপের ছায়া ব্যতীত সুখ নেই। এই দুঃখোচ্ছেদের চরম ঔষধি আত্যন্তিকী ভগবৎ-প্রাপ্তি।

ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি (২৩৪ অধ্যায়)। কর্ম শব্দের অর্থ এস্থলে নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম জন্ম-পুনর্জন্মের হেতু, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে, ভোগলিপ্সাশূন্যভাবে কর্ম সম্পাদন করলে, চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষের পথ সুগম হয়। জ্ঞান আগমোৎপন্ন ও বিবেকজ ভেদে দ্বিবিধ (২৩৪

অধ্যায়)। আগমজ জ্ঞান শব্দব্রহ্ম ও বিবেকজ জ্ঞান পরমব্রহ্ম বিষয়ক। অজ্ঞান অন্ধতমতুল্য, বিবেকজ জ্ঞান সূর্যবৎ ভাস্বর। ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলে বিজ্ঞেয়—শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মকে জেনে পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। দ্বিবিধা বিদ্যাই প্রাপ্তব্য। অপরাবিদ্যা ঋগ্বেদাদিময়ী, পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই পরমাত্মা লাভের উপায়। ৫৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করলে মানবমাত্রেই সর্বপাপ-বিমুক্ত হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

২৯ অধ্যায়ে ভক্তি ও তার অঙ্গাদির স্বরূপ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণকার বল্‌ছেন যে, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাধি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মন দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক ভাবনার নাম 'ভক্তি'; সে বিষয়ে মানসিক ইচ্ছাই 'শ্রদ্ধা'; এবং ঈশ্বরধ্যানই 'সমাধি'। যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ করেন ও অন্যকে শ্রবণ করান, যিনি ভগবদ্‌ভক্তগণকে পূজা করেন, যাঁর চিত্ত ও মন ভগবানে নিবিষ্ট, এবং যিনি সর্বদা দেবপূজা ও দেবকর্মে নিরত—তিনিই প্রকৃত ভক্ত। যিনি দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম-সমূহ অনুমোদন করেন, সতত ভগবৎ-নাম কীর্তন করেন, এবং ভগবদ্‌ভক্তগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন না, তিনিই প্রকৃত ভক্ততর।

গ্রন্থশেষে, ব্রহ্ম-পুরাণকার জ্ঞানমূলক সাংখ্য-মার্গ ও ধ্যানমূলক যোগমার্গের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ—সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন (২৩৬-২৪০ অধ্যায়)। সাংখ্যমার্গ দ্বারা মানব আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করে। সেই আত্মাকে চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করা যায় না, কেবল মাত্র প্রদীপ্ত মন দ্বারাই সেই মহান্ আত্মা দৃষ্ট হন, এবং যে ব্যক্তি তাঁকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন (২৩৬ অধ্যায়)। যোগমার্গ দ্বারা যোগী পুরুষ হৃৎপদ্মস্থ, সর্বব্যাপী নিরঞ্জন পুরুষোত্তমকে সতত ধ্যান করেন। প্রথমে কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে ক্ষেত্রজ্ঞে বা জীবাত্মায় ও পরে ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমব্রহ্মে যোজিত করে যোগী যোগযুক্ত হন। এই ভাবে যাঁর চঞ্চল মন পরমাত্মায় প্রলীন হয়, সেই বিষয়নিস্পৃহ যোগীই যোগসিদ্ধি লাভ করেন। যখন সমাধিমগ্ন যোগীর নির্বিষয় চিত্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়, তখনই তাঁর পরমপদ লাভ হয় (২৩৫ অঃ)। সাংখ্য ও যোগমার্গের আপেক্ষিক শ্রেয়স্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্ম-পুরাণকারের মত এই যে, উভয় পথই যথার্থ ও পরমগতির সাধন, কেবল এদের দর্শনই পৃথক্ (২৩৯ অঃ)।

উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই প্রমাণিত হবে যে, ব্রহ্ম-পুরাণে অতি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকতত্ত্ব প্রপঞ্চিত হয়েছে।

নীতিশাস্ত্রের দিক থেকেও, ব্রহ্ম-পুরাণ অতি বিশিষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত আত্মসংযম, দান, দয়া, প্রভৃতি সু-উচ্চ নীতির অতি সুন্দর প্রপঞ্চনা আছে। যেমন, ২১৬ অধ্যায়ে দান ও ২১৮ অধ্যায়ে অন্নদানের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে, এবং সর্ববিধ দানের মধ্যে অন্নদানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক ও নীতিতত্ত্ববিদ্‌গণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্রহ্ম-পুরাণকারও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, জ্ঞানের পথ, মুক্তির পথ, ধর্মের পথ একমাত্র নীতিরই পথ—অন্য কোনো পথ নয়। সেজন্য তিনি গ্রন্থশেষে ২৩৮ অধ্যায়ে নীতিতত্ত্বের সারাংশ বা চুম্বক বিবৃত করে বল্‌ছেনঃ—"একঃ পন্থা হি মোক্ষস্য"—মোক্ষের মাত্র একটীই পথ, সেই পথ হ'ল এইঃ জ্ঞানী ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প-বর্জন দ্বারা কামকে, সত্ত্বসেবা দ্বারা নিদ্রাকে, সাবধানতার দ্বারা ভয়কে, ধৈর্য দ্বারা ইচ্ছা ও দ্বেষকে, জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যকে, সন্তোষ দ্বারা লোভ মোহকে, তত্ত্বানুশীলন দ্বারা বিষয়া-সক্তিকে, দয়া দ্বারা অধর্মকে, ভাবিকালের ভাবনা-

পরিহার দ্বারা আশাকে, সংসারের অনিত্যতা-চিন্তা দ্বারা স্নেহকে, মৌনতা দ্বারা বহুভাষণকে, নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারা বিতর্ককে এবং শৌর্য দ্বারা ভয় ও মনকে জয় করবেন। এই সংযম-শুচি, জ্ঞানদীপ্ত, পরসেবাপূত পন্থাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা—"এষ মার্গো হি মোক্ষস্য প্রসন্নো বিমলঃ শুচিঃ।"

ব্রহ্ম-পুরাণকার গ্রন্থশেষে যে শাশ্বত আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন,—সেই অপূর্ব সুন্দর বাণীটী শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত করে শেষ করছি :—

"ধর্মে মতির্ভবতু বঃ পুরুষোত্তমানাং
স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
আয়ুশ্চ কীর্তিঞ্চ তপশ্চ ধর্মঃ
ধর্মেণ মোক্ষং লভতে মনুষ্যঃ॥
ধর্মোঽত্র মাতাপিতরৌ নরস্য
ধর্মঃ সখা চাত্র পরে চ লোকে।
ত্রাতা চ ধর্মস্ত্বিহ মোক্ষদশ্চ
ধর্মাদৃতে নাস্তি তু কিঞ্চিদেব॥"

ধর্মে আপনাদের মতি হোক্। এই ধর্মই পরলোকগত পুরুষের একমাত্র বন্ধু। ধর্ম দ্বারাই মানব আয়ু, কীর্তি, তপস্যা, ও মোক্ষলাভ করে। ইহলোকে ধর্মই মানবের মাতা ও পিতা; পরলোকে ধর্মই তার একমাত্র সখা। ধর্ম ই ত্রাতা, ধর্মই মোক্ষপ্রদ, ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই।"

কৃপা ও প্রার্থনা

স্বামী জগদানন্দ

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "সবই যদি আমাকে করিতে হইবে, তবে কৃপা মানেই বা কি ?"

এই প্রশ্নের উত্তর বোধ করি এই যে, যতক্ষণ "সবই আমাকে করিতে হইবে" এই বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ কৃপা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় নাই। যখন এই বুদ্ধি আসে যে, আমাকে কিছুই করিতে হয় নাই, কিছুই করিতে হইতেছে না, কিছুই করিতে হইবে না, তখনই কৃপার উপলব্ধি হয়। শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইলে ঐরূপ নিজকে অকর্তা বোধ হয়। ইহাই কৃপা। এই অকর্তৃত্ব-জ্ঞান কৃপা দ্বারাই লাভ হয়। ভগবান কি সাধনের অধীন যে সাধন করিয়া তাঁহাকে লাভ হইবে ? গীতার ১১।৫৩-৫৪ শ্লোকে আছে, বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। অনন্যা ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। এই অনন্যা ভক্তি কেবল তাঁহার কৃপাতেই আসে। (গীতা, ১০। ১০-১১)। ঐ স্থানে ১১ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন —তেষামেবানুকম্পার্থম্— "প্রীতিপূর্বক ভজনকারী ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ।" বলিলেন,—'প্রীতিপূর্বক ভজনকারীদের'; আর্তি-হরণের জন্য বা অর্থার্থী হইয়া ভজনকারীদের নহে। যাঁহারাই শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে সকলেই একমত—অর্থাৎ উহা তাঁহার কৃপাতেই লাভ হয়। কঠোপনিষদেও (১।২।২৩) ধর্মরাজ যম নচিকেতাকে ইহাই বলিতেছেন।

যাঁহারই শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় তাঁহারই মনে সতত উদিত হয়,—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥" "যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।"

অন্নদামঙ্গলে আছে—মা অন্নপূর্ণা বলিতেছেন, "ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব"; আবার, "যে মোরে আপন ভাবে, তারই ঘরে যাই।"

কথিত আছে, আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী লীলা-সম্বরণের সময় বলিয়াছিলেন,—"অমুকের হাতে খাব।" ইহা কৃপা ভিন্ন আর কি? আমাদের প্রতি কৃপাতেই তাঁহার অবতার—"অরূপ সায়রে লীলালহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহেতুক স্পর্শ (প্রার্থনা না করিয়াও) অনেক ভাগ্যবান ভক্ত স্বীয় হৃদয়ে ও মস্তকে দক্ষিণেশ্বরে ও অন্যত্র পাইয়াছেন।

কাহারও কাহারও মনে প্রশ্ন জাগে,—"প্রার্থনা কি পূর্ণ হয়?" প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া না হওয়া বিষয়ে সন্দেহ ত দূরের কথা, তিনি যে প্রার্থনা না করিতেই পূর্ণ করিয়া দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেহ উপবাসী থাকে না।" তাঁহার দর্শন প্রার্থনা যিনিই করিবেন তিনিই যে তাঁহাকে লাভ করিবেন, ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত সত্য আর কিছুই নাই। ভক্ত জানেন, সূর্যের উদয় এবং অস্তও অনিশ্চিত হইতে পারে কিন্তু ভগবানকে পাওয়া কখনও সন্দেহের বিষয় নহে। তাঁহাকে প্রাপ্তির প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না।

তবে ইহাও সত্য যে, অনিত্য বস্তুর প্রার্থনা সব সময় শ্রীভগবান পূর্ণ করেন না। তিনি জানেন, কোনটি আমাদের মঙ্গল। মানুষ না জানিয়া—ভবিষ্যৎ ফল না বুঝিয়া কত কিছু পার্থিব বিষয় প্রার্থনা করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিয়াও তাহার দুঃখের অবধি থাকে না—এমন কি কখনও তাহাকে আত্মহত্যাও করিতে হয়! শ্রীভগবান যে আমাদের সর্বজ্ঞ সুহৃৎ। আমাদের অকল্যাণকর প্রার্থনা তিনি কেন মঞ্জুর করিবেন?

কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, মায়ের আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও পুত্র মরিয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে বলা চলে যে, পুত্র বাঁচিয়া থাকিলেই যে সত্য সত্য কল্যাণ হইত, তাহা কে বলিবে? এই পুত্রই পরে হয়তো মায়ের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইতে পারিত—কে জানে?

আর এক কথা—পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের শোকার্তা না হইয়া থাকিতে পারিলেই ভাল। কারণ, মা তো জানেন না যে পুত্র কোথায় গিয়াছে। ভগবান যদি তাহাকে এই দুঃখময় সংসার হইতে ঋষিলোকে বা দেবলোকে লইয়া গিয়া থাকেন, অথবা তাহাকে তাঁহার নিকটেই পরমানন্দে রাখিয়া থাকেন, তবে মায়ের তো দুঃখের কারণ নাই। পুত্রের সুখেই তো মায়ের সুখ। ভগবান মায়েরও সুহৃৎ, পুত্রেরও সুহৃৎ।

আর সত্য কথা তো এই—তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইয়াছেন। তিনিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই দেহত্যাগ করেন। পুত্র আর কে? ভগবানই। তিনি ত সর্বদেহে বিরাজমান। তাঁহার জন্য শোক কি? (গীতা ২।১১-১৩)।

প্রার্থনা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, জাগতিক বিপ্লব চণ্ডীপাঠ করিয়া কি শান্ত করা যায়? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, বিপ্লবের কারণ তো ভগবানেরই ইচ্ছা। চণ্ডীপাঠের দ্বারা যে শান্তি হয়, তাহা তিনি চণ্ডীতে বলিয়াছেন। চণ্ডীপাঠের দ্বারা শান্তি করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি চণ্ডীপাঠ করাইবেন ও শান্তি দিবেন। অন্যরূপ ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ করিবেন। চণ্ডীপাঠক অহংকার-বশে দেখেন যে, তিনি পাঠ করিয়া শান্তি আনিলেন! কেনোপনিষদে আছে, দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেবতাদের অহংকার হইয়াছিল যে, তাঁহারা নিজের শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছেন। এই ভ্রম তাঁহাদের ভগবান দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

'আমরা চণ্ডীপাঠ করি', 'আমরা এই ফল পাই' 'তিনি এই ফল দেন'—এই প্রকার বুদ্ধি অহংকার হইতেই আসে। যতদিন কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে ততদিন ঐরূপ বোধ হইবেই হইবে এবং ততদিন যে উহা অতি সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহংকার, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি ছাড়িয়া দেখিলেই সত্য-দর্শন নতুবা আপেক্ষিক সত্যমাত্রের জ্ঞান থাকে।

অতএব চণ্ডীপাঠের দ্বারা যে শান্তি হয় তাহাতো সত্যই।

মায়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীর যমযন্ত্রণা গুমরি গুমরি কাঁদে
এই টুকু বুকে ; অপূর্ব্ব লীলা বলিহারি ভগবান,
শ্রাবণের মেঘ ঢেকে দিতে চায় দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদে,
সাহানার সুরে যতি কেটে যায়, ওঠে পূরবীর তান।

সপ্তসাগর মন্থনে বুঝি উঠিয়াছে হলাহল
তারই বিষাক্ত বেদনায় নীল পেলব ওষ্ঠ দু'টি,
অশ্রুবিন্দু শুষে নিল যেন তৃষার্ত্ত ধরাতল,
ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ধরিতে খুলে গেল দুই মুঠি।

প্রভাতের বাঁশী না বাজিতে সুর আকাশে মিলায়ে যায়
বিদায় বেলায় কাঁদিছে সানাই বিজয়ার সুরে সুরে,
না ফুটিতে ফুল কোমল কোরক মাটিতে লুটাল হায়
চাপা কান্নার অসহ্য ব্যথা গুমরায় বহুদূরে।

বহুদূরে নয় এ যেন বুকের একেবারে মাঝখানে
শ্মশানের চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে যায় অবিরাম
গঙ্গার জলে দু'মুঠো ভস্ম ভাসে জোয়ারের টানে
বুকের রক্ত, তার বিনিময়ে কিছু নাই তার দাম।

শোকের অশ্রু, মর্ম্মযাতনা, বুকফাটা হাহাকার
একান্ত মিছে মহাকারুণিক বিধাতার দরবারে,
নিষ্পাপ শিশু চেনে না জগৎ, জানেনাক' বিধাতার
মর্জ্জিমাফিক বিচারের ভান, নিষ্ঠুর সংসারে।

গত জন্মের পাপপুণ্যের জের টেনে মহাজন
বলেন,—"মুক্তি ইহজনমের কর্ম্মভোগের ফল,
প্রসূতির কোলে সন্তান মরে আছে তার প্রয়োজন।"
আমি বলি—মায়া-মতিচ্ছন্নে ডুবু ডুবু রসাতল।

মৃত্যুর চেয়ে আর কি সত্য অনিত্য পৃথিবীতে
অন্ধ বধির বিধাতার পায়ে মিছে মাথা খুঁড়ে মরা,
জগৎ-প্রভুর চোখে ঘুম নাই নিখিলবিশ্বহিতে
পরমদয়াল ভক্তের কাছে আপনি দিলেন ধরা।

আমরা বুঝেছি হাড়ে হাড়ে, তাই কালাপাহাড়ের দলে
নাম লেখালাম আগামী দিনের সূর্য্য সাক্ষ্য' করি'
জন্মান্তর প্রকৃতির খেলা, কি হবে কর্ম্মফলে
চির সত্যের জ্যোতিতে অন্ধ পৃথিবী উঠুক ভরি'।

শাক্তদর্শন

অধ্যাপক শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম্-এ

প্রসিদ্ধ ষড়্‌দর্শন বা সর্বদর্শনসংগ্রহের মধ্যে 'শাক্তদর্শন' নামে কোন দর্শনপ্রস্থান দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বর-দর্শনের মধ্যেই শাক্তদর্শনের রূপটি লুক্কায়িত আছে। 'শাক্তদর্শন' ঠিক এই নামে উল্লিখিত না হইলেও—এই তিন দর্শনে 'শক্তি' পদার্থের স্থান আছে। কিন্তু 'শাক্তদর্শন' নামে প্রাচীনকালেও যে একটি দর্শনপ্রস্থান ছিল, তাহা অনুমান করিবার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় চারশত বৎসর পুর্বে সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়-প্রণীত 'তন্ত্রসার' নামক তন্ত্র-সঙ্কলন গ্রন্থে—শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে শাক্তদর্শনের পুজার ব্যবস্থা আছে। শ্রীবিদ্যার পুজাক্রমে 'চক্রপুজা'র বিধিতে দেখা যায় যে,—'শাক্তদর্শন' চক্রের কেন্দ্রে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সৌর, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পাঁচটি দর্শনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণবমেব চ।
শাক্তং ষষ্ঠন্তু বিজ্ঞেয়ং চক্রং ষড়্‌দর্শনাত্মকম্॥"

কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত মনে করেন যে,—ভট্ট কুমারিল ও আচার্য্য শঙ্কর কর্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইলেও বৌদ্ধসম্প্রদায় একেবারে উৎসন্ন হয় নাই, কিন্তু তন্ত্রমত প্রবিষ্ট হইবার পর ভারতখণ্ডে পুর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত—মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিক এই চতুঃসম্প্রদায় ধীরে ধীরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া তান্ত্রিক সাধনক্ষেত্রে সমতা অবলম্বন করায় ক্রমে বৌদ্ধ-ভাব বর্জ্জন করেন। ফলে বৌদ্ধদর্শন তান্ত্রিকদর্শন-মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিল, এইজন্য শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে চক্রের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের সমাবেশ দেখা যায়।

শাক্তদর্শনের উৎপত্তি বেদ না তন্ত্র হইতে—এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ উভয়ই শ্রুতিমধ্যে পরিগণিত, মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লূকভট্ট লিখিয়াছেন—'শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।' বৈদিকী শ্রুতিই হউক বা তান্ত্রিকী শ্রুতিই হউক—শাক্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যে প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাঁহারা তন্ত্রকে পৃথক্ শ্রুতি বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ—অথর্ববেদকে তন্ত্রের আদিরূপ বলিয়া থাকেন। অথর্ববেদের বিস্তৃত রূপই তন্ত্র, ইহা তাঁহাদের মত। সুতরাং চতুর্বেদের অন্যতম অথর্ববেদ তন্ত্রের মুলস্থান সম্ভাবিত হইলে—বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে একটা যে সিদ্ধান্তগত যোগসূত্র আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তান্ত্রিক শাক্তদর্শনের মধ্যেও দ্বৈত ও অদ্বৈত সম্প্রদায় আছে। এ প্রবন্ধে বৈদিক শাক্তদর্শনের কথাই আলোচিত হইবে। তান্ত্রিক শাক্তদর্শন বহু বিস্তৃত, ও তাহার বহু প্রস্থান—এ প্রবন্ধে সমস্ত কথার আলোচনা সম্ভবপর নহে, এজন্য বৈদিক শক্তিবাদসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ইহা সর্ববিদিত যে, বৈদিক শাক্তদর্শনের মুল হইল—ঋগ্বেদের দেবীসুক্ত।

অম্ভৃণ নামক ঋষির কন্যা আম্ভৃণী; তাঁহার নাম 'বাক্'—তিনি স্বয়ং বাগ্‌দেবীরূপে এই সুক্তস্থ মন্ত্রগুলির দ্রষ্ট্রী। এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, একটি শক্তি,—যাহা 'অহম্' (আমি)রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল,—তাহাই রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্তর্যামিনী। ঐ শক্তি—সোম ত্বষ্টৃ প্রভৃতিকে ধারণ করিয়া

আছেন এবং সমস্ত বিশ্বের নির্মাণকর্তৃত্ব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সূক্তে যদিও শক্তি-শব্দ উল্লিখিত নাই, তথাপি তাৎপর্য্যবশে একটি মহাশক্তির সত্তা উপলব্ধ হয়। এই মহাশক্তিই যে সর্ব্বকারণ, জগতের সমস্ত উৎপন্ন ভূতগ্রামের তিনিই যে প্রেরয়িত্রী, এ তথ্যটুকু দেবীসূক্ত হইতে প্রকাশ পায়। শাক্ত অদ্বৈতবাদের ভিত্তি হইল দেবীসূক্ত। এই ঋককে অবলম্বন করিয়াই মার্কণ্ডেয় পুরাণের—সপ্তশতী প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তশতী (চণ্ডী) গ্রন্থে শক্তি বা মহাশক্তির মহিমা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত শাক্তদর্শন বিশেষভাবে প্রচারিত হয় নাই।

শাক্তদর্শনকে ঠিক দর্শনপ্রস্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে—ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা সহ সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে এবং সমস্ত উপনিষদ্‌-বাক্যের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া শাক্তসিদ্ধান্ত-সহ বিরোধ পরিহার ও সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তপ্রস্থানের কথা উঠিলেই পূর্ব্বমীমাংসা স্মৃতিপথে উদিত হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা—ইহা শুনিলেই মনে হয় যেন—একই শাস্ত্রের পূর্ব্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। কিন্তু প্রচলিত ভাবধারার অনুবর্ত্তন করিলে সাধারণতঃ আমাদের মনে আসে—পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধীয় ও উত্তর-মীমাংসা জ্ঞানকাণ্ড-সম্পৃক্ত। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোত্তরভাব থাকিলেও তাহার সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ উপকার্য্য-উপকারক ভাব নাই। কারণ, কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গাদির হেতু, আর অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান স্বর্গাদি হইতে অনেক উৎকৃষ্ট মুক্তির হেতু। কিন্তু, শাক্তদর্শন-প্রস্থান বিচার করিলে পূর্ব্বোত্তর মীমাংসার সুন্দর সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

মীমাংসা-দর্শন শক্তিবাদী। এই দর্শন প্রত্যেক বেদোক্তকর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই খণ্ডশক্তিবাদী মীমাংসাদর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী থাকায় পরবর্ত্তী মীমাংসাদর্শনে এক অখণ্ড মহাশক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসা সম্ভবপর হইতে পারে।

পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং উত্তর-মীমাংসা চার অধ্যায়ে—এই মিলিতভাবে ষোড়শাধ্যায়ে সমগ্র মীমাংসাদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম সূত্র "স্মৃতের্বা স্যাদ্ ব্রাহ্মণানাম্"—এখানে এই ব্রাহ্মণপদের মূলীভূত ব্রহ্মপদার্থ কি? —এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই উত্তর-মীমাংসার প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বিষয়রূপে উপস্থিত হইলে শিষ্য-দিগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য পরসূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"। আদ্য—যিনি আদিতে উৎপন্ন,—সেই ব্রহ্মা (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব) হিরণ্যগর্ভ (হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে); আদ্যের জন্ম যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্ম বা মহাশক্তি।

এখানে আপত্তি হইতে পারে—সম্প্রদায়-বিশেষের ব্যাখ্যায় 'আদ্য' শব্দে 'আকাশ' গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারাও শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ…" ইত্যাদি, সুতরাং আদ্যশব্দে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা না আকাশ, এ সংশয় থাকিয়া যাইতেছে।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে,—সংশয়ের কোন কারণ নাই। কারণ,—'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' এই শ্রুতিবচনে আকাশসৃষ্টি বিষয়ে প্রাথম্য-সূচক কোন শব্দ উল্লিখিত না হওয়ায় এই শ্রুতি আদ্যঘটিত সূত্রের লক্ষ্য হইতে পারে না। আদৌ ভবঃ আদ্যঃ—তস্য—আদ্যস্য জন্ম যতঃ, যাঁহা হইতে আদ্যের জন্ম, এই 'আদ্য' শব্দের অর্থবলে 'অগ্রে' বা 'প্রথমে' এইরূপ শব্দ যে শ্রুতিবচনে পাওয়া না যাইবে, তাহাকে 'আদ্য' বলার কোন যুক্তি নাই। আদ্য শব্দে আকাশ ইহাও আভিধানিক অর্থ নহে। সুতরাং "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব"

—দেবগণের প্রথমে ব্রহ্মা সম্ভূত হইয়াছিলেন—এই শ্রুতিবাক্য গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'অসদ্বা ইদমগ্রমাসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবচনে প্রাথম্যসূচক 'অগ্র' শব্দ থাকিলেও এখানে উৎপত্তির প্রসঙ্গ না থাকায় 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এখানে 'জন্ম' শব্দে উৎপত্তির প্রসঙ্গ থাকায়—উক্ত শ্রুতিদ্বয়ও এই সূত্রের লক্ষ্যের বিষয় হইতে পারে না।

ব্রহ্ম যে শক্তিস্বরূপ—ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্"—ব্রহ্মবিদ্গণ ধ্যানযোগরত থাকিয়া সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আবৃত দেবাত্মশক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরোপনিষদে আছে—"ভগঃ শক্তির্ভগবান্ কাম ঈশ উভা দাতারাবিহ সৌভগানাম্। সমপ্রধানৌ সমসত্ত্বৌ সমোজৌ তয়োঃ শক্তিরজরা বিশ্বযোনিঃ"। ভগ অর্থে শক্তি, শক্তিমান্ বলিয়াই তিনি ভগবান্। তিনি স্বয়ং কাম-স্বরূপ, তিনি ঈশান, এই ঈশান ও তাঁহার শক্তি উভয়ই সৌভাগ্যদাতা। তাঁহারা উভয়ই সম-প্রধান, সমসত্ত্ব, সমতেজঃসম্পন্ন তাঁহাদের উভয়ের অজরা শক্তিই এই বিশ্বের আদি কারণ।

গুণনিগূঢ়া আত্মশক্তিই বলা যাউক বা ঈশ-ঈশানীর মিলিত সত্তাই বলা যাউক,—ইহাই মহাশক্তি বা পরমব্রহ্ম।

দেব্যুপনিষৎ বলিলেন—'সর্ব্বে বৈ দেবা দেবী-মুপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীৎ—অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যঞ্চ।···অহমখিলং জগৎ। বেদোঽহম-বেদোঽহম্। বিদ্যাহমবিদ্যাহম্' ইত্যাদি।

সমস্ত দেবতারা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাদেবি! তুমি কে? তিনি বলিলেন,—আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমা হইতে প্রকৃতিপুরুষাত্মক এই জগৎ, আমা হইতে শূন্য ও অশূন্য উভয়ই। আমি সমস্ত জগৎ। আমি বেদ-স্বরূপা ও অবেদস্বরূপা। আমি বিদ্যা ও অবিদ্যা।

সপ্তশতীতে ইহার প্রতিধ্বনি কর্ণগোচর হইয়া থাকে—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে' আবার 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা'।

জন্মাদ্যস্য যতঃ—এই দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বিশ্ব-প্রসবিত্রী হইলেও যে জড়স্বরূপা নহেন, তাহা বুঝা যায় না। এজন্য তৃতীয় সূত্রের প্রয়োজন—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—যাহা হইতে সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশিত, তিনি ব্রহ্ম। "এতস্য মহাভূতস্য নিশ্বসিতং যদৃগ্ বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা, তাঁহারই নিশ্বাসবায়ুর মত অনায়াসে প্রকাশিত বেদচতুষ্টয়, ইহা জানা যায়। তাহা হইলে তিনি সমস্ত শাস্ত্রপ্রণেত্রী, অতএব জ্ঞানময়ী, তাহা অবধারিত হইল। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যিনি প্রসবিত্রী, তিনি চিন্ময়ী হইলে এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে কি? তাহার উত্তরে কথিত হইল—'তত্তু সমন্বয়াৎ'।

'তত্তু' অর্থাৎ আদ্যজন্মের কারণত্ব থাকিলেও "সমন্বয়াৎ" 'সম্' সম্যক্ 'অন্বয়' সম্বন্ধবশতঃ, দ্বিতীয় সূত্রোক্ত প্রসব-ধর্ম্মের সহিত তৃতীয় সূত্রের চিন্ময়স্বরূপের নিত্যসম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মবিষয়ে উভয় স্বরূপই সম্ভবপর। বহুশ্রুতিবচনে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। 'মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ' (বৃহদারণ্যক) 'সংযুক্তমেতৎ ক্ষর-মক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ' (শ্বেতাশ্বতর) এবং এই সকল শ্রুতিবচনকে উপজীব্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্রে মহাশক্তির বর্ণনায় বহু বিরোধিধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন।

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"
"মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

ইত্যাদি।

মহাশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে সকল বিরোধিভাবের সম্মেলনস্থান। শাক্তদর্শনসিদ্ধান্ত বেদ হইতে এবং তন্ত্র হইতেও সংগৃহীত হইয়া থাকে। অদ্য সংক্ষেপে বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রীর ভাবার্থ প্রকাশ করিলাম।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব* তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্যে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। আমি তাহার একাংশমাত্র এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

নিত্যসম্মিলিত চিদচিৎ সত্তাই মহাশক্তি, ইহাই শাক্তদর্শনের সিদ্ধান্ত।

* ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়
—উঃ সঃ

কবিতাঞ্জলি

থাক্ সে গোপন

শ্রীচিত্ত দেব

আকাশে তুমি ছড়িয়ে দিলে আমারে
জড়িয়ে নিলে তোমার বিপুল ছন্দে—
গন্ধে গানে হরিলে আমার চিত্ত
পুরিলে পরাণ বিমল জীবনানন্দে।
পুষ্পে পত্রে আমারে তুমি এঁকেছো
তোমার গলায় মালার মতন রেখেছো।
ডাকিলে তবু সময় হলেই আসো যে
কখনও আমি যাইনে তোমার আনতে—
আমারে তুমি কখন ভালোবাসো যে
থাক্ সে গোপন—চাইনে আমি জানতে।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

তোমারে স্মরণ করে আছে সাধ্য কার,
তুমি না স্মরিলে পরে করুণা-পাথার।
যাগ-যোগ জপ আদি তপস্যা কঠোর,
একাসনে স্তব্ধ ধ্যানে বসি' নিরন্তর,
দর্শন বেদান্ত শাস্ত্র পুঁথি যত সব
করায়ত্ত যদি হয় জ্ঞানীর গৌরব,
সাধি' কত ব্রত করি' তীর্থ দরশন
তবু, হায় নাহি হয় হৃদয় পূরণ।
তোমার কৃপায় দৃষ্টি মর্মে পশে যার,
অনাদি দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান সুলভ তাহার।

বিশ্বরূপ

[শ্রীঅরবিন্দের একটি সনেট অবলম্বনে]

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিমল রভসমূর্ত হে সুন্দর, স্বচ্ছ জ্যোতির্ময়,
আত্মা মোর রত আজি তব অন্বেষণে ;
সর্বময় স্পর্শ তব পাই আমি ধরার ধূলায়,
ভাসে মোর প্রাণমন পুলকের দীপ্ত সম্মোহনে।
সকল নয়ন মাঝে নেহারি গো তব দৃষ্টি-সুধা,
সর্ব কণ্ঠে শুনি তব কম্বুস্বরধ্বনি ;
প্রকৃতির পথ বাহি' তব প্রেম উজলে আমায়,
তব দিব্যছন্দে মোর সত্তা আজি উঠিছে নিস্বনি'।
জীবনের বক্ষে তব মুরতির আনন্দ অম্লান
পুষ্পে, পত্রে, প্রস্তরের অঙ্গে অঙ্গে শোভে ঃ
বহ্নিময় পক্ষপুটে প্রতিপল তোমারেই চায় ;
মর্তজীবন প্রভু উদ্ভাসিত তোমার আহবে।

যাত্রী আজি মহাকাল তব চির-প্রগতির সনে,
ভবিষ্যৎ আশাপুঞ্জ পল্লবিত তোমারই গহনে।

বিকল্প

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

'ঈশ্বর সত্য'—এ তত্ত্ব না মানে যে,
'সত্যই ঈশ্বর'—এই যেন জানে সে।
'বিশ্বরূপের' দেখা যে না পায় খুঁজিয়া,
বিশ্বই রূপ তাঁর লয় যেন বুঝিয়া।

সাকারে যে সংশয়ী, নিরাকারে ধারণা
নাই যার, জ্ঞান নাই, প্রেম সে তো আরো না;
প্রতিরোধ যে না পায় অপরের বাণীতে,
সাধনা সে করে যেন আপনারে জানিতে।

নব আগমনী

শ্রীশৈলেশ

শত শরতের প্রথম প্রভাতে দিয়েছিনু তব চরণে
শত কামনার শত অঞ্জলি,—কহিতে মরি যে শরমে!
সব কিছু মাঝে কেবল আপন
স্বার্থ ও সুখ খুঁজেছিল মন,
তব এ বিশ্বে আর কিছু আছে জানে নাই মোর ধরমে।
অনাদি চাওয়ার স্রোতে ভেসেছিনু অন্ত কোথাও নাহি।
পূজা অর্চনা যা কিছু করেছি সবই শুধু "দেহি" "দেহি"!
রূপ, যশ, ধন, জ্ঞান ও বুদ্ধি,
সুত-পরিবার-বিভব বৃদ্ধি,—
এ ছাড়া চাওয়ার আর কিছু ছিল, মানে নাই মোর মরমে।
আজি এ শরতে চিত্তে আমার নব জাগরণী বাজিছে;
বিলীন শ্রুতির বুকেতে দীপ্ত স্মৃতির আলোক লাগিছে!
ভাঙিছে স্বপন জাগরণী গানে,
স্থূল তনু মিশে মূল উপাদানে;
একক বাসনা বিশ্বজনার হয়ে আজি মিলে পরমে!
'দেহি'-হারা মন অর্ঘ্য সাজায়ে সঁপিছে জীবন-মরণে!

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি,
আকাশ-ঝরা আলোর স্রোতে জাগে অমল শিহর তুলি'।
বাঁধন ভাঙে পলে পলে
তোরি পরশ-সোনায় জ্বলে,
আঁধার-ঢাকা আকাঙ্ক্ষা তার রূপ নিল যে ঊষার ভুলি',
কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি।
বর্ণে যে তার লাগল প্রথম উদয়-বেলার স্বর্ণ-আভা,
চাঁদের বাঁশি মুক্ত প্রাণের গন্ধনিবিড় ছন্দে কাঁপা।
প্রতিক্ষণের নীরবতা
পায় গহনে কোন বারতা,
কোন অসীমের স্বপ্নদুয়ার মর্ত-ধূলায় যায় যে খুলি',
কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি।

শ্রীচৈতন্য-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত-জ্যোতিঃশাস্ত্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর যে অপূর্ব প্রকাশ দেখিয়াছিলেন ভক্তগণের নিকটে তাহাই বলিতেছেন :—

শ্রীচৈতন্যদেব অবতার

"আমারও তখন তখন ঐরকম মনে হত যে, চৈতন্য আবার অবতার। ছাড়া নেড়িরা টেনে বুনে একটা বানিয়েছে আর কি!—কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম কোথাও কিছু দেখ্‌তে পেলুম না! সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল! ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলুম!

অদ্ভুত দর্শন। দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনও দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসছে। আমি ঐ এলোরে এলোরে বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল ধরে ফেল্লে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে বাস্তবিকই অবতার।"

এইরূপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে উপদেশ-দানকালে নানাপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা পুনঃ পুনঃ বহুবার বলিয়াছেন। এখানে কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের হরিনাম প্রচার

"যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দ্যাখ চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার। তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল।"

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—

মাগুর মাছের ঝোল
যুবতী মেয়ের কোল,
বোল হরি বোল।

প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, 'যুবতী মেয়ে', কিনা—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধুলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি। নিতাই কোনরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামে ভারি মাহাত্ম্য।

শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল। যাদের ভোগ বাকী আছে তারা সংসারে থেকেই ডাকবে।"

গৌর নিতাইএর আচণ্ডালে কৃপা

"গৌর নিতাই হরিনাম দিয়ে আচণ্ডালে কোল দিলেন। এই এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। এই উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়।"

শ্রীচৈতন্যদেব যবনকুলোদ্ভব শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিতেন। সেই লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ-অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

বিজাতীয় লোকের সঙ্গত্যাগ

"ভবনাথ বল্লে, চৈতন্যদেব বলে গেছেন যে সকলকে ভালবাসবে। ভাল তো বাসবে—সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বোলে। কিন্তু যেখানে দুষ্ট লোক,—সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। চৈতন্যদেব, তিনিও—'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ'। শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের যে লীলার কথা বলিয়াছেন শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
ভক্ত সঙ্গে সঙ্কীর্তন করয়ে সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্তন।
প্রবেশিতে নারে কেহ ভিন্ন লোকজন॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস শাশুড়ী॥
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে॥
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্পভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘনে।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে॥"
সর্বভূত অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল॥
পুনঃ পুনঃ নাচি বলে "সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঁই॥"

* * *

মহাত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
"আমা সবা বিনা আর নাহি কোনো জন॥
আমরাই কোনো বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভুচিত্তে না পায় প্রসাদ॥"
আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া॥
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্বিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির॥
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥
প্রভু বলে—"এবে চিত্তে বাসিয়ে উল্লাস।"
হাসিয়া কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মাতৃভক্তি

"চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বল্লেন,—'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির যথার্থতার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্তলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিত জানি জননী আশ্বাসিতে॥
'নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিও তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥

* * * *

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করেন সদা সেবেন জননী॥

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জননীর সন্তোষের নিমিত্ত নীলাচলে অবস্থান-কালে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জননীর দত্ত দ্রব্য ভোজন করিতেন, শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় পার্ষদ দামোদরকে নিজ জননীর সেবা করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে পাঠাইবার সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—তুমি জননীকে আমার কোটি নমস্কার দিয়া কহিয়ো যে, তাঁহাকে আমার কথা শুনাইবার জন্য তোমাকে তাঁহার নিকট আমিই পাঠাইয়াছি। আর একটি গুহ্য কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও। মাঘ-সংক্রান্তিতে তিনি নানা ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্নাদি রাঁধিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিবার জন্য তাঁহার ধ্যান করিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল। আমি সেই সময় তথায় (সূক্ষ্মে) উপস্থিত হইয়া সেই সব দ্রব্য আহার করিয়াছিলাম। তিনিও (ভাবে) দেখিলেন নিমাই খাইতেছে—পাতও শূন্য; কিন্তু পুনরায় বাহ্যদশায় ফিরিয়া ঐ দর্শনকে ভ্রান্তিজ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবের উদ্দীপন

"শুনিস্ নি—এই মাটিতে খোল হয় বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে—ভক্তের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় উদ্দীপন যাহাতে হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। ভক্ত-হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম বিভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাব আবার দুই প্রকার, বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন। ভগবান অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রেম তিনিই প্রেমের বিষয় অতএব বিষয়ালম্বন। আর যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া ভগবানকে স্মরণ হয় তাহাই উদ্দীপন বিভাব। এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন হয়, মাটি দেখিয়া প্রেমের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়াতে শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাই ঠাকুরের উপদেশের মর্ম। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, বিভীষণ মানুষ দেখিয়া—আহা এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি, সেই নররূপ—এই বলে আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন, আর সেই মানুষটিকে উত্তম বসনভূষণ পরিয়ে পূজা আরতি করেছিলেন। এই বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—যাহার গুরুভক্তি হয় তাহার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখলে তো ঐরূপ গুরুর উদ্দীপন হবেই—যে গ্রামে গুরুর বাড়ী সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে—পায়ের ধুলো নেয়, খাওয়াই দাওয়াই সেবা করে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্-সি, বি-টি

বৃন্দাবন, মধু বৃন্দাবন !

নন্দপুরচন্দ্র বিনা আজ সে বৃন্দাবন অন্ধকার। তবুও ভক্ত-প্রেমিকের কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের পদধূলি-পূত প্রাণের তীর্থ সে বৃন্দাবন। রাধিকার অশ্রু-সিক্ত, চিরন্তন রস-রাসভূমি সে বৃন্দাবন।

সেথায়—

'চেতন যমুনা, চেতন রেণু
গহন কুঞ্জবন, ব্যাপিত বেণু।'

সেথায়—

'উজোর শশধর দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর বোল।
হনয়িতে হরিণী নয়নি দরশায়ই
ওহি, ওহি পিকু বোল।'

সেখানে স্বতঃ ওঠে ধ্বনি,—

'জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা,
জয় গোবর্ধন, চেতন-শিলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।'

সেখানে, আকাশে কান পাতলে এখনো শোনা যায় অপূর্ব সঙ্গীত, প্রাণ-মাতান করুণ মুরলীনিনাদ, যার আহ্বানে ব্রজগোপীরা একদিন গৃহ ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল, যমুনা প্রবাহিত হয়েছিল উজান স্রোতে।—

শ্যামকুঞ্জ রাধাকুঞ্জ গিরি গোবর্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই সে বৃন্দাবন।

দুঃসহ বিরহজ্বালার উপশান্তির জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করে বঙ্গাব্দ ১২৯৩ এর ভাদ্র মাসের ১৫ই তারিখ,—সে পরমতীর্থভূমির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন মা। সঙ্গের সাথী স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ ও লাটু মহারাজ। সঙ্গের সাথী গোলাপ-মা, লক্ষ্মীমণি ও মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী দেবী নিকুঞ্জবালা।

পথে দেওঘরে, পথে কাশীধামে অল্প কয়েক-দিনের জন্য বাস করেছিলেন মা—দেবদর্শন মানসে, তীর্থদর্শন মানসে। তারপরই সোজা বৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমগীতি-মুখরিত বৃন্দাবন। প্রথমা-বধিই মায়ের কাছে বড় ভাল লেগেছিল সে-পুণ্যধাম। কত হরিনাম তার পথে পথে, কত অবিশ্রাম নামকীর্তন তার মন্দিরে মন্দিরে। মা এ-স্থানকে তাঁর সাধনক্ষেত্র বলেই যেন গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য বিবিধ কারণ-পরম্পরায় বৃন্দাবনে খুব বেশীদিন তাঁর বাস করা হয় নি। শুধু সম্বৎসর কালের জন্য তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাই সেখানে। দেখ্‌তে পাই, বিরহ-ক্লিষ্টা ব্রতচারিণীর বেশে, নিঃসঙ্গ তপস্বিনীর বেশে। দেখ্‌তে পাই, কখনো দীনহীন কাঙালিনীর মত ইষ্টের মুখ চেয়ে তিনি প্রতীক্ষমাণা, কখনো অজ্ঞাত-পরিচয় অতি-সাধারণ তীর্থযাত্রীর মত পায়ে হেঁটে হেঁটে ব্রজমণ্ডল করছেন পরিক্রমা। আবার কখনো নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধ্যানজপে একেবারে নিবিষ্টা, একেবারে সম্বিৎ-হারা। বস্তুত, মায়ের 'সাধনকাল' বলে কোন সময়কে যদি একান্তভাবে চিহ্নিত করতে হয় তবে সে এই বৃন্দাবনের জীবন, আর এর অব্যবহিত পরবর্তীকালের কামারপুকুরের জীবন।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতকালে যে জীবন যাপিত হয়েছিল সেও অবশ্য মায়ের

তপস্যারই জীবন ছিল, শিক্ষারই জীবন ছিল। সেখানকার দৈনন্দিন বিবিধ কর্মব্যস্ততার অন্তরালেও তৈলধারাবৎ মায়ের ধ্যানপ্রবাহই সর্বদা অব্যাহত থাকত। কখনো অন্যথা হত না। তথাপি, সে সাধনজীবনের সঙ্গে বৃন্দাবনের সাধনজীবনের কোন তুলনা হয় না। দু'জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র, পরিবেশ স্বতন্ত্র—উদ্দেশ্য অভিলাষও বোধ করি অনেকাংশে স্বতন্ত্র ছিল।

দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে জীবনদেবতার প্রত্যক্ষ, জীবন্ত উপস্থিতি ছিল সম্মুখে। সে-উপস্থিতি অন্তরকে সর্বক্ষণ কানায় কানায় রাখত ভরে। তখন জীবন মনে হত শুধু মধুময়, আনন্দময়। অনাগত সে-ভাবীকাল তাও যেন শত বিচিত্র কল্পনার উচ্ছলতায় ছিল রঙীন্। কিন্তু এখন? এখন অন্তরে-বাহিরে শুধু নিবিড় হাহাকার, সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত কেবল অন্ধকার, নিরন্ধ্র অন্ধকার!

একে তো শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনই মায়ের জীবনে এক মর্মান্তিক বিপর্যয়। তদুপরি, মৃত্যু, 'মহীয়সী যে মৃত্যুমাতা'—তার সঙ্গেও মায়ের সেই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। যে পরিচয়ে ধর্মের গভীর জিজ্ঞাসা উত্থিত হয় সাধকের মনে, যে-পরিচয়ে স্মরণাতীত যুগে একদা সৃষ্ট হয়েছিল ভাগবত, সৃষ্ট হয়েছিল গীতা, নচিকেতা মুখে উত্থিত হয়েছিল প্রশ্ন,…

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং—' ইত্যাদি।

ঠিক সেই পরিচয়। কাজেই নিঃসঙ্গ নিরালম্ব জীবনে সাধনসমুদ্রের অতল গভীরে একেবারে ডুবে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এ-কালে আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না মায়ের জীবনে। এখন ভক্ত-সংসারের কোন কাজ নেই হাতে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবা-পরিচর্যাও ইহজন্মের মত শেষ হয়ে গেছে। অখণ্ড অবসর সম্মুখে। কাজেই বৃন্দাবনে মায়ের সমগ্র অন্তর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শুধু একটি প্রয়াসে, একটি অখণ্ড, অকুতোভয় প্রয়াসে—'সব ছোড়্ সব পাওয়ে'। সমগ্র মন-প্রাণ নিবিষ্ট হয়েছিল শুধু একটি কামনায়, একটি উদগ্র, উৎকণ্ঠ কামনায়—যিনি সর্বদা সর্বহিতে রত তাঁকে লাভ করব, তাঁতে নিবিষ্ট হয়ে ভুলে যাব সংসার, ভুলে যাব বিরহবেদনা, ভুলে যাব দেহজ্ঞান। একটি হবে বোল্—সে-বোল, হরিবোল। একটি হবে ব্রত, সে ব্রত পরমপুরুষের শাশ্বত নির্দেশ পালনে—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।'

তাই বৃন্দাবনে মায়ের যে দৈনন্দিন কার্যসূচী, সেও অনেকাংশে দক্ষিণেশ্বরের কার্যসূচী থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আহার-নিদ্রার একান্ত অপরিহার্যতায় যে সময়টুকু অতিবাহিত হত সেটুকু ছাড়া দিনরাত্রির সমস্তক্ষণ ব্যয়িত হত একই ভাবে—ধ্যানে, জপে; ভাবে, সমাধিতে; দর্শনে, পরিক্রমায়।

দূরে যমুনাপুলিনে সহসা হয়ত কখনো বেজে ওঠে বাঁশী, যেমন বেজে উঠত একদিন, কোন্ দূর অতীত দিবসে,—যা শুনে ব্রজগোপীরা গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে যেত, যমুনার কাল জল উজান-স্রোতে বইতে সুরু করত,—সেই বাঁশী। আর বিরহব্যাকুলা, প্রেম-উন্মাদিনী শ্রীসারদা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ছুটে যেত সেই ধ্বনি লক্ষ্য করে। খুঁজতে খুঁজতে অনেক বিলম্বে বিজন বাপীতটে সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে পেত ভাব-বিহ্বল, প্রেম-বিহ্বল অবস্থায়।

কখনো দেখা যায়, নিধুবনের কাছে রাধা-রমণের যে মন্দিরটি, সে-মন্দিরের বিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে প্রহরের পর প্রহর একইভাবে মা দাঁড়িয়ে। অথবা, গোবিন্দজীর মন্দিরের একটি পার্শ্বে কিংবা কালাবাবুর কুঞ্জের একটি কোণে

গভীর সমাধিতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে ধ্যানাসনে তিনি উপবিষ্ট। অনেক রাত্রে সঙ্গীরা এসে কর্ণমূলে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ধীরে ধীরে বাস্তবজগতের সঞ্জীবতায় তাঁকে ফিরিয়ে আনে।

এমনি করে কেটে যায় কত দিন, কত সপ্তাহ; বিনিদ্র রজনীর কত দীর্ঘ প্রহর। তারপর ধীরে ধীরে অরুণাভায় পূর্ব দিগন্ত রঞ্জিত হতে শুরু করে, শূন্য হৃদয় আনন্দ-নির্ঝরে উঠতে থাকে ভরে। খর উত্তাপের মহাশূন্যতাকে পূর্ণ করে, প্লাবিত করে জাগ্রত হয় মৌসুমী বায়ুর অনন্ত প্রবাহ, অনুভূত হয় সে প্রবাহের সরস, শীতল সঞ্চালন।

নানাভাবে, নানা মূর্তিতে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিয়ে, কথা কয়ে, নির্দেশ দান করে—ঠাকুর তাঁর সকল বিরহজ্বালা দূর করে দিতে শুরু করেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরের প্রথম জীবনে যে আনন্দের পূর্ণ ঘটটি নিয়ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলে অনুভব করতেন মা, আবার যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিহনে একেবারে শুষ্ক, শূন্য দেখে দেহধারণই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে, আজ আবার কতদিন পরে সেই ঘটটি শনৈঃ শনৈঃ রসে, অমৃতে পূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে। বাতাস আবার মধুময় বলে মনে হয়। আকাশে আবার ধ্বনিত হয় আনন্দসঙ্গীত—

'যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনা মন্ত্র জপে'—

তারই সঘন স্পন্দন সুস্পষ্ট অনুভূত হয় অন্তরে।

যিনি রসস্বরূপ, রসময়,—রসো বৈ সঃ বলে শাস্ত্রমুখে যাঁর পরিচয়, তিনি অন্তরে আসন গ্রহণ করলে বিরহ নীরসতা আর কেমন করে থাকে? এক দর্শনের সূত্র ধরে আসে আর এক দর্শন, এক অনুভূতিকে পূর্ণতর করে আসে দ্বিতীয় অনুভূতি। ক্রমে সাধন-জীবনের অবসান সূচনা করে অপ্রত্যাশিত নির্দেশ আসতে থাকে সম্মুখে, ভাবী কালের চিত্র উন্মোচিত হতে থাকে শনৈঃ শনৈঃ। মা দেখতে পান, প্রায়ই দেখতে পান ঠাকুরের ইঙ্গিত, শুনতে পান তাঁর আদেশ। বিশেষ করে একদিন।—

সেদিন, ধ্যানশেষে কতকটা আবিষ্টভাবেই আসনে বসে ছিলেন শ্রীমা। অকস্মাৎ যেন ঠাকুরের কণ্ঠধ্বনি ভেসে এল বাতাসে। মা শুনতে পেলেন তাঁর কথা,—'দীক্ষা দাও তুমি।'

দীক্ষা দাও! সে আবার কী নির্দেশ! মা বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রথমটায় মাথার খেয়াল বলে, দৃষ্টির ভ্রম বলে সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করতেই চাইলেন। কিন্তু অগ্রাহ্য করা চলল না শেষ পর্যন্ত। ক্রমান্বয়ে তিনদিন একই নির্দেশ পেয়ে মাকে অবহিত হতে হল। যখন পর পর তিনদিনই প্রত্যক্ষ করলেন একই দৃশ্য—সাক্ষাৎ সম্মুখে এসে সুস্পষ্ট ভাষায় একই কথা বলছেন ঠাকুর,—দীক্ষা দাও তুমি, তোমার মহতী গুরুশক্তির অভয়-আশ্রয়ে আর্ত ও জিজ্ঞাসু নরনারী পরমাশ্রয় লাভ করুক;—তখন আর মাথার খেয়াল বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃন্দাবনের পরমতীর্থে জীবনে প্রথম মন্ত্রদীক্ষা দান করলেন মা।

তাঁর অন্তরঙ্গ সন্তান, তাঁর প্রথম ও অন্যতম প্রধান সেবক, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বচর যোগানন্দ, ঈশ্বরকোটি যোগানন্দ—সে দীক্ষালাভে ধন্য হলেন, কৃতার্থ হলেন।[১]

কথিত আছে দীক্ষা দিবার সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে বিশেষ উচ্চকণ্ঠে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন মা

১। এ-দীক্ষা দানেরও পূর্বে অন্তত একজনকেও যে মা দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতকালে সে-কথা তদীয় কোন কোন জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের নহবতগৃহে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে অবগুণ্ঠনাবৃত থেকেই যে মা দীক্ষা দিয়েছিলেন, সে সব গ্রন্থে এ-কথা বলা হয়েছে।

এবং পাশের ঘরে যারা ছিল তারাও শুনতে পেয়েছিল সে মন্ত্র।

উত্তর জীবনে যে অগণ্য নরনারী মায়ের দিব্য গুরুশক্তির অভয় আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হয়েছিল, উদ্বুদ্ধ হয়েছিল—ব্রজধামের পুণ্যক্ষেত্রে এই ভাবেই ঘটেছিল তার শুভ উদ্বোধন, তার জয়যাত্রার প্রথম সূত্রপাত।

বস্তুতঃ, বৃন্দাবন থেকে দীর্ঘ এক বৎসর পরে ফিরে এসে কামারপুকুরের একান্ত বিজনতায় আরও অনেকগুলি দিন আপনভাবে যাপন করলেও দেবী সারদামণির জীবনের বিরাট রূপান্তর, গুরুশক্তির ব্যাপক প্রকাশ যে ঐকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল—সেকথা পরবর্তী ঘটনাসমূহ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়।

দেখা যায়, কি বৃন্দাবনের শেষদিকে, কি কামারপুকুরের নির্জনতায়—মায়ের ধ্যানচিন্তা ও প্রার্থনা-নিবেদন ঐকাল থেকে আর তাঁর নিজ জীবনের পরিধিমধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। অবশ্য পূর্বেও সেটা ছিল না। তবু, এখন থেকে তাদের বিশ্ববিস্তৃতির পথে নিঃশব্দ পদসঞ্চার যেন বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। স্পষ্টই যেন দেখা যায়, পরিচিত নরনারী ও পরিচিত দেশকালের স্বাভাবিক গণ্ডী স্বতঃ অতিক্রম করে তাঁর চিন্তা ও আকৃতি—সর্বলোক, সর্বকাল ও সর্বদেশের চিরন্তন কল্যাণে এখন থেকে নিয়োজিত হতে চলেছে।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, স্বধর্মী ও বিধর্মী—সকলের জন্য—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অব্যাহত অদৃশ্যধারায় নিত্য উৎসারিত হতে শুরু করেছে তাঁর অমোঘ প্রার্থনা ও নিবেদন; কল্যাণ হোক সকলের, আধিহীন, ব্যাধিহীন হোক জীবধাত্রী বসুধা—

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতঃ লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।

ইতিমধ্যে সম্বৎসর অতীত হয়ে গেল। পরিপূর্ণ অন্তরে বিশ্বমাতৃত্বের এক উদ্বেল অনুভূতি নিয়ে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেন মা বাংলায়। ফিরে এলেন রামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মভূমি, এ-যুগের নবতীর্থ কামারপুকুরে।

ভারতীয় জীবনদর্শন ও দুর্গাপূজা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্‌-এ, পি এইচ্‌-ডি

সমগ্রতা বা অখণ্ডতা-বোধই ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূলগত বৈশিষ্ট্য। উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মহিমা, এক আশ্চর্য অতুলনীয় মহিমা। পরিপূর্ণতা-বোধ বা ভূমাবোধ উহারই নামান্তর। উহাই বহুর মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি; নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের এবং স্থিতি ও গতিতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টিও উহা হইতেই।

যাহাদের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মবাণী হইতেছে—এক আমি, বহু হইতেছি,[১] বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ হইবে কি করিয়া? ঋষি বলেন,—এই দৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম,—'তজ্জলান'; তাহা হইতে জাত, তাহাতেই জীবিত এবং

১ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।
—ছান্দোগ্য উপনিষৎ—৬।২।৩

তাহাতেই লীন হইতেছে।[২] ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তরূপ[৩] ;—অজস্র তাহার অভিব্যক্তি, রূপে রসে গন্ধে শব্দে, লোকে লোকে বিচিত্র প্রাণস্পন্দনে, সুখ-দুঃখ জীবনমৃত্যুর বিপরীত দ্বন্দ্বলীলায় অপরূপ অপরিমেয় অনন্ত তাহার প্রকাশ। এই প্রকাশকে অদ্বয় বৈদান্তিকের মায়াই বলুন, আর ভক্তবৈষ্ণবের লীলাই বলুন, ইহা অনন্ত—অনন্ত। আর মায়া বা লীলা ভক্ত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এক বস্তুরই এপিঠ বা ওপিঠ নয় কি? অদ্বয় সচ্চিদানন্দের সহিত এই দৃশ্যমান জগতের সমন্বয় অন্য কিরূপেই বা সম্ভবপর?

তাই সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উপনিষৎ বলেন, এই সমগ্র দৃষ্টি বা সম্যগ্ দৃষ্টি অত্যাবশ্যক। অবিদ্যার যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা অন্ধ-তমসে প্রবেশ করেন, অবিদ্যা বর্জন করিয়া যাঁহারা কেবল বিদ্যার আরাধনা করেন, তাঁহারা গভীরতর অন্ধতমসে প্রবেশ করেন। যাঁহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা—উভয়কে উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই কেবল অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সাহায্যে অমৃতলাভে সমর্থ হ'ন।[৪] যিনি সকল জীবকে আত্মার মধ্যে দর্শন করেন এবং সকল জীবের মধ্যে দর্শন করেন আত্মাকে, তিনিই ঘৃণা, নিন্দা ও ভয়ের অতীত সত্যিকার দ্রষ্টা![৫]

ভারতীয় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সাহিত্য, এমন কি নৃত্য, গীত, চিত্র এবং মূর্তিশিল্পের মধ্যেও ভারতীয় জীবনদর্শনের এই পরম বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের ন্যায় আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণের জীবনেও এই স্বরূপের আশ্চর্য প্রকাশ দেখা যায়।

সমগ্র বেদরাশির কথাই আগে আলোচনা করা যাক্। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই দুই কাণ্ড লইয়া উহা সম্পূর্ণ। জ্ঞানকাণ্ড আবার সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই তিন ভাগ লইয়া। এক উন্নততর মহত্তর বলিষ্ঠ মানব-সমাজের তেজ বীর্য আনন্দ ও অমৃতের ধর্মে বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের নিত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়া শুরু কর্মসাধনায় যাহার আরম্ভ, পরম-জ্ঞানের সোঽহম্-মন্ত্র-সাধনায় তাহার সমাপ্তি। ঋষি কর্ম ও জ্ঞানের সুশোভন সমন্বয়মূর্তিতে নিজ জীবনকে সমাজের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। শ্রুতির এই কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ই গীতায় কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ে অপূর্ব ব্রহ্মবিদ্যারূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতির যুগে যোগবাশিষ্ঠ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—দুই পক্ষ লইয়া আকাশে যেমন পক্ষীগণের গতি সম্ভবপর হয়, সেইরূপ যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।[৬]

রামায়ণ-মহাভারতের সমগ্রত্বও এই প্রকার বটে, আবার অন্য প্রকারও বটে। উহা এক বিরাট মহাকাব্যের বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বর্ষের ব্যক্তির ও জাতির আদ্যন্ত জীবনদর্শন। উহা গ্রীক্ ইলিয়ড মহাকাব্যের ন্যায় কেবল যুদ্ধ-প্রধান নয়; সে তো রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড অথবা মহাভারতের ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শল্যপর্ব। যাঁহারা ইলিয়ড কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সহিত কেবল কাব্যাংশে নয়, সর্বাংশে তুলিত করিতে

২ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।—ছান্দোগ্য

৩ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়

৪ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
তততা ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ।
বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।
—ঈশাবাস্য

৫ যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।—ঈশাবাস্য

৬ উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্।

চাহিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই দুই বৃহৎ মহাকাব্যে আমরা পাই,—বংশাবলীর মহত্ত্বময় ঐতিহ্য বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্ব, ক্রমে যুদ্ধপর্ব শান্তিপর্ব অতিক্রম করিয়া মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও চরম পরিণামের বিরোধ ও শান্তির বিচিত্র লীলাময় শাশ্বত মানবজীবনের এক অখণ্ড ইতিহাস।

ভারতীয় সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটকে এই একই জীবনদর্শনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ভক্তিবিমুগ্ধ চিত্তে রবীন্দ্রনাথ তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন।[১] শকুন্তলায় শেষ অঙ্কে 'বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি।' রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা নাটককে বলিয়াছেন,—একসঙ্গে একটি Paradise Lost এবং Paradise Regained। গেটে বলিয়াছেন শকুন্তলায় 'তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল এবং মর্ত্য ও স্বর্গলোকের একত্র সমাবেশ।' কুমারসম্ভব কাব্যও অনেকটা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—"মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম ও বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।" কুমারসম্ভব কাব্যই হইল মদনকে ভস্মীভূত করিয়া কঠোর তপস্যার অন্তে শিব ও শক্তির অচ্ছেদ্য মিলন, মঙ্গল ও সৌন্দর্যের অক্ষয় পরিণয়। বহু শতাব্দী পরে রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় আদ্যন্ত এই সমগ্রতা বা সম্যগ্‌দর্শন উপলব্ধি করা যায়। পূর্বরাগ, অভিসার ও মিলনের পর বিরহে এই লীলার অবসান নহে, মাথুরের পরে দিব্যোন্মাদ ও ভাবসম্মিলনে ইহার চরমোল্লাস ও চিরন্তন বিলাস।

১। 'প্রাচীন সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় সাহিত্যে কেন ট্র্যাজিডি নাই, তাহার রহস্যটিও এখানে ধরা পড়িবে। যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন, বলিয়াছেন দুইই আত্মার বন্ধনের কারণ, যাঁহারা নির্লিপ্ত দৃষ্টি লইয়া লাভ-ক্ষতি বা জয়-পরাজয়ের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানেন নাই এবং দেখিয়াছেন সকলের ঊর্ধ্বে পরম শিব, পরম আনন্দ ও পরম শান্তিকে, তাঁহারা দুঃখকে প্রবলভাবে স্বীকার করিলেও, তাহার বিশেষ মূল্য দিবেন কেন? দুঃখ নয়, পরম মিলন ও পরম আনন্দই তাঁহাদের জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সাহিত্যকে তাঁহারা প্রকৃতির দর্পণ মাত্র মনে করেন নাই, অভিনব সমাজ গঠনকল্পে আদর্শনিষ্ঠ বুদ্ধি লইয়া তাঁহারা সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে পরম মঙ্গল ও পরম মিলনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই অখণ্ড সত্য বা পরিপূর্ণ জীবনদর্শনকে ভারতবর্ষ কদাচ বাস্তবসত্যের অতীত বলিয়া অবিশ্বাস করেন নাই। তাই তাঁহাদের কাব্য বা নাট্যে সন্ধিগণনায় পাওয়া যায় বিমর্ষের পরে উপসংহার। সমস্ত খণ্ডতা অখণ্ড পরিণামের মধ্যে স্থির সুষমা লাভ করিয়া অপূর্ব অমৃতরস পরিবেশন করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষের চতুরাশ্রম কল্পনার মধ্যেও এই সত্যের স্বীকৃতি রহিয়াছে। সুখের বিষয়, আধুনিক জগতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে যে 'Integrated way of Life'-এর কথা বলা হইতেছে, তাহা এই জীবনদর্শনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরামচন্দ্রের বহুভঙ্গিম জীবনের কথা সকলেরই পরিজ্ঞাত। আর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, দ্বারকালীলা ও কুরুক্ষেত্রের লীলার কথা স্মরণ করিলে সে বিরাট মহিমার ক্ষীণ উপলব্ধিতেও স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। দেবতামণ্ডলীর মধ্যে শিব, আশ্চর্য তাঁহার ভাব ও কল্পনার সমৃদ্ধি!

স্বামী প্রেমানন্দ

কত ঐতিহ্য সেখানে অবিচ্ছেদে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। শিবের চাইতে বড় গৃহী কে? শিবের চাইতে বড় সন্ন্যাসী কে? অন্তরের গহন গুহায় নিত্য ধ্যান-লীন থাকিয়াও তিনি তাণ্ডবোন্মত্ত প্রলয়রসিক। নটরাজ, আবার শিব শম্ভু শঙ্কর! আধুনিক কালের রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ, কিংবা গান্ধীজী—ইঁহাদের চিত্তক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্রের অবাধিত প্রসার কাহার না বিস্ময় উদ্রেক করে!

কলা ও শিল্পের মধ্যে এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে একমাত্র মূর্তি-শিল্প বা উহার পরিকল্পনা লইয়া দু'একটি কথা বলা যাইতে পারে। এই মূর্তি বা প্রতীক বা প্রতিমা আমাদের দৃষ্টিতে পুতুল নহে, ইহা ভাবঘন ভাব-বিগ্রহ পুজার্হ দেবতা। হর-পার্বতী বা উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, হরিহর, শ্যাম-শ্যামা বা কালীকৃষ্ণ—কতরূপেই এই সমগ্রতা সমন্বয়ের প্রকাশ ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গে দেখা গিয়াছে। সীতা-রাম বা রাধা-কৃষ্ণ ঐ একই তত্ত্বের প্রচার করে। আবার সুপ্রাচান কোণার্কের সূর্যমন্দিরে আর এক সমন্বয়ের দৃশ্য। মন্দিরের বহির্গাত্রে ও চক্রাঙ্গে চলমান বিশ্বজগৎ, তরুলতা মানব পশু বিরাট বিশ্বজীবনের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ সমগ্রলীলা প্রকটিত, অভ্যন্তরে মহাকালের নিয়ামক দেবতা প্রসন্ন মহিমায় শান্ত ও স্থির।

বাঙ্গালী মনীষার পরিকল্পিত দুর্গামূর্তিতে ভারতীয় জীবনদর্শনের সেই পরিপূর্ণ প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। মধ্যে মহাশক্তি দুর্গা দশভূজা দশ দিকে দশ ভুজ প্রসারিত করিয়া বিরাট দেশ ও কালকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন; বামে লক্ষ্মী সৌন্দর্য-সৌভাগ্য-সম্পৎ-স্বরূপা; দক্ষিণে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী মেধা-ধৃতি প্রভা-পুষ্টি প্রভৃতি অষ্ট তনু লইয়া দীপ্তি পাইতেছেন; একদিকে বলরূপী দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, অপরদিকে সর্বসিদ্ধিদাতা গণাধিপতি হেরম্ব গণেশ; চরণতলে অমঙ্গলরূপী মহিষাসুর সিংহবীর্যে বিমর্দিত হইতেছে। ইহা মহেশ্বরী মহাশক্তির পরিবৃত অবস্থায় সর্বাত্মক লীলা। তত্ত্বদৃষ্টিতে কিন্তু ইহাও অসম্পূর্ণ লীলা। সম্পূর্ণতার জন্য ঐ দেখুন উর্ধ্বে প্রতিমার পশ্চাৎপটে সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বমহিমায় বিরাজমান। এই শিবাধিষ্ঠিত শক্তিই আমাদের অর্চনীয়। শিবশূন্য শক্তি ভয়ঙ্করী, পাশ্চাত্যে স্বার্থলুব্ধ ঐশ্বর্যগর্বিত মদান্ধ ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহার প্রকাশ দেখিয়া বিশ্ববাসী পুনঃ পুনঃ ভয়বিমূঢ় হইয়াছে। আসুন, আত্মবিস্মৃত জাতি আমরা, আমাদের জীবনদর্শনকে উজ্জীবিত করিয়া শিবাধিষ্ঠিত দুর্গার অর্চনায় এই সঙ্কটক্ষণে পুনরায় ব্রতী হই।

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৯১১ সালের গ্রীষ্মকাল। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। পথ ঘাট কিছু জানা নেই। মঠের কাউকে চিনি না। কয়েকবার বড়দাদার সঙ্গে বাগবাজার শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে গিয়েছি এই পর্যন্ত। বেলুড় ষ্টেশনে নেমে পুবমুখো হেঁটে চলেছি। প্রখর রৌদ্রে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে পথ জনশূন্য। পথ জিজ্ঞাসা করবার মত লোক পাইনে। অবশেষে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ পার হয়ে কতকগুলো কুটিরের মধ্য দিয়ে একটা ইটখোলায় এসে পড়লাম। এইখানে

মঠের হদিশ পাওয়া গেল। উত্তর পশ্চিম কোণের খিড়কীর দরজা দিয়ে বহু মহাপুরুষের সাধনায় পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে প্রবেশ করলাম। বামে ঠাকুর ঘর রেখে মঠ বাড়ীর পশ্চিমের বারান্দায় উঠে দেখি, একটা লম্বা টেবিলের দু'দিকে দু'খানা বেঞ্চ, পূর্বদিকের বেঞ্চে পশ্চিমাস্য হয়ে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করতেই "জয় রামকৃষ্ণ" বলে আশীর্বাদ করে পাশে বসালেন। "আহা, এই গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে"—বলে সস্নেহে হাতের তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। কুণ্ঠায় লজ্জায় আপত্তি করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর তাঁর আদেশে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। এইবার তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। বললাম,—কোচবিহারের রাজবাড়ী থেকে আসছি, আমি শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই।

"শৌর্যেন্দ্র অনেকদিন মঠে আসেনি, কেমন আছে?"

আমি বললাম,—দেশের বাড়ীতে গেছেন।

এমনি সব টুকি-টাকি কথা হচ্ছে, এমন সময় তরুণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা আসতে লাগলেন। এসে বসলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দত্ত। এলো এক বৃহৎ কেটলি চা। তিনি চটা-ওঠা এনামেলের বাটিতে চা ঢেলে নিলেন আর একবাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—খোকা চা খাও। তখন আমার যা বয়স তাতে খোকা বলে ডাকলে লজ্জা পাই। হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। সন্ন্যাসী বললেন, ওরা রাজবাড়ীতে থাকে, অমন একটা পেয়ালায় ওকে চা দিচ্ছ! মহেন্দ্র হেসে বললেন, দেখ বাবুরাম, এটা যে সাধুসন্ন্যাসীর মঠ সেটা জেনেই এসেছে।

ইনিই বাবুরাম মহারাজ! বড়দাদার বৈঠকখানায় ভক্ত-সম্মেলনে এঁর কথা কত শুনেছি। কথামৃতে এঁর সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন, বাবুরামকে দেখলাম, দেবীমূর্তি, গলায় হার! বিস্ময়ের অন্ত রইল না। মাথায় ঘনকৃষ্ণ চুল ছোট করে ছাঁটা, নির্মল ললাটের নীচে ভাবের আবেশভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ, সৌম্য মুখমণ্ডলে করুণা ও প্রেমের স্নিগ্ধ দীপ্তি—তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সুঠাম দেহ, পৌরুষের কাঠিন্যবর্জিত সর্বাবয়বে যেন একটা অপার্থিব মাধুর্য। ইনিই স্বামী প্রেমানন্দ। মানুষের মধ্যে ভূমাকে প্রত্যক্ষ করা এক দুর্লভ সৌভাগ্য। সেই মহাসৌভাগ্যের স্মৃতি চিত্তপটে আজো অম্লান হয়ে আছে।

আমার মত একজন সামান্য বালকের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখে অভিভূত হলাম। মনে হ'ল আমি রামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিবারের ছেলে বলেই এতটা সমাদর করলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী এক জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রত্যয়ে ভরা। এমন অদ্ভুত দেবমানবের সম্মুখে কখনো দাঁড়াইনি। আদর করে প্রসাদ খাওয়ালেন, ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে বলতে লাগলেন। সকলে তাঁকে ঘিরে সেই অমৃত-মধুর কথা শুনতে লাগলেন। বেলা গড়িয়ে পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠলো। নিজে এসে গঙ্গার ঘাটে নৌকায় তুলে দিলেন। কাঁধের উপর হাত দিয়ে বললেন,—মাঝে মাঝে এসো।

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। তারপর কতদিন কত বর্ষ তাঁকে দেখেছি; অপার তাঁর স্নেহ, অসীম তাঁর করুণা। মনে হয়েছে, এমন মানুষকে ভালবাসা চলে, ভক্তি করা চলে—কিন্তু অনুসরণ করা কঠিন। সমস্ত অন্তর যাঁর সারাক্ষণ সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে অপার্থিব আনন্দরসে ডুবে আছে, এমন মানুষের প্রতি হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে আকৃষ্ট হওয়া

সহজ, কিন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা তাঁর অন্তর্লীন মহাভাবের পরিমাপ করা কঠিন। ভক্তির পথ আমার পথ নয়, ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রতি পঞ্চভাবের অনুরাগ আমার মনে কোনদিনই রেখাপাত করেনি। কিন্তু যাঁর মন-বুদ্ধি শুদ্ধা-ভক্তিতে ভরপুর, যিনি শিশুর মত সরল বিশ্বাসী—তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য সেকালে কেন উতলা হতাম, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আজো খুঁজে পাইনি। যাঁরা সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন, হয়তো তাঁরা এমনি ভাবেই সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষকে আকর্ষণ করেন।

মঠে যাতায়াত করি। মাঝে মাঝে কয়েকদিন থেকেও যাই। শিক্ষিত সেবাব্রতী সাধু ব্রহ্মচারী অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। প্রবীণ সাধুরাও স্নেহ করতেন। এই সময় যে সব যুবক ও ছাত্র মঠে যেতেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হল। কলকাতাতেও বিবেকানন্দ সোসাইটি, ও বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে অনেকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। পূর্ব থেকে কথাবার্তা বলে আমরা গঙ্গার ঘাটে জমায়েৎ হ'তাম, তারপর নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করতাম। সেইসব পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে আজ অনেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দের আদর্শ প্রচারের মহাব্রতে যোগ দিয়েছেন, অনেকে দেশসেবা ও রাজনীতিতে বরণীয় হয়েছেন। এই সময় ছাত্র সুভাষচন্দ্রও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গী হত।

এমনিভাবে এক রবিবার আমরা মঠে চলেছি। নানা আলোচনার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা আমরা মঠে যাই কেন? অমনি উত্তর,—বাবুরাম মহারাজকে দেখতে, তাঁর কথা শুনে শান্তি পেতে। যাদের মন বৈরাগ্য-প্রবণ, যারা ভক্ত, যারা বেদান্তী, যারা রাজ-নৈতিক বিপ্লবী, যাদের সমাজসেবা শিক্ষাপ্রচারের আগ্রহ আছে, এমন নানাভাবের যুবক চলেছে, প্রেমানন্দজীর স্নেহে সকলেই কৃতার্থ। প্রতি শনিবার ও রবিবার প্রায় একশ' যুবক মঠে যেত, এছাড়া গৃহীভক্ত নরনারীদেরও সমাগম কম ছিল না। বাবুরাম মহারাজকে ঘিরে এক এক অপরাহ্নে আমরা আনন্দের হাট জমিয়ে তুলতাম। সহসা কথা বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তেন। (হয়তো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরও ত্যাগী যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমনিভাবে বিচলিত হতেন, এমনিভাবেই হেলে দুলে মহাভাব সম্বরণ করে কথা কইতেন।)—"তোমরা ভাব আমি কেবল ভক্তির কথা বলি! জ্ঞান কর্ম এও চাই। ধর্ম বলতে কেবল তাঁর নাম নিয়ে কাঁদা নয়, ধর্ম মানে কর্ম। স্বামিজী যে নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবার কথা বলেছেন, তাই হ'ল যুগধর্ম। ওতেও ঈশ্বরেরই সেবা হয়। দুঃখী অজ্ঞ মানুষের তোরা সেবা কর্, জ্ঞান দে, বিদ্যা দে, ওদের চোখ খুলে দে, এই বিরাট জাতির সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর্। শক্তি, শক্তি! কেন নিজেকে দুর্বল ভাবিস? মহান যুগে তোরা জন্মেছিস, স্বামিজী তোদের মানবজীবনের মহোচ্চ ব্রত গ্রহণের জন্য ডাক দিয়েছেন।"—এমনি সব কথা বলতে বলতে তাঁর দিব্যবিভায় মণ্ডিত মুখ এক অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌তো। তখন মনে হত আমরা যেন প্রত্যেকেই অসাধ্য সাধন করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের এক এক জনের মধ্যে এক একটি ভাব বিশেষ পরিস্ফুট ছিল। বাবুরাম মহারাজের ছিল, মাতৃভাব প্রবল। মঠের তিনি জননীস্বরূপা ছিলেন। এতগুলি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর খাওয়ানোর ভার তাঁর ওপর, এ ছাড়া ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। কিন্তু এর

ব্যবস্থা করতে তিনি হিমসিম খেতেন। বাইরের লোকেরা মনে করতো, সন্ন্যাসীরা ভাল খায়। হায়রে ভাল খাওয়া! সকালে জলতোলা, বাগানের কাজ—কায়িক শ্রম কম নয়। জলখাবার মুড়ি, কয়েক টুকরো নারকেল আর একটু গুড়। দুপুরে জোটে একটা তরকারী, ডাল আর টক। এক চামচে দৈ হলে তো খুবই হল। রাতে রুটি, উপকরণ ঐ। রোগীরা একটু দুধ পেতেন। একদিন প্রেমানন্দজী দুঃখ করে বল্লেন, গৃহী ভক্তেরা ছুটির দিনে আসে সন্দেশ রসগোল্লা ঠাকুরকে দেবার তরে। যদি আলু, বেগুন, চাল আনতো! এরা ঠাকুরকে উত্তম সামগ্রী দিতে চায়, ঠাকুরের ছেলেদের ডালভাতের ব্যবস্থা করতে ভুলে যায়। তিনি মঠ থেকে কাউকে অভুক্ত ফিরে যেতে দিতেন না। অর্থকৃচ্ছ্রতা আর মনমত উপকরণের অভাবে মাঝে মাঝে বিমর্ষ হতেন। আবার পরক্ষণেই বলে উঠতেন,—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, আমি কে? আমি কে, কথাটির মধ্যে তাঁর আমিত্ব যে সসীম-প্রসারিত, তার রেশ আমার মত মূঢ়জনের মনেও বাজতো। তিনি একদিকে যেমন তাঁর গুরুভ্রাতাদের সেবা-যত্নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, তেমনি প্রত্যেকের প্রতি তাঁর ছিল সমান মমতা। এক রাতের কথা বলি। পুরাতন মঠবাটির একতলার হল ঘরে তরুণ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আমরা শয়নের আয়োজন করছি, এমন সময় দেখি বাবুরাম মহারাজ আলো হাতে দোতলা থেকে নেমে আসছেন। আমরা কলরব থামিয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগলাম। তিনি একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বল্লেন, ওরে সতুকে একটা লেপ দিস, তোদের মোটা কম্বলে ওর কষ্ট হবে। কি স্নেহ, কি বিবেচনা! আমি রাজবাড়ীতে ভাল বিছানায় শুই, এখানে কষ্ট হতে পারে, শয়নের পূর্বে এই কথাটি তাঁর মনে পড়েছিল। অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু বহু বর্ষ পরে এক শীতের রাতে প্রেসিডেন্সী জেলের সেলে অস্পৃশ্য কম্বল গায়ে দিতে গিয়ে সেই কেরোসিনের আলোয় স্নেহকাতর রক্তিম মুখখানি মনে পড়লো—সেদিন নিঃশব্দ একাকীত্বের মধ্যে তাঁর মমতা স্মরণ করে আমার চক্ষু বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠলো।

শুনেছি, মহাপুরুষ-সঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু এই দুর্লভের সন্ধানে আমাকে সচেতন ভাবে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি। আমার যখন কিশোর বয়স, তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। এমনি একটা পরিবারের বালক-রূপে সহজেই তাঁদের দর্শন ও স্নেহ পেয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমা থেকে তাঁর সন্তানমণ্ডলীকে একান্ত সহজ ভাবেই পেয়েছিলাম, যেমন শিশু বড় হয়ে পায় বৃহৎ আত্মীয়-মণ্ডলী। এঁরা যে মহাপুরুষ এমন ধারণাও ছিল না। থাকবার কথাও নয়। যার যা প্রাপ্য নয়, সে যদি স্বচ্ছন্দে তা পায়, তার মূল্যবোধ হবে কেমন করে! বিনা চেষ্টায় অর্জিত সম্পদের মূল্য মূঢ়র কাছে যা, মহাপুরুষদের স্নেহ আমার কাছে সেদিন পার্থিব আর দশটা সম্পর্কের মতই সহজলভ্য ছিল।

আমার গুরুভাইরা এই সব কথা লিখবার জন্য অনেক অনুরোধ ও ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু লেখার বাধা কোথায়, সঙ্কোচ কি, তা এঁদের বোঝাতে পারিনি। হয়তো আমার এই লেখা পড়ে তাঁরা বুঝবেন, তাঁদের অনুভূতির রাজ্যে আমার প্রবেশাধিকার নেই। নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিতে যা দেখেছি, তা লৌকিক ভাবেই প্রকাশ করতে পারি, তার বেশী নয়। এটা বিনয়ের কথা নয়, স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের যক্ষ্মা-সেবাকার্য

ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিদেশী সরকার কর্তৃক বাঙ্গলাদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যখন রাঁচিতে বসবাস স্থাপন ও চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম, তখন এখানে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হইয়াছিল। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বরাবর আমার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ে ইংরেজ ও ফরাসী গ্রন্থকারদের লিখিত বহু পুস্তক ও পত্রিকাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং ইংরেজিতে এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ক একখানা পুস্তকও রচনা করিয়াছিলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার সহযোগী বহু বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান যুবকের যক্ষ্মারোগে অকালমৃত্যু আমাকে এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

দশ-পনর বৎসর পূর্বে বর্তমান কালের ন্যায় যক্ষ্মা-চিকিৎসার সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তখন আমাদের দেশে এই রোগের বিস্তারও বর্তমান কালের ন্যায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। আর্থিক অবনতি ও অন্যান্য নানা কারণে এই রোগ মারাত্মকরূপে বিস্তারলাভ করিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক ইহার আক্রমণে অকালে প্রাণ হারায়। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামে এই রোগের চিকিৎসার জন্য মাত্র এগার হাজারের কিছু বেশী বেড্ আছে।

আমার পূর্বোক্ত সঙ্কল্প রূপায়িত হইবার পূর্বেই রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী রাঁচি অঞ্চলে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের শুভ সঙ্কল্প লইয়া আমার সমীপে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আমার আনন্দের পরিসীমা রহিলনা। এই ত্যাগব্রতী সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার নহে বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাদের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যত্নশীল হইলাম।

যেসব কারণে মিশন কর্তৃপক্ষ রাঁচি-হাজারিবাগের সন্নিহিত কোন স্থানে যক্ষ্মা-সেবাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। প্রথমতঃ, বাঙ্গলাদেশে যক্ষ্মানিবাস-স্থাপনের উপযোগী তেমন শুষ্ক স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব। দার্জিলিঙ্গের ন্যায় পার্বত্য অঞ্চলে যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের অসুবিধা এই যে, ঐরূপ উচ্চ ও শীতপ্রধান পার্বত্যস্থানে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভান্তে হঠাৎ আর্দ্র সমতল দেশে ফিরিয়া আসার পর রোগিগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়েন ও কষ্ট অনুভব করেন। দ্বিতীয়তঃ, রাঁচি অঞ্চলের জলবায় যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফুটের কিঞ্চিৎ অধিক। এখানে বৎসরের মধ্যে অতি অল্পসময়েই গ্রীষ্মের তীব্রতা অনুভূত হয় এবং সেরূপ দুঃসহ শীতও এখানে পড়ে না। বার্ষিক বারিপাত কলিকাতা অঞ্চল অপেক্ষা অধিক নহে এবং বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সব সময় বায়ু বিশেষ শুষ্ক থাকে। এই অঞ্চলে জনবসতি কম হওয়ায় এবং

কলকারখানা না থাকায়, এ অঞ্চলের বায়ু বিশেষ নির্মল। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রাঁচিতে যাতায়াত সুগম ও স্বল্পব্যয়সাধ্য।

নানা কারণে যক্ষ্মানিবাসের জন্য স্থান সংগ্রহ বড় সহজে সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে এবং সে সকল স্থানের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। মনোমত স্থানের সন্ধান মিলিলেও তাহা আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া মনে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রীজহরলাল নেহেরু ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহায়তায় রাঁচি শহর হইতে দশ মাইল দূরে রাঁচি-চাইবাসা রোডের পার্শ্বে দুই শত চল্লিশ একর ভূমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ইহা ১৯৩৯ সালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ যক্ষ্মা-সেবাশ্রমের গৃহাদি নির্মাণ-কার্য ১৯৪৮ সালের পূর্বে আরম্ভ করা সম্ভবপর হয়
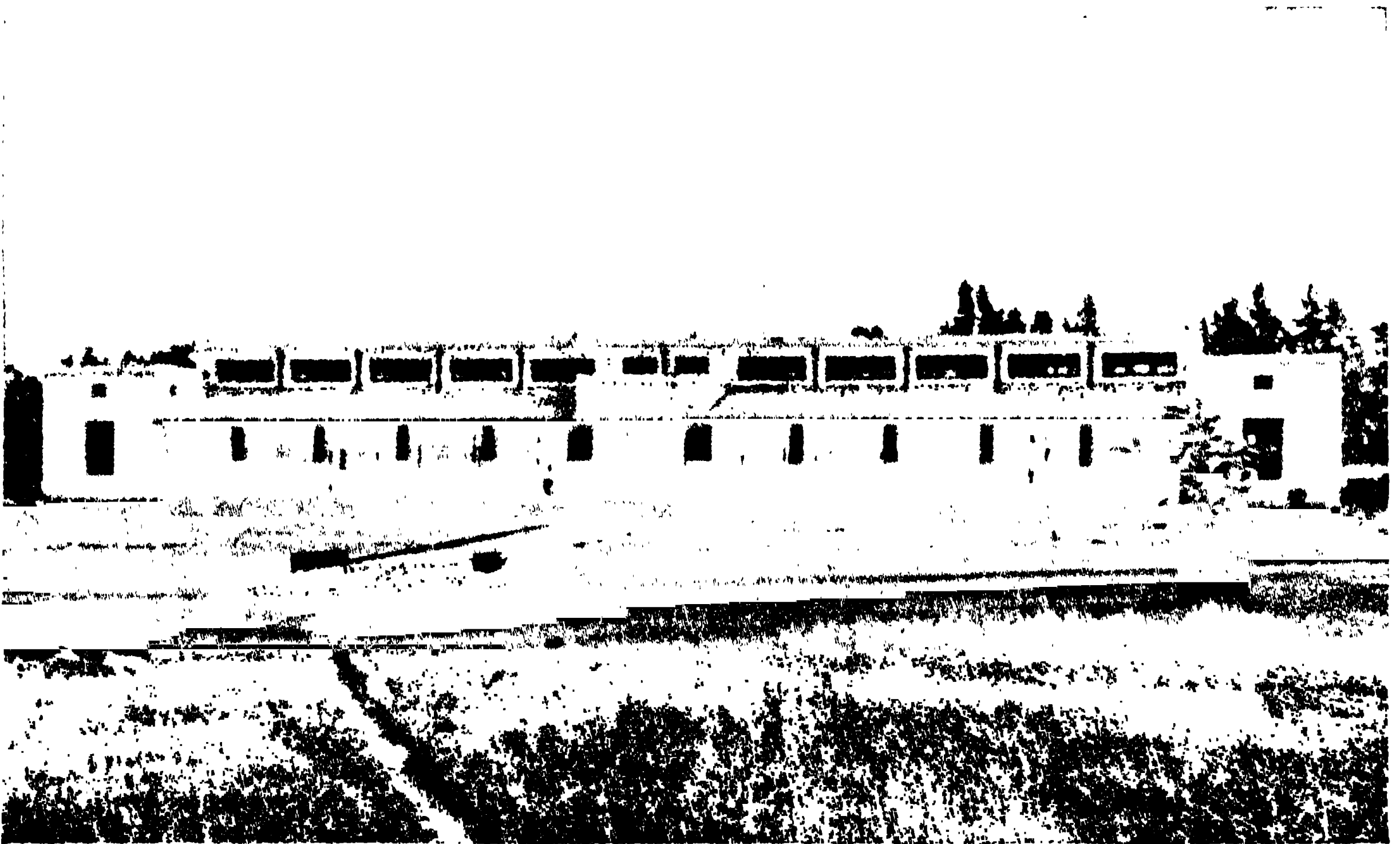
সাধারণ ওয়ার্ড

নাই। সেবাশ্রমের চারিদিকের উচ্চাবচ অরণ্যভূমির শোভা দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়। বহিরাগত দর্শকগণ এইস্থানের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করেন। জমির এক প্রান্তে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। পরবর্তী কালে আরও দশ বার একর ভূমি সংগৃহীত হওয়ায় সেবাশ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে রোগমুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য আরও ত্রিশ একর জমি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

এই সেবাশ্রম (স্যানাটোরিয়াম) স্থাপনের জন্য লক্ষ্ণৌ-নিবাসী সেবাব্রতী শ্রীভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত মহাশয় প্রথমে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন। এই প্রসঙ্গে রাঁচির অধিবাসী ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সরযূবালা রায়ের পচিশ হাজার টাকা দানও উল্লেখযোগ্য। ত্রিশ জন রোগীর উপযোগী গৃহাদি নির্মিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হওয়ার পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রোগীদের সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির অকুণ্ঠ বদান্যতায় এই কার্যের প্রসার হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা-নিবাসী জনৈক যুবক ব্যারিষ্টার-ভদ্রলোকের নাম সর্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়। তিনি তাঁহার নাম লোকসমাজে প্রচারে একান্ত অনিচ্ছুক। রামকৃষ্ণ মিশনের রিক্ত সন্ন্যাসিগণ যখন ঈশ্বরের

সাধারণ ওয়ার্ডের ভিতরকার একটি দৃশ্য

কৃপামাত্র সম্বল করিয়া বহুব্যয়সাধ্য এই সেবাকার্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই সময় তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজস্ব পৈত্রিক বহুমূল্যবান সমগ্র স্থাবর সম্পত্তি মিশনের সেবাকার্যে সমর্পণ করেন। কলিকাতাস্থ এই সম্পত্তি হইতে বার্ষিক যে লক্ষাধিক টাকা আয় হয়, তাহার অর্ধাংশ এই যক্ষ্মা-সেবাশ্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাওয়া যায়। এই সম্পত্তি প্রাপ্তির ফলে স্যানাটোরিয়ামটিকে প্রারম্ভ হইতে আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুপরিচালিত করা এবং এখানে অনেকগুলি রোগীকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমানে এখানে ৬০ জন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আরব্ধ কয়েকটি গৃহ আর এক বা দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, আরও ৩০ জন রোগীকে এখানে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে।

পূর্বে কয়েকজন দাতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল মহানুভব ব্যক্তির অকুণ্ঠ বদান্যতায় এই সেবাপ্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। (১) কলিকাতা নিবাসী ৺সন্তোষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মরণার্থ একটি ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য কুড়ি হাজারের কিঞ্চিৎ অধিক টাকা এবং ঐ ওয়ার্ডের প্রয়োজনীয় শয্যাদি দান করিয়াছেন। (২) ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসমিতির ন্যাসরক্ষকগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি শল্য-চিকিৎসাগার (Operation Theatre) নির্মাণ

ও উহার জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং আটটি কেবিন-সমন্বিত একটি ওয়ার্ড নির্মাণের জন্যও অর্থদান করিতেছেন। এই সকল উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রায় এক লক্ষ টাকা দিয়েছেন। কাপ্তেন দত্তের নির্মিত গৃহগুলি রোগার্তের সেবার সহায়ক হইয়া সুচিরকাল তাঁহার কীর্তিকাহিনী লোকসমাজে ঘোষণা করিবে। (৩) কলিকাতার স্বনামধন্য দাতা ৺মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শল্য-চিকিৎসাধীন রোগীদের আশ্রয়ের জন্য একটি ওয়ার্ড নির্মাণের উদ্দেশ্যে চল্লিশ হাজার টাকা এবং রুগ্ন সাধুদের ওয়ার্ড নির্মাণের আংশিক সহায়তাবাবদ সাড়ে ছয় হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধান চন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম স্মরণীয়। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় স্যানাটোরিয়াম-কর্তৃপক্ষ বহুমূল্য আধুনিক যন্ত্রপাতি নামমাত্র অর্থে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য স্যানাটোরিয়ামের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে পাইপের মধ্য দিয়া স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন গৃহে জল সরবরাহ করা হয়। জলের জন্য কয়েকটি গভীর কূপ খনন করা হইয়াছে। মিশনের ত্যাগী সেবকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্যানাটোরিয়ামের রন্ধনশালায় চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত বিবিধ পথ্য প্রস্তুত এবং পর্যাপ্ত

আরোগ্য নিবাসে হ্রদের দৃশ্য

পরিমাণে রোগীদিগকে প্রদান করা হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ নিজস্ব গোশালায় পাওয়া যায়—কিছু তরকারী এবং ফলও স্যানাটোরিয়ামের বাগানে উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলে জলের বিশেষ অভাব। আজ পর্যন্ত জলের জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করা হইলেও প্রয়োজনানুরূপ জলের ব্যবস্থা করা এখনও

সম্ভব হয় নাই। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রয়োজনীয় সমস্ত দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত এবং শাকসব্জী ও ফল প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামেই উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে।

এখানে আধুনিক চিকিৎসার উপযোগী সর্ববিধ উত্তম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত শল্যচিকিৎসাগারের অভাবে এতকাল পর্যন্ত কেবল এ-পি, পি-পি, থোরাকোস্কোপি, কটারাইজেশন এবং ফ্রেনিক অপারেশন সম্ভব হইত। ক্যাপ্টেন দত্ত স্মৃতিরক্ষাসমিতি এবং শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্যের অর্থানুকূল্যে সুন্দর ও সুসজ্জিত শল্যচিকিৎসাগার নির্মিত হওয়ার ফলে বর্তমান মাস হইতে থোরাকোপ্ল্যাষ্টি অপারেশন করাও সম্ভব হইবে। এখন তিনজন প্রবীণ বিশেষজ্ঞ যক্ষ্মা-চিকিৎসক সর্বক্ষণ স্যানাটোরিয়ামে থাকেন—ইঁহাদের একজন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী। এই চিকিৎসকগণের দুইজন বিলাতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং চিকিৎসাব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়
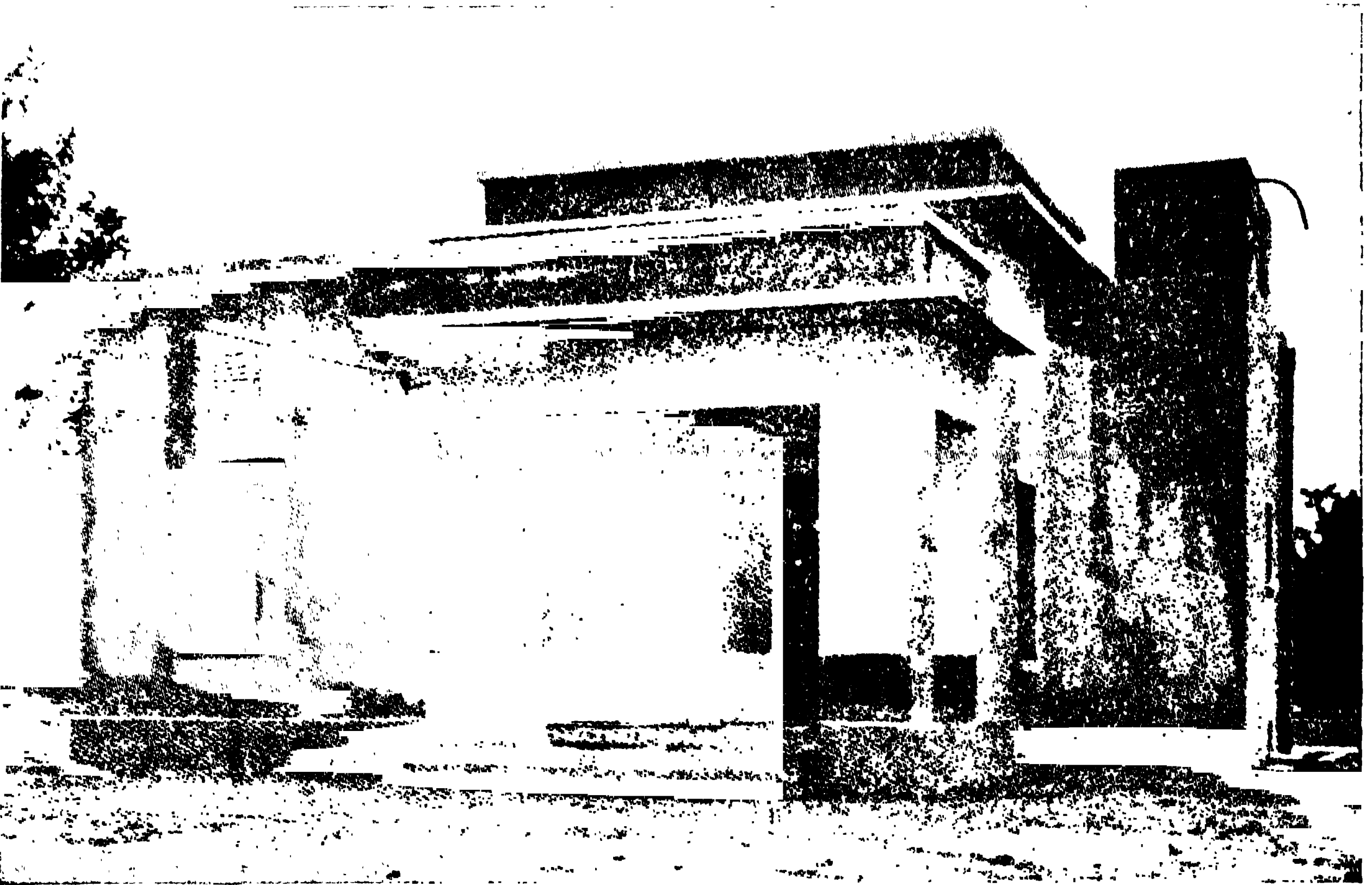
একটি 'এ'-টাইপ 'কটেজ'

করিয়াছেন। এই তিনজন ছাড়া একজন বেতনভুক্ এবং তিনজন অবৈতনিক বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাঁচি হইতে আসিয়া স্যানাটোরিয়ামের কাজে প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন।

এখানে নানাশ্রেণীর বেড্ আছে। অধিকাংশ বেড্ জেনারেল ওয়ার্ডে আর সাতটি বেড্ একটি স্পেশাল ওয়ার্ডে। ইহা ব্যতীত ৮টি কেবিন এবং কয়েকটি কটেজও আছে। বর্তমানে কমপক্ষে পঁচিশজন রোগীকে কিছু টাকা-পয়সা না লইয়া এখানে চিকিৎসা করা হয়। এই ২৫ জনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা ১০ জন রোগীর চিকিৎসার আংশিক ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করেন এবং বিহার সরকার তাঁহাদের মনোনীত পাঁচজন রোগীর চিকিৎসার জন্য বার্ষিক সাহায্য প্রদান করেন। এই ২৫ জন ব্যতীত বিভিন্ন সংস্থার মনোনীত আরও কয়েকজন রোগীর

জন্য এখানে বেড আছে। যথা—ইষ্টার্ণ রেলওয়ের কর্মচারীদের জন্য পাঁচটি বেড, পাটনা দিঘা-ঘাটের বাটা ওয়ার্কার্স টি. বি. প্রোটেকশন সোসাইটির সভ্যগণের জন্য ২টি বেড, বেঙ্গল ইনকম-ট্যাক্স এসোসিয়েশনের সভ্যগণের জন্য একটি বেড এবং বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিমিটেডের কর্মীদের জন্য ৩টি বেড।

দিনের পর দিন রোগীদের নিকট হইতে ভর্তির জন্য আবেদন আসিতেছে। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বেডের দ্বারা কয়জনের বা দাবী মিটানো সম্ভব? অধিকন্তু, বেডের সংখ্যা অচিরে বাড়াইতে না পারিলে রোগীদের জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের হার কমান যায় না এবং এই স্যানাটোরিয়ামটিকে একটি আদর্শ চিকিৎসা-গবেষণা-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনাও সার্থক হইয়া উঠে না।

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপেক্ষা ঐ রোগমুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বড় কম প্রয়োজনীয় নহে। এই রোগ হইতে মোটামুটি আরোগ্য লাভ করার পরও রোগীদের পক্ষে দীর্ঘকাল নিয়মিত জীবন যাপনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বেডের স্বল্পতাবশত প্রায় সকল হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ রোগীর যখন আর বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে না—এমন কি, যখন রোগীর থুথু কিছুকালের জন্য যক্ষ্মাজীবাণুমুক্ত দেখা যায়, তখনই রোগীকে স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া অন্য রোগীর জন্য স্থান করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু অধিকাংশ রোগীরই স্বগৃহে স্বচ্ছন্দভাবে আরামে থাকিয়া পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ও বিশ্রাম গ্রহণের সামর্থ্য নাই। ফলে, হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম হইতে ফিরিয়া অনেকেই পুনরায় রোগাক্রান্ত হন। আর এক শ্রেণীর রোগমুক্ত ব্যক্তির নানা কারণে স্বগৃহে ফিরিয়া স্বচ্ছন্দে বাসের বা জীবিকার্জনের যথেষ্ট সুযোগ সামর্থ্য থাকে না। তাঁহারা অন্তত কয়েক বৎসর হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নিরাপদে নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী জীবিকার্জন করিয়া নিরাপদে কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিদের জন্য উপনিবেশ-স্থাপনের চেষ্টা আমাদের দেশে আজও কোথাও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে নাই।

প্রাক্তন রোগীদের জন্য একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া স্যানাটোরিয়াম স্থাপনের প্রারম্ভ হইতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে সাতজন রোগমুক্ত ব্যক্তি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বিবিধ প্রকারের শিল্প, কৃষি এবং পশুপালনের বিভাগ-সমন্বিত এই উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিলে বহু হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

আজ পর্যন্ত এই কাজের জন্য ভারত সরকার এককালীন এক লক্ষ টাকা এবং বিহার সরকার এক লক্ষের কিছু অধিক টাকা দিয়াছেন। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট দান হিসাবে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ এখনও পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যক্ষ্মারোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। যে বয়সে নবযুবকগণ বিদ্যাভ্যাস ও অর্থার্জন করিয়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিবে, সেই সুকুমার বয়সে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী এই দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এই রোগের আক্রমণে কত সোনার সংসার যে ছারেখারে যাইতেছে তাহার

ইয়ত্তা নাই। এই রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসাভার বহনের সহায় সম্বল অনেকেরই নাই। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারাও হাসপাতাল হইতে হাসপাতালে আবেদন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক বেডের অভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদন পত্র গৃহীত হইয়া সেখান হইতে আহ্বান আসিবার পূর্বেই তাঁহাদের অনেকের জীবনদীপ নির্বাপিত হইতেছে; কাহারও বা রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। স্বল্পপরিসর অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করার ফলে কেবল যে রোগীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নয়, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পূর্বেও তাঁহারা অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই রোগের বিষ ছড়াইয়া যাইতেছেন। অথচ বর্তমান কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে রোগীকে নিরাময় করা বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। এই রোগের প্রতীকারের জন্য আমাদের দেশে একমাত্র প্রয়োজন রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের সমবেত ব্যাপক প্রচেষ্টা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই নূতন সেবা-প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিতে পারিয়া আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। সহৃদয় দেশবাসিগণও এই মহতী প্রচেষ্টার সহিত নিজদিগকে আন্তরিকভাবে যুক্ত করিয়া অসংখ্য যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের ধন্যবাদ ভাজন হউন।

কবি ইকবাল

অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

কবি আর ডিপ্লোম্যাট এক বস্তু নহে। কবি যদি কবিত্ব ছাড়িয়া ডিপ্লোম্যাসিতে যোগদান করেন তবে তাহাতে শুধু কাব্যেরই ক্ষতি হয় না, ডিপ্লোম্যাসিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কবির রাজনীতি সাময়িক ব্যাপার। রাজনীতির জন্য কবি অমরতা লাভ করেন না। কবির অমরতা কাব্যে। ক্রমওয়েলের অধীনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের লাটিন সেক্রেটারী মিল্টনের যদি কোন কাব্যগুণ না থাকিত তবে সমসাময়িক আরও অনেক খ্যাত-নামা অখ্যাতনামা লোকের মতই তাঁহার নাম মানুষের অন্তর হইতে বেমালুম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। কিন্তু মিল্টন ছিলেন মহাকবি। তাঁহার রাজনীতি বুদ্বুদের মতই অস্থায়ী। তাই আজ তাঁহার রাজনীতি চলেনা। চলে তাঁহার কবিতা।

কবি ইকবাল বহু রাজনীতি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যাপার। রাজনীতি তাঁহাকে উচ্চাসন দেয় নাই। কাব্য-গুণেই তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত। কাব্যই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। দার্শনিক ও কবি ইকবাল কিছুদিন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব রাজনীতিতে নহে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কবিতায় ও দর্শনে। নানা বিষয়েই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম, নীতি, আত্মা, স্বদেশপ্রেম, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অজস্র কবিতা আছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বেই তাঁহার স্থান। তিনি ইংরেজি ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শন সম্বন্ধে তিনি ইংরেজি

ভাষায় যে সব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। সাধারণতঃ উর্দ্দু ও ফারসী ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করিতেন। উর্দ্দু ভাষার কবিতাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইরাণে তাঁহার ফারসী কবিতাগুলি সমুচিত মর্য্যাদালাভ করে নাই। হাফেজ, রুমী, ওমরখাইয়ামের দেশে বিদেশী কবির কাব্য সে মর্য্যাদা পাইতে পারেনা। উর্দ্দু কবিতাই তাঁহাকে অমরতা দান করিবে। আজ এই প্রবন্ধে ইকবালের কবিতার একটা দিক লইয়া আলোচনা করিব।

কবি ইকবালের কবিতা পাঠ করিলে একটা বিষয় খুব বড় হইয়া দেখা দেয়। সেটা হইতেছে যে তাঁহার কবিতা জোরাল ভাষায় মানুষের মর্য্যাদাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইকবাল রবীন্দ্রনাথের মত আশাবাদী কবি। মানুষের মর্য্যাদা ও মহিমায় তিনি চরম বিশ্বাসী। তাঁহার নানা মতবাদের মধ্যে মানুষের মর্য্যাদাটাই তাঁহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কাব্য রচনা করিয়া তিনি চরম সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মানুষ সম্বন্ধে এই মর্য্যাদাবোধই তাঁহাকে সফলতা দান করিয়াছে। শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তিনি কিছুটা সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই চরম সঙ্কটের যুগেও তিনি সকলশ্রেণীর মানুষের মর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হন নাই। মানুষ বলিতে তিনি কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা ভাবেন নাই। সমস্ত মানব সমাজকে তিনি একই ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতেন। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ও মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি একটা নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্পর্ককে একটা নূতন মূল্যবোধ দিয়াছেন। মানুষকে তাহার মহৎ মর্য্যাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সমগ্র মানব সম্প্রদায় এক সমাজভুক্ত। মানব সমাজের মধ্যে একটি সার্ব্বজনীন সহানুভূতির ভাব সর্ব্বদাই সক্রিয় হইয়া আছে। কবি ইকবাল সত্যই সর্ব্বজাতিক মানুষকে ভালবাসিতেন। মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এই মানব-প্রেমের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইকবালের কবিতার শিল্পগুণ অসাধারণ। অপূর্ব্ব শব্দযোজনা, ছন্দের দীপ্তি, ভাষার যাদু তাঁহার কবিতাকে অত্যন্ত সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। আর্টের দিক দিয়া তিনি বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ যে তিনি উদ্দেশ্যমূলক কবিতা লিখিয়াছেন। এই অভিযোগ যে কতকটা সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের খুব কম কবিই "প্রচারক" হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন। এ যুগের যে কোন কবির কাব্য পড়িলেই দেখা যাইবে যে উহার অনেকগুলি উদ্দেশ্যমূলক। নিছক "আর্টের জন্য লেখা" এই নীতি আজকাল অনেকেই মানিয়া চলেন না। ইকবালের মধ্যেও এই "উদ্দেশ্য"-প্রবণতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহার কবিতার প্রধান কথা হইতেছে মানুষের মর্য্যাদা। মানবজাতিকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিতেছেন :

> Thou art neither for Earth nor for
> Heaven.
> The Universe is for thee, thou art
> not for the Universe.

হে মানুষ! তুমি পৃথিবীর জন্য নহ, অথবা স্বর্গের জন্যও নহ, সমগ্র বিশ্বই তোমার জন্য—তুমি বিশ্বের জন্য নহ।

ইকবালের বহু কবিতায় এইভাবে মানুষকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

"বিধাতার নিকট দেবদূতগণ ইকবালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, ইকবাল অশিষ্টাচারী ও

বেআদব, কারণ, যদিও। তিনি মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, তবুও তাঁহার এরূপ ঔদ্ধত্য যে, তিনি তাঁহার সামান্য ক্ষমতার সাহায্যে প্রকৃতিকে সুশোভিত করিতে চান। তিনি আনাটোলিয়ান নহেন, তিনি সিরিয়ান নহেন। তিনি কাশীর নহেন, অথবা সামারকান্দের নহেন। তিনি দেবদূতগণকে মানুষের চাঞ্চল্য শিক্ষা দিয়াছেন, এবং মানুষকে দেবত্বে দীক্ষা দিয়াছেন।" ইকবালের মতে দেবদূতগণকেও মানুষের নিকট শিক্ষা লইতে হইবে। তাঁহার মতে মানুষের যদি ইচ্ছাশক্তি ও সাধনা থাকে তবে সেও দেবত্ব পাইবার অধিকারী। মানুষ তাঁহার দৃষ্টিতে বিরাট শক্তিসম্পন্ন আত্মা। তিনি আর একটি কবিতায় বলিয়াছেন :

"মানুষ তাহার কর্তৃত্বে সমগ্র বিশ্বকে আনিতে পারে—তবুও সমগ্র বিশ্ব মানুষের জন্য বিরাট স্থান নহে। বিরাটত্বে মানুষ আকাশ অপেক্ষাও বড় —নিশ্চয় জেনো যে, মানুষকে শ্রদ্ধা করার মধ্যে নিহিত আছে প্রকৃত কাল্‌চার।"

বিশ্বের চতুর্দ্দিকে যখন যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল, তখন প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দিল আদর্শের সংঘাত। এই সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ কেবলমাত্র জাতীয়তার গৌরব গাহিতেই ব্যস্ত। বিশ্বমানবতার কথা চিন্তা করিতে সকলেই কুণ্ঠিত। মানবসভ্যতার এই সঙ্কটকালে যে সব সাধক ও মানবপ্রেমিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জাতি অপেক্ষা সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলের কথা ভাবিয়াছেন, তাঁহারা সকল দেশের নমস্য। একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন রমা রঁলা একজন রাসেল,—ভাবিয়াছেন মানবসমাজের মুক্তির কথা। আমরা নিশ্চয় সেই সব কবি শিল্পীর নিকট কৃতজ্ঞ, যাঁহারা ভৌগোলিক সীমা, জাতিগত সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের উদার সভাতলে সকল মানুষকে আহ্বান করিয়াছেন। এই সব মানবপ্রেমিকগণ কখনও ভুলেন নাই যে, এই বিরাট মানবসভ্যতা হইতেছে সকল দেশের সকল জাতির যুক্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। ইহা কাহারও একার নহে। ইহাতে সকলের সমান অধিকার ও সমান দান আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।

কবি ইকবালও একদিক দিয়া বিশ্বপ্রেমিক। তাঁহার কবিতা পড়িলে তাঁহার রাজনীতির কথা ভুলিয়া যাই। তিনি বলিতেছেন :

"আমরা আফগানী নহি, তুর্কি নহি, তাতারী নহি, আমরা একই উদ্যানে জন্মিয়াছি—আমরা একটি শাখার ফুল। বর্ণ ও গন্ধের পার্থক্যবোধ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ—আমরা একই বসন্তে ফুটিয়াছি—একটি বৃন্তেরই ফুল।"

(ক্রমশঃ)

ঠাকুরের কতিপয় পার্ষদের জন্মতারিখ ও জন্মতিথি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে কয়জন ত্যাগী সন্তানের জন্মতারিখ ও সময় পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী যোগানন্দ, এই দুইজন মহাপুরুষের সৌর জন্মমাসকে চান্দ্র মাস ধরিয়া তাঁহাদের জন্মতারিখ স্থির করা হইয়াছে এবং

জন্মতিথি প্রতিপালিত হইতেছে। ইহা সঙ্গত নহে। স্বামী প্রেমানন্দের জন্মতিথি প্রাচীন মতাবলম্বী এবং বিলাতী পঞ্জিকা (এফেমেরিস্) মতে বিভিন্ন। এইরূপ স্থলে বিলাতী পঞ্জিকার মত গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। স্বামী সুবোধানন্দের প্রচলিত জন্মতিথি ভ্রমাত্মক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত জন্মতারিখ এবং সময় সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদের কোন কারণ নাই।

এই বিষয়গুলি বুঝিতে হইলে সৌর ও চান্দ্র মাস এবং তিথি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। রবির একরাশি ভোগ-কালকে এক সৌর মাস বলে; ইহার দিন-সংখ্যাকে তারিখ বলা হয়। বাংলা দেশে সৌর মাস প্রচলিত এবং জন্মমাস বলিতে সৌর মাসই বুঝায়। শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই ত্রিশটি তিথিতে এক চান্দ্র মাস হয়। চান্দ্র মাস হিসাবে জন্ম-তিথি প্রতিপালিত হয়। তিথির সংখ্যা—শুক্লা প্রতিপদ ১, শুক্লা দ্বিতীয়া ২, পূর্ণিমা ১৫, কৃষ্ণা প্রতিপদ ১৬, এইরূপ গণনায় অমাবস্যা ৩০ সংখ্যক হয়। সৌর মাসের কোন্ তারিখে কোন্ চান্দ্র মাস যাইতেছে তাহা জানিবার সহজ উপায় এই—সৌর মাসের তারিখ অর্থাৎ দিনসংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা অধিক হইলে সেই তারিখে চান্দ্র তৎপূর্ব্ব মাস হইবে, এবং সৌর মাসের দিনসংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা কম হইলে চান্দ্র সেই মাসই হইবে। যথা, ১০ই বৈশাখ শুক্লা দ্বাদশী (১২ সংখ্যক) তিথি হইলে চান্দ্র তৎপূর্ব্ব মাস অর্থাৎ চান্দ্র চৈত্র মাস; কিন্তু উক্ত তারিখে শুক্লা পঞ্চমী (৫ সংখ্যক) তিথি হইলে চান্দ্র সেই মাস অর্থাৎ চান্দ্র বৈশাখ মাস বুঝিতে হইবে। সৌর মাসের দিনসংখ্যা ও তিথির সংখ্যা সমান হইলে মলমাস হইবে। রাশিচক্রে রবি এবং চন্দ্রের অবস্থিতি হইতে তিথি গণনা করা হয়। রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ বা ডিগ্রি থাকে, এবং তিথির সংখ্যা ৩০; সুতরাং প্রতি ১২ অংশে এক একটি তিথি হয়। যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের চন্দ্রস্ফুট-রাশ্যাদি হইতে রবিস্ফুট-রাশ্যাদি বাদ দিলে যে রাশ্যংশাদি হইবে, তাহাকে অংশে (৩০° অংশে এক রাশি) পরিণত করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল হইবে সেই সময়ের গত তিথির সংখ্যা, এবং ভাগশেষ পরবর্ত্তী তিথির ভোগ নির্দ্দেশ করিবে। ইহার উদাহরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের দুইটি জন্ম-তারিখ ও সময় প্রচলিত আছে—

(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় প্রণীত "বিবেকানন্দ চরিত" গ্রন্থ-মতে ২৮শে পৌষ, ১২৬৯ সাল, রবিবার, রাত্রিশেষে ৬টা ৩৩ মিঃ ৩৩ সেঃ, ধনু লগ্ন।

(২) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা" গ্রন্থ-মতে ২৯শে পৌষ, ১২৬৯ সাল, সোমবার, সূর্য্যোদয়ের এক মিনিট পরে ৬টা ৪৯ মিঃ, মকর লগ্ন।

সূর্য্যোদয় হইতে বার ও তারিখ আরম্ভ হয়। জন্মসময় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে বলিয়া জন্মতারিখের প্রভেদ হইয়াছে। দ্বিতীয়টি সংশোধিত জন্মতারিখ ও সময়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের একখানি পত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" নামক পুস্তকের শেষভাগে দেওয়া আছে। ইহাতে স্বামিজীর প্রকৃত জন্মতারিখ ও সময়ের স্পষ্ট উল্লেখ নাই; কেবলমাত্র বলা হইয়াছে যে,

ঐ-মতে তাঁহার জন্ম সূর্য্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ও ধনু লগ্নে, এবং ইহা তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর অনুমোদিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের সহিত কোষ্ঠীর ঐক্য-সম্পাদন জন্য জন্মসময়ে ৬ মিনিট যোগ করিয়া সূর্য্যোদয়ের (অর্থাৎ ৬টা ৪৮ মিনিটের) এক মিনিট পরে সংশোধিত জন্মসময় ৬টা ৪৯ মিঃ ও মকর লগ্ন ধরা হইয়াছে। জন্মসময় সূর্য্যোদয়ের পরে ধরায় জন্মতারিখ ২৯শে পৌষ হইয়াছে। পুরাতন পঞ্জিকা এবং আধুনিক বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত ও গুপ্তপ্রেশ এই তিনটি পঞ্জিকা-মতে ২৯শে পৌষ সূর্য্যোদয় যথাক্রমে ৬টা ৩৯ মিঃ ৩৩ সেঃ; ৬টা ৪৪ মিঃ, এবং ৬টা ৪৮ মিঃ। সুতরাং স্বামিজীর তিন প্রকার জন্মসময় (৬টা ৩৪ মিঃ ৩৩ সেঃ, ৬টা ৩৯ মিঃ এবং ৬টা ৪৩ মিঃ) হইতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে "বিবেকানন্দ চরিত" গ্রন্থে পুরাতন পঞ্জিকার সূর্য্যোদয় হইতে ৫ মিনিট স্থলে ৬ মিনিট বাদ দিয়া জন্মসময় ধরা হইয়াছে, এবং রাজেন্দ্র বাবু জন্মসময় সংশোধন করিতে আধুনিক গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার সূর্য্যোদয় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামিজীর জন্মসালে এবং তাহার পরেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্তপ্রেশ কিম্বা অধুনা প্রচলিত কোন পঞ্জিকার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এই সকল আধুনিক পঞ্জিকার সূর্য্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে স্বামিজীর জন্মসময় হইতে পারে না। তাঁহার জন্মকালে প্রচলিত পুরাতন পঞ্জিকার সূর্য্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে, অর্থাৎ ২৮শে পৌষ, রবিবার, রাত্রিশেষে ৬টা ৩৫ মিঃ (৬টা ৩৪ মিঃ ৩৩ সেঃ) সময়ে ধনু লগ্নে যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর অনুমোদিত ও মূল কোষ্ঠীতে ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ইহা ভিন্ন অন্য তারিখ ও সময় ব্যক্তিগত মতামত মাত্র, এবং ফলবিচারে তাহা গ্রহণ করিতে বহু বাধা আছে। রাত্রিশেষে ৬টা ৩৬ মিঃ সময়ে ধনু লগ্নের বর্গোত্তম নবাংশ পড়ে; এইজন্য জন্মসময় ৬টা ৩৬ মিঃ ধরা যাইতেও পারে।

স্বামী শিবানন্দ

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের প্রচলিত জন্মতিথি চান্দ্র অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী। "মহাপুরুষ শিবানন্দ" নামক পুস্তকের ২৯৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখা যায় যে, হস্তরেখা হইতে নির্দ্ধারিত তাঁহার জন্মতারিখ ২০শে পৌষ, ১২৬২ সাল, বৃহস্পতিবার। মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্ম অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এবং বেলা দুপুরের মধ্যে। ইহা অবশ্যই সৌর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। বাংলা দেশে জন্মমাস বলিতে সৌরমাস বুঝায়। চান্দ্র অগ্রহায়ণ হিসাবে হস্তরেখা হইতে নির্দ্ধারিত জন্মতারিখ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। "শিবানন্দ বাণী" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ২৫।২৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ১৩৩০ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার "দেহের বয়স" বোধ হয় "৭০।৭২ বৎসর হবে"। তাঁহার উক্তি এবং জীবনের ঘটনা হইতে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল, বৃহস্পতিবার, বেলা প্রায় ১১টা ১০ মিঃ (ইং ১৬ই নভেম্বর ১৮৫৪ খৃঃ)। জন্মসময়ে সায়ন চন্দ্রস্ফুট ৬।০।৫৪ এবং রবিস্ফুট ৭।২৩।৩৪ এবং চন্দ্র হইতে রবিস্ফুট বিয়োগ করিয়া ৩০৭ অংশ ২০ কলা পাওয়া যায়। ইহাকে ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল হয় ২৫ এবং ৭ অংশ ২০ কলা অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং জন্মসময়ে ২৫ তিথি গত হইয়া ২৬ অর্থাৎ কৃষ্ণা একাদশী তিথি চলিতেছিল। সৌর অগ্রহায়ণ মাসের দিন সংখ্যা ২

অপেক্ষা তিথির সংখ্যা ২৬ অধিক হওয়ায় চান্দ্র তৎপূর্ব্ব অর্থাৎ চান্দ্র কার্ত্তিক মাসে জন্ম হইয়াছে। তাঁহার জন্মতিথি হইবে চান্দ্র কার্ত্তিক কৃষ্ণা একাদশী।

স্বামী যোগানন্দ

"শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা" গ্রন্থে স্বামী যোগানন্দ মহারাজের জন্মতারিখ ১৮ই চৈত্র ১২৬৭ সাল, ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্থী দেওয়া আছে। চান্দ্র ফাল্গুন হিসাবে এই জন্মতারিখ স্থির করা হইয়াছে। বাংলা দেশে জন্মমাস বলিতে সৌরমাস বুঝায়। সৌর ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী হিসাবে তাঁহার জন্ম-তারিখ ১৭ই কিম্বা ১৮ই ফাল্গুন হইবে।' বর্ত্তমানে চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে তাঁহার জন্মতিথি প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু সৌর ফাল্গুন মাসের দিনসংখ্যা ১৭ই কিম্বা ১৮ই অপেক্ষা কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির সংখ্যা ১৯ অধিক হওয়ায় তাঁহার জন্মতিথি চান্দ্র মাঘ কৃষ্ণা চতুর্থী হইবে। ফল বিচারে ১৮ই ফাল্গুন তাঁহার জন্মতারিখ হয়, এবং তাঁহার যে জন্মসময় ও এফেমেরিস্-মতে তৎকালীন যে রবি ও চন্দ্রস্ফুট পাওয়া যায়, তদনুসারেও তাঁহার জন্মতিথি চান্দ্র মাঘ কৃষ্ণা চতুর্থী হয়।

স্বামী প্রেমানন্দ

তাঁহার জন্ম শকাব্দাদি ১৭৮৩।৭।২৫।৪৩।৫।০, মঙ্গলবার, অর্থাৎ জন্ম ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৮ সাল (ইং ১০ই ডিসেম্বর ১৮৬১ খৃঃ) ৪৩ দণ্ড ৫ পল। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের এই জন্মতারিখ ও সময় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু শান্তিরাম ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই দিন পুরাতন পঞ্জিকা মতে সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪০।৪৮ সময়ে হইয়াছিল এবং শুক্লা নবমী তিথি ৫০ দণ্ড ২ পল পর্য্যন্ত ছিল। ঘড়ির সময় অনুসারে জন্মসময় রাত্রি ১১টা ৫৫মিঃ এবং নবমী তিথির স্থিতিকাল রাত্রি ২টা ৪২ মিঃ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং পুরাতন পঞ্জিকা মতে শুক্লা নবমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহাই তাঁহার প্রচলিত জন্মতিথি।

জন্মসময়ে এফেমেরিস্-অনুসারে সায়ন চন্দ্রস্ফুট ০।৬।৫২ এবং রবিস্ফুট ৮।১৮।৪৫; চন্দ্র হইতে রবিস্ফুটের বিয়োগফল ১০৮ অংশ ৭ কলা। ইহাকে ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল ৯ হয় এবং ৭ কলা অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং জন্মসময়ে নবমী তিথি গত হইয়া দশমী তিথি চলিতেছিল। এফে-মেরিস্-অনুসারে তিনি শুক্লা দশমী তিথিতে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। তারিখের সংখ্যা ২৬ অপেক্ষা তিথির সংখ্যা ১০ কম হওয়ায় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি চান্দ্র অগ্রহায়ণ শুক্লা দশমী হইবে।

উপরি লিখিত রবি ও চন্দ্রস্ফুট হইতে দেখা যায় যে, নবমী তিথি রাত্রি প্রায় ১১টা ৪১ মিঃ পর্য্যন্ত ছিল, এবং পুরাতন পঞ্জিকার সহিত ইহার প্রায় তিন ঘণ্টা প্রভেদ। এফেমেরিসের তিথির সহিত বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার তিথির মিল হয়, এবং ইহার সহিত প্রাচীন মতাবলম্বী-পঞ্জিকার তিথি-স্থিতিকালের প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রভেদ এখনও দেখা যায়।

স্বামী সুবোধানন্দ

তাঁহার জন্ম ২৩শে কার্ত্তিক, ১২৭৪ সাল, শুক্রবার, ইং ৮ই নভেম্বর, ১৮৬৭ খৃঃ, রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিট। স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের এই জন্মতারিখ ও সময় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তরাম ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাঁহার প্রচলিত জন্মতিথি চান্দ্র কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী। পুরাতন পঞ্জিকা মতে এই তারিখে শুক্লা একাদশী তিথি দিবা ৮ দণ্ড ৩৬ পল অর্থাৎ বেলা প্রায় ৯টা ৫৪ মিঃ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং তাঁহার জন্মসময়ে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হয়। জন্মসময়ে এফেমেরিস্-অনুসারে সায়ন চন্দ্রস্ফুট ০।২।৪০ এবং রবিস্ফুট ৭।১৭।৫০; ইহা হইতেও গণনায় জন্ম-সময়ে শুক্লা দ্বাদশী তিথি পাওয়া যায়। দেশী ও বিলাতী উভয় পঞ্জিকা-মতে তাঁহার জন্মতিথি চান্দ্র কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী হইবে।

আশা করি স্বামিজীর প্রকৃত জন্মতারিখ ও সময় এবং উপরোক্ত মহাপুরুষগণের জন্মতারিখ ও জন্ম-তিথি সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

হের ঐ কাঙ্গালিনী মেয়ে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্

পূজা ও শারদীয় উৎসব আগতপ্রায়। কানে ভাসে, কবিগুরুর কথা—

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে—"

কিন্তু বিরস বদনে কাঙ্গালিনী মেয়ে দাঁড়াইয়া। এ উৎসবে কেহ তো তাহাকে আপনার মনে করিয়া আদর করে না। মাতৃহারা যদি মা না পায়, কবি ক্ষোভে বলিতেছেন, তবে আজ কিসের উৎসব, কেন এই মঙ্গল কলস, সহকার পল্লব! উৎসবের দিনে চিত্ত উদার ও প্রশস্ত হওয়ার কথা, শুধু কাঙ্গালী-ভোজন নয়, দরিদ্রদের এক দিন—কি তিন দিনই হউক—এক মুঠা আহার দেওয়া নয়, তাহাদের সঙ্গে একাত্মবোধই উৎসবের দিনে প্রয়োজন। শারদীয় উৎসবে বাঙ্গালীর মন আনন্দে বিভোর; 'মা এসেছেন', 'বৎসরের এই কয়টা দিন'—'সার্বজনীন' হইলেও লোকের অনুভূতির মধ্যে ফাঁকি নাই, কপটতা নাই। কিন্তু এই অনুভূতি কেন সুপরিচালিত হইয়া আমাদের আরও কল্যাণের পথে অগ্রসর করে না? অর্থের কথাই বলিতেছি—অর্থ আমাদের কলিকাতা শহরেই কম ব্যয় হয় না। কিন্তু সেই অর্থ কি একটু হিসাব করিলে জাতীয় কল্যাণের পথে কিছু ব্যয় করা যায় না? সমবায়ে, লোকের সঙ্গে অন্যান্য পল্লীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া কাজ করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় অর্থাৎ সার্বজনীন উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—উৎসবের আনন্দ আরও জমাট হইবে।

আনন্দ বিলাইতে হইবে; কিন্তু ঐ যে বাস্তু-হারা ভূমিহীন কৃষক রাষ্ট্রে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে, কি করিয়া উহার মনের আনন্দের বাস্তব ভিত্তি দেওয়া যায়, বলিতে পারেন? মানুষের যে তিনটি পরম প্রয়োজন—দুমুঠো ভাত, পরিবার কাপড়, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই—কে তাহাকে দিবে, কি করিয়া সে অর্জন করিবে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও, প্রাণপাত করিয়াও যে এই তিনটি সে জোগাড় করিতে পারে না! সন্ত বিনোবা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিতেছেন, মুখে তাঁহার ঐ ধ্বনি—সমস্ত ভূমি গোপালের। এ যেন ঈশোপনিষদেরই অনুরণন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

সমস্ত জগৎ তো আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ত্যাগ করিয়া ভোগ কর, অন্যের ধনে লোভ করিও না। কোন্‌টি অন্যের ধন? উত্তর তো আছেই—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" "সর্বভূমি গোপালকা হৈ।" মনে পড়ে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক লুঠতরাজ হত্যাকাণ্ড-অনুষ্ঠানের বহুপূর্বে গান্ধীজী ঐ কথাই জানিতে চাহিয়াছিলেন—জমি কি ভাবে কাহার, কোন্ সম্প্রদায়ের অধিকারে আছে। তাঁহার কথাই মনে পড়ে, যখন দেখি গ্রামে গ্রামে পথে পথে সন্ত বিনোবা ভূমি চাহিয়া ফিরিতেছেন। কৃষক, অথচ কৃষির জমি নাই; এর চেয়ে দারুণ পরিহাস আর কি হইতে পারে? দরিদ্র, তুমি অন্তত দরিদ্রের জন্য দান কর। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আছে, তাহা কি কেহ মিটাইতে পারিবে না? পাশ্চাত্ত্যে চেষ্টা চলিতেছে, সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে, বিশেষ করিয়া ধার্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া; কিন্তু তাহাতে কি সেই সমানুভূতি আসে, যাহা পরিণামে

আমাদের কাম্য? শুনিতে পাই, একদিকে যেমন ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনই তাহা এড়াইবার চেষ্টা তাল রাখিয়া চলিতেছে। জোর করিয়া ধর্ম হয় না, দান হয় না, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' প্রাণে অনুভব করা চাই। সন্ত বিনোবা মানুষের কাছে সপ্রেমে চাহিতেছেন ভূমি-দান। কে দিবে? দেওয়ার ক্ষমতা এই নিঃস্ব জাতির আছে কি?

দেখা যাইতেছে, তাহাও আছে, এবং প্রচুর আছে। তেলিঙ্গানায় দেখা গিয়াছে, এখন বিহারেও দেখা যাইতেছে। তেলিঙ্গানায় যাহারা মানুষের সমতা আনিতে চাহিয়াছিল জোরজবরদস্তিতে বেদখল করিয়া, লুটপাট মারধর করিয়া, তাহাদের কর্মের পরিমাণ ও অল্প সময়ের মধ্যে সেই একই ক্ষেত্রে বিনোবাজী যে সাড়া পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ তুলনা করিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। যে বিহারে জমিদারী-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীর ধর্মবুদ্ধি বিলোপ হইয়া যাইতেছিল, সেখানে আজ বিনোবাজী সুন্দরভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন! তাঁহার গতিবেগ সামান্য নয়। আর আজ তিনি ভূমিদানেই নিজেকে সীমিত করেন নাই। যাহার বিত্ত আছে, তাহাকেও যে তাহা ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ইতিপূর্বে আর্থিক সমতা আনিবার জন্য শ্রীকুমারাপ্পা প্রভৃতি যে আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তাহার গুরুত্ব এই ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আয়ের ষষ্ঠ ভাগ দান কর—ব্যক্তি বিশেষকে নয়, জাতীয় কল্যাণের জন্য দান কর—এই আহ্বানের দ্বারা আমাদের চিত্ত উদ্বোধনের চেষ্টা চলিতেছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মন্ত্রে ভাবিত আমেরিকান মহিলা-কবি এলা হুইলার উইলকক্সের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। শ্রীমতী উইলকক্সের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এককালে আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত ছিল। তাহার একটি Poems of Power এর অন্তর্নিবিষ্ট The Voices of the People নামে কবিতা। ১৯১৪ সালের যে প্রতিলিপিটি আমার কাছে আছে, তাহা উনবিংশ সংস্করণের। তাহারি ভূমিকাতেও আছে ঐ ঈশোপনিষদের কথা—The Divine Power in every human being, ঘটে ঘটে নারায়ণের কথা। কি আশ্চর্যভাবে তিনি বিশেষ করিয়া এই ভূদানের কথাই বলিয়াছেন, আমাদের কথারই অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছেন,—জগৎকে যদি সংকট হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে স্বেচ্ছায় ভূমি দান কর—

1

Oh! I hear the people calling through
the day time and the night time,
They are calling, they are crying for
the coming of the right time.
It behoves you, men and women,
it behoves you to be heeding,
For there lurks a note of menace
underneath their plaintive pleading.

2

Let the land-usurpers listen, let the
greedy-hearted ponder,
On the meaning of the murmur, rising
here and swelling younder!
Swelling louder, waxing stronger, like
a storm-fed stream that courses
Through the valleys, down abysses,
growing, gaining with new forces.

3

Day by day the river widens,
that great river of opinion,
And its torrent beats and plunges
at the base of greed's dominion.

Though you dam it by oppression
and fling golden bridges o'er it,
Yet the day and hour advances
when in fright you'll flee before it.

4

Yes, I hear the people calling,
through the night time and the day time,
Wretched toilers in life's autumn,
weary young ones in life's May time—
They are crying, they are calling
for their share of work and pleasure ;
You are heaping high your coffers
while you give them scanty measure,
You have stolen God's wide acres,
just to glut your swollen purses—
Oh ! restore them to His children
ere their pleading turns to curses.

কবি উইলকক্সের এই কবিতা সময়োপযোগী হইবে বলিয়া ইহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি যেন বর্তমান ভূদান-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভগবানের সন্তানদিগকে বঞ্চনা করিয়া আমরা যে জমি ভোগ করিতেছি, আমাদের পরস্বাপহরণের সেই ফল পুনর্বণ্টন করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, জগতেও এই অস্বাভাবিক বৈষম্য দূর হইয়া স্থায়ী ভিত্তিতে শান্তিসৌধ নির্মিত হইবে না। তার জন্য ঐ মন্ত্রেরই অনুধ্যান চাই—ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নূতন দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—এই শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দিল্লীতে মিশনের কর্মধারা প্রধানতঃ তিন প্রকার :—(১) ধর্মপ্রচার (২) লোক-শিক্ষা (৩) পীড়িত-সেবা

প্রতি রবিবারে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতা বিষয়ক একটি ক্লাশে শহরের সর্বস্তরের শত শত শিক্ষিত নরনারী সাগ্রহে আসিয়া থাকেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীও থাকে। পুরাতন দিল্লীতেও প্রতি শনিবার অপরাহ্নে ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্যও প্রতি রবিবার একটি ক্লাশ বসে; আলোচ্য বর্ষে ১২০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, খ্রীষ্ট-জয়ন্তী, বুদ্ধ-পূর্ণিমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭তম তিথি ও স্বামী বিবেকানন্দের ৯০তম জন্মবার্ষিকী মহা সমারোহে উদ্যাপিত হইয়াছিল। শেষোক্ত উৎসবে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদের ভিতর 'বিশ্বসৌভ্রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ'-সম্বন্ধে রচনা আবৃত্তি এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসবে অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য বিষয় ছিল—শিশুদিবস এবং মহিলাদিবস। শিশুদিবসে দশ বৎসর বয়সেরও কম বয়স্ক বালক-গণ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কয়েকটি ঘটনার অভিনয় প্রদর্শন অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। এই শিশুদিবস ও মহিলাদিবস স্থানীয় সারদা মহিলা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এবং উদ্যাপিত হয়। আলোচনা-সভার পরিচালনা করেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

আশ্রমের পাঠাগারে বর্তমানে ৪৭৯৪টি পুস্তক আছে। সর্বসাধারণের পড়িবার জন্য ১১টি সংবাদপত্র এবং ৭১টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। এখানে প্রচুর পাঠক আসিয়া থাকেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে এ বৎসরে ৫৪,৫৫৪ জনের চিকিৎসা করা হয়; তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১২৬৪১। সাধারণত হোমিওপ্যাথি মতেই ঔষধ দেওয়া হয়। মিশন পরিচালিত 'টিউবার-কিউলোসিস্ ক্লিনিক'টি বহুপ্রকার আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম-সমন্বিত। আলোচ্য বৎসরে ৬১,৪৭২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে—তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪২৯।

দুর্ভিক্ষে এবং বন্যায় সেবাকার্য—মহারাষ্ট্রে (আহমদনগর জেলায়) সমারব্ধ দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য সেপ্টেম্বরের প্রথমে সমাপ্ত হইয়াছে। ২০শে জুলাই হইতে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত ৫৯,৫৯৭ জন নরনারীকে ৪টি কেন্দ্র হইতে রন্ধিত খাদ্য বিতরণ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বিতরিত কাঁচা খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ২৯৪ মন।

দ্বারভাঙ্গা জেলায় বন্যাপীড়িত অঞ্চলে মিশনের পাটনা কেন্দ্র সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব গোদাবরী জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাতেও মিশন দুর্গত অধিবাসিদিগের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের কাজ করিতেছেন।

প্রভিডেন্স্ বেদান্তকেন্দ্রে অনুষ্ঠান—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভিডেন্স্ শহরস্থিত বেদান্ত-কেন্দ্রের পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূরণ উপলক্ষে গত ২০শে সেপ্টেম্বর উক্ত আশ্রমে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ও য়াহুদী ধর্মের কয়েকজন ধর্মনেতা এবং সিয়েট্‌ল্ (ওয়াশিংটন), সেন্ট্ লুই ও নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষত্রয় (যথাক্রমে: স্বামী বিবিদিষানন্দজী, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী ও স্বামী পবিত্রানন্দজী) বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক মেথডিষ্ট চার্চের রেভারেণ্ড অ্যালেন ই ক্ল্যাক্‌টন, ডি-ডি বলেন যে, ব্রাউন, বোষ্টন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভিডেন্স্ কেন্দ্রের সুযোগ্য নেতা স্বামী অখিলানন্দজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আগত অনেকগুলি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকার ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন বেদান্তের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। স্বামী বিবিদিষানন্দজী তাঁহার ভাষণে প্রসঙ্গত বলেন, আমেরিকায় বেদান্ত কাহাকেও ধর্মান্তরিত করিতে আসে নাই। ইহা সকল ধর্ম ও মতকেই গ্রহণ করে। য়াহুদী রাবী উইলিয়ম জি ব্রড এবং ব্রাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুর্ট জে ডুকাস্ স্বামী অখিলানন্দজীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং বহু-সমাদৃত কাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয়। পৃষ্ঠা:—(ডিমাই) ৩০০; মূল্য: ৫৲ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গাদি প্রামাণিক আকরগ্রন্থ-অবলম্বনে সর্বসাধারণের উপযোগী জীবনী-গ্রন্থ। ছয়টি চিত্রে শোভিত।

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয়। পৃষ্ঠা: ২২০; মূল্য: ২৷৷০ টাকা।

সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মুঠিগঞ্জ, এলাহাবাদ পৃষ্ঠা: ২৫০; মূল্য: ৩৲ টাকা।

The Cultural Heritage of India—Second Edition: Revised and Enlarged, Volume III. (The Philosophies) Published by the R. K. Mission Institute of Culture, 111, Russa Road, Calcutta-26. Double Crown 8vo Size (10" × 7½").720pages.Price; Rs. 30/-.

Talks on Jnana-Yoga—By Swami Iswarananda. Published by Sri Ramkrishna Ashrama, The Vilangans, Trichur (Travancore & Cochin). Price Rs. 1-8-0.

দুর্বার বিষয়-তৃষ্ণা

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেম্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্মপিশুনে নাদ্যাপি সংতুষ্যসি॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণে সকামা ভব॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্ (২, ৩)

অর্থের আশায় অনেক বিপৎসঙ্কুল দুর্গম স্থানে ঘুরিয়া মরিলাম, কিন্তু কোন ফলই হইল না; জাতিকুলের যথোচিত মর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া ধনীজনের সেবা করিয়া ফিরিলাম, কিন্তু বৃথা—সবই বৃথা। আত্মসম্মান-বর্জিত দীন প্রত্যাশায় পরের গৃহে কাকের মতো ভয়ে ভয়ে উদরপূর্তি করিয়া বেড়াইতে হইল। হীন-কর্মের প্ররোচক হে তৃষ্ণে, তুমি তো এখনও তুষ্ট হইলে না, তোমার বিলাস-চাতুরী তো ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে!

মণিরত্নের লোভে ক্ষিতিতল খনন করিয়াছি, পাহাড় কাটিয়া ধাতব-পাথর গলাইয়াছি, সমুদ্র ডিঙাইয়াছি। কত রাজা-রাজড়ার তোষামোদ করিয়া বেড়াইয়াছি, আবার মন্ত্রজপ ও দেবারাধনায় শ্মশানে কত রাত্রি কাটাইয়া অলৌকিক উপায়ও অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু হায়, একটি কানাকড়িও তো মিলিল না। হে তৃষ্ণে, এইবার তুমি শান্ত হও।

কথাপ্রসঙ্গে

একতার স্লোগান

সময়ে সময়ে এক একটি স্লোগান বা বাঁধাবুলি এক এক মানবগোষ্ঠিকে এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্যাপৃতিতে মাতাইয়া তুলে। ঐ স্লোগানকে অবলম্বন করিয়া মানুষ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা (সাময়িকভাবে হইলেও) ভুলিয়া যায় এবং সকলের মধ্যে একটি একতার বন্ধন বেশ দৃঢ় হইয়া উঠে। স্লোগানের শক্তি কম নয়। এই জন্যই বোধ করি, মানবসমাজের যাঁহারা নেতৃত্ব করিতে চান তাঁহাদিগকে সর্বাগ্রে একটি চিত্তাকর্ষক স্লোগান আবিষ্কার করিতে হয়।

স্লোগান কিন্তু সব সময়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়—সত্যের মুখোস পরিয়া আসে মাত্র। অনেক সময়েই উহা আলেয়ার আলো—বহু আশা দেখায়, অনেক দূর হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া যায়-অবশেষে একদিন আশার প্রাসাদ ধসিয়া পড়ে, পথিক দেখে—বিজন প্রান্তরে সে একান্তই একা—নিঃসহায়, নিরুপায়।

ধর্ম লইয়াও বহু স্লোগান ইতিহাসে তাহার ক্রিয়াশীলতার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে—বিরাট সঙ্ঘবদ্ধতা, অবিশ্বাস কর্মোদ্যম, সমাজের বিস্তৃত কল্যাণ—আবার ভয়াবহ বিদ্বেষ, বিশাল ক্ষতিও। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' 'জেহাদ'—এ সব গুলিরই পশ্চাতে ছিল স্লোগানের শক্তি। সহস্র সহস্র লোক জাতি কুল ঐশ্বর্য ভুলিয়া এক ধর্মের নামে এক হইয়াছে, সমধর্মাশ্রয়ীদের জন্য বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আবার অপর ধর্মাবলম্বীদের সহিত লড়িয়াছে, মারিয়া কাটিয়া পৃথিবীতে রক্তের নদী বহাইয়াছে। একতার স্লোগান একতা আনিয়াছে বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধ একতা—যেখানে প্রেম এবং বিদ্বেষ দুইই একই সঙ্গে মিশিয়া আছে, কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুইই যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বলিও না, ইহাই জগৎ-রীতি—আলোক-আঁধার-যুক্ত মায়িক ঘটনার লক্ষণ। বরং, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, ঐ অদ্ভুত দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী মানুষেরই ভুল—তাহার স্বার্থ-বুদ্ধি, অহংকার, দম্ভ—তাহার অপরিণত, আংশিক সত্যে স্থাপিত স্লোগান।

খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম দুইই বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলিয়া থাকেন, উহাদের স্ব স্ব প্রচারকগণ দেখাইতে চান, মানুষের মধ্যে একতা সংস্থাপন করিতে ঐ ঐ ধর্মের কী অদ্ভুত শক্তি। সত্য; কিন্তু বিশ্লেষণী চশমার তেজ একটু বাড়াইয়া যখন তাঁহাদের কথা ও কাজ নিরীক্ষণ করি তখন দেখিতে পাই, তাঁহাদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্লোগানে একটি বৃহৎ ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্ব খ্রীষ্টান-বিশ্ব, মুসলমান-বিশ্ব। যাহারা যীশুকেই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে না অথবা মসজিদে গিয়া কলমা পড়ে না তাহারা এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আলোক ও উত্তাপ হইতে প্রায়শই বঞ্চিত।

ভগবান বুদ্ধ একদা তাঁহার মানব-প্রেমে বিশ্বজনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মানব,—জগতের সকল মানবেরই জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। শাস্তার বাণী—সরল চতুরার্য সত্য—অষ্টশীলমার্গ—অপ্রতিহত শক্তিতে দিকে দিকে সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, কেন না, উহাতে শাস্ত্র-দেবতা-পুরোহিতের নির্মম বন্ধন ও অত্যাচার ছিল না। ত্রিশরণমন্ত্রের স্লোগান (বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি)—কে অবলম্বন

করিয়া অভূতপূর্ব ধর্মীয় একতা গড়িয়া উঠিল। কিন্তু এ স্লোগানেও ফাঁক ছিল। তাই, বুদ্ধোত্তর বৌদ্ধধর্মের একতা আপন ধর্মের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রহিল। সমগ্র মানবকে আলিঙ্গন করিবার সত্য উহার স্লোগানে ছিল না।

শ্রীচৈতন্যদেব বাঙলায়, উড়িষ্যায়, বৃন্দাবনে ধর্মজীবনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটি বিস্ময়কর একতা আনয়ন করিয়াছিলেন। স্লোগান—হরিনাম; জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন। জাতি ভুলিয়া, আভিজাত্য ভুলিয়া হাজার হাজার লোক নাম সংকীর্তনে পরস্পর পরস্পরের সহিত নিবিড় ঐক্য অনুভব করিয়াছিল, এখনও করে। কিন্তু একথাও সত্য যে পরবর্তী শ্রীচৈতন্যানুগগণ বৌদ্ধ ও শিবভক্তকে 'কৃষ্ণসংকীর্তন' করাইতে উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবের একতা সেইজন্য হইয়া দাঁড়াইল বৈষ্ণবেরই একতা—সর্বমানবের জন্য নহে। যদি বল, সকল মানুষকে বৈষ্ণব করিয়া লইয়া তবে কোল দিব, তাহার উত্তর—এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে উহা হইবার নয়; উপনিষদের ঋষি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন—'অনন্তং বৈ নামা'—অনন্ত অভিব্যক্তি, অনন্ত সংজ্ঞা, অনন্ত রুচি—সকলেই এক পথে যাইবে কেন?

ধর্ম বাঁধে, আবার বিচ্ছিন্নও করে; সে বোধ করি, একটা নির্দিষ্ট মতকে না মানাইয়া, একটি বিশেষ পতাকাকে সেলাম না করাইয়া বাঁধিতে পারে না। তাই, বিশ্বমৈত্রীকামী কোন কোন চিন্তানায়ক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধর্মের কর্ম নয় বৃহত্তম সংগঠন—জীবন-তান্ত্রিক অন্য কোন স্লোগান চাই,—যাহা মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত—অতীন্দ্রিয়—কুয়াসা—বিমুক্ত। উহা মানুষ সহজেই বুঝিবে—বুঝিয়া জীবন্তভাবে অনুসরণ করিবে। 'Workers of the world unite' (পৃথিবীর সকল শ্রমিক এক হও)—সাম্প্রতিক কালের এইরূপ একটি শক্তিশালী স্লোগান। এই স্লোগানের ক্রিয়া আমরা বর্তমান দুনিয়ায় অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। শ্রমিকরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে—সমান জীবনসমস্যায় পড়িয়া পারস্পরিক সহানুভূতিতে পৃথিবীর দূর দূরান্তরের লোক একতা অনুভব করিতেছে (জাতি, দেশ এমন কি, ধর্মেরও গণ্ডী ছাড়াইয়া)। সত্য; কিন্তু এখানেও সঙ্ঘর্ষের বিরাম নাই, স্বধর্ম-বিধর্ম-বোধের চেয়েও প্রখরতর বিদ্বেষ মাথা তুলিতেছে। বৈষয়িক স্বার্থবোধ এখানে প্রবল; এই হেতু স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে একশ্রেণীর শ্রমিক অপর শ্রেণীর শ্রমিককে দাবাইতে, পিষিয়া ফেলিতে পশ্চাৎপদ হয় না যদিও উভয়েই তাহারা একই স্লোগানের উপাসক। তাই বলিতে হয়, বিশ্বের সকল মানুষকে এক করা তো দূরের কথা, শুধু শ্রমিক-মানুষকেও স্থায়ী মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা উপরোক্ত স্লোগানে নাই।

যথার্থ একতার স্লোগান তবে কি? কোন্ পথে উহা আসিবে? মানুষের মানুষকে এক বলিয়া গ্রহণ করিবার বিবিধ বাধা কি ভাবে অপসারিত হইবে? বর্ণ নাই, জাতি নাই, দেশ নাই, সামাজিক পরিচয় নাই, কোনও প্রকার মতবাদ নাই—আছে শুধু মানুষের মনুষ্যত্ব—এমন একটি সত্যবোধ কবে মানুষের বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিবে? মানুষ মানুষ বলিয়াই মানুষকে মর্যাদা দিবে, আলিঙ্গন করিবে?

ব্যাধিক্লিষ্ট মানব এক সময়ে জড়ি-বুটি, মন্ত্র-তন্ত্র করিয়া নিরাময় হইবার চেষ্টা করিত। উহাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন হইত, একটা নির্দিষ্ট মানসিক প্রবণতা না থাকিলে ঐ উপায়ে আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হইত না। তাই ঐ চিকিৎসা-প্রণালী সর্বজনীন ছিল না—উহা ছিল সংস্কারগত,

গোষ্ঠীগত। এখনকার ব্যাধি-প্রতীকারসমূহ ঐরূপ সীমাবদ্ধ নয়। পেনিসিলিন বর্ধমানের শক্তিগড়েও চলে, সীমান্তের পেশওয়ারেও চলে। ইন্দোনেসিয়া, চীন, সুইডেন, পেরু, সব দেশের রোগীকে দায়ে পড়িলে পেনিসিলিন ঠুকিয়া দেওয়া হয়—সব দেশের পীড়িতই চাঙ্গা হইয়া উঠে। শারীর-বিজ্ঞান সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এক; ঐ বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসা-ধারা তাই মানুষে মানুষে বিভিন্ন নয়। আমরা যখন পৃথিবীবাসীর মধ্যে মৈত্রীর কথা বলি তখন উহার উপায়কেও সর্বজনীন মানব-বিজ্ঞানে অধিশ্রিত করা প্রয়োজন। যে স্লোগান মানুষের কোন বাহিরের পরিচয়কে ঘোষণা না করিয়া তাহার অন্তরতম সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে উহাই যথার্থ একতার স্লোগান। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে এই স্লোগান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উপনিষদ যখন 'শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' বলিয়া ডাক দিয়াছিলেন তখন তিনি কোন এক নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীকে, কোন এক বিশেষ মতানুসারীকে ডাকেন নাই—আহ্বান করিয়াছিলেন বিশ্বের সকল মানুষকে। সকল মানুষের মধ্যে এক আত্মিক সত্য রহিয়াছে, এক অমৃতত্ব রহিয়াছে। সকল মানুষই তাই তাঁহার চোখে ছিল এক। শাস্ত্র নাই, পুরোহিত নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই, জাতি-জীবিকা-বর্ণ, মতবাদ-কল্পনা নাই—আছে শুধু অবিসংবাদিত, অসন্দিগ্ধ, অতি-স্পষ্ট, অতি-ভাস্বর মানব-সত্য—নিকটে আবার দূরে, আজ আবার কাল, ব্যষ্টিতে আবার সমষ্টিতে। 'অমৃতস্য পুত্রা'—ইহাই সর্বকালের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ একতার স্লোগান।

দুর্গোৎসবের শিক্ষা

জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'দুর্গোৎসবের শিক্ষা'র দিকে চিন্তাশীল দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন (দৈনিক বসুমতী, ৮ই কার্তিক, রবিবার)। পল্লীতে পল্লীতে সর্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন। বহু আড়ম্বর, গানবাজনা, আলোকসজ্জা। আবার মণ্ডপের পার্শ্বেই ফুটপাথে গৃহচ্যুত, অন্নহীন সর্বহারাদের ভিড়। শুধু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নয়—পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক-পরিবারের পুরুষ-স্ত্রী-শিশুগণও।

আমি বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম—উৎসবের জন্য সংগৃহীত অংশের সামান্য অংশও হাসপাতালে দান করুন ও দরিদ্রদিগের জন্য কয়খানি বস্ত্রে ব্যয় করুন। কেহ কেহ সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন—সকলে করেন নাই। অথচ কেহই এই অনুরোধ যে অযৌক্তিক এমন বলেন নাই।

মানুষের পক্ষে আনন্দের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যে আনন্দ অপরের সহিত—সকলের সহিত ভাগ করিয়া সম্ভোগ করা যায়, তাহার সার্থকতা অধিক; সুতরাং উপযোগিতাও অধিক।

এ ক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে না।

হেমেন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, বর্তমান পাশ্চাত্যশিক্ষার গুণে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। "শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।" সমাজের সকল স্তরে সমবেদনা যতদিন না দেশবাসীর মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের 'নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর' প্রভৃতিকে 'নিজের রক্ত, নিজের ভাই' জ্ঞান করিয়া সেবার বাণীর প্রতি সর্বজনীন পূজার উৎসাহিবৃন্দকে হেমেন্দ্র বাবু অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

স্বামীজীর স্বপ্নের—দেশভক্তের সাধনার সেই ভারত যে এখনও স্বপ্নলোক ত্যাগ করিয়া বাস্তবলোকে সমাগত হয় নাই, তাহাই ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য। তাহার কারণ, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, ধনীতে দরিদ্রে, ক্ষমতামদমত্তে ও গণসমাজে—সমবেদনার অভাব; একের দুঃখ-দুর্দশা অন্যকে বেদনা দেয় না। * * *

সর্বজনীন দুর্গোৎসবে অনেক স্থানেই দরিদ্র, নিরন্ন, বস্ত্রহীন, রোগাতুর বাঙ্গালী নরনারী সমাজের সমবেদনার পরিচয় পায় নাই—যে সমবেদনা বেদনার প্রলেপ, জাতির ঐক্যের বন্ধন সেই সমবেদনা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সেই সকল ক্ষেত্রে উৎসবের সর্বজনীনতা ব্যাহত হইয়াছে।

রাজপথে উৎসবানন্দের পার্শ্বেই পথের উপর নিরন্নের জীবনান্ত—ইহা সমবেদনার অভাব ব্যতীত সম্ভব হয় না—হইতে পারেও না। যতদিন এই অবস্থা সম্ভব থাকিবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব, ততদিন জাতির বিপদ অনিবার্য। ততদিন নবীন ভারতের জয়ধ্বনি করিবার সময় আসিবে না।

আজকালকার সর্বজনীন পূজাসমূহের প্রতিমা-সম্বন্ধেও বাঙলার এই প্রবীণ চিন্তানায়কের মন্তব্যগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :—

পূর্বে বাঙ্গালার দুর্গাপ্রতিমার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—নূতন আর্টের নামে তাহার নানারূপ পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে প্রতিমা ছিল একত্রিত—মহাশক্তি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—তাঁহার দশ বাহু দশ দিকে প্রসারিত এবং তাহাতে নানা অস্ত্র শোভিত; তিনি পশুবলের উপর পদ রাখিয়া শূলে অসুরের বক্ষ বিদ্ধ করিতেছেন—নিয়ন্ত্রিত পশুবল সুপ্রযুক্ত হইয়া শত্রুবধে নিযুক্ত; সঙ্গে লক্ষ্মী সমৃদ্ধির প্রতীক ও সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কার্তিকেয়—বলরূপী ও গণপতি। কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর, যে বিষধর সর্পকে গলাধঃকরণান্তে জীর্ণ করিতে পারে, গণপতির বাহন ইন্দুর—নিঃশব্দে কাজ করে—মন্ত্রগুপ্তির প্রতীক। গণপতি বিজ্ঞ—তিনি দ্বিজ। উপরে "চালচিত্রে" বহু দেবতা অঙ্কিত—মধ্যস্থলে মহাদেব—যিনি অকল্যাণ বিষ ভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন। ধর্মকে মাথার উপর রাখিয়া শক্তির সাধনা করিতে হয়। এখন বাঙ্গালীর একান্নবর্তী পরিবার যেমন শিক্ষার ফলে ও অর্থনীতিক কারণে বিচ্ছিন্ন—প্রতিমায় দেবদেবীরাও তেমনই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত—হয়ত হিমাচলের এক একটি শৃঙ্গে।

সর্বজনীন দুর্গোৎসবে—ভক্তির স্থান সাজসজ্জার বাহুল্য অধিকার করে এবং দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত হয় না।

সেবার আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একখানি পত্রে (চিকাগো, ২৮।৫।১৮৯৪) জনৈক মাদ্রাজী যুবক-কর্মীকে লিখিয়াছিলেন—

"কাজের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।"

উক্ত যুবককেই লিখিত অপর একখানি পত্রে (ওয়াশিংটন, ২৭।১০।১৮৯৪) আছে—

"মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কাযে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য করিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশ হইবার পূর্বে শত শত বুদ্ধ নীরবে কার্য করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীচন্দ্রনাথ সৎপতি মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রাম থানার কোন গণ্ডগ্রামে প্রাইমারী স্কুলের একজন দরিদ্র শিক্ষক। কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় কয়েক মাস কাটাইতে হয়। দেশে ফিরিয়া দেখেন, অজন্মার জন্য দারুণ অন্নকষ্ট অনেকগুলি গ্রামকে এককালে আচ্ছন্ন করিয়াছে। গভর্নমেণ্ট কি করিবে, বিত্তবান জমিদারদের কাছে কবে কৃপাভিক্ষা সার্থক হইবে এ সকলের প্রতীক্ষা না রাখিয়া তিনি তাঁহার নিজের সামান্য শক্তিরই পূর্ণ ব্যবহার করিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। লিখিতেছেন—

"শ্রীভগবানের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি ১লা আশ্বিন হইতে তাহা একনিষ্ঠভাবে পালন করিয়া চলিতেছি, আজ পর্যন্ত (১৮ই আশ্বিন) ৯৬৪ জন বুভুক্ষু শিশুর মুখে খাদ্য দিতে পারিয়াছি। এ পর্যন্ত বাহিরের কিছু সাহায্য পাই নাই। নিজেই ঋণ করিয়া চালাইতেছি এবং শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প আছে, কিন্তু সেবাসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, তাহাতে ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু উপায় নাই। সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় বহুস্থানে আবেদন জানাইয়াছি, জানি না, কিছু ফলোদয় হইবে কি না।"

এই দরিদ্র পল্লীসেবকের সেবার আদর্শ বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জড় ও চেতন

'অনিরুদ্ধ'

জড় ও চেতন পর পর আসে,
পর পর মোরে টানে,
আপনারে কভু দেখি জড়-রূপে
কখনো স্বচ্ছ জ্ঞানে।
কভু মোর ধরা শুধু কালি-ভরা
আকাশে কেবলি মেঘ
বাতাস শুধুই হানি উত্তাপ বহিছে তীব্র-বেগ।
জলে নাই রস, সূর্যে দীপ্তি,
চন্দ্রে স্নিগ্ধ আলো
অখিল সৃষ্টি যেন প্রাণহীন অবশ কঠিন কালো।

জড়ের দৃষ্টি চোখে যবে লাগে
মানুষ মহিমা-হারা
তারে শুধু দেখি মাংস-পিণ্ড
দেহের জীবনে সারা।
জড়ের প্রবাহে প্রাণের স্পন্দ
নহে অভিনব কিছু
জীবনতৃষ্ণা জড়েরি ধর্ম, মনও বাঁধা জড়-পিছু।
নাহিরে বিশ্বে সত্য, শান্তি,
নাহিরে বিবেক, নীতি
ক্ষণিক বিষয়-সুখ-সম্ভোগ এই তো মানব-রীতি!

চকিতে আবার নেহারি পৃথিবী
ভরিল আলোক-বানে
ঊর্ধ্ব গগনে হাসে তারাদল
সমীর শান্তি আনে।
দিবস-যামিনী নাচে পুনরায় আপন ছন্দ পেয়ে
অনাদি অসীম পুলক-চেতনা রহে চরাচর ছেয়ে।

কোথা হতে পুনঃ চেতন-পরশ
নয়নে পশিল চুপে
মানব দাঁড়ায় অতিভাস্বর
দেহাতীত কোন্ রূপে।
পৃথিবীর মাটি ডিঙায়ে তাহার গৌরব ছুটে দূর
সপ্তভুবনে ধ্বনিল মানব-সত্য-গীতির সুর:

"ধন্য আমি যে মানুষ, নাহিরে জনম-মরণ-ভীতি
পরম-শুদ্ধি-জ্ঞান-আনন্দ আমারি স্বরূপে স্থিতি।
আমি তো ভিতর, আমিই বাহির, আমিই বৃহৎ অণু
আমিই সূর্য আমিই চন্দ্র আমি প্রজাপতি-মনু।
স্থির জঙ্গম ভূচর খেচর দূর ও নিকটে যারা
দানব দেবতা সকলি হয়েছে আমারি প্রকাশে হারা।"

জড়-চেতনের দ্বন্দ্ব এমনি রয়েছে সতত ঘিরে
আলোক আঁধার সাধক জীবনে পরপর আসে ফিরে।
কোন্ শুভ ক্ষণে তত্ত্বের ভানে এই খেলা হবে শেষ?
অখিল সৃষ্টি-মাঝারে কোথাও রহিবে না জড়-লেশ।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

(১)

[স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

নিউইয়র্ক
102, 58th St.
৮ই অক্টোবর, ১৯০১

পূজ্যপাদ স্বামিজী,[১]—

তোমার ১৬ই মে'র কৃপাপত্রটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। এইমাত্র আমি কালিফোর্ণিয়া থেকে ফিরছি—সানফ্রান্সিস্‌কোর বেদান্ত সমিতি বেড়ে চলেছে; কিন্তু জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে সক্ষম এরকম আর একজন সন্ন্যাসী ওখানে দরকার। ডাঃ লোগান আমার ওপর বেশ সদয় ব্যবহার করেছেন। আশ্রমের অবস্থান ঠিক করতে আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ওখানে পৌঁছুনো বেজায় দুঃসাধ্য ব্যাপার; গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর গরম, শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা। আশ্রমবাসীরা কৌটোয় সংরক্ষিত শাকসব্জী এবং ফল খেয়ে থাকে। ওখানে কিছুই উৎপাদন করতে পারে না, আশে পাশেও কিছু পাওয়া যায় না। ওদের দরকারী জিনিসপত্র সব আসে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী সান্ জোস্ (San Jose) থেকে। আমার মনে হয়, ওখানে আশ্রমটি কার্যকরী হবে না।

"জ্ঞানযোগ"-এর বিষয়ে তোমাকে মিঃ লেগেটকে লিখতে হবে। পাণ্ডুলিপি সব প্রস্তুত। বই ছাপাবার জন্য আগাম টাকা দিতে মিঃ লেগেটকে মিস্ ওয়াল্ডো বলেছিলেন, কিন্তু কোন কাজ হয় নি। মিঃ লেগেটের সঙ্গে তুমি কি ব্যবস্থা করেছ, আমি তা জানি না। তুমি তো জানো তোমার সব বইএর ভার তুমি মিঃ লেগেটকেই দিয়েছিলে, আমরা মিঃ লেগেটের কাছে অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতাদের মতো পাইকারী হারে তোমার বই কিনে খুচরো বিক্রি করে থাকি। মিঃ লেগেটকেই তোমার বইএর হিসাবাদি রাখতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের কিছু করার হাত নেই। তোমাকেই ঐ সম্বন্ধে মিঃ লেগেটকে লিখতে হবে। তিনি আর কারুর কথা শুনবেন না।

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার সাষ্টাঙ্গ এবং ভালবাসা নিও। ইতি

—দাস কালী

(২)

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

নিউইয়র্ক
102E 58th St.
২৪শে নভেম্বর, ১৯০১

প্রিয় শশী,

তোমার সস্নেহ পোষ্টকার্ডটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। হরিভাই[২]এর বেশ দুঃসময় গিয়েছে। তাকে পাথুরী রোগে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিল, তবে বর্তমানে ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে। হরিভাই এখন সান্ ফ্রান্সিস্‌কোতে। সম্প্রতি তোমার খবরাখবর দিয়ে তাকে চিঠি দিয়েছি। আমাদের প্রিয় সুহৃৎ কিডি[৩] আর ইহলোকে নেই শুনে খুবই দুঃখিত হলাম।

১ এই সম্বোধনটি মূল বাংলায় লিখিত।

২ স্বামী তুরীয়ানন্দ

৩ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মান্দ্রাজী শিষ্য অধ্যাপক সিঙ্গারাভেলু মুদালিয়র।

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

আমাদের ঠাকুরের আগামী জন্মতিথির তারিখটি সময়মত জানানর জন্ত তোমাকে বহু ধন্তবাদ।

আমি বর্তমানে সাংঘাতিক কর্মব্যস্ত। আশা করি তোমার ক্লাশগুলি বেশ ভালই চলছে।

আমার প্রীতি ও দণ্ডবৎ নিও।

ইতি দাস কালী

পুনশ্চ :— ইংরেজীতে লিখলাম বলে ক্ষমা কোরো। এটাই তাড়াতাড়ি আসে।

(৩)

[মূল ইংরেজীতে লিখিত]

বোম্বাই
৯ই নভেম্বর, ১৯০৬

প্রিয় শশী ভাই,

তোমার ৭ই নভেম্বরের স্নেহপত্রটি এই মাত্র হাতে পৌছুল। ধন্তবাদ। মাদ্রাজে মঠটি এখনও তৈরী হয় নি জেনে দুঃখিত। আশা করি গুরুমহারাজ শীঘ্রই সব কিছু ঠিক করে দেবেন।

আমি আগামী কাল P. & O. S. S. Marmora জাহাজে রওনা হচ্ছি ; সঙ্গে বসন্ত যাচ্ছে। বসন্ত[৪] এবং আমাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে শ্রীশ্রীমাকে লিখছি। আমার মনে হয়, সঙ্গে যে বসন্ত যাচ্ছে এ শ্রীশ্রীপ্রভুর এবং স্বামিজীরই ইচ্ছা। ওকে এখন কিছুদিন কাছে কাছেই রাখব এবং আমেরিকায় আমাদের কাজের জন্ত ভাল করে গড়ে তুলব। শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট প্রার্থনা কোরো তার সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ এবং কর্মজীবন সফল হোক ; আর তাকে তোমার আশীর্বাদও পাঠিও।

৪। পরে স্বামী পরমানন্দ।

কলকাতা থেকে বোম্বাই অবধি সর্বত্র আমরা খুব সুন্দর অভ্যর্থনা পেয়েছি। এখানে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র এবং স্থায়ী ভাবে বাস করবে এরকম একজন সন্ন্যাসীর অত্যন্ত চাহিদা রয়েছে। * * * এখানে আমি দুটো বক্তৃতা দিয়েছি, আজকের সান্ধ্য বক্তৃতাটি হবে তৃতীয়। গতকাল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের অধ্যাপক মিঃ উড্‌হাউস্। তিনি ইংরেজ এবং আমাদের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। আমার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল—'ভারতীয় যুবকগণের দায়িত্ব'। সভায় ছাত্রদের এবং বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় বহু লোকের ভিড় হয়েছিল। আজকে সভানেতৃত্ব করবেন মাননীয় শ্রীগোকুল দাস পরেখ্ : বিষয়বস্তু—'বাস্তব জীবনে বেদান্ত'।

খগেন অসুস্থ শুনে দুঃখিত। তাকে আমার ভালবাসা ও সহানুভূতি দিও। আশা করি তুমি ভাল আছ। তোমাকে এবং খগেন ও অন্যান্য বন্ধুদের বিদায়-ভাষণ জানাই। ভালবাসা ও নমস্কার।

তোমার স্নেহের
অভেদানন্দ

ক্ষুদ্রতা

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

যাহা কিছু প্রয়োজন নিত্য মোর কল্যাণ লাগিয়া,
একে একে তাই দেব তুমি মোরে চলেছ যে দিয়া।
কিছু সুখ সিদ্ধি দিলে, কিছু দিলে দুঃখ বিফলতা,
ঋদ্ধি ও রিক্ততা দিলে, প্রিয়জন-বিরহের ব্যথা।
দুঃখ ও বেদনা ভারে যবে মোর ভেঙে পড়ে হিয়া,
তোমারে যে দোষ দিই মায়াহীন নিষ্ঠুর বলিয়া।
সম্পদের মাঝে বসি' সুখে যবে পূর্ণ প্রাণমন,
বলিনা তো, 'এই থাক্, আর মোর নাহি প্রয়োজন'।
বলি শুধু, 'দাও দাও, আরো দাও ওহে দয়াময়,
দাও অর্থ, দাও মান, দাও যশ অতুল অক্ষয়'।
আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, যত পাই তত বেড়ে যায়,
হীনতার বোধ নাই, লজ্জা নাই নিজ ক্ষুদ্রতায়।
কামনার মোহবশে ভুলে যাই আপন মঙ্গল ;
বিশ্বাস হারায়ে ফেলি, ভাবিনা কো বিপরীত ফল
ক্ষুদ্রতার গণ্ডী রচি' তোমারেই রাখি দূরে ঠেলি',
হৃদয় দেবতা তুমি, তোমারেই ছোট করে' ফেলি।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য স্মৃতি

(এক)

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সান্যাল, এম-এ, বি-এল্

১৩১৫ সনের কথা। চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। হেমন্তের এক কুহেলীময় প্রভাতে গোমো-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে তিনটি বন্ধুসহ রওনা হইয়াছিলাম বর্তমান জগতের পুণ্য তীর্থদ্বয়—কামারপুকুর ও জয়রামবাটি দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। বন্ধুত্রয়ের মধ্যে দুইজন এখন বেলুড়-মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী, আর একজন হইতেছেন বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক প্রাচীন উকীল।

বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক (ট্রেনের কামরায় তাঁহার সহিত আমাদের জীবনে সর্ব-প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সেই দিনই) আমাদিগকে তাঁহার বাসায় জলযোগ করাইয়া কামারপুকুরে লইয়া যাইবার জন্য রাত্রিতে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরের দিন কামার-পুকুরে পৌছিতে পৌছিতে অপরাহ্ণ প্রায় অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মুস্কিল হইল কামারপুকুর গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়,—"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ীটি কোথায়?"—সে-ই বলে একই কথা,—"বলতে লারবো বাবু।" আজ লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে ভগবান ঈশার বাণী—"For verily I say unto you, a prophet is without honour in his own land." (আমি তোমাদের বলে রাখি শোনো, অবতার তাঁর নিজের জন্মভূমিতে সম্মান পান না)। জনৈক বন্ধু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, এই ত সামনে জিলিপির দোকান, দোকানদারের বাবা কিংবা ঠাকুরদাদা নিশ্চয়ই তাঁকে জিলিপি তৈয়ারী করে খাইয়েছেন, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন।" জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"ও বুঝতে পেরেছি বাবু, চাটুজ্যেদের বাড়ী—তাই বল না বাবু—উ-ই যে বটেক, উ-ই দেখা যাচ্ছে।" মুস্কিলের আসান হইয়া গেল। ঠাকুরের বাড়ীতে পৌছিয়া শিবুদাকে পাইলাম। আর পরিচয় হইল শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদারের সহিত। আজ তিনি পরলোকগত। তিনিও কলিকাতা হইতে আমাদের অগ্রে কামারপুকুর দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। বিজয় বাবু তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের প্রবর্তিত এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'র সম্পাদক ছিলেন। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া পরদিন অপরাহ্ণে হাঁটিয়া আমরা জয়রামবাটি রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতেই থাকিতেন। হাতমুখ ধুইবার পর আমি দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলিয়া বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বন্ধুরা তখন বহির্বাটিতে বসিয়া মামাদের এবং পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। আমি যে কখন হঠাৎ বাড়ীর ভিতর গিয়া বসিয়াছি, তাহা তাঁহারা লক্ষ্যই

করেন নাই। ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া মা কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তোমার বে হয়েছে ?"

আমি বলিলাম,—"না।"

মা তখন বলিলেন,—"বাবা, মহীন্দর বই পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি একটু পড়ে শোনাও তো।" এই বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়ভাগ, একখানি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। ঐ বই তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টার মহাশয় (শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত—শ্রীম) সর্বাগ্রে একখানি শ্রীশ্রীমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—"প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটী।" তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ দিকে যেখানে আছে—"ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না; কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে"—সেই জায়গাটি যখন পড়ি, তখন মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর ঐ কথাটি খুব বলতেন, কাঁচা লুচি পড়লে আবার পাকা ঘি ছ্যাক্ কল্ কল্ করে।" তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে যেখানে আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)' সেখানে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, মণি কে জানো ?" আমি উত্তর করিলাম,—না, মা, জানিনা তো।" মা হাসিয়া বলিলেন,—"মণি, উটি হচ্ছে মাষ্টার মশায় নিজে।" সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাঠ বন্ধ হইল। ইতিপূর্বে বন্ধুরাও আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়াছি জানিতে পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, মা তাঁহার ঘরের ভিতর তক্তাপোশে উপবিষ্টা আছেন, মাটিতে কয়েকটি গ্রাম্য বালক ও বালিকা বসিয়া। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কোথায় বসিব ইতস্ততঃ করিতেছি, কারণ, শহরে শিক্ষার প্রভাবে একদম মাটিতে বসিতে দ্বিধা বোধ হইতেছিল অথচ ঘরে মাটির মেঝেতে কোন রকম আসনও তখন ছিল না। শেষে অনেকটা হতভম্ব হইয়া মাকে বলিলাম,—"মা, আমি আপনার কাছে বসতে পারি এখানে ?" মা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ,—বাবা, বোসো, বোসো।" আমি গিয়া তক্তাপোশের উপর মায়ের নিকটে বসিলাম। এ কাণ্ডজ্ঞান তখনও হয় নাই যে মায়ের সহিত এক আসনে বসিতে নাই। মা ঐ সব গ্রাম্য বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন কে কেমন আছে, ক্ষেতে কি পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, এরা সব কে ?" উত্তর দিলেন,—"এই সব আশেপাশের গ্রামের।" দেখিলাম ঐ সকল বালকবালিকা প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লইয়া যাইতেছে।

রাত্রির আহারের পর তখনই আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম, কারণ সকলেরই শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। ভোরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলাম। মাকে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরের ভিতর পাইলাম। তিনি তখন দাঁড়াইয়া, আমিও তদ্রূপ। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা, তোমাকে এই নাম দিলাম।" ব্যাপারটি যেন এক মুহূর্তে ঘটিয়া গেল। কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এতই বোকা ছিলাম যে, আমি কিছুক্ষণ পরেই বাহিরের ঘরে আসিয়া, বন্ধুত্রয়ের একজনকে বলিতে উদ্যত হইলাম,—"ছাখ্, আজ ভোরে মা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন 'ছাখো বাবা, তোমাকে এই নাম—'।" এই কথাটি এই পর্যন্ত

বলা হইলেই বন্ধুবর আসল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে চুপ্‌ চুপ্‌ ও কথা কাউকেও বলতে নেই, বলতে নেই।" আমি তো আরও হতভম্ব হইয়া গেলাম। জীবনের সেই শ্রেষ্ঠতম দিনে, অতি প্রত্যুষ হইতেই আমার একের পর এক কারণে হতভম্ব হইবার পালা চলিতেছিল! পরবর্তী কালে পুস্তকে পড়িয়াছি, মা একবার বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে একটি হিন্দুস্থানী নারীকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিপ্রহরে আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা আমাদের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। মা স্বহস্তে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। দু'এক গ্রাস মাত্র ভাত খাইয়াছি, এমন সময় বন্ধুদের একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"অনুকূল বাবু, মাকে গিয়ে বলুন, আমরা তাঁর প্রসাদ খাবো।" উচ্ছিষ্ট হাতে সেই অবস্থায় মা যেখানে ছিলেন, আসন হইতে উঠিয়া তথায় গিয়া মাকে ঐ কথা বলিলাম। করুণাময়ী সেই অবস্থায়ই একটি বাটির ভিতর ভাত, ডাল, তরকারি সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম নিজেই সেখানে লইয়া আসিলেন এবং বাটিটি হইতে সেই প্রসাদ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে পরিবেশন করিলেন। আমার আজও এই সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হওয়া সত্ত্বেও, অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আছে যে, সে দিন জয়রামবাটিতে খাইতে বসিয়া মায়ের হাতের রান্না পায়েস যেমন খাইয়াছিলাম, অমন সুস্বাদু পায়েস ইহজীবনে আর কোথাও খাই নাই। বিকাল বেলা রওনা হইবার প্রাক্কালে মাকে একান্তে বলিলাম,—"মা, আপনার একটু প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই কলকাতায়।" অমনি মা বেঁধে প্রসাদ করিয়া দিলেন, অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে বলিয়া। তাহা ছাড়া সঙ্গে আরও মিষ্টি দিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সেই প্রসাদের কিয়দংশ আচার্য স্বামী সারদানন্দজীকে এবং ভক্তকুলচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের যে মূর্তি আমি দেখিয়াছি, তাহা স্মরণপথে উদিত হইলেই স্বতঃই মনে আসে আচার্য স্বামী প্রেমানন্দের কথা—"রাজরাজেশ্বরী ঘর নিকুচ্ছেন, ছেলেদের এঁটো পাড়ছেন।" আমার দেখা মা হইতেছেন মা-ই, সন্তানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় সর্বদা ব্যাপৃতা। তাঁহার ঐশী ভাবের প্রকাশ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আবার স্বভাবতঃই মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—'যার যা পেটে সয়। * * * মা ছেলেদের জন্য বাড়ীতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; তাই কারু কারুর জন্য মাছের ঝোল করেছেন —তারা পেটরোগা। আবার কারুর সাধ অম্বল খায় বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা— আবার অধিকারী ভেদ।"

বিকাল বেলা আমরা যখন কলিকাতা আসিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন মা বাড়ীর বাহিরে একটুখানি দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও দাঁড়াইয়াই আছেন আমাদের দিকে চাহিয়া। করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা—যে যত অযোগ্য, যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা!

কয়েক বৎসর পরে আবার কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন আফিসে) পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একবারের কথা সুস্পষ্টভাবে

মনে আছে। সেবার স্বামী— দোতালায় মায়ের ঘরের দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। আমি দোতালায় গিয়া সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই তিনি মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন —"মা, এই যে অমুকূপ এসেছে। সেই আমরা একত্রে জয়রামবাটি গিয়েছিলুম।" আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা তখন বসিয়াছিলেন ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে তক্তাপোশের উপরে। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, আমি কি এখন আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি?" যতদূর মনে পড়ে, আমি তখন অস্নাত ছিলাম এবং বাস করিতেছিলাম কলেজের মেসে। ঈষৎ হাসিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, বাবা, এস, এস।" আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পুনরায় প্রণাম করিলাম। কেন বলিতে পারি না, এবারও মা সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই পূর্বেকার প্রশ্ন,—"বাবা, তোমার বে' হয়েছে?"—যে প্রশ্ন আমার মানব-জীবনের পরম মাহেন্দ্রক্ষণে এক অপরাহ্ণে জয়রামবাটিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এবার অতি অল্পক্ষণ কথাবার্তা হইয়াছিল, কারণ বহু ভক্ত একের পর এক তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে সেই সময় আসিতেছিলেন।

আজ মনে হয়—তখন অবশ্য বয়সের অল্পতার দরুণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মহাশক্তি-স্বরূপিণী হইয়াও নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিয়া, কি ভাবে সাধারণ পল্লীবধূরূপে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ দৈনন্দিন কর্ম করিতে হয়, তাহার তুলনারহিত, উপমারহিত দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রশক্তি মদমত্ত নরনারীর সম্মুখে জননী সারদাদেবী রাখিয়া গিয়াছেন—আর রাখিয়া গিয়াছেন, অপার করুণার, অসীম কৃপার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

(দুই)

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-এস্‌সি, বি-এল্

ইংরেজি ১৯১৭ খ্রীঃ, বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল। ঐ বৎসর আমি আর তিনজন সঙ্গীসহ ভাঙ্গা (ফরিদপুর) হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির ঠিক্ আট দিন পূর্বে বেলুড়মঠে পৌঁছাই। তখন বেলা আন্দাজ আড়াইটা হইবে। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) নীচে সামনের বারান্দাতেই বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"আমরা ভাঙ্গা থেকে উৎসব দেখ্‌তে এসেছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ও বাবা! এত আগে?" এবং তাহার পরই আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা মঠে কোনও সংবাদ না দিয়াই আসিয়াছিলাম। কিন্তু বাবুরাম মহারাজের স্নেহ-যত্নে আমরা তখন বুঝিতেই পারি নাই যে, আমরা ঐরূপ করিয়া কোনপ্রকার অন্যায় বা অবিবেচনার কার্য করিয়াছি।

আমাদের ভাঙ্গার দলের অপর একজন আর দুই তিন দিন পরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে 'প্রিয়নাথ দা' ছিলেন বয়স্ক লোক। তিনি বহু পূর্বেই ঠাকুরের কোনও গৃহী শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়াছিলেন। এবার মঠে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মহারাজদের ও সম্ভবপর হইলে শ্রীশ্রীমায়েরও দর্শন-লাভ।

আমাদের বাকী চার জনের উদ্দেশ্য ছিল দীক্ষা-গ্রহণ।

আমরা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম যে, রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) অনুপস্থিতির জন্য ঐ বৎসর মঠে কোন দীক্ষা দেওয়া হইবে না। মঠে পৌঁছিয়া সেই সংবাদ সত্য জানিয়া আমরা জয়রামবাটি যাইবার বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলাম, কারণ শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটিতে এবং বাবুরাম মহারাজ বা হরি মহারাজ (তিনি তখন মঠে ছিলেন) ইঁহারা কেহই দীক্ষা দিতেন না। এই জন্য আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের বিষয় প্রথম দিন কাহাকেও কিছু বলি নাই। কিন্তু পরদিন সকালবেলা দোতলার (পুরাতন) লাইব্রেরী ঘরে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি তিনি যেন সবই জানেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, তিনি প্রথম নিকটে দণ্ডায়মান হরি মহারাজকে দেখাইয়া আমাদের বলিলেন,—"এঁর নাম হরি মহারাজ, তোমরা যাঁর কথা বইতে তুরীয়ানন্দ স্বামী ব'লে পড়েছ।" এই বলিয়া তিনি আমাদের হরি মহারাজকে প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, বাবুরাম মহারাজ আমাদের দেখাইয়া হরি মহারাজকে বলিলেন,—"এরা সব সাধু হ'তে এসেছেন।" এবং সেই সঙ্গে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমাদের যা বলার আছে, এঁকে বল।" আমরা বাবুরাম মহারাজের কথায় যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া হরি মহারাজের সঙ্গে পূর্বদিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া সর্বপ্রথম বলিলেন,—"সাধু হবার ইচ্ছা—সে তো ভাল কথা। যার সাধু ইচ্ছা ভগবান তার সহায়।—ইত্যাদি।" তাহার পর আমার final law examination (শেষ আইন পরীক্ষা) দেওয়া বাকী আছে জানিয়া বলিলেন,—"আরব্ধ কাজটা শেষ কর, তা শেষ ক'রতে হয়।" কিন্তু কাজের কথা কিছুই হইতে পারিল না, কারণ স্বামী নির্ভয়ানন্দ মহারাজ* ঝড়ের মত কোথা হইতে আসিয়া হরি মহারাজের সঙ্গে অন্য আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

যাহা হউক, কয়েকদিন অনিশ্চিত ভাবে কাটাইয়া আমরা জয়রামবাটি যাওয়া চূড়ান্তভাবে স্থির করিলাম। ইহারই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার পূর্বে দেখি বাবুরাম মহারাজ কাহাকে যেন উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিতেছেন। আমি নিকটে যাইতেই তিনি আমাকে আমাদের সঙ্গের একটি ছেলেকে দেখাইয়া বলিলেন,—"তোমরা এই সব ছেলে নিয়ে মঠে আস, মঠ কি শেষে গরুর গোয়াল হবে?" ছেলেটি স্কুলে পড়িত, লেখাপড়ায় মোটেই ভাল ছিল না। আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম উনি কিসের দ্বারা বুঝিলেন যে, ছেলেটি মঠেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু আর একদিন তিনি আমাদেরই সমক্ষে উত্তেজিত ভাবে বলিতে থাকেন, "দীক্ষা দেব না ব'ল্‌লেই হ'ল, জোর ক'রে দীক্ষা নেব।" তাঁহার এই সব কথার তাৎপর্য আমরা তখন কিছুই বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম কতক মায়ের বাড়ী গিয়া এবং কতক তাহারও পরে।

তিথিপূজার দিন ক্রমে নিকটে আসায় আমরাও খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অথচ তখন মঠে এত লোক ও কাজের ব্যস্ততা যে বাবুরাম মহারাজকে কিছু বলারও সুযোগ পাইতেছি না। অনুপায় হইয়া আমরা হরি মহারাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আরাত্রিকের সময়ে ঠাকুরঘরে যাইতেন না। তাই, একদিন সন্ধ্যার পরে যখন আর সকলে ঠাকুরঘরে গিয়াছেন, তখন আমি আমার একজন সঙ্গীসহ দোতলায় হরি মহারাজের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন সামনের বারান্দায় তাঁহার আসন হইতে উঠিতেছিলেন। আসনখানি

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য।

তাঁহার হাতেই ছিল। আমাদের দেখিয়া উহা পুনরায় পাতিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দুটি কথা ব'লব?"

হরি মহারাজ বলিলেন,—"বল।"

আমি।—"আমরা দীক্ষার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু রাজা মহারাজ এখানে নেই।"

হরি মহারাজ (চিন্তিতভাবে)।—"দীক্ষা,—তা আমি তো দি না। বাবুরাম কি দেয়?"

আমি।—"দুই একজনকে গোপনে দিয়েছেন শুনেছি, তবে ঠিক জানি না।"

হরি মহারাজ।—"আচ্ছা, আমি বাবুরামকে জিজ্ঞেস ক'রব।"

ইহা বলিয়াই তিনি পুনরায় বলিলেন,—"শুধু দীক্ষা নিয়ে কি হবে, ভজন ক'রতে হয়। ঐ যে (ঠাকুরঘরে) ভজন হ'চ্ছে।"

আমি।—"দীক্ষা নিয়ে ভজন ক'রলে ভাল হয় না?"

হরি মহারাজ।—"তা বটে, তা বটে। আচ্ছা বাবুরাম মহারাজকে ব'লে দেখি।"

আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। আমরা জানিতাম, রাজা মহারাজ বর্তমান থাকিতে বাবুরাম মহারাজ কিছুতেই আমাদের দীক্ষা দিতে সম্মত হইবেন না এবং মায়ের বাড়ী যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। এদিকে সময়ও আর বড় নাই, পরের দিনই শিবরাত্রি। যাহা হউক, ঐ শিবরাত্রির দিন দুপুরবেলা হঠাৎ দেখি বাবুরাম মহারাজ একতলার সামনের বারান্দায় একা বসিয়া আছেন। আমি তখন আমার সঙ্গের একটি ছেলেকে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গিয়া আমাদের জয়রামবাটি যাওয়ার অনুমতি চাহিতে বলিলাম। এই ছেলেটি কলেজে পড়িত ও বাবুরাম মহারাজের প্রিয় ছিল। কিন্তু ছেলেটি অনুমতি চাহিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "কি ক'রে অনুমতি দি? মা (রাধুর অসুখের জন্য) এক রকম পাগলের মত হ'য়ে দেশে গেছেন।" ইহা বলিয়াই তিনি এত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন যে, ছেলেটি তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে সাহসী হইল না।

এই সময়ে আমরা একতলার 'ভিজিটরস্ রুমে' অপেক্ষা করিতেছিলাম। খবরটি শুনিয়া আমরা যার-পর নাই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। বাবুরাম মহারাজ তখন সামনের বারান্দায় বসিয়া থাকায়, আমরা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া ভিজিটরস্ রুমের জানালা দিয়া বাহির হইয়া মঠবাড়ীর পশ্চাতের দিক দিয়া স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের পিছনে গিয়া বসিলাম এবং উপায় আলোচনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অল্প পরেই বিশেষ আশ্চর্য হইয়া দেখি বাবুরাম মহারাজ আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি আমাদের কিছু না বলিয়া আমাদেরই পাশ দিয়া ধীরে ধীরে স্বামিজীর সমাধিমন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন তাঁহাকে আমাদের অত্যন্ত গম্ভীর ও উপবাস-ক্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছিল। পরে তিনি ঐ রকম ধীরে ধীরেই ফিরিতে আরম্ভ করিলে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম ও মায়ের বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি এইবার বিনা দ্বিধায় এবং বিশেষ সন্তোষের সহিত অনুমতি দিলেন এবং আমরা কবে ও কোন পথে যাইব জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আমাদের তারকেশ্বরের পথে গিয়া তিথিপূজার দিন জয়রামবাটিতে পৌঁছাইতে বলিলেন। কিন্তু আমাদের আর দেরী সহিতেছিল না। আমরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ দিন রাত্রেই হাওড়ায় গিয়া গাড়ীতে বিষ্ণুপুরের পথে রওনা হইলাম।

ভোরের বেলা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে নামিলাম এবং সেখান হইতে তখনই গরুর গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময়ে কোয়ালপাড়া

আশ্রমে পৌঁছিলাম। সে রাত্রি আমরা সেখানেই কাটাইলাম।

পরদিন আসিল আমাদের জীবনের মহাসুপ্রভাত। আমি ও আমার চারজন সঙ্গী অতি প্রত্যুষে স্নানাদি করিয়া কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতে পায়ে হাঁটিয়া জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল পাতায় মোড়া কিছু ফুল। আমাদের মুখে চোখে শুধু আশা আর আনন্দ।

অল্পপরেই মায়ের জনৈক সেবক সাধুর সাক্ষাৎ মিলিল। তাঁহাকে বলিলাম,—"মাকে বলুন, আমরা দীক্ষা নিতে এসেছি।" তিনি আমাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"মা জিজ্ঞেস করলেন আপনারা স্নান ক'রে এসেছেন কি?" আমরা হাঁ বলায়, সেবকটি আমাদের বাহিরের ঘরখানিতে বসাইয়া আমাদের হাতের ফুলগুলি লইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বুকের পাথর নামিয়া গেল। আমরা সেখানে বসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। বহুদূর হইতে অনেক পথ ও বিস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া মায়ের দুয়ারে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা কেহই মা বা তাঁহার সেবকদের পরিচিত ছিলাম না। আমরা তাঁহাদের কোন সংবাদ দিয়াও আসি নাই। তাই, আনন্দের সহিত ভাবিতে লাগিলাম, 'কি আশ্চর্য! দীক্ষা দিবার পূর্বে মা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে, আমরা কাহারা বা কোথা হইতে আসিয়াছি।' কথাটি বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়নাথ-দাকে বলিলে তিনি হাসিয়া কহিলেন,—"জিজ্ঞেস আবার করবেন কি? ও তো আমরা বেলুড়ে থাক্‌তেই এখানে টেলিগ্রাম এসেছে।" তাঁহার কথার অর্থ এই ছিল যে, প্রেমানন্দ স্বামিজী আমাদের আগমনের বিষয় মাকে সূক্ষ্মভাবে জানাইয়াই আমাদের জয়রামবাটি আসিবার অনুমতি দিয়াছেন। প্রিয়নাথ-দা পল্লীগ্রামের লোক ও ঠাকুরের পুরাতন ভক্ত। তাঁহার অন্তরের সরল ভক্তি-বিশ্বাস তখন তাঁহার মুখ, চোখ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বাহিয়া যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় সেবক মহারাজ আসিয়া বলিলেন,—"আপনারা একজন আমার সঙ্গে আসুন।" দীক্ষাপ্রার্থীদের মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ থাকায় আমিই আগে গেলাম। মায়ের ঘরে গিয়া দেখি, তিনি পূজা শেষ করিয়া আসনে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া পার্শ্বের একখানি আসনে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে আমাকে প্রথমে আচমন করিতে বলিলেন এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি উত্তর দিলে তিনি যথারীতি মন্ত্র দীক্ষা দিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। * * * আমরা মার জন্য কিছুই লইয়া যাই নাই। তাই দীক্ষার সময়ে মা আমার হাতে কিছু দিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন! দীক্ষান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা একটু হাসিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি আমাকে আর একজনকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

এইভাবে মা পর পর আমাদের তিনজনকে কৃপা করিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি চতুর্থ-জনকে আর কিছুতেই দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে ছেলেটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্চর্যের বিষয়, এই ছেলেটির সম্পর্কেই বাবুরাম মহারাজ বেলুড়ে আপত্তি তুলিয়াছিলেন এবং তাহাকে মঠে আনার জন্য আমাদের তিরস্কার করিয়াছিলেন!

ছেলেটির জন্য আমরা সকলেই খুব ব্যথিত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত ছিল না। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলাম এবং অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে, তাহার দীক্ষা পরেও হইতে পারিবে। ঐ সময়ে সেবক সাধু মহারাজ আমাদের বলিলেন, "আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি মা যাহাকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন, মায়ের দৃষ্টি তাহার উপরেই বেশী থাকে।"

দুপুরবেলা আহার করিতে বসিয়া দেখিলাম মা আমাদের দিকে পিছন রাখিয়া পার্শ্বের একখানি চালাঘরে বসিয়া পায়স রাঁধিতেছেন। দীক্ষার সময়ে আমি সঙ্কোচে মায়ের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারি নাই। সে জন্য মনে খুব দুঃখ হইয়াছিল। তাই আহারের সময়ে মাকে নিকটে দেখিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল মা যদি দয়া করিয়া তাঁহার মুখখানি আমাদের দিকে একবার ফিরান তবে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মাথা নীচু করিয়া খাইতে লাগিলাম। তারপর হঠাৎ মাথা উঁচু করিতেই দেখি মা আমাদের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিতেই আমার মাথাটি আপনিই নীচু হইয়া গেল। কিন্তু তাহার পরই আবার মাথা উঁচু করিতেই দেখি মা পূর্বের মত আমাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছেন।

ঐ দিন আমরা জয়রামবাটির আমোদর নদীতে স্নান করিয়াছিলাম এবং মায়ের জন্মস্থান ও প্রসিদ্ধ সিংহবাহিনীর মূর্তি দর্শন করিয়া শেষোক্ত স্থানের মাটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, আমরা বেলুড়মঠের উৎসবের পূর্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া ঐ উৎসব দেখিব। কাজেই আমরা আমাদের দীক্ষার দিনই অপরাহ্নে মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

মা তখন তাঁহার শুইবার ঘরে তক্তাপোশের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বেই অসুস্থ রাধু শুইয়াছিল। আমি মাকে আমার দীক্ষা-সম্বন্ধীয় কোন একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলায়, মা সেবক সাধুটিকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"মা, সাধন-ভজন আর কি করব?" মা উত্তর দেন, "যা ব'লে দিয়েছি তাতেই সব হবে। আর কিছুই ক'রতে হবে না।"

যে ছেলেটিকে মা সকালবেলা দীক্ষা দিতে রাজি হন নাই, সে প্রণাম করিতে গেলে তিনি তাহাকে একটি নাম দিয়া তাহা জপ করিতে উপদেশ দেন। সর্বশেষে প্রিয়নাথ দা যান। তিনি প্রণাম করিয়া ফিরিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি মাকে কি বল্লেন?" প্রিয়নাথ-দা একটি পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আমি মায়ের দুই পা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললাম, মা আমার যেন বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হয়।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাতে মা কি বল্লেন?"

প্রিয়নাথ-দা উত্তর দিলেন—"মা বললেন, তাইই হবে।"

এই অল্প-শিক্ষিত ও স্বল্পভাষী পল্লীবাসী লোকটি এক নিমেষে যাহা করিয়া আসিলেন, তাহা আমি অনেক বেশী সুযোগ পাইয়াও যে করিতে পারি নাই তজ্জন্য মনে একটু দুঃখ হইল। তবে আমি তাঁহার সৌভাগ্যে বিশেষ সুখীও হইয়াছিলাম। কারণ তিনি সমস্ত দিন শুধু আমাদের সৌভাগ্যেই আনন্দিত ছিলেন।

ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার রূপ

অধ্যাপক শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্ত্তী, এম্‌-এ

স্বাধীনতা ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অর্থহীন। মানুষের কাজকর্মে স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী করা হয়। যে কাজে দায়িত্ব নেই তার নৈতিক বিচার চলে না। যে যে-কাজের জন্য দায়ী নয়, সে কাজের ভালো-মন্দ দিয়ে তার বিচার করা চল্‌বে কেন? মানুষ স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারে। কর্মে কর্মীর চরিত্র প্রকাশ পায়। সেজন্যই মানুষের কাজের বিচার করে তার নৈতিক মান নির্ধারণ করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং যে কর্মে স্বাধীনতা নেই, সে কর্ম নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় স্থান পায় না।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা নৈতিক স্বাধীনতা-সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। অদৃষ্টবাদের দেশ বলে কুখ্যাত আমাদের ভারতবর্ষ। ছেলে-বেলা থেকে শুনে এসেছি, পুরুষকার এবং স্বাধীনতার স্থান আমাদের শাস্ত্রে নেই। ভগবদ্‌-গীতায় কর্মফলের মহিমা কীর্তন করে অদৃষ্টবাদের জয়ধ্বনি করা হয়েছে বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। এই অদৃষ্টবাদের দেশে কর্মফলের মহিমা কীর্তনকারী ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তার আলোচনা কৌতুহলো-দ্দীপক হবে সন্দেহ নেই, সাহস করে তাই বর্তমান নিবন্ধ আরম্ভ করা যাচ্ছে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল—নৈতিক স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝবো কি? নৈতিক স্বাধীনতা দু'টি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বাধীনতা বল্‌তে —আত্মার স্বাধীনতা বোঝাতে পারে—আবার মানুষের কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার (Freedom of will) স্বাধীনতাও হতে পারে। যদি স্বাধীনতা বল্‌তে আত্মার স্বাধীনতা বুঝি,—তবে প্রশ্ন হবে —মানুষ কি স্বাধীন? আর যদি স্বাধীনতা বল্‌তে মানুষের কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা বুঝি—তবে প্রশ্ন হবে—মানুষের কর্ম-কৃতি ও চেষ্টায় কি স্বাধীনতা আছে?

পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখি—যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা (Rationalists) সাধারণতঃ নৈতিক স্বাধীনতার প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষবাদী (Empiricists) এবং অপরোক্ষানু-ভূতিবাদী দার্শনিকেরা (Intuitionists)। স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল এবং ইংরেজ হেগেলপন্থী দার্শনিকেরা স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝেছেন—আত্মার স্বাধীনতা। হিউম এবং মিলের মত প্রত্যক্ষ-বাদী দার্শনিকেরা এবং মার্টিনিউ সাহেবের মত অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকেরা স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝেছেন—ব্যক্তির কর্মকৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের কাছে মুখ্য প্রশ্ন—আমরা কি স্বাধীন? প্রত্যক্ষবাদী এবং অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকদের কাছে প্রশ্ন —বিভিন্ন সম্ভাব্যতার (possibility) মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার ক্ষমতা কি মানুষের আছে?

যুক্তিবাদী দার্শনিকপ্রধান কাণ্টের স্বাধীনতা-প্রত্যয় (Concept of freedom) এস্থলে বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার রূপ অনেকাংশে

কাণ্টের স্বাধীনতা-প্রত্যয়সদৃশ। কাণ্ট কার্য-কারণনির্দিষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয়ের বাইরে স্থান নির্দেশ করেছেন মানুষের। কাণ্টের মতে প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুই কার্যকারণ-নিয়মাধীন। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন কারণের কোন স্থান নেই। সমস্ত কার্যই কারণ-নিয়ন্ত্রিত। কার্য কারণ ব্যতিরেকে অসম্ভব, কারণ পুনরায় অন্য কোন কারণনির্দিষ্ট কার্যস্বরূপ। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। মানুষ স্বাধীন কারণ (Free cause); তার কারণত্ব অন্য কারণ-নির্দিষ্ট হ'য়ে কার্যরূপ গ্রহণ করে না। প্রাকৃতিক বস্তু স্বাতিরিক্ত অন্যবস্তু নির্দিষ্ট। মানুষ কিন্তু অন্যবস্তু নির্দিষ্ট নয়; মানুষ স্বয়ং সাধ্য (end in itself)। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই কাণ্টের নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে।

যেহেতু মানুষ স্বাধীন কারণ, সুতরাং সে স্বয়ংসাধ্য; অন্যবস্তু দ্বারা সাধ্য নয়। কাণ্ট তাই নীতিশাস্ত্রের নিয়ম করেছেন—"নিজেকে এবং অন্য মানুষকে স্বয়ংসাধ্য ধরে নিয়ে কাজ করবে—অন্যবস্তু-সাধ্য মনে করে নয়।" (So act as to treat humanity, whether in thine own person or in the person of any other, as an end withal, never as means only).

কাণ্টের বিশ্বাস—সুখাদর্শের (Pleasure principle) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া পরাধীনতার নামান্তর। কাণ্ট পরাধীনতার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন—"If the will seeks the law which is to determine it anywhere else than in the fitness of its maxims to be universal laws of its own dictation, consequently if it goes out of itself and seeks the law in the character of any of its objects, then always results heteronomy." (Metaphysics of Morals, Vide Abbott's Kant's theory of Ethics p59). সুতরাং আমরা বলতে পারি, কাণ্টের মতে যুক্তির নির্দেশ মেনে চলাই একমাত্র স্বাধীনতা। কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করে যাওয়াই কর্মজীবনের আদর্শ। কাজের জন্যই কাজ করতে হবে; কাজেই কাজের সমাপ্তি এবং পরিপূর্তি। এস্থলে কাণ্টের নৈতিক স্বাধীনতার ধারণায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্বে কাণ্ট স্বাতিরিক্ত কোন বস্তু-নির্দেশ ভিন্ন স্ব-অধীনতাকেই নৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছেন। এখন কিন্তু তিনি বলছেন—শুদ্ধ যুক্তির নির্দেশ মেনে চলাই স্বাধীনতা। সর্বপ্রকার অনুভূতির দাসত্বই পরাধীনতা। মানুষের ভেতর যুক্তি এবং অনুভূতি দুইই কাজ করে। অনুভূতির নির্দেশ অমান্য করে যুক্তির অনুগামী হওয়াই নৈতিক স্বাধীনতার মূল কথা। সুতরাং পূর্বে স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার পার্থক্য নির্ভর করছিল—স্বনির্দেশ এবং স্বাতিরিক্ত বস্তু-নির্দেশের উপর;—এখন তা নির্ভর করছে—আমাদের জীবনে ক্রীড়াশীল দু'টি বিশেষ বৃত্তি—যুক্তি এবং অনুভূতির উপর।

কাণ্টের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শেষের মতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানেই আমরা কাণ্টের এবং প্রাচীন যুক্তিবাদী দার্শনিকদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতবাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাই। প্লেটো এবং স্পিনোজার মত যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-মুক্তিই স্বাধীনতা। প্লেটো তাঁর Phaedo নামক গ্রন্থে এই মতবাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—দেহের বন্ধন মুক্তি এবং সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়াসক্তি হ'তে মুক্তিই স্বাধীনতা।

সেজন্যই দার্শনিকেরা মৃত্যুকে ভয় না করে তাকে 'শ্যামসুন্দর' বলে আহ্বান করে থাকেন। তিনি আরও বলেন—দর্শন মানুষকে দেহের বন্ধন-মুক্তির জন্য জ্ঞানে দীক্ষা দিয়ে থাকে। বন্ধন অজ্ঞানতার ফল; সুতরাং মুক্তি জ্ঞানের অনুগামী।

পাশ্চাত্য দার্শনিক স্পিনোজা নৈতিক স্বাধীনতা অনুরূপ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ethica'র চতুর্থখণ্ডে ৫৭নং সূত্রে বলেছেন—"A free man, that is to say, a man who lives all to the dictates of reason alone, is not led by the fear of death" (স্বাধীন মানুষ অর্থাৎ এমন মানুষ যিনি কেবলমাত্র যুক্তির নির্দেশ মেনে চলেন, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন না)।

নীতিশাস্ত্রবিদ্ সিজ্‌উইক্ স্বাধীনতার দু'টি রূপের সন্ধান দিয়েছেন—(১) নির্বিকার স্বাধীনতা (Neutral Freedom) এবং (২) যৌক্তিক স্বাধীনতা (Rational Freedom)। ভালো এবং মন্দ দুই করবার স্বাধীনতাকে বলা যেতে পারে—নির্বিকার স্বাধীনতা। কান্ট স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে দু'টি ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন—তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নির্বিকার স্বাধীনতা। দার্শনিক গ্রীনের মতবাদেও এই প্রকার স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ যখন একমাত্র যুক্তির নির্দেশেই কাজ করে তখন সে মুক্ত—স্বাধীনতার এই ধারণার নাম যৌক্তিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্বন্ধে কান্টের দ্বিতীয় মতবাদ এবং যুক্তিবাদী দার্শনিকদের স্বাধীনতার ধারণা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পাশ্চাত্য দার্শনিকদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা গেল। আশা করি, এই আলোচনার আলোতে ভগবদ্‌গীতার নৈতিক স্বাধীনতার রূপ সহজবোধ্য হবে। ভগবদ্‌গীতায় স্বাধীনতা বল্‌তে যৌক্তিক স্বাধীনতাই ধরা হয়েছে। মানুষ যখন যুক্তির নির্দেশ মেনে চলে তখনই সে স্বাধীন। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগ-বাসনা হ'তে মুক্ত হ'য়ে দৈবী আত্মার (Rational Self) অনুগামী হওয়াই স্বাধীনতা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দুঃখে অক্ষুভিত চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হ'তে মুক্ত ব্যক্তিই স্থিতধী। (২।৫৬)

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যাঁহা হ'তে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোকের নিকট হ'তে উদ্বেগ প্রাপ্ত হ'ন না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হ'তে মুক্ত—তিনিই ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি (১২।১৫)

দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে অনাসক্ত ব্যক্তিকেই ভগবৎপ্রিয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তির আলোচনাতেই মুক্তপুরুষের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। যিনি ভক্তিমান্ এবং স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি নিঃসন্দেহে মুক্ত-পুরুষ। সুখে স্পৃহাহীন, দুঃখে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সর্বব্যাপারে অনাসক্ত ব্যক্তিই মুক্ত। সহজ ভাবে বল্‌তে গেলে যিনি বদ্ধ নন, তিনিই মুক্ত। "অনাসক্তি" গীতার মূল আদর্শ। সমস্ত গীতায় বারবার এই অনাসক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যে পুরুষ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্মম হ'য়ে বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন। (২।৭১)

চতুর্থ অধ্যায়ে পাচ্ছি—

যিনি কর্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করে নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত হ'ন তিনি সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়েও কিছুই করেন না।

যিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হ'ন তাতেই

সন্তুষ্ট হ'ন, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত নন, মাৎসর্যকে দূর করেন এবং কার্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, তিনি কর্ম করেও তাতে বদ্ধ নন। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে লাভ নেই। আমরা বুঝ্তে পেরেছি—ভগবদ্গীতায় অনাসক্তিই স্বাধীনতার স্বরূপ।

পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা নৈতিক স্বাধীনতা বল্তে আত্মার স্বাধীনতা বুঝেছেন। ব্যক্তির কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা তাঁদের মতে স্বাধীনতা পদবাচ্য নয়। ভগবদ্গীতাতেও এই মতবাদেরই প্রকাশ দেখা যায়। গীতায় বার বার বলা হয়েছে—যিনি আত্মবান্ অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনিই মুক্ত।

যে মানব আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তার কোন কর্তব্য কর্ম নাই। (৩।১৭)

বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক, তুমি সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত, নিত্য ধৈর্যশীল, যোগক্ষেমরহিত আত্ম-বান্ হ'য়ে নিষ্কাম হও। (২।৪৫)

আত্মবান্ হ'য়ে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। আবার আত্মবান্ হওয়ার পথে মানুষই বাধাস্বরূপ।

বিবেকবুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে সংসার হ'তে উদ্ধার করবে, আত্মাকে কখনও অধঃপাতিত করবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার রিপু। (৬।৫)

ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনা মানুষের আত্ম-প্রাপ্তিতে বাধা জন্মায়। মানুষ স্বচেষ্টায় অতিক্রমও করতে পারে এই বাধা। সুতরাং আমরা বল্তে পারি, স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ স্বরূপতঃ স্বাধীন। মনুষ্যত্বে বন্ধন নেই, বন্ধন মানুষের। অর্থাৎ মানুষের যা স্বরূপ—তার মনুষ্যত্ব—তা মুক্ত; মানুষের যা বাইরের জিনিস—তার আসক্তি—তাতেই বন্ধন।

এখানে প্রশ্ন উঠ্তে পারে—গীতা যেমন আত্মপ্রাপ্তিতে মানুষের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেম্নি কি মানুষের অধঃপাতে যাওয়ার স্বাধীনতাও স্বীকার করেছেন? অনেকে বলেন, যে স্বাধীনতায় অধঃপাতে যাওয়ার স্বাধীনতা নেই, তা এক-প্রকার পরাধীনতার নামান্তর। পাশ্চাত্ত্য নীতি-শাস্ত্রবিদ্ সিজ্‌উইক্ যাকে নির্বিকার স্বাধীনতা বলেছেন, ভগবদ্গীতায় তারই স্বীকৃতি আছে। ভগবদ্গীতায় এমন স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে—যাতে করে মানুষ ভালও করতে পারে, মন্দও করতে পারে;—আত্মপ্রাপ্তিও হয় আবার অধঃ-পতনও হ'তে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হয়েছে—আত্মাই মানুষের বন্ধু—আত্মাই মানুষের শত্রু। মানুষ এমনভাবে কাজ করতে পারে যাতে আত্মা তার বন্ধু হয়, আবার এমন কাজও করতে পারে যাতে আত্মা তার শত্রু হয়। মানুষ নিজেকে উন্নীতও করতে পারে, অধঃপাতিতও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় পাপের পথ বা পুণ্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। পাপপথাশ্রয়ী মানব নীতি উপদেশে পুণ্য কার্যে ব্রতী হয়। মানুষের যদি এ স্বাধীনতা না থাক্‌তো, তবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'ত। অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে হত-বুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। অর্জুনকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করাই গীতার আসল উদ্দেশ্য। এতেই বোঝা যাচ্ছে—মানুষের স্বেচ্ছায় কাজ করবার স্বাধীনতা আছে। অর্জুন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে পারতেন। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—ও রকম না করে এরকম করাই তোমার উচিত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে—মানুষ উপদেশ প্রভাবে অন্যায় হ'তে ন্যায়পথে অগ্রসর হ'তে পারে। গীতায় সকলের জন্যই মুক্তির ব্যবস্থা আছে। হীন, পতিত, ভণ্ড, পাষণ্ড—কারও চিরকালের জন্য নরক-

ভোগের নির্দেশ নেই। মানুষ চেষ্টা করলেই তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে। অপবিত্রের পক্ষে পবিত্রতা চেষ্টাসাধ্য, অসম্ভব অলীক স্বপ্ন নয়।

মানুষ তার ভাগ্যস্রষ্টা এবং ভগবান নীরব দর্শকমাত্র, এমন কথাও কিন্তু ভগবদ্গীতায় নেই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

অন্তর্যামী ভগবান সর্বজীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করে নিজ শক্তি দ্বারা তাদের পরিচালিত করেন।

এই শ্লোকে কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়নি। বলা হয়েছে—মানুষ নিঃসন্দেহ স্বাধীন, কিন্তু সর্বকর্মনিয়ন্তা ভগবান তার হৃদ্দেশে অবস্থিত আছেন, একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এখানে প্রশ্ন উঠবে—হৃদ্দেশস্থিত ভগবানের কাজ কি? তিনি মানুষের স্বকৃত কর্মানুসারে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে থাকেন। আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে—মানুষের কর্ম যদি তার পূর্বকৃত কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তবে তার স্বাধীনতা কোথায়? এখানে ভুললে চলবে না যে—কর্মের ফল দু'টি—একটি মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্য হচ্ছে—কর্মফল, আর গৌণ হচ্ছে—সংস্কার। কর্মফল কর্মান্তে সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত হয়। একে কেউ রোধ করতে পারে না। সংস্কার আমাদের চিত্তে পূর্বকৃত কর্মের পুনরাবৃত্তির বাসনা জাগ্রত করে। আমরা ইচ্ছা করলে এই বাসনা রোধ করতে পারি। সুতরাং কর্মের সংস্কার ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত কর্মফলে আমাদের কোন হাত নাই। আবার এ কর্মফল আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। সুতরাং এর উপর প্রত্যক্ষ না হোক্ পরোক্ষভাবে আমাদের একেবারেই হাত নেই—একথাও কিন্তু বলা চলে না।

সসীম মানুষ অসীম অনন্ত পুরুষের মত স্বাধীন—একথা গীতার কোথায়ও নাই। মানুষ যদি সর্বব্যাপারেই ভগবৎনির্দেশনিরপেক্ষ স্বাধীন হয়—তবে ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। পাশ্চাত্য দার্শনিক লাইব্‌নিজের মত আমাদের ভগবদ্গীতা এমন অশ্রদ্ধেয় মত পোষণ করেন না। জীব এবং শিব উভয়েই যদি সর্বক্ষম হয়, তবে তাদের পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমরা জানি—জীব পার্থিব জীবাবস্থায় শিব নয়; শিব সর্বক্ষম, জীবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

গীতায় বলা হয়েছে—ভগবান মানুষের হৃদ্দেশে অবস্থিত হ'য়ে তাকে চালিত করেন। সেজন্য মানুষের স্বাধীনতা গীতায় খর্ব করা হয়েছে—এমন কথা বলা চলবে না। সংসারবদ্ধ সসীম জীবের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাকতে পারে না। কারণ, তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা শোভনতা ও শালীনতার সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট। যে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ নয়, সে স্বাধীনতা ভয়ঙ্কর। বর্তমান সভ্যজগতে বিনাসর্তে স্বাধীনতা (Unconditional Freedom) বলতে কিছু নেই। পৌর বিজ্ঞানের মূল নীতি—"নিয়ম শৃঙ্খলা স্বাধীনতার সর্তস্বরূপ" (Law is the Condition of Liberty)। শাসন আছে বলেই স্বাধীনতা আছে। শাসনশূন্য স্বাধীনতা অর্থহীন প্রলাপমাত্র। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় রাষ্ট্র আইন ক'রে স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে। এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাই বর্তমান সভ্যজগতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ। নৈতিক স্বাধীনতার বেলাতেই বা এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আদর্শ হবে না কেন? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নিয়ন্তা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সুন্দর ও শোভন হয়। নৈতিক স্বাধীনতার নিয়ন্তা মানুষের হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ। অন্তর্যামী অন্তর-পুরুষের নির্দেশেই নৈতিক স্বাধীনতা হয় সার্থক এবং পূর্ণ। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নির্ভুল এবং পক্ষ-পাতহীন হওয়া অসম্ভব না হ'লেও অস্বাভাবিক।

দোষত্রুটীলেশশূন্য বিধাতার নির্দেশ নির্দোষ এবং পক্ষপাতহীন হওয়াই একমাত্র সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের নৈতিক স্বাধীনতা অন্তর-পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং সার্থক।

ভগবদ্গীতায় ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত হওয়াকেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা। এ ঈশ্বর স্বর্গরাজ্যবাসী আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য ভয়ঙ্কর ঈশ্বর নন। তিনি আমাদের অন্তর-স্থিত প্রেমময় অন্তরপুরুষ। বাংলার অশিক্ষিত সাধক বাউলেরা এরই নাম দিয়েছেন—'মনের মানুষ'। তিনি জীবের ভিতরে শিব, নরের ভিতরে নারায়ণ এবং নারীর অন্তরে নারীশ্বর-স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ শিবস্বভাব। ভোগ্যবস্তুর বন্ধনে বদ্ধ শিবই জীব। জীব যখন শিবের নির্দেশে চলে—তখন সে মুক্ত; যখন সে তার শিবসত্তা বিস্মৃত হ'য়ে ভোগাসক্ত হয়—তখন সে বদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্ট যখন যুক্তির নির্দেশে চালিত হওয়াকেই মুক্তি বল্‌ছেন—তখন যে তিনি ভিন্ন ভাষায় ভগবদ্গীতার আদর্শই ঘোষণা করছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভগবদ্গীতা যাকে বল্‌ছেন হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ, কাণ্ট তাকে বল্‌ছেন—"যুক্তি", বাউলেরা বল্‌ছেন "মনের মানুষ", মহাত্মা গান্ধী বল্‌ছেন—"শুভবুদ্ধি" আর স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌ছেন—"মানুষের দেবত্ব" (Divinity in man)। যে যে-ভাবেই বলুন না কেন—বক্তব্য তাঁদের এক, পার্থক্য শুধু কথায়। মানুষ যখন তার মনের মানুষটিকে জানে—নিজেকে তাঁর জন্য বিলিয়ে দেয়—তখন সে মুক্ত। সেখানে অন্ধকার নেই, দুঃখ নেই, বিচ্ছেদ নেই—কেবলই স্বাধীনতা, কেবলই শান্তি, কেবলই আলো।

তৃপ্ত জীবন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মান্ যশ, উচ্চপদ, ধনরত্ন মণি
যদি কিছু না জুটে জীবনে
আপনারে হতভাগ্য তবু নাহি গণি
তবু ভালবাসি এ ভুবনে।

দুর্লভ বিধির দান এ ইহজীবন
জীবনই বা ক'দিনের তরে,
সেটুকুর উপভোগে এত আয়োজন?
এত ভার সে জীবন' পরে?

জন্মাবধি নীলাকাশ তারকাখচিত
পূর্ণিমার চারুচন্দ্রালোক,
বনশ্রী পুষ্পিত শ্যাম শোভায় রচিত
আজো মোর জুড়াতেছে চোখ।

মেঘের গম্ভীর মন্দ্র, বিহগের গান
তটিনীর মৃদু কলস্বন।
অলির গুঞ্জন মোর জুড়াতেছে কান,
আজো কেহ নয় পুরাতন।

গাহন গহন নীরে, সুরভি সমীর,
বটচ্ছায়া শীতল মধুর।
স্নিগ্ধস্পর্শে আজো মোর জুড়ায় শরীর
আজো মোর শ্রান্তি করে দূর।

জলধরে, রবিকরে দান বিধাতার
পুষ্পে ফলে রয়েছে সঞ্চিত
অফুরন্ত নিত্য নব বৈচিত্র্য তাহার
এই দানে কে করে বঞ্চিত?

সুলভ বিধির দান দুর্লভ জীবনে
হ্রদনদে মীনের সমান
তার মাঝে আছি আমি, রাশীকৃত ধনে
এর বেশি কি করিবে দান?

নিরুদ্বেগ, উপভোগ তৃপ্তি সুখময়
স্বল্প শ্রমে প্রচুর বিশ্রাম,
অযাচিত মিলে বলি, তুচ্ছ তাহা নয়
জানি আমি কত তার দাম।

নারী

শ্রীমতী উষা দত্ত, বি-এ, কাব্যতীর্থ, ভারতী

নারীর প্রকৃতি এবং জীবন-লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে বহু গবেষণা হয়ে গিয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অনেক মনীষী এবং মনীষিণীদের সুচিন্তিত যুক্তি ও মত সমাজে নারীর যথার্থ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হয়ে আসছে। তবুও কিন্তু নারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুস্থির সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই আমরা করে উঠতে পারি না। বিশ্বের শুভদিন উদিত হয় সমগ্র মানবের শুভ চেষ্টার দ্বারা, তাতে নারীর ব্যষ্টিগত দানও যেমন উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি জাতির দুর্দিনে সমাজের পতনে নারীর কার্যও সমানভাবে দায়ী। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে যেন একটা বিপ্লব চলছে। সমাজগৃহ আপনগৃহ সর্বত্রই দুর্নীতি দুষ্টাচরণে মানব আজ যেন শান্তিহারা, পথহারা। পিতাপুত্র, স্বামীস্ত্রী, ভ্রাতাভগিনী, প্রভুভৃত্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিহিত কর্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশে বিমুখ। একটা দারুণ নৈরাশ্যের অন্ধকার যেন বর্তমান বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। পৃথিবীর এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নারীর ভ্রান্তি, নারীর আত্মবিস্মৃতিও বোধ করি বহুলাংশে দায়ী।

আপাতদৃষ্টিতে নারী, বিশেষ করে ভারতের নারী—হিন্দুনারী জগতের সম্মুখে আপনাকে 'অবলা'-রূপে প্রকটিত করে বহু বন্ধনে আবদ্ধা এবং অপরের ভারস্বরূপ পরিদর্শিতা হয়ে এসেছে অনেক যুগ ধরে। বোঝা হতে গেলেই বাহকের দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয় বহু প্রকারে—এ অতি সত্য কথা। তাই পুরুষের অধীনা হয়ে নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে নানা ভাবে এবং বহুকাল হ'তেই মধ্যযুগের যে নারীচিত্র আমরা দেখি তা' অতিশয় করুণ, বেদনাময়। প্রত্যুষ হতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত রন্ধনশালায় নানা ব্যঞ্জনাবৃতা, অগণিত পুত্রকন্যা-বেষ্টিতা, স্বামীর ভ্রূকুটি-কটাক্ষে সদা-শংকিতা নারীর "অবলা", "দুর্বলা" নামের যথার্থ আলেখ্যই আমাদের মানস চক্ষে প্রতিফলিত হয়। এই অসূর্যম্পশ্যা, স্বামীর প্রভুত্ব খেয়ালতৃপ্তির যন্ত্রী কেবলমাত্র গৃহসীমান্তের জড়ঐশ্বর্যের নিয়ন্ত্রীরূপেই আমরা নারীর অস্তিত্ব অনুভব করি। বহির্জগতের সঙ্গে কোন আদান-প্রদানই নাই তার। পিতার বোঝা, স্বামীর বোঝা, সর্বশেষে পুত্রের বোঝারূপেই তার শেষ পরিণতি। সর্বপ্রকারে পুরুষের সহস্র বন্ধনের দ্বারা বন্দিনী নারী আপন অস্তিত্ব পুরুষের সত্তায় সম্পূর্ণ বিলোপ করে বিশ্বে স্থানহারা হয়ে প্রকাশিতা হয়েছিল।

তারপর শিক্ষার ক্রমবিকাশে মানবমনের সূক্ষ্ম স্তরগুলির হয় উন্মেষ। কালের প্রভাবে শিক্ষা দীক্ষা আচার-নীতি সমাজ-সংস্কার, সবই হয় পরিবর্তিত বা সংস্কৃত। তাই মধ্যযুগের বন্দিনী নারীকে আজ আমরা বর্তমান প্রগতিযুগের স্বাধীন নারীরূপে দেখতে পাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এতকাল পরে এই বর্তমান যুগে নারী কি সত্যই স্বাধীনতা লাভ করলো? সত্যই কি নারীর বক্ষপঞ্জর হতে এতদিনকার পরাধীনতার, দাসত্বের গ্লানি-ব্যথা বিদূরিত হয়ে শান্তির স্বস্তির নিশ্বাস উত্থিত হ'ল? বিজয়ের নাদ ধ্বনিত হ'ল? কিন্তু কই বিজয়িনী নারীর সেই মুক্ত স্বাধীন সত্তার উজ্জ্বল বিকাশ! আপন মহিমায়, আপন সত্তাপ্রতিষ্ঠার সেই গৌরবপূর্ণ দাবী তো আমরা দেখতে পাই না!

বন্ধন হতে মুক্তি পেতে গিয়ে নারী আজ

বহু বন্ধনে আবদ্ধা হয়ে পড়েছে ; কেবল পুরুষের কাছেই তারা আবদ্ধ নয়, নিজেদের কাছেও তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে বহুপ্রকারে। মুক্তির পথে নেমে আজ তারা নিত্যনূতন সাজসজ্জার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রাণহীন ভাবুকতার স্রোতে প্রগতির পথে ভেসে চলেছে। রন্ধনগৃহের মোহ কাটিয়ে অগণিত বিলাসের জড় ভোগের বন্ধনে নারী আপনাদের জড়িয়ে ফেলে তাদের যা ছিল তাও হারিয়েছে। হারিয়েছে তাদের নারীধর্মের প্রধান বৃত্তি সেবা-ধর্ম, তাদের পরার্থপরতা, অন্তর্নিহিত প্রেম, স্নেহ, দয়া, কোমলতা, ক্ষমা প্রভৃতি সুকুমার সম্ভার! হারিয়েছে তাদের লজ্জাশীলতা, তাদের গৌরবময়ী মাতৃত্বের প্রশস্তি! পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত নারীর ভোগের সূক্ষ্মতম বৃত্তিগুলি হয়েছে মার্জিত। আপন ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য আপনাকে প্রগতিপন্থী পুরুষের ভোগের পূর্ণ যোগ্যা করবার জন্য নারীকে যে সকল পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তা নারীর নারীত্ব-প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বর্তমান বাস্তবের কঠিন প্রতিযোগিতার আসরে বিজয়িনী হবার জন্য নারীকে কত ভাবের অভিনয়ই না করতে হয়! আয়ত্ত করতে হয় মনভুলানো দৃষ্টিভংগী, ছেদহীন উদ্দামগতি, প্রাণহীন ভাবুকতা! এই রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, চপল ভাব-বিলাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ঐশ্বর্যের কপটতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—প্রতিযোগিতায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নারী আজ আত্মহারা। মুক্তি কোথায়? স্বাধীনতা কোথায়? কঠিনতম বন্ধনে বদ্ধ নারী! তথাকথিত শিক্ষা নারীর জীবনের দৈনন্দিন অভাব বৃদ্ধি করে তাদের বিশ্রামহীন, শান্তিহীন করে তুলছে। সরল সুন্দর জীবন-যাত্রার পথ আজ বহু বাহ্য আড়ম্বরের আবর্জনায় পূর্ণ। অন্তরের সম্পদকে উপেক্ষা করে নারীর মন আত্মপ্রতিষ্ঠায় বহির্মুখী। আপন স্বাধীন জীবনলাভের জন্য অন্তঃপুর ত্যাগ করে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে আপনার শক্তি নিয়োজিত করে চলেছে বটে, কিন্তু নিত্যনূতন অভাবের দাস হয়ে বাইরের জগতের একটু মুগ্ধদৃষ্টি-প্রসাদের আশায় তাদের কতই না প্রয়াস। নামযশাকাংক্ষা অপরিমেয় স্বার্থসিদ্ধির নিপুণ কৌশল তাদের সংখ্যাতীত সমস্যাজালে আবৃত করেছে। এই প্রগতির বেগে চলতে গিয়ে নারী আজ ক্লান্ত শ্রান্ত, শ্রীহারা, স্নিগ্ধ অভয়প্রদ মাতৃত্বহারা—কেবলমাত্র বাহ্য উপায় দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে নারী আজ পথভ্রষ্টা হয়ে জগতে আপনাদের নিরাপদ শান্তিময় আশ্রয়লাভের ব্যর্থ প্রয়াসে রত।

বর্তমান যুগে তাই আমরা সর্বচেতনাময়ী নারীর বিকাশ তো দেখতে পাই না—দেখি সেই মধ্যযুগের জড়নারীরই একটু সূক্ষ্মপ্রকাশ!

তবে কি নারী সত্যই যুগযুগের ভাবপ্রবাহের দাস? সত্যই কি নারীর ভাগ্যনিয়ন্তা পুরুষ? কখনও "নারী স্বর্গের দ্বার" "নারী নরকের দ্বার" রূপে পুরুষের হাতের পুত্তলিকা হ'য়ে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করছে?

না, তা কখনই নয়। সর্বচেতনাময়ী, সর্বশক্তিময়ী জগন্মাতার অংশ নারী চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন! নারীর স্বরূপ জানতে হলে আমাদের সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি দৃক্‌পাত করতে হবে। পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ অবদান এই মানবজাতি! হিন্দুধর্ম বলে—বহু লক্ষ কোটি জন্মের পর জীবাত্মা মানবদেহ ধারণ করে। ক্ষুদ্র হতে বৃহত্তম সত্তা লাভ—এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতা এ বড়ই বেদনাময়। প্রেমময় ঈশ্বর আপন প্রেমলীলা প্রকটিত করবার জন্য আপন অংশ দিয়ে জীব সৃষ্টি করেছেন। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই স্থির ব্রহ্মের সৃষ্ট বলে, জীবাত্মার সাহজিক গতিও সেই কূটস্থের প্রতি। তাই এই বারংবার গমনাগমন—আপন স্রষ্টা হতে এই বিচ্ছেদ এ জীবের অতি দুঃসহ বেদনা।

পৃথিবীর বুকে জীবাত্মার এই নিরন্তর ক্লেশজনক ভ্রমণ, এই আত্মবিস্মৃতি, এই বিরহ-বেদনা নিরোধ করবার জন্য ঈশ্বর আপন শ্রেষ্ঠাংশ দিয়ে যাকে সৃষ্টি করলেন—সে হ'ল মানবজাতি!

শাস্ত্র বলে, মানবের এই আত্মোদ্ধারের উপায়, আপন স্রষ্টার সাথে চিরমিলনের একমাত্র উপায় কর্মানুষ্ঠান। এই পার্থিব জগতের কর্মের সম্যক অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব আপন আত্মপরিচয়-লাভে সমর্থ হয়।

এই কর্মানুষ্ঠান মানব বহুপ্রকারে বিভিন্ন-রূপে সম্পাদন করতে পারে। পিতারূপে, মাতারূপে, জায়ারূপে। রাজা, প্রজা, যোদ্ধা বহু-রূপেই মানব স্ব স্ব জীবনের কর্তব্য সাধন ক'রে দেহাবদ্ধ আত্মার মুক্তি সাধন করতে পারে। তাহলে নারীরূপেও মানবের সকল কর্তব্য সাধনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল তার আত্মোদ্ধার। এই মায়িক জগতের কন্যারূপে, জায়ারূপে, মাতারূপে, নারী বীরদর্পে আপন উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হতে আবির্ভূতা! নারী কখনও কারো অধীনা বা ভোগ্যবস্তু নয়। পুরুষের মত নারীও আপন কর্তব্যসমূহ প্রকটিত ক'রে আপন সাধনপথে আপনি পূর্ণা, জয়শ্রীমণ্ডিতা! নারী ও পুরুষ সংসারা-শ্রমে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ক'রে আপন আপন মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। এখানে কেউ কারো অধীন বা গলগ্রহ হতে পারে না।

শোনা যায়, সৃষ্টি-পত্তনের প্রথমে পুরুষ সৃষ্ট হয়েছিল আগে; কিন্তু পুরুষ তার সমস্ত কাজে —সর্ব অনুষ্ঠানে অনুভব করতো একটা বিরাট শূন্যতা—অনুভব করতো বিষাদময় ক্লেশ! বহুবিধ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা আপন মুক্তিসাধনের চেষ্টা মানবের হয়তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোতো, যদি প্রেমময় ঈশ্বর আপন প্রেম-পারিজাতের দ্বারা বিশ্ব-সৌন্দর্যের সারভূতারূপে নারীকে না সৃষ্টি করতেন! পুরুষের সকল কর্মের প্রেরণা সকল শক্তির আধাররূপে তাদের কঠোর কর্ম-চক্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে নারীর সৃষ্টি, সে কি কখনও পুরুষের অধীনা হতে পারে? এই নারীশক্তি-বিহনে পুরুষের সকল কর্ম স্তব্ধ হয়ে যেতো। স্বয়ং শংকরই শক্তির পদতলে আপনাকে পতিত ক'রে কর্মপ্রেরণা ভিক্ষা করেছিলেন। আর নারী সেই শক্তি—সেই জগন্মাতারই খণ্ডীকৃত মূর্তি! জাগতিক ভোগে মোহাচ্ছন্ন পুরুষ আপন ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য সেই পবিত্র শক্তির অবমাননা করে আপন মুক্তির পথই রুদ্ধ করে চলেছে। আর নারীও আপন জীবনলাভের উদ্দেশ্য ভুলে অন্তরের শিবশক্তিকে বিস্মৃত হয়ে কন্যারূপে, জায়ারূপে, মাতারূপে পুরুষের দাস হয়ে যুগ যুগ ধরে নির্যাতন ভোগ ক'রে বদ্ধ হতে বদ্ধতর স্তরে উপনীতা হচ্ছে। তাই তো নারী পুরুষের ভোগের বস্তু হয়ে, তাদের কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য আপন অন্তরজাত সম্পদকে উপেক্ষা ক'রে বহুবিধ বাহ্যবিষয়ে আবদ্ধ হয়ে স্বীয় মুক্তির পথ রুদ্ধ করেছে। আপন জীবনোদ্দেশ্য-ভ্রষ্টা মধ্যযুগের বহুবিধ ব্যঞ্জনাবৃতা রন্ধনগৃহের সম্রাজ্ঞী নারীকে আমরা বর্তমান যুগে দেখতে পাই বিবিধ সাজসজ্জায় মগ্না। ছলনাময় বাকপটুতা লাভে চঞ্চলা। অনার্যোচিত স্বেচ্ছাতন্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে আপনাদের প্রকৃষ্ট গতিকে রোধ করে প্রগতির পথে ধাবমানা তাহলে কোথায় নারীর স্বাধীনতা? এই যুগযুগের ভাবপ্রবাহের দাস পুরুষের পেছনে গাধাবোটের মত ধাবমান নারীর এই গতির কী ছেদ নাই? বিরাম নাই?

আছে, নিশ্চয় আছে। বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্যের সার—জগন্মাতার অংশ সর্বশক্তির আধার নারীর জড় আবরণের অভ্যন্তরে তার চেতনাময়ী সত্তা সতত বিরাজমান। নারীকে তার সেই সত্তাকে

জাগ্রত করতে হলে তার জীবনলাভের উদ্দেশ্য আবার স্মরণ করতে হবে। নারীকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে, সে কারো দাস নয়—তার এই মানবজন্ম-লাভ, এই জগৎরূপ নাট্যমঞ্চে কন্যা, ভার্যা, মাতারূপে কর্তব্যসাধন—এ কেবল তারই স্রষ্টার প্রসাদলাভের জন্য—তার দেহাবদ্ধ আত্মার মুক্তি সাধন ক'রে সেই প্রেমময় স্থির সত্তার সঙ্গে চিরমিলনের জন্য! মধ্য-যুগের জড়পুত্তলিকাবৎ বা বর্তমানযুগের বিলাস-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে বিজয়িনী হবার ব্যর্থ প্রয়াসে রত নারীর সকরুণ আলেখ্য তো নারীর প্রকৃত পরিচয় নয়। নারী এই বাহ্যজগতের কারো কৃপা-প্রসাদের ভিখারিণী নয়। কন্যারূপে, জায়ারূপে, মাতারূপে, সেবিকারূপে, সর্বরূপেই নারী স্বাধীনভাবে সগৌরবে পুরুষকে সাহায্য ক'রে আপন মুক্তির পথে অগ্রসর হোক। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাদান দ্বারা নারী সৃষ্ট। বাহ্য সকল প্রকার উপাদানকে উপেক্ষা ক'রে নারী তার অন্তরজাত সেইসকল—প্রেম, দয়া, ক্ষমা, তেজস্বিতা, মাতৃত্বের প্রশস্তি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির অনুশীলন দ্বারা আপন স্বাধীন সত্তার জাগরণ সাধন ক'রে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভে সমর্থা! নারী তার প্রতিটি কাজে জগতকে বুঝিয়ে দেবে তারা জড়পুত্তলিকাবৎ পুরুষের ভাবের দাস নয়। তারা তাদেরই মতো একই স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, একই মহান উদ্দেশ্যে প্রেরিত —আপন কর্তব্যসাধনে রত মহিমান্বিত স্বাধীন কর্মী! আপনাতে আপনি মগ্না, পূর্ণা সে।

এইরূপে সরল সুকুমার হৃদয়জাত সৌন্দর্যের অনুশীলন দ্বারা আপন আভ্যন্তরিক চিরমুক্ত সত্তার উন্মেষ সাধনপূর্বক স্বাধীনতালাভে অগ্রসর হতে হবে নারীকে। তার বহির্মুখী সর্বকার্যের মধ্যে সর্বদা তাকে চিন্তা করতে হবে তার জীবন-ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা, পাশ্চাত্যভাবের পরিবেশের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে তাকে তাদের গৌরবময় প্রাচীন ও বৈদিক-যুগের নারীচিত্রের প্রতি। বৈদিক যুগের বেদমন্ত্ররচয়িতা জ্ঞানজ্যোতি-বিভাসিতা লোপা-মুদ্রা, যমী, শ্রদ্ধা, বাক্, অপালা, শাশ্বতী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রকেই তাদের সশ্রদ্ধায় বরণ করে নিতে হবে। বালব্রহ্মচারিণী সুলভার মত, মহীয়সী গার্গীর মত তাদের পুরুষের সাথে ধর্মব্যাখ্যানে শাস্ত্রবিচারে অবতীর্ণ হতে হবে। বলতে হবে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত উদাত্ত ওজস্বিনী ভাষায় "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"। এই হল নারীর মুক্তিলাভের—শাশ্বত আনন্দলাভের একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

পওয়ালী

স্বামী সুত্রানন্দ

এমন এক দিন ছিল—যখন হিমালয়ের উত্তরা-খণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাওয়া সর্বত্যাগী সাধুসন্ত ছাড়া অপরের কাছে খুবই ভয়ানক ব্যাপার বলে মনে হত। রাস্তায় চলা, খাওয়া, থাকা প্রভৃতি তখন ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু আজকাল আর সেদিন নেই। অনেক পথেই মোটর চলে, তাছাড়া দোকান-হাট আছে, জলের কল আছে,

ডাক্তারখানা আছে। ডাকখানা, কেতাবখানাও রয়েছে!

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথ অবশ্য এখনও বেশ দুর্গম। কোন কোন স্থানে রাস্তাই নেই—ভেঙ্গে গিয়েছে। পাথর বেয়ে উঠতে হয়—হামাগুড়ি দিয়ে নামতে হয়। তার প্রধান কারণ হল, এ দিকটা ছিল স্বাধীন গাড়োয়াল—টিহ্‌রী রাজার অধীন। তাই আর পাঁচ দশটা দেশীয় রাজ্যের মত এটাও পিছিয়ে আছে অনেক। কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ ছিল বৃটিশ গাড়োয়াল, কাজেই বিংশ শতাব্দীর ডাক ওদিকে পৌঁছেছে অনেকটা আগেই। বর্তমানে সবটাই উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সর্বত্রই সর্ববিষয়ে সুব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

দুর্গম—কষ্টকর হ'লেও এ গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পঁচিশ দিনের ভ্রমণ আমাদের খুবই উপভোগ্য ছিল। দুটি রাস্তারই দৃশ্যাবলী অতি চমৎকার। সকল পাহাড়ই ঘন বনে আবৃত। কেবল গাছ আর গাছ—গাছের মেলা। কেদার-বদ্রির রাস্তার মত রুক্ষ, নেড়া বা টাক্‌পড়া পাহাড় এ অঞ্চলে নেই। তাছাড়া এদিকে প্রচুর ফল পাওয়া যায়—যেমন আখরোট, আলুবখরা, আপেল, বাদাম ও পিচ্‌ ইত্যাদি।

হিমালয়ের এ চারটি বিখ্যাত তীর্থস্থান—কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীকে 'চারধাম' বলে। উত্তরাখণ্ডের এই 'চারধাম' বৎসরে ছয় মাস খোলা থাকে—অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপান্বিতা পর্যন্ত। তবে তার কিছু এদিক সেদিক যে না হয়, এমন নয়। এ-ছ'মাসের মধ্যে চার মাসই—বৈশাখ থেকে শ্রাবণ—যাত্রী সমাগম হয়। অন্য সময় অত্যধিক বৃষ্টিতে পাহাড়ের ধস নেমে রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। শীতের ছ'মাস বরফে রাস্তা একেবারেই অগম্য থাকে। তখন চার ধামের চলন্তমূর্তি নীচে পূজা-অর্চনা করা হয়। যমুনার পূজা হয় জানকীচটির নিকটস্থ গ্রামে, গঙ্গার পূজা হয়—মুখিমঠে, কেদারনাথের—উখিমঠে ও বদ্রিনাথের—জ্যোশীমঠে। হৃষীকেশ থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে যথাক্রমে ১৪৩ ও ১৮৩ মাইল দূরবর্তী স্থানে সুপ্রসিদ্ধ কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ পুরী অবস্থিত। অনেকটুকু পথ, প্রায় শতেক মাইল একই রাস্তায় গিয়ে, পরে দুদিকে দুধামে যেতে হয়। এবং হৃষীকেশ থেকে সোজা উত্তর দিকে যথাক্রমে ১৩০ ও ১৫৮ মাইল দূরে অবস্থিত যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী। এদিকেও প্রায় ৮২ মাইল একই রাস্তায় যেতে হয়। তাই যাত্রীরা এক বৎসরে কেদার-বদ্রি ও অন্য বৎসরে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শন করে থাকেন। এক বৎসরে 'চারধাম' ঘুরে আসা সময়সাপেক্ষ তো বটেই, তাছাড়া পরিশ্রমও হয় অত্যধিক। মোটর ছাড়া শুধু হাঁটাপথই ৪৫০ মাইল। মোটরে যাতায়াত করা যায় ২১৪ মাইল। একই বৎসরে যারা 'চারধাম' করবার দুঃসাহস করেন—তাদের পক্ষে দুধাম করে হৃষীকেশে নেমে এসে আবার ওঠা সেও সম্ভব নয়, কারণ দুবার চড়াইয়ের পরিশ্রম করতে হয় এবং সময়ও লাগে দ্বিগুণ। দুধাম করে অন্য দুধামে যেতে পাহাড়ের উপর দিয়েই একটি রাস্তা আছে। কিন্তু তা ভয়ানক বিপজ্জনক—যেমন চড়াই, তেমনি তুষারাবৃত এবং তেমনি নির্জন। অর্থাৎ পথিকের যাত্রাপথের যাবতীয় অন্তরায়ের সমন্বয় ঘটেছে ওখানে। এ পথের উঁচু পাহাড়টির নাম পওয়ালী। 'চারধাম' যারা একসঙ্গে করেন তারা খারাপ রাস্তাই—অর্থাৎ গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর রাস্তাই আগে ধরে চলেন।

হৃষীকেশ-এ যেদিন চারধামের কুলি করলাম, সেদিন থেকে শুনছি—"পওয়ালীকা চড়াই আউর কাবুলকা লড়াই"। হয়ত কাবুলের যুদ্ধে গাড়োয়ালী সৈন্যেরা মার খেয়েছিল অধিক তাই এ বাক্যটা ডাকে

পরিণত হয়েছে। যাক্‌গে, এ পাহাড় অতিক্রম না করা পর্যন্ত দীর্ঘ এক মাসের মধ্যে এমন দিন অল্পই বাদ গিয়েছে যেদিন পওয়ালীর ভীতিপ্রদ দু'একটি কথা কর্ণগোচর না হয়েছে।

হৃষীকেশে মোটর ধরে গেলাম গাড়োয়ালের রাজধানী টিহ্‌রী। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী দর্শন করে, একই পথে চল্লিশ মাইল নীচে নেমে এসেছি ভাটোয়ারী চটিতে। এটি একটি বড় চটি। দোকান, ধর্মশালা, ডাক-বাংলা, ডাকঘর, স্কুল, শিবমন্দির ইত্যাদি এখানে আছে। এ পর্যন্ত আমরা পায়দলে ২১৫ মাইল চলেছি। এখান থেকে মাইল দেড় এগিয়ে, মানে নীচে নেমে এলাম মল্লা চটিতে। এর পরেই পড়লাম প্রখ্যাত সে পওয়ালীর নূতন রাস্তায়। প্রথমেই লোকালয়বিহীন গহন বন। এত ঘন বৃক্ষরাজি যে অনেক স্থানেই সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ। উপরে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা—নীচে ঘুমন্ত ছায়া। ক্বচিৎ কোথাও বা এক দু'টা ঝরণা বা নিঝরিণী কলহাস্যে প্রবাহিত। আর সে তানে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে কত রকমারি মধুরকণ্ঠ পাখী। আমরা দশ মাইল চড়াই ভেঙ্গে অতিকষ্টে ছুনা নামক পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি চটিতে আশ্রয় নিলাম। তখন বেলা প্রায় দুটা। চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর একটি গাছ যদি জন্ম নেয় তাহলে তাকে অনশন করে মরতে হবে। দুপুরের বেলা, নিঝুম···নিঃস্তব্ধ। দু'একটা ঝিঁ ঝিঁর ডাক—সে একটানা ডাকে নীরবতাটাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এ-হেন গহন বন-পথে সকলেই এক বেলা চলেন। তাই আমরা রাত্রিবাস ওখানেই করলাম।

পরদিন ভোরে রওণা হলাম। তখনও অন্ধকার কাটেনি। আজও পূর্বদিনের মত কেবল চড়াই। রাস্তায় পাতা পড়ে আধ হাত উঁচু গদির মত হয়ে আছে। পাঁচ মাইল উঠে পেলাম পাহাড়ের চূড়ায় বেলকচটি। ইহা ৯৭৩০ ফুট উঁচু। ওখানে রুটি দুধ খেয়ে আবার চার মাইল উৎরাই করে এলাম "পৎরানায়"; দোকানদার দু'একদিন হল চটির পত্তন করেছে। বেশ লেপা পোঁচা পরিষ্কার এ ঘরগুলি লতাপাতা দিয়ে যা তৈরী করেছে কোনপ্রকারে এক রাত্রি কাটিয়ে দেখা যায়। কিন্তু মুস্কিল করেছে, এ হিমের আলয়ে একটা দিক রেখে দিয়েছে একেবারেই ফাঁকা। উৎরাইয়ের মুখে চটির অবস্থানটি বেশ সুন্দর। খোলা জায়গা—সম্মুখের মাঠে নলকূপের মত একটি ক্ষীণকায়া ঝরনা। আর তার পদতল বিধৌত করে যাচ্ছে পুণ্যতোয়া নদী ধর্মগঙ্গা। তার নিরবচ্ছিন্ন সুমধুর তান যেন সামগান। ঐ চটিতে সেদিন আমরা খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। চটিতে মোষ এনেছিল অনেক—খাঁটি দুধ, দৈ, ঘি কিছুরই অভাব ছিল না।

পরদিন আরো দশ মাইল উৎরিয়ে "বোড়-কেদার"। ধর্মগঙ্গা ও বালগঙ্গার সঙ্গমস্থল—এই স্থানটি অতি মনোহর। নীচু জায়গা, ৫০০০ ফিট। চারদিকে গ্রাম, চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বানিজ্য বেশ চলছে। এখানে প্রাচীন শিবদুর্গার মন্দির বিখ্যাত। দোকান, চটি, ধর্মশালা, এখানে প্রচুর। গ্রামের দক্ষিণে ভৃগুপাহাড় ও পূর্বে স্বর্গারোহিণী পাহাড় দণ্ডায়মান। বোড়কেদার—শিলামূর্তি—পাহাড়াকৃতি। তাঁর গায় এগারটি চিত্র অঙ্কিত। শিব, দুর্গা, গণেশ, নারায়ণ, ভৈরব, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী। লোকে বলে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণের পথে শিব-সন্দর্শন মানসে এখানে এসেছিলেন।

বোড়কেদার থেকে তার পরদিন গেলাম ভট্ট-চটীতে। এদিকে লোকালয় আছে, তাই দোকানও পাওয়া যায়। পরবর্তী চটির নাম ভৈরব চটী। প্রকাণ্ড একটি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠের মধ্যে মন্দির অবস্থিত। এভাবে চারধামের পথেই চার জন ভৈরব আছেন। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর। পাণ্ডাজী অনেক গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার

পারমর্থ হল—একজন ইংরেজ সেনাপতি সদলবলে একবার এ পথে যাচ্ছিলেন। গোরাদের অনাচারে ও মন্দিরে অশ্রদ্ধ ব্যবহারে দেবতা রুষ্ট হন এবং অনেক সাহেব নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। সেই দলে যে সৈন্য সামন্ত ছিল, তাদের প্রায় সকলেই মৃত্যুর মুখে না পড়লেও একেবারে মরণাপন্ন হয়ে যায়। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত সাহেব তাম্রপাতে গড়া বাবার মন্দির ও পূজা ভোগ দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। সেই সেনাপতির স্বহস্তে লিখিত বর্ণনা প্রমাণ-পত্র হিসাবে এখনও আছে। পাণ্ডাজীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সময় সাপেক্ষ বলে আমরা তা দেখতে রাজি হইনি। তারপর আমরা মৌঠ, যুতু ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রায়পুরে এসে রাত্রিবাস করলাম। রায়পুর হ'ল বিখ্যাত পওয়ালী পাহাড়েরই অংশবিশেষ। আরো নয়টি মাইল উঠতে পারলে পাওয়ালী চটীতে পৌছুব।

পরদিন অন্ধকার যেতে না যেতেই আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম, পওয়ালী জয়ের আশায়। যেমনি ভয় তেমনি আনন্দ, "টেরিব্‌ল্ বিউটিফুল।" একটি শিখায় উঠেছি—দেখছি পশ্চাতে ফেলে আসা কত দূরদূরান্তরের বনানী, তরুলতা, গ্রাম, পাহাড়, নদী, নালা। একদৃষ্টে দৃশ্যমান সে চিত্র অতি মনোরম। কিন্তু সম্মুখে তাকাতেই দেখি আর একটি অধিক উঁচু চূড়া দণ্ডায়মান। যেন আক্রমণোদ্যত শত্রুর সম্মুখীন বিরাটকায় আফ্‌গান শান্ত্রী। কিছুতেই সে রাস্তা ছাড়বে না। আমরা বুক বেঁধে যখন তারও মাথা দলিত করলাম—তখন হতভম্ব। দেখি কি না, ততোধিক উঁচু আর একটি সম্মুখে। কেবল এখানেই শেষ নয়, এরূপ ভাবে পর পর আরো তিনটি পর্বতারোহণ করে যখন দেখলাম যে আর শেষ নেই, তখনও সুমুখে আর একটি—একটু বিচলিত হয়ে গেলাম। শৌর্য বীর্য আগেই শেষ। এখন শুধু আপোষ করে চলা। বুঝলাম, হাঁ সত্যিই "কাবুলকা লড়াই—পাওয়ালীকা চড়াই"। কি জন্য যে এ রাস্তা সম্বন্ধে এত ভীতিপ্রদ জনরব তা বুঝতে আর বাকী নেই। কি করা যায়? এসেছি যখন, যেতেই হবে। নিরুৎসাহ-ভাঙ্গামন ও ক্লান্ত দেহকে কোন প্রকারে টেনে সম্মুখ-শিখরে উঠালাম। দেখি অনন্ত বিস্তৃত আকাশ—সামনে আর পাহাড় নেই। দিগন্তে শুভ্র হিমগিরি ও মেঘ এক হয়ে আছে। প্রকৃতি তার শোভা এখানে দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিচিত্র সৌন্দর্যের অবাধ আনন্দ। দিকে দিকে অপূর্ব শ্রী উদ্ভাসিতা হয়ে উঠল। সমস্ত দুঃখের, সমস্ত ব্যথার যেন অবসান হয়ে গেল। কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! হাতে স্বর্গলাভ। সবই মধুময়—বায়ু মধুময়, নদী-সকল মধুময়, ওষধিসকল মধুময়, রাত্রি ও ঊষা মধুময়, পৃথিবীর ধূলি মধুময়, দ্যৌরূপী পিতা মধুময়, বনস্পতি মধুময়, সূর্য মধুময় এবং গোসকল মধুময়। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

ঐ পাহাড়ের সানুদেশে তিন চারিটি ছোট মাঠ আছে। একটি সম্পূর্ণ বরফাবৃত। অতি সাবধানে রাস্তা নির্ণয় করে পদক্ষেপ করতে হয়। উচ্চতা ১১০০০ ফুট। এখান থেকে চির হিমগিরির যে মনোরম রূপ দৃষ্ট হয় তা অতুলনীয়। গাছপালা কিছুই নেই। চারদিকে কেবল ঢেউখেলান স্ফটিকের পাহাড়। মাঝে মাঝে চূড়াগুলি যেন ধারাল তীক্ষ্ণ ফলকের ন্যায় চক্ চক্ করছে সূর্যকিরণে। নীচে কোথাও বা অল্পবিস্তর ঘাস আছে। যেখানে বরফ নেই, গলে গিয়েছে—সেথায় লাফিয়ে উঠেছে ফুল। গাছ পরে বেরুচ্ছে। কত রঙবেরঙের ফুল! যেন গালিচা বিছান। শুনেছি শ্রাবণ মাসে ফুলের আধিক্য আরো বেশী। তখন ব্রহ্মকমল নামে একপ্রকার পদ্ম ফোটে—অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। শুভ্রবর্ণ, আকার মেগ্নোলিয়া গ্রেণ্ডি-ফ্লাওয়ারের মত। সে সময় ফুলের গন্ধে অনেক যাত্রী নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। আমরা যতটা আভাস পেয়েছি তাতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ নেই। সেদিন পাহাড়ের শীর্ষদেশেই রাত্রিবাস করলাম। পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের যে দৃশ্য দেখলাম, তা কখনও ভুলতে পারব না—চিরকালের জন্য সে মনের কোণে স্থান দখল করে নিয়েছে।

কবীর বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

('সতগুরু সোঈ দয়া কর দীনহা'—বাণীর অনুবাদ)

অজানা যিনি চিনেছি তাঁরে
পেয়েছি পরিচয়,
এ কেবলই দয়াল গুরুর
করুণা মনে হয়।
চরণ বিনা চলিতে আমি
শিখেছি তাঁর কাছে,
পক্ষবিহীন যদিও আমি
উড়েছি গাছে গাছে।
নয়ন বিনা দেখেছি আমি
শুনেছি বিনা কানে,
বদন বিনা আহার করি
হয়েছি সুখী প্রাণে!
চন্দ্র সূর্য দিবস রাতি
সেথায় নাহি রহে,

যেথায় মোর ভক্তি-ধ্যানের
সদাই স্রোত বহে!
অন্ন বিনা অমৃত-রসে
আমার প্রাণ ভরে,
সলিল বিনা সদাই দেখি
আমার তৃষা হরে।
পুলক রাজে পরম রসে
পূর্ণরূপে যথা,—
কাহারে কহি মর্ম ইহার
কে বুঝিবে কথা!
কবীর কহে সত্য গুরু
তাঁহারে বলিহারি,
ধন্য হল শিষ্য, তাহার
জীবন মনোহারী!

বাংলার সংস্কৃতি ও প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যায় যে, বাংলার শিবশক্তিবাদ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। বেদের রুদ্র আর বাংলার শিব যে এক নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শিব ছিলেন বাঙালী দ্রাবিড়দের দেবতা। বৌদ্ধযুগে বজ্রযানের সঙ্গে শিববাদ একভাবে মিলেমিশে রয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম বাংলার তান্ত্রিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। বৌদ্ধের ধর্মমূর্তি বাংলার বহুস্থানে আজও শিবরূপে পূজা পাচ্ছেন। শাক্তদর্শন ও তান্ত্রিকতার জন্য বাংলাদেশেই দুই এক জন

বিদেশীয় পণ্ডিত (প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ উইনটারনিজ্) এই মতের পক্ষপাতী। বাংলার শাক্তদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের তান্ত্রিকতার খানিকটা প্রভেদ আছে। প্রভাস, মালাবার, অন্ধ্র-কোচিন প্রভৃতি নানা স্থানে তন্ত্রের নানা রূপ দেখা যায়। বাংলার বহু তন্ত্রাচার্য বাংলার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, প্রমাণ আছে। বাংলায় শাক্তদর্শনের রূপ কি, তা প্রাকৃত-জনের ধর্মাচরণের মধ্যেই দেখা যায়। শক্তি চিন্ময়ী মূর্তি ত্যাগ করে মানবীয়রূপে ঘরে ঘরে বিরাজমানা। বাঙালী শাক্ত তার দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেম-সম্বন্ধে যুক্ত। সে প্রেম মানবীয় স্তরে নেমে এসেছে। আগমনী ও বিজয়া গানে তা পরিস্ফুট। শাক্তভক্তেরা মাতারূপে কন্যারূপে শক্তিকে অভিনন্দন করেছেন। বাংলার প্রাকৃতজনের ধর্মও এই ভাবধারায় প্রভাবান্বিত। ভক্ত রামপ্রসাদ, রামলোচন, কমলাকান্ত প্রভৃতি শাক্তভক্তদের মাতৃ-বন্দনার গানে যে মানবীয়তা ফুটে উঠেছে পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন বিশেষভাবে। বাউলদের মধ্যে ভগবানকে যেমন মানবীয়ভাবে দেখা হয়েছে, বাংলার শাক্তভক্ত চিন্ময়ী মাকে মানবীয় সম্বন্ধের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই তান্ত্রিকতাই আনন্দ-মঠে মাতৃবন্দনার গানে দেশজননীরূপে পরিস্ফুট। মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাঙালীর ছেলে দেশজননীর জন্য যেভাবে আত্মাহুতি দিয়েছে, অন্যান্য প্রদেশে ঠিক এই ভাবটি আর দেখা যায় নি।

বাংলার বৈষ্ণবতাও অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণবতা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। রামানুজ মাধ্ব ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বাংলাদেশে আছেন, কিন্তু আধুনিক কালে বাংলার বৈষ্ণবতা বলতে মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মকেই আমরা বুঝি। শ্রীক্ষিতি-মোহন সেন বলেন যে, বাংলার বৈষ্ণবধর্ম অতি পুরাতন। পাহাড়পুরে বৈষ্ণবধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরানো অর্থাৎ এইসব মত থেকে প্রাচীনতর। তাতে বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলাই বেশী চিত্রিত। যা হোক মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্য বৃন্দাবনলীলা তার আপন জিনিস। মাধ্বাচার্য, নিম্বার্ক ও রামানুজের ভালো ভালো কথা মহা-প্রভু ও বৈষ্ণবাচার্যেরা গ্রহণ করেছেন, তবু একথা না বলে উপায় নেই যে, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতা বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণবভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশের নিজস্ব। বাংলার বাইরে অন্য কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধাঁচে তাকে ফেলা যায় না। যে মরমীবাদ ও মানবতাবাদের ধারা নানা সাধনার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত মহাপ্রভুর মধ্যে সেই ধারার স্বরূপ দেখতে পাই। সেইজন্য বাংলার বাউলেরা তাকে আপনজন বলে মেনে নিয়েছেন। জয়দেব-চণ্ডীদাস-কৃত কৃষ্ণলীলার কীর্তন মাধ্ব ও অন্যান্য সম্প্রদায়-বিরোধী, কিন্তু মহাপ্রভুর তাই উপজীব্য। মাধ্ব-মতে বর্ণভেদ আছে, মহাপ্রভুর মতে মানুষ সবই সমান, কৃষ্ণভক্তিতে সকলের সমান অধিকার। মহাপ্রভুর মতে 'রাগানুগা' ভক্তিই আসল। প্রেমই মান্য। ভগবানের সর্বোত্তম স্বরূপ মানবস্বরূপ। 'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা'। বাংলার বাউলদের সঙ্গে এই বিষয়ে মহাপ্রভুর যথেষ্ট মিল আছে। বাউল সাধক বলেন, 'মানুষই সারতত্ত্ব'—'আদ্য অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই'। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলী স্মরণীয়—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই',—এই মানবতা বা মানবতত্ত্বই বাংলার খাঁটি বৈষ্ণবধর্ম বা বাউলদের সাধনা বা তান্ত্রিকতার মর্মবাদ। এই তত্ত্বই বাংলার প্রাণধর্ম।

বাংলার প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য :

এ কথা সত্য যে, ভারতীয় আর্যদর্শনই মানব-

সত্য আবিষ্কার করেছে। দর্শন ও ধর্মে তাই এখানে ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। দর্শনের দ্রষ্টাই ভারতীয় ঋষি, যিনি সৃষ্টির অন্তস্থলে প্রবেশ করেছেন—সর্বজ্ঞ হয়েছেন। বৈদিক ঋষিরা প্রথম দিকে এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে সার্থকতা খুঁজেছেন—অথর্ববেদে দেখি মানুষ ও পৃথিবীর দিকে সকলে শ্রদ্ধার চোখে তাকালেন—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদুঃ।
তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্॥

অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখ্‌লো, সে ঠিক জায়গাটিতেই তাঁকেই সংস্থিত দেখলো। তারপর বেদান্তদর্শনে এই মানব-সত্যেরই জয়গান। বৃহদারণ্যক ঘোষণা করলেন—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। অথর্ববেদ বল্লেন—ঋক যজু সাম, সবই এই মানুষের মধ্যে—ভূত ভবিষ্যৎ সর্বলোক সর্বকাল সবই এক মানুষে—(অথর্ব ১০ম কাণ্ড)। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় এই মানব-সত্যের কথাই প্রচার করেছেন। মানবসত্যই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। 'মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না, করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈশ্বরের কল্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতঃই আলোকরূপেই অনুভব করে, আলোকরূপে ব্যবহার করে, ক'রে ফল পায়। এও তেমনি।' বাংলাদেশে বেদান্তের এই মানবসত্য-প্রচারের আগেও বাংলার নিজস্ব জীবন-দর্শনের মধ্যে মানববাদ দেখতে পাওয়া যায়। নাথযোগ, মহাযান বৌদ্ধমত ও জৈন মরমীবাদ যা বাংলার মাটির রসে জারিত হয়ে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছিল, এই সব মতবাদ বেদবিরোধী হলেও মানুষকে বিশিষ্ট শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। এই ধর্মমতগুলির প্রাণবস্তুই বাংলার সাধনাকে পুষ্ট করে এসেছে—এ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বাউল ও সহজিয়া ভাব—যার আসল কথাই হচ্ছে মানুষ, এই মানুষের মধ্যেই সব :

'জীবে জীবে চাইয়া দেখি
সবই যে তার অবতার।
ও তুই নতুন লীলা কী দেখাবি
যার নিত্যলীলা চমৎকার।'

'আমার আঁখি হতে পয়দা
আসমান আর জমীন।'

বাংলার গম্ভীরা গাজন ও নীলের গানে শিব-পার্বতীর মানবলীলাই পরিস্ফুট। শিবপার্বতী আমাদের ঘরের মানুষের মত আপনজন হয়ে আছেন। পার্বতী প্রাকৃত জনের মত বাগদিনী সেজে মাছ ধরেছেন, শিব কৃষক সেজে চাষ আবাদ করেছেন। বাংলার শিব যোগীশ্বর শিব নহেন, তিনি আমাদের ঘরের মানুষ। কন্যারূপে, মাতা-রূপে গৌরী আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমানা। বাঙালী হৃদয়ের এ নিজস্ব সৃষ্টি।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি—এ কথা পূর্বেই বলেছি। দেবতাকে প্রিয় ও প্রিয়কে দেবতা করার সাধনাই বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা। এই প্রেমের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের সমস্যা মিটে গেছে। 'দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।' বাউলরাও বলেন, 'প্রেমে দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ ঘুচেছে।' বৈষ্ণবেরাও বলেন—জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তির নহে কভু অঙ্গ (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)। প্রেমের কাছে জ্ঞান বৈরাগ্য তুচ্ছ। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে উপাস্য উপাসক ভিন্ন। উপাস্য বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর ত্রিভুবনের অধিপতি—সকল দেবতা অপেক্ষা তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এই ধারণার বশেই স্বয়ং রামানুজ দক্ষিণ ভারতের বহু শিব মন্দির থেকে শিব-বিগ্রহ উৎখাত করে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—দক্ষিণ ভারতে শৈব-বৈষ্ণব বিরোধ তাই অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু বাংলাদেশে সকল ধর্ম সকল সত্য পাশাপাশি

অবিরোধী চলেছে। ষোড়শ শতকে প্রবল বন্যাবেগের মত বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়, কিন্তু কাউকে সে আঘাত করে নি। মহাপ্রভুর নিজ জীবন এই ভাবেরই লীলা। মহাপ্রভু নিজে জ্ঞানী ও নৈয়ায়িক ছিলেন, কিন্তু প্রেমের তিনি মূর্তবিগ্রহ। বাউলরাও তাই তাঁকে আদিগুরু বলেছেন। এই প্রেমলীলার আর একটি বিশেষত্ব তার ঐশ্বর্য। রাজরাজেশ্বর যখন সামান্যা রমণীর সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হন, তখন সে অসামান্যা। মহাপ্রভু তাই বলেছেন—'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত'। প্রেমে ভক্ত ভগবানে ভেদ নেই, উপাস্য উপাসক ব্যবধানও লুপ্ত।

মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্ম বাংলা পেরিয়ে পুরী, গয়া, বৃন্দাবন, জয়পুর এবং আরও পশ্চিমে প্রসারিত হল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে সারা ভারতের বুকে এক গৌরবময় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার কীর্তন ও বৈষ্ণব-সাহিত্যও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করল। ধর্ম-সংস্কৃতির এইরূপ প্রাণময় আন্দোলন বাংলাদেশে আর কখনো হয় নি। ষোড়শ শতকের বাংলার সেই প্রাণময়তা ও মানবতার ধারা আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে যে কতভাবে পুষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা হয় না।

পূর্বেই বলেছি বাংলার মুসলমান মনে প্রাণে বাঙালী থাকায় সংস্কৃতিগত কোন বিরোধ দেখা দেয় নি। সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি সেকালে মক্কার দিকে ছিল না। বাংলাই ছিল তার মক্কা-মদিনা। অতি আধুনিক কালেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতিগত ভেদবুদ্ধি নানাভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, নইলে সহজ বাঙালীত্বের দাবীতে বাঙালীর ছেলে বলে বাঙালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপরও তার সহজ অধিকার। এই বোধটুকু তার নষ্ট হয়েছে সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে। নাহলে সুফীমতের উদারতা ও মর্মবাদ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একটা আপোষ রক্ষা ক'রে পাশাপাশি চলে এসেছে।

বাঙালীমনের এই ভাবধারা কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? উনবিংশ শতক থেকে সুরু করে যে ইউরোপীয় ভাববন্যা বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গেল তাতে বাংলার সংহত জীবনযাত্রাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করতে পারে নি। মরমী বাঙালী, ভাবুক বাঙালী এক নতুন আলোর সংঘাতে চমকিত হল। নব নাগরিক সভ্যতার আঘাতে ভেঙে গেল তার পল্লীপ্রাণতা, টুটে গেল তার মনোময় জগৎ। এক কথায় তার জীবনের মর্মমূলে নেমে এল প্রচণ্ড আঘাত। সে আঘাতে বাঙালী আবার নতুন করে জাগল। তার বুদ্ধিও ধাবিত হলো নতুন খাতে। মানবতা রূপ নিল নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মান্দোলনে। রামমোহন এলেন মানবতার প্রথম দূত, তারপর বাংলার রঙ্গমঞ্চে একে একে দেখা দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন। কিন্তু এই প্রবল পরিবর্তনের যুগে সমন্বয়-সাধনার যে বিরাট শক্তি প্রয়োজন, সে শক্তির অভ্যুদয় হল দক্ষিণেশ্বরে, এক গেঁয়ো ব্রাহ্মণের মূর্তিতে। ইনিই সমন্বয়-সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস। ইনিই উনিশ শতকের বাংলার ভাবঘন বিগ্রহ। রামকৃষ্ণ একাধারে তান্ত্রিক, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত ও সাধক—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সব মতবাদে সিদ্ধ পুরুষ—এ এক আশ্চর্য সম্মিলন—বাংলার মাটিতেই এ বিকাশ সম্ভব। হৃদয়বত্তা ও মানবতার দিক দিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে এঁর তুলনা করেছেন অনেকে। এই হৃদয়ধর্মই বাংলার নিজস্ব অবদান। সর্বমানবে ঐক্যবুদ্ধি ও নারায়ণ-ভাবে জীবে সেবা—এই শিক্ষাই রামকৃষ্ণের প্রধান শিক্ষা। পরবর্তী কালে এই শিক্ষা প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সংস্কৃতির রেনেসাঁস্ সুরু

হল এই বিরাট অভ্যুদয়ের সাথে, বাঙালীর বাঙালীত্বকে সর্বভারতীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিবেকানন্দ। এর আগে চেষ্টা করেছেন রামমোহন, চেষ্টা করেছেন কেশবচন্দ্র। তাই রবীন্দ্রনাথ এই সব মহাপুরুষদের আখ্যা দিয়েছেন 'ভারত পথিক'। চৈতন্যের যুগে বাঙালীর প্রসারতা দেখতে পেয়েছি একবার, আর একবার বাঙালী প্রসারিত হল উনিশ শতকে সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধর্মে। বাঙালীর মনোময়তা, মনীষা ও আত্মদানে এক বিরাট মহাভারতের সূচনা।

ইউরোপীয় ভাবধারার সংঘাতে বাঙালীর প্রান্তিকতা ঘুচল, জীবন দর্শনে এল এক অভিনব দৃষ্টি। মুসলমান শাসনের প্রভাবে বাঙালী ধীরে ধীরে সমাজ-জীবনে যে কূর্মবৃত্তিকে আশ্রয় করেছিল, তা থেকে মুক্তি পেল বাঙালী মন—বাঙালীর মনোময়তা ও প্রাণময়তা নিরন্তর রসের সাধনায় যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই বিকৃতিই তাকে দুর্বল ক'রে সর্বভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল। সেই দুর্বলতা, সেই প্রান্তিকতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল বাঙালী। রাষ্ট্রজীবনে সমাজচেতনায় নব উদ্বোধিত বাঙালী ভারত-নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হল। জাতীয়তার 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র ভেরী-নিনাদে বেজে উঠল বাংলার অঙ্গনে অঙ্গনে। সে ভেরীনিনাদ স্পর্শ করল সারা ভারতের হৃদয়। সংস্কৃতির নব অভ্যুদয় বাঙালীকে দিল যেমন নব চেতনা, জীবনদর্শনেও দিল এক অভিনব দৃষ্টি। রসের সাধনায় আত্মহারা বাঙালীর ছেলে মেতে উঠল বীর্যের সাধনায়। বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালী এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করল সারা ভারতে। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বাঙালীর আবেগময় মন ও স্বাধীন চিন্তাধারাই এর মূলে। জাতির ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে এলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী-জীবনে যেটুকু প্রান্তিকতা ছিল, তাকে ধুয়ে মুছে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বমানবতার স্তরে। বিশ্বমানবতার বাণী ধ্বনিত হলো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। বাউল বৈষ্ণবের মানবতা তাকে শেষ পর্যন্ত মানব-সত্য প্রচারে প্রেরণা দিয়েছে। উপনিষদের ভাবধারায় উজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ এক সংহতি খুঁজে পেয়েছেন বাংলার মানবতা-ধর্মের সাধন-পীঠে, বাংলারই মর্মবাণীর মধ্যে।

বর্তমান সংকট :

মানবধর্মের সাধনপীঠ বাংলা কি আজ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে নিষ্প্রাণ নিঃশেষিত হতে থাকবে? এতদিনকার এত মহাপুরুষ ও সাধকের তপস্যা ও আত্মাহুতি কি ব্যর্থ হবে? বাংলা আজ সত্যই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন—সমস্যার যেন অন্ত নেই। দেহ যখন দুর্বল হতে থাকে, রোগ-জীবাণুর আক্রমণও তত প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়। বহুদিন থেকে বাংলা এই দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে অন্তরে ও বাইরে, তাই বৃটিশ রাজশক্তির শেষ ও চরম আঘাতের মুখে বাংলার আর আত্মরক্ষা করার দৃঢ়তা ছিল না। খণ্ডিত হৃতশক্তি বাংলা তার মহৎ আদর্শ থেকে আজ ভ্রষ্ট হয়ে চলেছে। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলা আজ হৃতগৌরব। কোথায় গেল সেই অপরিমেয় প্রাণশক্তি, চিন্তার স্বাধীনতা ও অপরিসীম হৃদয়বত্তা? বাঙালীমনের সূক্ষ্মতা, কমনীয়তা, অনুভবপ্রবণতা ও কল্পনার সাবলীলতা—যা বাঙালী চরিত্রকে একদা গৌরব-মণ্ডিত করেছিল, কোথায় গেল সেই চিত্তবৃত্তির সহজ বিকাশকুশলতা?

বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বাংলা-দেশ। কিন্তু সে বিপর্যয়ের আঘাতকে অতিক্রম করে নতুন প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছে বাঙালী। রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাত অর্থনৈতিক শোষণ—কিছুতেই বাংলাকে তার প্রাণধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে

পারে নি। আজ আমাদের জীবনের মূলে উদ্দীপনা নেই, জয়ের মনোভাব ও আনন্দ নেই। তাই আমরা সৃষ্টি-প্রতিভা হারিয়েছি। আজ আমরা আদর্শভ্রষ্ট স্বধর্মে আস্থাহীন। নির্যাতিত হয়েও প্রতিকারের জন্য মহৎ আত্মত্যাগে আর আমরা প্রস্তুত নই। ঈর্ষা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতায় আমরা জর্জরিত। যে মানবতাধর্মের সাধনপীঠ এই বাংলা সেই মানবতাধর্ম আজ লাঞ্ছিত। সংঘ-শক্তিতে তাই আমরা পশ্চাৎপদ হয়ে চলেছি। প্রেম-হৃদয় মানবতা আমাদের কাছে আজ অভিধানের বুলি, জীবনধর্মের মধ্যে তার বিকাশ নেই। রসবোধের বিকৃতিকে পরম আনন্দে আজ আমরা রোমন্থন করে চলেছি। বর্তমানের কবি সাহিত্যিক শিল্পী সেই বিকৃতিকে পরমোৎসাহে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। আর অবাঙালী চতুর বণিক, ব্যবসায়ী আমাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থার সুযোগে মুখের গ্রাস লুণ্ঠন করে চলেছে।

দুর্বলতার ভিতর দিয়েই সূচিত হয় জাতির সর্বনাশ। বাংলার সর্বনাশ তাই হঠাৎ একদিনে হয়নি। ধীরে ধীরে চিত্তবিকৃতির ভিতর দিয়ে জীবনদর্শন থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি আমরা—তাই চারিদিকে এই নৈরাশ্য ও পরাজয়ী মনোবৃত্তি। মুসলমান শাসনের বিজাতীয় আঘাত অতিক্রম করেও বাংলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাঙালী চিত্তের এই প্রবলতা, এই বলিষ্ঠতা যা ইউরোপীয় প্রভাবের প্রথম যুগেও জীবনের ক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, সেই দীপ্তি ও প্রাণময়তা কি বাংলার জীবন-দর্শনকে আবার উদ্ভাসিত করবে না?

"বন্ধু সে যে তোমার আশ্বাস"

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্.এ

জানি আছে আবিলতা,—আছে চিত্তে কলুষ কালিমা;
জীবন প্রবাহে জানি আবর্তের নাহি মোর সীমা!
কামনা প্রমত্ত জানি,—জানি সে যে দুরন্ত, দুর্বার;
আছে মদোদ্ধত দম্ভ, দুর্বিনীত মিথ্যা অহঙ্কার!
আছে দ্বিধা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস,—বিচ্যুতির গ্লানি;
অসম্বৃত বাসনার আছে বক্ষে তীব্র হানাহানি!
আছে বিক্ষেপের দাহ,—অসঙ্গতি বিভ্রম সংশয়;
সপিল বন্ধুর পথে স্খলনের নিত্য আছে ভয়!
আমার সমুখ পথে তবু যেন শুনি ক্ষণে ক্ষণে—
নূপুর নিক্কন রোল বাজে কার অলক্ষ্য চরণে!
বিপর্যয়ে,—দুর্দৈবের পুঞ্জীভূত ঘন কৃষ্ণ মেঘে
আশার দামিনীচ্ছটা আচম্বিতে কভু ওঠে জেগে!
তোমার সঙ্কেত সে যে—বন্ধু, সে যে তোমার আশ্বাস!
ঝঞ্ঝাহত সিন্ধুবক্ষে সে যে আনে তীরের আভাস!

জীবনের গতিপথ

স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ

সকল মানুষেরই জীবনের গতিপথ স্থিরীকৃত হয় নিজ নিজ আচরণানুযায়ী।

"তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়-যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ—৫।১০।৭)

যে জীবের এ জগতে ভাল আচরণ অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই জীব ভাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে—তার আবির্ভাব হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যরূপে। আবার খারাপ আচরণ যার অভ্যাসে পরিণত হয়, সে জন্ম নেয় খারাপ যোনিতে—আসে কুকুর, শূকর কিংবা চণ্ডালরূপে।

গীতাতে রয়েছে :—যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তম্ তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥—মরণের সময় যার যে সংস্কার প্রবল হয়, সে সেই সংস্কারানুযায়ী সেইভাবে ভাবিত হয়ে এ জগতে জন্ম নেয়।

'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম শুভাশুভম্।
নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি॥'

ভালমন্দ কর্মফল জীবকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই কর্মফল ভোগ না করা পর্যন্ত কোটি কোটি বর্ষেও সেই কর্মের ক্ষয় হয় না। কর্ম জীবকে নিয়ে চলে জন্ম হতে স্থিরীকৃত গতিগথ ধরে, যেন জীবনের প্রতি ব্যাপার একেবারে আগে থেকে ছক্‌কাটা হয়ে থাকে। মানুষের জীবনে যখন দুর্ভোগ আসে বর্তমান জীবনের কর্ম বিশ্লেষণ করে কিছুতেই তার থই পাওয়া যায় না। তাই বিবশ হয়ে জীবকে পূর্বজন্মকৃত কর্মফল মানতে হয়। ভূতনাথের জীবন-কাহিনী থেকে কর্মফলে স্থিরীকৃত জীবনের গতিপথের সন্ধান পাব আমরা।

ভূতনাথের জন্ম হয় এক মধ্যবিত্ত বৈশ্য-পরিবারে। সংসার স্বচ্ছল, টাকা পয়সা, জায়গা জমি রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি বিকিয়ে যায়। নিলামে তারই বড় কাকা তাদের সম্পত্তি কিনে নেয়। অবস্থার বিপর্যয়ে ছেলেপিলের বড় পরিবার নিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন বাবা। কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে সংসার প্রতিপালন কচ্ছেন।

ছোটবেলা থেকেই ভূতোর মনের গড়ন আলাদা। ভায়ের ছোট মেয়েকে নিয়ে পুকুর ধারে বসে মেঘ ভেসে চলেছে আকাশের গায়ে, তাই দেখতে থাকে একমনে এবং মেয়েটিকেও দেখায়। মেঘ ভেসে চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে তার মনও ভেসে যাচ্ছে কোন এক অজানা দূর দেশে। গ্রামের স্কুলে পড়ে ভূতো—পড়াশুনোতে বেশ ভাল। ভূতোর সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে একই শ্রেণীতে পড়ে। সেই ছেলেটিও পড়াশুনোতে ভাল। দুজনে বেশ ভাব রয়েছে। কখন কখন দুজনে মিলে পরামর্শ করে পাহাড়ে পর্বতে যেখানে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী ফকির ভগবানের আরাধনা কচ্ছে সেখানে চলে যেতে। একদিন ভূতোদের গ্রামে এক সৌম্যদর্শন, সুকণ্ঠ সন্ন্যাসী এসে হাজির হয় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে—গান গেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে থাকে। ভূতো তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে বলে বেশী করে

সংগ্রহ করে দেয় ভিক্ষা। পরে তাঁকে একান্তে পেয়ে বলে—"আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো।" "বড় হও, পড়াশুনো কর—তারপরে যাবে" এই বলে সন্ন্যাসী তাকে প্রবোধ দেয় এবং বিদায় নেয়। এক ভক্তিমতী বৈষ্ণবী ভূতোদের বাড়ীতে প্রায়ই আসেন। থাকেন বাইরের দিকে দূরে একটি ঘরে। এক সুন্দর গোবিন্দ বিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, আরতি ইত্যাদি নিয়ে বৈষ্ণবী ভরপুর হয়ে থাকেন। সেই গোবিন্দ-মন্দিরের দাওয়ায় বসে বসে ভূতো বৈষ্ণবীর কথায় রামায়ণ, মহাভারত পড়ে আর প্রতিবাসী সকলে সেখানে বসে নিবিষ্ট মনে শোনে।

ভূতোদের গ্রামের অনতিদূরে অন্য এক গ্রামে একজন সজ্জন গৃহস্থ বাস করেন। গৃহস্থ হলেও তাঁকে দেখলেই মনে হয় গৃহের বাহিরে তাঁর মন চলে গিয়েছে—সমাহিত মনে আপন ভাবে হয়ে আছেন বিভোর—দেখেই হয় শ্রদ্ধা, ভক্তিঅর্ঘ নিয়ে পুজো করতে ইচ্ছে হয় তাঁকে। ভূতো মাঝে মাঝে সারদাকে নিয়ে সেই মহাপুরুষের নিকট যায়—তাঁর কথা শুনে পায় পরম আনন্দ। সারদা তার মামার ছেলে তারই বয়সী, এক স্কুলে পড়াশুনো করে আর সৎপ্রসঙ্গে সময় কাটায়। বড়ই সরল সারদা, সংসারের আবিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অল্প বয়সেই মারা যায় সে। সাথী মরে যাওয়ায় ভূতোর মনে আসে এক উদাসীনতা—আপনা থেকেই মনে একটা ভাব খেলে যায়—তাকেও সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে দূরে—অপরের মত সংসারে সংসারী সাজতে হবে না। বয়স হলেও শিশুমনের এ সংস্কার ঘুচে যায় না বালকের—বড় হয়ে একাকী ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রে আকাশের দিকে আপন মনে তাকিয়ে থাকে আর পূতভাবে পূর্ণ হয় তার হৃদয়—রসনা আপনা থেকে জপে হরিনাম—সেই হরিনামে দুই গণ্ড আপ্লুত হয় অশ্রুধারায়। অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে মনের ময়লা ধুয়ে যায় আর যেন এক অপূর্ব লোকে বিচরণ করতে থাকে সে। বালক জীবনের অনেক রাত্রি এইভাবে কেটেছে—আনন্দধারায় পূত হয়েছে তার জীবনের এক অধ্যায়।

শ্বেতদলবাসিনী, বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতীর আগমনে বালকের মন নেচে ওঠে এক আনন্দ তরঙ্গে। সকালেই স্নান করে পুজোয় দেবার বই, খাগের কলম ইত্যাদি হাতে নিয়ে চলে যায় গ্রামের স্কুলে। পুজো শেষে অঞ্জলি দিয়ে সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ পায় খিচুড়ি, লুচি ইত্যাদি।

সহপাঠী মুসলমান ছেলেটি এবং ভূতো দুজনেই মধ্য ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভূতোকেই পরীক্ষার্থী স্থির করা হয়। তার সুন্দর ইংরেজি reading শুনে জিলা স্কুলের পরীক্ষক-শিক্ষক উচ্চ প্রশংসা করেন অন্য শিক্ষকের নিকট। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভূতো মাসিক চার টাকা করে বৃত্তি পায়। বৃত্তি নিয়ে গ্রাম থেকে দূরে শহরে এক উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়। কিছু দিন যেতে না যেতেই শহরের স্কুল ছেড়ে ভূতোকে চলে যেতে হয় একটি দ্বীপে অন্য এক স্কুলে। দ্বীপটি ছোট—নারিকেল, সুপারি বৃক্ষে পরিশোভিত। ষ্টীমারে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌছুতে হয় ওখানে। দ্বীপে প্রায়ই প্রবল ঝড়বৃষ্টি দেখা দেয়। সেই ঝড়বৃষ্টিতে আনন্দে উদ্বেলিত হয় ভূতোর মন। দ্বীপ থেকে ভূতো ছুটিতে বাড়ী আসে একাকী। একবার ঐরূপ বাড়ী আসবার সময় পায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি—ষ্টীমারের ঘাটে গিয়ে দেখে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ—ঢেউর পর ঢেউ চলেছে উঁচু হয়ে অবিরাম গতিতে। ভূতোর মনও সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলে অসীম সাগরের অনন্ত পথে—অনন্তের পরশে হৃদয়-তরী দুলে উঠেছে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। গ্রামে

নদীর ধারে খোলামাঠে শ্মশানকালীর পূজো—পূজো হয় মহাসমারোহে সারা রাত্রি। প্রকাণ্ড শ্মশানকালীর মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে দু'সারিতে রয়েছেন দুদিকে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী এবং কমলা—দশমহাবিদ্যা। সকলেই খুব আনন্দ করে এই পূজোতে। বাড়ী থেকে চাঁদা দিয়েছেন মা—কম দেখে ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। চাঁদা সংগ্রহকারী একজন ভূতোকে দেখে বলছে—'তোদের চাঁদা নেওয়া হবে না।' বেশী না দিলে সামাজিক শাস্তি দেওয়া হবে বলে শাসাতে থাকে—তাতে ভূতোর হয়েছে বড় অভিমান—এ কি অন্যায়, যার যেমন সামর্থ্য তাইতো দেবে—তাতে কেন অবিচার। নির্ভীক বালক ক্ষুণ্ণ মনে চলে যায় গ্রামের মাতব্বরদের নিকট—খুলে বলে সব কথা। ভূতোর কথা শুনে আশ্বাস দিয়ে মাতব্বরেরা ওকে শান্ত করে এবং সেই চাঁদাই গ্রহণ করে। সেই দিন বালকের মনে অন্য ভাব দেখা দিয়েছে—জগজ্জননীর প্রতি এসেছে অভিমান—সকলের সাথে মিশে পূজোর জায়গায় গিয়ে আনন্দ পাচ্ছে না। তাই দূরে নদীর ধারে একা আপনমনে বসে আত্মভোলা হয়ে জগন্মাতাকে স্মরণ করে—দুঃখতারিণী, পতিতপাবনী মায়ের স্মরণে প্রাণে পায় এক নির্মল আনন্দ। পরের দিন মাঠে বসে সকলের সঙ্গে আনন্দ করে মায়ের প্রসাদ পায়।

জন্ম থেকেই ভূতোর রাশি নক্ষত্রের এমন. অপূর্ব সমাবেশ যে এক জায়গায় তার স্থিতি হয় না বেশী দিন। এমনি ঘটনা ঘটে যায় যে তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ভূতোকে দ্বীপ ছেড়ে চলে আসতে হয় শহরে জিলাস্কুলে। সেখানে হেডমাষ্টারের বিপুল বপু, গম্ভীর চেহারা, দরাজ আওয়াজ। দূর থেকে দেখেই প্রাণপাখী খাচা ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করে ভয়ে। কিন্তু এই বিপুল বপুর মধ্যেও ফল্গুনদীর মতো ভেতরে বইতে থাকে প্রেমবারি। ভাল ছেলে বলে ভূতোকে দেখেন স্নেহের চোখে। ব্রাহ্মণ হেড্‌পণ্ডিত মশায় ভূতো সংস্কৃতে সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পায় বলে বরদাস্ত করতে পারেন না—ব্রাহ্মণ ছেলেদের দেন গালি। অন্য সংস্কৃত অধ্যাপকগণ ভূতোকে উৎসাহ দেন, আদর করেন। ভূতো শহর থেকে দূরে গ্রামে এক আত্মীয়বাড়ী থেকে স্কুলে আসে। যত জোর জলঝড় তত আনন্দ পায় সে রাস্তায় ভিজে ভিজে আর স্মরণ করে বালক জটিলের মত মধুসূদনদাদাকে। এই ভাবে স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে অদৃষ্ট-পরিচালিত ভূতো বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বি, এ পাশ করে চাকুরী পাবার আশায় চলে যায় সুদূর বর্মাপ্রদেশে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়। অচেনা অজানা জায়গা। কোন এক সূত্র ধরে ওঠে গিয়ে বর্মার বিখ্যাত এক বড় মুসলমান ব্যবসায়ীর ঘরে। কাঠের ইজারা রয়েছে তার। ইরাবতী নদীতে যত লোক কাঠনিয়ে যায় তাকেই দিতে হয় ট্যাক্স। সেই নৌকোতে নদীতে ঘুরে ঘুরে যুবক ট্যাক্স আদায় করতে থাকে আর কিছু সাহায্য পায় সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এতে অপর ট্যাক্সআদায়ীর ব্যবহারে দেখতে পায় জালজুয়াচুরি—শিক্ষিত যুবকের ঘৃণা ধরে যায়, ছেড়ে দেয় ঐ আদায়ের কাজ। অতঃপর চাকুরীর সন্ধানে রেঙ্গুনে থাকে এক চাকুরে বাবুদের মেসে তিনতলা বাড়ীতে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই যুবকের পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে আসে আর হয়ে পড়ে অসহায়। তখন একদিন হঠাৎ অসহায়ের সহায় সর্বশক্তিমান কৃপাময় ভগবানের কৃপায় এক ব্যক্তি এসে অযাচিত-ভাবে তাঁর ছেলেদের পড়াতে বলেন। এই গৃহ-শিক্ষকের কাজ অবলম্বন করে আরও কিছুদিন ভূতো কাটায় সেই মেসে। সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর সন্ধানও চলতে থাকে। অনুসন্ধানে সুযোগ ঘটে না

কিছু—ভুতো নিরাশ হয়ে ফিরে আসে কলকাতায়। এখানে হোষ্টেলে থেকে এম্, এ পড়তে থাকে। এই সময়ের মধ্যে যুবক পিতৃহীন হয় এবং অনেক আত্মীয়স্বজনকে হারায়। আত্মীয়স্বজনের বিরহে এবং সংসারে আরও ঘাতপ্রতিঘাত খেয়ে ভুতোর হৃদয়-নিহিত বৈরাগ্য-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়। সংসারে আসে বিতৃষ্ণা, খোঁজে শান্তির সন্ধান।

যন্ত্রবৎ চালিত হয়ে ভুতো চলেছে চৌরঙ্গী পার হয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে। হঠাৎ পেছনে হৈ হৈ রব শোনা গেল। সবলোক প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে—দুটো ঘোড়া ছাড়া পেয়ে সব তছ্নছ্ করে ছুটে আসছে পাগলের মতো। ভুতোও পালাবে, এমন সময় সামনে দেখলো একটি ৮ বৎসরের বালক যাচ্ছে—তাকে গেল টেনে উঠিয়ে নিতে, এমন সময় ঘোড়া এসে তার উপরেই পড়লো। বালক গেল বেঁচে, কিন্তু ভুতোর পায়ের একটি হাড় ভেঙ্গে গেল ঘোড়ার পায়ের আঘাতে। এক ডাক্তার ভদ্রলোক গাড়ীতে আসছিলেন পেছনে। এই অবস্থা দেখে ভুতোকে গাড়ীতে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাসাবধি কাটিয়ে ভুতো ফিরে এল হোষ্টেলে। আর একদিন সন্ধ্যায় আবছায়া অন্ধকারে ভুতো চলেছে এক গলি ধরে। দূরে দেখতে পেল কতগুলো লোক একটি যুবতী মেয়েকে ঘিরে রয়েছে। তাদের হাতে লাঠি ছোরা—উন্মুক্ত ছোরা উদ্যত মেয়েটির ঘাড়ের কাছে। নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে ছুটে গিয়ে ভুতো লোকটির হাত থেকে ছোরা ছিনিয়ে নিল আর মেয়েটি ইত্যবসরে ছুটে গিয়ে এক বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ভুতোর পিঠে পড়তে লাগলো লাঠির ঘা—ঘায়ে ঘায়েল হয়ে লুটিয়ে পড়লো রাস্তার উপর, মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো আর অবশ হয়ে অচৈতন্য হয়ে গেল সে। এই সময় এক সদাশয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি রাস্তায় আসতে আসতে তাকে দেখতে পেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মাথায় জল ইত্যাদি দিতে দিতে চৈতন্য ফিরে এল তার। সে যেতে চাইল হোষ্টেলে ফিরে, তখনও লাঠির ঘায়ের আঘাত থেকে দরদর করে রক্তধারা বয়ে যাচ্ছে। সদাশয় ব্যক্তির নিঃসন্তান স্ত্রী কিছুতেই ভুতোকে যেতে দিলেন না এই অবস্থায়। দুদিন পরে দেখা গেল পুঁজ ইত্যাদি দেখা দিয়েছে ঘায়ে, মায়ের অপার ভালবাসা ঢেলে দিয়ে অতি যত্নে সেবাশুশ্রূষা করে কিছু দিনের মধ্যেই ভুতোকে নিরাময় করে হোষ্টেলে ফিরে পাঠালেন ভদ্রদম্পতী।

হোষ্টেলের ছেলেদের অসুখে বিসুখে শিয়রে বসা দেখা যাচ্ছে ভুতোকে। তাদের আপদে বিপদে, অভাবে ভুতোর সাহায্য আসছে অযাচিত-ভাবে। তাই ছেলেরা সকলে তাকে বড় ভাল-বাসে, আপনার বোধ করে। ভুতোর পাশের গ্রামের এক বাল্যবন্ধু সহপাঠী থাকে সেই হোষ্টেলে। ভুতোকে সকলে ভালবাসে, সেটা তার বরদাস্ত হয় না, সহ্য হয় না—মনে জ্বলে ওঠে এক ঈর্ষাবহ্নি। ভুতো কিন্তু বাল্যবন্ধু বলে সেই ছেলেটিকে বড় আপনার বলে জানে এবং তাকে ভালবাসে। ভালবাসে সকলের চেয়ে বেশী। আর অসুখে বিসুখে অস্থির হয়ে পড়ে—সদাই করে তার মঙ্গল কামনা। ঈর্ষাবহ্নিতে দগ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে বাল্যবন্ধুর ভেতরে ভুতোর অনিষ্ট কামনা। খোঁজে সুযোগ কি করে তাকে সকলের নিকট খাটো করা যায়, হীন প্রতিপন্ন করা যায়। হোষ্টেলের ছেলেদের সন্ধ্যার পরে বিনা অনুমতিতে বাইরে থাকবার নিয়ম নেই। কলেজের এক গরীব ছেলে গ্রামের পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে এম্, এ পড়ছে। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন ধরে ভুগছে সেই ছেলেটি—আত্মীয় স্বজনের অভাবে বড় অসহায় অবস্থায় পড়েছে। ভুতো রোজই তার সেবা-

শুশ্রূষা করছে কিন্তু সেদিন হঠাৎ অবস্থা খুব খারাপ হওয়াতে রাত ১০টাতেও ফিরে আসতে পারেনি হোষ্টেলে। অনুপস্থিতির এই সুযোগ নিয়ে বাল্যবন্ধু হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিয়ে এক মিথ্যা অপবাদ রচনা করে। তখনই ভুতোর ডাক পড়ে হোষ্টেলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে—ভুতো সব খুলে বলে এবং হোষ্টেলের ছেলেরাও পীড়িত বন্ধুর সেবায় গিয়েছিল বলে এক বাক্যে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কারও কথা কানে না নিয়ে তাকে তখনই হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করেন। বাল্যবন্ধু—যাকে ভুতো অত আপনার মনে করতো, তার নিকট হতে কল্পনাতীত এই দুর্ব্যবহার পেয়ে ভুতোর প্রাণে আসে মর্মযাতনা—একেবারে মুষড়ে পড়ল সে। অনাথশরণ ভগবানের শরণ নিতে তখনই হোষ্টেল থেকে বের হয়ে পড়ে। রাস্তায় যেতে যেতে গড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হল। দূরে দেখতে পেল এক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী আপন মনে এক বেঞ্চিতে বসে আছেন—কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে ভুতো নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করে। সন্ন্যাসী যাচ্ছেন পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে—পরে ফিরে যাবেন নিজের গুরুস্থানে হিমালয়ের বিজন প্রদেশে। ভুতোর কাহিনী শুনে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন পুরীতে। ভুতোর দাদা জানতেন তার সংসারে বিতৃষ্ণার কথা—তাই ভাইয়ের খোঁজে এসে হোষ্টেলে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে তাকে দেখতে পেলেন ঐ অবস্থায় সাধুর সঙ্গে। বাড়ী ফিরিয়ে নেবার জন্যে নানারকমে বুঝাতে লাগলেন কিন্তু ভুতো মনকে স্থির করে নিয়েছে—রইলো তার সংকল্পে অচল অটল, কিছুতেই সাধুর সঙ্গ ছাড়লে না। পুরীতে কয়দিন মহানন্দে কাটল।

সাধু হিমালয়ের পথে ভুতোকে নিয়ে নানা স্থান ঘুরে অবশেষে এসে হরিদ্বারে পৌঁছুলেন। অনভ্যস্ত পথশ্রমে ভুতো খুব পীড়িত হয়ে পড়ল। যাহোক কিছু দিনের মধ্যেই সেরে উঠল। সবল হলে সাধু তাকে নিয়ে পাহাড়ে পায়ে-হাঁটা পথে গুরুর আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন হরিদ্বার ছেড়ে। যেতে যেতে পথ আর ফুরোয় না—চড়াই উৎরাইতে অনভ্যস্ত ভুতো ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু মনের আনন্দে এলিয়ে পড়ে না। এইভাবে তরঙ্গের মত সজ্জিত পাহাড়শ্রেণী ভেদ করে সাত দিন পরে পৌঁছুলো আশ্রমে। বাবা রাঘব স্বামী সন্ন্যাসী মহারাজের গুরুদেব। আশ্রমের চারদিকে দেবদারু, চীর, রডো ইত্যাদি অনেক গাছ রয়েছে। রডোডেনড্রন্ গাছ গুলো লালফুলের স্তবকে পরিশোভিত। বাগানে নানারকমের ফুল ফুটে শোভায় সকলের নয়ন পরিতৃপ্ত করছে, গন্ধে মন আকুল করছে। আশ্রমের আওতায় এলেই বুঝা যায় ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ষড়রিপুনিচয় এখানে আশ্রয় না পেয়ে সরে পড়েছে দূরে। এখানে সকলেই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত। সকলেই চায় ভেতরের সারবস্তু; তাই বাহিরের খোলা নিয়ে নেই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এক সুর, এক লয়ে বাঁধা সকলের মন। এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণত্বলাভ। তাই অংশ ছেড়ে নিরংশের খোঁজে সকলে তন্ময়। কেউ জ্ঞানপথে বেদান্তের অন্ত নির্ণয় করছে, কেউ বা ভক্তি-পথে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর ভাবে বিভোর। কেউ যোগপথে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি অভ্যাস করছে আবার কেউ নিষ্কাম কর্ম-পথ ধরে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় রত।

ভুতো সন্ন্যাসীর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে প্রথমে কারণত্রয়হেতু শান্ত সত্যং শিবং সুন্দরম্ শিব-লিঙ্গের সম্মুখে প্রণত হয়ে আত্মনিবেদন করল—নিজের নিজত্ব নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে শরণ গ্রহণ করল শিবের। তারপর ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলল গুরুদেবের কুটিরের দিকে। বাবা রাঘব স্বামী ব্যাঘ্রচর্মাসনে সমাসীন—হিমালয়ের

মত অচল অটল, প্রশান্ত মহাসাগরের মত গভীর ধীর স্থির মূর্তি—মুখমণ্ডলে অসীম আনন্দের আভা ফুটে বের হচ্ছে। সন্ন্যাসী-শিষ্য প্রণত হয়ে শ্রীগুরুর পাদবন্দনা করল, সঙ্গে সঙ্গে ভূতোও প্রণত হয়ে মনে মনে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নিজেকে দিল বিলিয়ে। বাবা রাঘব স্বামী অনেক দিন পরে সন্ন্যাসী-শিষ্যকে প্রত্যাগত দেখে কুশল-প্রশ্নে আপ্যায়িত করলেন, আর নবাগত ভূতোর দিকে বহুদিনের পরিচিতের মত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতেই ভূতোর মন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল, অশান্ত মন হল শান্ত আর যেন অপূর্ব অজানা এক শক্তি তড়িতের মত খেলে গেল তার সমস্ত দেহ-মনে। ভূতোর স্থান হল ছোট একটি 'কুঠিয়া'তে। সর্বস্ব সমর্পণ করে গুরু-সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দিল ভূতো। সকাল সন্ধ্যায় সব সন্ন্যাসী শিবমন্দিরে সমবেত হয়ে সমস্বরে মহিম্নস্তোত্রপাঠ করে, আর অন্য সকলে করে স্তবগান। সেই স্তব-গানের উদাত্ত সুর পাহাড়ের ঢেউ ধরে অনেক দূরে চলে যায়।

বাবা রাঘব স্বামী ভূতোর চালচলনে, কথায় বার্তায়, সেবায় খুব পরিতুষ্ট হলেন। কিছুদিন এই-ভাবে কেটে গেলে শুভদিন দেখে ভূতোর ভাবানুযায়ী মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন তাকে। ভূতো শ্রীগুরু-নির্দিষ্ট সাধনপথে অগ্রসর হতে লাগল; ক্রমেই বাহিরের বস্তুতে বিতৃষ্ণা এল। মন হল অন্তর্মুখী, অন্তরে খুঁজে পেল আনন্দের ফোয়ারা। এই ভাবে দশ বৎসর গুরুসান্নিধ্যে সেবায় তৎপর হয়ে শ্রীগুরুর আদেশে বারাণসীতে গিয়ে ভূতো জীবসেবা বরণ করে নিল। বারাণসীতে বাবা রাঘব স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিরাট প্রতিষ্ঠান। রয়েছে আদর্শ মহাবিদ্যালয়—গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ব্রহ্মচারী বালকেরা সেখানে শিক্ষালাভ ক'রে সংসার-পথে এগুবার সম্বল সংগ্রহ করছে। আর রয়েছে সেবাসদন। সেখানে অনাথ, আতুর, সম্বলহীন পীড়িত সকলে পাচ্ছে আশ্রয়। সেবার সকল ব্যবস্থা পরিপাটিরূপে সাধিত হচ্ছে। ভূতো এই সেবার কাজে নিজের জীবন করল উৎসর্গ। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতি নিষ্ঠার সহিত সেবাব্রত উদ্‌যাপনান্তে পরপারে তার প্রয়াণের সময় এল। মা এবং দাদা কাশীনাথ কাশীতে এসেছেন বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শনে। হঠাৎ দেখা হল দশাশ্বমেধ ঘাটে। কাশীর যত দ্রষ্টব্য স্থান ভূতো একে একে তাঁদের সব দর্শন করিয়ে দিল এবং কয়দিন আদর যত্নের সহিত দাদা ও মায়ের সেবা করল। সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দাদা ও মা অন্তরের আশীর্বাদ ভূতোকে জানিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করলেন। কিছু দিন পরেই একদিন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে আসবার পথে পথিপার্শ্বে দেখতে পেল এক অসহায় ব্যক্তি রোগের যাতনায় ছটফট করছে, সে হয়েছে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত। পথ থেকে কুড়িয়ে রিক্স করে ভূতো লোকটিকে নিয়ে এল সেবাসদনে আর প্রাণপাত পরিশ্রম করে, দিবারাত্র সেবায় তৎপর হয়ে তাকে করল রোগমুক্ত। কিন্তু ভাগ্যের বশে নিজে সেই ভীষণ ব্যাধির কবলে পতিত হল। ক্রমেই অবস্থা হল শোচনীয়, জীবনের আর আশা রইল না। জীবনদীপ নির্বাপিত হবার সময় ভূতো ভগবানের নাম করতে করতে পরলোকের সজ্ঞানে ইহলোকে অজ্ঞান হয়ে পড়ল রাত্রি ১২টায়। শেষ সময়ে উপস্থিত গুরুভাইয়েরা সকলে হরি ওঁ রাম বলে সারারাত কাটাল। সকালে শবদেহ চন্দন পুষ্পে সুশোভিত করে নিয়ে চলল মণি কর্ণিকা ঘাটে। সেখানে যথাকৃত্য সমাপন করে গঙ্গায় ভূতোর দেহ বিসর্জন দিল।

ভূতোর জীবনের প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে এক অদৃশ্য শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়ে। তার কর্মফল তাকে নিয়ে চলেছে পূর্ব হতে নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট গতিপথে। সে পথ ছেড়ে বিপথে চলবার তার কোন উপায়ই ছিল না।

অসম্বন্ধ

শান্তশীল দাশ

কোন পথে আজ চ'লেছে মানুষ,
কোথা এর পরিণতি ?
কেন উন্মাদ গতি ?
জীবনের পথ এ নহে বন্ধু,
এ যে মৃত্যুর পানে,
ক্রমাগত ছু'টে চলেছে সবাই মৃত্যুর আহ্বানে।
মৃত্যুরই হ'বে জয় !
মৃত্যুর কাছে অমৃত-পুত্র মে'নে নেবে পরাজয় !
দীর্ঘ দিনের সাধনা ব্যর্থ হ'বে ?
আলোক-তীর্থযাত্রী কি শেষে
আঁধারে শরণ ল'বে ?

যে-দিকে তাকাই বন্ধু, কোথাও
পাইনা কো খুঁজে আলো,
চারিদিকে শুধু দেখি ধরণীর
সীমাহীন ঘন কালো।
মানুষের ধরাতলে,
বন্য শ্বাপদ ঘু'রে ফেরে দেখি বীভৎস কোলাহলে।
স্বার্থলোভীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
ব্যথিত ধরণীতল ;
করুণ কাতর ক্রন্দন ভেসে আসে,
আকাশ বাতাস বেদনায় চঞ্চল।
মানুষের মন ভ'রে আছে আজ হিংসা ও বিদ্বেষ,
দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা হ'য়ে গে'ছে নিঃশেষ।
শ্বাপদেরে করি ভয়,
আবরণ-মাঝে শ্বাপদবৃত্তি সে-যে আরও ভয়াবহ,
যেথা নেই সংশয়,
সেথায় আঘাত হে'নে যে জীবন ক'রে তোলে দুঃসহ।

বন্ধু, ক্লান্ত আমি :
কার অভিশাপে ধরণীর বুকে
এলো দুর্দিন নামি'—
ভে'বে পাইনা কো, বেদনায় ভরে মন ;
শুনি কান পে'তে দিকে দিকে শুধু অশ্রান্ত ক্রন্দন।
আর্ত ধরণী কাঁদে,
শোণিত-সিক্ত হল ধরাতল এ কাহার অপরাধে ?

যুগে যুগে এ'ল কত মহাজন— অমৃতের সন্তান,
কণ্ঠে তাদের মহাজীবনের বাণী ;
দিয়ে গেল তারা ধরার মানুষে অমৃতের সন্ধান,
ব'লে গেল তা'রা—"জানি
আঁধারের পারে আদিত্যরূপ সেই দেবতার বাস,—
আমরা জেনেছি তাঁরে,
তাঁর কাছে সেই আঁধারের লেশ,—জীবনের আশ্বাস,
আলো সেথা শত ধারে।"

সেই পথ ধরে চলেনি মানুষ, বৃথা অভিমান ভরে
হয়েছে বিপথগামী ;
আলোকের পথ তাই গেছে দূরে স'রে,
আঁধারের বুকে তাই চলা দিনযামী।
আঁধারের অনুচর
আঁধার পথের হয়েছে সংগী ; মানুষের অন্তর
হয়েছে আঁধারে ভরা,
সেই আঁধারের ঘন কালিমায়
কালো হয়ে গেছে ধরা।

* * * *

বন্ধু, স্বপ্ন দেখি :
ঝড়ের আঘাতে কালো মেঘ গে'ছে স'রে,
সুনীল আকাশ,—উজল আলোকে
ধরাতল গে'ছে ভ'রে ;
স্বপ্ন আমার সত্য হবে না সে কি ?
কান পে'তে আমি শুনি বারে বারে—
ভয় নাই—নাই ভয়,
আঘাতে আঘাতে সকল বেদনা
নিঃশেষে হ'বে ক্ষয়।
বেদনার আঁখিজল
ধরনীর বুক হ'তে মু'ছে দেবে
বেদনার হলাহল।
টু'টে যা'বে সব আবরণ তার,
ঘুচে যা'বে অভিমান,
আলোকের হ'বে জয় ;
অমৃতের সন্তান
অমৃত-তীর্থ যাত্রী সে হ'বে নাহি কোন
সংশয়।

কবি ইকবাল

অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল

(শেষাংশ)

নিম্নের কয়েকটি পংক্তি হইতে ইকবালের বিশ্ব-মানবতার আদর্শ বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। স্বর্গ হইতে মানুষের আদি জনক আদম পৃথিবীতে আসিতেছেন। সেই সময় ধরিত্রী জননী আদমকে অভিনন্দন জানাইতেছেন। বাস্তবিকই এই কবিতাকে বলা যাইতে পারে "The Testament of Humanity."

ধরিত্রী বলিতেছেন :

হে আদম, এ পৃথিবীর সব কিছুই তোমার অধীনে আসিবে। ঐ দেখ মেঘমালা, ঐ বজ্র, ঐ স্বর্গের উচ্চ মিনার, ঐ আকাশ, ঐ অনন্ত শূন্যের বিস্তৃতি, এই পর্ব্বত, এই মরুভূমি, সমুদ্র, এই সর্ব্বব্যাপী বায়ু—এ সবই তোমার। গতকাল পর্য্যন্ত দেবদূতদের সৌন্দর্য্য তোমাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কালের দর্পনে দেখ এই পৃথিবীতে কি বিরাট সম্ভাবনা ও গুরুত্ব রহিয়াছে তোমার জন্য।"

চিন্তাক্ষেত্রে ইকবাল যথেষ্ট দান করিয়াছেন। ইকবালের দর্শন ও কবিতা পরস্পরের সহিত যুক্ত। তাঁহার দর্শনের মূলকথাটা না বুঝিলে তাঁহার কবিতার সম্যক উপলব্ধি হইবে না। ইকবালের দর্শন ও কবিতা দুইই বিরাট সমুদ্র। তাঁহার দর্শন বিশাল, কারণ সেই দর্শনের বাহন হইতেছে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিতা। আবার তাঁহার কবিতাও বিশাল, কারণ তাহার ভিত্তি হইতেছে তাঁহার অগাধ দর্শন। ইকবালের দর্শনের একটা বড় অংশ হইতেছে Egoর দর্শন বা ব্যক্তিত্বের দর্শন। বহু কবি দয়িতের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তৃপ্তি পান। কিন্তু এইভাবে মানুষের মহৎ মর্য্যাদাকে লঘু করিয়া দেওয়া হয়। ইকবাল এই ধরনের আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন নাই। যাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন, ইকবালের আত্মদর্শন যেন সেই আদর্শের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। ইকবাল বলেন যে, পৃথিবীতে মানুষের Egoর ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বদাই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। শুধু সংগ্রাম নয়, সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইবে। এই ভাবে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ব্যক্তিত্ব পায় স্বাধীনতা। এবং তারপর পায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য যে ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন সত্তা। এই ব্যক্তিত্ব Constant state of tension (অর্থাৎ সর্ব্বদাই একটা চাঞ্চল্য, উত্তেজনার মধ্যে) কার্য্য করে। এই জন্য সে বিশ্রাম পায় না। এই ভাবে সর্ব্বদাই সক্রিয় থাকার ফলে ব্যক্তিত্ব পায় অমরত্ব। ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা ও অমরত্ব পাইয়া একদিকে সমগ্র স্থানের বিস্তৃতিকে (Space) জয় করে, আর অন্যদিকে কালকেও (Time) জয় করে। ব্যক্তিত্ব মানুষের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতিকে সতত সাহায্য করে। এইভাবে ব্যক্তিত্ব হইতে পূর্ণ মানুষ (Perfect Man) আবির্ভূত হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ দ্বারা পূর্ণ মানুষের সাধনা সমগ্র জীবন-ব্যাপী করিতে হয়। ইহাই হইল ইকবালের আত্ম বা ব্যক্তিত্ব-দর্শনের সারমর্ম্ম। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,

ব্যক্তিগত অমরত্ব, ও পূর্ণমানুষ-সৃষ্টি—এই তিনটি বিষয়ই হইতেছে ইকবালের ব্যক্তিত্ব-দর্শনের মূল কথা।

প্রশ্ন এই যে, এই তিনটির বিবর্ত্তন (Evolution) কেমন করিয়া সম্ভব হইবে? ইকবাল বলেন, সর্ব্বপ্রকারে ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া একটা মানুষের মর্য্যাদাকে বৃদ্ধি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে। তাঁহার মতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুরক্ষিত করিবার শ্রেষ্ঠ শক্তি হইতেছে 'ইশ্‌ক্' বা প্রেম, এবং 'ফাকর' বা ধনসম্পত্তিতে অনাসক্তি ; ভারতীয় পরিভাষায় ইহার নাম—"প্রেম এবং অস্বাদ ও অপরিগ্রহ।" ফলাফলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখাইতে না পারিলে প্রেম সার্থক হয় না, পূর্ণ হয় না। ইকবাল "ইশ্‌ক্" বা প্রেম কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, তিনি ইহাকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ইশ্‌ক্' কথাটির অর্থ হইতেছে Desire to assimilate, আপনার করিয়া লইবার ইচ্ছার নামই প্রেম। আর "ফাকর" বলিতে ইকবাল বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ইহজগতে ও পরজগতে কি ফল পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব অবলম্বনের নামই 'ফাকর' বা অস্বাদ ও অপরিগ্রহ। তাঁহার মতে সত্যিকারের মর্য্যাদা পাইতে হইলে ব্যক্তিকে অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ইহা সম্ভব নহে। ব্যক্তিকে সমাজে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। প্রেম দ্বারা আত্মার উন্নতি করিতে হইবে। ব্যক্তির কাজকে সমাজের অপর সকলের সহিত খাপ খাওয়াইতে না পারিলে তাহা স্বার্থপরতায় কলুষিত হইয়া পড়ে। সমাজের মঙ্গলের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে না পারিলে মানুষ চরম কল্যাণ পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ"—রবীন্দ্রনাথও এইভাবে এককে বহুর মধ্যে ও বহুকে একের মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছেন। ইকবালও বলেন, আদর্শ সমাজ গঠিত হইবে আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত এই আধ্যাত্মিক আদর্শ সার্থক হইতে পারে না। ইহাকেই তিনি বলেন "তৌহিদ" বা একেশ্বরবাদ। "তৌহিদ" মানেই হইল "বিশ্বঐক্য" অর্থাৎ সমগ্র মানুষ এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, এই নীতি হইতেছে বিশ্বঐক্যের প্রধান কথা। তাঁহার একত্ববাদ গোঁড়াধর্ম্মীয় একত্ববাদ নহে। সমাজের সকলের জন্য চিন্তা ও কর্ম্মের একত্ব ও বিশ্বমৈত্রী তাঁহার একত্ববাদের মূল কথা।

বাঙ্গলা ভাষায় ইকবাল-সাহিত্যের চর্চ্চা হয় না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পায় না। তাঁহার বহু কাব্যের ইংরাজি অনুবাদ হইয়াছে। সে সব পড়িলে তাঁহার কাব্যের রস সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক পাইতে পারে। ইকবাল ভারতীয় প্রতিভার উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার রাজনীতি স্থায়িত্বলাভ করিবে না। আমির খোসরু, গালেব, চন্দ্রভান, পণ্ডিত চকব্য উর্দ্দু-সাহিত্যে যে স্থান পাইয়াছেন, কবি ইকবাল তাঁহাদের পার্শ্বেই স্থান পাইবেন। আমাদের ভারতমাতা বন্ধ্যা নহে। ভারতের সন্তান ইকবাল প্রত্যেক ভারতবাসীরই গৌরবের সম্পদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত-জ্যোতিঃশাস্ত্রী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ

"যদি প্রেমোন্মাদ হয়, তাহলে কে বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে, পাগলের মত হয়ে গেছে। তার কিছুই কর্তব্য নাই। সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি কম? সে অবস্থা হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়।

চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই নিদ্রা নাই, শরীর বলে বোধ নাই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়ার যে লীলাকথার উল্লেখ করিয়াছেন—সেই লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

শরৎকালের চন্দ্রিকোজ্জ্বল রাত্রি নীলাচল-বিহারী শ্রীগৌরহরি নিজগণ সঙ্গে রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে পড়িতে এবং ভক্তমুখে শুনিতে শুনিতে কৌতুকে উদ্যান ভ্রমণ করিতেছেন, এবং প্রেমাবেশে কীর্তন-নর্তন করিতেছেন। কখনও ভাবোন্মাদে এদিক ওদিক ধাবিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনও বা মূর্ছিত হইতেছেন। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার প্রত্যেকটি শ্লোক আস্বাদন করিতেছেন, এবং কখন হর্ষভরে আনন্দিত কখনও বা বিরহভরে ব্যাকুল হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এইরূপে রাসলীলার শ্লোকগুলি পড়িতে পড়িতে অবশেষে গোপীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলেন এবং সমুদ্রতীরবর্তী 'আইটোটা' নামক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈল মূর্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়া যায়।
কভু ডুবায়ে রাখে কভু ভাসায়ে লইয়ে যায়॥
যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥

এদিকে স্বরূপদামোদর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ প্রভুকে না দেখিয়া চমকিত হইলেন,- আচম্বিতে মহাবেগে প্রভু কোথায় গেলেন তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। প্রভুকে না দেখিয়া সকলে সংশয় করিতে লাগিলেন। প্রভু কি জগন্নাথ দেখিতে গমন করিলেন, অথবা অন্য দেবালয়ে গমন করিলেন? কিম্বা অন্য উদ্যানে গিয়া প্রেমোন্মাদে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, অথবা গুণ্ডিচা মন্দিরে কিম্বা নরেন্দ্র সরোবরে, কি চটক

পর্বতে, না কোণার্কে গমন করিলেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দিকে প্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন! এই প্রকার অন্বেষণ করিতে করিতে স্বরূপদামোদর কয়েকজনের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে আসিলেন এবং সেখানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই প্রকারে রাত্রি শেষ হইল। তখন তাঁহাদের মনে হইল প্রভু নিশ্চয়ই অন্তর্ধান করিয়াছেন।

এইরূপে প্রভুর বিরহে ম্রিয়মান ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে আসিয়া যুক্তি করিয়া কেহ কেহ চিরায়ু পর্বতের দিকে প্রভুর অন্বেষণে ব্যাকুল প্রাণে গমন করিলেন। প্রভুর পরম প্রিয় স্বরূপদামোদরও কয়েকজন সঙ্গে সমুদ্রের তীরে তীরে পূর্ব দিকে প্রভুর অন্বেষণে গমন করিলেন—

বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ।

এইরূপে ব্যাকুল প্রাণে প্রভুর অন্বেষণে গমন করিতে করিতে—

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছে সমাচার॥

স্বরূপদামোদর জালিয়ার চেষ্টা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য! এই জালিয়ার অঙ্গে প্রেমবিকারের লক্ষণ দেখিতেছি। আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ ভিন্ন এই প্রেম কাহারও লাভ হইতে পারে না। এ জালিয়া কি প্রকারে সেই প্রেম পাইল? এই ভাগ্যবান অবশ্যই মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন; ইহার নিকট প্রভুর সন্ধান পাইব! এই ভাবিয়া বলিলেন—

কহ জালিয়া এই পথে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥

তখন জালিয়া বলিতে লাগিল—এই দিকে আমি কোন মনুষ্য দেখি নাই। আমি সমুদ্রে মাছ ধরিব বলিয়া জাল ফেলিয়াছিলাম। সেই জাল টানিতে এক মৃত আমার জালে আসিল, আমি তখন তাহা না বুঝিয়া বড় মৎস্য মনে করিয়া যত্ন করিয়া উঠাইলাম। মৃত দেখিয়া আমার মনে বড় ভয় হইল। অতি সাবধানে জাল খসাইতে লাগিলাম, কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও তাহার অঙ্গের একটি লোমের সঙ্গে আমার অঙ্গুলির নখের স্পর্শ হইল। স্পর্শমাত্রেই সেই ভূত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—

ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছুটি চর্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধরে॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত।
মো মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত॥

সেই ভূতের কথা কহিবার নয়। আমি ওঝার নিকট যাইতেছি, যদি সে ভূত ছাড়াইতে পারে এই আশায়। আমি রাত্রে নির্জনে মৎস্য ধরি; নৃসিংহদেবকে স্মরণ করি বলিয়া আমাকে ভূত প্রেত লাগে না, কিন্তু এই ভূতের আশ্চর্য ব্যাপার—

এই ভূত নৃসিংহ নামে কাঁপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে॥

আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি ওখানে যাইও না, ওখানে গেলে সেই ভূত তোমাদের লাগিবে। জালিয়ার এই উক্তি শুনিয়া স্বরূপদামোদর বুঝিলেন যে, মহাভাগ্যবান জালিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ পাইয়াছে, এই জালিয়ার নিকটেই প্রভুর সন্ধান পাইব। এই জালিয়া

প্রেমাবেশে অস্থির হইয়াছে, কিন্তু তাহা না বুঝিয়া ভূতে পাইয়াছে মনে করিতেছে। তখন স্বরূপদামোদর জালিয়াকে সুস্থির করিবার মানসে সুমধুর স্বরে বলিলেন—

আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পালাইল।
ভয় না পাইও বলি সুস্থির করিল॥

মহাভাগ্যবান জালিয়া মহাপ্রভুর স্পর্শে প্রেমলাভ করিয়াছে, তাহাতে আবার ভয় হইয়াছে—এই দুইয়ের প্রভাবে জালিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। স্বরূপের কৃপায় তাঁর ভয় অংশ গেল, তাহাতে কিছু স্থিরতা আসিল। তখন স্বরূপদামোদর তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যাঁহাকে ভূত জ্ঞান করিতেছ তিনি ভূত নহেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে পড়িয়াছেন, তুমি আপনার জালে তাঁহাকে উঠাইয়াছ। তাঁহার স্পর্শে তোমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোদয় হইয়াছে, কিন্তু ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার মহা ভয় হইয়াছে। এখন তোমার ভয় গিয়াছে, মন স্থির হইয়াছে; এখন বল কোথায় তাঁহাকে উঠাইয়াছ, শীঘ্র আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল।

জালিয়া বলিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বার বার দেখিয়াছি, তিনি নহেন, এ অতি বিকৃত আকার।

স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার॥

এই শুনিয়া সেই জালিয়া আনন্দিত হইল এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মহাপ্রভুকে দেখাইল। সকলে গিয়া দেখিলেন মহাপ্রভু—

ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনন না যায়॥

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুর আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরাইলেন এবং বালুকা ঝাড়িয়া বহির্বাসে শোয়াইলেন। তৎপরে—

সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুর কানে॥
কতক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল॥
উঠিতেই অস্থি সন্ধি লাগিল নিজ স্থানে।
অর্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥

মহাপ্রভু সর্বদা তিন দশায় থাকিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"চৈতন্যের তিনটি অবস্থা হত"। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা এবং বাহ্যদশা।

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
অন্তর্দশা, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দশায় ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ্য নাম॥
অর্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আভাষে কহেন সব শুনে ভক্তগণে॥

এখন মহাপ্রভুর অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। মহাপ্রভু অর্ধবাহ্যদশায় কহিতেছেন—

কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে॥

এই প্রকারে মহাপ্রভু গোপীগণ সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলি লীলা অর্ধবাহ্যদশায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরিসমাপ্তিতে বলিলেন—

হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লৈয়া আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সে সুখ মোর ভঙ্গ কৈলা॥

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর কেবল বাহ্যদশা

হইল। তখন স্বরূপ গোসাঞিকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা আমাকে এখানে লইয়া আইলে কেন? তখন স্বরূপ বলিলেন—যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলে, সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসাইয়া তোমাকে এত দূরে আনিয়াছে। এই জালিয়া তোমাকে জালে করিয়া উঠাইয়াছে, তোমার স্পর্শ পাইয়া এই জালিয়া প্রেমে মত্ত হইয়াছে। আমরা সমস্ত রাত্রি তোমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, জালিয়ার মুখে শুনিয়া এখানে আসিয়া তোমাকে পাইলাম। তুমি মূর্ছাছলে বৃন্দাবনে ক্রীড়া দেখিতেছিলে, তোমার মূর্ছা দেখিয়া সকলে মনোব্যথা পাইতেছিল। কৃষ্ণ নাম লইতে তোমার অর্ধবাহ্য হইল, তাহাতেই যে প্রলাপ করিলে তাহা শুনিলাম। তখন মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাসক্রীড়া করেন গোপীগণ সনে॥
জলে ক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে॥

তদনন্তর স্বরূপ গোসাঞি মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া আনন্দিত হইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।

দেবার্চনা সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

ভগবদ্দর্শন ও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান-লাভই যে ত্রিতাপ-দগ্ধ মনুষ্যের দুঃখের আত্যন্তিক উপশমহেতু, ইহা সর্বজনবিদিত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যুগে যুগে তত্ত্বজ্ঞ সাধুমহাপুরুষগণ স্বীয় জীবনালোকে বিভ্রান্ত মানব-সমাজকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুগ্ধ দুগ্ধ বলিলে যেমন কাহারও দুগ্ধপান-জন্য তৃপ্তির উদয় হয় না, তদ্রূপ মুখে ভগবদ্দর্শনাদি শব্দমাত্র উচ্চারণ এবং তদ্বিষয়ে নানা বাদবিতণ্ডা করিলেই কাহারও ভগবদ্দর্শন হয় না। দুগ্ধপানের জন্য দুগ্ধসংগ্রহাদি উপায়ের ন্যায় ভগবদ্দর্শনের জন্যও উপায় অবলম্বন করিতে হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি। অর্থাৎ 'বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও স্বেচ্ছা-পূর্বক উপবাসযুক্ত (—রাগদ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শরীরস্থিতির অনুকূল ভোজনাদি গ্রহণযুক্ত) তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ সেই ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করেন'। কিন্তু মাত্র এই সকল কর্মের দ্বারাই ভগবদ্দর্শনাদি হয় না, ইহাদের দ্বারা সাধকের চিত্তের মলিনতার নিবৃত্তি হইয়া তাহার শুদ্ধতা ও অন্তরঙ্গ সাধনসম্পাদনযোগ্যতা সম্পাদিত হয় মাত্র। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত ইহারা ভগবদ্দর্শনের বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ভগবদ্ধ্যান, তাঁহার নামগুণানুকীর্তন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইত্যাদি অন্তরঙ্গ সাধনবলে ভগবদ্দর্শনের বা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। বৈদিক যুগে যজ্ঞ বলিতে শ্রুতি-বিহিত অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি কর্মকলাপকেই বুঝাইত। এই সকল কর্মে শ্রুতিবিহিত ক্রমানুযায়ী দেবতাগণের উদ্দেশে ঘৃত, পুরোডাশ [ইহা তণ্ডুলাদিনির্মিত এক প্রকার পিষ্টক বিশেষ], চরু ও পশু প্রভৃতি হবণীয় দ্রব্য ত্যক্ত হইত। এই বৈদিক যজ্ঞ-সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে বেদমূলক পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত নানাবিধ দেবদেবীর অর্চনা। ইহাতেও নানা দেবদেবীর উদ্দেশ্যে

বেদমন্ত্রসহযোগে নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচার নিবেদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারাই হইতেছে অধুনা ভগবদ্দর্শনের ও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান-লাভের বহিরঙ্গ সাধনভূত যজ্ঞ। বৈদিক যজ্ঞসকলে যেমন নানাবিধ বিধি, নিষেধ এবং ক্রমাদি আছে, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত বিভিন্ন দেবার্চনারূপ এই যজ্ঞসকলেও তদ্রূপ নানাপ্রকার বিধি, নিষেধ এবং ক্রমাদি আছে। বৈদিক যজ্ঞসকলের ন্যায় ইহারাও সকাম বা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারীরী, প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞসকলের ন্যায় এই যজ্ঞসকলের ফলাধায়কতাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অঙ্গহীন বৈদিক যজ্ঞসকলের ব্যর্থতার ন্যায় ইহাদের ব্যর্থতাও অধিকতর প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলেই এই দেবার্চনাদিরূপ যজ্ঞসকল অনুষ্ঠাতার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী স্বর্গাদি ফল প্রদান করে অথবা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারে সাধকের ভগবদ্দর্শন ও ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎ-পত্তির সহায়ক হইয়া থাকে। 'শাস্ত্র' বলিতে এই স্থলে যাহাতে এই দেবার্চনাসকল বিহিত হইয়াছে, সেই পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রকে এবং বেদবিহিত কর্মের ইতিকর্তব্যতার নির্ণায়ক মীমাংসাশাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের বার্তিককার পূজ্যপাদ কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

"ধর্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা।
ইতি কর্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি।"

'বেদরূপ প্রমাণের দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইলে পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র তাহার ইতিকর্তব্যতা অংশের পূরণ করিবে' ইত্যাদি। অল্পশক্তি মানবের অনুষ্ঠানসৌকর্যের জন্য দেশ, কাল ও অধিকারি-ভেদে প্রবর্তিত বেদমূলক তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্র-সকলে বিহিত কর্মসকলের ইতি-কর্তব্যতাও যে মীমাংসাশাস্ত্র হইতে নিরূপিত হইবে, ইহা অসন্দিগ্ধভাবেই বলা যায়।

এক্ষণে আমরা "যথেচ্ছকল্পিত উপচারযোগে দেবার্চনা শাস্ত্রসম্মত কি না"—এই প্রস্তাবিত বিচারের অবতারণা করিতেছি। ইদানীন্তনকালে প্রায়শ পরিদৃষ্ট হয়—বিশিষ্ট সাধক ও কর্ম-কুশল ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদিগকে প্রায় শিষ্টই* বলা যায়, তাঁহারাও দেবার্চনাকালে নানাবিধ কল্পিত উপচারের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা—শতো-পচারযোগে দেবার্চনাকালে বহু ব্যয়সাধ্য হস্তি, অশ্ব, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি উপচারস্থলে কাষ্ঠাদিনির্মিত হস্তি, অশ্ব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশদণ্ডের উপর কিঞ্চিৎ কুশাচ্ছাদন দ্বারা নির্মিত, স্থায়ী ভিত্তিবিহীন ও চটকেরও বাসের অযোগ্য তথাকথিত গৃহ এবং সার্ধহস্তপরিমিত আস্তীর্ণ কুশোপরি কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রক্ষেপদ্বারা নির্মিত তথাকথিত ক্ষেত্র ইত্যাদি দেবতাকে নিবেদন করেন। এতাদৃশ কল্পিত উপচারের বিনিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কি না—এই বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাহাতে আমাদের প্রস্তাবিত বিচারের অবয়ব হইতেছে এইপ্রকার—

বিষয়—যথেচ্ছকল্পিত উপচারযোগে দেবার্চনা।

সংশয়হেতু—পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রবিরোধ ও ইদানীন্তনকালীন বিশিষ্ট সাধকগণ কর্তৃক প্রয়োগ।

পূর্বপক্ষ—এতাদৃশ উপচারযোগে দেবার্চনা শাস্ত্রসম্মত।

সিদ্ধান্ত—পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের বিরোধ ইত্যাদি সাতটী দোষবশত এতাদৃশ দেবার্চনা অশাস্ত্রীয়।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, এতাদৃশ দেবার্চনা চিত্ত-শুদ্ধিকর।

সিদ্ধান্তে—অঙ্গবৈকল্যযুক্ত এতাদৃশ দেবার্চনা চিত্তশুদ্ধির হেতু নহে।

এক্ষণে এতাদৃশ সিদ্ধান্তের প্রতি হেতু কি তাহা বিবৃত হইতেছে—কোন কর্মে কাহার

* "যে শ্রুতিং পঠিত্বা তদর্থম্ উপদিশন্তি তে শিষ্টাঃ বিজ্ঞেয়াঃ" (মন্বর্থমুক্তাবলী, ১২।১০৯)—'যাঁহারা বেদ পাঠ পূর্বক তাহার অর্থ উপদেশ করেন, তাঁহারা শিষ্ট'।

অধিকার, তাহা 'অধিকারবিধির' দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। "ফলস্বাম্যবোধকঃ বিধিঃ অধিকারবিধিঃ" (ন্যায়প্রকাশ)—'যে বিধিবলে ফলের স্বামী অর্থাৎ ফলভোক্তা নিরূপিত হয়, তাহাকে বলে অধিকারবিধি'। আর সেই ফলের স্বামিত্ব তাহারই হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি অধিকারিবিশেষণ-বিশিষ্ট। অর্থাৎ যে যে গুণ থাকিলে কোন কর্মে অধিকারী হওয়া যায়, সেই সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই হয় কর্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং সেই ব্যক্তিই হয় সেই কর্মের ফলভোক্তা। ১। অর্থিত্ব, ২। সামর্থ্য, এবং ৩। অপর্যুদস্তত্ব প্রভৃতিই সেই গুণ (শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ১৩২৫)। 'অর্থিত্ব' শব্দের অর্থ কোন কিছু কামনাবান্ হওয়া। যেমন যে ব্যক্তি স্বর্গাদি কামনা করে, সেই ব্যক্তিই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। কিন্তু মাত্র অর্থিত্ব থাকিলেই কোন কর্ম সম্পাদন করা যায় না, তাহা সম্পাদনের 'সামর্থ্যও' থাকা আবশ্যক। 'সামর্থ্য' শব্দের অর্থ—কর্মসম্পাদনশক্তি। তাহা দুইপ্রকার—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। লৌকিক সামর্থ্য আবার দ্বিবিধ,—যথা—শারীরিক সামর্থ্য ও বিত্তজন্য সামর্থ্য। অন্ধ, পঙ্গু, বধির ও মূকাদি না হওয়াই শারীরিক সামর্থ্য। দেবদর্শন, দেবতা-পরিক্রমণ, মন্ত্রাদির অশ্রবণ ও অনুচ্চারণবশত এই অপ্রতিসমাধেয় বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ কর্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হওয়ায় কর্মে অধিকারী হইতে পারেন না।* কর্মসম্পাদনযোগ্য, ও সদুপায়ে অর্জিত ধনবান হওয়াই 'বিত্তজন্য সামর্থ্য'। পূর্বমীমাংসা-ভাষ্যকার পূজ্যপাদ শবরস্বামী বলিয়াছেন—"যো ন কথঞ্চিদপি শক্নোতি যাগম্ অভিনির্বর্তয়িতুং, তং নাধিকরোতি যজেত শব্দঃ" (জৈঃ সূঃ ৬।১।৪০ ভাষ্য)। অর্থাৎ অর্থাভাববশত যে ব্যক্তি কোন প্রকারে যজ্ঞসম্পাদন করিতে পারে না, 'যজেত' ইত্যাদি যজ্ঞবিধায়ক বিধি তাহাকে বিষয় করে না। সুতরাং বিত্তহীন ব্যক্তির যে ব্যয়বহুল কর্মে অধিকার নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে*। অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানবান হওয়াকে বলে 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য'। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে 'মন্ত্রোচ্চারণে অসামর্থ্যবশত' (শাস্ত্রদীপিকা ৬।১।৬ অধিঃ) কর্মে অধিকার হয় না। উপনয়ন, আধানসিদ্ধ অগ্নিবান হওয়া† ইত্যাদিও শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অন্তর্গত। কিন্তু সামর্থ্য থাকিলেও কর্মে অধিকার হয় না। অপর্যুদস্তত্বও থাকা আবশ্যক। নিবারিত না হওয়াকে বলে অপর্যুদস্ততা। যেমন ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞে পর্যুদস্ত, ক্ষত্রিয় সত্রযজ্ঞে পর্যুদস্ত ইত্যাদি। শাস্ত্র রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে ও সত্রযজ্ঞে ক্ষত্রিয়কে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের তত্তৎ যজ্ঞে অধিকার নাই। যাই হউক ইহা হইল অধিকারি-বিশেষণসকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। বিস্তৃত পূর্বমীমাংসাদর্শনে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত-স্থলে আমরা বলিতেছি—বিত্তজন্য সামর্থ্যের অভাবে যথাযোগ্য হস্তি ও অশ্বাদি উপচার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় এতাদৃশ ব্যয়বহুল দেবার্চনাতে দরিদ্র সাধু ও ব্রাহ্মণাদি সাধকগণের অধিকার সিদ্ধ হয় না; কারণ বিত্তজন্য সামর্থ্যরূপ অধিকারিবিশেষণ বাধিত হওয়ায় অধিকারী সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া অধিকারবিধি বাধিত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে অধিকারবিধির বাধরূপ **প্রথম দোষ** পূর্বপক্ষীর উপর আপতিত হইল।

* চিকিৎসাদি দ্বারা অঙ্গবিকলতা নিরাকৃত হইলে ইহাদেরও কর্মে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, পূঃ মীঃ ৬।১।৯ অধিকরণ। বিকলাঙ্গগণের কাম্যকর্মে অধিকার না থাকিলেও নিত্যকর্মে অধিকার আছে, পূঃ মীঃ ৬।১।১০ অধিকরণ।

* কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তিও যদি শাস্ত্রবিহিত উপায়ে দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মে অধিকার পূঃ মীঃ ৬।১।৮ অধিকরণে স্বীকৃত হইয়াছে।

† শাস্ত্রীয় ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা যে বহ্নির সংস্কার করা হয়, তাহাকে বলে আধানসিদ্ধ অগ্নি। তাদৃশ অগ্নিতেই অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞসকল সম্পাদিত হয়। (ক্রমশঃ)

ভগবান মহাবীরের শিক্ষা

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি শেষ হইবার কিছু পূর্বে জৈন চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। স্বয়ং জন্ম, জরা, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া জগতের প্রাণিগণকে জন্মজরামৃত্যুর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইবার পথ প্রদর্শন করিতে তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের কঠোর মার্গ অবলম্বন করেন এবং ঘোর তপস্যাসহায়ে কৈবল্য বা কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরে ত্রিশ বৎসর কাল উত্তর ভারতের নানাস্থানে ধর্মপ্রচার এবং সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকারূপ বৃহৎ সংঘ স্থাপন করিয়া মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরিনির্বৃত ও সর্বদুঃখ-প্রহীণ হইলেন।

ভগবান মহাবীরের পিতামাতা ভগবান পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত নিগ্রন্থ ধর্মে আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু মহাবীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত নিগ্রন্থ সম্পদায়ে মিলিত হইলেন না। তিনি একাকীই বিচরণ করিতেন। এবং নিজের পুরুষকারের দ্বারাই কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিগ্রন্থ ধর্মই প্রচার করেন কিন্তু পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের আচারে কিছু পরিবর্তন করিয়া যুগোপযোগী করিয়া লইলেন। পার্শ্বনাথের শিষ্য-পরম্পরার সাধুগণ ও তাঁহাদের গৃহস্থ সাধকগণ ক্রমে ক্রমে মহাবীরকে চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মাবলী অঙ্গীকার করিয়া তৎসম্প্রদায়ে মিলিত হন। সে সময়ে জৈন সম্প্রদায়কে নিগ্রন্থ সম্প্রদায় নামেই অভিহিত করা হইত—জৈন নাম বহু পরে প্রচারিত হইয়াছে।

মহাবীর যেমন নিজের শক্তিতে স্ব-আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ করিয়া স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রত্যেক আত্মার্থী সাধককে নিজের পরাক্রমের দ্বারাই নিজের বিকাশ সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ভগবান মহাবীর প্রচার করেন যে, বিকাশের হীনতম অবস্থা হইতে উচ্চতম অবস্থা পর্যন্ত প্রত্যেক জীবে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র আত্মা আছে যাহা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি প্রভৃতি অনন্ত গুণময়। কিন্তু এই সমস্ত আত্মা অনাদি কাল হইতে মিথ্যাত্ব বা অবিদ্যার দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বকৃত কর্মের আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই কর্মের প্রভাবে নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও মরণ-প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আবর্তিত হইতেছে। জন্ম-জরা-মৃত্যু ও তজ্জনিত ভীষণ দুঃখ হইতে কি প্রকারে চিরতরে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া আত্মা তাহার প্রকৃত স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার অমর উপদেশের মূল কথা।

মহাবীর বলিয়া গিয়াছেন,—"শুষ্ক পত্র যেমন সামান্য বায়ুর হিল্লোলে ঝরিয়া পড়িয়া যায় তদ্রূপ জীবনও আয়ু পরিপক্ক হইলে শেষ হইয়া যাইবে; অতএব, হে মানব, ক্ষণকালের জন্যও প্রমাদগ্রস্ত হইও না।" প্রত্যেক মানসিক, বাচিক ও কায়িক প্রবৃত্তির জন্য জড়দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়া তোমার আত্মার সহিত কর্মরূপে লিপ্ত হইতেছে এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করিয়া তোমাকে নানাপ্রকার সুখদুঃখ

অনুভব করিতে ও পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছে। অতএব তোমায় আচরণ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে নবীন কর্মের বন্ধন নিরুদ্ধ হয় ও সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। অহিংসা সংযম ও তপস্যাই ইহা হইতে একমাত্র উদ্ধারের উপায়।

অহিংসা পালন করিতে হইলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, জীব কয় প্রকার, জগতে কোন্ কোন্ পদার্থ জীব এবং কোন্ কোন্ পদার্থ অজীব বা জড় তাহার জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, নতুবা জীবকে জড় মনে করিয়া তাহার হিংসা সহজেই হইয়া থাকে। জৈন শাস্ত্রে জীব ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুসারে পাচপ্রকার বিভাগে বিভক্ত, যথা:—একেন্দ্রিয়, দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতিতেও প্রাণ বা জীবন আছে, ইহাদিগকে পৃথ্বীকায় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে জল, শিশির, শিল প্রভৃতিকে অপকায় অগ্নি অঙ্গার প্রভৃতিকে অগ্নিকায়; বাতাস, বাত্যা, ঘূর্ণবাত প্রভৃতিকে বায়ুকায়; বৃক্ষ; লতা, গুল্ম, শৈবাল প্রভৃতিকে বনস্পতিকায় জীব বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা প্রাণী বা জীব এবং ইহাদের একটি মাত্র ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় আছে বলিয়া ইহারা একেন্দ্রিয় পর্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত একেন্দ্রিয় প্রাণিগণকে ছেদন, ভেদন বা বিমর্দন করিলে তাহারা বেদনা অনুভব করে। অন্ধ, মূক ও বধির মনুষ্যকে যদি প্রহার বা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছেদন করা যায়, তবে সেই মনুষ্য যেরূপ বেদনা অনুভব করিলেও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, একেন্দ্রিয় জীবসমূহও সেইরূপ তাহাদের প্রতি কৃত অত্যাচারের জন্য অব্যক্ত বেদনা অনুভব করে। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ কখনও একেন্দ্রিয় জীবের হিংসা করা ছেদন, ভেদন, বা বিমর্দনাদিও করিবে না। একেন্দ্রিয় জীবের হিংসা করিলে অশুভ কর্মের বন্ধন ও তজ্জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এইরূপে কৃমি, জলৌকা প্রভৃতি দ্বীন্দ্রিয়; পিপীলিকা, উৎকুন প্রভৃতি ত্রীন্দ্রিয়; মক্ষিকা; ভ্রমর প্রভৃতি চতুরিন্দ্রিয় এবং পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেব ও নারক পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণিগণের কোনও প্রকার হিংসা করিলেও পাপ কর্মের বন্ধন হইবে ও তজ্জন্য ঘোর দুঃখানুভব অবশ্যম্ভাবী। ভগবান মহাবীর বলিয়া গিয়াছেন যে—"হে মানব, যাহাকে তুমি প্রহার করিবার ইচ্ছা কর, যাহাকে বলপূর্বক অধীন করিবার, যাহাকে পরিতাপ প্রদান করিবার বা যাহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা কর, সে তোমার ন্যায়ই সুখ দুঃখ অনুভব করে, তাহার মধ্যে তোমায় ন্যায়ই আত্মা আছে; অতএব কোনও প্রাণীর হিংসা করা উচিত নয়।" "যে ব্যক্তি জ্ঞানী তাঁহার জ্ঞানের সার ইহাই যে কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না। অহিংসা সিদ্ধান্তের জ্ঞানের ইহাই সার। ইহাই অহিংসার বিজ্ঞান।"

রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদিজনিত বিষয়ে আসক্ত হইলে হিংসা করিতে হয়, অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে সংযত করিয়া তাহাদের উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত। মহাবীর বলিয়াছেন যে—"অন্য কেহ বলপূর্বক যাহাতে আমাদিগকে দমন করিতে না পারে, তজ্জন্য আমাদের নিজকে অর্থাৎ আমাদের মন, বচন, কায়া ও ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করা উচিত।" যদি আমরা আমাদের উদ্দাম প্রবৃত্তি-সমূহকে দমন করিতে না পারি তবে আমরা আমাদেরই বিপদ ডাকিয়া আনিব। মনুষ্যের কামনার অন্ত নাই, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, "অসংখ্য কৈলাস পর্বতের পরিমাণে যদি সুবর্ণ ও রৌপ্যের রাশি কাহারও নিকট একত্রিত হয় তবুও লুব্ধ নরের আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না—মানবের তৃষ্ণা আকাশের ন্যায় অনন্ত।" "সুবর্ণ, রৌপ্য, শালি ও যবাদি শস্য এবং পশুগণ দ্বারা পরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও একজন মনুষ্যের তৃষ্ণা পুরণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়—ইহা জানিয়া সংযম পালন কর।"

"সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ সমগ্র বিশ্বও যদি একজন মনুষ্যকে প্রদান করা যায় তথাপি সে সন্তুষ্ট হয় না। অহো! মনুষ্যের তৃষ্ণা অত্যন্ত দুষ্পূর।" "ক্রোধ প্রীতিকে নাশ করে, মান বিনয়কে নাশ করে, মায়া মিত্রতাকে সংহার করে এবং লোভ সমস্ত সদ্গুণকে বিনাশ করে।" "শান্তির দ্বারা ক্রোধকে ধ্বংস কর, নম্রতার দ্বারা অভিমানকে জয় কর, সরলতার দ্বারা মায়াকে (কপটতা) বিনাশ কর এবং সন্তোষের দ্বারা লোভকে জয় কর।"

অহিংসা ও সংযম পালন করিলে নবীন কর্মের বন্ধন হয় না। নূতন কর্মবন্ধনকে নিরুদ্ধ করিয়া সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করিবার নিমিত্ত তপস্যা করা বিধেয়। তপস্যা দুই প্রকার:—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য তপস্যা ছয় প্রকার যথা:—উপবাস, অল্পাহার, ইচ্ছানিরোধ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও শরীর সংকোচন। আভ্যন্তর তপস্যাও ছয় প্রকার, যথা:—প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, পীড়িত ও আর্তগণের সেবা, স্বাধ্যায়, শরীরের প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ ও ধ্যান। এই দ্বাদশ প্রকার তপস্যার দ্বারা সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বর্তমানেও জৈনগণ উপবাসাদি তপস্যার জন্য বিখ্যাত। এইরূপে অহিংসা, সংযম ও তপস্যার দ্বারা কর্মবন্ধনকে ক্ষয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবার উপদেশ ভগবান মহাবীর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন:—যে উৎকৃষ্ট তপশ্চরণ করে, যে প্রকৃতিতে সরল, ক্ষমা ও সংযমে রত, ক্ষুধা প্রভৃতির কষ্ট যে শান্তভাবে সহ্য করে, সদ্গতি প্রাপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে পরম সুলভ।"

সমালোচনা

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য, এম্-এ, বি-টি, বি-এস-ই-এস। প্রকাশক: শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা—১২। দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬০। পৃঃ ৪৩৬; মূল্য—৭৲ টাকা।

মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়নের যৌক্তিকতা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলি এবিষয়ে প্রভূত গবেষণা চালাইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়াস পাইতেছে। ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষার মাত্র হাতে খড়ি হইয়াছে বলা যায়,—সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের সুচিন্তিত প্রয়োগ পরীক্ষা একমাত্র বহুলত গ্রন্থের সীমানায় সীমায়িত। শিক্ষার্থীকে একটা গোটা মানুষরূপে কল্পনা করিয়া তাহার মনোজগতের তরঙ্গ বিশ্লেষণপূর্বক তদনুকূল শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করা এক কথা, আর তাহাকে যন্ত্রেরই সাধন রূপে গণ্য করিয়া যান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারই একটি সহায়ক উপযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। মেকলে সাহেব এতদ্দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া সাম্রাজ্য-রক্ষার ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষত গোলা-গুলী বারুদ এবং কূটনীতির জোর থাকিলেও পরিশেষে বিদেশী শাসন যাহাদের সাহায্যে ভারতের মাটিতে দানা বাঁধিয়াছিল তাহারা হইতেছে তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। মধ্যশিক্ষার নামে ইংরেজী শিক্ষা ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, রকমারী তকমা-আঁটা 'শিক্ষিত' পুতুল কিম্বা বিনয়-বিগলিত কেরানীকুলকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া করাইয়া

নিশ্চিন্তে শাসন ও শোষণকার্য চালাইয়াছে। তাই ভারতের শিক্ষার ইতিহাস বহুলত সাম্রাজ্যবাদী-শোষণের নিষ্ঠুর ইতিহাসেরই একাংশ মাত্র। শুধু সাম্রাজ্যবাদই নহে, ফ্যাসীবাদ, একনায়কত্ব, তথাকথিত সাম্যবাদ, জঙ্গীবাদ—সর্বত্রই শিক্ষার এই নিদারুণ অমর্যাদা শাসকের কুৎসিত অভিসন্ধি সিদ্ধিমানসে শিক্ষাব্যবস্থার বিন্যাস ও পরিচালনা। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষকে অবশ্যই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবম্বিধ অনুদার শিক্ষা ব্যবস্থা ও উদার পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী করিতে হইবে। জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসমূহ রক্ষাপূর্বক বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিতে শিক্ষার্থীকে মানুষ করিয়া তোলা—ইহাই হইবে ভারতের জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'Mass Education নয়, Man Educationই আমাদের লক্ষ্য': বস্তুত ডিগ্রিধারী বা লিখিয়ে-পড়িয়ে সহস্র লোকের চাইতে একজন প্রকৃত বিদ্যাবান, জ্ঞানবান, জাগতিক ও পারমার্থিক ভাব-প্রবুদ্ধ মানুষের মূল্য অনেক বেশী। শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠার সন্ধান না জানিলে এইরূপ মানুষ-গঠনের শিক্ষা পরিকল্পনা কখনই সম্ভব নহে। সমালোচ্য 'শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থখানি এইরূপ সন্ধানী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষা পরিকল্পনা-প্রণেতার নিকট দিগ্‌দর্শনরূপে গণ্য হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রকৃত-প্রস্তাবে শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট গ্রন্থখানি অপরিহার্য। গ্রন্থকারের কঠোর শ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় গ্রন্থখানির সর্বত্র: 'এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'—এই খেদই যে গ্রন্থকারকে এই দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী করিয়াছে, তাহারও পরিচয় গ্রন্থেই পাই। তত্ত্বে এবং তথ্যে পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গসুন্দর এই শ্রেণীর গ্রন্থ আর আছে বলিয়া আমরা জানি না। মুদ্রণ এবং গ্রন্থনকার্যের ত্রুটিহীনতাও সমান প্রশংসনীয়।

—শ্রীমনকুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ১২৪।৫ বি, রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। ডিমাই আটপেজী ১০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ২৷৹ আনা।

লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি ঠাকুরের সহিত গিরিশ চন্দ্রের প্রথম পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুত গিরিশের ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ, তাঁহাকে বকলমা প্রদান, ঠাকুরের শিষ্যস্নেহ এবং গিরিশ-সাহিত্যে ঠাকুরের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই মনে হয়।

কতকগুলি উক্তির ভ্রম চোখে পড়িল। যথা, ২৯ পৃষ্ঠায়,—"জনক রাজা দুহাতে দুখানি তলোয়ার ঘুরাতেন—একখানি কর্মের আর একখানি ত্যাগের"। "ত্যাগের" নয়; "জ্ঞানের"। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ ২৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৫৪ পৃষ্ঠায়—"স্বামী বিবেকানন্দ বরাবর বলিতেন—বিল্বমঙ্গল আমি পঞ্চাশবার পড়েছি, আর প্রতিবারেই নূতন তত্ত্ব পেয়েছি"; এই উক্তি যথার্থ নয়। ৫৬ পৃষ্ঠায়,—"পরমহংস দেব মনে করিতেন না, তিনি গিরিশকে কৃপা করিয়াছেন, বরং ভৈরবাবতারের সঙ্গলাভে তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন"। লেখক শ্রীযুত গিরিশকে বাড়াইতে গিয়া একটু বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। ৬৪ পৃষ্ঠায়,—"কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হইয়াছিলেন, গিরিশ সেদিন উপস্থিত ছিলেন না।" এই উক্তি নিদারুণ ভ্রান্ত। বরং শ্রীযুক্ত গিরিশেরই সরল অকপট উক্তিতে "অদ্ধ অর্দ্ধবাহ্য দশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে

লাগিলেন"—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ৫ম ভাগ ৪০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৪৬ পৃষ্ঠায়,—"ঠাকুর বলিলেন, 'তুই ভাবিস্ নে গিরিশ, তুই আমার মত সত্য মিথ্যার পার'।" সত্যাশ্রয়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্য ও মিথ্যাকে সমপর্যায়ে ফেলিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই! গ্রন্থখানিতে ছাপার ভুলও যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

—শ্রীমায়াময় মিত্র

বেদ-পুরাণ-কাব্যে (পৃথিবী ও) ভারতের ইতিহাস—অধ্যাপক শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার-প্রণীত। প্রকাশক: রজনী গ্রন্থাগার, গুমাডাঙ্গী, পোঃ মুন্সিরহাট (হাওড়া); ডবল ক্রাউন আট-পেজী পৃষ্ঠা—২৬ ; মূল্য—২৲ টাকা।

ভারতের প্রাগ্‌বৌদ্ধ-যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস সুনিবদ্ধ করিতে গেলে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া বেদ ও পুরাণ আলোচনা অপরিহার্য। এই গবেষণা-নিবন্ধে লেখকের সেই চেষ্টাই পরিস্ফুট। তাঁহার দীর্ঘকালব্যাপী অধ্যয়ন এবং সন্ধানী স্বাধীন মননধারার ফল এই পুস্তিকাটি ভারতেতিহাসানুরাগিগণকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাম ভরসা—শ্রীরাসবিহারী বসু-প্রণীত; প্রকাশিকা—শ্রীনলিনীদেবী সরস্বতী, পোঃ ওড়ফুলি, গ্রাম চক্‌কমলা (হাওড়া), পকেট সাইজ, ৯২ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১৷৵০ আনা।

ব্যক্তিগত আবেগ দিয়া লেখা সরল কবিতায় ভগবানের নামের শক্তি ও মাহাত্ম্য-প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছে। নমুনা:—

"মিলনে বিরহে বল রাম ভরসা
স্বজন-নিধনে বল রাম ভরসা
অর্থ অপব্যা (ব্যঃ)য়ে বল রাম ভরসা
দেহমনোকষ্টে বল রাম ভরসা
জয় রাম জয় রাম সীতারাম রাম রাম।
সব রাম সবে রাম সবাই রাম রাম রাম।"

লেখক বিশ্বাস করেন, 'রাম ভরসা' ভগবৎ কৃপায় তাঁহার ধ্যানলব্ধ মহামন্ত্র। 'সব রাম, সবে রাম, সবাই রাম'—এই বাক্যেরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার আরাধনা প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পূজার কয়দিন মঠে আনুমানিক প্রায় দুই লক্ষ নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ সকাল ৬টায় পূজা আরম্ভ হইত। দক্ষিণমুখী গর্ভমন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুষ্পমাল্যশোভিত মর্মর মূর্তি যেন জীবন্তভাবে সমাসীন—পূর্বে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী—শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তির সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যভাগে সুসজ্জিত মণ্ডপে পশ্চিমমুখী দেবী-প্রতিমা। পূজা-স্থানের সন্নিকটে মুণ্ডিতশীর্ষ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জপ ধ্যান প্রার্থনাদিতে রত—সুবৃহৎ নাটমন্দিরে পুরুষ এবং স্ত্রীভক্তগণ ধীরভাবে বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন—সৌম্যদর্শন জনৈক তরুণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী—পূজক, বৈদিক এবং তান্ত্রিক অর্চনাদিতে বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনৈক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী—তন্ত্রধারক। গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারিত

হইতেছে, ধূপধুনা জ্বলিতেছে, গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচার পর পর নিবেদিত হইতেছে, মন্দিরের বায়ু-কোণে স্থাপিত চণ্ডীর ঘটের স্থান হইতে দুর্গাসপ্তশতী-পাঠের সুললিত ছন্দ শোনা যাইতেছে, দূরে সানাই প্রভাতী রাগিণীতে মায়ের বন্দনা ফুটাইয়া তুলিতেছে। অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, গম্ভীর এক ভাব-পরিবেশ! ১২টার সময় পূজাশেষে সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন—তৎপরে দেবীর ভোগ ও আরতি। প্রত্যহই সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। দেবীর সন্ধ্যারতিও বিশেষ দর্শনীয় ছিল। আরতির পর মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমবেত কণ্ঠে দেবী-বিষয়ক ভজন সঙ্গীত করিতেন। নিরঞ্জনের দিনও সন্ধ্যায় বহু-সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রতিমা-বিসর্জনের পর নাটমন্দিরে স্থিরভাবে উপবিষ্ট জনতা শান্তিজল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাষ্টমীর দিন দেবীপূজার অঙ্গীভূত কুমারীপূজা সকলের প্রাণে স্নিগ্ধ ভক্তি এবং আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল।

শাখা-আশ্রমসমূহে পূজা—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় জগন্মাতা দুর্গার পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে :—

মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশী, শিলং, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বালিয়াটি, বরিশাল, দিনাজপুর, বড়া (২৪ পরগণা), মেদিনীপুর, জয়রামবাটি, আসানসোল, মালদহ। সকল স্থানের পূজাতেই প্রধান কেন্দ্রে অনুসৃত শাস্ত্রীয় বিধির যথাযথ মর্যাদা এবং সাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আচরণ-পরম্পরার দিকে পূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহে অনুষ্ঠিত মাতৃপূজা এত জীবন্ত, হৃদয়গ্রাহী এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ মঠের পূজোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যমন্ত্রী শ্রী কে বেঙ্কটস্বামী নাইডুর সভাপতিত্বে একটি জনসভায় অধ্যাপক পি শঙ্করনারায়ণ, ব্রহ্মশ্রী শাস্ত্ররত্নাকর পি রাম শাস্ত্রীগল্ (তামিল ভাষায়) এবং স্বামী আগমানন্দ দেবীপূজার তাৎপর্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ একদিন দেবীর আরতির সময় উপস্থিত ছিলেন। দেবীপ্রতিমা দশমী-সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র নরনারীর বিপুল একটি শোভাযাত্রাসহযোগে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। শোভাযাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—বেদ, গীতা, ও সহস্রনাম আবৃত্তিরত বিদ্যার্থী ও ব্রাহ্মণগণের কয়েকটি দলের যোগদান।

বোম্বাই আশ্রমে শারদীয়া পূজাকে উপলক্ষ করিয়া দুই দিন দুটি ধর্মসভা আহূত হয়। বক্তা ছিলেন—মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ শ্রীপ্রেম পুরীজী, দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল এম্ জাবেরী, পণ্ডিত দীননাথ ত্রিপাঠী সপ্ততীর্থ, অধ্যক্ষ ডক্টর এ সি বসু, শ্রীমনোহরলাল মতুভাই, পণ্ডিত রুদ্রদেব ত্রিপাঠী, অধ্যাপক জি এন্ মাথরানি, স্বামী আদিনাথানন্দ এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। মহাষ্টমীর দিন রাত্রিবেলায় শহরের বিখ্যাত শিল্পীগণ কর্তৃক কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান, সপ্তমী ও দশমীর রাত্রে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বিরচিত 'কুরুক্ষেত্র' ও 'উমা হৈমবতী' এই ধর্মমূলক নাটক-দ্বয়ের অভিনয় এবং মহানবমীর দিন অপরাহ্ণে বিভিন্ন ধর্মের সুযোগ্য এবং বহুমানিত প্রতিনিধিগণ-সহ একটি ধর্ম সম্মেলন উৎসব-কর্মসূচির অঙ্গীভূত ছিল।

রায়লসীমায় দুর্ভিক্ষ-সেবা—১৯৫২ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত অন্ধ্র রাজ্যের রায়লসীমা অঞ্চলে (চিত্তুর, কুড্ডাপা, অনন্তপুর এবং কুর্নুল—এই চারিটি জেলা) মিশন যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত মুদ্রিত রিপোর্ট মাদ্রাজ-কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ক্লিষ্ট পরিবারসমূহে রন্ধিত ও অরন্ধিত উভয়প্রকার খাদ্য বিতরণ, শিশুগণের জন্য দুগ্ধ ও গবাদির জন্য পশুখাদ্য সরবরাহ, জলকষ্ট নিবারণার্থ পুরাতন কূপ সংস্কার ও নূতন কূপ নির্মাণ, নিঃস্বগণকে বস্ত্র ও ছাত্রগণকে পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য এবং রোগ-পীড়িতদিগের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা এই সেবাকার্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল। গৃহ, রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালী মেরামতের কিছু কিছু কাজও মিশনকে লইতে হইয়াছিল। এই সেবা-কার্যের পরিধি ছিল উপরোক্ত চারিটি জেলার ৫১৪ খানি গ্রামে। উক্ত সেবাকার্য পরিনির্বাহের জন্য মিশন মোট ৪,৫৪,০৪৯ টাকা ৵৹ আনা ৩ পাই পাইয়াছিলেন ('অন্ধ্রপ্রভা ফণ্ড' হইতে প্রাপ্ত—৩,০৮,৩১৬৵৭ পাই ; মাদ্রাজরাজ্যের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের দান—১,২৫,০০০৲ টাকা)। মোট খরচ—৪,৫২,৬৪৬৲ টাকা ৩ পাই।

উদ্বোধন

দুর্লভ

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥
—কঠোপনিষৎ, ১।২।৭

কিচ্ছো মনুস্‌সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং।
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছো বুদ্ধানমুপ্পাদো॥
—ধম্মপদং, বুদ্ধবগ্‌গো, ৪

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্‌।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥
—আচার্য শঙ্কর, বিবেকচূড়ামণি, ২

পরমসত্য সম্বন্ধে তো অনেকে শুনিতেই পায় না, আবার শুনিলেও অনেকে ধারণা করিতে পারে না। সত্যের বক্তা যেমন হাটে-বাটে মিলে না, সেইরূপ উহার উপলব্ধি-সমর্থ অধিকারীরও হওয়া চাই অতি নিপুণ। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সুযোগ্য শিষ্যের আত্মজ্ঞানলাভ—এই যোগাযোগ প্রকৃতই দুর্লভ।

মনুষ্যজন্ম লাভ করা কঠিন কথা, মর্ত্যের জীবন—তাহাও কষ্টকর, যথার্থ ধর্মের বিষয় শ্রবণ সহজে ঘটিবার নয়, আর বুদ্ধ (সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী)-গণের আবির্ভাব তো অত্যন্ত দুর্লভ।

কোটি কোটি প্রাণিনিচয়ের মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ, পুরুষদেহ-ধারণ দুর্লভতর, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—তথা, বৈদিকধর্মে নিষ্ঠা ততোঽধিক দুর্ঘট। এ সকল সত্ত্বেও প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানলাভ আরও কঠিন। তাহার পরে আসে আত্মা ও অনাত্মার বিচার এবং এই বিচার যদি যথাযথ থাকে, তবেই প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভবপর। তখনই জীব, ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমসত্যের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। উহারই নাম মুক্তি। অতি দুর্লভ এই মুক্তি শতকোটিজন্মের অর্জিত পুণ্য বিনা প্রাপ্ত হইবার নয়।

কথাপ্রসঙ্গে

একজাতি

কমল বাবু তাঁহার কতকগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনের কথা বিবৃত করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি খগেন বাবুর বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া খগেন বাবুর পা ছুঁইয়া প্রণামানন্তর অতি বিনীত ভাবে একটি চেয়ারে বসিল। খগেন বাবু পরিচয় দিলেন, তাঁহার জামাতা—কোনও বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কমল বাবু খুশী হইয়া বলিলেন, বেশ, বেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, তোমার নাম কি? যুবক কিন্তু যখন নাম বলিল 'গগন কর্মকার' তখন কমল বাবু চমকাইয়া উঠিলেন, কেননা, খগেন বাবুর উপাধি হইতেছে 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। পরিচিত মহলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থে এবং কায়স্থ-পরামাণিকে দুটি বিবাহের কথা তাঁহার জানা ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কর্মকারে এই উদ্বাহ-বন্ধন আরও বিস্ময়কর মনে হইল।

ভিতরকার ভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়া কমল বাবু যুবকের সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন,—পরে যুবক যখন অন্দর মহলে চলিয়া গেল তখন তাহার শ্বশুর খগেন বাবুর নিকট এই বিবাহ সম্বন্ধে পূর্বাপর তথ্যরাজি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। চেহারা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, চরিত্র-রীতি—কোন দিক দিয়াই জামাতাকে ব্রাহ্মণ-পরিবারে খাপছাড়া মনে হয় না। এই বিবাহের পূর্ব সূত্র অবশ্য যেমন অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে, তরুণ ও তরুণীর কলেজ-জীবনে পড়াশুনার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে। কিন্তু উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, তথা এক আদর্শ-নিষ্ঠা দেখিয়া আত্মীয়-গোষ্ঠী এবং সমাজের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করিয়াও খগেন বাবু উভয়ের পরিণয় ঘটাইয়াছেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল। আত্মীয় স্বজন যাঁহারাই জামাতার সহিত আলাপ করিয়াছেন প্রায় সকলেই এখন সন্তুষ্ট। বলিতেছেন, ভগবদিচ্ছায় এই বিবাহ বরবধূ উভয়েরই কল্যাণকর হইয়াছে।

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে সারা পথ কমল বাবু উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্মকারের সংযোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের যোগের কথা পাওয়া যায়—অবশ্য প্রায়শই পাত্র থাকিত উচ্চবর্ণের, কন্যা নিম্নবর্ণের। অতীত যুগে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শ- ও বৃত্তিগত ব্যবধান ছিল বাস্তব ও দুর্লঙ্ঘ্য। এখন সে ব্যবধান ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে না কি? শিক্ষার দিক দিয়া, পারিবারিক এবং সামাজিক আচরণের দিক দিয়া কর্মকার ছেলেটি তো বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারের ছেলেদের চেয়ে একটুও পিছাইয়া নাই—বরং কোন কোন দিকে কিছু বেশীই আগাইয়া গিয়াছে। খগেন বাবুর প্রথম পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সংস্কৃত প্রায় কিছুই জানেন না; দ্বিতীয় তনয় সংস্কৃত জানেন কিন্তু ব্রাহ্মণের আচারনিষ্ঠা বিন্দুমাত্র নাই। পক্ষান্তরে কর্মকার-জামাতাটি ভাল সংস্কৃত জানে, হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অনুরাগী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, দেবতা-ব্রাহ্মণ-তীর্থাদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বৃত্তি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারের বয়স্ক পুরুষেরা প্রায় সকলেই 'মসী-জীবী'—কর্মকার-জামাতাও তো তাহাই। তবুও কেন জাতির মানদণ্ড বাহির করা? এ ক্ষেত্রে জাতি-বিচারের যৌক্তিকতা কি স্পষ্ট বুঝিয়া উঠা যায়?

কমল বাবু কিছুকাল ইউরোপে ছিলেন। কই, সেখানে তো আমাদের ন্যায় জাতির কড়াকড়ি নাই। শিক্ষা এবং চরিত্রগত সাম্য থাকিলে তথায় সমাজের যে কোন বৃত্তির লোক যে কোন বৃত্তির লোকের

সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারে। অবশ্য, পাশ্চাত্ত্য দেশে টাকার আভিজাত্য আছে। কিন্তু সে আভিজাত্য কাহারও একচেটিয়া নয়। যাহাকে আমরা জেলে-মালা-ডোম-ছুতোর বলি তাহাদেরও একদিন ঐ আভিজাত্য লাভ করিবার কোন সামাজিক বাধা নাই। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণত্ব কিন্তু প্রাচীনকালে যাহাই থাকুক এখন যেন একচেটিয়া। অধস্তন জাতিসমূহেরও গাত্রে অধস্তনত্বের লেবেল একেবারে চিরকালের জন্ত আঁটা!

কমলবাবু 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিক ভাবে বাঙলা দেশের নানা জাতির যে ইতিবৃত্ত বাহির হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। কৈবর্ত, বাগ্দী, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বহু জাতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের এই পরিচয়গুলি পড়িলে অনেকের অনেক অন্ধ ধারণা এবং যুক্তিহীন সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যায়, তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়েরা নিম্নবর্ণদিগকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি করিতে শিখেন। বাঙলা দেশের এই সকল বিভিন্ন জাতি সমাজের এক একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। বিরাট সমাজ-দেহের সংরক্ষণ এবং পরিপুষ্টির জন্ত প্রত্যেকটি বৃত্তির প্রয়োজন আছে। এই বৃত্তি হীন, উহা সম্মানকর—এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে কোন স্বাস্থ্যকর মনন ও বিচার নাই—উহা উচ্চবর্ণের দম্ভ এবং নিজেদের স্বার্থ কায়েমী করার চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত। প্রত্যেক বৃত্তিধারীই সমাজ-সেবক, কেহই অবহেলার পাত্র নয়। উপরোক্ত জাতিপরিচিতিগুলি হইতে জানিতে পারা যায়, এই সকল 'নিম্নবর্ণীয়ে'র মধ্যেও অতিশয় বিদ্বান, পরহিতব্রতী, আদর্শচরিত্র, উদার, দানশীল ব্যক্তিসমূহ হইয়া গিয়াছেন। অতএব মহত্ত্বের সকল সম্ভাবনাই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রহিয়াছে। সুযোগ পাইলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া অনেকেই ব্রাহ্মণের গুণ লাভ করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উক্তির কথা কমল বাবুর মনে পড়িল। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, —ব্রাহ্মণকে নীচে টানিয়া আনিয়া নয়, চণ্ডালকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণের ধাপে লইয়া গিয়া জাতিভেদ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে চাতুর্বর্ণ্য-বিধান একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থা। ঐ বিধানে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার কোন স্থান ছিল না। মানুষ বিভিন্ন সংস্কার, রুচি, কর্মক্ষমতা লইয়া পৃথিবীতে আসে। এইগুলি মানিয়া লইয়া এক এক মানুষকে এক এক কাজ দিতে হইবে—ইহাই চাতুর্বর্ণ্যের মূল কথা। হিন্দু ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে 'সমাজ' কিছু মানুষের চরম লক্ষ্য নয়—চরম লক্ষ্য হইতেছে সত্যলাভ; সমাজ ঐ লক্ষ্যপথের একটা ধাপমাত্র। যে মানুষ ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে যত বেশীদূর আগাইয়া গিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রানুযায়ী, ব্রাহ্মণের আদর্শ হইতেছে এই চরম লক্ষ্যের জন্ত ঐকান্তিক সাধনা করা, তাই ব্রাহ্মণ 'সমাজশীর্ষ'। স্বামিজী শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল, কেননা, তখন পরম সত্যের ব্যাপক অনুশীলনই ছিল সকল মানুষের একমাত্র লক্ষ্য—সমাজজীবন ছিল খুব সরল—উহার স্তরভেদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। ক্রমে মানুষ যখন উক্ত উচ্চ আদর্শ হইতে নামিয়া আসিল তখন সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি পাইল,—গুণকর্মানুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইল। আবার মানুষকে তাহার সেই আধ্যাত্মিক জীবন-লক্ষ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে—সেই সত্যযুগে—সেই ব্রাহ্মণ-রূপ এক জাতিতে।

ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কমলবাবু ভাবিয়া দেখিলেন, কর্মকারের স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সামর্থ্যে ব্রাহ্মণের পাশে দাঁড়ানোর প্রতি বোধ করি আমাদের একান্ত অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। তবে একটি কথা। এখনই সকল নিম্নবর্ণকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহের ফতোয়া জারী করিতে

পারি না। উহা মৃত্যু। অন্যদেশে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে 'একজাতির' উহা পন্থা নয়।

ভারতের জীবনাদর্শ আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আদর্শলাভের উপায় চাতুর্বর্ণ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাটি একেবারে বানচাল করিয়া না দিয়া দেশকালানুযায়ী অদল বদল করিয়া লওয়া বিধেয়; স্বামিজী ঐরূপই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে ঠেঙাইয়া শূদ্রের দলে দাঁড় করানো নয়—শূদ্রকে ব্রাহ্মণ-শীল শিখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা।

বাড়ী গিয়া কমল বাবু স্বামিজীর বই খুলিয়া এই দুটি অংশ দাগাইয়া রাখিলেন :—

(১) ব্রাহ্মণত্বের যিনি দাবী করিবেন তাঁহাকে প্রথমতঃ নিজ চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ অপরকে সেই পর্যায়ে উন্নয়ন—এই দুইটি দ্বারা ঐ দাবী প্রমাণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগের কাছে আমার এই সনির্বন্ধ মিনতি তাঁহারা যেন ভারতের সনাতন আদর্শ ভুলিয়া না যান—পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, ভগবত্তুল্য মহান ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জগৎ সৃষ্টি! * * * যুগ যুগ সঞ্চিত যে সংস্কৃতি ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত আছে এখন তাঁহাকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিতে হইবে।

(২) ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলি, সবুর কর, তাড়াহুড়া করিও না। সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইও না। * * খবরের কাগজে বৃথা লেখালেখি এবং ঝগড়ায় সময় নষ্ট না করিয়া, ঘরে মারামারি এবং বিবাদরূপ পাপ না করিয়া সমস্ত শক্তিটা ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদীক্ষা আয়ত্ত করিতে লাগাও তো—দেখিবে কার্য সিদ্ধ হইবে। * * জাতিসাম্য আনিবার একমাত্র উপায় হইতেছে উচ্চবর্ণের শক্তি যে কৃষ্টি ও শিক্ষা—উহা আত্মসাৎ করা।

কোন্ পথে?

এতদিন স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা মাঝে মাঝে যে 'ষ্ট্রাইক' করিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বিষয়ে অভিযোগ আনিত এবং বিচার চাহিত—এই ধরণের ঘটনাগুলির উপর আমরা তেমন গুরুত্ব আরোপ করিতাম না—ভাবিতাম, ছেলেমানুষ, রক্ত গরম, একটু আধটু আন্দোলন করিতেছে, করুক। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ছাত্র-সমাজের মতিগতি ও ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাপক—সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লক্ষ্ণৌতে ছাত্রগণের ব্যাপক ধর্মঘট এবং 'বিদ্রোহ' সারাদেশকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে, স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুকে একটি সভায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে হইয়াছিল, ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রসমাজ গঠনের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। 'Student Unrest'-সংজ্ঞক প্রবন্ধে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় (৯ই নভেম্বর) 'হোমা' লিখিতেছেন—

"শিক্ষার্থীদের ইউনিয়নগুলি এখন 'ট্রেড ইউনিয়নের' আকার গ্রহণ করিয়াছে—শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপৃতির পরিবর্তে ঐ গুলি হইয়াছে ছাত্রদের 'দাবী' সংরক্ষণের দল। এই 'দাবী' যে কি তাহার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কার্যতঃ উহা কিন্তু রূপ লইয়াছে শ্রমিক, মালিকের নিকট যে দাবী-দাওয়া করে সেই ধরণের দাবীর। তাই দেখিতে পাই, শাস্তি বা বহিষ্কারের প্রতিরোধ হিসাবে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া ধর্মঘট প্রভৃতি অবলম্বন করিতেছে। * * * অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে শিক্ষকের ছাত্রকে পরিচালন নয়, ছাত্রগণই চায় শিক্ষককে চালাইতে। বিদ্যার্থীর উপর কোন চরিত্র-নীতি চাপানো চলিবে না, বিদ্যার্থীরাই ঐ নীতি ঠিক করিয়া লইবে। কোন ছাত্র অন্যায় আচরণ করিলে তাহাকে শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

শুধু তাহাই নয়, অন্যায়কারী বা অযোগ্য কোন শিক্ষককেও কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় হইতে অপসারণ করিতে পারেন না। * * * হয়তো এমন সময় আসিতেছে যখন ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটিতে, সিনেট, সিণ্ডিকেট এবং শিক্ষক ও অধ্যাপক নির্বাচনী বোর্ডেও প্রতিনিধির আসন চাহিয়া বসিবে !"

'হোমা' ভবিষ্যৎ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দেশনেতৃগণকে ছাত্রসমাজের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলিয়াছেন। 'তালমুড' (য়াহুদী ধর্ম-বিধান-শাস্ত্র)-এর একটি সতর্কবাণী তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"জারুজালেম ধ্বংস হইয়াছিল, কারণ তথায় শিক্ষকগণ সম্মানিত হইতেন না।"

সম্প্রতি (৮ই নভেম্বর) ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কাটজু অমরাবতীতে একটি ছাত্রসম্মিলনে ছাত্রগণকে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবার, নিয়ম-শৃঙ্খলা অভ্যাস করিবার এবং রাজনৈতিক কার্য-কলাপ হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসমিতির সভাপতি শ্রীমণীন্দ্র রায় কিছুদিন পূর্বে বেহালায় একটি বিজয়া-সম্মিলনীতে যুবকগণকে ডাকিয়া বাহিরের হৈ চৈ কমাইয়া স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দুঃস্থ ও আতুর সেবাকার্যে সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। ছাত্রেরা যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে সেই সকল মনীষীর এই ভাবে তাহাদের মধ্যে গিয়া আলাপ-আলোচনা ও সদুপদেশ দান একান্ত প্রয়োজন, সন্দেহ নাই।

আশা করি বর্তমান ছাত্রসমাজকে যথার্থ পথে চালিত করিবার দায়িত্ব যে উপেক্ষণীয় নয় দেশের শিক্ষাবিদ্, সমাজসেবী এবং রাষ্ট্রনায়কগণও দ্রুত বুঝিতে পারিয়া কার্যকরী উপায় অবলম্বন করিবেন।

মর্ম-বাণী

ডাঃ শচীন সেন গুপ্ত

তোমায় যে চাই—
এ কথা তো হায় বুঝি নাই;
এতদিন এ সংসারে চলিতে চলিতে
যাহা কিছু এসেছিল মোর অলক্ষিতে,
ষোল আনা তার—
বলেছি আমার।
তুমি সেথা নাই;
তবু সব চেয়ে তোমায় যে চাই—
এ কথা তো কভু বুঝি নাই।

তুমি আছো—
ভরিয়াছো—
হৃদয়-ভাণ্ডার মোর সুধারস দিয়ে;
ক্ষণেকের তরে সেই অনুভূতি নিয়ে
যেতেছিল প্রাণ।
সে—ই অবদান!
তোমায় যে চাই—
তবু ভুলে যাই;
সে কথা তো—তাই বুঝি নাই।

তোমায় বুঝিনা—
বুঝিতে চাহিনা;
শুধু এই টুকু নিয়ে যেন কাটে এ জীবন—
তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমিই রহিবে যখন
সব চলে যাবে—
কিছু না রহিবে,
শুধু তুমি রবে সব ঠাঁই—
সেথা আমি নাই।—
হায়, তোমার যে চাই
সে কথা তো তবু বুঝি নাই।

কেন তিনি এসেছিলেন

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তিপ্পান্ন বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন আমাদের এই পৃথিবীতে। ঈশ্বর পাওয়ার চরম ব্যাকুলতায় শরীরটাকে কতদিন তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি! শরীরের দিকে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। তবু তিপ্পান্ন বৎসর শরীরটাকে তিনি ধারণ করেছিলেন। বুঝ্‌তে হবে একটা মজবুত কাঠামো নিয়ে কামারপুকুরের চাটুজ্যে-বংশে তিনি আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। কিন্তু শরীরের গঠনের চেয়ে তাঁর মনের গঠন ছিল আরও অদ্ভুত। ভগ্নী নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন: His was, probably, the one really universal mind of modern times. তাঁর চরিত্রে নানা বিভিন্নমুখী গুণের সমাবেশ বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় আমাদিগকে সত্যই অবাক ক'রে দেয়। ব্রহ্মানন্দের আকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতোই যিনি বিহার করতেন, মাটির প্রতি তাঁর মন উদাসীন ছিল না। সংসারের খুঁটি-নাটির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল কি প্রখর! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৩য় ভাগে দেখ্‌তে পাই স্নানান্তে ঠাকুর ৺কালীঘরে যাচ্ছেন। মণি সঙ্গে আছেন। ঠাকুর মণিকে ঘরে তালা লাগাতে বল্‌লেন। তিনি জান্‌তেন সংসারে চোর-ডাকাতের অভাব নেই, আর তারা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধুকেও রেহাই দেয় না। ঠাকুর মেঘলোকে উধাও শেলীর Skylark ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylark—যার ডানা আকাশে থাকলেও নীড়কে যে ভোলে না। তিনি আমাদিগকে বলে গেছেন সাধু হ'তে, বোকা হ'তে নয়। নির্বুদ্ধিতাই এ সংসারের যাবতীয় দুষ্কার্যের মূলে। কথাটা Ruskinএর।

তিনি জানতেন মানুষের চরিত্র একরকমের মাল্‌মসলায় তৈরী নয়। তাদের সমস্যাও এক-রকমের নয়। এক একজন মানুষের এক এক রকমের সমস্যা। ঠাকুর প্রতিটি হৃদয়ের সমস্যা-গুলিকে দরদ দিয়ে অনুভব করতে পারতেন—যেন সেগুলি ছিল তাঁর নিজেরই জীবনের সমস্যা। তিনি বল্‌তেন, 'কি জানো, রুচিভেদ, আর যার পেটে যা সয়। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন—অধিকারীবিশেষের জন্য।' কেশব সেন লেক্‌চারে বললেন, 'যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুবে যাই'। ঠাকুর হেসে বললেন, 'ভক্তিনদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে তাহ'লে চিকের ভিতর যাঁরা র'য়েছেন ওঁদের কি দশা হবে?··· একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না'। কেশব সংসারী লোক। তাঁর জন্য, তাই, সারে মাতে থাকার ব্যবস্থা। কিন্তু নরেন্দ্রের বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধ'রে তিনি কি কান্নাই কেঁদেছিলেন! নরেন্দ্র ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়া। তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। একই ক্ষুরে সকলের মাথা কামাতে যাওয়া ঠিক নয়—এ সত্য ঠাকুরের মতো আর কে বুঝ্‌তো? ঠাকুর নিজে ছিলেন ক্ষমার প্রতিমূর্তি। ঈশ্বরের আবেশে ঠাকুর মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছেন। ঢং ভেবে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার অন্ধকারে এসে তাঁকে বুট জুতোর গুঁতো মারতে লাগলো। সোনার অঙ্গে দাগ হ'য়ে গিয়েছিল। সবাই বল্লে সেজোবাবুকে বলে দিতে। ঠাকুর সে ধার দিয়ে গেলেন না। আর—সবাইকে বারণ করলেন সেজোবাবুর কানে যেন কথাটা না যায়। কিন্তু সংসারীকে তিনি বলে গেছেন ফোঁস করতে, ক্রোধের আকার

দেখাতে। নইলে শত্রুরা এসে যে অনিষ্ট করবে। অবশ্য বিষ ঢাল্‌তে তিনি বারম্বার মানা ক'রে গেছেন। মাষ্টার তাঁকে বলেছিলেন :

আমার পাতের কাছে বেড়াল মুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বল্‌তে পারি না।

ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন :

কেন! একবার মারলেই বা, তাতে দোষ কি? সংসারী ফোঁস্ করবে। বিষ ঢালা উচিত নয়। * * ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

'অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাক্‌তে নাই।' এতো ঠাকুরেরই কথা। কিন্তু আবার তিনিই বলেছেন মাতালের কথা :

'যদি রাগিয়ে দাও তা হ'লে বল্‌বে, তোর চৌদ্দ পুরুষ, তোর হেন তেন,—বলে গালাগালি দিবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তা হ'লে খুব খুসী হয়ে তোমার কাছে ব'সে তামাক খাবে।'

তিনি বল্‌তেন, 'আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই।' সত্যই তিনি একঘেয়ে লোক ছিলেন না। তিনি বল্‌তেন 'দেশকালপাত্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা।' তিনি বল্‌তেন :

'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'একথা বোলো না—আমারই পথ সত্য, আর সব মিথ্যা ভুল।'

মতুয়ার বুদ্ধিকে তিনি আদৌ সমর্থন করতেন না।

ঠাকুরের কথামৃত পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে পড়ে ফরাসী মনীষী মঁতেনের (Montain) সেই অদ্ভুত কথাগুলি :

"আমাকে দিয়ে অন্যের বিচার করবার ভুল—যা সাধারণত লোকে ক'রে থাকে, আমি করি নে। তার মধ্যে যে গুণগুলি আমার থেকে স্বতন্ত্র—তাদের আমি সমাদর করতে পারি। যদিও আমি এক বিশেষ ধরণের আচরণে অভ্যস্ত তবুও অন্যদের মতো সেই আচরণ অনুসরণ করতে দুনিয়াকে আমি বাধ্য করিনে। আমি ধারণা করতে পারি এমন হাজার রকমের আচরণের যাদের সঙ্গে আমার আচরণের মিল নেই। সেই সব আচরণে আমি বিশ্বাসও করি। সাধারণ লোক যা করে না আমি তাই ক'রে থাকি অর্থাৎ আমাদের মিলের দিকটার চাইতে অমিলের দিকটাকেই বেশী তাড়াতাড়ি স্বীকার করে থাকি। তাদের জায়গায় নিজেকে ফেল্‌তে আমার কোন বেগ পেতে হয় না। তারা আমার থেকে স্বতন্ত্র ব'লে তাদের আরও বেশী ভালোবাসি, আরও বেশী শ্রদ্ধা করি।"

এ যেন ঠাকুরের কথা। ঠাকুরও বলতেন :

"তবে অন্যের মত ভুল হ'য়েছে—একথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ তিনি ভাব্‌ছেন।"

বৈচিত্র্যে প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এ বৈচিত্র্য না থাকলে পৃথিবী প্রাণহীন হয়ে যেতো। রলাঁর (Romain Rolland) সেই কথা : and variety is a necessity of nature : without it there would be no life

স্বামিজীর পত্রাবলীতে আছে :

"যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখন উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয় অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তখনই উহা মরিয়া যায়।"

এই বৈচিত্র্যে ঠাকুর বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন : 'ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।" তিনি বলতেন : 'আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও

মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক।'

দল গড়বার জন্যে ঠাকুর আসেন নি। তিনি এসেছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাতে। তিনি এসেছিলেন ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মানুষের মনকে মুক্ত ক'রে সেই মনে ঐক্যবোধ জাগাতে। যুগের কর্ণে যে যাদুমন্ত্র তিনি উচ্চারণ করলেন সে মন্ত্র হচ্ছে ঐক্য। স্বপ্ন আর কাজ, জ্ঞান আর ভক্তি আর কর্ম, ত্যাগ আর ভোগ—সব কিছুকেই তিনি স্বীকার করলেন। স্বীকার করলেন কৃষ্ণকে, খ্রীষ্টকে, মহম্মদকে। মিলিয়ে দিলেন সাকারবাদকে নিরাকারবাদের সঙ্গে। বিচারকে (Reason) স্বীকার করলেন, বিশ্বাসকেও স্বীকার করলেন। সারা বিশ্বে যে যে-মতেরই থাকুক সকলেরই জন্য প্রাণ তাঁর কেঁদেছিল। কাউকেই বাদ দিয়ে চলতে তিনি রাজী ছিলেন না। নিবেদিতা ঠিকই লিখেছেন :

A universe from which one, most insignificant, was missing, could not have seemed perfect in his eyes.

মাতাল গিরীশ ঘোষকেও বুকে টেনে নিতে কোথাও তাঁর বাধেনি।

তিনি যে সময়ে এসেছিলেন তখন বাংলার যুবসমাজের দৃষ্টি ছিল পশ্চিমের দিকে। পশ্চিমের সাহিত্য থেকে নূতনতর ভাবধারা এসে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশাত্মবোধে। ইউরোপের রুচিকে, ইউরোপের আচরণকে অনুসরণ ক'রে ভারতবর্ষ আবার জগতে গৌরবের আসন অধিকার করবে—এই ধারণা তরুণ-সম্প্রদায়ের মনে তখন ভালো ক'রেই শিকড় গেড়েছিল। প্রগতির সব চেয়ে সাংঘাতিক শত্রু তারা মনে করতো প্রতিমাপূজাকে। পৌত্তলিকতাই যে ভারতবর্ষের সমস্ত অধঃপতনের মূলে—এ বিষয়ে তারা ছিল নিঃসংশয়। স্বদেশের মর্ম থেকে অতীতকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিয়ে সেখানে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে নূতনতর ভবিষ্যতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমাদের দেশের তরুণেরা যখন বদ্ধপরিকর তখন ঠাকুর এসে তাঁর নিজের অননুকরণীয় ভাষায় তাদের বল্লেন 'তিষ্ঠ'। চম্‌কে তারা পিছন দিকে তাকালো। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লো গোঁড়া হিন্দু ধরণের এক ব্রাহ্মণ। শান্ত, সরল, নিরভিমান, পরিহাসপ্রিয়, সদাহাস্যময় পুরুষ, প্রায় উলঙ্গ বল্লেই হয়। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ কোন এক যাদুতে সেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী যুবকদের মুগ্ধ ক'রে ফেললেন। সে যাদু বিচার-বুদ্ধির অগম্য। তখনকার দিনে আকাশে বাতাসে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব। ব্রাহ্মণের খ্রীষ্টে অনুরাগ ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মসাধনাকে ইতিপূর্বে তাঁর সাধনার অঙ্গ ক'রেছিলেন। আগন্তুক তরুণদের মুখ থেকে বাইবেল শোনার আগ্রহ তাঁর প্রবলই ছিল। কিন্তু সেই আগ্রহ তাঁর কালীভক্তি কিছুমাত্র কমাতে পারলো না। তিনি বল্লেন, 'যত মত তত পথ।'

সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্ত্যের ঔদ্ধত্যের সাম্‌নে প্রাচ্য নিজেকে মনে করতো তুচ্ছ, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর। রামকৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রাচ্য বুক ফুলিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো—পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে সগর্বে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ালো। পরানুকরণপ্রিয়তার তমসাচ্ছন্ন যুগ শেষ হয়ে গিয়ে দিগন্তে ফুটে উঠলো নবারুণজ্যোতি। ঘুমের রাজ্যে ঠাকুর আনলেন জাগরণ, আত্ম-[illegible] রাজ্যে আনলেন আত্মমর্যাদাবোধ। ভারতবর্ষ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলো। আপনাকে সে চিন্‌লো। ইতিহাসের বুকে তার সুরু হোলো জয়যাত্রা। তাঁকে প্রণাম—শতকোটি প্রণাম।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব ১৩৬০ সালের পৌষ মাস হইতে উদ্‌যাপিত হইবে। সে আনন্দের দিন আগতপ্রায়। মাকে ভুলিয়া কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়াছি। এবার মায়ের অহৈতুকী কৃপায় এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আজ মায়ের স্মৃতিবিজড়িত কত কথাই না হৃদয়-পটে একে একে উদ্ভাসিত হইতেছে। মা ছিলেন অন্তর্যামিনী। আপন হৃদয়ে সন্তানের মনোব্যথা অনুভব করিয়া ব্যথাহারিণী মা তাহা দূরীকরণে নিয়তই ব্যস্ত থাকিতেন। ১৩২০ সালে ৩১শে আষাঢ় মা শ্রীধাম জয়রামবাটীতে আমাকে কৃপা করেন। উহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই মায়ের জনৈক সন্তান শ্রীমুকুন্দবিহারী সাহা তথায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দীক্ষার দিবস বৈকালে কলিকাতা যাওয়ার জন্য তাঁহার নামে একটি টেলিগ্রাম আসে। বিষ্ণুপুর ষ্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য গো-গাড়ীর কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায় মা আমাকে তাঁহার সহিত পদব্রজে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। ভোর রাত্রে যাওয়া স্থির হইল। আমাদিগকে উৎসাহিত করার জন্য মা তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার কাহিনী উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আমি এত দূর পায়ে হেঁটে যেতে পেরেছি, আর তোমরা এ পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না? তোমরাও পারবে।" আমি মায়ের আদেশ মাথা পাতিয়া লইলাম, কিন্তু অন্তরে এক ব্যথা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। মা খাইবেন, আর আমার হাতে একটু প্রসাদ দিবেন, আমি পাইয়া ধন্য হইব—এ সাধটি আমার অপূর্ণ-ই রহিয়া গেল। আমরা ভোর রাত্রে রওনা হইবার সময় মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি মা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখনও উক্ত সাধটি আমার মনে আন্দোলিত হইতেছিল। আমরা প্রণাম করিতেই মা "একটু দাঁড়াও" বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও একটি ছোট ডালায় করিয়া কিছু মুড়ি আনিয়া আমার সম্মুখে দুই এক মুঠ খাইয়া এবং মুখের কিঞ্চিৎ মুড়ি ডালার মুড়িতে মিশাইয়া ডালাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"এবার তো হয়েছে?" আনন্দের আতিশয্যে আমার মুখে কোন কথা ফুটিল না, শুধু 'মা' বলিয়া প্রণাম করিলাম। মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে ও মায়ের অযাচিত কৃপার কথা আলোচনা করিতে করিতে আমরা দীর্ঘ ২৮ মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। মায়ের আশীর্বাদে আমাদের কোন কষ্টই অনুভব হয় নাই।

রাঁচি হইতে একবার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত কতিপয় সন্তান মায়ের কাছে শ্রীধাম জয়রামবাটী যাইতেছেন। তাঁহাদের সহিত আমারও যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে উদিত হইল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু চেষ্টা করিয়াও ছুটী পাইলাম না। আমি ইহাতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। বেপরোয়া হইয়া আমিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম। কর্মস্থলে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে সে চিন্তা তখন মনে স্থানই পাইল না—শুধু এক চিন্তা—আমার মায়ের রাঙা পা দুখানি স্পর্শ করিব, হৃদয়ে ধারণ করিব।

কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলে স্বামী কেশবানন্দজী বলিলেন, "মায়ের শরীর বিশেষ ভাল নেই। আপনারা রাত্রে এখানেই থাকুন; কাল প্রাতে

মায়ের বাড়ী যাবেন।" আমি মহারাজকে বলিলাম, 'বিশেষ কোন কারণে আজই আমাকে মায়ের বাড়ীতে যেতে হবে' এবং আমি রওনা হইলাম। শ্রীশদা প্রভৃতিও রওনা হইলেন। সাধুর বাক্য প্রতিপালন না করার ফল হাতে হাতেই ফলিল। আমরা প্রায় একতৃতীয়াংশ পথ চলিয়া আসার পর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ প্রবলবেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা পথিপার্শ্বস্থ একটি গৃহের বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। উহা একটি ঠাকুর ঘর। অনেক রাত পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইল যে মায়ের বাড়ী যাওয়া কিংবা কোয়ালপাড়া ফিরিয়া আসা আমাদের পক্ষে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, ঝড় বৃষ্টি থামিবার পর শীতল দেওয়ার জন্য লণ্ঠন হস্তে একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিলেন এবং তাঁহারই সাহায্যে অনেক রাত্রে আমরা মায়ের বাড়ী পৌঁছিলাম। পৌঁছিতেই শ্রীযুক্ত কালী মামা বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—"দিদির শরীর বিশেষ ভাল নেই। আপনারা এখান থেকেই প্রণাম করুন। ঘরে জল দেওয়া ভাত আছে, তাই আজ রাত্রে আহার করুন।" পরে তিনি আমাদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য রাস্তায় আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম, একদিন মায়ের বাড়ী পান্তাভাত খাইব! এই ভাবেই মা আমাদের সে সাধ পূর্ণ করিলেন। পরদিন প্রাতে আমরা মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিতেই মা বলিলেন,—"আমার দেহটা ভাল নেই। তোমরা এসেছ জেনেও তোমাদের খোঁজ করতে পারি নি। তোমরা এজন্যে দুঃখ করো না।" তারপর স্নেহভরে বলিলেন,—"এমনি গোঁ করে কি আসতে আছে? রাস্তায় কত কিছু হন্‌হনিয়ে চলে। ঠাকুর রক্ষা করেছেন, ঠাকুর রক্ষা করেছেন।" আমি বলিলাম, "মা, ঠাকুরকে তো দেখি নি। তুমিই আমার ঠাকুর।" তখন মা দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমিই তোমার ঠাকুর। সব সময় মনে রেখো ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন।" শ্রীশদা প্রভৃতি মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম, "মা, ওরা ছুটি নিয়ে এসেছে। আমার ছুটি হয় নি। তুমি যদি বল 'তুই থাক্' তাহলে বিশ্বে আমার এতটুকু অনিষ্ট করার সাধ্য কাহারও নেই। মা, আমার যে যেতে ইচ্ছে করে না।" মা তখন বলিলেন,—"তাই তো ছুটি হয় নি, কিন্তু না খেয়ে কি করে যাবে? কোয়ালপাড়া মঠে সকাল সকাল ঠাকুরের ভোগরাগ হয়, সেখানে প্রসাদ পেয়ে গেলে হয় না?" আমি বলিলাম,—"মা, প্রসাদ পেতে হয় তো তোমার প্রসাদই পাব। আমি আর কোথাও প্রসাদ পেতে যাব না। আমি এমনিই চলে যাব। তোমার চরণ স্পর্শ করতে পেরেছি, আর আমার কোন ক্ষোভ নেই।" কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা আমাকে বলিলেন,—"না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ওদের সঙ্গেই আনন্দ করে যাবে।" আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মাকে বার বার প্রণাম করিলাম। পরে ছুটিয়া গিয়া শ্রীশদাকে এই খবর দিলাম।

স্নেহময়ী জননী আমার! সন্তানের ব্যথায় এমনি করিয়া তোমার স্নেহ উথলিয়া উঠে। আর সেই স্নেহধারা বিতরণে সন্তানকে আনন্দ-সাগরে ভাসাও। এর কোন হেতু নাই, এ তোমার অহেতুক স্নেহ, অহৈতুকী কৃপা।

মহানন্দে দিন কাটিতে লাগিল। এই সময় ভানু পিসীর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি পান সাজিয়া ভক্তদের মুখে গুঁজিয়া দিয়া বলিতেন,—"ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছি।"

কয়দিন মহানন্দে কাটাইয়া রাঁচি ফিরিবার সময় সুধীরা দিদিও আমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত চলিলেন। তাঁহাকে তুলিয়া দেওয়ার জন্য মা গো-গাড়ীর কাছে আসিলেন।

আনন্দে ভরপুর হইয়া রাঁচি ফিরিলাম। ছুটি না লইয়া আফিসে অনুপস্থিতির জন্ম দণ্ড হইতে অভাবনীয়ভাবে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। বুঝিলাম মহামায়ারই খেলা।

মায়ের নিকট কত আবদারই না করিয়াছি, আর মা অম্লানবদনে সেই সব আবদার রক্ষা করিয়াছেন। একদিন জয়রামবাটীতে মা তাঁহার রাঙ্গা পা দুখানি ঝুলাইয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আবদার করিলাম, 'মা, আমার বড় সাধ তোমার রাঙ্গা পা দুখানি আমার হৃদয়ে তুলে ধরি'—এই কথা বলিয়াই মেঝেতে শুইয়া পড়িলাম। মা হাসিতে হাসিতে 'ছেলের যত সাধ' বলিয়া রাঙ্গা পা দুখানি আমার হৃদয়ে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহানন্দে উঠিয়া বসিলাম, আর বলিলাম,—"মা, এবার আমার মাথায় একটু জপ করিয়া দাও।" আনন্দের সহিত মা আমার মাথায় জপ করিয়া দিলেন।

একদিন মাকে প্রার্থনা জানাই,—"মা, তোমার ঠাকুরপূজা দেখব।" মা বলিলেন,—"ও আবার কি দেখবে।" পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত কালী মামার বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, কে যেন বলিল—'মা পূজায় বসেছেন।' আমি ছুটিয়া গিয়া দেখি পূজা প্রায় শেষ। মা একটি পুষ্পহস্তে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছেন—যেন নিশ্চল প্রতিমা, আর সুধীরা দিদি মাকে ব্যজন করিতেছেন। পাখাসহ তাঁহার হাতখানাই শুধু নড়িতেছে—আর সব স্থির। সে দৃশ্য অনুভূতির, ভাষায় বর্ণনীয় নহে। আমি নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। পূজান্তে মা বলিলেন, "পূজা দেখা হল বাবা?" আমি দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। আর একদিন মাকে বলিলাম,—"মা, তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে, কেউ চোখ চেয়ে ঠাকুরকে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর-দর্শন হল না।" মা তখন বলিলেন,—"স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।" তারপর মা খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"একদিন কোয়ালপাড়ায় ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে প্রণাম করে আমার শোবার ঘরে যেয়ে দেখি ঠাকুর মেঝেতে শুয়ে আছেন। আমি বলিলাম, 'সে কি গো, তুমি অমনি করে শুয়ে?' ঠাকুর বললেন, 'আমার বড় ভাল লাগে'।" মা একথা বলিতে বলিতে কি রকম যেন হইয়া গেলেন, আর কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি বলছি ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।" মায়ের স্নেহবিগলিত করুণার কথা ভাষা দিয়া প্রকাশ করা আমার সাধ্যের অতীত।

আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে একটি কথা। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমীর দিন বৈকুণ্ঠদা (ডাক্তার) যখন মায়ের নিকট হইতে গেরুয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন, আমি সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার প্রাণে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। আমি সুযোগমত মায়ের চরণতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলাম,—"মা, আমাকেও বৈকুণ্ঠদার মত গেরুয়া দিতে হবে। স্বামিজী বলেছেন, সন্ন্যাস না হলে জীবের মুক্তি নেই।" মা তখন আমাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"সে তো সত্যি কথা। তবে কি জান সন্ন্যাস মানে অন্তর-সন্ন্যাস। বাহির-সন্ন্যাস অন্তর-সন্ন্যাসের সহায়তা করে, তাই যার দরকার মনে করি তাকে দেই। তোমার দরকার নেই। তোমার অমনিই হবে।" এই বলিয়া মা ঠাকুরের প্রসাদী এক গ্লাশ সরবৎ হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। বাহিরে উঠানে মা তাঁহার পরিহিত একখানা কাপড় শুকাইতে দিয়াছিলেন। সেই কাপড়খানা ভাঁজ করিয়া আনিয়া

আমাকে দিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানা নাও।" আমি দুহাত পাতিয়া কাপড়টি লইয়া মাথায় স্পর্শ করিতে লাগিলাম, আর সব ভুলিয়া গেলাম। মা তখন বলিলেন,—"তুমি যে সংসারে আছ তাহা ঠাকুরের সংসার জানবে। তুমিও ঠাকুরের—। কাজেই ঠাকুরের সংসারে যারা আছে তাদের সেবায় জন্ত কাজ করে যাবে। যা কিছু কর সবই ঠাকুরের কাজ জেনে করবে।" মায়ের দেওয়া কাপড়খানা মায়ের কাছ হইতে যেভাবে পাইয়াছিলাম সেটি আজও সেইভাবেই রক্ষিত আছে। কাপড়টি যখনই স্পর্শ করি তখনই মায়ের শ্রীচরণ-স্পর্শসুখ অনুভব হয়।

দধীচি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

দেবাসুর-রণে দেবতারা যবে মানি' নিল পরাভব,
স্বর্গপুরীর মুছে গেল দ্যুতি, রহিল না গৌরব।
ইন্দ্র-বরুণ-যম-হুতাশন, সূর্য-চন্দ্র-আদি দেবগণ,
বিষাদ-সাগরে হ'ল নিমগ্ন, হ'ল হৃতবৈভব!

কাঁপায়ে তুলিল সারা ত্রিভুবন অসুরের উল্লাস,
ধ্বনিয়া উঠিল বিজয়-নিনাদ ভরি' অনন্তাকাশ!
শিব-বরে বলী বৃত্র অসুর, জিনিয়া লইল নন্দন-পুর,
বসি' রাজাসনে লইল মিটায়ে মনের যতেক আশ।

ব্রহ্মা-সকাশে আসি' দেবগণ, করি' শির অবনত,
পরাজয়-গ্লানি বক্ষে বহিয়া জানাল বেদনা যত।
কহে করপুটে—"হে চতুরানন, অসুরের করে সহি' নিপীড়ন,
হ'য়েছি স্বর্গ-ভ্রষ্ট আমরা, হয়েছি ভাগ্যহত!"

"হে মহাস্রষ্টা, বিশ্বস্রষ্টা, মোরা আজ নিরুপায়,
নির্জিত মোরা, লাঞ্ছিত মোরা, মোরা আজ অসহায়!
দুর্গত মোরা—কর প্রতিকার, কেমনে স্বর্গ হ'বে উদ্ধার?
আশার আলোক দাও তুমি জে'লে নিদারুণ হতাশায়!"

কহিল ব্রহ্মা—"অসুর-জয়ের উপায় ত' কিছু নাই,
শিব-বরে বলী বৃত্র-অসুর, অজেয় হয়েছে তাই।"
সহস্র-আঁখি করিয়া সজল, কহিল ইন্দ্র ব্যথা-বিহ্বল,—
"পাব না তবে কি কখনো আমরা স্বর্গপুরীতে ঠাঁই?"

"একটি উপায় এখনো রয়েছে, শুন তবে দেবগণ!"
আশ্বাসময় করুণা-বাক্যে কহিল চতুরানন,—
"যাও ধরাধামে দধীচির পাশে, তাঁহার অস্থি-ভিক্ষার আশে,
তাই দিয়ে গড় কঠিন বজ্র—মহাস্ত্র অতুলন!

"হে বজ্রপাণি, যাও ত্বরা করি', দূর কর অবসাদ,
অসুরে জিনিয়া লভ পুনরায় বিজয়-আশীর্বাদ!
বৃত্র-দর্প কর চুরমার, সংগ্রামে তারে কর সংহার,
দাও মুছে দাও স্বর্গপুরীর কলংক-অপবাদ!"

ব্রহ্মা-চরণে জানায়ে প্রণতি অসীম ভক্তিভরে,
আসিল ইন্দ্র দধীচি মুনির সন্ধান-লাভ তরে।
দেখিল, অদূরে মহাতপোধন, ধ্যান-আবিষ্ট যুগল নয়ন,
কি যেন শান্ত ভাবের আবেশ মুখমণ্ডল 'পরে!

বন-প্রকৃতির স্নিগ্ধ মাধুরী বিছায়েছে মধু-মায়া,
কোন্ ভুবনের অলক্ষ্য-রূপ হেথায় পেয়েছে কায়া!
হেথা জীবনের নাহি চপলতা, ভোগের লাগিয়া নাহি আকুলতা,
শান্তি হেথায় মেলিয়া রেখেছে শান্ত জীবন-ছায়া!

তপোবন-রূপ দেখিতে দেখিতে দেবরাজ উপনীত—
মহাতপোধন দধীচি যেথায় যোগাসনে সমাহিত।
ক্রমে ক্রমে ঋষি মেলিয়া নয়ন, দেখি' ইন্দ্রের মলিন আনন,
কহিল,—"কি হেতু তব আগমন? কেন এত ব্যাকুলিত?"

ইন্দ্রের মুখে নাহি সরে ভাষা, রহে সে অচঞ্চল,
নিদারুণ বাণী জানাতে ঋষিরে কাঁপে অন্তর-তল।
দেখি' দেবরাজে বাক্যবিহীন, দধীচি আবার ধ্যানে হ'ল লীন,
অন্তর মাঝে [illegible] সম হ'ল সব উজ্জ্বল!

স্নেহে সম্ভাষি' কহে তপোধন,—"বুঝিয়াছি দেবরাজ,
তব আগমনে ধন্য হইল মোর আশ্রম আজ!
দেবতার লাগি' দিব এ জীবন, ইচ্ছা তোমার করিব সাধন,
আমার সকাশে কহিতে এ বাণী, কি তব শংকা-লাজ?

"তুচ্ছ এ তনু, তুচ্ছ জীবন, মিছা মায়া তা'র তরে,
পরহিতার্থে যদি যায় প্রাণ, দিব আমি অকাতরে!"
কহিল ইন্দ্র ঋষি-পদ চুমি', "ত্রিভুবন মাঝে ত্যাগ-বীর তুমি,
এ কীর্তি তব র'বে উজ্জ্বল অক্ষয় অক্ষরে!"

ধ্যানে পুনরায় বসিলেন ঋষি সুস্থির করি' মন,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি' প্রাণবায়ু হইল নির্গমন।
শিষ্য যতেক হইল আকুল, আশ্রয়হারা যেন তরুমূল,
বিয়োগ-ব্যথায় কেঁদে কেঁদে ওঠে শান্ত সে তপোবন!

* * *

অজেয় বৃত্রে করিতে নিধন দধীচির পঞ্জরে,
বিশ্বকর্মা রচিল বজ্র অতি সুনিপুণ করে।
দেবতার মাঝে প'ড়ে গেল সাড়া, সাজ-সাজ-রবে বাজিল নাকাড়া,
গর্জি' উঠিল ভেরী-দুন্দুভি মেঘ-মন্দ্রিত-স্বরে!

দেবতা-অসুরে মহা সমারোহে বাধিল আবার রণ,
মহা হুংকারে উদ্বেল নভ, কম্পিত ত্রিভুবন!
ভরি' দিগ্‌দেশ বিষ-নিঃশ্বাসে, রোষে আক্রোশে অসুরেরা আসে,
দেবতারা ছুটে মহা উল্লাসে করিয়া বিজয়-পণ!

মেঘের আড়ালে বজ্র হস্তে দাঁড়ালো পুরন্দর,
সহস্র আঁখি ঝলকি' উঠিল—উজলি' দিগন্তর!
দেখি সে দৃশ্য অতি বিভীষণ, বৃত্রাসুরের স্পন্দিত মন,
যেন কি শংকা মহা বিভীষিকা ছেয়ে গেল অন্তর!

অমোঘ বজ্র হানিল ইন্দ্র লক্ষ্যি' অসুর-রাজে,
আছাড়ি' পড়িল বৃত্রের দেহ রণস্থলের মাঝে।
ত্রিভুবনে ওঠে দধীচির জয়, দেবতারা পুন হ'ল নির্ভয়,
রাজাসনে পুন বসিল ইন্দ্র স্বর্গ-অধীশ-সাজে!

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সামঞ্জস্য

স্বামী কৃষ্ণাত্মানন্দ

তত্ত্বদর্শী ঋষিমুনিগণের উপলব্ধ উচ্চ ভাব বা তত্ত্বসকল যেরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না, সেইরূপ সত্ত্বগুণঘন ভগবান রামকৃষ্ণদেবের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব এবং উপদেশসমূহও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং উপদেশরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতীত বুঝিতে পারা কঠিন। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) বলিতেন,—"ঠাকুর যেন সূত্র, স্বামিজী তাহার ব্যাখ্যা",—অর্থাৎ ঠাকুরের জীবনকে যদি দর্শনাদি শাস্ত্রের সূত্রস্থানীয় মনে করা যায়, তবে স্বামিজীকে বুঝিতে হইবে ঐ সূত্রসমূহের ভাষ্য বা ব্যাখ্যাস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাদি পাঠান্তে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পড়িতে তাঁহাদের উপদেশ-সমূহে আপাতত বিরুদ্ধ ভাবপূর্ণ কথাসমূহ দেখিতে পান এবং ঐ সকল কথার পরিষ্কার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কালীঘাটে যাইয়া আগে যো সো করে কালী দর্শন করে নাও, তারপর যত ইচ্ছা পারতো দান ধ্যান কর, মজা দেখে বেড়াও ক্ষতি নাই। অপর পক্ষে স্বামিজী বলিতেছেন,—আর্ত, অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, রুগ্ন নারায়ণরূপী ইহাদের সেবা কর; গ্রামে গ্রামে যাইয়া অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষা দান কর; ইহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে সহায়তা কর, জীবরূপী শিবের সেবা কর—ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন এই—কালীদর্শন করারূপ ঈশ্বরদর্শন বা জ্ঞানলাভ আগে অথবা দান-ধ্যান করারূপ স্বামিজী-কথিত নিঃস্বার্থ পরোপকার আগে করিতে হইবে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণের মতে কিন্তু দুইটিই যথার্থ এবং অবিরোধী ভাব। তাঁহারা বলেন—একটি উদ্দেশ্য, অপরটি উপায়। ঈশ্বরদর্শনের যোগ্যতা অর্জন না করিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিলেই কি আর ঈশ্বর দর্শন করা যায়? অপরদিকে শরীর মন ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করিবার উপযুক্ত হইলে কি আর কেহ তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হন? সুতরাং স্বামিজী-বর্ণিত নিঃস্বার্থ সেবা বা পরোপকার করারূপ দান-ধ্যান—যাহা কর্মযোগ বলিয়া খ্যাত, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা, ক্ষুদ্রতা নষ্ট হইয়া চিত্ত ক্রমশ নির্মল ও উদার হইয়া ঈশ্বর-বস্তুরূপ উচ্চতত্ত্ব ধারণা করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তাহা অবশ্যই পূর্বে অনুষ্ঠেয়।

স্বামিজী ঠাকুরের ভাবসমূহ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রাঞ্জল করিয়া জগতের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার উক্তিসকল পৃথিবীর এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া দিন দিনই শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

স্বামিজী-প্রদর্শিত নিষ্কাম কর্মযোগরূপ সাধন-পথ যদিও সম্পূর্ণ নূতন নয়, তথাপি উহা নূতনই বলা যাইতে পারে, কেন না, জীবনের প্রতিকার্যটিই—যে কোন ব্যক্তির, যে কোন অবস্থায় নিষ্কামভাবে করিবার যে কৌশল তিনি নরনারায়ণ সেবা বা শিবজ্ঞানে জীবসেবা করারূপ অপূর্ব শব্দসাহায্যে প্রচার করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও কেহ বলেন নাই। এই নিঃস্বার্থ পরোপকার বা সেবাদ্বারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রত্ব, অহঙ্কার, অভিমানাদি-রূপ রজঃ ও তমোগুণপ্রসূত আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভের বিঘ্নসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজে দূর করিয়া ঈশ্বরদর্শনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। অবশ্য

ইহাতেও নির্মমভাবে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব, শারীরিক বা মানসিক সুখভোগের বাসনা, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মোহ, মমতাদি সমূলে ত্যাগ করিতে হয়। ইহাতেও সদা সচেতন না থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার যথেষ্টই ভয় বা সম্ভাবনা থাকে। স্বার্থদুষ্ট মন কর্মযোগের নামে যাহা কিছু করে সকলই ভগবানের সেবা বা নিষ্কামভাবে করিতেছি, এই অছিলায় নিজ স্বার্থ, নাম, যশ, ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপ প্রবঞ্চনা-কালে সাধক বুঝিতে পারে না যে, সে নিজেই নিজেকে ঠকাইতেছে। প্রবল আসক্তিবশতঃ মনের এইরূপ প্রবঞ্চনা করিবার স্বভাব সকল সাধনপথেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তিযোগী যিনি তিনিও যদি নিজ অন্তঃকরণের সুপ্ত ভোগবাসনা-সমূহের প্রতি অবহিত না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হয়। "স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র" পাঠে দেখিতে পাই তিনি জনৈক ভক্তকে লিখিতেছেন—"* * * তবে তাঁর আনন্দে আনন্দ সেবার এই ভাবটী ভুল না হইলেই মঙ্গল, কিন্তু প্রায় হইয়া পড়ে ঠিক বিপরীত। প্রভুর সেবা না হইয়া আত্মসেবাই হইয়া পড়ে। এইটাই সেবাধর্মের এক মহা অনর্থকর পরিণাম। খুব হুঁশিয়ার, খুব সমনস্ক, প্রার্থনাপরায়ণ, বৈরাগ্যবান হইলে তবে ইহা হইতে রক্ষা। অপরিপক্ক অবস্থায় সকল ধর্মই চ্যুতিভয়-যুক্ত। ভগবানে প্রেম গাঢ় হইলে আর কোনও ভয় থাকে না। কিন্তু সে প্রগাঢ় ভাব স্বার্থসম্বন্ধরহিত না হইলে ত হইবার উপায় নাই। যে দিক দিয়েই যাও, অহংভাব, স্বার্থ, স্বাত্মভোগেচ্ছা দূর না হইলে কোন ধর্মেরই সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হয় না।"—ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তিপথও যে নিষ্কণ্টক তাহা বলা চলে না। সেইরূপ জ্ঞানপথ বিচারমার্গেও সাধক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনসকলের অনুশীলনে যত্নবান না হইয়া কেবল চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্-আদি দীর্ঘ ধ্বনি-সহায়ে নিজেকে সাধকাগ্রণী বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। অপরদিকে দৈহিক ও মানসিক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সকলেও আসক্ত থাকিয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। সুতরাং সাধকমাত্রকেই সদা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে নিজ নিজ মনবুদ্ধিকে অভীষ্টপথে পরিচালিত করিতে হয়। আর ইহা দুই চার মাস কি বৎসর, এমন কি এক জীবনেরও কাজ নয়। এইরূপ জানিয়া ধৈর্যের সহিত আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বামিজী তাঁহার কর্মযোগের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে, এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি স্বার্থপূর্ণ ই থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে যখন আমরা মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন দিন আসিবে যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমরা ইহাতে সক্ষম হইব সেই মুহূর্তে আমাদের শক্তি এক কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।"

কর্মযোগের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত প্রকারে রজো-গুণোদ্দীপক, মনশ্চাঞ্চল্যবৃদ্ধিকর প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া যদি কেহ বলেন যে, কর্মযোগের চেয়ে ভক্তিযোগ সহজ পথ—ইহা স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, যথা—'কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি।' আবার তাহা অপেক্ষাও কেবল

নামজপরূপ সাধন আরও সহজ, একমাত্র নামজপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে,—যথা "জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ; জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ" এইরূপ মহাপুরুষ-বচন এবং ঐরূপ উদাহরণও রহিয়াছে—তদুত্তরে পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা ছাড়া, স্বামিজী "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহাও স্মরণ করিলে এ বিষয়ে তাঁহার কি সিদ্ধান্ত তাহা পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। তিনি বলিতেছেন,—" 'ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি', 'হরিনামে সর্বপাপনাশ' 'শরণাগতের সর্বাপ্তি' এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছো যে লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত প্রভু যা করেন বলছে এবং পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে—কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে—অর্থাৎ যে ধার্মিক"—ইত্যাদি।

সাধনার ক্রম-অনুযায়ী রজোগুণের উদ্দীপনার দ্বারা তমকে এবং পরে সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা রজোভাবকেও অতিক্রম করিয়া সর্বশেষে গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের মনে রজঃ এবং তমোগুণেরই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহার মধ্যে যিনি পূর্বজন্মের অশেষ সুকৃতিবশতঃ এবং ঈশ্বরকৃপায় প্রথমোক্ত গুণ দুইটির সীমা অতিক্রম করিয়া বিমল সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, তিনি আমাদের সকলের নমস্য। কিন্তু সাধকজীবনে পা বাড়াইয়াই যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ উদ্দীপিত হইয়াছে, তবে তাহাও স্বামিজীর উক্তি-সহায়ে পরীক্ষা করিয়া নেওয়া উচিত। স্বামিজী বলিতেছেন,—"সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি এ কথার জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—'ফলেন পরিচীয়তে।' সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্বলোক-পূজ্য—।" ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে সত্ত্বগুণভ্রমে তমোগুণের আবরণ-শক্তিদ্বারা কি ভাবে আমাদের প্রতারিত হইবার ভয় আছে—স্বামিজী তাহাও যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল? যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

"অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের

মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?"—ইত্যাদি।

সুতরাং আমাদিগকে সাবধানতার সহিত নিজ নিজ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। স্বামিজীর নির্দেশমত না চলিলে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ভয় চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। অনেক সময় আমরা নিজেদের মানসিক ঝোঁকের বশবর্তী হইয়া কর্তব্যাকর্তব্যবোধ হারাইয়া ফেলি, ফলে নিজের এবং অপরের অনুশোচনার বিষয় হইয়া পড়ি। সুতরাং আমাদিগকে সর্বদাই অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তমোগুণ-প্রভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া মানুষ কি ভাবে নিজের দ্বারাই নিজে প্রতারিত হয়, স্বামিজী-লিখিত 'ভাববার কথা'-শীর্ষক উদাহরণ-গুলিতে তাহা বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে তাহারও দু' একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। স্বামিজী বলিয়াছেন, যথা—"ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুসী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিট্‌কেল আওয়াজে বারম্বার বল্‌তে পার্‌লেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু'চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজি কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলি নি!!" . * * *

"ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো ম'রে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তার কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন। তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী—'আত্মা মরেনও না, মারেনও না' এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলা-পুরীর আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরীজির মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্য জীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কেন মুহূর্তমাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

"ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়ে আহাম্মক ঠাওরেছেন।" * * * *

"বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই। শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা ভাঙ্ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর বল দেখি? রামচরণ—'সে সোজা কথা মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।' রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?" ইত্যাদি।

উপরে উক্ত উদাহরণগুলি দ্বারা স্বামিজী আমাদিগকে আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে সতত সাবধান থাকিতে বলিতেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসুখ ত্যাগ করিবার ভাব যাঁহার হৃদয়ে যত অধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, তিনি ততই ঈশ্বরানুভূতির বা জ্ঞান-লাভের নিকটবর্তী হইবেন। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়বার্তা-প্রচারকারী, হৃদয়বান, আশ্রিতজনপালক, অশেষ-লোককল্যাণকারী স্বামিজীর চরণে এই প্রার্থনা—তিনি আমাদিগকে সর্বদা অসম্ভাবনা—বিপরীত ভাবনা হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে আদর্শাভিমুখে অগ্রসর হইতে আশীর্বাদ করুন।

উদ্বোধন

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে,
ব্যষ্টি-জীবন ছাড়ো—ছাড়ো দলগতপ্রাণ,
ব্যক্তিস্বার্থচিন্ততারে।
জগতে যেথা যত হীনজন
করে কি রে জয় সংগণমন?
আজ নয় কাল তার নয় জয় হয় ক্ষয়,
দেখাও অকূল হৃদ্যতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততারে।

শত হোক্ পিচ্ছিল হও পথে আগুয়ান
তোমরাই তোমাদের লাগিয়া,
হও করমেতে বীর মুছি' সবে আঁখিনীর
শত শুভ কল্যাণ মাগিয়া।
দুস্তর দিনে বাধা অনিবার,
ক্ষতি নাই করো গতি দুর্বার,
জীবনের যাত্রায় হোক্ নীল অভিযান,
ধরো মুখে হাসি-হৃষ্টতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

কভু ক্ষুৎপিপাসার ক্ষুদ-গুঁড়া সঙ্কটে
নিখিলের বণ্টন মানিও,
তোমাদের পরিচয় যুগে যুগে অক্ষয়,
তোমরাই তোমাদের জানিও।
সৎপথ, সদাচারী জীবনের
হানি যেন দেখি নাক' তোমাদের,
সাম্য ও মৈত্রীর সন্ধান মিলিবেই
দূর করো যদি হিংস্রতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

ধৈর্যের বন্ধনে শুধু যাও বেঁধে বুক,
হোক্ মন পর্বতগম্ভীর,
নন্দন-নর্তনে ছন্দিত করো দেশ,
কোন্দল ছেড়ে হও ধীর-স্থির।
ধ্বংসের কোলাকুলি কেন হায়!
কাজ নাই বোমা সাহসিকতায়,
প্রেম কাছে আগ্নেয় অস্ত্র যে কিছু নয়,
ধরো গান একতান দো-তারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

অনাগত দিন বহু সম্মুখে তোমাদের,
থাক্ পথে জীবনের ক্লান্তি
দুঃখের মেঘে ঢাকা হসিত হিরণ্ময়
ছড়াবেই আলোক প্রশান্তি।
দূর হবে যত ভয়-শঙ্কা,
বাজিবেই শুভ জয়ডঙ্কা,
মিছিলের বন্যায় উদাসীন হ'বে লীন,
ধনী আর গরীব কি কথা রে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

বেদ-পুরাণসম্মত ভারতেতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা

অধ্যাপক শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, এম্-এ

রামায়ণে আর্যসভ্যতা-বিস্তারের একটি সুচিন্তিত পন্থা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দণ্ডকারণ্য থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম ভারত ও লঙ্কাদেশের অধীশ্বর বৈদিক সভ্যতায় প্রভাবান্বিত অনার্য রাবণ-রাজ—যাঁর অধিকার দশদিকে বিস্তৃত থাকায় তিনি দশগ্রীব রাবণ নামে খ্যাত ছিলেন, তখন উত্তর ভারতে আর্যাধিকারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি বিস্তার করে তাদের শান্তিনাশের জন্য চেষ্টিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ সুদূর দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত—যেখানে বহুদিন ধরে ইক্ষ্বাকুদের রাজ্য ছিল—বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে তাঁদের ধ্যান-ধারণার উপযোগী আশ্রম সকল স্থাপন করে অনার্যগণের মধ্যে নৈতিক প্রভাবের দ্বারা ধীরে ধীরে আর্যসভ্যতার বিস্তার করে চলেছেন। অত্রি-ভরদ্বাজ-অগস্ত্যাদি ঋষিগণ এই সভ্যতার শাস্ত্রোজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করে ও সারা ভারতময় তপোবন-সৃজনে এতই দৃঢ়নিষ্ঠ যে, এখন পর্যন্ত তাঁরা যেন একার্য হতে বিরত হন নি—পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত। অগস্ত্য ঋষিই এই কার্যে অগ্রণী হয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করেন নি এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত (একেই বলা হয় অগস্ত্যযাত্রা)। এরূপ সভ্যতাবিস্তারের আদর্শ জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তাঁদের এই অপূর্ব কীর্তির ফলেই সমগ্র ভারত আজ পর্যন্ত এক ধর্ম ও সমাজ-বিধানে বদ্ধ। শান্তভাবে এইরূপ সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে ও ঋষিগণের কল্যাণময় পবিত্রজীবন-যাপনের সাহায্যকল্পে ইক্ষ্বাকুগণ তাঁদের রাষ্ট্রীয় প্রভাবও বিস্তার করতে থাকেন। রামায়ণে এই সত্যই সুন্দরভাবে উদ্ঘাটিত এবং এরই পরিণতি-স্বরূপ রাম-রাবণের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও অনার্য-রাক্ষস-নিষাদ-বানর জাতিগণের পরিচয় বিহিত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে এইরূপ বিশাল ভারতীয় আর্যসভ্যতার সংস্থাপক-রূপে শ্রীরামচন্দ্র যুগ-যুগান্তর ধরে সম্মানিত হলেন—তারই সুন্দর চিত্র বাল্মীকি ঐতিহাসিক মহাকাব্য-রূপে রামায়ণে অঙ্কিত করে গেছেন। তাই আজ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্র সনাতনধর্ম-সংস্থাপকরূপে দেশময় ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজিত। ভগবৎ-নির্দেশেই যেন সূর্যবংশীয় রাজশক্তি-সহায়ে এই মহৎ কার্য সাধিত হয় ও এক নবযুগের আরম্ভ হয়। এর পর ইক্ষ্বাকুগণের আর কোন কীর্তিকলাপের কথা আমরা শুনতে পাই না। শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিতে সমগ্র ভারত এইভাবে একত্র হবার ভিত্তিতেই ইক্ষ্বাকুগণের পরে ভরতবংশীয় রাজগণ বেদ-ব্রাহ্মণশাসন আরও সুদৃঢ় করতে সমর্থ হন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রসমষ্টির দ্রষ্টা ভরতরাজবংশীয়-গণের পুরোহিত ঋষিগণই। ভরতবংশীয়গণের অধিকার-কালেই তাঁদের বিশাল রাজ্যের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বৈদিক যজ্ঞ-ধূমে পবিত্রীকৃত ও সামগানে মুখরিত। রাজন্য-বর্গের সুশাসনেও শান্তির সুচ্ছায়ায় ব্রাহ্মণগণের যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম-কর্মের সহায়কল্পে শব্দশাস্ত্র-ছন্দঃ-শাস্ত্র-গণিত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের উদ্ভব ও দিন দিন নবনবরূপে বিকাশ—সুশৃঙ্খলার সুযোগে বৈশ্যগণের কৃষি বাণিজ্যাদির প্রসারে প্রজাবৃন্দের দিবারাত্র ধর্মাচরণে আত্মনিয়োগে সমগ্র দেশ রাজাদের উত্থান-পতন ও রাজ্য-সকলের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও ধর্ম-ভাবে প্লাবিত। এই ধর্মভাবই শ্রীরামচন্দ্রের রামরাজ্য-স্থাপনের পর থেকে সারা ভারতে বিরাজমান।

ইক্ষ্বাকুগণের পর ভরতবংশীয়গণের অধীনে পৌরব রাজ্য দিন দিন সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে ও ঋষি বিশ্বামিত্র-ভরদ্বাজাদির পৌরোহিত্য ও মন্ত্রকুশলতার ফলে সমগ্র গাঙ্গ্য-যামুন প্রদেশ তাঁদের অধীনে আসে। ভরতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হস্তী হস্তিনাপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন ও তাঁহার দুই পুত্র অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ় কর্তৃক দুইটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হয়। অজমীঢ় পৈতৃক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। দ্বিমীঢ় পূর্বযুগের পাঞ্চাল প্রদেশের এক প্রান্ত নিজের অধিকারে আনেন। এখন থেকে প্রায় ১০০০ হাজার বৎসর পর্যন্ত পৌরবগণই মূলতঃ উত্তর ভারতের পরাক্রমী রাজশক্তিরূপে বিরাজিত। তাঁদের সময় থেকেই বেদব্রাহ্মণ-শাসনে সনাতন আর্যধর্ম তার সংহত রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে ও বেদানুশীলনের সর্বাঙ্গীণ চেষ্টায় বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। বর্তমানে আমরা বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদি শ্রুতিসাহিত্যের যে সকল বিস্তৃত রূপ দেখতে পাই, সে সকলই এই ভরতবংশীয়গণের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবনতিস্বরূপ যে জাতি-ভেদবিচার আরম্ভ হয় তার বীজও ব্রাহ্মণদের অত্যধিক সামাজিক আধিপত্যের ফলে রোপিত হয়। কিন্তু প্রাচীন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিরোধরূপে থেকে যায়। এর ফলেই পৌরবরাজগণের প্রতাপের অবসানে ভারতে ধীরে ধীরে বেদোত্তর যুগে ধর্মে ও সমাজে নব নব সৃজনশক্তির বিকাশ ও অত্যাশ্চর্য বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়।

ইক্ষ্বাকুগণের গৌরবসূর্য প্রোজ্জ্বল থাকার কাল থেকেই আমরা প্রথমতঃ ভরত-বংশোদ্ভূত পাঞ্চাল রাজগণের সমৃদ্ধি দেখতে পাই ও এই সময়কার রাজেন্দ্রবর্গের অনেক নামই আমরা বেদে পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল থেকে ষষ্ঠ মণ্ডল পর্যন্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে ভরতবংশীয় রাজগণের ও তাঁদের পুরোহিত-গোষ্ঠী ঋষিদের উল্লেখই সর্বত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এমনও মনে হয় যে, এঁরাই ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টা।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে রাজা দশরথ কর্তৃক যে সকল রাজা নিমন্ত্রিত হন, তাঁদের মধ্যে উত্তর পাঞ্চালরাজ দিবোদাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্বতন চতুর্থ পুরুষ মুদ্গলও বেদে রাজা ও ঋষিরূপে প্রখ্যাত। ইনিই মৌদগল্য-গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর স্ত্রীকে বীর রমণীরূপে স্বামীর পার্শ্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা দেখতে পাই। দিবোদাসের ভগিনীই অহল্যা-নামে পুরাণে খ্যাতা। দিবোদাসের প্রায় সমসাময়িক রাজা সৃঞ্জয় পুরাণাদিতে দানবক্তা-গুণে বিশেষভাবে সম্মানিত। তাঁর পৌত্র সুদাসকে দিগ্বিজয়ী রাজারূপে দশজন আর্য-অনার্য মিশ্রিত রাজগণের বিরাট শত্রুসৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে বেদোল্লিখিত 'দাশরাজ্ঞ' যুদ্ধে লিপ্ত দেখতে পাই। পৌরবরাজ 'সম্বরণের' রাজ্য অধিকার করার জন্য এই ঘটনা ঘটে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে এই যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি ১০ম বশিষ্ঠ (শতযাতু বশিষ্ঠ) পৌরবরাজ সম্বরণের পুরোহিতরূপে বর্তমান থাকলেও ৪র্থ বিশ্বামিত্রই তাঁর উৎসাহদাতারূপেও পৌরবরাজ সম্বরণ, যাদবরাজ, আনবরাজ, দ্রুহ্যুরাজ, তুর্বসুরাজ ও মৎস্যরাজ এবং অনার্যপক্থাসঃ, ভলানসঃ ভণৎ-তালিনাসঃ, বিষাণিনঃ, শিবাসঃ প্রভৃতি (যাঁরা বধ্রিবাচঃ বলে বর্ণিত) অনার্যজাতিসমূহ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বর্তমান। এই যুদ্ধে সুদাস জয়ী হন এবং বিশেষ করে পৌরবরাজ সম্বরণ স্বরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে সিন্ধুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা আর্য-অনার্য-মিশ্রণে এক বিশেষ নিদর্শন-রূপে মনে করা যেতে পারে। সুদাসের পুত্র 'সোমক'ও রাজচক্রবর্তিরূপে এবং দানবীর ধর্মরাজ-রূপে পুরাণে সম্মানিত।

এই সময়ে বশিষ্ঠ-বংশীয়গণ ভরতবংশীয়

রাজগণের পুরোহিত হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি যে, ইক্ষ্বাকুরাজগণ আর সেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না ও বশিষ্ঠসন্তানগণ ভরতবংশীয়গণ কর্তৃক আহূত ও পুরোহিত-রূপে সমাদৃত হয়ে ছিলেন। এই কারণেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের পুরাতন কলহ-বিদ্বেষাদি আবার উদ্দীপিত হয়। ইক্ষ্বাকুরাজ 'সৌদাস কল্মাষপাদে'র সময়েই বিশ্বামিত্রবংশীয় একজন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অনুপস্থিতি-কালে ইক্ষ্বাকুপুরোহিত-রূপে আমন্ত্রিত হয়ে এই কলহ পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি আভিচারিক মন্ত্রাদি-প্রয়োগে বশিষ্ঠের শত পুত্রের নাশ সাধন করেন। বশিষ্ঠ-বংশীয়গণ এই অপমান ও অত্যাচার সহজে ভুলতে পারেন নি। তা'ছাড়া আমরা জানতে পাই যে, বশিষ্ঠ স্বয়ং তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। এই মহৎ ক্ষমার আদর্শের জন্য বশিষ্ঠ আবহমান কাল ভারতে পূজিত। কিন্তু ভরতবংশীয় সুদাসরাজের সহিত কিরূপ ষড়যন্ত্র করে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের স্থলে অভিষিক্ত হন তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না। আমরা দেখে আশ্চর্য বোধ করি যে, তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে বিশ্বামিত্রই নিজেকে সুদাসরাজের দাসরাজ্ঞযুদ্ধে জয়ী হবার কারণ বলে উল্লেখ করছেন। আবার ৭ম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে বশিষ্ঠই সেই গৌরবের দাবী করছেন। বিশ্বামিত্র যে সুদাস কর্তৃক আদৃত হয়েছিলেন তা' মনুস্মৃতিতে আমরা দেখতে পাই এবং বশিষ্ঠ সুদাসকে অভিশাপ দিয়ে রাজ্য থেকে চলে যান—তা'ও আমরা এই সঙ্গে জানতে পারি। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিরোধের ইতিহাসের এইখানেই পরিসমাপ্তি। সুদাসের পুত্র সোমকের অথবা তাঁর পৌত্রাদির পুরোহিতরূপে বশিষ্ঠবংশীয়দের আর দেখতে পাওয়া যায় না। পাঞ্চালগণের গৌরব-রবি রাজা 'সহদেবে'র সহিত অস্তমিত হয় এবং আমরা দেখতে পাই যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বশিষ্ঠের সাহায্যে সম্বরণ আবার পৌরবরাজ্য অধিকার করেন। সম্বরণের পুত্র কুরুর পরাক্রমে ও সুশাসনে পৌরবরাজ্যের পূর্ব গৌরব আবার ফিরে আসে ও তিনি প্রায় সমগ্র পাঞ্চালরাজ্য নিজের অধীনে আনতে সমর্থ হন। তাঁর বংশীয়গণের নূতন নাম হয় কৌরব। এই থেকেই কুরু-পাঞ্চাল বিদ্বেষ আরম্ভ হয়—যার পরিণতি হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ।

পাঞ্চালরাজ সৃঞ্জয়ের সময়ে বিরাট যাদবরাজ্য 'ভীম সাত্বতে'র চার জন পুত্র—ভজমান, দেববৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। বৃষ্ণি-বংশীয়গণ দ্বারকায় নিজেদের প্রধানদের মধ্যে একজনকে সর্বপ্রধান স্থির করে এক নূতন রাষ্ট্র-বিধান প্রবর্তন করেন।

কুরুর এক বংশধর—বসু উপরিচর মধ্য ভারতে চেদীদেশ ও তাহার দুই পার্শ্বের দেশসমূহ নিয়ে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন ও তাঁর বিশাল রাজ্য পঞ্চ পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। তা থেকেই মগধ—চেদী—কৌশাম্বী—করূষ ও মৎস্য এই কয়টি নূতন খণ্ডরাজ্যের আরম্ভ হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথ গিরিব্রজে রাজধানী স্থাপন করে মগধের রাজা হন। এই সময় থেকে মগধের ক্রমোন্নতি আরম্ভ।

প্রায় ৩৫০ বৎসর পরে কৌরবরাজ প্রতীপ আবার পৌরব-রাজত্বের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর পুত্র শান্তনু পরাক্রান্ত নৃপতি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ভিষক্‌প্রবর—প্রজারঞ্জক-রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতৃসুখের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অত্যাশ্চর্য ত্যাগ-স্বীকারের জন্য আদর্শত্যাগিরূপে আজ পর্যন্ত ভারতে পূজিত হয়ে আসছেন। ইনি দ্বিতীয় পরাশর ঋষির—যিনি পুরাণ-ইতিহাস-সংকলনের জন্য বিখ্যাত—সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই সর্বপ্রথম প্রাচীন কালাবধি সংরক্ষিত গাথাসকল পঞ্চবিষয়-সম্বলিতরূপে সংগ্রথিত হয়ে পুরাণ নাম ধারণ করে।

আখ্যানৈশ্চৈব উপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পয়োক্তিভিঃ।
পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥
সর্গশ্চপ্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতানি চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

ভীষ্ম আত্মপ্রতিশ্রুতি-অনুসারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যকে পর পর রাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁদের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁরা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ভীষ্ম কর্তৃক পালিত হন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় পাণ্ডু রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের হত্যার জন্য যৌবনকাল থেকেই সচেষ্ট থাকেন। এই ঈর্ষার বীজ থেকে যে ভ্রাতৃকলহের উদ্ভব হয় তাহাই বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হয় ও সারা ভারতব্যাপী আর্যসমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করে। এই যুদ্ধে আর্যাবর্ত মহাশ্মশানে পর্যবসিত হয় এবং তার ভস্মরাশির উপর নূতন ভারতীয় সভ্যতার জন্ম হয়। বহুকালব্যাপী কুরু-পাঞ্চাল বিদ্বেষ এই যুদ্ধানলে ইন্ধন সংযোগ করে ও সেইজন্য এই যুদ্ধকে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধও বলা হয়। পাঞ্চালের এক প্রান্তের অধিকারী দ্বিমীঢ়বংশীয় উগ্রায়ুধ উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল জয় করে কৌরব রাজ-প্রতিনিধি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে পরাস্ত করে দক্ষিণ পাঞ্চাল কৌরবরাজ্যের অধীনে রেখে উত্তর পাঞ্চালের ন্যায্য অধিকারী পৃষতকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। রাজা পৃষত রাজ্য ফিরে পেলেও পাঞ্চাল-গর্ব খর্ব হওয়াতে কৌশলে কৌরবদের হীনবল করার জন্য সচেষ্ট রইলেন। তাঁর পুত্র দ্রুপদ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে রাজ্যবৃদ্ধি করতে সমর্থ হলেন। তথাপি প্রতিশ্রুতি-মত আচার্যকে রাজ্যাংশ দান না করাতে দ্রোণাচার্য তাঁকে ত্যাগ করে ভীষ্মের অনুরোধে কৌরব-পুত্রদের ক্ষাত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার নিলেন ও তাঁদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুললেন। যুদ্ধবিদ্যাদি শিক্ষালাভের পর যুবরাজ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের নানা রূপ দুষ্ট অভি-সন্ধি জানতে পেরে মাতা ও ভ্রাতাদের নিয়ে দূরে গোপনে বলসঞ্চয় করতে ব্যাপৃত রইলেন। কিছুদিন এই ভাবে কাটাবার পর দ্রুপদরাজ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ঘোষিত হওয়াতে সেইখানে পঞ্চপাণ্ডব গমন করলেন ও দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করলেন। এই স্বয়ম্বর-সভাস্থে পাণ্ডবগণ তাঁদের মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন ও তারপর থেকে তাঁর পরামর্শমতই সকল কাজ করতে থাকেন।

এই ঘটনার পর পাণ্ডবগণ ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনের আদেশমত রাজ্যে ফিরে এলেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির রাজ্যা-ভিষিক্ত হয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করে সম্রাট্‌রূপে পরিগণিত হলেন। এই কারণে দুর্যোধন মাতুল শকুনি ও মিত্র অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় তাঁদের—রাজ্যপণ রেখে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করলেন। শকুনির কুচক্রে পাণ্ডবগণ অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে মাতা কুন্তীকে রেখে একমাত্র দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিশ্রুতিতে রাজ্যত্যাগ করে চলে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে নানা প্রকার দৈব অস্ত্রাদি শিক্ষা করে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিশেষরূপে বলশালী হয়ে উঠলেন এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের কালে মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করে তাঁর কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-পুত্র অভি-মন্যুর বিবাহ দিয়ে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করলেন। উপরন্তু যাদববংশীয় মাতুল বসুদেবের পুত্র বাসুদেব

কৃষ্ণের পরামর্শে অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বনবাসান্তে পুনর্বার রাজ্যাধিকারের দাবী জানালেন। কিন্তু দুর্যোধন অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে দুই পক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তা থেকেই কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধের উৎপত্তি।

এই যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে একদিকে দুর্যোধন ও কর্ণপ্রমুখ কৌরবগণ এবং অন্যদিকে পাঞ্চালরাজ, মৎস্যরাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সহায়াবলম্বনে পাণ্ডবগণ দণ্ডায়মান হলেও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই এর কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত। পরাশরপুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এইরূপেই এই যুদ্ধকাহিনী-অবলম্বনে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য—মহাভারত রচনা করে গেছেন।

বাসুদেব কৃষ্ণের পিতা বসুদেব বৃষ্ণিবংশীয়গণের মুখ্য ছিলেন। কৃষ্ণ যৌবনে সর্বশাস্ত্রবিৎ—সর্ববিদ্যাবিশারদ ও পরাক্রমী বীর হয়ে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যায় অভূতপূর্ব সিদ্ধি লাভ করে তাঁর সময়ে সারা ভারতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। গুণী বৃদ্ধগণ অনেকে তাঁকে অতিমানবরূপে মান্য করতেন। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বজনপূজ্য ভীষ্ম কর্তৃক সভামধ্যে সকল মানবের অগ্রগণ্যরূপে সম্মানিত হন। এই ঘটনার কিছু পূর্বে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে চেদীরাজ শিশুপাল বিবাহ করার মনস্থ করেন, কিন্তু রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে বরণ করে তাঁকে সেই সংবাদ জানাতে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেন ও গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। তার ফলে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁকে অপমানিত করে যুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থলেই তাঁর দৈবলব্ধ অস্ত্র সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিশুপালকে হত্যা করে তাঁর গর্ব চূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অতিমানবতা এই ব্যাপারেই প্রমাণিত হয় ও দুর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণও তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবদের সঙ্গেই সৌহার্দসূত্রে বিশেষরূপে বদ্ধ—একথা দুর্যোধনের অজ্ঞাত ছিল না।

এদিকে অন্ধকগণ প্রাচীন হৈহয়বংশীয় ভোজদের সঙ্গে মিশে গিয়ে মথুরায় রাজ্যস্থাপন করেন ও ক্রমশঃ দেববৃধ-বংশীয়গণের সহিতও মিত্রতা স্থাপন করে বিরাট ভোজবংশের বিস্তারের সহায়তা করেন। চেদীরাজ—বিদর্ভরাজ—অবন্তিরাজ ও দশার্ণরাজ এই ভোজবংশীয় ছিলেন। অবশ্য রাজা উগ্রসেনই সেই সময়ে বিশেষ ভাবে ভোজরাজ-নামে খ্যাত ছিলেন।

চেদীরাজ শিশুপালের অপমানে বিশাল ভোজবংশের সকলেই নিজেদের অপমানিত বোধ করেন ও উগ্রসেনের পুত্র কংস (যিনি আবার বসুদেবের শ্যালক ছিলেন) এই শত্রুতার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। তাঁর দুই কন্যাকে তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের হস্তে দেন ও তাঁকেও নিজেদের দলভুক্ত করেন। তার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, মগধরাজ জরাসন্ধ (বৃহদ্রথের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ) তখন অনেকানেক রাজন্যবর্গকে পরাজিত ও বন্দী করে বিশেষ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কংসকে নাশ করেন ও পরে পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকেও বধ করেন।

প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব দিকস্থিত আর্যগণ ও বিশেষতঃ হৈহয়গণ নানাজাতীয় অনার্যদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়াতে—পৌরব ও যাদবাদি পুরাতন আর্যসন্তানগণ তাঁদের সহিত বিবাহাদি ব্যাপারে সম্বদ্ধ রাজবংশীয় নৃপতিদের সম্ভবতঃ সম্মানের চক্ষে দেখতেন না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন শিশুপাল ও জরাসন্ধের গর্ব চূর্ণ করলেন, তখন এই সকল রাজন্যবর্গ সাত্বত ও বৃষ্ণিবংশের প্রতি বিশেষ শত্রুভাবাপন্ন হলেন। দুর্যোধনও সেইজন্য ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ এই সকল রাজাকে নানাভাবে মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ করতে লাগলেন। এইরূপে সমগ্র ভারত—কি আর্য কি অনার্য—দ্বিধা বিভক্ত হয়ে

গিয়ে অনেকানেক রাজন্যবর্গ পৌরবগণের ও পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিবদ্ধ হলেন। শিশুপালপুত্র, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁদের পক্ষই অবলম্বন করলেন। মৎস্যরাজ—করূষরাজ—কাশীরাজ—পাঞ্চালরাজ—ও পশ্চিম মগধাধিপতিও পাণ্ডবগণের সাহায্যকল্পে দণ্ডায়মান হলেন। এঁরা ছাড়া উত্তর ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ—পশ্চিম ভারতের হৈহয়াদি যাদবগণ ও দক্ষিণ ভারতের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম-পূর্বমগধ প্রভৃতির অধিপতিগণ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। পাণ্ডবগণের সৈন্যসংখ্যা ৭ অক্ষৌহিণী ও কৌরবদের ১১ অক্ষৌহিণী ছিল। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে এই ভীষণ যুদ্ধ অষ্টাদশ দিন স্থায়ী হয় ও প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হয়ে যায়। একমাত্র পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ জীবিত থাকেন। তাঁরাও প্রায় ৩০ বৎসর পরে অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং কিয়ৎকাল পরে স্বর্গ গমন করেন।

এই যুদ্ধের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ আনর্তদেশে সমস্ত যাদববংশীয় বীরগণকে একত্র করে তাঁদের সকলের প্রধান হয়েছিলেন। যাদব বীরগণ তাঁদের শৌর্যবীর্যের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিলেন ও ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত পরাক্রান্ত অনার্যরাজগণকে নিজেদের অধীনে এনেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে বিরাট আর্যধর্মরাষ্ট্র-স্থাপনোদ্দেশ্যে পাণ্ডব ও কৌরবদের ভ্রাতৃকলহ নাশ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কালধর্মের প্রবলতা লক্ষ্য করে নিজেকে সেই কালরূপ ভীষণ শক্তির যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আর্য-অনার্য একত্র করে ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে মহাভারত-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। আর্যাবর্ত তখন আর্যরাজগণের অধিকারে এবং বিন্ধ্যের দক্ষিণ ও পূর্ব দিগ্বিভাগ তখনও প্রাচীন অনার্যরাজগণের অথবা মিশ্রিত আর্যানার্যরাজগণের অধীনে। এই মিশ্রিত রাজগণের কেন্দ্রস্বরূপ রাজা জরাসন্ধকে জয় করার দ্বারা মগধের প্রাধান্য নাশ করে আর্য-গৌরব পুনঃস্থাপনের ইহাই বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তখন থেকেই মগধই ভারতের কেন্দ্রস্বরূপ প্রতিভাত হয়েছিল। উপরন্তু খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতক থেকেই হিমালয়োত্তর প্রদেশ বেয়ে দলে দলে যে সকল শক-হূন প্রভৃতি জাতিগণ ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল—তারাও ভারতের রাজপুতানার মরুপ্রদেশের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সেখানে খণ্ড খণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করে ও ভারতের পশ্চিম সাগরোপকূলে বসতি বিস্তার করে স্থায়ী ভাবে বাস করাতে পূর্ব থেকেই মিশ্রিত আর্য-অনার্য সঙ্ঘে মিশে গিয়েছিল। এদের মধ্যে আভীর নামে এক জাতি অনেক গবাদি পশু নিয়ে বিশেষ করে যাদববংশীয়গণের সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণই এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে মহাভারত স্থাপনকল্পে তৎকালীন সমগ্র ভারতীয়গণকে একত্র করতে প্রয়াস করেছিলেন—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই তার সূচনা হয়। পরাশরপুত্র ব্যাসদেব সেই বিরাট কৃতিত্বের চিত্রই তাঁর অমর লেখনীতে মহাভারত-রূপ মহাকাব্যে চিত্রিত করে গেছেন।

"যতদূর পার পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তারপর সম্মুখ-সম্প্রসারিতদৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জীবন ও দেবতা

'বৈভব'

নীরব বীণাটি মুখর করিল
জীবন আনিল যে—
সেও যদি মোর দেবতা না হয়
দেবতা তবে বা কে ?
যে জন আমার হৃদয়ের রাজা
স্বপনের সাথী যে—
সেও যদি মোর দেবতা না হয়
দেবতা তবে বা কে ?

দেবতা কি তবে আকাশ হইতে
ধরায় আসিবে নামি ?
দেবতা আমার জীবনের রাজা
ভালোবাসি যারে আমি।
যে জন আমার হৃদয়ের মাঝে
নিশিদিন সেথা যার বাণী বাজে
যার মাঝে মোর জীবনের ছবি
সে-ই ত জীবন-স্বামী
সে-ই ত হৃদয়-দেবতা আমার
ভালোবাসি যারে আমি।

সোমনাথ

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

সোম অর্থে চন্দ্র। চন্দ্রের নাথ সোমনাথ—মহাদেব। কবে কোন অতীতে শাপভ্রষ্ট সোমদেব শাপমুক্তির জন্য প্রথম সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু সোমনাথ ভারতের অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রতীক। দেহের জরা আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, তার বিনাশ নাই। তাইত সোমনাথ কোটী কোটী ভারতবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লইয়া আবার জাগ্রত হইয়াছেন। উষার অরুণ আলোকে তাঁর শুভ্র জটাজাল ভাস্বর হইয়াছে। ফেনিল নীল সিন্ধু পাষাণ চত্বর আবার ধৌত করিয়া দিতেছে। মুহু-র্মুহু ঘণ্টাধ্বনির সাথে ভক্তের দল সমস্বরে আহ্বান জানাইতেছে—হর হর মহাদেও।

ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ। অত্যন্ত অনুর্বর দেশ; জলহীন শুষ্ক মরুভূমি। ইহারই এক প্রান্তে দেবপট্টন বা প্রভাসপট্টন। এক দিকে নীল সমুদ্র অপর দিকে শ্যামতরুরেখা, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণাহত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। এখানে বেলাভূমির মাঝে এক দিন স্বর্গের দেবতা মর্তভূমে নামিয়া আসেন। পাষাণে প্রতিষ্ঠিত হয় মহাভারতের প্রাণ। সমুদ্রের জল-কল্লোলের সাথে পিনাকীর ডমরু মাভৈঃ মাভৈঃ রবে বাজিতে থাকে। দূর হয় মনের শঙ্কা—জয় শঙ্কর!

সোমনাথের প্রাচীন ইতিহাস রহস্যাবৃত। মহাভারতের যাদবরাজগণ যখন দ্বারকায় রাজত্ব করিতেন, তখন হইতেই প্রভাসপট্টন তীর্থরূপে

পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু সোমনাথের মন্দিরের কোন উল্লেখ নাই। অনুমান, শৈব বল্লভী রাজগণের রাজত্বকাল ৪৮০-৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সোমনাথের প্রথম অভ্যুদয় হয়। উক্ত রাজবংশের উপাস্য দেবতা শঙ্করের আরাধনার জন্য নির্জন সৈকতভূমির উপর প্রথম দেউল নির্মিত হয়। বল্লভী রাজগণের পতনের পর রাজধানী সোলাঙ্কী রাজাদের করতলগত হয়। সোলাঙ্কী রাজবংশের প্রথম রাজা মূলরাজ সোমনাথের উপাসক ছিলেন। কালের ব্যবধানে নির্জন বেলাভূমি তীর্থযাত্রীর কলতানে মুখরিত হইল। মন্দির ঘিরিয়া বিশাল জনপদ গড়িয়া উঠিল। নূতন দুর্গ রচিত হইল। প্রাচীন ভিত্তিভূমির উপর দেউল ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে পশ্চিম ভারতে এক দর্শনীয় বস্তুতে রূপায়িত হইল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যেই রাজানুগ্রহে মন্দিরের ঐশ্বর্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মন্দিরের স্বর্ণদুয়ারে ভক্তের দল সুদূর এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আসিয়া দুনিয়ার সেরা রত্ন-মাণিক্যে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করিত; দেবতার কোষাগার পূর্ণ হইত বিচিত্র রত্নসম্ভারে। বিদেশী বণিকের দল বন্দরে নামিয়া তাহাদের যাত্রার শুভ কামনা করিত এবং বাণিজ্য-বেসাতির সাথে দেবতার বৈভব লইয়া যাইত।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তার[১] বর্ণনা হইতে মন্দিরের একটি চিত্র পাওয়া যায়: "Superb building is built of hewn stone. Its lofty roof was supported by fifty six pillars curiously curved and set with precious stones.

"In the centre of the hall was Somnat, a stone idol. Besides the great idol above-mentioned there were in the temple some thousands of small images wrought in gold and silver of various shape and dimension.

"It is related that there was no light in the temple, except one pendent lamp which being reflected from the jewels, spread a bright gleam over the whole edifice.

"20,000 villages were assigned for its support and there were so many jewels belonging to it as no king had ever one tenth part of it in his treasury. Two thousands Brahmins served the idol ond a golden chain of 200 muns (400lb) supported a bell plate which being struck at stated times called people to worship. 300 shavers, 500 dancing girls, 300 musicians were on the idol's establishment and received support from the endowment and from gifts of pilgrims."

মর্মানুবাদ:—

কাটা পাথরের নির্মিত অতি মনোহর অট্টালিকা—বহুমূল্য প্রস্তরখচিত অদ্ভুত বক্রাকৃতি ৫৬টি স্তম্ভোপরি সুউচ্চ উহার ছাদ। মধ্যে শিলামূর্তি সোমনাথ। এই বৃহৎ মূর্তি ব্যতীত মন্দিরে আরও কয়েক সহস্র স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত নানা আকারের ও পরিমাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিও রহিয়াছে। শোনা যায় মন্দিরে শুধু একটিমাত্র ঝুলান লণ্ঠনই ছিল, উহার সংলগ্ন মণিমাণিক্য-গুলিতে প্রতিফলিত উজ্জ্বল আভায় সমগ্র প্রাসাদ আলোকিত হইত।

ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০,০০০ গ্রাম মন্দিরের অধিকারে ছিল। তাহা ছাড়া মন্দিরের এত মণিরত্ন ছিল যে, উহার দশ ভাগের একাংশও কোন নৃপতির অর্থাগারে ছিল না। দু'হাজার ব্রাহ্মণ ছিলেন বিগ্রহের পূজারী। পূজার সময়ে সকলকে ডাকিবার জন্য সোনার শিকলে ঝুলানো একটি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের বৃহৎ ঘণ্টা বাজানো হইত। মন্দিরের সেবায়

১. Farishtah—The history of the Rise of Mohamedan Power in India (Translated by Brigge).

ক্ষৌরকার ছিল ৩০০ জন, দেবদাসী ৫০০ জন এবং গায়ক বাদক ৩০০ জন। ইহারা মন্দিরের তহবিল হইতে ভরণপোষণ পাইত।

উক্ত বর্ণনায় যদিও বাহুল্যবর্জিত নয় তবুও মন্দিরের বিশালত্ব সহজেই অনুমেয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সোমনাথের ভাগ্যাকাশে ঘন মেঘের আবির্ভাব হইল। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ সুলতান মামুদ গজনী হইতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে মন্দির অবরোধ করিলেন। অবরোধ-শেষে যুদ্ধ হইল। পাঁচ হাজার রাজপুত সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ বলি দিল। রক্তে প্রভাসপট্টন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। রক্তে রাঙ্গা পিচ্ছিল পথে সুলতান মামুদ নগরে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মামুদ চমকিয়া গেলেন। এত ধনরত্ন, এত ঐশ্বর্য। সারাদিন ধরিয়া বাধাহীন অবিরাম লুণ্ঠন চলিল। বিধর্মীর হস্তে মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। চূর্ণ প্রস্তর বাহিত হইয়া গজনীর পথে চলিল। মন্দিরের সোনার বড় ঘণ্টাটি একবার বাজিয়া উঠিল। বিধর্মীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "আল্লা-হু-আকবর"।

মধ্যাহ্ন গগনে জ্যোতিষ্মান সূর্য কাল মেঘে ঢাকা পড়িল। স্তিমিত প্রদীপশিখা কম্পিত হইল। অনন্ত চন্দ্রাতপের তলে ভগ্ন দেউল পড়িয়া রহিল, মহাকালের প্রতিভূ হইয়া। কিন্তু সংহারের মাঝেই সৃষ্টির নূতন বীজ লুকাইয়া থাকে। নটরাজের প্রলয়নৃত্যের সাথেই প্রাণ-প্রবাহিনী, অমৃতধারা নামিয়া আসে, জটাজাল হইতে। সৃষ্টি সার্থক হয়।

নূতন দেউলে আবার হাজার প্রদীপশিখা জ্বলিল। নহবৎখানায় ভোরের ভৈরবী বাজিয়া উঠিল। ভোলানাথ আবার চীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ করিলেন। মূল মন্দিরের চত্বরে নূতন মন্দির নির্মাণ করেন গুজরাটরাজ ভীমদেব। কিন্তু এ মন্দির পূর্বের মত স্থাপত্যে ও ঐশ্বর্যে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল না। কালের প্রভাবে মন্দির আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে গুজরাটের তদানীন্তন মহারাজ কুমারপাল মন্দিরটির পুনরায় সংস্কার সাধন করেন অথবা নূতন করিয়া নির্মাণ করেন। সোমনাথের মন্দিরের যে অংশটুকু ধ্বংসের হাত হইতে কিছুকাল পূর্বেও বাঁচিয়া ছিল, তাহা ঐতিহাসিকদের মতে কুমার পাল কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ঐতিহাসিক Cousen[২] বলেন।

"The ruined temple as it now stands, save the Muhamaddan addition is a remnant of the temple built by Kumarpal, a king of Gujrat about 1169 A. D. * * of the temple, made so famous in history by Sultan attack, not a vestige now remain."

এই মন্দির বিগত দিনের স্মৃতি বহন করিয়া আরও এক শতাব্দী কাল ধ্বংসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সময়ের ব্যবধানে প্রদীপ্ত সূর্য শিখর হইতে বিদায় লইল। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি আলফ খাঁ ও নসরৎ খাঁ গুজরাট জয়ে বহির্গত হইয়া, মন্দির পুনরায় ধ্বংস করেন।

ইহার পর আবার নূতন করিয়া মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন জুনাগড়ের রাজা মণ্ডালিক ও তৎপুত্র খেঙ্গার। মূল মন্দিরের সন্নিকটে নব নির্মিত মন্দিরের দেবতার আবার পুণ্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সূর্য আর ভাস্বর হইল না, কাল যবনিকার অন্তরালে দিগন্তের পাড়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। রাজশক্তি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দিকে দিকে ধাবিত হইল। গুজরাটের সিংহাসন তখন মুসলীম রাজশক্তি-

২. Cousen—Somenath and other temples of Kathiwar.

কবলিত। নবনিযুক্ত শাসনকর্তা মজফর খাঁন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির পুনরায় ধ্বংস করিয়া উহা মসজিদে রূপান্তরিত করেন। মজফর খাঁর অভিযান বর্ণনা করিয়া ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন।

"Muzafar Khan then proceeded to Somanath, where having destroyed all Hindu temples, which he found standing he built mosque in the steed."

ইহার পর হিন্দুরা পুনরায় মন্দির নির্মাণে সাহসী হয় নাই। কেবলমাত্র মুসলীম ধর্মোন্মত্ততাই বিগত শতাব্দীর এক মহান হিন্দুস্থাপত্যের ধ্বংসের কারণ হইল।

হিন্দুর দেবতা—তিনি কি কেবলমাত্র দেউলে, সামান্য মূর্তির মধ্যে বিরাজ করেন? যিনি নিরাকার, তার আবার রূপ। তিনি নিখিল বিশ্বে প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত; শুধু দর্শনে নয়, প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি সুপ্ত রয়েছেন। তিনি পরমাত্মন্—বিশ্বচৈতন্য। যাঁর সৃষ্টি নাই, তাঁর আবার ধ্বংস। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত।

এই সত্যের সন্ধানে একদিন পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। গাড়ী ছুটিয়া চলিল। রাত্রি অবসানে দিন আসিল। দিন গত হইলে, আবার রাত্রি আসিল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল কত দেশ, কত জনপদ,—উষর মরুভূমির তপ্ত বালুকা। আগ্রা, জয়পুর, আজমীড়, মাড়বার, পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ী মেসেনা জংসনে আসিয়া ক্লান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু পথ দীর্ঘ, অবসর লইবার সময় নাই। আবার গাড়ী চলিল ভেরাবলের দিকে। প্রায় ২৪ ঘণ্টা পরে গাড়ী ভেরাবলে আসিয়া থামিল—পথে পড়িয়া রহিল রাজকোট আর জুনাগড়।

ভেরাবল একটি ছোট রেল স্টেশন। এখান হইতে সোমনাথের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। চমৎকার পথ। সরকারী পরিবহন বিভাগ কর্তৃক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া টঙ্গাও পাওয়া যায়। অতীতের প্রভাসপট্টন বর্তমানে একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। মন্দির-সন্নিকটে একটি ধর্মশালার স্থানলাভ করিলাম।

নিকটেই সঙ্গম। কপিলা, হিরণ্যা, সরস্বতী তিনটি নদী সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সঙ্গম রচনা করিয়াছে। পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। পথে প্রাচীন নগরীর ভগ্ন প্রাচীর দেখা গেল, তাহারই মধ্য দিয়া পথ।

সোমনাথের বর্তমান মন্দির দেখিয়া নিরুৎসাহ হইলাম। মূল মন্দিরের পীঠটি কেবলমাত্র নির্মিত হইয়াছে। ইহারই উপরে ভাস্কর্য-বিহীন মর্মর মন্দির নিকেতনে [দেবতার বর্তমান প্রতিষ্ঠার জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মিত] সোমনাথ বিরাজ করিতেছেন। সম্মুখেই দ্বারপাল নন্দী। চারিদিকে পাষাণ-চত্বরে পুরাণ মন্দিরগুলির শেষ স্মৃতিচিহ্ন, পরাজয়ের কালিমা মাখিয়া স্বাধীন ভারতের মাটির মাঝে মিশিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের এই অংশটিতে বসিলে মন পার্থিব আনন্দে ভরিয়া যায়। জগৎ সংসারের কাণ্ডারী শঙ্কর প্রহেলিকাময় ভাবসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। বিরাট প্রকৃতি এই অসীমের পূজার আয়োজন করিয়াছে। সমুদ্র নিত্য পদযুগল ধৌত করিয়া দিতেছে। নীল আকাশ চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছে, আর পূজার নির্মাল্য অগণিত জনগণের অন্তরের ভক্তি আর প্রেম।

ইহার পর পুণ্যশ্লোকা অহল্যাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি দেখিতে গেলাম। প্রাচীন মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মূল মন্দির হইতে অনতিদূরে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। মূল শিবলিঙ্গটি মন্দিরের তলদেশে অবস্থিত, সুড়ঙ্গ পথ দিয়া যাইতে হয়। ইহারই উপরে সাধারণের দর্শনার্থে আর একটি মূর্তি রহিয়াছে।

প্রভাসপট্টন হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এইখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

অপরাহ্ণে দেহোৎসর্গের স্থানটি দেখিলাম। নীল বনানীর প্রান্তে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলদেশে একটি বেদী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। এমন সময়ে একজন ব্যাধ তাঁহাকে মৃগভ্রমে শরসন্ধান করে। বাণাহত হইয়া তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদূরে হিরণ্যা নদীর তীরে দেহত্যাগ করেন। কাষ্ঠফলকে সামান্য পরিচয়টুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ফিরিবার পথে কোটীশ্বর মহাদেবের জীর্ণ মন্দির পড়িল। রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট সমুদ্রসৈকতে শিলার মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ প্রোথিত দেখিলাম। প্রবাদ, এইস্থান হইতেই ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরসন্ধান করে।

সোমনাথের অভ্যুত্থানে প্রভাসতীর্থে আবার জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তীর্থযাত্রীর কিংবা ভ্রমণকারীর আহার ও বাসস্থানের বিশেষ সুবিধা নাই। সর্বাগ্রেই মনে পড়ে পানীয় জলের অপ্রাচুর্য। নিকটেই ভেরাবল বন্দর; দূর সমুদ্র-গামী জাহাজ যদিও এখানে আসে না, তবুও পালতোলা নৌকা সারা বৎসর বন্দরে নঙ্গর করিয়া থাকে। সেইজন্য বন্দরের নিকটবর্তী স্থানটি অপেক্ষাকৃত উন্নত।

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

সৃষ্টির মূলে মহাশক্তি। আদিকাল থেকে চলে আসছে সে মহাশক্তির স্তুতি—আপদে-সম্পদে, আনন্দে-নিরানন্দে। নিবেদিতা-আধারে যাঁর প্রকাশ এক নবযুগ রূপায়িত করেছে তাঁকেই জানাতে এসেছি প্রাণের অর্ঘ্য।

কারণ না জানলে কার্যকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। Back ground ঠিক না দেখালে যেমন চিত্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না, মহাপুরুষদের জীবনীকেও তৎকালীন বাতাবরণ দিয়ে বিচার না করলে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় না। ভগিনী নিবেদিতার অনুধ্যান আমাদের অসম্পূর্ণ হবে যদি কালের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করি। তাই খানিকক্ষণের জন্য দৃষ্টিকে আমাদের সুদূর অতীতে নিয়ে যেতে হবে।

মহাশক্তি আর নারীরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সুরকুলের অমিত তেজ ঘনীভূত হয়ে মহিষমর্দিনী আকারে প্রকাশিতা হয়েছিলেন, আর বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে সকলে তাঁকে বরণ করেছিলেন সানন্দে। যুগে যুগে নারী অখণ্ড মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। যেখানে নারী উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা সেখানে ঘটে সৃষ্টি-বিপর্যয়। নারী যেখানে স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা, অধিকার-বৈষম্যের কোনও প্রশ্ন ওঠে না সেখানে। বৈদিক যুগে পুরুষ আর নারীকে সমভাবে ব্রহ্মসাধনা-নিরত দেখতে পাই। কিন্তু মহাকালের কোন্ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে নারী আত্মসাধনা হতে বিরত হলেন জানি না। উপনিষৎ

বলছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—আত্মসাধনা-বিরত নারীর প্রতি তাই বুঝি বা আত্মা হলেন বিমুখ। আত্ম-সাক্ষাৎকারের অধিকারিণী নারী বেদাধ্যয়ন এবং আত্মতত্ত্বানুশীলন হতে হলেন বহিষ্কৃত। সমাজে ঘটল তাঁর অধঃপতন আর অমর্যাদা। মহাশক্তি অনুকম্পার পাত্রীতে পরিণত হতে চললেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতে দেখি—"স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম"; মনুসংহিতায় পাই—"কন্যাপি পালনীয়া যত্নতঃ—"। 'অপি' শব্দ স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈষম্যের ইঙ্গিত মনকে করে ব্যথিত। নারীত্ব এ অমর্যাদা তার স্বভাবসুন্দর জ্যোতির্ময়ীরূপকে করে তুলল নিষ্প্রভ। অবমানিতা নারীসমাজ তাই হীনবীর্য জাতির জননী।

পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করলেও ভুল হবে, কারণ বিদ্যারূপিণী কল্যাণী, অশান্তি আর অকল্যাণের জন্ম দিতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি ভাবের সুন্দর রূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। বারাঙ্গনা, সত্যদ্রষ্টা ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে স্ব-স্বরূপের স্তুতি শুনে বলেছিলেন—

"দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি
নিয়ে গেলো সবে মাটীর ঢেলা"

পাশ্চাত্যের নারীসম্মানও ঐ মাটীর ঢেলার সম্মানেরই তুল্য।

কালের গতিতে নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈষম্য যখন দেখা দিল চরমাকারে, 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নিয়ে এল যুগান্তর। যুগাবতারের প্রথম বিদ্রোহ নারী ও শূদ্রের সমানাধিকারের জন্য। ব্রাহ্মণপুত্র গদাধর শূদ্রাণী ধনী কামারণীর ভিক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে দিলেন প্রতিষ্ঠা। এ মার্ক্স-প্রবর্তিত আর্থিক সমানাধিকার নয়, পারমার্থিক সমানাধিকারের পুনঃ প্রবর্তন। যে অদ্বৈত শুধু পুঁথিপত্রে সীমাবদ্ধ হতে চলেছিল তা গদাধরের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। এ-অপার্থিব জীবনে আমরা সকল দ্বৈতাবসান প্রত্যক্ষ করি। কৈবর্তকুলোদ্ভবা রাণী রাসমণি হলেন অদ্ভুত তপস্বীর পূত তপোভূমির স্রষ্টা, ভৈরবী ব্রাহ্মণী নিলেন প্রথম গুরুর অধিকার।

লাঞ্ছিতা মহাশক্তির রুদ্রাণীরূপের উলঙ্গ নৃত্যে পাশ্চাত্য মদোন্মত্ত। আর মহা তমোময়ীর প্রভাবে প্রাচ্য নির্বীর্য; সেই সন্ধিক্ষণে বালক শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশক্তিকে 'মা' 'মা' করে আকুল আবাহন জানালেন। সে ব্যাকুলতায় বুঝি বা পাষাণও গলে যায়। সচকিতা রুদ্রাণী কল্যাণীরূপে দেখা দিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাষাণী মুণ্ডমালিনী স্নেহময়ী জননীরূপে প্রকাশিতা হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভ্রান্ত মানবসমাজকে সেই প্রসন্না মূর্তির সন্ধান দিলেন; কিন্তু বহির্মুখী মানব অন্তর্দৃষ্টি যে হারিয়ে বসে আছে, তাই সাধনাকে দিতে হল নূতন রূপ। গভীর অমাবস্যা রাত্রিতে সকলের অগোচরে আপন যোড়শী প্রেয়সীকে জগজ্জননীরূপে করলেন আরাধনা। আর সেই মানবীমূর্তিতে জগজ্জননীর পূর্ণ প্রকাশ উপলব্ধি করে নিবেদন করলেন আজন্মলব্ধ তপস্যার ফল।

যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার উদ্দেশে আপন পত্নীতে জগজ্জননীর উদ্বোধন করলেন ঐ যোড়শীপূজার রাত্রিতে, তার গভীরতা নিরূপণের প্রয়োজন বোধ হয় তখনও ঘটেনি, একটুমাত্র আভাস পাওয়া গেল মহাপ্রয়াণের কদিন আগে। শ্রীশ্রীমাকে ডেকে বললেন—"কলকাতার লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে তুমি তাদের দেখো।" কল্যাণী জননী সে ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু অকূল পাথার! ঘোর তমসাচ্ছন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন সমাজে কি করে আসবে চেতনা! রজোগুণ সহায়ে এ তম কাটিয়ে উঠতে পারলে তবেই প্রকাশ পাবে সত্ত্বগুণের স্নিগ্ধ জ্যোতি। সিদ্ধি সময়-সাপেক্ষ, গোপনে চলল তপস্যা।

যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন যুগাবতার স্বয়ং, যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন যুগাবতার-

সহধর্মিণী 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' সারদা তীব্র বিয়োগব্যথা উপেক্ষা করে, সে পবিত্র হোমাগ্নির আহুতির জন্ম এগিয়ে এলেন সুদূর ইউরোপ থেকে আইরিশ-কন্যা শ্রীমতী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল।

মুকুলিকা অপেক্ষা করছিল শুভ অরুণোদয়ের! এলো সময়, দীর্ঘ বিভাবরীর ঘটল অবসান। কি মধুর! কি অপূর্ব সে মুহূর্ত! দৃষ্টি চলে যেতে চায় সে দৃশ্যসুধা পান করতে—

১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস, স্মৃতিমধুর অপরাহ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর শ্রীমতী নোবল আপন ঘরে বিশ্রাম করছেন; মনে প্রবল আলোড়ন, অপূর্ব আবেশে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত, দিব্যভাবে সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তরঙ্গ-রাজির মত চিন্তাধারা হৃদয়ে তীব্র আঘাত করছে —"এ কথা পূর্বেও শুনেছি কিছু নূতন নয়— সঙ্গিনীরা এ কি মন্তব্য করে গেল! এক ঘণ্টা। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কোন মন্ত্রবলে এ অদ্ভুত সন্ন্যাসী যাবতীয় উচ্চভাবধারার সুন্দর মালা গেঁথে দিল। এ অপূর্ব কৃষ্টি-সম্পন্ন, নবালোকরঞ্জিত উদার হৃদয় আমাদের যে নবদৃষ্টি দান করল, তাকে এভাবে সাধারণ শোনা কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া শুধু অভদ্রতা নয় রীতিমত অন্যায়।

"কে এ গৈরিকধারী? মূর্তিমান বোধ! আঁখি দুটীতে দিব্যভাবের কমনীয়তা, র‍্যাফেল-অঙ্কিত দিব্য বালকের দৃষ্টি!"

"কি অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী আর অকাট্য যুক্তি— 'অব্যক্তস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ব্যক্তরূপে প্রতি-ভাত হন'; 'আমরা ভ্রান্তি হইতে সত্যে যাই না অল্প সত্য হইতে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হই'—কি অপূর্ব অভয়বাণী, 'You are the ocean of purity.'—"

যুগপৎ আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিলন— ভাবী যুগের অমরকাব্যের মধুরতম অধ্যায়। যুবক নরেন্দ্রের মনে ঝড় উঠছে—"কে এ উন্মাদ! কেন তার স্পর্শে মর্মস্থল পর্যন্ত এমন আলোড়িত হয়ে উঠছে।"

শ্রীমতী নোবল অভীস্বরূপ বিবেকানন্দকে গুরু-রূপে বরণ করলেন। নব জন্মদাতার পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করে দেবার জাগল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কতদিন শুনেছেন সিংহকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান—

"জগৎ এরকম বিশজন স্ত্রী-পুরুষ চায় যারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে—ভগবান ছাড়া কিছু চাই না—কে এগিয়ে আসবে এসো। জগৎ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ অনন্ত প্রেমপূর্ণ জীবনের প্রার্থনা করছে, যাদের অন্তরের প্রেম উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে বজ্রের মত দৃঢ় করে তুলবে। একমাত্র দৃঢ় চরিত্র সত্যকে পূর্ণরূপ দিতে পারে। সহানুভূতি প্রেমের দ্বারা সফলতা লাভ করে।"

অরুণ-কিরণস্নাত মুকুলিকা নোবল ধীরে ধীরে পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হতে লাগলেন। এলো তখন সৌরভ বিলিয়ে দেবার সময়। গুরু বিবেকানন্দের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রিয় ভারত-ভূমির সাধারণ শ্রেণী আর নারীজাতির উন্নতি। শ্রীমতী নোবল সেই ভারতভূমির জন্ম প্রকাশ করলেন আত্মবলিদানের সঙ্কল্প। সে যে কতখানি দান তা বুঝি বা তিনি নিজেও জানতেন না; কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন দূরদ্রষ্টা আচার্য, তাই বারবার সাবধান বাণী শুনালেন। কিন্তু জয়ী হলো সেই তপস্বি-কল্পিত হোমাগ্নির আহ্বান। নোবলকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখে বিবেকানন্দকে লিখতে হলো— "এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হবে। ভারতের জন্ম বিশেষ করে ভারতের নারীসমাজের জন্ম পুরুষের চেয়ে নারীর, একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্মজাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা,

অসীম প্রীতি, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে…”

চিঠি পড়ে নোবল বিস্মিতা—আনন্দিতা, ছুটে এলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত ভারততীর্থে। বিদেশিনী মার্গারেট নোবল হলেন ভারতের নিবেদিতা, ভারতীয় জনকল্যাণ-সাধনে নিবেদিতা, আর আমাদের প্রিয়তমা ভগিনী নিবেদিতা।

বিবেকানন্দ মানসকন্যা নিবেদিতাকে সনাতন সত্যের প্রকাশভূমি, আর্য ঋষিদের তপোভূমি হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে গেলেন; গুরু-সান্নিধ্যে ভূস্বর্গ কাশ্মীর, তুষারতীর্থ অমরনাথ প্রভৃতি দর্শন করে নিবেদিতা অপার আনন্দ নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা। আরম্ভ হলো সঞ্জীবনী সুধা-পরিবেশনের পালা। বাগবাজার পল্লীর নিতান্ত সাধারণ একখানা ভাঙ্গা বাড়ী হলো তার কেন্দ্র। বিদেশিনী স্বীয় বহুমুখীন প্রতিভা দ্বারা এ সমাজকে করে নিলেন একান্ত আপনার, জয় করে নিলেন সকলের হৃদয়কে। তদানীন্তন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শিল্পী—সকলেই নিবেদিতাকে জানালেন আন্তরিক শ্রদ্ধা, সে অদ্ভুত প্রতিভায় সকলে বিমুগ্ধ। কিন্তু জানল না এর উৎস কোথায়। বিরাট প্রতিভা কি করে এতখানি মাধুর্যমণ্ডিত, নিষ্কাম প্রেমপূর্ণ—কেউ তার সন্ধান করল না।

স্বামী বিবেকানন্দ নারীর মধ্যে যে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ, তেজ ও সাহসের সঙ্গে মলয়মারুতের কোমলতা একাধারে দেখতে চেয়েছিলেন—কোন্ মন্ত্রে তা উদ্বোধিত হবে? একি কেবল আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র? এর প্রমাণ নিবেদিতা-চরিত্র। বৈদান্তিক স্বামীজী বেদান্তকেই এর মূলসূত্র বলে জানতেন। একমাত্র অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা নারীতেই নারীজনোচিত কোমলতার সঙ্গে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্প সম্ভব। বিবেকানন্দ-চরণে-উৎসর্গীকৃতা সেই অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিতা অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্মক্ষেত্রে ডুবেছিলেন।

বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম আদর্শ অনুন্নত-শ্রেণী আর স্ত্রীজাতির উন্নতি, কারণ এই দুই জাতিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বেদান্তের-অধ্যয়ন থেকে করা হয়েছে বহিষ্কৃত, যার ফলে এদের আত্মবিস্মৃতি এসে মোহময় স্বার্থপরতা আর দুর্বলতার আকর করে তুলেছে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত মিশন আবার নূতন গার্গী-মৈত্রেয়ীর উদ্বোধন করতে চান, যাঁরা কেবল বেদান্ত-বিচারে ক্ষান্ত থাকবেন না, বেদান্তপ্রচার তথা অনুশীলনেও রত থাকবেন।

উদ্বোধন-পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাবনায় স্বামীজী লিখেছিলেন—“রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণ উদ্বুদ্ধ করাই এর আদর্শ।” পূর্ণ রজোগুণসম্পন্না নোবল শুদ্ধসত্ত্বগুণমণ্ডিতা নিবেদিতারূপে, তেজস্বিনী কল্যাণীরূপে নারীসমাজের সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করতে এগিয়ে এলেন।

বিবেকানন্দ হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে স্ব-স্বরূপে লীন হয়ে আনন্দে ডুবে থাকার জন্য বসেছিলেন, কিন্তু ঐ রত্ন নির্জন প্রান্তে লুক্কায়িত থাকলে জগতের কল্যাণ কোথায়? তাই বুঝি বা জগৎরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ পটভূমিকায় তার প্রদর্শনী হলো। শ্রীমতী নোবল দেশকালাতীত অমৃতত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, আর যে কোনও নিভৃত কক্ষে তার অভীষ্ট লাভ করতে পারতেন। কিন্তু যুগচক্র যাদের সাহায্যে ঘুরবে, তাদের স্থান সকলের মাঝখানে—একের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পারে না, তাই নরেন্দ্রনাথকে হতে হলো বিবেকানন্দ, আর নোবলকে হতে হলো নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে ঘরে আনার মন্ত্র পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অতি সাধারণ ঘটনার মাঝখানে। নিবেদিতাও স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা অন্তর্মুখী সারদাদেবীকে সাংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে দেখেও তাঁকে চিনতে ভুল করলেন না। বললেন—

"তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ পেয়ালা।" আমাদের সকলকে বলে গেলেন—"সারদাজীবনী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ভারতীয় নারী-আদর্শের শেষ কথা।"

তাই সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে নিবেদিতা ছোট্ট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যে ঐ বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিনটির অপেক্ষা করেছিলেন। এতদিনে বুঝি সিদ্ধি রূপ নিতে চললো।

কেবল নিবেদিতা-বিদ্যালয় অথবা ২১৪ জন সাহিত্যিক আর শিল্পীর স্মৃতি দিয়ে নিবেদিতাকে বিচার করলে মনে হয় ভুল করা হবে। প্রতিভার বিকাশ ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিন্তু 'এ অহং-শূন্য অহং' এর বহুধা প্রকাশ বাস্তবিক দুর্লভ! তিনি যে ছিলেন বৈরাগিণী, প্রেমিকা, তপস্বিনী। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। এই আদর্শকে মনে প্রাণে বুঝেছিলেন যে, মুমুক্ষু না হলে জগতের প্রকৃত হিত করা যায় না, আবার জগতের কল্যাণ-সাধনে আত্মনিয়োগ করতে না পারলে মুমুক্ষুত্ব লাভ করা যায় না। তাই এমন করে মুক্তি-কামনায় নিজেকে বলি দিতে পেরেছিলেন।

নিবেদিতা আপন প্রতিভাসহায়ে নিজেই একটা দল করে নিতে পারতেন। তাঁর স্তাবকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সত্যসন্ধিৎসু নিবেদিতা সনাতন আর্য-ঋষিদের মতো নামযশকে উপেক্ষা করে অতি সংগোপনে সকলের কল্যাণ সাধন করে গেলেন।

তাঁর বিদ্যালয়ের প্রতিটি বালিকাকে তিনি কি ভাবে দেখতেন, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন, সে সব মধুর কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করে। সেই তেজস্বিনীর সপ্রেম প্রেরণায় কত জীবন উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কত ভাব প্রকৃত রূপ পেয়েছে দেখলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে, আবার আমাদের সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সেই বিদেশিনী তপস্বিনীকে কত অপমান সইতে হয়েছে তা শুনলে হৃদয় ব্যথিত হয়। কিন্তু নিবেদিতা—"তুল্যনিন্দা-স্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" ব্রতের ব্রতী ছিলেন; প্রতিটি উপেক্ষা—সন্তুষ্ট হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। সাধনার পথে আসে নানা বিঘ্ন, নিবেদিতাকেও তার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯০০ খ্রীঃ স্বামীজীর চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যায়—

"আমার অনন্ত আশীর্বাদ জানবে, কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না।... ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম, আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস ত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু-সজ্জা। ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে।"

স্বামীজীর Complete Works-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন—The truth he preaches would have been as true had he never been born......had he not lived. Texts that to-day will carry the bread of life to thousands might have remained the obscure dispute of scholars. He taught with authority and not as one of the Pundits, for he himself had plunged to the depths of the realisation which he preached and he came back like Ramanuja only to tell its secrets to the pariahs, the outcast and the foreigners.

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধেও ঐ কথার পুনরুক্তি করার ইচ্ছা হয়—যাকে সত্য বলে জানলেন তার জন্য সর্বস্ব পণ করে আজন্ম-অর্জিত সংস্কার পর্যন্ত ভুলে গিয়ে যে আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেলেন মুমুক্ষু নারীসমাজ সেজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর পূত জীবনী অনুসরণ করে বহু মেয়ে এগিয়ে আসছেন তীব্র মুমুক্ষা আর পরহিতব্রতের বাসনা নিয়ে, কালে আরও আসবেন। মনে হয়, অদূর

ভবিষ্যতে স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হবে। তিনি চেয়েছিলেন—স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্ত আর নানা সমস্যা সমাধানের জন্ত একদল ব্রতধারিণী যাদের কর্মভূমি ছাড়া কোনও গৃহ থাকবে না, ধর্মের বন্ধন ছাড়া কোনও বন্ধন থাকবে না; গুরু, স্বদেশ আর আপামর সাধারণ এই তিনের প্রীতি ভিন্ন অন্য প্রীতি থাকবে না।

নিবেদিতা-জীবন সকলের কাছে শাশ্বত শান্তি আর আনন্দের বাণী ঘোষণা করতে আহ্বান জানাচ্ছে সকলকে ঐ জীবন বরণ করে ধন্ত হবার জন্য। বেদান্তসূর্যের কিরণছটায় যে নিবেদিতা-কলিকা চোখ মেলেছিল, প্রতিটি পাপড়ি তার বেদান্ত-আভাতে সমুজ্জ্বল। আর তত্ত্বপিপাসু অলিকুল তাকে কেন্দ্র করে মধু আহরণের জন্য ছুটে আসছেন দলে দলে।

নিবেদিতার প্রতি শুধু বাচনিক শ্রদ্ধা দেখিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ করে ফেললে আমরাই হব বঞ্চিত—তিনি যে শ্রদ্ধাতীত, শ্রদ্ধাময়! তাঁকে আমাদের জীবনে কার্যতঃ গ্রহণ করার জন্ত সম্মিলিত শপথের প্রয়োজন।

আজ ভারতজননীর পরমাত্মীয়া পূতচরিত্র ভগিনীর কাছে প্রার্থনা করি তিনি তাঁর মত আমাদেরও সর্বস্ব বলি দিয়ে সর্বস্ব পাওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। তাঁর প্রেরণা আর আশীর্বাদ আমাদের আত্মস্মৃতি-লাভের যাবতীয় বিঘ্ন দূর করুক, পরমাত্মার স্নিগ্ধ প্রকাশ মন, প্রাণ, চরিত্রকে সুষ্ঠু রূপ দান করুক, আর অন্তিমে সেই অভেদ সত্তাতে মিলিত হওয়ার সাধনা সার্থক করে তুলুক।

দেবার্চনা-সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

(শেষাংশ)

পূর্বপক্ষী যদি বলেন—প্রতিনিধি দ্রব্যের (অনুকল্পের) দ্বারা কর্মসম্পাদন তো অশাস্ত্রীয় নহে। পূর্বমীমাংসা-দর্শনের ৬।৩।৪ 'দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধিনাসমাপনাধিকরণে' (জৈঃ সূঃ, ৬।৩।১৩-১৭) বিহিত দ্রব্যের অভাব হইলে প্রতিনিধি দ্রব্যান্তর তো অনুজ্ঞাত হইয়াছে। যদি প্রতিনিধি দ্রব্যের গ্রহণ না স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দ্রব্যাভাবে কর্মবোধক বিধি বাধিত হইয়া যাইবে। যেমন পুরোডাশ-নির্মাণের জন্ত কেহ যদি ব্রীহি (ধান্য) সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে হবনীয় দ্রব্যের অভাবে যজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারিবে না, ফলে সেই যজ্ঞবোধক বিধি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তাহা যাহাতে না হইয়া পড়ে সেইজন্য ব্রীহির অভাবে নীবার, সোমের অভাবে পূতিকা ইত্যাদি প্রতিনিধি দ্রব্যের গ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ আমরা যথার্থ হস্তী ও অশ্বাদি-স্থলে কাষ্ঠাদিনির্মিত হস্তী ও অশ্বাদি প্রতিনিধিদ্রব্য গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং অধিকারবিধি বাধিত হইবে কেন?

তদুত্তরে বলিব—হাঁ, প্রতিনিধি-দ্রব্যের দ্বারা কর্মসম্পাদন শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রতিনিধি-দ্রব্যকে বিহিত মূল দ্রব্যের যথাসম্ভব সদৃশ হইতে হইবে, ইহাও তো পূর্বমীমাংসা-দর্শনের (৬।৩।১১) 'শ্রুতদ্রব্যাপচারে তৎসদৃশস্যৈব

'প্রতিনিধিত্বাধিকরণে' (জৈঃ সূঃ, ৬।৩।২৭) প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রীহির স্থলে প্রতিনিধিরূপে যে নীবারের গ্রহণ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহার হেতু উভয়েই ধান্যবিশেষ হওয়ায় তাহাদের সাদৃশ্য অতি নিকটতম। আর ভক্ষণযোগ্য হওয়ায় উভয়েই পুরোডাশ-নির্মাণের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তুমি যে কাষ্ঠাদিনির্মিত হস্তী ইত্যাদিকে যথার্থ হস্তী ইত্যাদির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতেছ, আকারগত সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের সাদৃশ্য তো নিকটতম নহে। দেখ, দেবতাকে পুরোডাশ প্রদত্ত হয় ভক্ষণের জন্য। আর নীবার-নির্মিত পুরোডাশ ব্রীহি-নির্মিত পুরোডাশের ন্যায়ই ভক্ষিত হইতে পারে। তদ্রূপ দেবতাকে হস্তী ইত্যাদি প্রদত্ত হয় বাহনরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্য। কিন্তু তোমার কাষ্ঠহস্তী গমনক্রিয়াতে অসমর্থ হওয়ায় বাহনরূপে ব্যবহৃত হইতে তো পারে না। সেইহেতু আকারগত কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও তোমার কাষ্ঠহস্তী ইত্যাদি উপচার বিসদৃশ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া যথার্থ হস্তী ইত্যাদির প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। যদিও ভাট্টদীপিকাকার বলেন—'মন্দসদৃশ দ্রব্যও প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে পারে।' কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে যে প্রধান উদ্দেশ্যে দ্রব্য দেবতাকে নিবেদিত হয়, তাহাই ব্যাহত হইয়া পড়িতেছে বলিয়া আকারমাত্রের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যবলে মন্দসদৃশরূপেও কাষ্ঠহস্ত্যাদি উপচাররূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না। ইহা হইল পূর্বপক্ষীর উপর **দ্বিতীয় দোষ**।

আর এক কথা—প্রতিনিধিদ্রব্য-গ্রহণের অবসর তখনই হয়, যখন সংগৃহীত উপচারসম্ভারযুক্ত অধিকারীর কর্মানুষ্ঠানকালে কোন উপচারের হঠাৎ অপচার (নাশ) হইয়া পড়ে, ইহা 'তেষু শ্রুত-দ্রব্যাপচারে ভবতি সন্দেহঃ' ইত্যাদি শাবরভাষ্যে (জৈঃ সূঃ, ৬।৩।২৩) বর্ণিত হইয়াছে। তোমাদের তো সংগৃহীত যথার্থ উপচারের অপচার হয় নাই, অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদনকালে তোমার হস্তী বা অশ্ব ইত্যাদি তো পলায়ন করে নাই বা অন্য কোন হেতু-বশতঃ দেবতাকে নিবেদনের অযোগ্য হইয়া পড়ে নাই! সুতরাং প্রতিনিধি দ্রব্যগ্রহণের প্রশ্নই তোমার পক্ষে উঠে না। তোমাদের তো যথার্থ হস্ত্যাদি উপচার সংগ্রহের সামর্থ্যও নাই এবং প্রবৃত্তিও নাই। 'অনুকল্পের দ্বারা কর্মসমাপন করিব', ইহা প্রথম হইতেই সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছ। অতএব পূর্বমীমাংসাদর্শনের ৬।৩।৪ 'দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধি-নাসমাপনাধিকরণে'র আশ্রয় তোমরা প্রাপ্ত হইতে পার না বলিয়া কাষ্ঠহস্ত্যাদি প্রতিনিধিদ্রব্যের গ্রহণ তোমরা করিতেই পার না। ইহা হইল পূর্বপক্ষীর উপর **তৃতীয় দোষ**।

যদি বলা হয়—দ্রব্যের অপচার (নাশ) না হইলেও অনুকল্পের দ্বারা কর্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা পুরাণ ও তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা—পিষ্টতণ্ডুলদ্বারা নির্মিত বৃষদ্বারা বৃষোৎসর্গের বিধান গরুড়পুরাণে * বর্ণিত হইয়াছে। আবার শবসাধকের নিকট দেবীর অনুচরগণ নরাদি বলি প্রার্থনা করিলে ঐ প্রকারে নির্মিত নরাদি বলি-প্রদানের বিধিও তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় (তন্ত্রসার, শবসাধন)।

তদুত্তরে বলিব—শিষ্টসমাজে পিষ্টতণ্ডুল-নির্মিত বৃষদ্বারা বৃষোৎসর্গের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং পুরাণের উক্ত বচন অর্থবাদ কি না, তাহা চিন্তনীয়। আর উক্ত পুরাণবাক্যে স্পষ্ট বিধি-প্রত্যয় থাকায় পিতৃ ও ভূতাদির যজনের জন্য উক্ত প্রকার অনুকল্প স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ব-মীমাংসাবিরোধী হওয়ায় দেব-যজনে যে তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা ভগবান মনুর বচন উদ্ধৃত

* একাদশেঽহ্নি সম্প্রাপ্তে বৃষাভাবো ভবেদ্ যদি।
দর্ভৈঃ পিষ্টৈস্তু সম্পাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্ বুধঃ॥
বৃষোৎসর্জনবেলায়াং বৃষাভাবঃ কথঞ্চন।
মৃত্তিকাভিস্তু দর্ভৈর্বা বৃষং কৃত্বা বিমোচয়েৎ॥
(গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬।৪৪-৪৫)

করিয়া আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। আবার অবিশেষভাবে যজ্ঞ হওয়ায় শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞের বিধি-নিষেধাদি দেবযজ্ঞে অনুসৃত হইলে, অবিশেষভাবে যজ্ঞ হওয়ায় ইষ্টিযজ্ঞের বিধি-নিষেধাদি সোমযজ্ঞে এবং সোমযজ্ঞের বিধিনিষেধাদি পশুযজ্ঞে অনুসৃতির পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। তাহাতে সকল প্রকার যজ্ঞের সাঙ্কর্য হইয়া পড়িবে এবং কল্পসূত্র ‡ ও মীমাংসাদর্শনের প্রবৃত্তি ব্যর্থ হওয়ায় ভগবান মনুর বচনও বাধিত হইয়া যাইবে। তাহা কাহারও অভীষ্ট হইতে পারে না। তবে হাঁ, পুরাণাদিতে তত্তৎ দেবার্চনা-বিধানস্থলে যদি যথার্থ উপচারের অপচার না হইলেও উক্ত প্রকার কাষ্ঠহস্ত্যাদি বিসদৃশ অনুকল্প দ্রব্যের বিধান থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ বিসদৃশ উপচারকেও অবশ্যই শাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ বিধান কিন্তু পরি-দৃষ্ট হইতেছে না। সাধকগণ যদি তাদৃশ বিধিবাক্য প্রাপ্ত হন, জানাইতে অনুরোধ করিতেছি। গরুড়-পুরাণে পঠিত বাক্যে 'বৃষোৎসর্জনবেলায়াং বৃষাভাবঃ' ইত্যাদি বাক্যটি লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহাতেও কর্মানুষ্ঠানকালে যথার্থ বৃষের অপচারই সূচিত হইয়াছে, আর তাদৃশ অপচারের ফলেই এতাদৃশ বিসদৃশ অনুকল্প অনুজ্ঞাত হইয়াছে। তোমাদের দেবার্চনাতে যথার্থ ও হস্ত্যাদি উপচারের অপচার না হওয়ায় পূর্বোক্ত তৃতীয় দোষ দুর্বারই হইয়া পড়িতেছে।

পূর্ববাদী যদি বলেন—'যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্য-বোধিত যাবজ্জীবিক নিত্যকর্মের ন্যায় দেবার্চনাসকল আমাদের নিত্যকর্ম, কাম্য কর্ম নহে, সুতরাং পূর্বমীমাংসার ৬৷৩৷১ 'নিত্যযথাশক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানাধিকরণে'র সিদ্ধান্তানুসারে যথাশক্তি উপচারযোগে দেবার্চনা অশাস্ত্রীয় নহে।

‡ যে গ্রন্থে বেদবিহিত যজ্ঞসকলের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে বলে কল্পসূত্র বা শ্রৌতসূত্র।

উক্ত অধিকরণে কাম্য কর্মেই সর্বাঙ্গোপসংহারে বিধান পরিদৃষ্ট হয়, নিত্যকর্মে নহে।

তদুত্তরে বলিব—পূর্বমীমাংসার উক্ত অধিকরণানুসারে যথাশক্তি যথার্থ উপচারযোগে দেবার্চনাতেই তুমি অধিকারী, প্রতিনিধি উপচার-প্রদানের অধিকার উক্ত অধিকরণে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং যে কয়টি যথার্থ উপচার তোমার সংগৃহীত হয়, সেই কয়টির দ্বারাই তোমায় দেবার্চনা সমাপন করিতে হইবে। নিত্য দেবার্চনাতে কোনই উপচার সংগৃহীত না হইলেও মাত্র গন্ধপুষ্প বা জল ইত্যাদি দ্বারাই দেবার্চনার অনুজ্ঞা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে 'অমুকদ্রব্যার্থম্' ইত্যাদি বাক্যও দেবার্চনাকালে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় এবং শিষ্টগণ তাহা অনুমোদনও করেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত পূর্বমীমাংসাদর্শনের ৬৷৩৷১১ অধিকরণের বিরোধ-বশতঃ জল তত্তৎ উপচারসকলের সদৃশ না হওয়ায় তাহাকে তত্তৎ উপচারের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা চলিবে না। নিত্যকর্মবোধক বিধির নিরবকাশতা নিবারণ করিবার জন্য অসমর্থ বিত্তহীন সাধকের পক্ষে তাহা শাস্ত্রানুজ্ঞায় যথার্থ উপচারমাত্র। দেবার্চনা-কালে কোন উপচারের অভাব হইলে মহারাষ্ট্র দেশীয় সাধকগণ 'অমুকদ্রব্যাভাবে নমস্করোমি' এই প্রকার মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, দেখা যায়। নমস্কার আর কোন দ্রব্যের প্রতিনিধি নহে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, নিত্যকর্মে প্রতিনিধিদ্রব্য-প্রদানের অধিকার না থাকিলেও কাষ্ঠহস্ত্যাদি প্রতিনিধি-দ্রব্য প্রয়োগ করায় পূর্বপক্ষীর উপর পূর্বমীমাংসার ৬৷৩৷১ 'নিত্য-যথাশক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান-অধিকরণে'র বিরোধরূপ **চতুর্থ দোষ** আপতিত হইতেছে।

আর এক কথা। কোন সম্মানিত অতিথিকেই যখন ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য প্রদান করা যায় না, তখন তোমার ইষ্টদেবতাকে সাদরে আবাহন করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য কাষ্ঠ ইত্যাদি বিসদৃশ উপচার

তুমি প্রদান কর, কি প্রকারে? এই প্রকারে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে ব্যবহারাযোগ্য উপচার প্রদান করায় লোকব্যবহার-বিরোধরূপ **পঞ্চম দোষ** পূর্ব-বাদীর উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

আবার কাষ্ঠ-অশ্বাদি উপচার দানকালে 'অশ্বং সুখপ্রদং গৃহ্ণ পথি কণ্টকবারণম্,' ইত্যাদি মন্ত্র তুমি পাঠ করিয়া থাক। বল তো—কাষ্ঠনির্মিত অশ্ব তোমার ইষ্টদেবতার পথিকণ্টক কি প্রকারে নিবারণ করিবে? সুতরাং স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট মিথ্যা-কথনরূপ **ষষ্ঠ দোষ** পূর্বপক্ষীর উপর আপতিত হইল।

পূর্ববাদী যদি বলেন—'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ' (গীতা, ১৭।১) ইত্যাদি ভগবদ্বচনে শ্রদ্ধা থাকিলে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও দেবযজন অনুজ্ঞাত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিব—এই স্থলে 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ—'বৃদ্ধব্যবহারে বা লোকাচারে শ্রদ্ধা'। আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা এখানে পরিগৃহীত হয় নাই, কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে আর শাস্ত্রজ্ঞানবানের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। গীতাভাষ্যে আচার্যপাদ শঙ্কর ইহা স্পষ্টই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ তুমি অজ্ঞ গ্রাম্য-জনের ন্যায় এই ভগবদ্বচনের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পার না।

যদি বলা হয়—'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' (গীতা, ৯।২৬) ইত্যাদি ভগবদ্বচন-অনুসারে আমাদের ভক্তিভাবে প্রদত্ত এতাদৃশ উপচারসকল বিসদৃশ হইলেও অবশ্যই দেবতা গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার প্রসাদে আমাদের কর্মের সাঙ্গতা ও চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদিতে তো কোন বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

তদুত্তরে বলিব—শ্রীভগবানের উক্ত বচনে অসমর্থ ভক্তের পক্ষে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলই অনুজ্ঞাত হইয়াছে, কাষ্ঠ-অশ্বাদির ন্যায় বিসদৃশ ও সর্বথা অযোগ্য উপচার তো অনুজ্ঞাত হয় নাই। যদি বল—উক্ত পত্রপুষ্পাদি বচনটি যে কোন তুচ্ছ দ্রব্যের উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ উক্ত পত্রপুষ্পাদি শব্দে যে কোন তুচ্ছ দ্রব্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তদুত্তরে বলিব—দেবতা যে তোমাদের প্রদত্ত তুচ্ছ উপচার গ্রহণ করেন না বা তাঁহার প্রসাদে যে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে না, ইহা তো আমরা বলিতেছি না। ভক্তির বশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামা-প্রদত্ত কদন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, প্রহ্লাদপ্রদত্ত বিষ গ্রহণ করিয়া তাহাকে অমৃতে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের খিস্তিখেউড় গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'বকল্‌মা' গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি ভক্ত-ভগবানের লীলাদৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু আমরা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি—আচমন হইতে বিসর্জনান্ত সমস্ত কর্ম বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানের দ্বারা তুমি বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছ। অশাস্ত্রীয় সুতরাং অসদুপচার প্রদানকালে মধ্যে অকস্মাৎ তুমি সুদামা প্রভৃতির ন্যায় পরাভক্তি কোথায় প্রাপ্ত হইলে যে বৈধী ভক্তির সীমা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিতেছ? অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে—হে সাধক, ইহা তোমার মনের চালাকিমাত্র। সুতরাং—

> অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
> অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥
>
> (গীতা, ১৭।২৮)

'অশ্রদ্ধাপূর্বক হোম, দান তপস্যা ইত্যাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, হে পার্থ, তাহা অসৎ। ইহলোকে ও পরলোকে তাহা ফলপ্রদ হয় না'—ইত্যাদি এই ভগবদ্বচনানুসারে তোমার সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হওয়ায় কর্মব্যর্থতারূপ **সপ্তম দোষ** পূর্বপক্ষীর উপর আপতিত হইতেছে।

এইরূপে পূর্ববাদীর সমস্ত যুক্তিই বালুকা-কূপের ন্যায় বিদীর্ণ হওয়ায়, বিসদৃশ ও যথেচ্ছ অনুকল্পযোগে দেবার্চনার অশাস্ত্রীয়তাই সিদ্ধ হইল।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বিচারণীয় না হইলেও প্রসঙ্গবশতঃ আরও দুইটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকগণের সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। সেই বিষয় দুইটি এই—(ক) প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় যে—দেবার্চনান্তে হোমকালে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্য অগ্নিতে সমর্পিত হয়। হোমকালে এই যে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ, ইহা কি শাস্ত্র-সম্মত? (খ) ইদানীন্তনকালে দুর্গোৎসবাদিতে বহু স্থলে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে চণ্ডীপাঠাদি ঋত্বিক্‌কর্মে বিনিযুক্ত হইতে ও দক্ষিণা গ্রহণ করিতে দেখা যায়, ইহাও কি শাস্ত্র-সম্মত? শাস্ত্রকে অনুসরণ করা বা না করা, হে সাধক, তোমার ইচ্ছাধীন; কারণ শাস্ত্রের কোন রক্ষকবাহিনী নাই এবং "কামং তান্ ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মসু যোজয়েৎ" (বোধায়ন স্মৃতি), ইত্যাদি বচনবোধ্য রাজাও নাই। তবে আমরা বলিব—হোম ও চণ্ডীপাঠাদি তো সেই শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে যাহাকে অনুসরণ করিয়া তুমি পূজার্চনাদির অনুষ্ঠান করিতেছ। সুতরাং সেই একই শাস্ত্রের আদেশ কতকটা পালন ও কতকটা অপালন করিয়া যদি তুমি শ্রেয়োলাভের আশা পোষণ কর তো করিও, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহা করিও। যাহা হউক উক্ত উভয় প্রকার আচরণই যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, ইহাই আমরা বলিতে চাই। কোন্ হেতুবলে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ, (ক) হোমকালে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—"(বীজ) অমুকদেবায় স্বাহা" ইত্যাদিরূপে যে হোম করা হয়, তাহাকে বলে 'দর্বিহোম'।* ইহাতে অধ্বর্যু স্বয়ংই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষেপ করেন। 'যাগ'কালে কিন্তু হোতা পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন, অধ্বর্যু স্বয়ং কোন মন্ত্রপাঠ না করিয়া যাজ্যামন্ত্রের শেষে 'বৌষট্' এই মন্ত্র উচ্চারিত হইবার সমকালেই হবনীয় দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করেন। ইহাই দর্বিহোম ও যাগের প্রভেদ। বাস্তুহোম প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকেও দর্বিহোম বলে (পূঃ মীঃ, ৮।৪।৩ সূঃ), তাহা এখানে বিচার্য নহে। যাহা হউক এই দর্বিহোম ও যাগকালে অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান (হোম), ইহা যজুর্বেদীয় ঋত্বিকের অর্থাৎ অধ্বর্যুর কর্ম। শ্রুতি বলেন—"উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা" (তৈঃ সং ১।৮।১)—'ঋগ্বেদ ও সামবেদ উচ্চৈঃস্বরে পঠনীয়, যজুর্বেদ উপাংশুস্বরে পঠনীয়।' যাহা উচ্চারণকারী স্বয়ং শ্রবণ করিতে পারেন, অপরের শ্রুতিগোচর হয় না, এতাদৃশ যে নিম্নস্বর, তাহাকে বলে উপাংশুস্বর; অর্থাৎ ফিস্‌ফিস্ করিয়া যে উচ্চারণ, তাহাই উপাংশুস্বর। অধ্বর্যুর বেদ যজুর্বেদ হওয়ায় এবং পূঃ মীঃ ৩।৩।১ বেদোপক্রমাধিকরণ ও ২।১।১৩ নিগদাধিকরণ ন্যায়ে নিগদভিন্ন যজুর্বেদ উপাংশুস্বরে পঠনীয় হওয়ায় অধ্বর্যু কর্তৃক সম্পাদনীয় দর্বিহোমেও উপাংশুস্বরই প্রযুক্ত হইবে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। [এক প্রকার যজুর্মন্ত্রকে 'নিগদ' বলে, বিশেষ বচনবলে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হয়]। হোমকর্তা ও যজমান যদি অন্যবেদাধ্যায়ী হন, তাহা হইলেও "বিপ্রতিষেধে পরম্" (জৈঃ সূঃ, ১২।৪।৩৯) এই সূত্রোক্ত ন্যায়ানুসারে আর্ত্বিজ্য কর্মই (—ঋত্বিকের কর্মই) প্রবল বলিয়া এবং অগ্নিতে হবনীয় প্রদান অধ্বর্যুর কর্ম বলিয়া হোমকালে তাঁহাকে অধ্বর্যুর পদই গ্রহণ করিতে হয়। আর সেইহেতু আধ্বর্যব উপাংশুস্বরই অধ্বর্যু কর্তৃক হোমানুষ্ঠানকালে প্রযোক্তব্য হইয়া পড়ে। আর বীজমন্ত্র যে গোপনীয় অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণীয় নহে, এই বিষয়ে অন্য শাস্ত্রবচনও আছে, যথা—

"আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
দানমানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥ ইত্যাদি।

* শাস্ত্রদীপিকা, ৮।৪।১ অধিঃ, সোমনাথী; তৈঃ সং, ৩।৪।১০ সায়ণভাষ্য; জৈঃ সূঃ, ৮।৪।১১ শাবরভাষ্য।

'আয়ু (বয়স), ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, দান, মান ও অপমান ইত্যাদি যত্নপূর্বক গোপনীয়।' শিষ্টগণের এই প্রকার আচরণও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কাশী প্রভৃতি ক্ষেত্রসমূহে তদ্দেশীয় সাধকগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমসম্পাদন রীতি পরিদৃষ্টও হয় না। পরন্তু তাহার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হয়, তাঁহাদের হোমকালে মাত্র স্বাহাকারটিই অপরের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং যে শাস্ত্রোক্ত যে দেবার্চনাতে হোম সম্পাদিত হয়, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক হোমানুষ্ঠান স্পষ্টভাবে বিহিত না হইলে শ্রুতি, পূর্বমীমাংসা ও শিষ্টাচারসম্মত উপাংশুস্বরবিষয়ক উক্ত সাধারণ বিধানই যে অনুসরণীয়, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। অতএব দবিহোমকালে উপাংশুস্বরযোগেই তাহা অনুষ্ঠিত হইবে, উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্রাদি পঠিত হইলে তাহা শাস্ত্রসম্মত হইবে না, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

(খ) ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির চণ্ডীপাঠাদি ঋত্বিককর্মে প্রবৃত্তিও সর্বথা অশাস্ত্রীয়, কারণ পূঃ মীঃ ১২।৪।১৬ আর্ত্বিজ্যোব্রাহ্মণমাত্রাধিকারাধিকরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রাহ্মণই 'ঋত্বিককর্মে' অধিকারী। যদি বলা হয়—অন্যস্থলে ঋত্বিক্‌কর্মে যাহাই হউক না কেন, চণ্ডীপাঠে যে সকলেরই অধিকার আছে, ইহা "যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে" (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীপাঠরূপ ঋত্বিক্‌কর্মে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি বৃত হইলে, তাহা অশাস্ত্রীয় হইবে না। তদুত্তরে বলিব—উক্ত শ্লোকে স্ব-কামনা সিদ্ধির জন্য সাধককে চণ্ডীপাঠের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু অপরের ক্রিয়াতে ঋত্বিক্‌রূপে বৃত হইবার অধিকার তো উহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং উপরোক্ত জৈমিনীয় ন্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি অপরের কর্মে ঋত্বিক্‌রূপে বৃত হইয়া চণ্ডীপাঠ ও দক্ষিণাগ্রহণ করিলে তাহা আর শাস্ত্রসম্মত হইবে না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন—উপরোক্ত বিষয়ত্রয়ে শাস্ত্রার্থনিরূপণই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের বিচারে ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ যদি তাহা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে আমাদের ভ্রম তো বিদূরিত হইবেই, উপরন্তু বহু সাধকের তাহাতে উপকার হইবে।

পরমাত্মা

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমারে আমি যে করি অপমান
ধিক্কার দিই মনে,
আত্মার মাঝে পরমাত্মার
ফিরি অনুসন্ধানে,
তবু কেন দেখি চারিদিকে মোর
কুয়াসার জাল বোনা।
ওগো সুন্দর, বল বল তুমি
বৃথা যাবে দিন গোণা।

শীতের কুহেলী রাত্রির মাঝে
আমি একা পথচারী,
অনাবিষ্কৃত কোন্ জীবনের
অভিমুখে আমি ফিরি;

কুয়াসার মাঝে নিজেরে ডুবায়ে
অসীমের পানে ছুটি,
ধিক্কৃত এই জীবন আমার
ধূলায় পড়ে যে লুটি।

কতবার হায় জ্বেলেছি প্রদীপ
হৃদয়ের মন্দিরে,
তোমার পাইনি দেখা, দীপ মোর
নিভে গেছে বারে বারে;
ওগো সুন্দর, বল বল তুমি
কোন্ ফুলে তোমা পূজি,
যুগ যুগ ধরে নয়নের জলে
তোমারে আমি যে খুঁজি।

স্বামী প্রেমানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাবুরাম মহারাজ কেবল স্নেহবিগলিতা জননী ছিলেন না, ঘটনাক্রমে কঠিনবীর্য পৌরুষের মূর্তিও ধারণ করতেন। লর্ড কারমাইকেল যখন বল্লেন, রামকৃষ্ণ মিশন বিপ্লবীদের গৈরিকের আবরণে প্রশ্রয় দেয় তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বজ্রকঠোর রূপ দেখেছিলাম। কোন কোন ভীরু গৃহী ভক্ত বিচলিত হয়ে বল্লেন, বিপ্লবী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মঠ থেকে সরিয়ে দিলে হয় না? প্রেমানন্দ গর্জে উঠ্লেন,—ইংরাজ মঠ দখল করে নিক্, ওদের ভ্রূকুটিতে নত হব না। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে ভেদ করবো কেন? কারো অতীত জীবন আমাদের বিচার্য নয়। বিরজা-হোম করে যারা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা মঠে থাকবে; তারা আমরা ভিন্ন নই। সকলে একসঙ্গেই জেলে যাব। রাজশক্তির ভয়ে সত্যভ্রষ্ট হব না। সেদিন মৃদুস্বভাব স্বামী প্রেমানন্দের রুদ্র মূর্তি দেখে বিস্মিত হয় নি। জননী সারদা দেবীও ঐ কথাই বলেছিলেন। এই ঘটনার মর্ম আজকের দিনের অনেকের পক্ষে বোঝাই কঠিন। এবিষয়ে বলতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে, বারান্তরে বলবার ইচ্ছে রইল।

কতবার কত ভাবে দেখেছি; পাপী তাপী দীন দুঃখী সর্বমানবের কল্যাণ-কামনায় বিগলিত-হৃদয় এই কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর অপার্থিব চরিতমহিমা। যেমন কোমল তেমনি কঠোর। কত লোক তাঁর শিষ্য হতে এসেছে, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কেউ মন্ত্রশিষ্য নেই। যখন স্বয়ং সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে দেহ ধারণ করে আছেন, তখন তিনি ছাড়া আর কে কৃপা করতে পারে? একবার আমরা জয়রামবাটী থেকে ফিরে মঠে এসেছি। গ্রামে গিয়ে শ্রীশ্রীমা যে কত কায়িক ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করেন সেই সব কথা হচ্ছিল। মা মানা শোনেন না, অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিলে কলসী নিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যান। পায়ে বাতের ব্যথা, তবু জলভরা কলসী কাঁকালে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবেন, আর কাউকে দেবেন না। গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে সাংসারিক সুখদুঃখ নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। আমি বল্লাম, একদিন গ্রামের পথে চলেছি, একজন বিধবা ব্রাহ্মণী ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়ী কোথায় বাছা? পূর্ব বাঙ্গলার কথা শুনে তিনি কিছুই বুঝলেন না। তবু দূরত্ব অনুমান করে বল্লেন, সারদা এখানে এলেই নানা দেশের কত লোক আসে। ওর স্বামী ছিল পাগল, ছেলেপুলেও হ'ল না, সংসার-সুখও হয়নি। এখন শিষ্য-সেবক নিয়ে তবু সুখের মুখ দেখছে। আমার বলবার ভঙ্গীতে সকলে হেসে উঠ্লেন। বাবুরাম মহারাজ সব শুনে বল্তে লাগলেন, দেখে এলে তো! সব গোপন। ঠাকুরের ভাবসমাধি হত, বিস্তার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেতো, কিন্তু মার মধ্যে কোন বিভূতির বিকাশ নেই। ইনি কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, প্রকৃত মায়ের মত আদর করে সকলকে খাওয়াচ্ছেন, সম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে গৃহীর মত ব্যবহার করছেন। কে চিনবে, কে বুঝবে মা মহামায়ার অপার লীলা? জয় মা, জয় মা বল্তে বল্তে ভাবে বিভোর হয়ে উঠ্লেন; কথা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তিনি গান ধরলেন—'আয় মা সাধনসমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র

'হারে।' যুদ্ধের ভঙ্গীমায় গাইতে লাগ্‌লেন ;— 'দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান তাতে জুড়ে ভক্তিবাণ'— ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গীতে বেশী দখল ছিল না, কিন্তু তাঁর আবেগময় কণ্ঠস্বর সমগ্র দেহের অপূর্ব ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অপূর্ব ভাবের দ্যোতনায় সকলের মন ভক্তিভাবে অভিভূত হয়ে যেতো।

সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিব্য আনন্দময় বিগ্রহরূপে প্রেমানন্দ মঠে বিরাজ করতেন। তাঁর দর্শনে তাঁর কথা শুন্‌লে নিমেষে চিত্ত ও বুদ্ধি মালিন্য-মুক্ত হত। দেশ, জাতি ও সর্বমানবের কল্যাণের জন্য ঠাকুরের নির্দেশে এক মুক্ত পুরুষ যেন দেহধারণ করে আছেন। লৌকিক দৃষ্টির অগোচর আত্মার মহিমা আমার মত অপরিণতবুদ্ধি যুবকও যেন চকিতে অনুভব করতো।

একবার বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতাদের আনন্দ-সম্মেলন। দক্ষিণ দেশ থেকে বড় মহারাজ (রাখাল) এসেছেন, কাশী থেকে মহাপুরুষ মহারাজ (তারক) আর সারগাছি থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর)। প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের আনন্দ-সম্মেলনে সমগ্র মঠবাটী মুখরিত। সেদিন, সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি—বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির আয়োজন। প্রভাত থেকেই কলকাতা থেকে গৃহী ভক্তরা আসতে লাগলেন। কোথাও কীর্তন-ভজনের আসর, কোথাও বা আলোচনা-সভা। মূল মঠবাটীর উত্তরপশ্চিমে খোলা জায়গায় সামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হ'ল। কৃষ্ণলাল মহারাজ ঘৃতসিক্ত সমিধ আহুতি দিতে লাগ্‌লেন। পাশে পদ্মাসনে বসে স্বামী অখণ্ডানন্দ বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব সুরঝঙ্কার, বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী শুনে মনে হতে লাগলো, বৈদিক যুগের কোন ঋষি যেন বহু শতাব্দী পর আবির্ভূত হয়েছেন। জাগ্রত ভারতের তপো-ভূমিতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠে আর্যজাতির মহোচ্চ প্রার্থনার ধ্বনিতরঙ্গে চারদিক প্রসন্ন, ভাগীরথী আনন্দে রোমাঞ্চিত।

অদূরে কাঠের আসনে বসে ব্রহ্মানন্দ—আপনাতে আপনি ডুবে আছেন, পাশে গুরুভাই ও শিষ্যবর্গ। এমন সময় ঠাকুর দালান থেকে বেরিয়ে এলেন স্বামী প্রেমানন্দ। হাতে পেতলের রেকাবীতে মালাচন্দন—ভাবাবেশে পা টলছে, অর্ধ-উন্মীল নেত্রে অপার্থিব আনন্দের দীপ্তি। প্রথমে বড় মহা-রাজকে মালাচন্দন দিয়ে প্রণাম করলেন, তারপর অন্যান্য গুরুভাইদের। ব্রহ্মানন্দ ভ্রাতৃপ্রীতিভরে বাবুরামকে আলিঙ্গন করলেন। সকলের বদনমণ্ডল দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত—কারো মুখে কথা নেই। মনে হল, পৃথক পৃথক দেহে এঁরা একই অদ্বৈতকে গাঢ় অনুভূতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করছেন।

এঁদের ভ্রাতৃপ্রীতি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা নানা উপলক্ষ্যে আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। ইহলোক-নিস্পৃহ সন্ন্যাসীরা মর্ত্য মানবের কল্যাণে জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে নর-নারায়ণ সেবার যে মহান ব্রত শ্রীগুরু ও বিবেকা-নন্দের নির্দেশে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মূলে এঁদের সমবেত শুভেচ্ছার সম্মিলিত প্রয়োগই যে প্রেরণা-শক্তি যুগিয়েছে, একথা অসঙ্কোচেই নির্দেশ করা যায়। সঙ্ঘনেতাদের এই পারম্পর্য পরবর্তীদের মধ্যে অক্ষুণ্ন রয়েছে বলেই আর দশটা লৌকিক ও ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের মত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে কখনো আত্মখণ্ডনের উদ্বেগ দেখা দেয়নি। আজ তাঁরা একে একে অপ্রকট হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্ঘানুরাগ, সাধনা ও সেবাধর্মের পারম্পর্য শিষ্যানুশিষ্যক্রমে দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সেবা ও সাধনার এমন একটা সঙ্ঘ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত—ভারতে এমন কোন অতীতের নজীর নেই। মঠ ও সন্ন্যাসী পারলৌকিক ব্যাপারের রহস্যমণ্ডিত—এই তো জানা ছিল চিরকাল। সাধন-ভজন আছে,

তার সঙ্গে আছে হাসপাতাল, শিক্ষালয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, আছে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে আর্ত মানবের সেবা,—এ ভারতে অভিনব। এই দুই আপাত বিরুদ্ধতার সমন্বয় যাঁরা করেছিলেন এবং যাঁরা আজও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন, স্বামী প্রেমানন্দের উৎসর্গময় জীবনের অম্লান দীপ্তি তাঁদের পথভ্রান্ত করবে না।

আমাদের মত বয়সের অনেকের মনে আছে—প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গভ্রমণের কথা। ভক্তদের আগ্রহে তিনি রাজী হলেন। আমার বড়দাদা শৌযেন্দ্রনাথ মজুমদার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা সঙ্গী হ'লাম। ট্রেনে সিরাজগঞ্জ হয়ে ষ্টীমারে পোড়াবাড়ী। যমুনার বিশাল বিস্তার দেখে তিনি বালকের মতো অধীর হয়ে উঠলেন। ছোট ডিঙ্গী নৌকা ঢেউএর দোলায় নাচছে,—পাট বোঝাই গাধাবোট টেনে চলেছে ছোট ষ্টীমার, আমাদের ষ্টীমার চলেছে পাড় ঘেঁসে, ঘন গাছপালায় ঘেরা গ্রাম, টিনের ঘরগুলি রৌদ্রালোকে জলছে—প্রেমানন্দজী ডেকে চেয়ারে বসে দেখছেন আর তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মাথা দোলাচ্ছেন। রাঢ়দেশের মানুষ তিনি,—সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির এই অপরূপ রূপে মুগ্ধ হ'লেন। একবার আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, পূর্ববঙ্গের ছেলেরা যে দুঃসাহসে দেশের কাজে কেন ছুটে যায়, এই কূলভাঙ্গা নদী দেখে তা বুঝতে পারছি। আমি তোদের ভালবাসি, আজ তোদের দেশ দেখে সে ভালবাসা আরো গভীর হ'ল।

পোড়াবাড়ী ষ্টেশন থেকে পাল্কী করে টাঙ্গাইল (মহকুমা শহর) হয়ে ঘারিন্দা গ্রাম। পথের দুধারে গ্রামের নরনারী দাঁড়িয়েছে, দর্শনের আশায়। সম্মুখে চলেছে কীর্তনের দল। আমাদের বহির্বাটি মহাতীর্থ হয়ে উঠ্‌লো, জলস্রোতের মতো জনস্রোত, গভীর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তনে সারা গ্রাম মুখরিত। গ্রামের মাঝখানে বিরাট অন্নসত্র—চারদিক থেকে ভারে ভারে চালডাল তরিতরকারী আসছে, ভোগ রান্না ও পরিবেশনে ছেলে বুড়ো কোমর বেঁধে লেগেছে। সে এক সমারোহ ব্যাপার। ভক্তরা কাণ্ড দেখে অবাক। স্বামী প্রেমানন্দজী দেখে বলেন—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। ইতর ভদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র কোন ভেদাভেদ রইল না। এমন দৃশ্য কেউ এ দেশে দেখেনি। প্রেমানন্দ যেন তাঁর আশ্চর্য উদার হৃদয় দিয়ে জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করছেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পর্যন্ত অভ্যাস-গত দ্বিধা সঙ্কোচ ভুলে গেল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্পর্কে যাঁদের মনে বিরূপ ধারণা ছিল, তাঁরা অনুতপ্ত চিত্তে "শূদ্র সন্ন্যাসীর" পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় এক মৌলবী তাঁর গুটিকয় শিষ্য নিয়ে এলেন। দম্ভভরা ভঙ্গীতে বাবুরাম মহারাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন, আমি ম্লেচ্ছ, আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন? প্রেমানন্দজী তাঁকে প্রীতি-ভরে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে ভক্তরা বসেছেন। মৌলবী চারদিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ঈশ্বর-জানিত পুরুষ, নিশ্চয়ই ভেদাভেদ মানেন না, আমার সঙ্গে এক পাত্রে আহার করতে পারেন? মৌলবী অনেকের পরিচিত, তাঁরা বিরক্ত হয়ে মৃদু প্রতিবাদ তুল্‌লেন। প্রেমানন্দজীর মুখ গম্ভীর—আদেশ দিলেন, ফল নিয়ে এসো। এক থালা ফল সম্মুখে রাখা হ'ল। প্রেমানন্দজী বল্‌লেন, মৌলবী সাহেব, গ্রহণ করুন। মৌলবী এক টুক্‌রো আম তুলে নিলেন, তিনিও তাঁর স্পৃষ্ট পাত্র থেকে এক টুক্‌রো ফল মুখে দিলেন। একটা বড় রকম জয়ের গর্বে মৌলবী চারদিকে চাইলেন। এমন সময় প্রেমানন্দজী মৌলবীর দু'হাত ধরে বল্‌লেন, এর পর? তারপর যা ঘটলো, জীবনে তা কখনো দেখিনি। মৌলবী দু'হাঁটু গেড়ে বসে মাথা কুট্‌তে লাগলেন ফরাসের ওপর—তাঁর কণ্ঠে আর্ত ক্রন্দনে ধ্বনিত হতে লাগলো, আনল হক্‌, আনল হক্‌। ক্রমে আনত শির আর উঠলো

না, তাঁর সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগলো, হিক্কা রোগীর মত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে বল্‌তে লাগলেন, আনন্দ হক্‌। প্রেমানন্দজী হাস্য মুখে মৌলবীর দিকে চেয়ে আছেন, সমবেত জনতা নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পর মৌলবী প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসলেন। স্বামিজীকে নত হয়ে নমস্কার করে নীরবে চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম মৌলবী সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু এমনটা কেন ঘটলো, সে রহস্য অজ্ঞাতই থেকে গেল।

ধারিন্দা থেকে বাবুরাম মহারাজ বিক্রমপুর চলে গেলেন। সেখানে সোনারং গ্রামে একটা কচুরী পানায় পূর্ণ পুকুর দেখে তিনি ওটা সংস্কারের প্রস্তাব করলেন। তাঁর উৎসাহবাণীতে তখনই শতাধিক যুবক ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পুকুরে নেমে পড়লো। প্রেমানন্দও স্থির থাকতে পারলেন না। কোন নিষেধ অনুনয় তিনি শুনলেন না। কোমর জলে দাঁড়িয়ে কচুরী পানা সরাতে লাগলেন। এর পর যখন বেলুড় মঠে ফিরে এলেন, তখন তাঁর দেহে কালা জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে আনা হ'ল। দেহ শীর্ণ, সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে,—কিন্তু সেই মধুর হাসি, অমিয় বচন ম্লান বা নিস্তেজ হয়নি। চিকিৎসা নিষ্ফল, অন্তরে অন্তরে আমরা বুঝলাম—তাঁর নরলীলার অবসান আসন্ন। বহু তাপিতের হৃদয়ে স্নিগ্ধ শান্তিবারি বর্ষণ করে, বহু চরিত্রবান যুবককে নরনারায়ণের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে, নব যুগের সন্ন্যাসের আদর্শ পরবর্তীদের হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করে, ঈশ্বরীয় প্রেম ও মানবীয় ভালবাসার প্রেমঘনমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দ ইহলোক থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন।

সাধনায় শ্রীগুরুতত্ত্বের স্থান

শ্রীকালিদাস মজুমদার

সাধনায় শ্রীগুরুতত্ত্বের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীরামাদি অবতারগণও যথাবিধি লৌকিক গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, লৌকিক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। দীক্ষাগ্রহণের অনুকূলে বহু শাস্ত্রীয় বচনও আছে। গুরুর কি প্রয়োজন, দীক্ষার কি প্রয়োজন, গুরু কে, মন্ত্র কি—এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে এবং অনেক দীক্ষিত নরনারীর মধ্যেও সুস্পষ্ট ধারণা নাই, পরন্তু কিছু কিছু ভ্রমাত্মক ধারণাও আছে।

প্রশ্ন এই, প্রকৃত পক্ষে গুরু কে এবং কেন? ইহার উত্তর, ঈশ্বরই গুরু, কারণ তিনি (ক) পথ-নির্দেশক (খ) মায়াপসারক এবং (গ) সাফল্যদাতা। তিনি যে নরদেহ আশ্রয় করিয়া উক্ত কর্মসমূহের সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই নরদেহধারী গুরুও ঈশ্বরের প্রতিমার মত মাহাত্ম্যপ্রাপ্ত ও পূজ্য হন।

(ক) মান, যশ, ধর্ম, অর্থ, উচ্চপদ, স্বর্গাদি অপবর্গ, অথবা ইষ্টসম্মেলন, আত্মদর্শন, মোক্ষ প্রভৃতি উচ্চবর্গ যাহা কিছু রুচিভেদে, আধারভেদে মানবের কাম্য তৎসমুদায় একমাত্র ঈশ্বরই প্রদান করিতে পারেন। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে তাঁহার নিকট কিছু পাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। কখন কিসে তাঁহার সন্তোষ হয় তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, কারণ তিনি কোন নিয়মের অধীন নহেন। তাঁহার রুচিও বহুপ্রকারের। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিই

তাঁহার বহু রুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কাহার নিকট হইতে কোন প্রকারের সেবাকর্ম, ভালবাসা বা ব্যবহার পাইতে তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন এবং বলিতে পারেন। বহু জন্মের বিবর্তনের ফলে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশাবস্থা অনুযায়ী জীবাত্মার এক একটি আধার গঠিত হয়। সেই আধারকে তাহার শক্তি ও উপযোগিতা অনুসারে যে ভাবে চালিত করিলে সর্বোত্তম শুভ হয় তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাই আধ্যাত্মিক জগতে গুরুরূপী ঈশ্বরের এত গুরুত্ব। সেইজন্যই ঈশ্বরই একমাত্র গুরু। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দই গুরু"।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগুরু অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া মায়োপহিত চৈতন্য জীবকে তাহার আত্মদেবের সহিত মিলিত হইবার বা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মায়া ব্রহ্মশক্তি। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই মায়ার কবল হইতে সাধককে মুক্ত করিতে পারেন না; সুতরাং মায়াপসারক হিসাবে ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দই গুরু। কিরূপে মায়ার ক্রমশঃ অপসারণ হয়? মন্ত্রপ্রদানের ফলে সাধকের আধ্যাত্মিক নবজন্ম ও শক্তিলাভ হয়। এই নূতন পরিবেশ সাধন-জীবনের যথেষ্ট অনুকূল হয়। পরে সাধনাপ্রভাবে ক্রমশঃ মায়ার অপসারণ হইতে থাকে।

গুরুদত্ত দীক্ষা ও উপদেশ ঈশ্বরদত্তজ্ঞানে সর্বদা অনুসরণ ও মান্য করা উচিত; কারণ, মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হওয়ার ফলে তাহা যেমন ঈশ্বরবৎ পূজ্য হন এবং ঈশ্বরের একটি রূপ হিসাবে গ্রাহ্য হন সেইরূপ গুরুও ঈশ্বর হন এবং ঈশ্বরবৎ পূজ্য হন। গুরূপদেশ সকল সাধনার মূল।

(গ) গুরুই সিদ্ধিদাতা। যেমন কেহ পূজিত প্রতিমাকে ঈশ্বরের সহিত ভেদ করে না, সেইরূপ দীক্ষাদাতা গুরু ও ঈশ্বরে ভেদ করা কর্তব্য নহে। যেমন কেহ প্রতিমাকে শিলাখণ্ড মনে করিলে ভগবৎকৃপা লাভে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ গুরুকে মানুষ মনে করিলেও সাধনায় সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি নশ্বর পাঞ্চভৌতিক দেহধারী ক্ষুৎপিপাসাতুর ইন্দ্রিয়-পরিচালিত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণে অপারগ হইয়া কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিতে পারেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গী অজ্ঞতার পরিচায়ক। পাঁচ টাকা মূল্যের মাটির প্রতিমায় বাহ্যদৃষ্টিতে কি এমন অনন্তজ্যোতি সত্যশিবসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় যে কোটি কোটি হিন্দু সেইরূপ প্রতিমাকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে? যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গুরুকে দেবোচিত শ্রদ্ধার্পণ করা অসম্ভব হইবে কেন? যদি পিতার প্রতিকৃতি (photo) জীবন্তভাবে না উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তান কি সেই প্রতিকৃতির অমর্যাদা করে? ঈশ্বরের বাক্য-বিলসিত বোধে শিখ সম্প্রদায় যদি গ্রন্থসাহেবকে এবং হিন্দুরা শ্রীশ্রীচণ্ডীকে পূজা করিতে পারেন, ঈশ্বরের প্রতিনিধি মহাত্মা যীশুর প্রতীক বলিয়া যদি খ্রীষ্টানগণ পবিত্র ক্রুশের প্রতি দেবোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত পণ্ডিতম্মন্যগণ কেন মানবদেহধারী গুরুকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না—বিশেষতঃ শাস্ত্রে যখন একথা বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রপ্রদানকালে গুরুর কণ্ঠে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হয় (যস্য বক্ত্রাদ্বিনির্যাতং পূর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ)।

গুরুর মহিমা সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রবাক্য আছে; এ স্থলে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল। জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মদাতা পিতা (গুরু) অধিক পূজ্য [শ্রীক্রম]। মন্ত্রত্যাগের ফল মৃত্যু, গুরুত্যাগের ফল, দরিদ্রতা, গুরু ও মন্ত্র উভয়ের ত্যাগের ফল নরকবাস। নিজ গুরুর সম্মুখে অন্য দেবতার পূজা করিলে সে পূজা নিষ্ফল হয় [জ্ঞানার্ণব]। গুরু কোন শাস্ত্রবাক্যের অধীন নহেন। গুরুর ব্যবহার্য বস্তুসমূহ—শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র প্রভৃতি লঙ্ঘন করা অনুচিত [দেব্যাগমে শিববাক্য], অর্থাৎ

সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। গুরুর সহিত বাণিজ্যাদি করা নিষিদ্ধ এবং তাঁহাকে ঋণদান বা কোন দান করা যায় না [রুদ্রযামল], তবে শ্রদ্ধা সহকারে উপহার বা প্রণামী দেওয়া যায় এবং উৎসর্গ করা যায়।

যাহাতে ভবিষ্যতে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, এতদুদ্দেশ্যে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে তন্ত্র নিন্দনীয় লক্ষণযুক্ত গুরুবরণে নিষেধ করিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে অনুসন্ধান চলে, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের পর গুরু বাহ্যতঃ যাহাই হউন না কেন, শিষ্যের চক্ষে আর জীবপদবাচ্য থাকেন না, ঈশ্বরপদবাচ্য হন। বিবাহব্যাপারে লোকে যে কুলশীলাদির অনুসন্ধান করিয়া থাকে তাহা যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অযৌক্তিক নহে, বরং সমর্থনযোগ্য, তদ্রূপ গুরুনির্বাচনের ব্যাপারেও উক্তরূপ আচরণ দুর্নীয় নহে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুবরণের পূর্বে যথেষ্ট পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষাদানের পূর্বে কিয়ৎকাল শিষ্যসঙ্গ করিবার কথা আছে—শিষ্য-পরীক্ষার জন্য; ইহাতে ব্যুৎক্রমে গুরু-পরীক্ষাও সূচিত হয়। এই পরীক্ষা বা নির্বাচন লৌকিক বিশ্বাসের ক্ষীয়মাণতার জন্যই সমর্থন করা যায়। বাস্তবিক কিন্তু গুরুর লৌকিক কুলশীল বিদ্যার উপর শিষ্যের উপকার তত নির্ভর করে না, যত করে শিষ্যের সক্রিয় গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার উপর এবং গুরুদেবের শিষ্যের প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ এবং আশীর্বাদের উপর। সেইজন্যই গুরু ব্রাহ্মণ কি শূদ্র তাহাতেও কিছু আসে যায় না, যে হেতু ঈশ্বর জাতিকুলবর্ণাতীত। ব্রাহ্মণ গুরুর শিষ্য যে শূদ্র গুরুর শিষ্য অপেক্ষা অধিক উন্নত হইবে এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যেমন স্বর্ণময়ী ও মৃন্ময়ী প্রতিমাতে পূজায় ফলের তারতম্য প্রতিমার উপাদানের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু পূজার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ গুরু ও শূদ্র গুরুর শিষ্যের সাধনার ফল তাহাদের গুরুদ্বয়ের বর্ণভেদের উপর নির্ভর করে না, করে তাহাদের নিজ নিজ সাধনার উৎকর্ষ-অপকর্ষের উপর। (ক্রমশঃ)

প্রণাম

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

আজো আমি হেরি সুখে,—এ নবীন যুগে
যেথা আছে দেবালয় ধরণীর বুকে,
যে হৃদয়ে ভক্তি-প্রেম-নির্ঝরিণী বয়,
যেথা সুখী দম্পতির নিভৃত আলয়,
ভাই-বোনে গড়ে প্রীতি, পিতা-মাতা-পায়ে—
সন্তান সুধন্য হয় ভকতি জানায়ে
শক্তি মত সবে খাটি অন্ন গৃহে আনে—
সততা ও সন্তোষের আনন্দ বয়ানে,
যেথা কেহ ক্ষুদ্র স্বার্থ দূরে বিসর্জনি
দুর্গতে করিছে সেবা স্ব-বান্ধব মানি,
সাঁঝে-ভোরে ভগবানে ভক্তি-ভরে ডাকে,
একতার সুনিবিড় বন্ধনেতে থাকে,
সেথায় মানুষ ভুলি' মান-অভিমান—
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে মাথা জানায় প্রণাম॥

নীলকণ্ঠের গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌

বাংলা দেশের প্রাচীন সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নানাভাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের মতন সম্পূর্ণ বিশিষ্ট শ্রেণীর সাধনসঙ্গীত, দাশুরায়ের মতন সর্বজনপ্রিয় পাঁচালী গান অথবা কবির গান-রচকদের মতন সাধারণের রুচিকর প্রেমগীতির প্রচলিত কোন ধারারই একনিষ্ঠ অনুগামী তিনি হ'ন নাই, কিন্তু তাঁহার গানে ঐ সকল বিশিষ্ট রীতির প্রত্যেকটির প্রভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য বাংলাদেশের অন্যান্য গানের ন্যায় কীর্তনভঙ্গীই তাঁহার গানের আগা-গোড়ায় অল্পবিস্তর রহিয়াছে।

নীলকণ্ঠের গীত একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর যাত্রাগান নামে সে সময়ে পরিচিত ছিল। যাত্রাগানে সে সময়ের অন্যান্য সকল শিল্পকলার মিশ্রণ হইয়াছে। যাত্রায় গীত, গল্পকাহিনী, নাট্যাভিনয়, ভাঁড়ামি প্রভৃতি নানা অঙ্গের সম্মিলন হইত। কৃষ্ণলীলা পালাই যাত্রার প্রধান উপজীব্য ছিল এবং এ পালার নাম অনুসারে সকল যাত্রাকেই 'কালীয়দমন' বলিয়া অভিহিত করা হইত।

পূর্বে হয়ত অন্য কাহিনীও অভিনীত হইত, কিন্তু শিশুরাম অধিকারীর নেতৃত্বে এমনভাবে যাত্রা-গানের সংস্কার হইল যে, পরবর্তী সমস্ত যাত্রাই এক রকম ব্রজলীলা-অবলম্বনে রচিত হইতে লাগিল। শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীর যত্নে কালীয়দমন যাত্রা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করিল।

যাত্রার পূর্ব ইতিহাস অনুধাবন করিলেও দেখা যায় চিরকালই কৃষ্ণলীলা-প্রচারই মূল উদ্দেশ্যরূপে বিবেচিত হইত। বাংলাদেশে 'কানুছাড়া গীত' সম্ভব নয়! মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গুণরাজ খাঁনের শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং কোন কোন মঙ্গলকাব্য—এগুলির প্রত্যেকটিই নাটকীয় গীতপদ্ধতিতে রচিত। মহাপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অভিনয় করিতেন।

মঙ্গলগানের নাট্যাভিনয়ে গায়কগণ একাই আসরে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতরণ করিতেন। মনসামঙ্গল গান, মনসার ভাসান, বেহুলা প্রভৃতি নানা নামে পূর্ববঙ্গের নানা অংশে অভিনয় সহকারে গীত হইত।

পরবর্তী কালে কীর্তনের কাহিনী-অংশকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনয় করিয়া তাহাকে যাত্রার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রারম্ভিক বন্দনা, রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা প্রভৃতি কীর্তনের প্রচলিত রীতিতেই যাত্রার আসরেও গীত হইত।

পরমানন্দ অধিকারীর যাত্রায় ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি লোকসঙ্গীতও স্থান পাইয়াছিল। 'কালীয়-দমন' যাত্রার প্রধান পালা ছিল চারটি—মান, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর এবং মিলন। এ ছাড়া প্রত্যেক পালার শেষে 'দূতীসংবাদ' নামে একটি বিশেষ সুরস-প্রযুক্ত অংশ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী এই দূতীসংবাদে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গোবিন্দ অধিকারী হুগলী জেলায় জাঙ্গিপাড়া গ্রামে ১২০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন; বিদ্যাচর্চায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না দেখাইলেও গীতচর্চায় তিনি বাল্য বয়স হইতেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। গোলোকচন্দ্র দাস ছিলেন গোবিন্দের সুরগুরু, তাঁহার একটি কীর্তনের দল ছিল। গোবিন্দ অধিকারী সেই দলের অন্যতম গায়করূপে আসরে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। জনসমাজের রুচির তখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবিমিশ্র সঙ্গীতের সমাদর কমিয়াছে, শ্রোতারা আসরে ক্রমে

দর্শকে পরিণত হইতেছে। গোবিন্দ অধিকারী তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী কীর্তনের দলকে যাত্রার দলে রূপান্তরিত করিলেন।

নীলকণ্ঠ এই গোবিন্দ অধিকারীর প্রিয়তম শিষ্য। ১২৬৮ সালে বর্ধমান জেলায় ধরণীগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়; বাল্যবয়সে লেখাপড়ায় বিশেষ সুযোগ তাঁহার না হইলেও পরিণত বয়সে সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রাদির তিনি রীতিমত চর্চা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে অবশ্য চিরকালই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল, গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদের গ্রামে যাত্রা গাহিতে গিয়া নীলকণ্ঠের সুকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দলে ভিড়াইয়া লইলেন।

সেখানে নীলকণ্ঠের সাগরেদী শুরু হইল, সুরচর্চা ও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভারও বিকাশ হইতে লাগিল। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার শূন্যস্থান সর্বাংশে নীলকণ্ঠই পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার যাত্রার দল-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। নীলকণ্ঠ তাঁহার গুরু 'গোবিন্দে'র সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে গোপাল রায় এবং গঙ্গানারায়ণ রায়ের নিকটও কিছুদিন সাগরেদী করিয়াছিলেন।

অধিকারী পদপ্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যেই নীলকণ্ঠের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যাত্রাধিপতিরা সে সময়ে কি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করিতেন, আজ আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিব না; দূরদূরান্ত হইতে ভক্ত শ্রোতারা কেবলমাত্র তাঁহার দর্শনলাভের আশায় আসরে আসিয়া প্রতীক্ষা করিত।

নীলকণ্ঠ ভক্ত কবিও ছিলেন; তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তিসঙ্গীত সেদিনের আসরের শ্রোতাদেরই কেবল মুগ্ধ করে নাই—আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে সেগুলি ঠিক তেমনি শ্রদ্ধাসহকারে গীত হইয়া আসিতেছে। বৃন্দাবন-গাথা লইয়া রচিত গানগুলি নীলকণ্ঠের এ ভাবে পদাবলীর পর্যায় উন্নীত হইয়াছে—

আমায় দে গো মোহন চূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি, দাঁড়াব চরণ ছেঁদে—আমায় দে গো।
ব্রজলীলা আমি করব যতদিন চন্দ্রাবলীর প্রিয় হব ততদিন,
শ্যামের বদন নলিন হইবে মলিন রাই অদর্শনের খেদে॥

এগুলির সুর ঠিক কীর্তনাঙ্গের নয়, বাউলাঙ্গেরও নয়—একটি বিশিষ্ট গীতিভঙ্গীতে তাঁহার এ সমস্ত গান রচিত। যাত্রার আসরে যখন গাওয়া হইত, তখন এগুলির আবেদন এক প্রকার ছিল; তাহার পর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া এগুলি সম্পূর্ণ বিশিষ্ট একটি রীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার এসব গান কণ্ঠবাবুর গাননামে বৈরাগী সম্প্রদায়ের ভিক্ষা উপজীবিকার অবলম্বন হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানের মধ্যেই একটি অলৌকিক বিচ্ছেদব্যথা এবং আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে—অবশ্য গানের ভাষাভঙ্গী সেই চিরাচরিত প্রথায়—

মরি মরি সখি, তমাল দেখে আমার অঙ্গ পোড়ে। মরি গো শ্যাম বিচ্ছেদ শরে॥
তমালের অঙ্গের বরণ, শ্যামের শ্যাম অঙ্গ যেমন। তমাল করিলে দরশন, আমার অঙ্গ শিহরে॥
তমাল বন তমাল তলা, ফুরায়েছে সে সব খেলা। কণ্ঠ কহে চিকণ কালা না রহে তমাল ছেড়ে॥

বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে; বৃন্দাবন-পদাবলীর মতন গৌরপদাবলীও তিনি রচনা করেন, যাত্রার প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা রূপে সেগুলি গীত হইত। যেমন—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নবনটবর, তপন কাঞ্চন কায়।
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়॥

কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে, উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে, এসেছে তিনেরি দায় ;
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে, দরশে জগৎ মাতায় ॥

কেবল বৈষ্ণব পদাবলীই নয়, রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের মতন নীলকণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত এবং উমা-সঙ্গীতেরও বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এসব গানের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং তত্ত্ববিস্তার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামার ভয়ঙ্কর রূপটিকে শব্দচ্ছটার সংকর্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন—

ঘোর ধ্বান্তবরণী, দুঃখান্তকরণী, কার কামিনী, কামান্ত উরে।
দক্ষ করে নরে বিতরে বরাভয়, কভু দনুজদলে করয়ে পরাজয়,
যখন দন্তে বামা ফেলয়ে পদদ্বয়, মনে লয় হয় বা প্রলয় এই বারে ॥

নীলকণ্ঠের একশ্রেণীর গান ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত। যে সব গানে সুররসকে অযথা প্রাধান্য না দিয়া ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিই অধিকতর জনসমাদর লাভ করিয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নের গানটি নীলকণ্ঠের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গান—

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার।
কবে বলতে হরিনাম, শুনতে গুণগ্রাম, অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার,
(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা, জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা, বিষয়বাসনা ঘুচিবে আমার ॥

'কবিয়াল'রা তখনকার আসরের সাধারণ শ্রোতাদের রুচির চাহিদা অনুসারে গান রচনা করিতেন। নীলকণ্ঠও তাঁহার যাত্রার আসরে তাহাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ; ভক্তিরস ছাড়া হাস্যরস এবং পারমার্থিক বিষয় ছাড়া সময়োপযোগী ঘটনা লইয়া গান তাঁহাকেও রচনা করিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার একটি 'পাকাফলার' বা লুচিবন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল—

লুচি, তোমার মান্য ত্রিভুবনে।
তুমি সুপবিত্র শুচি, অরুচির রুচি, দেখলে বাঁচি এ জীবনে ॥
যাগযজ্ঞ শুভকর্মাদি, বিবাহ তোমা বিনা কারও না হয় নির্বাহ।
শ্রাদ্ধ দুর্গাপূজায় মিলে রাজা প্রজায় তোমায় ভাজে সযতনে ॥

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহাপ্রয়াণে রাজভক্ত যাত্রার আসরে গীত হইল—

ভারত অন্ধকার এত দিনে।
হরি হরি হরি, পন্থা নাহি হেরি, ভারতেশ্বরী মা বিনে।
হায় হায় এ কি হইল দুর্দিন, সুখময় সূর্য কালাভ্রে বিলীন,
কাতরে কাঁদিছে নবীন প্রবীণ, সবার বদন মলিন এক্ষণে ॥

কিন্তু এ সমস্ত গান অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার আসল পদাবলী গানগুলি, কবির ভাষায়—"আজিও রাঢ়বঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে, মাঠে, হাটে, খেয়াতরীতে, দীঘিপুকুরের ঘাটে ঘাটে মুক্তকণ্ঠে উদ্গীত হয়। রাঢ়বঙ্গের বৈরাগী ভিখারীরা নীলকণ্ঠের গান গাহিয়া গৃহে গৃহে বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়া ঘুরে। প্রতিদিন অন্নগ্রহণের আগে তাহারা অন্নদাতা ভগবানের করুণার কথা শোনে, তাহাদের বিষয়াসক্ত মন ক্ষণকালের জন্য একটু চঞ্চল হয়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসেই হয়ত সে চঞ্চলতার পরিসমাপ্তি হয়, কিন্তু প্রতিদিনকার নামশ্রবণের ফল একটু একটু করিয়া তাহাদের চিত্তে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাই নীলকণ্ঠকে আমরা ধর্মগুরু বলিয়া মনে করি।"

সমালোচনা

সঙ্গীত ও সংস্কৃতিঃ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত ; শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ; ডিমাই সাইজ ৩৭৬ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১০৲ টাকা।

সঙ্গীতের সহিত সংস্কৃতির নিবিড় আত্মিক যোগ রহিয়াছে। কিন্তু সেই যোগকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে সঙ্গীত এবং সংস্কৃতি উভয়েরই গূঢ় তত্ত্ব ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের পরিচয় আবশ্যক। সঙ্গীত-শাস্ত্রে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বহুশ্রুত গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে সেই পরিচয় অতি যোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বইখানি লেখকের 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস'-রূপ বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। বেদের সংহিতা যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরকালীন ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, প্রাতিশাখ্য এবং শিক্ষা গ্রন্থাদির মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের (গীত, বাদ্য এবং নৃত্য) উৎপত্তি, ক্রিয়া এবং ক্রমপরিণতির যে সকল মূল্যবান তথ্য বিকীর্ণ রহিয়াছে বিস্ময়কর অধ্যবসায় এবং গবেষণা সহকারে লেখক তাহাদের উদ্ধার এবং সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সিন্ধু উপত্যকা-সভ্যতা (মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা) এবং ঐ যুগে সঙ্গীতের বিকাশ লেখকের সিদ্ধান্তে বৈদিক যুগের পরে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং মনীষীর উক্তি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখকের নিজের বিচারধারাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। গ্রন্থের একটি অন্যতম মূল্যবান সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"বৈদিক 'শিক্ষা'-গ্রন্থাবলীর 'মাণ্ডুকীশিক্ষা' ও 'নারদীশিক্ষা' বিশ্লেষণ ক'রে স্বামীজী প্রমাণ করেছেন যে, সাম-গানে সপ্তস্বরের প্রয়োগ হইত। এই তথ্য সম্পূর্ণরূপে নূতন আবিষ্কৃত সত্য,—ইহার আবিষ্কারে ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাসের একটী নূতন বাতায়ন উন্মুক্ত হইল—তাহার জন্য ভাবিকালের ভারত-সঙ্গীতের ঐতিহাসিক স্বামীজীকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিবেন।" 'ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতেতর দেশের যোগাযোগ' আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য, রাশিয়া, পারস্য, আরবদেশ ও চীনে সঙ্গীতের বিকাশ অনুসরণ করিয়া লেখক ঐ ঐ বিকাশে ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অবদান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সন্ন্যাসি-লেখকের ভারত-সংস্কৃতির উপর একটি অন্ধ আবেগ হইতে প্রসূত এ কথা বলা চলে না, তাঁহার প্রচুর যুক্তিবহুল বিবৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর ধীরভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সঙ্গীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁহার শুভেচ্ছা লিপিতে বলিয়াছেন,—"আমার বিশ্বাস এই ধরণের বই সাধক ঋষি মুনি ছাড়া কেউ লিখতে পারে না। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্ত্য সকল দেশের সঙ্গীত-গুণীরই এই বই পরম উপকার সাধন করবে।" গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে এই প্রশংসা আমাদের মতে অত্যুক্তি নয়। রাগ বসন্ত এবং রাগিণী গুর্জরীর দুইখানি রঙীন ছবি এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য ও মুদ্রা-সংক্রান্ত বহুসংখ্যক আলোক- ও রেখা-চিত্র পুস্তকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাপা এবং বাঁধাই নিখুঁত।

—'অনিরুদ্ধ'

A Phase of The Swadeshi Movement—অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জি এবং অধ্যাপিকা উমা মুখার্জি-প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা ; পৃঃ ৮৪ ; মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক-লেখিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বদেশী যুগের ইতিহাসের বহু তথ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা-সম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রধানতঃ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জি এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী সহকর্মী উমা দেবী বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তৎকালীন সংবাদপত্র, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য দলিলপত্র হইতে বহু মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়া এই নিবন্ধের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। প্রাক্‌স্বদেশী যুগ হইতেই ভারতীয় চিন্তানায়কগণের দেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের সঙ্কল্প জাগ্রত হইয়াছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কৃতী শিক্ষাবিদ্‌ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটীর প্রতি কর্তৃপক্ষ তথা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। বিংশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া দেশের জনসাধারণ যখন বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন তাহার সহিত বিদেশী শিক্ষা বর্জন এবং জাতীয় শিক্ষা গ্রহণের আন্দোলনও তীব্র হইয়া উঠে। দেশের তদানীন্তন কৃতী মনীষিবৃন্দ প্রায় সকলেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষ করিয়া 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখার্জির ন্যায় একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠককে পাইয়া অল্পকালমধ্যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটী নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়, কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে কয়েকটী শহর ও পল্লীতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী একটা নূতন চাঞ্চল্য এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দলে দলে ছাত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত এই নূতন ধরনের শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিতে থাকে। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় যে শিক্ষাপ্রণালী এবং পাঠ্যতালিকা নির্বাচিত হইয়াছিল, আজিকার স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষানায়কগণের পক্ষেও তাহা অনুকরণযোগ্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালকবৃন্দ সেই যুগেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বদেশের সমৃদ্ধির জন্য দেশের যুবকসমাজকে বিজ্ঞান ও বিভিন্ন কারিগরীবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত কারিগরী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে একমাত্র যাদবপুরের কারিগরী শিক্ষায়তনটী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উজ্জ্বল ও গৌরবময় স্মৃতি বহন করিতেছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে। সংক্ষেপে স্বচ্ছ এবং মনোরম ভাষায় এই আন্দোলনের বিস্মৃত ইতিহাস বিবৃত করিয়া অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা মুখার্জি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

অহনা (কাব্যগ্রন্থ)—রচয়িতা : শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৫ ; মূল্য আড়াই টাকা।

সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে, কবিতারচনার সেই মাপকাঠিতে আলোচ্য গ্রন্থখানির আলোচনা সম্ভব নয়। তা' না হ'লেও 'অহনা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে একটি কাব্যনিষ্ঠ সাধকপ্রাণের সন্ধান মেলে। নানা বিষয় (প্রধানতঃ ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক) অবলম্বনে বিভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতাগুলি ভাবের গভীরতায় সমুজ্জ্বল। কবি দেবতা ও মানব উভয়ের উদ্দেশেই অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন

কবিতাগুলির মাধ্যমে। স্থানে স্থানে ছন্দের অসংগতি রয়ে গেছে। 'ঢুঁড়ি', 'দুরি', 'হিয়ে', 'অক্ষুভিত', 'অস্বীকারি', 'তোমাও স্বাগতি' প্রভৃতি শব্দ কানে বাজে। কাগজ এবং ছাপা চিত্তাকর্ষক।

—শান্তশীল দাশ

কুষ্ঠসমস্যা ও আমাদের কর্তব্য—প্রকাশক: শ্রীপার্বতীচরণ সেন, হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ (পশ্চিম বঙ্গীয় শাখা), স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা—১২।

কুষ্ঠরোগ আমাদের দেশে একটি উৎকট সমস্যা। বিনামূল্যে প্রচারিত ৩২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে এই রোগসম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিচিতি এবং প্রতীকারের উপায় দেওয়া হইয়াছে। প্রভূত শিক্ষা ও উপকার-বিধায়ী আলোচ্য বইটির জন্য প্রকাশক সর্ব-সাধারণের ধন্যবাদার্হ।

সংসার ও সংগ্রাম—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী-প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীহামিরকুমার রায় চৌধুরী, ১৪-এফ সুইনহো ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯; ২৩০ পৃষ্ঠা; "ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের জন্য মূল্য ৩৲ টাকা।"

দেশসেবা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত গ্রন্থকার তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা মনোজ্ঞ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারের বিচিত্র কর্মসংঘাতকে লেখক সত্যের পথে প্রয়োজনীয় সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। মুদ্রণ এবং আকারসৌষ্ঠব লক্ষণীয়।

(১) **West Bengal** (২) **পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন অক্টেভো; পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫৬ ও ১২৮; মূল্য যথাক্রমে ২৲ টাকা ও ১৲ টাকা।

এই দুটি বার্ষিকী (প্রথমটি ইংরেজীতে, দ্বিতীয়টি বাঙলায়) পশ্চিমবঙ্গ-সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমাজ-উন্নয়ন, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, জনশিক্ষার অগ্রগতি, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজ্যসরকার কতটা কি করিতেছেন এবং এখনও কত করিবার বাকী সর্বসাধারণের তাহা জানা অবশ্য কর্তব্য।

দেশের বিবিধ সমস্যা-দূরীকরণে সরকারের যেমন গুরুদায়িত্ব আছে, জনসাধারণেরও কর্তব্য তেমন কম নয়। দুঃখের বিষয়, অনেক সময়ে আমরা ইহা ভুলিয়া যাই। আলোচ্য বার্ষিকীদ্বয় দেশসেবার প্রতি আমাদের নিজেদের কর্তব্যবিষয়ে সজাগ হইবার প্রেরণা দেয়। লেখাপড়া জানা বাঙ্গালীমাত্রেরই হাতে স্বল্পমূল্যের বই দুখানির একটি পৌঁছানো প্রয়োজন। অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে।

বিশ্ববাণী (অভেদানন্দ-(৭ম) স্মৃতিসংখ্যা)—প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; ২১০ পৃষ্ঠা; মূল্য ২॥০ টাকা।

পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় বিশ্ববাণীর বর্তমান বৎসরের এই স্মৃতিসংখ্যাটিও অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। 'স্বামী অভেদানন্দের জীবন: শেষ অধ্যায়' চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন স্বামী বেদানন্দ। 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশের তরুণগণকে স্বামিজীর অপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিতে আহ্বান করিয়াছেন:—

"আজ ভারত রাজনীতিক স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানা প্রকারের দ্বন্দ্বভাবে ভারত জর্জরিত। সেইজন্য বিদেশের মুখ না চাহিয়া patriot prophet স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ণ কর্মপদ্ধতি গ্রহণপূর্বক নূতন ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টির কর্মে তরুণেরা যেন আত্মনিয়োজিত করেন। কিন্তু কথায় আছে, 'গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না',

সেইজন্য চটকদার বিদেশী আলেয়া তরুণদের মুগ্ধ করে।" উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত 'স্বদেশী আন্দোলন' (১৯০৫-এর) তথ্যবহুল এবং চিন্তাপূর্ণ আলোচনা। ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ইতিহাস-বিষয়ক অন্যান্য রচনাগুলিও সুখপাঠ্য।

শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্রসংখ্যা)—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সম্পাদিত ; ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা—৫ ; মূল্য : ১৲ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন, সাহিত্য এবং বিশেষতঃ তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'যুগান্তরে'র 'স্বপনবুড়ো' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 'রবীন্দ্রস্মৃতিকথা' ; কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিয়াছেন 'লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ' ; 'কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্মী রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সংখ্যাটি বরাবরকার জন্য ঘরে রাখিবার মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ভারত সরকারের দান :—দীর্ঘকাল যাবৎ মিশন কর্তৃক পরিচালিত ব্রহ্মদেশের এই সুবিখ্যাত হাসপাতালটিতে একটি গভীর রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিছুদিন হইল ভারত সরকার এই অভাব দূর করিয়া প্রতিষ্ঠানটির উপযোগিতা-বর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন। এখানে বহুসংখ্যক ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় রোগী আসিয়া থাকেন।

গত ৫ই কার্তিক (২২শে অক্টোবর) ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে যন্ত্রটি মিশনকে দান করেন। এই উপলক্ষে হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে সেবাশ্রমের বন্ধু ও পরিপোষক-মণ্ডলীর একটি বৃহৎ সম্মিলন আহূত হয়। তাহাতে সভাপতিত্ব করেন সাও হকুন্ হকিও। ব্রহ্মদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উ খিন্ মং লাট্ হাসপাতালের পক্ষ হইতে রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রটি শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর-এর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, কেবলমাত্র সুরম্য গৃহ ও বিচিত্র যন্ত্রপাতি কোন হাসপাতালকে কর্মক্ষম ও উপযোগী করিয়া তুলে না ; প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণের সেবাসমাহিত সু-উচ্চ মনোভাবই ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশন কিভাবে নিঃস্বার্থ জনসেবা দ্বারা সমাজের নৈতিক উন্নয়ন সাধন করিতেছেন শ্রীযুক্তা কাউর তাহার উল্লেখ করেন। এই ঐকান্তিক সেবা-পরায়ণতার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ভারত ও ব্রহ্ম উভয় দেশেই এত জনপ্রিয়। মিশনের ভারতীয় কর্মিগণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত আপন জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মবাসিগণের সেবা করিতেছেন সাক্ষাৎভাবে দেখিয়া তিনি গর্বানুভব করেন। এই নিঃস্বার্থ সেবার ভিত্তিতেই উভয়-দেশের সুপ্রাচীন মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর হইতে পারে।

রাজকুমারী অমৃত কাউর মিশন হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডের ভিত্তিস্থাপন করেন। মিঃ চণ্ডুমল নামক জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে এই নূতন ওয়ার্ডটি নির্মিত হইতেছে।

সিংহলে ধর্মশালা (মডম্) প্রতিষ্ঠা—গত ১২ই জুলাই, সিংহলের প্রধান মন্ত্রী (সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত) মাননীয় মিঃ ডাড্‌লি সেনানায়ক সিংহলের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কাতরাগামায় (Kataragama) রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালার উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সিংহল-সরকারের মন্ত্রিগণ, অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ভারতীয় হাই কমিশনার যোগদান

করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠ এবং দাক্ষিণ ভারতের ও সিংহলের শাখাকেন্দ্রগুলি হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সন্ন্যাসী এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। উদ্বোধনের পর নূতন গৃহের প্রশস্ত হলে একটি সভার আয়োজন হয়। সিংহলের মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন প্রধান অতিথি। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী বেলুড় মঠ হইতে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসিতে অপারগ হন বলিয়া সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী। ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকের প্রেরিত শুভেচ্ছা-বাণী সভা-প্রারম্ভে পড়া হয়। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার প্রেরিত লিপিতে জানান: "আমার মনে পড়ে সিংহলের হিন্দুদের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি কাতারাগামার মন্দির-বিষয়ক ব্যাপারে আমার নিকট পূর্বে আসিয়াছিলেন এবং উক্ত বিষয়ে আমাকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ জানান—যেরূপ আমি বুদ্ধগয়া মন্দিরের স্থান সমর্পণ ব্যাপারে উদ্যোগী ছিলাম। সেই জন্য আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ঐ স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন—একতা এবং সামঞ্জস্যবিধানই যাঁহাদের ব্রত—একটি 'মডম্' প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং এখানে দর্শনার্থী আগত তীর্থযাত্রীদের থাকিবার ব্যবস্থা ব্যতিরিক্ত ইহা শিক্ষা-সংস্কৃতিরও একটি কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। আশা করি এই ধর্মশালা-প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দুইটি পাশাপাশি জাতির মধ্যে সংস্কৃতি এবং ধর্মমূলক সৌহার্দ্যের এক নূতন বন্ধন গড়িয়া উঠিবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব—

(উৎসবসম্বন্ধীয় কতিপয় নির্দেশ)

শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মশতাব্দী উৎসব তাঁহার পুণ্য জন্মতিথি, ১২ই পৌষ, রবিবার, ১৩৬০ (ইং ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) তারিখে নির্ধারিত হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সর্বসাধারণ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার পবিত্রতা ও স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম ও অনুরাগ কিরূপে তাঁহাকে কেবলমাত্র সামান্য স্ত্রীর ন্যায় ঐহিক কর্তব্য পালনে নিরতা না রাখিয়া প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যারূপে পরিগণিত করিয়াছিল; কেমন করিয়া উঁহার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার ধর্মজীবন গঠিত হইয়াছিল; কি ভাবে উঁহার তিরোধানের পর তিনি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর স্থূল শরীরে বর্তমান থাকিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পরম কৃতিত্বের সহিত তাঁহার বাণী বহন করিয়াছিলেন, কি দরদ দিয়া বহু সংসারক্লিষ্ট নরনারীর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষ ও গভীরতা সম্পাদন করিয়াছিলেন সে কাহিনী স্বল্পই লোকের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

যথাযোগ্যভাবে এই অপূর্ব মাতৃমহিমোজ্জ্বল সাধ্বীর জীবনী ও বাণীর বহুল প্রচারের জন্য তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী প্রতিপালনের আয়োজন চলিতেছে। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব উদ্‌যাপনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পৃথিবীব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় শতবর্ষজয়ন্তী সমিতি সকল সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া নিম্নলিখিত নির্দেশপত্র জ্ঞাপন করিতেছেন; ইহাতে স্থানীয় ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির কার্যকলাপ নির্ধারণ ও সংগঠন করা সহজ হইবে।

(১) শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা-জ্ঞাপক বাণী কেন্দ্রীয় সমিতিতে পাঠান যাইতে পারে।

(২) পৃথিবীর সর্বত্র সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের মধ্যে একাত্মবোধ ও ভাবৈকতানতা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ধর্মসম্মেলন বা প্রার্থনাসভার এক অধিবেশন করা।

(৩) শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর বিশদ আলোচনার দ্বারা তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্বকে স্থানীয় লোকের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য অপর কোন নির্দিষ্ট দিনে এক স্মারক সভার অধিবেশন করা।

(৪) উক্ত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সভা, সম্মেলন, পরিষদ্, প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর মহীয়সী মহিলাদিগের জীবনী আলোচনা দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে নারীদিগের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও অবদান, বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন ও বাণীর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া নারীমাহাত্ম্য প্রকট করা।

(৫) স্থানীয় বেতারকেন্দ্র ও সংবাদপত্রাদিতে সভাসমিতির বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া এবং সাধারণ ভাবে নারীচরিত্রের আদর্শ ও বিশেষভাবে শ্রীশ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া এই জয়ন্তীর প্রচারে সাহায্য করা।

আমাদের ঐকান্তিক বাসনা যে, স্থানীয় সমিতি-সমূহ উল্লিখিত বা তদনুরূপ পদ্ধতিক্রমে এই উৎসব পরিচালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পৃথিবীব্যাপী এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। কেন্দ্রীয় সমিতি সকল শাখাসমিতি হইতে ঐরূপ কার্য-বিবরণীর খসড়া পূর্বে পাইলে খুবই সুখী হইবেন এবং তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দীজয়ন্তীর সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।

বারাণসী সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী— শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম সেবাশ্রম এই কেন্দ্রটির (ঠিকানা: লাক্সা, বেনারস, ইউ পি) ১৯৫২ সালের (দ্বি-পঞ্চাশৎ বার্ষিক) কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বৎসরে ২৪৯৫ জন রোগীকে চিকিৎসার্থ ভর্তি করা হয় (তন্মধ্যে শল্য-চিকিৎসার রোগিসংখ্যা —৪৯১)। পঙ্গু-আশ্রয়-বিভাগে ১৯টি দুঃস্থ স্ত্রী-পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রী বিবি ধর্মশালা ফণ্ডের সামর্থ্যানুযায়ী আতুরদিগকে বাসস্থান ও আহার্যের কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শিবালাস্থ শাখা লইয়া সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে মোট ১,৪৪,০৩৪ জন নূতন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এই উভয় স্থানে পুরাতন রোগীর সংখ্যা ছিল—৩,৩৬,৬১১। বহির্বিভাগে অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল—২৫০৪ (শিবালা কেন্দ্রে—৫৮১)।

দরিদ্র পঙ্গুদিগকে আর্থিক সহায়তা এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের অসহায় মহিলাগণকে মাসিক সাহায্যদানখাতে এবারে ১৮৩২৵৬ পাই ব্যয় করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা ১০২। এতদ্ব্যতীত দুঃস্থদিগকে ৭৫ খানি কম্বল, ১১টি ধুতি এবং ৯টি গেঞ্জিও দান করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে পুস্তকাদি এবং অসহায় পথিকদিগকে খাদ্যাদি দিয়াও কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়াছিল।

রোগ-বীজাণু নিরূপণ এবং ব্যাধিসংক্রান্ত রাসায়নিক অনুসন্ধানের জন্য একটি পৃথক ল্যাবোরেটরীর সুষ্ঠু কর্মনির্বাহের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ সালে দুটি এক্স রে ইউনিট্ কেনার ফলে এক্স-রে বিভাগের কাজ সুন্দরভাবে চলিতেছে।

এই বৎসরে (সকল তহবিল লইয়া) মোট আয়—৯২,৫৬১৵৫পাই এবং ব্যয় ১,১০,৯৭৮৲টাকা। ইহা হইতেই ঘাটতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। গত পাঁচ বৎসরে সাধারণ তহবিলে মোট ঘাটতি-পরিশোধের জন্য ৫০,০০০৲টাকা আশু প্রয়োজন।

সেবাশ্রমে রোগীর সংখ্যা এবং খরচের পরিমাণ যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে কর্তৃপক্ষকে [illegible]ভাবে প্রচুর অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইতেছে। [illegible] দেশবাসীর নিকট আর্থিক অথবা দ্রব্যাদির (পোষা[illegible] পথ্য প্রভৃতি) সাহায্যের জন্য কর্তৃপক্ষ আবেদন জানাইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

হাফলংএ (কাছাড়, আসাম) উৎসব—অপরাপর বৎসরের ন্যায় স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে হাফলংএ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১৮তম জন্মতিথি-স্মরণে আধ্যাত্মিক-ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সৌম্যানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। "বিশ্বসভ্যতায় বিবেকানন্দের অবদান" এই বিষয়বস্তু-অবলম্বনে স্বামী চণ্ডিকানন্দ এবং আরও কয়েকজন বক্তা চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদি করেন। উৎসবে এবং বক্তৃতাদিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শত শত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এক রবিবারে সারাদিনব্যাপী বেদপাঠ, কথামৃতাদি পাঠ ও আলোচনা, পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, আলোক-চিত্র প্রদর্শনী ও বক্তৃতাদি অভূতপূর্ব আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকায় বিভিন্ন ধর্মমতের লোক—যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫০ সালের গীর্জার বর্ষপঞ্জী থেকে জানা যায়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ৭৩ হাজার বৌদ্ধ এবং ১২ হাজার বেদান্ত সোসাইটির সদস্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় ঐ সময় ১০ হাজার হিন্দু ও ৩২ হাজার মুসলমান ছিল। এ ছাড়া, ক্যালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেন্টোর আশে-পাশে ২ হাজার এবং ষ্টকটনের আশেপাশে ৪ শত শিখ বাস করে।

আমেরিকায় বেদান্ত সোসাইটির ১১টি কেন্দ্র আছে এবং অনেকগুলি প্রার্থনামন্দির আছে; কিন্তু খাঁটি হিন্দু মন্দির বলতে গেলে যা বুঝায়, এরূপ কোন মন্দির নেই। ক্যালিফোর্ণিয়ায় শিখদের দুটি গুরুদোয়ারা আছে। সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রে ৪৭টি বৌদ্ধ মন্দির আছে। ওয়াশিংটনে মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। এ ছাড়া নিউইয়র্ক, ডেট্রয়ট এবং সাক্রামেন্টোতেও মুসলমানদের উপাসনালয় আছে।—(আমেরিকান রিপোর্টার)

আমেরিকায় সংস্কৃতগ্রন্থ—আমেরিকার বড় বড় ১৮টি গ্রন্থাগারে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস গ্রন্থাগারে কয়েক সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ ও বহু শত পাণ্ডুলিপি আছে। এ-ছাড়া, ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত গ্রন্থাদি আছে। নিউইয়র্ক সিটি লাইব্রেরীতে প্রচুরসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

(আমেরিকান রিপোর্টার)

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে উদ্বোধনের নূতন (৫৬তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বর্ধিত হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রণাদির ব্যয় দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এই জন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমরা উদ্বোধনের বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকা করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি, উদ্বোধনের গ্রাহকমণ্ডলী আমাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই বর্ধিত মূল্যের জন্য তাঁহাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। যথারীতি গ্রাহকসংখ্যা, নাম ও ঠিকানাসহ ১৫ই পৌষের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা এই আফিসে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। টাকা পূর্বে আমাদের হস্তগত হইলে গ্রাহকগণের ভি, পি-তে কাগজ লইবার অযথা বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ব্যয় ৷৵ আনা বাঁচিয়া যায়। পাকিস্তানের গ্রাহকগণের টাকা পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন—১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩

পরম আশ্রয়

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে॥

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ সকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা॥

—স্বামী বিবেকানন্দ, অম্বাস্তোত্রম্—৫, ৭

হে বিশ্বজননি, তুমি হইতেছ সমতার প্রতিমূর্তি। শত্রু-মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পদ্ম-নয়নের দৃষ্টি তুল্যভাবে পড়িতেছে, সুখী-অসুখী উভয়ের ক্ষেত্রেই তোমার একই করুণ হস্তপাত, মৃত্যুর ছায়া এবং অমৃতত্ব—দুয়ের মধ্যেই প্রকটিত তোমার ভাগবতী দয়া। হে পরমে, তোমার কল্যাণ-চক্ষুর অবলোকন যেন আমাকে কখনও পরিত্যাগ না করে।

সুচির কাল কঠিন দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিয়াছি—এইরূপই হয়তো চলিতে হইবে আরও কত যুগ—যতদিন না জীবন-লক্ষ্যে পৌঁছাই। কিন্তু ইহা যে জগদম্বারই বিধান, তাঁহারই ললিত লীলা-ব্যঞ্জনা। জানি, তিনি সতত এই পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে শ্রেয়ের অভিমুখে নিয়োজিত করিতেছেন; সফলতা আসুক, বিফলতা আসুক, সেই মঙ্গলময়ী জননীই আমার একমাত্র আশ্রয়।

কথাপ্রসঙ্গে

মা

আগামী ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাসপ্তমী) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পুণ্যাবির্ভাবের একশত বর্ষ পূর্ণ হইবে। শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দীজয়ন্তী-সমিতির উদ্যোগে ভারত এবং ভারতের বাহিরেও সারা বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠেয় উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঐ তিথিতে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী এই অনবদ্য মাতৃ-মহিমোজ্জ্বল চরিত্রের স্মরণ এবং অনুধ্যান করিয়া ভারতের এক শাশ্বত আদর্শেরই প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন। সে আদর্শ—নারীকে মাতৃ-মহাশক্তিরূপে উপলব্ধি ও সম্মান। জননী সন্তানের নিকট সকল দেশেই সম্মানিতা, কিন্তু ভারতে ঐ সম্মানের প্রকৃতি এবং গভীরতা সত্যই অনুপম। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতসন্তান ঈশ্বরের মাতৃরূপ-কল্পনার মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, গুণ ও শক্তিগুলির ঘনীভূতপ্রকাশ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে। অসীম স্নেহ করুণা, শুচিতা, ক্ষান্তি, দান্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি—আবার মেধা, পুষ্টি, বীর্য, বুদ্ধি, কান্তি—এ সকলই জগন্মাতার বিভূতি। অমিত গুণ ও বৈভবময়ী সেই জগদম্বারই বিশেষ এক প্রকাশ পার্থিব জননীর মধ্যে। তাই জননী জগজ্জননীর ন্যায়ই পূজার্হা। শুধু তাহাই নয়, নারীমাত্রেই ভারতসন্তান দেখিতে চায় জগদম্বিকার অভিব্যক্তি। নারীমাত্রই তাই ভগবতী—মা। নারীর প্রতি এই পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গী আবহমান কাল হইতে ভারত-সংস্কৃতিকে প্রভূত শক্তি ও উচ্চপ্রেরণা দিয়া আসিয়াছে। উহা কিন্তু বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত একটি কাব্যিক বা দার্শনিক ভাব-বিলাস মাত্র নয়—ভারত-সন্তান তাহার দৈনন্দিন আচরণে পদে পদে এই মাতৃপূজা সাধিয়াছে—মাতৃ-মহামন্ত্র তাহার প্রতি স্নায়ুতন্ত্রীতে সর্বক্ষণ অনুরণিত। মাতৃপূজারী ভারতের নিকট মা শব্দটি এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগের দ্যোতনা লইয়া আসে। সংসারের যাহা কিছু সুন্দর, স্নিগ্ধ, বলপ্রদ—আবার সংসার যে পরম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দে বিধৃত—এই দুইটাই ভারত তাহার মাতৃমূর্তির মধ্যে দেখিতে পায়।

প্রাক্-শ্রীরামকৃষ্ণ যুগে ভারতে যে একটি ধর্মের গ্লানি আসিয়াছিল নানা গ্রন্থে উহার বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। ঐ গ্লানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল প্রধানতঃ নাস্তিক্য, স্বধর্মে অনাস্থা এবং ঐহিক ভোগোন্মত্ততায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ যেন দেখা দিয়াছিল উহাদিগকে প্রতিহত করিবার জন্যই, ইহাও আজ সুবিদিত। কিন্তু ঐ ধর্মগ্লানির মধ্যে বীজাকারে আরও একটি মহাসঙ্কট লুকাইয়া ছিল যাহা তখন তেমন ধরা না পড়িলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ক্রমশঃ ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করে। সে সঙ্কট ভারত সন্তানের মাতৃ-মহিমা-বিস্মৃতি। মহামতি বেথুন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এই দেশে নারীর উচ্চশিক্ষার যে সূত্রপাত অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষার্ধে করিয়া গিয়াছিলেন তাহার পরিবিস্তৃতি শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায়। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ ভারতীয় নারীরা ব্যাপকভাবে শিক্ষালাভ এবং প্রতিভাবিকাশ করিতে লাগিলেন। নারীর স্বতন্ত্র অধিকার-বোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত ও বর্ধিত হইতে লাগিল। মাতৃজাতির এই বহুমুখী প্রগতি অবশ্যই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু প্রগতির ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং পরিচালনার মধ্যে মারাত্মক ত্রুটি ছিল—যাহার ফলে প্রগতিশীলা ভারতীয় নারীকে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইতে আমরা ক্রমশঃ দূরে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। নারী আমাদের নিকট হইয়া পড়িতেছিলেন শুধুই নারী রক্তমাংসের নারী; তাঁহার আধ্যাত্মিক সত্তা—তাঁহার ভাব-রূপ—দেবীত্ব—মাতৃত্ব আমরা বিস্মৃত হইতেছিলাম। এই আত্ম-বিস্মৃতি প্রকৃতই ভারত-ধর্মের একটি বিপজ্জনক গ্লানিরূপে দেখা দিতেছিল। ভারতের ভগবান কিন্তু সেই গ্লানি দূর করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী মাতা সারদাদেবী আমাদিগকে প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া 'মা' ডাক শিখাইলেন—নারী-মহিমা শাশ্বত মাতৃত্বে পুনরায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিগ্দর্শন দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার জীবন-সাধনায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি নাস্তিক জগৎকে দিয়া থাকেন জগৎ-সার ভগবানকে, শ্রীশ্রীমা মাতৃহীন সন্তপ্ত পৃথিবীকে বসাইয়া গিয়াছেন জননীর স্নেহ-শীতল অঙ্কে। উভয়েই যুগধর্মসংস্থাপক—যুগগুরু—যুগের আরাধ্য।

সত্য খুব সহজ সরল জিনিস—কিন্তু অনেক সময়ে এই সহজতাই উহাকে চিনিতে দেয় না; মনে হয়, যাহা এত মূল্যবান তাহা কি কখনও এত অনায়াসে পাওয়া যায়? শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিতে অনেকেরই 'ধোকা' লাগিয়াছিল। জননী সারদাদেবীরও চতুষ্পার্শ্বে এমন একটি নিরাবরণ স্বাভাবিকতা দেখা যাইত যে, তিনি যে অসামান্যা একথা বিশ্বাস ও ধারণা করা বহু লোকের নিকট ছিল সুকঠিন। কৌতুকাবহ হইলেও এই কথোপকথনটি সত্যই সে সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য মনস্তত্ত্বের প্রতি আলোকসম্পাত করে: জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিতেছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঠাকুর—অবতার, একথা বিশ্বাস হয়, কিন্তু সারদাদেবীকে ভগবতী বলিয়া মন কিছুতেই নিতে চায় না। মাতৃসেবক স্বামী সারদানন্দজী ঈষৎ উত্তেজিতভাবে জবাব দিতেছেন,—তবে কি তুমি বলতে চাও, ভগবান একটি ঘুঁটে-কুড়োনী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যথাযথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের দূর-প্রসারী সার্থকতার কথাও খ্যাপন করিয়া গিয়াছিলেন তিনিই। শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিবার, অনুসরণ করিবার সময় যেমন স্বামীজীকে সর্বদা পুরোভাগে রাখা বিধেয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার তেমনই পরম সহায়ক হইতেছে স্বামীজীর তাঁহার প্রতি বিভিন্ন সময়ের আচরণ এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ উক্তিগুলি।

মায়ের জীবন ইতিহাসের কাঁটাকে পশ্চাতে ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে বলে না। প্রগতির সহিত উহার কোন বিরোধ নাই। তবে উহা প্রগতি-দেহে একটি কল্যাণ-বর্ম পরাইয়া দেয়—প্রগতি-ধর্মে আনয়ন করে একটি অদ্ভুত সঞ্জীবন-শক্তি। প্রগতির মধ্যে যে আত্ম-বিস্মৃতি—যে অমঙ্গলের সম্ভাবনা রহিয়াছে মা উহা দেন বিদূর করিয়া।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বিশেষতঃ মাতৃজাতিকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নূতন গতিবেগ সঞ্চার করিতে আবির্ভূতা।

ধ্যান ও প্রণাম

(স্রগ্‌ধরা ছন্দ)

পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ

ধ্যান

স্নিগ্ধশ্যামামগোত্রা,-মরুণিতচরণাং, কল্পবল্লীসমানাম্
আকীটব্রহ্মরূপাং, স্মিতশশিবদনাং, সর্বভূতাভয়াখ্যাম্।
লজ্জানম্রাবদাতাং, দলিতকলিমলাং রামকৃষ্ণাধিদৈবাং
ধ্যায়েত্তামাদিকর্ত্রীং, ত্রিভুবনজননীং, সারদাং সিদ্ধিদাত্রীম্॥

যিনি স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণা, মায়িক দেহধারণসত্ত্বেও যিনি জন্মহীনা, যাঁহার পদযুগল অরুণবর্ণ, শরণাগতের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যিনি কল্পলতিকাবৎ, কীট হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত সর্বত্র যিনি অনুস্যূতা, যাঁহার স্মিতোজ্জ্বল মুখমণ্ডল চন্দ্রমাসদৃশ, সর্বপ্রাণীর অভয়দাত্রীরূপে যিনি খ্যাতা, যিনি লজ্জায় অবনতা ও পরমপবিত্রা, যিনি স্বশক্তি দ্বারা কলি-কলুষ বিনাশ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণই যাঁহার অধিদেবতা, সেই আদিভূতা সনাতনী ত্রিভুবন-জননী সিদ্ধিদাত্রী শ্রীসারদাকে ধ্যান করিবে।

প্রণাম

গঙ্গাস্রোতোঽম্বুতুল্যাং, নিজগুণকরুণাং, বাহয়ন্তীং জগত্যাং
নীচানীচাপ্রভেদে,-রশনবসনদাং, সর্বমাঙ্গল্যধাত্রীম্।
প্রত্যাগচ্ছন্তমেহী,-ত্যবদদতিশুচা, যাশ্রুনেত্রৈরবেক্ষ্যাং-
কুর্বন্তীন্তাং ভবানীং, তনয়হিতরতাং, পাদপাতৈর্নতোঽস্মি॥

অবারিত কলুষনাশন গঙ্গাবারির ন্যায় জগতে যিনি আপন অহেতুক কৃপাগুণ প্রবাহিত করেন, উচ্চনীচ-নির্বিশেষে যিনি অন্নবস্ত্র দান এবং সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করেন, একবার চলিয়া গিয়া পুনঃ প্রত্যাগত সন্তানের প্রতি 'বাবা, এস' বলিতে বলিতে অতি আকুলভাবে বিগলিতনয়নে যিনি চাহিয়া থাকেন, সদা সন্তানহিতে রতা সেই ভবানীস্বরূপা জগন্মাতা শ্রীসারদার পাদপদ্মে বিনত হইয়া প্রণাম করি।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী ঈশানানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময়কার ঘটনা। একদিন দুপুরবেলা ষ্টার থিয়েটারের তখনকার নামকরা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী মাকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। মায়ের শরীর তখন বেশ দুর্বল, মাঝের ঘরে মেয়েদের সকলের সহিত কথা বলিতে বলিতে একটু শুইয়া রহিয়াছেন। তারাসুন্দরী মার কাছে বসিয়া খুব সন্তর্পণে ও ভক্তি-বিনয়-সহকারে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। কিছু পরে মা বলিতেছেন,—"ষ্টেজে তো বেশ বল, এমন সেজে এস যে তখন চেনাই যায় না।* এখানে এমনিই একটু শোনাও দেখি।" তারাসুন্দরী মাকে নমস্কার করিয়া পুরুষোচিত ধরণে বেশ বীরভাববিষয়ক একটি পাঠ আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। মা খুব খুশী। বলিলেন,—"আর একদিন এসো।"

এই সময় বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসুর উপর মায়ের চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। প্রাণধন বাবুকে ১৬৲ টাকা ভিজিট ও ৫৲ টাকা মোটর ভাড়া বাবদ দিতে হইত। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতেন। একদিন বৈকালে শ্রীমতী তারাসুন্দরী হঠাৎ একটি ট্যাক্সি করিয়া ৪।৫ ঝুড়ি নানা রকমের ফল, মিষ্টি, ফুল, শ্রীশ্রীমার জন্য ভাল কাপড় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় (রাধু ও মাকু) ও ছোট খোকাদের জন্য কাপড় ও জুতা প্রভৃতি বহু টাকার জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত। মা ঐ জিনিসগুলি মাঝের ঘরে রাখিয়া দিতে বলিলেন। অতঃপর তারাসুন্দরী চলিয়া গেলে মা আমাকে ও গোলাপ-মাকে বলিলেন,—"তারার ঐ খাবার জিনিসপত্র এখানের সাধু-ব্রহ্মচারী ছেলেদের কাউকে দেবার দরকার নেই ; চন্দ্র, ঝি, বামুন ও রাধু, মাকু, ছোটখোকা এদের কিছু কিছু দিও।" ঐ ভাবে মায়ের কথামত সকলকে কিছু কিছু দেওয়া হইল ; বাদ বাকী সমস্তই মাঝের ঘরে আগের মত রহিল। এই দিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার প্রাণধন বাবু মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি মাকে পরীক্ষা করিয়া নীচে বৈঠকখানায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট গমন করিলে মা আমাকে বলিলেন,—"দেখ, তারাসুন্দরীর জিনিস আর যা আছে, ঐ বুড়োর (ডাক্তারের) গাড়ীতে সব তুলে দিয়ে এসো ; ওঁরা ফুল খুব ভালবাসেন (প্রাণধন বাবু খ্রীষ্টান ছিলেন), ফুলগুলিও দিয়ে এসো।" আমরা তাহাই করিলাম। এদিকে ডাক্তার বাবু মার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গাড়ীতে উঠিতে গিয়া ঐ সকল দ্রব্য দেখিতে পাইলেন। কে দিলেন জিজ্ঞাসা করায় পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"মা এসব আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" ডাক্তার বাবু জিনিসপত্রাদি দেখিয়া খুব খুশী হইলেন মনে হইল।

পরের দিন ডাক্তারবাবু যথাসময়ে মাকে দেখিবার পর ঐ ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো প্রভৃতি দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি এতদিন কার চিকিৎসা করছি ?" মহারাজ উত্তর দিলেন,—"পরমহংসদেবের সহধর্মিণী, আমাদের সংঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের।" ডাক্তার বাবু পুনরায় কহিলেন,—"এত ধরচপত্রের টাকা কোথা থেকে আসে ?" মহারাজ উত্তরে ভক্তদের সাহায্যের কথা জানাইলেন। "ওঃ, তা এতদিন বলেননি ত,"—

* অভিনেত্রী তারাসুন্দরী অনেক সময় পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন।

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু বসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইহার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজ পূর্বের ন্যায় ডাক্তার বাবুকে দর্শনী ও মোটর ভাড়ার টাকা দিতে গেলে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন, আপনারা আজীবন অতি নিষ্ঠার সহিত যাঁর আপ্রাণ সেবা করে জীবন সার্থক করছেন, আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটু সেবা করবার সুযোগ দান করুন।" অন্তরের সহিত এই কথাগুলি অতি গদ্‌গদ ভাবে বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখে জল আসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য ঐ দিন হইতে ডাক্তার বাবু আর দর্শনীর টাকা গ্রহণ করিতেন না। অধিকন্তু কয়েকদিন পরে যখন তাঁহার চিকিৎসায় তেমন ফল হইতেছে না দেখিয়া সকলের পরামর্শে মায়ের জন্য অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হইল, ডাক্তার প্রাণধন বাবু তখনও দৈনিক সন্ধ্যাবেলা আপনার খরচে ট্যাক্সি করিয়া মাকে দর্শন ও অসুখের অবস্থা জানিতে আসিতেন এবং ঐ সময় প্রায় দুই ঘণ্টা নীচের ঘরে বসিয়া কাটাইয়া যাইতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতেন না। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট ঐজন্য আক্ষেপ করিয়া কিছু শুনিতে চাহিলে, মহারাজ একদিন তাঁহাকে এক সেট্ 'লীলাপ্রসঙ্গ' উপহার দিয়াছিলেন।

*   *   *

একদিন জয়রামবাটীতে আমি মার পায়ে ও হাতে হাত বুলাইতেছি। কয়েকটি ভক্তের চিঠির কি কি উত্তর লিখিব জিজ্ঞাসা করায় মা সংক্ষেপে ২।১টি কথা বলিয়া দিলেন। কিন্তু উহাদের প্রশ্ন অনেক ছিল। একটু পরে আমি বলিলাম,—"মা, আমার তো তেমন জিজ্ঞাসা করবার কোনই প্রশ্ন মনে ওঠে না। জপ ধ্যানও তেমন কিছু করছি না। সর্বদা আনন্দে একটা নেশার মতন দিন কেটে যাচ্ছে; ভবিষ্যতে কি হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে ঐ বিষয়ে কোন চিন্তাও নেই।" মা একটু একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিতেছেন,—"কি দরকার তোমার?" আমি বলিলাম,—"তা তো কিছুই জানি না।" মা তখন বলিলেন,—"আর ও সকল দিকে চিন্তা করতে হবে না। যা করছ করে যাও; ও সকল দিকে মন দিলে আমার এই কাজগুলি হবে না। ভাবনা কি? পরে পরে সব হবে, সব বুঝতে পারবে।" তারপর আবার বলিতেছেন, "দেখ, বিচার করা, মনের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, জপ-ধ্যান কর্ম করা—সব হল মনের, চিত্তের শুদ্ধতা আনার জন্যে,—কিনা, অনিত্য জিনিস থেকে, মনের বিক্ষেপ থেকে মনকে গুটিয়ে শুদ্ধ করে তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্যে ব্যাকুল হওয়া; তারপর তাঁর কৃপা যে কিসে হবে তিনিই জানেন। তবে কি জানো, সব চেয়ে তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন? ওই যা করছ—এতেই একমাত্র তিনি সন্তুষ্ট হন—অর্থাৎ সেবাতে। সেবাতে বনের পশুপাখী থেকে স্বয়ং ভগবান—সব বশ। কাজেই মন খারাপ না করে যা করছ করে যাও। আপনার জনদের চাওয়ার বলার কি আছে?"

"যার যার নাম মনে আসে তাদের জন্যে জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে তাদের জন্যে ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই কোরো'।"

শ্রীশ্রীসারদামণি-দশকম্

শ্রীআত্মপ্রজ্ঞ

মানুষীং তনুমাশ্রিত্য লোকোদ্ধারবিধায়িনীম্।
পতিলীলাসহায়াং চ বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ১
নারায়ণে যথা লক্ষ্মীর্যথা গৌরী চ শঙ্করে।
রামকৃষ্ণে তথা যায়া বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ২
ধরিত্রীব সহিষ্ণুর্যা স্পন্দক্ষোভাদিবর্জিতা।
স্বাত্মাভাসনিরোধা চ বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ৩
পতিপ্রিয়া পতিপ্রাণা পতিসেবাতিশোভনা।
পতিধ্যানপরা যা বৈ বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ৪
পতিশিক্ষাপ্রমোদা যা জ্ঞানভক্তিসমুচ্চিতা।
সর্বার্থসাধিকা দেবী বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ৫

অম্বা যা ভক্তশিষ্যাণাং জগদম্বাসমা সদা।
বরাভয়ামৃতস্যন্দা বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ৬
স্বাত্মসংস্থা শাস্ত্রমর্মজ্ঞা আবাল্যব্রহ্মচারিণী।
পাষণ্ডোপাধিবিধ্বংসা বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ৭
সদাশান্তাব্ধিসংকাশা সদা প্রবোধমালিকা।
সদা সত্যবিধাত্রী যা বন্দে তাং সারদামণিম্॥ ৮
দীনার্তদুঃখহা মাতঃ কৃপয়া পরয়া যুতা।
অবোধং রক্ষ সন্তানং মায়াচক্রবিভেদতঃ॥ ৯
অদ্য তে পুণ্যজন্মাহঃ স্মরন্ মাতৃ-সুগৌরবম্।
পাদেহত্র প্রার্থনাং দেবি প্রীত্যা সাবহিতা শৃণু॥ ১

বঙ্গানুবাদ

পতির লীলায় যিনি হইতে সহায়,
লোকের উদ্ধার হবে এই প্রেরণায়,
ধরিয়া মানুষ-তনু এলেন ধরায়,
সেই সারদামণিরে আজ ভক্তি বন্দনায়। ১
নারায়ণ বক্ষে যথা শোভিতা কমলা,
শঙ্করের অঙ্কে যথা গৌরী স্নিগ্ধোজ্জ্বলা,
রামকৃষ্ণ সঙ্গে তথা মাতা সারদামণি,
দৃঢ়রূপে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি। ২
সহিষ্ণুতা-গুণে যিনি ধরিত্রীর সমা,
স্পন্দন-বিক্ষোভ-হীনা অতি নিরুপমা,
আত্মার আভাস দানে সদা সঙ্কুচিতা,
প্রণাম লউন সেই শ্রীসারদা মাতা। ৩
পতির অতীব প্রিয় যিনি পতিপ্রাণা,
পতির সেবায় যিনি অতি সুশোভনা,
সর্বদা মগন যিনি প্রিয়পতি-ধ্যানে,
প্রণাম, প্রণাম সেই সারদাচরণে। ৪
পতির শিক্ষায় যিনি পেয়ে পূর্ণানন্দ,
জ্ঞান ভক্তি সমুচ্চয়ে ফুল্ল অরবিন্দ,
সর্বার্থসাধিকা দিব্য ভাবের আগার,
সেই সারদামণি-পদে নমি বারবার। ৫

ভক্ত ও শিষ্যের যিনি মাতৃস্বরূপিণী,
জগদম্বা সম সদা ক্ষীর-মন্দাকিনী,
বর ও অভয়ময়ী, অমৃত-স্যন্দিনী,
বন্দন-প্রসন্না হোন্ সেই সারদামণি। ৬
শাস্ত্রের মর্মজ্ঞা যিনি সদা স্বাত্মসংস্থিতা,
পাষণ্ডের মতিগতি বিধ্বংস-নিরতা,
বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্যে বিহারিণী,
প্রণাম-সম্প্রীতা হোন্ সেই সারদামণি। ৭
চিত্ত যাঁর সদা শান্ত সাগর সমান,
গলে সদা দোলে মালা প্রবোধ-বিজ্ঞান,
সতত কল্যাণকল্পে যিনি মুক্তহস্তা,
সেই সারদামণি-পদে প্রণতি প্রশস্তা। ৮
অয়ি মাতা দীনার্তের দুঃখবিনাশিনী,
কৃপা করি সুতে রক্ষ অবোধে জননী,
মায়াচক্র-পিষ্ট সে যে ছিন্ন ভিন্ন দেহ,
তাঁহারে হেরিবে হেথা হেন নাহি কেহ। ৯
আজি দেবি তব পুণ্য জন্মতিথি-দিনে,
মাতার গৌরব-কথা আসিছে স্মরণে,
শ্রীচরণে প্রার্থনা নিবেদি জননি,
প্রীতি ভরে অবহিতা ধন্য কর শুনি। ১০

ভাব-লোকে

'অনিরুদ্ধ'

'নিত্যই তিনি জগন্মূর্তি'—নৃপতি-বৈশ্যে কহেন ঋষি—
'তথাপি বহুধা জন্ম-গ্রহণ যুগে যুগে তাঁর নানান্ দিশি।'
যেথায় কেঁদেছে আর্ত-পীড়িত ডাকিয়াছে কেহ ত্রাণের তরে
সেথাই জননি হইলে প্রকাশ সমান করুণা সবার 'পরে।

ঊর্দ্ধ্ব আকাশে একদা ঝলকে ইন্দ্র-ব্যামোহ-বিদূর-করা
অতি অপরূপ হৈম কান্তি হস্ত তত্ত্ব-মুদ্রা-ধরা।
ইঙ্গিতে উমা বুঝালে সেদিন অহং বুদ্ধি তুচ্ছ অতি
পরমসত্তা-সন্ধানে চাই আদিতে তোমারি শরণাগতি!

চিত্ত আমার চলেছে ছুটিয়া সৃষ্টি-অতীত সেই সে কালে
দুরন্ত মধুকৈটভ সনে যুঝিছেন হরি কারণ-জলে।
সহস্র কত বৎসর কাটে বিজয়-আশার নাহি কো লেশ
অসুর-মানসে হানি মায়া তবে ঘটালে মা তুমি রণের শেষ।

ত্রিলোক ব্যাপ্ত অঙ্গ-জ্যোতিতে কিরীট শোভিছে গগন-ছোঁওয়া
একাই নাশিছ দানব-নিবহ মহিষাদিনী সর্বজয়া।
দণ্ডের ছলে বিতরো আশিস যুগপৎ মাতা ভীষণা মৃদু
সকল-দেবতা-তেজোময়ি অয়ি তোমার উপমা তুমিই শুধু।

পার্বতী তব অঞ্চল ধরি জাহ্নবী-তীরে দাঁড়ানু আসি
যথা হিমাচল-মূলে স্তুতিরত দেবগণ পানে চাহিছ হাসি।
আপনি ঘোষিলে আপন স্বরূপ নারী-অপমান বেজেছে প্রাণে
বিকাশি শক্তি অষ্ট মূর্তি শাসিলে দুষ্ট দৈত্যগণে।

কে নিশীথে দেবি ভাসি আঁখিনীরে 'রাম-রাম-রাম' বিলাপ করো?
কে গোপ-রমণী বিপিনচারিণী আকাশ বাতাস বিরহে ভরো?
রাজরানী তব ভিক্ষুণী-সাজ নেহারি যে মাতা বিদরে হিয়া
কে পুনঃ কাঁদিছ নদীয়া-কুটীরে গৌর-ললনা বিষ্ণুপ্রিয়া?

ফুরালো কি রণ ফুরালো রোদন সাজিলে কি ধ্যান-কর্মময়ী
গহন শান্তি সত্ত্ব-কান্তি আনিলে সেবার মাধুরী বহি?
তোমারি মহিমা খ্যাপিয়া কি হন শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের পাতা?
ভুবন ভরিয়া উঠে জয়গান জয় মা জয় মা সারদা মাতা।

আদর্শ নারী সারদা দেবী

শ্রীমতী বেলারাণী দে, এম্-এ

এখন থেকে একশো বছর আগে বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামে একটি অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর জীবন ছিল একেবারে আড়ম্বরশূন্য। তাঁর ছিল না তথাকথিত শিক্ষার ঐশ্বর্য, ছিল না রূপের ঐশ্বর্য, ছিল না সাংসারিক বিত্তের ঐশ্বর্য। কিন্তু আজ আমরা দেখছি যে এই সামান্য গ্রাম্য ব্রাহ্মণী সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ক্রমশঃ বিশ্ববরেণ্যা হয়ে উঠেছেন। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ থেকেই নয়, পৃথিবীর ওপিঠ থেকে পর্যন্ত কত লোক ছুটে আসছে এই পল্লীরমণীর উদ্দেশে মাথা নত করতে—সারদা দেবীর জন্মস্থান অখ্যাত, অজানা পাড়াগাঁ জয়রামবাটীর ধূলি স্পর্শ করে ধন্য হতে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন বলেই কি তাঁর এই সম্মান? না, তাঁর জীবন-সাধনায় এবং চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যার জন্যে তিনি আজ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিতা? বর্তমান যুগ যুক্তিবাদী। তাই বিচার করে বুঝে নিতে হ'বে যে, আমাদের নতুন যুগের পটভূমিকায় কি নতুন আদর্শ, কি সাধনা তিনি আমাদের নারী-জগতের সামনে রেখে গিয়েছেন—আমাদের নতুন যুগে সারদা দেবীর কি অবদান।

সারদা দেবীর নীরব শান্ত জীবন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, জগতের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে তিনি এক অপূর্ব স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতবর্ষ বরাবরই সাধক-সাধিকার দেশ। কিন্তু সারদা দেবীর জীবনে এমন একটা নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। তিনি যেন সংসারে ডুবে-থাকা দুঃখকষ্টে জর্জরিত অগণিত নারী-সমাজের পক্ষ থেকে এই আদর্শই প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন যে, সংসারী হয়েও সংসারের শত দুঃখকষ্ট-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও জীবনে মহত্ত্বে, এমন কি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃত্বে—এই মাতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ হয়েছে সারদা দেবীর জীবনে। সীমাহীন বিরাট মাতৃত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার উজ্জ্বল আলোর সমাবেশে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তিনি আজ দেবীর পদে অধিষ্ঠিতা। আমাদের ধর্মজগতের ইতিহাসে অবতার-পুরুষদের সঙ্গে যে সমস্ত শক্তি লীলা-সহচরীরূপে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। সীতাচরিত্র সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল, রাধিকা প্রেমের গৌরবে গৌরবান্বিতা, কিন্তু নারী-জীবনের যে সার্থকতা মাতৃত্ব, এই মাতৃত্বের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর কঠোর যোগ-সাধনার এ রকম সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় না। আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সীতা, রাধা, রুক্মিণী, সত্যভামা, বিষ্ণুপ্রিয়া বা গোপা যে সমস্ত অবতারদের শক্তিরূপে তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন সেই সব অবতার-পুরুষদের জীবন-সাধনায় এবং তাঁদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের কাজে এঁরা কেউ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমরা সারদা দেবীর জীবনে দেখি, তিনি যে শুধু স্বামীর সাধনায় সব বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি যেভাবে সুদীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে অনলসভাবে তাঁর আরব্ধ কর্ম সাধন করে গেছেন, সে এক অভূতপূর্ব কাহিনী। ঠাকুর নিজেই শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, তাঁর শরীরটা চলে গেলে তিনিও যেন

শরীর ছেড়ে চলে না যান। ঠাকুরের বাকী কাজ তিনি যেন পূর্ণ করেন। সাধারণের কাছে সারদা দেবী শ্রীশ্রীমা-নামেই সমধিক পরিচিতা। সারদা দেবীকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর-সাধিকা বলতে পারি।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন একাধারে সংসারী গৃহস্থ, আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী। তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক যোগ-সাধনার দিকটি বাদ দিয়ে সংসারে তিনি কি ভাবে বিচরণ করেছেন, কাজ করেছেন, যদি শুধু সেই বিষয় আলোচনা করা যায় তাহলেও দেখা যায় যে, এ রকম আদর্শ চরিত্র সংসারে বিরল। সারদা দেবীর পুণ্য চরিত্রে পাতিব্রত্য, সেবা, ত্যাগ, তেজ এবং সর্বশেষে মাতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মায়ের ভক্তি, প্রীতি, সেবা আমাদের সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠাকুরের সাধক অবস্থায় শত দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও উৎকণ্ঠাকে বরণ ক'রে তিনি স্বামীর ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গ্রহণ ক'রে এবং স্বামীর সাধনার পথে ত্যাগী যোগিনীর মত আজীবন তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য ক'রে প্রকৃত সহধর্মিণীর আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। মা যখন কিশোরী মাত্র তখন থেকেই তিনি ঠাকুরের মহৎ ভাবকে এবং স্বর্গীয় প্রেমকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সংসারী লোকদের অবজ্ঞা এবং উপহাস নীরবে উপেক্ষা ক'রে আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকতেন। ঠাকুর যখন তাঁর সাধন-মন্দির দক্ষিণেশ্বরে মহাসাধকের জীবন যাপন করছেন, মা ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করার জন্যে জয়রামবাটী থেকে পদব্রজেই সেখানে চলে আসেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে নহবতের অতি অল্পপরিসর ঘরটির মধ্যে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর ছিল তাঁর জীবন। সারাদিনের শত কর্মের মধ্যে ঠাকুরের সেবার ওপরেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকত। প্রতিদিন স্বহস্তে রান্না ক'রে ছোট ছেলের মত ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতেন, আবার কখনও ঠাকুরের সঙ্গে সারারাত্রি জাগরণ ক'রে ঠাকুরের ভাবসমাধি থেকে কত দেবদেবীর নাম ক'রে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ অধ্যায়েও মা কাশীপুর বাগানে বহু কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে থেকে অক্লান্তভাবে ঠাকুরের সেবা করেন। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সারদা দেবীর কাছে ঠাকুরই ছিলেন জীবন-সর্বস্ব।

শুধু পতিসেবাই নয়, বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিজনের, পিতামাতা, অশিক্ষিত অবুঝ গ্রাম্য আত্মীয়স্বজনদের এবং ভক্ত সন্তানবর্গের যে ভাবে সেবা করেছেন তাতে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। ছোটকালে ভাই-বোনদের লালনপালন করেছেন। অভাব-অনটনের সংসারে গরুর জন্যে জলে নেমে দল ঘাস পর্যন্ত তাঁকে কাটতে হয়েছে। আবার গ্রামের দুর্ভিক্ষে আর্তদের সেবায় পাখার বাতাস দিয়ে তাদের খাইয়েছেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাগত ভক্তদের সেবাতেও আত্মনিয়োগ করেছেন। বিভিন্ন ভক্তদের রুচি-অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করতেন। সারাজীবন ধরে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ মা ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও প্রীতির সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে ক'রে গিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে জয়রামবাটীতে এবং উদ্বোধনে যখন তাঁর সাহায্য এবং সেবার জন্যে বহুলোক উদ্‌গ্রীব থাকতেন তখনও তিনি নিজেই নিত্যকার কাজগুলি এবং ভক্তদের সেবা নিজের হাতে আনন্দের সঙ্গে ক'রে যেতেন।

এই সেবা এবং কর্ম তিনি কখনও শুষ্ক কর্তব্যের খাতিরে করেন নি। নানারকম পরিবেশে নানা-রকম কর্মের মধ্যে তাঁর মাতৃত্বের করুণা এবং স্নেহই ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন সরলতা, নম্রতা, পবিত্রতা এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তিনি

ছিলেন অদোষদর্শিনী, কারোর দোষ তিনি কখনও দেখতে পারতেন না।. সাধারণতঃ মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা, কোমলস্বভাবা এবং মধুরভাষিণী ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনমত কার্যক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাহস এবং তেজ অসাধারণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ডাকাতবাবা এবং পাগলা হরীশের কাহিনী সর্বজন-বিদিত। আমরা জানি কিভাবে মা মাড়োয়ারী লছমীনারায়ণের দশহাজার টাকা এবং রামনাদের রাজার উন্মুক্ত কোষাগার প্রত্যাখ্যান করেন।

বিরাট সংসারের দায়িত্ব সুগৃহিণীর মত সুসম্পন্ন ক'রে মা গার্হস্থ্যধর্মের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন ক'রে গিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর এই সেবার আদর্শ, কর্মের আদর্শ, মাতৃত্বের আদর্শ, সহধর্মিণীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হ'য়ে উঠবে।

সংসার-জীবনে আদর্শচরিত্র হ'লেও সারদা দেবীর জীবনের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ দিক তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, সংসারে নানা কাজের মধ্যে অন্য কোন মহৎ কাজ করার আর অবসর থাকে না। শ্রীশ্রীমা যেন তাঁর জীবন দিয়ে এই প্রশ্নেরই সমাধান ক'রে গেছেন। যে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে তিনি উঠেছিলেন, যে দেবীত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন, সে সাধনায় তাঁকে সংসার ত্যাগ করে বনবাসিনী হ'তে হয় নি। সংসারের শতকর্মের মধ্যেই চলেছিল তাঁর নীরব নিরলস কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মত বিরাট আধ্যাত্মিক সূর্যের অন্তরালে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন, কখনও নিজের সত্তাকে প্রচার করেন নি, এমন কি পরবর্তী জীবনেও তিনি সমাগত ভক্তদের সব সময়েই বলতেন, "ঠাকুরই সব।" এরকম আত্ম-বিলুপ্তির উদাহরণ অতি বিরল।

শ্রীশ্রীমা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বর আসেন তখন একদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ ?" মা তখনই দৃঢ়স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমাকে সংসারের ভেতর টানব কেন ? তোমার জীবনের ব্রতে সহায় হ'তে এসেছি।" তাঁদের দুজনের প্রেম ছিল দেহের অতীত, অপার্থিব, অলৌকিক। ঠাকুরের কাছে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সুগভীর তত্ত্ব এবং সাধনপদ্ধতি শিক্ষা ক'রে ক্রমশঃ গভীর সাধনার ফলে শ্রীশ্রীমা দিব্য ভগবৎ-উপলব্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী হ'য়ে উঠলেন। সর্বশেষে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপূজার দিন গভীর অমানিশার রাত্রিতে নিজের ঘরে দেবীর আসনে বসিয়ে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করলেন সেদিনকার কাহিনী ধর্মজগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সে সময় ঠাকুর সমাধিস্থ, মাও বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সুদীর্ঘ সাধনার ফলরাশি এবং নিজের জপের মালা সারদা দেবীর চরণে সমর্পণ করে প্রণাম করলেন। এই সময় থেকেই সারদা দেবীর জীবনে সর্বজনীন মাতৃত্বের ক্রমবিকাশ সুরু। মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা যিনি গ্রহণ ক'রতে পারেন এবং যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা ক'রতে পারেন তিনি যে কত বড় আধ্যাত্মিক শক্তি তা আমাদের পক্ষে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। পরবর্তী কালে ভক্ত সন্তানরা মায়ের জীবনে তাঁর কত অলৌকিক দর্শন এবং দেবীভাবের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন তা বর্ণনাতীত।

কাশীপুর বাগানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিযোগে পুণ্যদেহ পরিত্যাগ করে যাবার পর ক্রমশঃ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘরূপ বিরাট মহীরুহের বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিছুকাল তীর্থে তপস্যায় কাটিয়ে শ্রীশ্রীমা তাঁর অপূর্ব মাতৃত্ব এবং যোগসাধনার সিদ্ধি নিয়ে ঠাকুরের সংসারত্যাগী ভক্ত সন্তানদের একাধারে জননী এবং গুরুর স্থান অধিকার করলেন। এর পর থেকে ১৯২০ সালে তাঁর

তিরোধান পর্যন্ত তিনি সঙ্ঘ-জননীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে সকলের অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণ নতুন কিছু করতে গেলে সকলের আগে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিতেন। এমন কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং সাধনসম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হলে তাঁরা মায়ের সিদ্ধান্ত শেষ কথা বলে অবনত মস্তকে গ্রহণ করতেন। স্বামীজী মায়ের অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিয়েই আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে গিয়েছিলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এসে তাঁর চরণস্পর্শে মঠের জমি পবিত্র ক'রে নিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ শ্রীশ্রীমার চরিত্রের মাধুর্য এবং সাধনার দীপ্তি চারদিকে বিকীর্ণ হতে সুরু করল। দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক ছুটে আসতে লাগল তাঁর কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হতে। বিদেশী ভক্তদের মা বাংলাভাষায় দীক্ষা দিলেও, তারা ঠিক বুঝে নিত এবং তাদের বক্তব্য তারা নিজেদের মাতৃভাষায় প্রকাশ করত। ভাষার ব্যবধানের জন্যে ভাবের আদান-প্রদানের কোন অসুবিধেই হ'ত না। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেকে মায়ের চরণে মাথা নত ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। সিষ্টার নিবেদিতা বলেছিলেন, "মার ভালবাসা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ।" এইভাবে জাতি-ধর্ম-ভাষার বাধা অতিক্রম ক'রে শ্রীশ্রীমা সর্বজনীন মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। মার গর্ভধারিণী জননী একবার মার সম্বন্ধে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ও মা-ডাক শুনল না।' এই কথা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন যে, এত মা-ডাক শুনবে যে তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠবে।

ছোট বড় যে তাঁর কাছে আসত সেই একটা অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করত। মা অন্তরযামিনী ছিলেন। একবার দেখেই লোকের অন্তরের শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা প্রশ্ন সমস্যা সব বুঝতে পারতেন; যেরূপ প্রয়োজন তাকে সেই ভাবে সান্ত্বনা বা উপদেশ দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিতেন। কি জয়রামবাটীতে, কি 'উদ্বোধনে' ঠিক গর্ভধারিণী জননীর মতই মা ভক্ত সন্তানদের সেবা-যত্ন করতেন —রান্না করে খাওয়ানো থেকে সুরু করে তাদের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত পরিষ্কার করতে দ্বিধা করতেন না। ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সন্ন্যাসি-গৃহস্থ, এমন কি সজ্জন-দুর্জনের প্রতি জাতিধর্মনির্বিশেষে মায়ের অপার স্নেহের এবং করুণার মন্দাকিনী-ধারা সমভাবে প্রবাহিত ছিল। লোকে যাকে অনাদর করত তারই ওপর মার অধিক কৃপাদৃষ্টি পড়ত। কেউ যদি গর্হিত অপরাধ করে অনুতপ্ত চিত্তে মার শরণাপন্ন হত মা তখনই তাকে আশ্রয় দিতেন। এই মাতৃসুলভ স্নেহ আর ক্ষমার দ্বারাই মা বিপথগামীকে সুপথে আনতেন। তখনকার দিনেও মা জয়রামবাটী গ্রামে মুসলমান মজুরদের পরিবেশন করে খাইয়েছেন। অন্য লোকের সমালোচনার উত্তরে বলেছেন, "শরৎও (স্বামী সারদানন্দ) আমার যেমন ছেলে, আমজদও তাই।" মায়ের জীবনে বহু ভক্ত সন্তান অলৌকিক ভাবে তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছেন—সে সমস্ত কাহিনী আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। শেষ শয্যায় শ্রীশ্রীমা একটি ভক্ত মেয়েকে বলেছিলেন, "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের, জগৎকে আপনার করতে শেখ।" শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিস্বরূপা, যুগধর্মপালিনী শ্রীশ্রীমার এই শেষ বাণীর মধ্যেই যেন তাঁর সাধনা এবং আদর্শ মূর্ত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন বরদাত্রী, জ্ঞানদাত্রী, স্নেহরূপা, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'। মাতৃত্বের মহাসাধনা-বলেই শ্রীশ্রীমা সকলের মা হয়েছিলেন, সঙ্ঘজননী থেকে বিশ্বজননী হতে পেরেছিলেন। একাধারে এত গভীর, এত উদার, এত স্নিগ্ধ মাতৃত্ব এবং কঠোর সন্ন্যাসের সংমিশ্রণ—জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

শ্রীশ্রীমার জীবন এবং আদর্শ আলোচনা করে আমরা তাঁর মধ্যে এমন গুণরাশির বিকাশ, এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই যার জন্যে আমরা বলতে পারি যে তিনিই আমাদের বর্তমান যুগের নারী-সমাজের আদর্শ। সিষ্টার নিবেদিতা ঠিকই বলেছিলেন, "নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে সারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা···পুরাতনের শেষ প্রতীক এবং নতুনের সার্থক সূচনা।" পুরাতনের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে এবং নূতনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে শ্রীশ্রীমার অনুপম অভিনব চরিত্র নতুন যুগের পটভূমিকায় অপূর্ব ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই নতুনতর গার্গী-মৈত্রেয়ীর সম্ভাবনা রয়েছে।" তাঁর চরিত্রের মধ্যে যেমন ভারতীয় ভাবধারার এবং সংস্কৃতির মহিমা অতি উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে তেমনই আবার আধুনিক ভাবধারার সন্ধানও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমার যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন এবং নারীজাগরণের আন্দোলন সুরু হয়েছে মাত্র। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মার একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে পড়তে পারলেও লিখতে জানতেন না, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষালাভে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। তিনি চাইতেন, মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করুক। অত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বাস করেও তিনি নিজে সকল রকম কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ছিলেন। শ্রীশ্রীমা সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, অতি নিরীহ গ্রাম্য রমণীর মত গৃহকোণে জীবন কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের জন্যে রেখে গেছেন তাঁর অপূর্ব জীবনাদর্শ।

বর্তমান যুগ নারী-প্রগতির যুগ। এই অগ্রগতির দিনে এই আদর্শ-বিক্ষুব্ধ জগতে আমাদের নারী-সমাজের পক্ষে আদর্শ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের কর্মধারার এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন অপরিহার্য। ভারতের এই নব জাগৃতির দিনে অন্য সব দিকের মতই নারীসমাজেও বিরাট পরিবর্তন সুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারা রক্ষা করে আমাদের নারীসমাজকে সংস্কার করাই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; যান্ত্রিক অনুকরণে কেউ কখনও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় নূতন ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই মেয়েরা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রছেন। আজকের দিনে নারীদের উচ্চ শিক্ষালাভ করে বর্তমান যুগের উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, কিন্তু নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়; নারীকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা অনেকেই এমনভাবে ভারতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদেশী নারীর আদর্শ অনুকরণ করে থাকেন যে, তাঁদের ভারতীয় বলে চেনাই কঠিন। এই বিভ্রান্তির দিনে শ্রীশ্রীমার চরিত্রই আমাদের আধুনিক নারী-সমাজের সামনে একটি পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ চিত্র। শ্রীশ্রীমার পবিত্র, জ্ঞানদীপ্ত, তেজস্বিনী, করুণাময়ী মাতৃমূর্তি আমাদের শক্তি দেবে, সাহস দেবে, আমাদের জীবনে শুচিতা আনবে, মহত্ত্ব আনবে। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের নারীসমাজকে সত্যের পথের, শান্তির পথের সন্ধান দেবে—আমাদের জীবনে চলার পথে ধ্রুবতারার মতই পথ নির্দেশ করবে।

"পাশ্চাত্যে, নারী—স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রী-শক্তিতেই কেন্দ্রীভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারী-শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জয়রামবাটী

(শতবার্ষিকী-বৎসরে)

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

জয়রামবাটী জাগো !
গ্রামীণ চোখের তন্দ্রা ঘুচায়ে আতিথেয়তায় লাগো।
সবুজের ঐ সীমিত বাঁধন,
ধানের দোলায় দেখে যে স্বপন ;
প্রাণান্বিত-নভ নীল তূলিকায়
রামধনু রঙ নিঙাড়ে মাথায় ;
ক্রন্দসীর ঐ স্পন্দিত ব্যথায়
'আমোদর' তন্ময়।
শতবার্ষিকী সময় ঘনায়
উৎসব-আঙিনায়।

জয়রামবাটী জাগো !
ছিন্ন স্মৃতির পাপড়ি খুলিয়া আভ্যুদয়িকে লাগো।
কুটীরাস্তরণে রূপের মাধুরী
আধুনিকতায় হয়নিকো ভারী।
আবাহন নয়—আরাধনা তব,
অমৃতের অনুভব !
আকুল আকূতি, —মা-মা-ডাকে ভরা, উত্তাল জনরব।

জয়রামবাটী জাগো !
সপ্তমীচাঁদে, প্রয়াসী আলোকে কন্যাবরণে লাগো।
পৌষ নিশির পূত-প্রস্তুতি
এনেছে ধরায় অমর বেসাতি।
ত্যাগের মহিমা, স্নেহের ভূপালী
উছলে ভূলোকে দীপ্র দীপালী।
রুদ্রকালের প্রলয়-নাট্যে, মহামঙ্গল দীপ্তি,—
অধুনাতনের নিয়ম-নিগড়ে– অবারিত পরিতৃপ্তি !

জয়রামবাটী জাগো !
নির্বাণময়-দীপের দেউলে মায়ের আশিস মাগো।
আবহমানের ধূসর প্রান্তে
তোমার আসন রবে একান্তে।
হোম-শিখানলে, নব উপচারে
অন্তর্মুখী কল্যাণ—ধারে
অনন্ত তব আশিসেতে ঝরে অযাচিত অবদান ;
অনতিক্রমা পার হবো লভি—নির্মোহ অবসান।
জয়রামবাটী জাগো !
মাতৃস্নেহের পীযূষপ্লাবনে আতিথেয়তায় লাগো।

মাতৃচিত্র

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত

মহাপুরুষের জীবনকে কয়েকটি ছোট ছোট ছবির সমষ্টি বলা চলে, আর প্রত্যেকটি ছবিকে অবলম্বন করে রচনা করা যায় এক একটি গীতি-কবিতা—সুন্দর, গভীর, মর্মস্পর্শী সে ছবি। শ্রীশ্রীমার জীবন-সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষ করে খাটে। মায়ের জন্ম থেকে সুরু করে দেহ-ত্যাগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই এক একটি ঘরোয়া চিত্র বলে মনে হয়। সে চিত্রে অবোধ্য বা রহস্যময় কিছু নেই, খুবই সহজ সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য চিত্র। তাকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হ'বে তাও নয়। সহজ, সরল ঘরোয়া ছবি, কিন্তু তাই বলে তাতে গভীরতার অভাব নেই।

* * *

"এই আমি তোমার কাছে এলুম।"

গ্রীষ্মতপ্ত জনপদের উপরে মলয় হাওয়ার মত, ঊষর মরুভূমির উপরে সরস বর্ষাধারার মত এ কার কণ্ঠস্বর! বহুদূর থেকে ভেসে আসা এ কার গীত-গুঞ্জন! এত মধুবর্ষী কেন? পাঁচটি শব্দের মধ্যে এতখানি প্রাণ, এতখানি ভালবাসা, এত করুণা-ঢালা কথা, এত হৃদয়জয়ী আকর্ষণ!

তুমি এলে। অকারণে, এমনি এলে। ভালবেসে এলে। অপরূপ মাধুর্যের বন্যা নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী এলে। এলে একান্ত হয়ে, ছোট্ট মেয়েটি হয়ে। রাজর্ষি জনকের কাছে এলে সীতা হয়ে, এলে বৃষভানুর কাছে রাধা হয়ে। ছোট্ট পায়ে ঝনন্ ঝনন্ করে নূপুর বাজিয়ে জানালে তোমার আগমনের সংকেত। গলা জড়িয়ে ধরে জানালে তোমার ভালবাসা; জানালে, এবার পাত্র নিঃশেষ করে দিতে এসেছো। দরদ দিয়ে বল্‌লে—

"এই আমি তোমার কাছে এলুম।"

*　　*　　*

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্। অগ্রহায়ণ মাস। ঘরে ঘরে ধান। ধান তো নয়, পাকা সোনা সত্যিকার ঐশ্বর্য। ঘরে ঘরে আনন্দ। গরীব চাষীর ঘরেও আজ হাসির ছড়াছড়ি। সারা বছরের আশার ছবি আঁকছে মনে মনে। আজ 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'। যিনি আনন্দময়ী, শোকতাপিত অগণন জনগণের হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপন করবার জন্য যাঁর আসা, তাঁর দেহধারণের এই তো উপযুক্ত সময়।

সত্যি তিনি এলেন। অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কোলে ঐ তো সেই দেবতনয়া। স্নিগ্ধ চোখ-জুড়ানো গায়ের রঙ। মৃদুমধুর হাসি লেগে রয়েছে সুন্দর অধর-কোণে। ঊর্ধ্বে উত্থিত দুটি হাতে ঐ তো জানালেন বরাভয়। জানালেন, আমি এসেছি। ঘরে ঘরে গৃহললনারা তখনও কমলাদেবীর ব্রত-অর্চনায় ব্যাপৃতা। অকস্মাৎ শুভ শঙ্খধ্বনি জানিয়ে দিল তাদের ব্রতসিদ্ধির বার্তা।

*　　*　　*

"কই আমার অলংকার, আমার গলার হার!" —কাঁদছে পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা-বধূ সারদা। চৌরশ্রেষ্ঠ হরি তা হরণ করে নিয়েছেন—কত কৌশলে, কত সন্তর্পণে! নিয়েছেন নূতন নূতন অলংকারে সাজাবেন বলে! যাঁর অলংকার হবে প্রেম, প্রীতি, করুণা, ভালবাসা; ভক্তি হবে যাঁর গলার হার, তাঁর কেন আর স্বর্ণ-অলংকারের বাহার? তুচ্ছ স্বর্ণমৃগ কত দুঃখের, কত অশ্রুজলের কারণ হয় সে কি এত সহজে ভুলে যাই? তাই এবার অলংকারের বোঝা ঘুচিয়ে দিলেন প্রথমেই—জানালেন বৃহত্তের আহ্বান। পাগলা ভোলার পাশে এই নিরাভরণা গৌরীই সাজাচ্ছে ভালো।

ঐ ছোট মেয়ে গৌরীর মধ্যেই যে জগন্মাতা, দশমহাবিদ্যা—আভাসে চকিতে না বোঝালে আর কেমন করে বুঝতে পারি? ভোলানাথেরও ভুল হয়ে যায় যে, ঐ ছোট্ট মেয়ে সারদার মধ্যেও ঘুমিয়ে আছে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা।

দেশে দুর্ভিক্ষ, কিন্তু যে ঘরে স্বয়ং অন্নপূর্ণা জাগ্রতা সে ঘরে অন্নের অভাব হয় না। ক্ষুধাকাতর নরনারী সারি সারি বসে গেছে অন্নপূর্ণার উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে। আর অন্নপূর্ণা? সে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে ছোট্ট হাত দুটি নেড়ে নেড়ে পাখার হাওয়া করছে, অন্নের উষ্ণতায় কারো কষ্ট না হয়!

আয়, সবে ছুটে আয়। মায়ের ঘরে আজ অমৃতের পরিবেশণ। এমন সুযোগ আর মিলবে না। এই অমৃতের এককণা পেলেও আমাদের কামনা বাসনা সব চলে যাবে, আমরা অমর হ'ব।

*　　*　　*

"হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রহিয়াছে।" কিন্তু এ মিলন এত স্বল্পকালস্থায়ী, মাত্র সাতমাস পরেই আবার অদর্শন। তার উপরে আবার পতিনিন্দা— পতি পাগল, পতি উন্মাদ! পতিনিন্দা শুনবার ভয়ে সতী গৃহমধ্যে অন্তরীণ হলেন। বাইরে

দিন রাত নানা কাজে ব্যাপৃতা, অন্তরে বিরহের হোমানল, প্রতি মুহূর্তে অন্তরে করছেন জীবন-দেবতার ধ্যান, পূজা। কখনও কখনও এই প্রাণফাটা বিরহের আর্তি জানিয়ে দেন ঝোড়ো হাওয়ার মুখে, কখনও বা গতিশীল মেঘের বুকে। অসীম নীলিমায় তারকার অক্ষরে লিখে দেন বিরহের পত্র। এই বিরহে আকাশবাতাস বৃক্ষলতা সকলেই ব্যথাতুর, কিন্তু তবু ডাক আসে কই? কই তাঁর প্রাণমাতানো বাঁশীর সংকেত? এই যে দীর্ঘশ্বাস, এ কি তাঁর বাঁশীতে ব্যথার সুরে বেজে উঠবে না? কবে শেষ হবে এই প্রতীক্ষা?

* * *

"তুমি এতদিনে এলে?"—সুধামাখানো সুরে প্রশ্ন ভেসে এল। সারদা দেবী এসেছেন দক্ষিণেশ্বর, পায়ে হেঁটে গায়ে জর নিয়ে, বহুদিনের আর্তি, বহু দিনের অভিমান বুকে নিয়ে—এসেছেন আত্ম-নিবেদন করবার জন্য। ভয়ও আছে, যদি তিনি গ্রহণ না করেন, যদি বিফল হয় এ পুষ্পাঞ্জলি, পায়ে ঠেলে দেন এ অর্ঘ্য, জীবনদেবতা যদি বিমুখ হ'ন। যদি তাঁর সাধনায় বিঘ্ন হয়, যদি ধ্যানভঙ্গে রুষ্ট হন! তবু, এত পথহাঁটা কি ব্যর্থ হবে! ভয়ে, শরমে, ভালবাসায় সারদা দেবী তাকালেন ধূর্জটির মুখের পানে, প্রথম কথাটি শুনবার জন্য রইলেন উৎকর্ণ হয়ে। প্রশ্ন এল,—

"তুমি এতদিনে এলে?"

এ প্রশ্নের উত্তর তো নেই—সারদা দেবী তাই নিরুত্তর। মনে মনে বুঝলেন, এ শুধু প্রশ্নচ্ছলে আপন করে নেওয়া, একান্ত করে নেওয়া। এ গ্রহণ—বর্জন নয়। শুধু জানানো, আমিও তো তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, ভরা মন নিয়ে বসে আছি।

তিনি বললেন, "তুমি আমার আনন্দময়ী মা।"

সারদা দেবী আরও গভীর করে বললেন, "তুমি আমার সব।"

* * *

আজ ফলহারিণী কালীপূজা। কিন্তু রামকৃষ্ণের আজ আর প্রতিমায় কি প্রয়োজন? রক্তমাংসের জীবন্ত দেবীপ্রতিমা আজ সশরীরে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা। রামকৃষ্ণের অন্তরে আজ অভিনব পূজার সঙ্কল্প। শিবরূপে বুক পেতে দিয়েছি রাঙা পা দুখানি ধারণ করবার জন্য, কৃষ্ণরূপে বলেছি, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্', আজ রামকৃষ্ণরূপে জবাচন্দন দিয়ে পূজা করব, পুষ্প-অর্ঘ্যের মত নিবেদন করব জীবনের সমস্ত সাধনা।

কিন্তু কে কার পূজা করবে? রামকৃষ্ণ আর সারদা দেবী কি আলাদা? সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ কি ভিন্ন, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি? তাই পূজ্য-পূজক দুই আজ মহাসমাধিতে এক হয়ে মিলিত হয়েছেন। এ মিলনের তুলনা কোথায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, পূজার গাম্ভীর্যে বুঝি সমস্ত জগৎ কেঁপে উঠছে। প্রদীপ-শিখার মত স্থির গম্ভীর দুইটি দীপশিখা প্রথমে মিলে এক হ'ল, তার পর তা ব্যাপ্ত হ'ল দিগ্‌দিগন্তে।

* * *

"কে যায়?" কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন এল পথহারা সাথাহারা সারদা দেবীর কাছে।

যিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, যিনি বিশ্বাত্মিকা,—সকলের যিনি আত্মার আত্মীয়া তাঁর কাছে আর কে পর কে আপন কে মনোরম আর কে ভয়ানক? তাই স্বভাবকোমল কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

"তোমার মেয়ে সারদা।"

যে ভালবাসায় পাষাণও দ্রব হয়, সাধারণ ডাকাত সেখানে কঠিন হয়ে থাকবে? এক মুহূর্তে তার অন্তরের শত সহস্রযুগের অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, জেগে উঠল তার শাশ্বত পিতৃহৃদয়। যে হৃদয়ে কোমলতা ছিল দুর্বলতা, কল্যাণের কণামাত্রও যেখানে দুর্লভ ছিল, পিতৃস্নেহে সে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল।

শতযুগের অন্ধকার ঘর যেমন একটি দেশলায়ের আগুনে আলোকিত হয়, একটি সুকোমল আঁখিপাতে প্রস্ফুটিত হল ডাকাতের হৃদয়পদ্ম।

তারপর সে বিদায়দৃশ্য—সেই বারবার ফিরে ফিরে চাওয়া। আর অশ্রুবর্ষণ, সেই হৃদয়ে হৃদয় অনুভব—এ দৃশ্য অনুপম।

* * *

উন্মুক্ত নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবীর বক্ষ। গঙ্গার জলে তার অপূর্ব প্রতিসরণ। ছোট্ট ছোট্ট ঢেউএর মাথায় মাথায় শতকোটি তারকার ঝলক। সেই ভুবনপ্লাবী জ্যোৎস্নার এক টুকরো এসে পড়েছে ধ্যানরতা সারদা দেবীর মুখে বুকে। অমনি তাঁর অন্তরে উদ্গীত হ'ল প্রার্থনামন্ত্র—

ওগো পূর্ণশশী, আমাকে তোমার মত সুন্দর কর, পবিত্র কর, স্নিগ্ধ কর। প্রখর সূর্যতেজ তোমার স্পর্শগুণে হয় সুধাধারা, আহা, দিনমণির প্রভায় চোখ যাদের ঝলসে গেল তাদের জন্য আমাকে স্নিগ্ধ কর। শতকোটি তরঙ্গশিশুর মুখে স্নেহের চুম্বন দেওয়ার জন্য আমায় জ্যোৎস্না দাও। কিন্তু ওগো নিশামণি, তোমারও মুখে নাকি কলঙ্কের কালিমা, কিন্তু আমার অন্তর যেন নিখুঁত হয়, যেন না থাকে তাতে আলোকালোর মিশেল।

* * *

মুক্ত অম্বরতলে জগন্মাতা ধ্যানাসীনা। ধীরে ধীরে মন উড়ে চলল পাখা মেলে, দেহ থেকে দেহাতীতের পানে। খণ্ডের দেশ ছেড়ে মন চলল অখণ্ডের দেশে, রূপ থেকে অরূপে। সূর্য, চন্দ্র, তারা অরূপসাগরে সব মিশে গেল—'শূন্যে শূন্য মিলাইল', নিখিল ভরে উঠল প্রার্থনার সুরে সুরে—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি?

মা পুজোয় বসেছেন। জীবন-দেবতার পায়ে দেবেন পুষ্পার্ঘ্য। বিল্বপত্রপুষ্পাঞ্জলি তুলে নিয়েছেন হাতে। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে গেল, বন্ধ হয়ে গেল ইন্দ্রিয়ের দ্বার। মাথা থেকে খসে পড়ল বস্ত্রাঞ্চল। মন গিয়ে নিলীন হল কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে। আস্তে আস্তে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল, মৃদু মধুর হাসি দিব্য আননে। দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল হাতের পুষ্পাঞ্জলিতে। অপার্থিব অশ্রুকুসুমের স্পর্শে পার্থিব ফুল হ'ল আরও সুন্দর। জীবনদেবতার পায়ে স্থান পেয়ে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

* * *

সন্তান গিয়েছে মার কাছে, নৌকোয় করে গঙ্গা পেরিয়ে। নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে আছেন মা, বাৎসল্যের ভাগীরথী। জুলাই মাস, বর্ষাকাল। দেখা হয়ে গেল; এবার বিদায়ের বেলা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি সুরু হল গঙ্গার উপরে, ঝরে ঝরে পড়তে লাগল মুক্তাবিন্দুর মত। বৃষ্টির কণা যেন মাতৃ-বিরহের অশ্রুকণা। তবু বিদায়, মা বিদায়। জানি না তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে! সন্তান চোখের জলে ভেসে আবার নৌকায় উঠল। আর তাকিয়ে রইল, মায়ের বাড়ীখানার দিকে সাশ্রুনয়নে। ঐ যে মা উঠে এলেন ছাদে। আবার চার চোখে মিলন, অশ্রুধারা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। স্নেহবিহ্বলা মা দাঁড়িয়ে আছেন ছাদে—অন্ধকারে মুখ তাঁর ভাল দেখা যায় না! এ দৃশ্য স্থায়ী রইল, যতক্ষণ না সন্তানের নৌকা মিলিয়ে গেল দিগন্তে। মায়ের মূর্তি তখন আস্তে আস্তে মিশে গেল অসীম নীলিমায়। ঝখানে।

* * *

মায়ের কোন সন্তান চলে যাবেন, আর হয়ত জীবনে দেখা হবে না। মাকে ছেড়ে যেতে সন্তানের মন চাচ্ছে না। তবু চলে যেতে হবে। সন্তানের চোখে জল, মনে দুঃখ—মা কি আর তেমন

মনে রাখবেন, তেমন করে ভালবাসবেন। সন্তানের দুঃখ দ্বিগুণ আঘাতে বাজল মায়ের বুকে। প্রথমে নিজেকে সামলে নিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি বাবা, আমি আছি, হেসে নেচে চলে যাও।" কিন্তু বিদায়বেলা মায়ের অশ্রু আর বাধ মানে না—চোখের জলে ভেসে বলতে লাগলেন, "আমায় ভুলো না, ভুলবে না জানি, তবু বলচি।"

"কিন্তু মা তুমি? আমি যদি ভুলেও থাকি, তুমি কি মা হয়ে ছেলেকে ভুলবে?"

"মা কি কখনও ভুলতে পারে ছেলেকে।" উত্তর এল।

* * *

দর্শনপিয়াসী সন্তানের অন্তিম সময় উপস্থিত। মা রয়েছেন বহুদূর, এ জীবনে বুঝি আর দেখা হয় না। সমস্ত বুক ভেঙ্গে কান্না এল—অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল অশ্রু। কিন্তু সন্তানের আন্তরিক ডাকে মা কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? মুখে স্বর্গীয় হাসি নিয়ে হাতে বরাভয় নিয়ে মায়ের মূর্তি ফুটে উঠ্‌ল সন্তানের মানসচক্ষে। শুধু মানসচক্ষে কেন? যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ-রূপেণ সংস্থিতা—জগতের কোথাই বা তাঁর অগম্য! সন্তানের সমস্ত দুঃখ চলে গেল, আবার হাসিতে ভরে উঠল মুখমণ্ডল। অন্তরের গভীরে স্পর্শ করলো সামনে গীয়মান মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীত—

পোহাল দুঃখরজনী
গেছে 'আমি আমি' ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ
জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে—হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় "জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন বিজয়,
মার নামে পূর্ণ অবনী।

সন্তানের আত্মা ধীরে ধীরে মিশে গেল মায়ের শাশ্বত চরণকমলে।

* * *

মা শেষশয্যায় শায়িতা। তবু প্রাণীর জন্য, জগতের প্রতিটি সন্তানের জন্য, আত্মীয় অন্তরংগদের জন্য, চিন্তার বিরাম নেই, ভালবাসার সহানুভূতির অভাব নেই। ভালবেসে, কৃপা করে এমনি এসেছিলেন, ভালবেসেই চলে যাবেন। স্বামী সারদানন্দকে ডেকে চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে করুণনয়নে বল্‌লেন,

"শরৎ, এরা রইল।"

পার্থিব মায়ের পক্ষেও যেমন, অপার্থিব জগন্মাতার পক্ষেও সেই একই উদ্বিগ্নতা, একই ভাব, একই ছবি।

* * *

উপরে যে কয়টি ছবি তুলে ধরা হ'ল, এমনি অসংখ্য ছবির সমবায়ে মায়ের জীবন। এগুলি যে অসাধারণ সে কথা বুঝি। কিন্তু তবুও মনে হয়—মা যেন খুবই সাধারণরূপে, অন্তরংগ হয়ে এসে বসেছেন আমাদের মর্মের মাঝখানে। তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন, আমাদের মতই চলেন ফেরেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের ভালবাসা চান। এই ভালবাসতে ও ভালবাসাতে তিনি সাধারণ হয়েছেন, সহজ সরল হয়েছেন। তাই সহজ সরল তাঁর জীবন-চিত্র—শুচিশুভ্র তাঁর জীবন-গাথা।

"বৈদিক ঋষি পুরুষশরীরের ন্যায় নারীশরীরেও সমভাবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া সর্ববিষয়ে পুরুষের সহিত নারীকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা ও সম্মান করিলেন। পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র স্পর্শে নারীও যে পুরুষের ন্যায় অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেন।"

—স্বামী সারদানন্দ (ভারতে শক্তিপূজা)

শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে

(এক)

শ্রীমা

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

অখ্যাত পল্লীর মাঝে ব্রাহ্মণের ঘরে
এসেছিলে কন্যারূপে। শতবর্ষ পরে—
কোটি কোটি প্রাণে আজ তুমি অধিষ্ঠিতা
মাতৃরূপে, দেবীরূপে—জগৎ-বন্দিতা।
রামকৃষ্ণ-সাধনার কেন্দ্র-স্বরূপিণী,
পরিচয় তুমি তাঁর জীবন-সঙ্গিনী।
তোমারেই দেখিলেন পূর্ণ মাতৃরূপে
পূজিলেন তাই তোমা পুষ্প-দীপ-ধূপে

ভক্তি-উপচারে ; মহাশক্তির প্রতীক
তুমি মাগো, কত আর্ত্ত-বিভ্রান্ত পথিক
তব স্নেহছায়াতলে লভিয়া আশ্রয়
করিল জীবন ধন্য পুণ্য মধুময়।
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে আজি গো জননী,
কোটি কণ্ঠে গীত তব বন্দনার ধ্বনি।

(দুই)

জন্মতিথিতে মাতৃসমীপে

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী

ভবতারিণীর ছায়ারূপা দেবী
তুমি ত শুধুই মানবী নও।
দুঃখ দহন তাপিত বিশ্বে
শান্তির বারি তুমিই বও!
রামকৃষ্ণের পূজা-অঞ্জলি
তোমারি চরণে পড়িল ঝরি!
মহাসাধনার সিদ্ধিরূপিণী
কে বলে মা তুমি ক্ষুদ্র নারী?
নিখিল জগতে চিনিয়া লইলে
মাতৃহৃদয় আলোকে, অয়ি!
তোমার দুয়ারে ভিখারী বিশ্ব,
মাতারূপে তুমি মহিমময়ী!

কত অমৃত সিঞ্চিলে মাগো
কত মরুবুকে ফুটালে ফুল!
তব করুণার অলকানন্দা
কুলুকুলু রবে ছাপাল কূল!
অফুরান স্নেহ, নাহিক বিচার
কেবা সাধু, কেবা পুণ্যবান!
সন্তান শুধু এই পরিচয়ে—
দীনহীনেরেও করিলে ত্রাণ!
ললাটে রাখিলে শীতল পরশ
গেল অনন্ত যুগের তাপ!
পুণ্যপ্রভায় ঝলিল বিশ্ব
বিবরে লুকাল কামনা-সাপ!

মা বলিয়া শুধু যে ডেকেছে তোরে
সেই পেয়ে গেছে চরণছায়া !
না জানি কাহার অসীম পুণ্যে
স্বরগের ছবি ধরিল কায়া ?
আজি তব শুভ জনম-লগনে
এসেছি ভকতি-আনত-শিরে ।
তোমার লীলায় পূত এ তীর্থে
কলকল্লোলা তটিনী-তীরে ।

হেথা প্রতি তৃণে জাগে রোমাঞ্চ
কার দুটি পদপরশ লাগি ?
প্রতি পল্লবে, প্রতিটি কুসুমে
কার মধুরিমা রয়েছে জাগি ?
এস অনন্ত করুণারূপিণী,
এস শান্তির বিমল জ্যোতি !
বিশ্বমানস হ'ল উতরোল
স্মরি এ পুণ্য জনম-তিথি !

(তিন)

অঞ্জলি

শান্তশীল দাশ

মাগো তোমার চরণ দু'টি
স্মরণ করে পাই অভয় ;
এমন দু'টি চরণ যে আর
পাইনে খুঁজে বিশ্বময় ।
ধেয়ান করি মনের মাঝে,
আঁধার ঘুচে আলোক রাজে ;
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্ব টুটে
সব বেদনা পায় যে লয় ।

সভ্য ধরার সব অভিমান
ঘুচ্‌লো মাগো তোর সকাশে ;
নিরক্ষরা গাঁয়ের মেয়ের
পায়ের তলে সবাই আসে ।
বিজ্ঞানীরা দেখলো চেয়ে
অবাক হয়ে, এ কোন্ মেয়ে ;
এমন ধনে কে এই ধনী
যে-ধন কভু হয় না ক্ষয় ।

(চার)

গান

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

এসো মা সারদে শুভদে বরদে
রাঙাপদে নতি করি মা ।
আপদে বিপদে সুখে সম্পদে
ও চরণ যেন স্মরি মা ॥

এ ভব-সংসারে কিবা ভয় আর
তুমি আছ জানি জননী আমার
অভয়-স্বরূপা রূপে অপরূপা
রহ অন্তর ভরি মা ॥

ভজন পূজন তব আরাধন
দাও মা শিখায়ে দাও,
নিবেদিতে এই হৃদয়কুসুম
আপনি ফুটায়ে নাও ;

তোমারি আলোকে তব সন্ধানে
চলি যেন মাগো পুলকিত প্রাণে
(এই) জনম-মরণ-সিন্ধু গহন
পার করো হাত ধরি মা ॥

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীমতী কুন্তলিনী দাশগুপ্তা

অশেষ সৌভাগ্যবশতঃ আমি শ্রীশ্রীমার দর্শন ও তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। আমি তখন ১৮ বৎসরের বালিকামাত্র। বয়স্ক লোকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা সমস্যা আমার ছিল না এবং মার কাছে আমি সেরূপ কিছুর সমাধানও চাহি নাই। শিশুর মত সরল প্রাণে আমি চাহিয়াছিলাম তাঁহার কৃপা ও আশীর্বাদ। আর তিনিও চিরকল্যাণময়ী জননীর মত স্নেহের সঙ্গে তাহা দান করিয়া আমার প্রাণমন ভরিয়া দিয়াছিলেন। বেশ মনে আছে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ব্যবহার বুকের ভিতর এক একটি আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। আর আমাদের ন্যায় অধম সন্তানদেরও তিনি কত প্রশংসাই না করিয়াছিলেন! কেন করিয়াছিলেন তাহা জানি না। শুধু এইটুকুই জানি যে, আমরা উহার যোগ্য ছিলাম না এবং উহা আমি তাঁহার সুগভীর স্নেহের নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে যখন ফিরিয়া আসি তখন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ, দেহ-মন এক অপূর্ব আশার আলোকে উদ্ভাসিত। মার অপার্থিব স্নেহ-বিজড়িত সেই একটি দিনের স্মৃতিই এই বিবরণে লিখিতেছি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। আশ্বিন মাসে আমি দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে মা জয়রামবাটী হইতে লিখেন যে, তিনি ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় আসিবেন এবং তখন আমিও যেন আসি, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

নানা কারণে ফাল্গুন মাসে আমার আর আসা হয় নাই। ১৯১৮ সালে ৺পূজার অল্প পূর্বে আমি কলিকাতায় পৌঁছি এবং তাহার পরদিন সকালবেলা উদ্বোধনে মায়ের বাটীতে যাই।

তখন বেলা প্রায় ৮॥ টা হইবে। আমার সঙ্গে আমার স্বামী, তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র ও আমার দাদা। পুত্রটিকে গাড়ীতে দাদার নিকট রাখিয়া আমি স্বামীর সহিত মায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। স্বামী নীচে রহিলেন, আমি উপরে গেলাম।

মা তখন ঠাকুরঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। সেখানে আরও কয়েকটি ভদ্রমহিলা বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট মা কে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। মা আমাকে হাত দিয়া সামনের জায়গা দেখাইয়া বলিলেন, "বস"। তখন যে কয়জন ভদ্রমহিলা সেখানে ছিলেন তাঁহারা একে একে মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমি দীক্ষা নিতে এসেছি।" মা সহজভাবে বলিলেন, "বুঝেছি" এবং সেই সঙ্গে কুটনো কাটা শেষ করিয়া বঁটি তুলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

উঠিয়াই তিনি খাটের পার্শ্বে সাম্‌না-সামনি দুইখানি আসন পাতিলেন এবং ছোট একটি গঙ্গাজলের কমণ্ডলু লইয়া একখানি আসনে আমাকে বসিতে বলিয়া অপরখানিতে নিজে বসিলেন। আমি বসিলে তিনি আমার হাতে গঙ্গাজল দিয়া আচমন করাইলেন এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। ইহার পর তিনি আমাকে বিধিমত দীক্ষা দিয়া জপ করা শিখাইয়া দিলেন। জপ করার সময়ে আমি আঙ্গুল ফাঁক করিয়া জপ করিতেছিলাম দেখিয়া মা আমাকে আঙ্গুলগুলি একত্র চাপিয়া রাখিয়া জপ করা দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু আমি ঠিক পারিতেছিলাম না, আঙ্গুলগুলি

ফাঁক হইয়া যাইতেছিল। তখন মা বলিলেন, "ওকি, জপের ফল বেরিয়ে যাবে যে।" ইহার পর আমি ঠিকমত জপ করিলাম।

দীক্ষান্তে এক অপূর্ব আনন্দে আমার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল। আমি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, আমার যেন জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য লাভ হয়।" ইহা বলিতে বলিতে, কেন জানি না, কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "হবে বৈকি মা, হবে বৈকি" বলিয়াই পুনরায় বলিলেন, "আহা মা, তোমার কি ভক্তি!" আমি তখন আরও কাঁদিতে লাগিলাম। অনেক কষ্টে আত্মীয়স্বজনের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া আমি মার কাছে আসিতে পারিয়াছিলাম, তাহা মনে করিয়া আমার আরও কান্না পাইতে লাগিল।

ইহার পর মা উঠিয়া আমার হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন, "খাও।" আমি বলিলাম, "মা, তোমার প্রসাদ খাব।" মা তখন সন্দেশটি জিবে ঠেকাইয়া আমাকে দিলেন। আমি তাহা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া খাইতে লাগিলাম। মা এই সময়ে পার্শ্বের ঘরে মাকুকে মুড়ি দিতেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুড়ি খাবে মা?" এবং আমি কিছু বলার আগেই মেঝেতে মাকুর পার্শ্বে কিছু মুড়ি ঢালিয়া দিলেন। তখন আমরা সেখানে বসিয়া তেলেভাজা, নারিকেলের ফালি ও মুড়ি খাইলাম।

ঐ সময়ে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে এসেছ মা?"

আমি উত্তর দিলাম—"স্বামীর সঙ্গে।"

মা—"স্বামী কি করেন, কোথায় থাকেন?"

আমি—"তুমি তাকে চেন মা। গেল বছরের আগের বছর জয়রামবাটীতে তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছেন।"

শুনিয়া মা তখন কিছু বলিলেন না।

ইহার অল্প পরেই পুরুষ ভক্তরা মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। আমরা তখন পার্শ্বের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পুরুষ ভক্তরা চলিয়া গেলে, আমি মার ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিতেই অবাক্ হইয়া দেখিলাম যে, ঐ দরজার সামনেই মা আমার ছেলেটিকে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন। ছেলেটি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সাদা মা?" আমি বলিলাম, "হাঁ, সাদা মা।" তখন মাকু প্রভৃতিও সেখানে আসিলে মা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা, বেশ ছেলেটি গো, বেশ ছেলেটি।" তারপর তিনি ছেলেটিকে একটি সন্দেশ খাইতে দিলেন। আমি মাকে উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলে, মা উহা পূর্বের ন্যায় জিবে ঠেকাইয়া দিলেন। (পরে স্বামীর কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি যখন মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন, তখন মা নিজ হইতেই ছেলেটিকে দেখিতে চাওয়ায় তিনি তাহাকে মার কাছে দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা কেহই ছেলের বিষয় পূর্বে মাকে বলি নাই)।

কিছুক্ষণ পরে আমরা পার্শ্বের ঘরে আসিলাম। তখন মা আমার দেওয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাপড় তুমি এনেছ মা? বেশ কাপড় হয়েছে।" তারপর মা আমার দিকে ও মাকু প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া আমার স্বামীর সম্বন্ধে বলিলেন, "ওকে আমি চিন্‌তে পেরেছি। ও যে দু'বছর আগে জয়রামবাটী গেছল।" সেই সঙ্গে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা মা, ও ওকালতি ছেড়ে দিলে কেন?" আমি তখন ছেলেমানুষ, কথা গুছাইয়া বলিতে শিখি নাই। তাই থতমত খাইয়া সরল ছেলেমানুষের মত বলিয়া ফেলিলাম, "তা না হলে মা তোমাকে যে ডাকা হয় না।" মা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা ঠিক মা, ও যারা পারে, তারাই পারে। এরা কি পারে কখন?" এইখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আমার স্বামীর ওকালতি-

ত্যাগের বিষয় আমরা কেহ পূর্বে মাকে কিছু বলি নাই।

ইহার পর মা পুনরায় ঠাকুরঘরে গেলেন। একটু পরে আমিও সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হইয়া গিয়াছে এবং মা ঘরের মাঝখানে বসিয়া দুইখানি ছোট পাতায় করিয়া জলখাবার খাইতেছেন। আমার পূর্ব হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, মা খাইতে খাইতে আমাকে তাঁর পাতের প্রসাদ দেন। কিন্তু লজ্জায় কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। তাই একটু ঘুরাইয়া বলিলাম, "মা, আমি একটু ঠাকুরের প্রসাদ খাব।" মা প্রথম একখানি পাতা হইতে কিছু তুলিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—"না, এতো ঠাকুরের প্রসাদ নয়।" বলিয়াই পার্শ্বের অপর পাতাখানি হইতে একটু তুলিয়া দিলেন। ইহার পর মা খাইতে লাগিলেন, আমি তাঁহার সামনে বসিয়া রহিলাম। মা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে কি বলে আমাকে?" আমি বলিলাম, "সাদা মা বলে।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বোধ হয় তোমার ছবিখানা সাদা দেখে।"

খাওয়া শেষ হইলে আমি যখন ঠাকুরঘরের ভিতর একটু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছিলাম, তখন মা আমার কাছে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের একখানি গ্রুপ-ফটো দেখাইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, "এই প্রেমানন্দ, এই ব্রহ্মানন্দ, এই শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, এই শরৎ—সারদানন্দ, ইত্যাদি।" এইভাবে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ছবি দেখান শেষ হইলে, মা খাটের উপরে বসিলেন। আমি তাঁহার সাম্‌নে নীচে বসিলাম। তখন মাকু প্রভৃতি আসিয়া আমার হাতের চুড়ি, বালা, প্রভৃতি দেখিতে লাগিল। এই সময়ে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি কি মা?" আমি নাম বলিলে মা মাকু প্রভৃতিকে বলিলেন, "তোরা নামটি মনে রাখিস, যদি কখনও চিঠি-টিঠি লেখে।"

ইহার পরে সেখানে আর যে সকল কথা হইতে লাগিল তাহা সবই মেয়েলী কথা, লিখিবার মত কিছু নয়। তবে ইহার মধ্যেও মার সুগভীর স্নেহ অনুভব করিয়াছিলাম। তাই দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম: (১) আমার হাতের সোনা-বাঁধানো লোহাটা ভাঙিয়া যাওয়ায় তাহা গড়াইতে দিয়াছিলাম। ইহা আমার নিকট হইতে জানিবার পরেও উপস্থিত কেহ কেহ আমার হাতে শাঁখার সঙ্গে লোহা না থাকায় ত্রুটি ধরিয়া মন্তব্য করিতে লাগিলেন। তখন মা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নোয়াটা ফেটে গিয়েছে, তাই।" তখন তাঁহারা চুপ করেন। (২) অপর একজন মহিলা মার সাম্‌নে আমার বাঁকা সিঁথির বিষয় উল্লেখ করেন। মার কাছে আসিবার সময়ে আমি বিদেশে; তাড়াতাড়ির মধ্যে আর চুল আঁচড়াইয়া আসিতে পারি নাই। তাই আমার মাথায় পূর্বদিনের বাঁকা সিঁথিটাই রহিয়া গিয়াছিল। এখন মার সাম্‌নে ঐ বাঁকা সিঁথির কথা উঠায় আমি প্রথমে লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। মা কি মনে করিতেছেন ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা এখন হয়েছে এই সব।" তখন আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

মার এই গভীর স্নেহাশ্রয়ে নানা কথাবার্তায় আর কিছু সময় কাটিলে আমার যাইবার জন্য ডাক আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গাড়ী এসেছে?" আমি "হুঁ" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু সিঁড়ির নিকট আসিতেই মনে হইল যাইবার সময় আমি মাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলাম না। তাই ফিরিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, ঠাকুরঘরে কেহ নাই। আমি তখন বাহিরের দিকের দরজা দিয়া মুখ বাড়াইতেই দেখি, মা বারান্দায় রেলিং ধরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি উঁকি দিতেই মা আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু তাঁহার চোখে চোখ পড়িতেই আমি লজ্জায় ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রহিয়া গেল। কারণ, মাকে আমার এই প্রথম ও শেষ দর্শন। তবে ইহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল হইয়া আছে।

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

কামারপুকুর! হুগলী জেলার কামারপুকুর। স্বভাবতঃ জনবিরল সেখাকার পল্লীগৃহ তখন প্রায় জনহীন, প্রায় নিস্তব্ধ। রঘুবীর-বিগ্রহের সেবা-পূজা নিয়ে পরিবারের দু'একজন মাত্র তখন বাস করেন সেখানে। আর সবাই হয় প্রবাসে, নয় লোকান্তরে। যারা আছে, কায়ক্লেশেই তাদের দিন কাটে। চির-অসচ্ছল কামারপুকুরের সংসারে তখন যেন আরও অসচ্ছলতা। সেই নিদারুণ অসচ্ছলতার মধ্যেই বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে মা অনেকদিন বাস করেছিলেন। অভাব-অনটনের বড় কষ্টের মধ্যেই কেটেছিল সে দিনগুলি। সঙ্গি-সাথী তো কেউ ছিলই না—তার উপর, অর্থাভাবে কখনো সামান্য শাকভাত, কখনও বা কেবলমাত্র নুনভাত খেয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হত। অথচ সে সংবাদও বাইরে কেউ রাখত না।

মা চিরদিন যদৃচ্ছলাভে তুষ্ট ছিলেন। চিরদিন অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। সামান্য তুচ্ছ বস্তুও কেউ কখনও দিলে কত আনন্দ করে মা দশজনকে ডেকে দেখাতেন। বলতেন,—'দেখগো, অমুকে এইটি দিয়েছে।' কাজেই শারীরিক কষ্টকে বড় একটা গ্রাহ্য করতেন না, গায়ে মাখতেন না তিনি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি যখন থাকব না, তখন তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে। শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।' মা সত্য সত্য এ-কালে তা-ই করতেন। অভাব-অভিযোগ তাঁকে স্পর্শ করত না। কামারপুকুরের নীল নভপট আনন্দময় ঐশ আবির্ভাবে পূর্ণ বলে তাঁর কাছে ক্ষণে ক্ষণে মনে হত।

মনে হত, বনানীর পত্রচ্ছায়ায় রহস্যময় অজস্র ইঙ্গিত যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। বাতাসে মহাজীবনের শাশ্বতগান যেন তরঙ্গায়িত। অর্থাৎ, ব্রজধামের শেষদিকের দিনগুলির মত কামারপুকুরেও প্রায়ই বিচিত্র দর্শন ও অনুভূতিতে তাঁর সমগ্র সত্তা আবৃত হয়ে থাকত, পূর্ণ হয়ে থাকত। বিরাট বিশ্ব ব্যগ্র বাহু দুটি প্রসারিত করে অহর্নিশ তাঁকে যেন আহ্বান করত—উদাত্ত, অনুদাত্ত, মন্দ্রস্বরে।

যেন বলত,—মা তুমি স্বয়ম্প্রকাশ, প্রকাশিতা হও। তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী—বিশ্বকে রক্ষা কর, বিশ্বকে ধারণ কর :

> 'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।'
>
> —চণ্ডী, ১১।৩৩

কাজেই, খাওয়া-পরার অভাব-অনটন তাঁর মনকে কীভাবে আর স্পর্শ করবে? অতীন্দ্রিয় দর্শনের জ্যোতি-তরঙ্গে, সহজানন্দে ঘুরে বেড়াত তাঁর মন। অবশ্য, তাদের বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের জানা নেই, কারুরই জানা নেই। কারণ, মা কখনো এ সব দর্শনাদির কথা বড় একটা উল্লেখ করেন নি জীবনে। শুধু যে দু'টি একটি বিচিত্র দর্শনস্মৃতি দীর্ঘকাল তাঁর অন্তরে জাগ্রত ছিল, তাদেরই কাহিনী কখনো কখনো উল্লেখ করেছেন উত্তরকালে, কথাপ্রসঙ্গে।

উদাহরণ হিসাবে, তাদেরই দু'-একটির উল্লেখ এখানে আমরা করব। একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটেছিল সে সব দর্শন এবং মাও সেভাবেই তাদের বর্ণনা করেছেন।···

* * *

সেদিন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ বেলা।

জনবিরল কামারপুকুরের গোঠে মাঠে দিনশেষের সূর্যরশ্মি ধারায় ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ধরিত্রী, ক্লান্ত তার উষ্ণ নিঃশ্বাস। বাতাসে ঈষৎ তপ্তভাব।

মা বাটির সম্মুখের অপরিসর পায়ে চলার পথটির ধারে আনমনে দাঁড়িয়েছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। এমন সময় সে দর্শনটি উপস্থিত হল।

মা দেখলেন, ভাবে নয়, কল্পনায় নয়—সাদা চোখে প্রত্যক্ষ দেখলেন—দিব্যদেহধারী, দীর্ঘাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যোমপথে নেমে আসছেন ঊর্ধ্বলোক থেকে। সর্বাঙ্গ থেকে অপরূপ লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অল্প একটু উপর দিয়ে লঘুপদে এগিয়ে চলেছেন তিনি পুরঃপ্রসারিত দিগন্তের পথে। আর তাঁর পাদনখকোণ থেকে গঙ্গার জলধারা অশ্রান্ত প্রবাহে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর মাটি সিক্ত করছে, বিধৌত করছে।

আরও দেখলেন, তদীয় লীলাসহচর, অন্তরঙ্গ সেবকগণ অনুবর্তী হয়ে সেই জলরাশি মস্তকে ধারণ করছেন, তাতে অবগাহন করে পবিত্র করছেন তনু, মন।

মুহূর্তে পৌরাণিক যুগের বিস্মৃতপ্রায় অতীত কাহিনী ভেসে উঠল মায়ের চেতন-মানসে। সত্য যুগের পুণ্যস্মৃতি কলিযুগের ধরিত্রীতে রূপায়িত হল কি পুনর্বার? হরজটা-নিঃসৃত গঙ্গা ভগীরথের শঙ্খনিনাদে বিধৌত করল কি মেদিনী?

সঙ্গে সঙ্গে পথের ধারের ফুলগাছ থেকে মুঠো মুঠো জবাফুল তুলে এনে সে জলরাশিতে নিক্ষেপ করলেন মা; যুক্ত করে প্রণাম করলেন সে দেব-আবির্ভাবকে, প্রণাম করলেন সে পূত জলধারাকে। স্বর্গের ধ্যানমন্ত্র শব্দিত হল মাটির পৃথিবীতে—

সুস্পষ্ট, 'মন্দ্রিল বাঁশী সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে।'

ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল দৃশ্যপট। ধীরে ধীরে মায়ের হাতের পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে পরিতৃপ্ত দেবতামণ্ডলী মহাকাশের মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিলীন হয়ে গেল।

এ অপূর্ব দর্শনটি মা'র কাছে নিগূঢ় তাৎপর্যে পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। ঠিক এ ধরনেরই আর একটি দর্শন অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আরও একবার মায়ের জীবনে উপস্থিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বলে সে কথাটিও এখানেই আমরা উল্লেখ করছি।

মা তখন বেলুড়ে, নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটে বাড়ীতে। দিনশেষের ক্লান্ত রবি সেদিনও অস্তাচলশায়ী। সেদিনও তার লোহিত আভায় সর্বচরাচর অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে গঙ্গার জলধারা। পশ্চিম দিগ্বধূ সোনার স্বপ্ন দেখ্‌তে শুরু করেছে।

এমন সময় সহসা মা দেখতে পেলেন—দিব্য দেহে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্বর্ত্মে নেমে এলেন পৃথিবীতে। মাটিতে পাদক্ষেপ না করে সরাসরি অবতরণ করলেন গঙ্গায় এবং অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিব্য তনুখানি জলরাশির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেল, তদাকারাকারিত হয়ে গেল।

পরমুহূর্তে মা দেখলেন, স্বামিজী,—স্বামী বিবেকানন্দ—'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে করতে সেই জলরাশি তটভূমির অগণ্য নর-নারীর মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছেন। পূত বারিস্পর্শে সদ্যমুক্ত হয়ে ব্যোমপথে তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঊর্ধ্বলোকে।

'বিশ্বের রহস্যলীলা যেন লভিতেছে আপন প্রকাশ
দেবতার উৎসব-প্রাঙ্গণে।'

এ দর্শনের পর অনেকদিন মা আর গঙ্গায় নামতে পারেননি। কেবলি তাঁর মনে হত—গঙ্গাবারি, ব্রহ্মবারি। দেবদেহ মিশে গেছে সে সলিলে। কাজেই, এতে পা দেওয়া চলতে পারে না কোনমতেই। দীর্ঘকাল পরে তাঁর সে ভাব অবশ্য অনেকটা দূরীভূত হয়েছিল।

তবে একটু 'গঙ্গাবাই' মা'র চিরদিনই ছিল, গঙ্গাতীরে বাস সর্বদাই তাঁর কাম্য ছিল।

মায়ের কামারপুকুরের জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে একটি কঠোর তপশ্চর্যার কথাও এখানে মনে পড়ে—তাঁর পঞ্চতপা অনুষ্ঠান। মায়ের উত্তরজীবনে

এই 'পঞ্চতপা'র কাহিনী তাঁর নিজ মুখ থেকেই শোনবার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটেছিল।

মা বলেছিলেন,—পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের আগে—দেশে থাকবার সময় প্রায়ই একটি দশ-বার বছরের কিশোরী সন্ন্যাসিনীকে তিনি দেখতে পেতেন। তার তৈলহীন, রুক্ষ মাথাভরা একমাথা চুল। গায়ে গেরুয়া, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের জপমালা। মা দেখতেন, অনেক সময়ই দেখতেন—সে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকারে ইঙ্গিতে একটা কিছু অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছে যেন। প্রথম প্রথম বিশেষ খেয়াল করেন নি মা। কিন্তু শেষে হঠাৎ একদিন ভিতর থেকেই যেন সে ইঙ্গিতের অর্থ ভেসে উঠল। কে যেন বলে উঠল,—'পঞ্চতপা, কঠোর ব্রত পঞ্চতপা! তারই অনুষ্ঠান কর তুমি।'

পঞ্চতপা কি বস্তু মা'র জানা ছিল না। সেজন্য নিত্যসঙ্গিনী যোগেন মাকেই জিজ্ঞাসা করলেন পঞ্চতপার কথা। বললেন,—'পঞ্চতপা কাকে বলে যোগেন? আমি কিছুদিন ধরে এই রকম দেখ্‌ছি।'—

তারপর বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতেই পঞ্চতপার আয়োজন হল। মা এবং যোগেন মা দুজনে এক সঙ্গেই সে দুরূহ ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন।

চারদিকে পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারটি অগ্নিকুণ্ড। তাতে ঘুঁটের আগুন, উপরে অনাবৃত সূর্য। তারই মধ্যে সূর্যোদয় থেকে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাসনে জপধ্যান—এই পঞ্চতপা।

মা বলতেন,—'প্রথমদিন সকালে স্নান করে গিয়ে দেখি আগুন খুব জ্বলছে। গন্‌-গনে আগুন। দেখে ভয় হয়েছিল প্রাণে। ভেবেছিলাম কি করে এর ভিতরে যাব আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকব। যোগেন কিন্তু বলল—'ভয় নেই মা, এস।'—বলে আমার হাত ধরল। তখন মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে প্রবেশ করলাম। ঢুকে দেখি আগুনের কোন তাপ নেই। কিন্তু পাঁচদিন আগুনের মধ্যে বাস করে শরীর যেন পোড়া কাঠের মত হয়ে গিয়েছিল। রং হয়েছিল কালীর মত।'

প্রাচীন যুগের তপস্বিনী গৌরীর এ যেন এক নবতম আলেখ্য, বিরহকৃশা গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়ার এক অভিনব অভিব্যক্তি। দেখে আমরা অবহিত হই, বিস্মিত হই।

অবশ্য, মায়ের সমগ্রজীবনই একটি অব্যাহত সাধনজীবন। যোগ-সংসিদ্ধিতে পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তিনি অবস্থান করতেন অহর্নিশ। সুতরাং, সাধনজীবন বলে একটি অংশকে একটু স্বতন্ত্র করে, কিছুটা রেখাঙ্কিত করে দেখাবার তাৎপর্য যে খুব বেশী আছে তা নয়। তথাপি, তাঁর গুরুভাব ও মাতৃভাবের ব্যাপক অভিব্যক্তির প্রাক্‌-কালটিকে সাধারণভাবে তপস্যার কাল বলেই আমরা উল্লেখ করলাম। নতুবা, ঘটনাবিরল মায়ের যে জীবন মুখ্যতঃ ধ্যানময়, ভাবময়—বাহ্যিক আচার-আচরণে যার প্রকাশ নিতান্ত কম—তার ক্রমবিকাশের অদৃশ্য গতিপথটি অনুসরণ করা এবং শব্দগুলিতে তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়, হয়ত বা সম্ভবই নয়।

প্রাচীন ও বর্তমান—এ-দুই যুগের ঠিক সন্ধিক্ষণে, এ দুই যুগের সার্থক সমন্বয়বিগ্রহরূপে মা তাঁর অমৃতমধুর জীবনটি নিয়ে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশেষ সুকৃতিবশে তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-স্বচ্ছ দৃষ্টিতে নারী-আদর্শের যে সর্বতোভদ্র রূপটি বাস্তব হয়ে ফুটে ছিল মা তারই নিখুঁত জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাঁর জীবনকে অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামনীষীর ধ্যানকল্পনাও আর কোন বৃহত্তর, উন্নততর নারী-আদর্শে পৌঁছাতে পারে নি। নিবেদিতা তাই বলেছিলেন,—'She (Holy Mother) is the last of an old order and the beginning of a new ...To me it has always appeared that she is Sri Ramakrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood.'

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করেছিলেন আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে কয়জন ভাগ্যবানকে রসদ্দার বলে নির্দেশ করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম ছিল ঠাকুরের কথায় 'সুরেশ মিত্তির', সেই সুরেন বাবু ছিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরম বন্ধু। আমার শ্বশুর মহাশয় তখন কলকাতার সিমলা স্ট্রীটে সুরেন বাবুর বাড়ীর নিকট থাকতেন। তাঁরই সঙ্গে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমার শ্বশুর মশাই গিয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তখনকার দিনে সাধুদর্শন করতে গেলে তাঁর অলৌকিকত্বই সাধুত্বের পরিচায়ক বলে গণ্য হত, ভগবৎ-তত্ত্বান্বেষণে খুব কম লোকেই সাধুর নিকট যেতেন। আমার শ্বশুর মহাশয় ছিলেন বড় ইঞ্জিনীয়ার। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর যেমন সকলকেই বল্‌তেন "মাঝে মাঝে এসো," তাঁকেও ঐরূপ বলেই তারপর বলেছিলেন, "ওরে তুই বদ্‌লি হয়ে গেছিস্‌।" বাড়ী এসেই শ্বশুর মশাই দেখেন পূর্ণিয়ায় তাঁর বদল হবার খবর দিয়ে সরকার হতে তার এসে গেছে। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তখন তিনি তা আশা করেন নি। এই অলৌকিক ঘটনা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু বদলি হয়ে বিদেশে চলে যাওয়ায় আর সংসারের নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে ডুবে যাওয়াতে এবং বহুদিন কলকাতা ছাড়া হয়ে থাকায় তাঁর আর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর যখন তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন ঠাকুর মানবলীলা সংবরণ করেছেন।

বহুদিন কেটে গেল, শ্বশুরের প্রথম সন্তান আমার ডাক্তার ভাসুর যখন বালিকা বধূ আর শিশুসন্তান রেখে অকালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে চলে গেলেন, তখন তাঁদের প্রাণে সান্ত্বনা দিতে আত্মীয়ের হাতের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্য দিয়ে ঠাকুর আমাদের ঘরে এলেন। সেই থেকে আমরা তিন পুরুষ ঠাকুরের শ্রীচরণে বাঁধা পড়েছি।

আমার বড় জা ভারী ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁরই সংস্পর্শে আমার শোকাতুরা শাশুড়ী ঠাকুরানী শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে গিয়ে একটু শান্তি লাভ করতেন। কিছুদিন পরে কৃপাময়ী মা আমার শোকাতুরা শাশুড়ীমাতাকে ও আমার বড় জাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। তখন আমি বালিকা, মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও কিছু বলবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে শাশুড়ীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-দর্শনে যেতুম, তাঁদের কথা অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে শুনতুম। আমাদের বাড়ীতে আবার অবগুণ্ঠন খোলবার উপায় ছিল না বা শাশুড়ীর সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলারও নিয়ম ছিল না। তাই শাশুড়ীর সাহচর্যে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যলাভ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌বার সুযোগ হ'ত না।

আমার বাপের বাড়ীর দিকে তখনও কেউ ঠাকুরের ভক্ত হন নি। দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া আর কিছু সেখান হ'তে হত না।*

* পরে অবশ্য আমার মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কাজের জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তাঁর পিতামাতার স্মৃতিতে ৺কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে সংক্রামক রোগীর ওয়ার্ড তিনিই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন বা স্পর্শন একমাত্র শাশুড়ীমাতার সঙ্গে ছাড়া কখনও হয়নি, কাজেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে, তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নেবার মনের যে ইচ্ছা, কিছুতেই তা নিবেদন করবার সুযোগ পেতুম না।

এইভাবে অনেকদিন কেটে গেল। আমার শিশু কন্যাটির বয়স তখন মাত্র চারমাস; তাকে নিয়েও একদিন যাই। তার মাথাটি শ্রীচরণে ঠেকাতেই মা তাকে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আবার কোলে দিয়ে দিলেন। এইভাবে মায়ের দর্শন মাঝে মাঝে পেলেও আমার প্রাণের আকুলতা যায় না।

স্বামীরও তখন দীক্ষায় মন নেই। অবশ্য আমায় বাধা দেন নি, সর্বান্তঃকরণে বলেছিলেন, "তুমি শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় নাও, আমার যখন যেখানে ইচ্ছা হবে তখন নেব।" তখনও জানতেন না যে, ঠাকুর আমাদের ধরে আছেন, আমাদের কোথাও যাবার উপায় নেই।

এইভাবে দিন যায়, শেষে আর থাকতে না পেরে আমার বড় জাকে মনের কথা বললুম। তিনিও তখন কিছু করে উঠতে পারলেন না, তবে আশা দিলেন যে, নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখবেন।

এই সময় আমার একটি দেবর ঠিক আমার ভাসুরের মতনই কৃতবিদ্য ডাক্তার হ'য়ে সেই রকমই বালিকা বধূ ও এক বছরের শিশুপুত্র রেখে পঁচিশ বছর বয়সে অকালে চলে গেল। এইবার আমার শাশুড়ী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমার শ্বশুর মশায়ও তখন ছয় সাত বৎসর ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী আর সহ্য করতে পারলেন না, একেবারে শোকবিহ্বলা ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ এলেন শাশুড়ী মাতাকে সান্ত্বনা দিতে। আমার ঘরখানি পবিত্র করে আমাদের কাছে বসে কতই আশ্বাসের কথা, ঠাকুরের প্রসঙ্গ সব শুনিয়ে গেলেন। সেই সময় পূজনীয়া গৌরীমাও এসেছিলেন একদিন আমাদের বাড়ীতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পুণ্যকথা আমাদের শুনিয়ে ধন্য করে গিয়েছিলেন। তাঁর স্কুল তখন নতুন শুরু হয়েছে গোয়াবাগানে। সেখানে আমার ছোট বোন দুটি পড়ত, সেই সূত্রে তিনি আমার বাপের বাড়ীও যেতেন এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের পুণ্যকথা সানন্দে বলতেন। সেই সব দিনের স্মরণে আজও আমার মনে হয়, তখন আমরা কত সৌভাগ্যেরই অধিকারী হয়েছিলুম।

তারপর থেকে আমার আকুলতা আরও বাড়ল। আমার আকুলতায় বোধ হয় এইবার ঠাকুরের আসন টললো। একটি সুযোগ ঠাকুর দিলেন—ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শিবরাণী আমার আর একটি দেবরের বধূ হয়ে আমাদের গৃহ কিছুদিনের জন্য পবিত্র করতে এসেছিল। বালিকাটি যেন মূর্তিমতী আনন্দ ছিল। সে আমায় ভারি ভালবাসত। আমার ঐ দেবরটি আগ্রা কলেজের অধ্যাপক ছিল। যখন তার বিয়ে হয় বধূটি নিতান্ত বালিকা, সুতরাং তিন চার বছরের মধ্যে তাকে আগ্রা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। যখন সে একটু বড় হল, তার আগ্রা যাবার কথা হয়। সে তখন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর চরণে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। শ্রীযুত কিরণ বাবুর বাড়ীতে সর্বদাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ মহারাজদের যাওয়া-আসা ছিল; শ্রীশ্রীমাও ওঁদের কাশীর বাড়ী 'লক্ষ্মীনিবাসে' কৃপা করে নিজে গিয়ে কিছুদিন বাস করে তাঁদের ধন্য করেছিলেন। ওঁরা সর্বদাই মায়ের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করতে পেতেন। এইবার আমায় ঠাকুর সুযোগ করে দিলেন; শিবরাণীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল। শাশুড়ীমাতা মত দিলেন, আমাদের দীক্ষার দিন স্থির হল।

তবু আবার বাধা হয়, শ্রীমতী রাধুর তখন শরীর বড় খারাপ, সে তখন কোনও গোলমাল সহ্য করতে পারছে না, সেজন্য শ্রীশ্রীমা তাকে নিয়ে উদ্বোধনের বাড়ী ছেড়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বোসপাড়া লেনে রয়েছেন। কাজেই আমাদের দীক্ষা দিতে তখন মা সম্মত হবেন কিনা সে একটা ভাববার কথা হল।

কিন্তু শিবরাণীর আগ্রা যাবার দিন পুনঃ পুনঃ বদল হওয়ায় বাড়ীতেও একটু গোলমালের সৃষ্টি হয়। করুণাময়ী মা সব শুনে সম্মতি দান করলেন।

সে কথা শুনে আনন্দে, আর কি যেন একটা অনির্বচনীয় ভাবে সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারলুম না। রাত্রি থাকতেই স্নানাদি ও গৃহদেবতার পূজাদি সমাপন করে কম্পিত বক্ষে শাশুড়ী মাতার সঙ্গে বোসপাড়া লেনে গেলুম। সেই অবগুণ্ঠনাবৃতই অবস্থা। সুতরাং শ্রীমতী রাধুর সম্বন্ধেও যে মাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব তারও উপায় নেই।

যাই হোক্, শুভ সময় এল ; শ্রীশ্রীমা আমাদের একে একে ডাকলেন। সেই জীবনের শুভ মুহূর্ত, মা ও আমি নির্জন কক্ষে, আর কেউ নেই, জীবনে কখনও মাকে সম্বোধন করে একটি বাক্যও আমার মুখ হতে উচ্চারিত হয়নি, আর সেই শুভ সময় যদি অসতর্ক হ'য়ে কাটিয়ে দিই, তবে আর তা নাও পেতে পারি।

আমার অন্তর বলে উঠল, ওরে মূর্খ, এই তোর সময়, এই তোর অবসর, করুণাময়ীর কাছে যা চাইবার চেয়ে নে, আর কখনও এমন সুযোগ পাবি না।

রাধুর অসুখ, মাও ক্ষিপ্রতার সহিত সব সেরে নিচ্ছিলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএর ঠাকুর-ঘরে শ্রীশ্রীমা আমাদের একে একে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঠাকুর ও নানা দেবদেবীর ছবি ছিল। মা আমার আমার ইষ্টদেবীকে দেখিয়ে দিলেন, ঠাকুরকে দেখিয়ে বল্লেন—উনিই সব, এবং সবীজ মহামন্ত্র দান করলেন। আর বল্লেন, "মা, অনিবেদিত বস্তু কখনও খেও না, এক খিলি পান খেতে হলেও নিবেদন করে খাবে, আর শ্রাদ্ধের অন্ন কখনও খেও না।" কোনও বিশেষ বাধা-নিষেধে মা আমাদের আবদ্ধ করেন নি, শুধু এইটুকু মা নিজেই নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়ে আসছেন।

করুণাময়ী মা আমায় যেমন আশ্রয় দিলেন, তখনই তাঁর শ্রীচরণ দুখানি চেপে ধরে কাতরে আমি বলে উঠলুম, "মা! মা! শ্রীচরণে আশ্রয় দিলেন তো?" মাথায় হাত বুলিয়ে, চোখ মুছিয়ে দিয়ে করুণাময়ী বলে উঠলেন, "হাঁ মা, দিলুম বৈকি!" আর আমি কিছু মনে করতে পারলুম না। এখনও মনে মনে স্মরণ করলে জননীর সেই কোমল পাদ-পদ্মের স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করি। মার শ্রীচরণের অঙ্গুলিতে বোধ হয় বাতের জন্য একটি লোহার তারের আংটি ছিল, এখনও যেন সেইটিরও স্পর্শ অনুভব করি। তারপর যেন আচ্ছন্নের মত বাইরে এলুম। মা আমাদের প্রসাদ দিয়ে একটু দুঃখিত হয়ে বল্লেন, "আজ তো এখানে প্রসাদ পেতে হয়। কি করব মা, রাধু যে গোলমাল সহ্য করতে পারছে না।" আমাদের সেই সময়ই চলে আসবারই ব্যবস্থা ছিল। কখন যে কি ভাবে গাড়ীতে এসে বসেছি তা জানতেও পারিনি। এই আচ্ছন্নভাব আমার সপ্তাহকাল ছিল।

আমার জীবনে মার সঙ্গে এই প্রথম ও এই-ই শেষ কথা। এর পর আর আমি কখনও মাকে দর্শনও করতে পাইনি। অতি তুচ্ছ সাংসারিক কারণ মার শ্রীচরণ-দর্শনে বাধা ঘটিয়েছিল।

শিবরাণী আগ্রা যাবার দু' তিন মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হল। বালিকা বধূ বলে আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী তার সঙ্গে আগ্রা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই শুনেছিলেন যে,

শিবরানীর বিয়োগে ব্যথিতা হয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সাশ্রুনেত্রে বলেছিলেন, "রানীর শাশুড়ী বর্ষীয়সী গৃহিণী হয়ে অন্তঃসত্ত্বা বধূকে তাজের গম্বুজে উঠতে দিলে কেন? বৃহস্পতিবারেই বা আগ্রা নিয়ে গেল কেন?"

আমার শাশুড়ী-ঠাকুরানী বড়ই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীমা বিরক্ত হয়েছেন শুনে কলকাতায় এসে তিনি নিতান্ত ভীতা হয়ে উদ্বোধনে যেতে সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলেন, কাজেই আমারও আর যাওয়া ঘটে উঠল না। শ্রীশ্রীমার পার্থিব লীলা সংবরণ করার মধ্যে আর শাশুড়ী-ঠাকুরানী সেখানে গেলেন না, আমারও আর শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনেরসুযোগ হল না।

আরও কিছুদিন পর যখন অশীতিপর পিতা-মাতা রেখে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হলেন, তখন আমার শোকাতুরা মাতাকে নিয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট আমি যাতায়াত করতে লাগলুম, তখন উদ্বোধন মা-শূন্য। প্রাণ হাহাকার করত; মনে মনে বলতুম, মাগো এই ত শাশুড়ী ছাড়া আসা হল, তখন কেন আনলে না মা? আর যে তোমায় দেখতে পেলুম না। পূজনীয়া গোলাপ-মা, যোগীন-মা কত সান্ত্বনা দিতেন, কত যত্ন করতেন, কিন্তু অনেক দিন যাবৎ প্রাণের হাহাকার যায় নি, ক্রমে সব স'য়ে গেল।

তখন পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে বালিকা কন্যা দুটীর দীক্ষার জন্য প্রার্থী হলুম। মহারাজ সানন্দে সম্মতি দান করলেন, ছোটটি নিতান্ত বালিকা, তবুও কৃপা করলেন। যদি কোনও দিন গিয়ে বলেছি, "মহারাজ, ও আমার কথা শোনে নি," তখনই তিনি বলতেন, "ওদের মহারাজ ছোটবেলা কত দুষ্টু ছিল জাননা ত মা!" তারপর তাকে বলতেন, "হ্যাঁরে, দুষ্টুমি করেছিস্, তোকে বেরাল-ছানার মত খাটের পায়ায় বেঁধে রাখবো। তোকে শাস্তি দিলুম—যা, সব ঠাকুরদের ছবিতে ধূপ দিয়ে আয়," বলে একটি দীর্ঘ ধূপ জ্বালিয়ে ওর হাতে দিতেন। উদ্বোধনে তৎকালে ওর নাম ছিল, 'মহারাজের বেরালছানা'। এত স্নেহ-যত্ন ওরা এত শিশুকালে পেয়েছিল যে, এখন হয়ত তা ভাল করে স্মরণ করতে পারে না।

এমনি করে সকল মাতৃহারা সন্তানদের ব্যথা বিশালবক্ষে শরৎ মহারাজ নিজে নিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর স্নেহ ভালবাসায় যেন মায়ের স্নেহেরই স্বাদ পেতুম। মায়ের প্রাণটি নিয়েই তিনি মায়ের বাড়ীতে সকলের মন ভরিয়ে রাখতেন।

আমাদের মেয়েরা বাল্যকালে দীক্ষাহেতু গুরুসঙ্গ পায়নি বলাতে একদিন একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বলেছিলেন, "ঐ সব সিদ্ধগুরুর সঙ্গের প্রয়োজন হয় না, ওঁদের একবার চোখের দেখা দেখলেও কাজ হয়।" তখন যেন মনের একটা কুয়াসা সরে গেল, নিজের সম্বন্ধে তখন মনে হল, তাইত তবে দুঃখ করি কেন? শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন একবার হলেই ত হয়েছে।

মা অন্তরের অনুভূতির ধন; রোগে, শোকে, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে মার স্পর্শ সদাই অনুভব করি, করুণারূপিণী স্নেহক্রোড়ে ধারণ করে রয়েছেন। সেত বারে বারেই অনুভব করেছি, তারই দু একটি কথা দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব।

মা বেশী কিছু নিয়মে বাঁধেননি। শুধু দুটি কথা —"অনিবেদিত বস্তু খেও না ও শ্রাদ্ধান্ন খেও না।" আমরা দুই জায়ে প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত মায়ের কথাগুলি পালন করতে চেষ্টা করতুম। নিজের পিতৃশ্রাদ্ধেও সারাদিন উপবাসী থেকে রাত্রে বাড়ী এসে খেতুম। লোকে কত কিছু মন্তব্য প্রকাশ করত। পরে যখন 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রকাশিত হল, তাতে দেখি কৃপাময়ী মা জনৈক ভক্তকে বলছেন, "তা তোমরা সংসারী লোক, নিজের বাড়ীতে হলে আর কি করবে? প্রসাদ খেও।" তখন আমরা বলাবলি করি মা'ত আমাদের এরকম বলেন নি।

মা নিজে শ্রীমুখে বলেছেন, 'হ্যাঁ মা, আশ্রয় দিলুম বৈকি।" এ আশ্বাসের মর্ম বহুবার অনুভব করেছি অন্তরে। মায়ের কথায় দেখি, মা যেমন করে বাসনা হতে রাধুকে রক্ষা করতেন, ঠিক তেমন করেই আমাদেরও রক্ষা করেন।

রামনাদের রাজা কোষাগার খুলে দিতে চাইলে রাধু যেমন একটি পেন্সিল ভিন্ন কিছু চায়নি, সেই-রকম আমার লক্ষপতি পিতা একবার মার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমায় যখন বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা নাও" সেই সময় দুচার হাজার টাকার জিনিষ কিনলেও কোন ক্ষতি হত না, তখনি মনে হল, মা নির্বাসনা হতে বলেছিলেন। আমার চোখের উপর মাতৃমূর্তি ভেসে উঠল, বলে ফেললুম, "কিছুই চাই না বাবা, সবই ত আছে, মিছামিছি এই লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা অবধি বোঝা বাড়বে।" আমি বাড়ী এসে সকলের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলুম, এমন সুযোগ হারিয়েছি বলে। কিন্তু তারা ত জানে না, আমার প্রাণে বসে কে আমায় কিছু কিনতে দেননি। নীরবে আমি কৃপাময়ী মাকে স্মরণ করেছিলাম।

আরও একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করি মায়ের অপার কৃপা স্মরণ করে। যখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কৃপা করে আশ্রয় দিলেন, তখন থেকে কেবলই মনে হ'ত, কবে মা কৃপা করে আমার স্বামীর মতিগতি ঐ পথে নিয়ে যাবেন। মার কাছে নিয়ত সেই প্রার্থনা জানাতুম। আরও মনে হ'ত এই কারণে যে, বাড়ীর অনেকে একে একে কেউ বা পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে, কেউ বা তখনকার মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে। একবার যখন একটি দেবরের ও তার বধূর দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে মহাপুরুষজীর কাছে, তখন আমার স্বামী কার্যোপলক্ষে রয়েছেন সুদূর বিলাসপুরে। দীক্ষার আগের দিন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, "মা করুণাময়ী, করুণা করে ওঁর মতিগতি এই দিকে করে দাও মা।" তখন মা বহুদিন লীলা-সংবরণ করেছেন। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় স্বামী বিলাসপুর হতে এসে পড়লেন। পরের দিন তিনি নিয়মিত প্রাতরাশের পর আমার অনুরোধে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর দীক্ষা দেখতে আমাদের সঙ্গে মঠে গেলেন। তাদের দীক্ষা নিতে যাবার সময় আমি কাতরে মাকে আমার আবেদন জানাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আমার স্বামী এসে জানালেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকেও কৃপা করতে চেয়েছেন। অস্নাত, তার উপর খেয়েও এসেছেন বলে তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বল্লুম, "তা হোক্, কৃপালাভের কালাকাল নেই, এখনই দীক্ষা নাও।" এইভাবে মহাপুরুষজীর কৃপা লাভ করে রাত্রের গাড়ীতেই কর্মস্থলে চলে গেলেন। আমি বিস্ময়ে জননীর অপার কৃপা স্মরণ করতে লাগলুম।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমরা আর একদিন মঠে গিয়েছি, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে আমার স্বামীর অন্তর অত্যন্ত বিচলিত। আমরা প্রণাম করে মাথা তুলতেই শিবপ্রতিম আশুতোষ মহাপুরুষ মহারাজ বলে উঠলেন, "তোর কি চাই? বল্ কি চাই?" তখন যেন বরাভয়কর হয়ে চতুর্বর্গ-প্রদানে উদ্যত! আমার প্রাণে ভেসে উঠল ঠাকুরের সেই কথা, "রাজার সঙ্গে দেখা হ'লে কি লাউ-কুমড়ো চাইবে?" আর মা বলেছেন, "নির্বাসনা।" তখনও মহাপুরুষজী উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখ পানে চেয়ে আছেন; মা বললেন, "ঠাকুরের পায়ে যেন রতিমতি হয় মহারাজ, আর কিছু চাই না।" মহারাজ অত্যন্ত খুসী হয়ে বললেন, "হবে, হবে,—তোদের হবে।"

এই যে সাক্ষাৎ শিবের কৃপা হজম করা, একি মায়ের আশ্রয় না পেলে হ'ত? আশ্রয় দিয়েছেন বলেই, মা নিজ শ্রীমুখে স্বীকার করেছেন বলেই, এই রকম ক'রে সব সময় নিজের সন্তানকে

রক্ষা করেন। তখন কিছু চেয়ে ফেললেই কত যে বাসনার জালে জড়িয়ে পড়তে হত তা কে জানে?

আর একবার পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ—তখন তিনি মঠ ও মিশনের সভাপতি—আমার দেবরের শালগোলাস্থিত বাসাবাড়ীতে কৃপা করে ইং ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁর সারগাছির আশ্রম থেকে এসে সে রাত্রি আমাদের কাছে রইলেন। অল্পপরিসর স্থান, মাত্র তিনটি ঘর। পূজনীয় মহারাজ পাশের ঘরেই, মধ্যে দরজা, ভোরবেলা দরজা খুলে গিয়ে প্রণাম করতেই রহস্য করে বল্লেন, "তোমাদের বাড়ী এক বছর রয়েছি।" বিস্মিত আমি, বলে উঠলুম, "সেকি মহারাজ!" তিনি হেসে বল্লেন, "'৩৪ সালে এলুম, আজ ৩৫ সাল। এক বছর হোলো না?" আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

প্রভাতে বাগানে ইজিচেয়ার পেতে সদানন্দ শিশুপ্রকৃতি মহারাজ আমাদের নিয়ে নানা গল্প করছেন, আমরাও তাঁর শিশু-প্রকৃতিতে নিঃসঙ্কোচ। অন্তরে বাইরে কোনও অর্গল নেই। বলে বসেছি, "মহারাজ, ১লা জানুয়ারী আজ; আজকের দিনে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন; আপনিও আজ আমাদের কল্পতরু হোন।" তখনই বালকসুলভ ভাব ছেড়ে গম্ভীর হয়ে মহারাজ বললেন, "বল, তোমার কি চাই।" অমনি করুণাময়ী জননীর পুণ্যবাণী জেগে উঠল, "নির্বাসনা, নির্বাসনা।" তখন জননীই মুখে বলিয়ে দিলেন, "মহারাজ, আর কিছু নয়, আমি গরম গরম খাবার করে দেব, আর আপনি আমার কাছে বসে খাবেন।" মহারাজের রূপ যেন বদলে গেল; বলে উঠলেন, "বেশ তাই চলো; তুমি যা দেবে তাই খাব।" আমি আনন্দে আত্মহারা—জননী আমায় রক্ষা করেছেন। আর পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজও শিশুসুলভ প্রকৃতিতে বসে বসে গরম খাবার খেয়ে আমার প্রাণের সেবা নিয়ে আমায় ধন্য করেছেন।

সংসারে আমরা পুত্রহীন; অভাব-অনটন ত আছেই। বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত স্বামী, তবুও মায়ের কৃপায় বেশ দিন চলে যায়। মায়ের একখানি প্রতিকৃতি রান্নাভাঁড়ারের কাছে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে প্রতিদিন এই বলে প্রণাম করি, "মা, অন্নপূর্ণারূপে এইখানে বসে থাক, তোমার ঘরে যেন খাবার কষ্ট না পায় কেউ।" তা মা ঠিক সকলকে তৃপ্ত করে খাইয়ে দেন, কোথা হতে কি হয় আমি জানি না। আর দিনে দিনে মায়ের অপূর্ব লীলার প্রসার দেখে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে থাকি। জানি না কবে মার কাজ মা শেষ করিয়ে চরণে টেনে নেবেন। সেই প্রতীক্ষায় গুনে গুনে দিন কাটাচ্ছি।

শ্রীশ্রীসারদালক্ষ্মীর পাঁচালী

শ্রীমতী সুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ্রী

জয় মা সারদাদেবী লক্ষ্মীস্বরূপিণী
ধর্ম অর্থ সিদ্ধি আর মুক্তি-প্রদায়িনী।
সর্বগুণাধারা মাতা আসি অবনীতে
সর্বভাবে পালিতেছ না পারি বর্ণিতে।
গৃহলক্ষ্মী-রূপে যে মা তুমি আছ ঘরে
সে কথা বিশেষ করি না ভাবি অন্তরে।
এবার জেনেছি হৃদে তুমি লক্ষ্মী মাতা
অন্নবস্ত্র যাহা কিছু সকলের দাতা।

তোমার মহিমা কিছু বুঝেছি যখন
সে কথা জানাতে সবে করিব কীর্তন।
চিন্তিয়া দারিদ্র্য-কথা গরীব ব্রাহ্মণ
আপন কুটিরে যবে করেন শয়ন।
নিশীথে বালিকা-রূপে স্বপনেতে আসি
ধরেন জড়ায়ে তাঁরে মৃদু মন্দ হাসি।
অলঙ্কার-বিভূষিতা কন্যা লক্ষ্মীরূপা
হেরিয়া ব্রাহ্মণ মনে জানে তব কৃপা।

ধনে ধানে ভরপুর সারা গ্রাম খানা
চাল কোটে গুড় কেনে পিঠে করে নানা।
শীতের নূতন গন্ধে ভাসে চারিধার
আঙ্গিনা লেপিয়া রাখে অতি চমৎকার।
এ হেন সৌন্দর্যে যবে ঘেরে গৃহখানি
তমসার বেশ ধরি সাজে সন্ধ্যারানী।
বধূগণে দীপ জ্বালি লয়ে যায় চলে
প্রণাম করিছে গিয়া তুলসীর মূলে।
বৃহস্পতিবার দিনে শুভক্ষণ সাঁঝে
রামচন্দ্র-গৃহে উলু শঙ্খধ্বনি বাজে।
দিন-অবসান যবে সন্ধ্যার কালে
ভুবনমোহিনী রূপ শোভে শ্যামা-কোলে।
আনন্দে ভকতি-ভরে গদগদ চিতে
রামচন্দ্র কন্যা হেরি বলেন মুখেতে।
কে এলে মা ধন্য করি মোর গৃহতল
মুখ হেরি পুলকিত হৃদয়কমল।
ব্রাহ্মণ না জানে মনে তার এই সুতা
এক কালে হবে যে গো জগতের মাতা।
মুখেতে সুমিষ্ট কথা সদা করি দান
ব্যথিত ও তৃষিতের ভরি দিলে প্রাণ।
সন্তানের হৃদে মধু ঢালিয়াছে যত
দেহমন মধুময় হইয়াছে তত।
লজ্জায় আবৃত তনু ও মুখমণ্ডল
ভক্ত তরে সদা খোলা চরণকমল।
দরশন করিলে মা তোমার বদন
পবিত্র ভাবেতে হৃদি হয় যে মগন।
সন্তানেরে খাওয়াইতে পাড়াতে যাইয়া
এনেছ পশরা বহি মাথায় করিয়া।
এহেন মায়ের স্নেহ নাহি ধরাতলে
স্নেহের পাথার তুমি ভকতেরা বলে।
লক্ষ্মীরূপা তুমি মাগো নিপুণা হইয়া
সাজিয়াছ কত পান নিজ হাত দিয়া।
লক্ষ্মীজ্ঞানে মনে ভাবি আমি অনুক্ষণ
পূজিতে বাসনা বড় ও রাঙ্গা চরণ।

যেই বৃহস্পতি দিনে ও পদ বাড়ালে
সেই দিন দিব পুষ্প চরণ-কমলে।
তুমি যদি কৃপা করি লও মোর পূজা
তবে ত পূজিব আমি ওগো দশভুজা।
নাহি কোন চপলতা স্বভাবে তোমার
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তুমি নমি বারেবার।
তুমি সতী বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি জগন্মাতা
নারায়ণী তুমি মাগো অযোধ্যার সীতা।
কাশীধামে অন্নপূর্ণা কালী কালীঘাটে
রয়েছ সতত মাগো ঘটে আর পটে।
দেশব্যাপী জুড়িয়াছে মহা হাহাকার
লও মাগো সকলের অন্নবস্ত্রভার।
উদর জ্বলিয়া যদি করে হায় হায়
ধর্মের বারতা সেথা কভু নাহি যায়।
লক্ষ্মীদেবী পূজিবারে নাহি বেশী মন
সংসার দহিছে তাই প্রতি ক্ষণে ক্ষণ।
তুমি না বোঝালে মাতা কে বোঝাতে পারে
মায়াতে বেঁধেছ আঁখি অজ্ঞান-আঁধারে।
সংসারপালন আর অতিথির সেবা
ক্ষুধার্তেরে খেতে নাহি দেয় অন্ন যেবা।
লক্ষ্মীশ্রী নাহি রহে সেই গৃহে তার—
লক্ষ্মী দেবী ছাড়ি যান হইয়া বেজার।
দরিদ্রেরে দিতে গিয়া দেই নারায়ণে
নাহি বুঝি এই সত্য আঁখির বাঁধনে।
লক্ষ্মীর কৃপাতে রহে লক্ষ্মীশ্রী ভরা
যেই পূজা করে সেই মনে জানে তারা।
এ যুগের লক্ষ্মী যিনি তারে নাহি জানি
আজিকে হৃদয়মাঝে জাগিছেন তিনি।
সারদালক্ষ্মী-পূজা যদি হয় ঘরে ঘরে
অশান্তি ও দুঃখকষ্ট না ঘেরে তাহারে।
এ ক্ষুদ্র অন্তরে মম যা হয় বিশ্বাস
সকলেরে তাই দিয়া করিব আশ্বাস।
যুগগুরু যুগলক্ষ্মী তুমি মা সারদা
তোমার যুগলপদে নমি গো সর্বদা ॥

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী করুণা মুখোপাধ্যায়, বি-এ

৺ষোড়শীপূজা সম্পন্ন করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। মাত্র ইহাই বলিতে পারা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম প্লাবনে আমাদের দেশ যখন ভাসিতেছিল, মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়া ভোগবাদ ও জড়বাদে একেবারে ডুবিয়া যাইতেছিল, চারিদিক তমসাচ্ছন্ন, স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি লইয়া সবেমাত্র প্রশ্ন উঠিতেছে, তখন আবির্ভাব হইল এমন এক আদর্শ নারীর, যিনি সর্বকালে সর্বদেশে আদর্শস্থানীয়া। তিনি হইলেন শ্রীসারদা দেবী—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী এবং পরবর্তী জীবনে 'শ্রীশ্রীমা' নামে পরিচিতা।

শ্রীসারদা দেবীর জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষা, আভিজাত্য, সাংসারিক বিভব না থাকিলেও একজন একান্ত লজ্জাশীলা পল্লীরমণীর ভিতর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হইতে পারে যাহা ভারতের নারীজাতির নিকট এক অভূতপূর্ব মহান আদর্শ।

তাঁহার জীবনে আমরা এমন কতকগুলি গুণের সমন্বয় দেখিতে পাই যাহা সর্বযুগের অতিবিশিষ্ট নারীচরিত্রেও পাওয়া যায় না। তাঁহার সহজ সরল মধুর অথচ গভীর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ জীবন আলোচনা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। কোমল ও কঠোর এই দুই ভাবের সমন্বয় তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যাহাকে শিক্ষা বলিয়া থাকি, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু অশিক্ষিতা, গ্রাম্য মেয়ে হইলেও তাঁহার সহজ সরল প্রখর বুদ্ধির কাছে আধুনিক যুগের শিক্ষিতা নারী অতি সহজেই পরাভব স্বীকার করিবে।

দরিদ্র পিতামাতার গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছিল তাঁহাকে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অর্থের প্রতি লোভ দেখা যায় নাই।

শৈশবে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত শ্রীশ্রীমার বিবাহ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়স তখন ২৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তখনকার সমাজে এইরূপ বিবাহ কোন অভাবনীয় ঘটনা নহে।

শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজীবন-সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শ্রীসারদা দেবী এমন জ্ঞান লাভ করিলেন, যাহার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকজ্ঞানে তাঁহাকে নিজে পূজা করিয়া ও নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি দান করিয়া সমাধিমগ্না দেবী সারদার পদে প্রণিপাত করিলেন। অনন্ত আধার হইতে অনন্ত শক্তি সংক্রমিত হইলে আধারের কোনই হ্রাস হয় না। অথচ সংক্রমিত পাত্রের যোগ্যতা না থাকিলেও শক্তিদান বা গ্রহণ অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ যতকাল স্থূল শরীরে ভক্তগণ-মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন ততকাল শ্রীসারদাদেবীর দিব্য জীবনের প্রকাশ অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে সেই শক্তির আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই মহাশক্তির কল্পনা করিতে মানুষ ততদিনই অসমর্থ থাকে, যতদিন সর্বশক্তিময়ী মহামায়া মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না করিয়া দেন।

বিবাহের পর পুনরায় যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ করিলেন তখন তাঁহার বয়স চতুর্দশ বৎসর। সেই বিকাশোন্মুখ যৌবনের স্মৃতি উত্তরকালে তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই স্থির ধীর দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।" সাধারণ মানবের মন যে বয়সে ভোগরাজ্যে স্বভাবতঃ ডুবিয়া থাকে, সেই সময় তিনি কিন্তু অমৃতের

আস্বাদনই করিতেছিলেন। আবার যখন তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিলেন তখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। এখন হইতেই তাঁহাদের দৈবী লীলা প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইল। একজন জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, অপরে তাহাই আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইভাবে চলিল অপূর্ব লীলা।

চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যে পবিত্রতাই হইতেছে আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। শ্রীশ্রীমা ছিলেন পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এইরূপ সহধর্মিণী লাভ না করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবন অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং একথা স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার চরিত্র ছিল এক অদ্ভুত উপাদানে গঠিত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন সাধারণ নারীর ন্যায় সংসার-জীবন যাপন করিবার জন্য নহে। পরন্তু ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণীরূপে। তাঁহার জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক, বিন্দুমাত্র ত্রুটি তাঁহার চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা। সকল দিক হইতে তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয়। তাঁহার জীবন হয়ত বিরাটকর্মবহুল ছিল না, কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি দৈনন্দিন ঘটনা অতিশয় শিক্ষণীয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের চক্ষে তাঁহার কোন বাহিরের আড়ম্বর পরিলক্ষিত হইত না, কিন্তু অন্তরে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি সদাই ভরপুর থাকিতেন।

শ্রীশ্রীমাকে বহু বিপদ ও বিপত্তির মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্না ও অনন্ত-আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়সী শ্রীশ্রীমা সেই সকল বিপদ অতি সহজেই অতিক্রম করিয়াছেন। 'ডাকাত বাবার' কাহিনীতে তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি ও নম্র বিনয়-ব্যবহার প্রকাশ পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীমা তাঁহার কর্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। পতিসেবা, গুরুজনের যথোচিত যত্ন লওয়া, ভক্তমণ্ডলীর ও অতিথিদিগের পরিচর্যা প্রভৃতি কোন কাজেই তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি বা বিরক্তিবোধ করিতে দেখা যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে নহবতখানার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দিনের পর দিন তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে কষ্টের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের জননীরূপে তিনি সকলের জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করিতেন, হাসিমুখে কত ক্লেশ সহ্য করিতেন!

মাতৃত্বই ভারতীয় নারী-জীবনের চরম আদর্শ এবং শ্রীশ্রীমা ছিলেন এই আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ সকলের কাছেই তিনি ছিলেন স্নেহময়ী জননী 'শ্রীশ্রীমা'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মাতৃশক্তির বাহ্যবিকাশ ত্রিতাপদগ্ধ মানবের নিকট অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, সম্পদে বিপদে তিনি মানবের চিরশান্তিদায়িনী মাতৃমূর্তিতেই বিরাজিতা ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আগমন নারীসমাজে এক নব যুগের সূচনা করিয়াছে। তাঁহার জীবনে প্রাচীন নারীগণের আদর্শই যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ভাবী নারীসমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা এক স্থানে বলিয়াছেন—'ভারতীয় নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের 'শেষ-কথা' এবং 'শ্রীশ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও নূতনের সার্থক সূচনা।'

বর্তমান এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনই নারীজাতিকে একমাত্র কল্যাণকর নূতন পথ দেখাইতে পারে।

সারদা-সঙ্গীত

কথা—স্বামী চণ্ডিকানন্দ ;   সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, সঙ্গীতবিশারদ

দরবারী কানাড়া—তেওড়া

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেম-সুরধুনী করুণারূপিণী মা আমার।
আসিলে ধরায় ধরি নর-কায় জুড়াতে তাপিত হিয়া সবার॥
নিত্য শুদ্ধ চিন্ময় কায় শ্রীরামকৃষ্ণ অরুণিমা তায়।
অরূপ উথলে ও রূপ-আভায় পরাণ মাতায় জগজ্জনার॥
নিত্য নন্দিতা নিখিল-বন্দিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিতা।
গুণাতীতা তুমি গুণময়ী দেবী তুমি মাতা পুন তুমি পিতা॥
সাধু-সজ্জন-জননী তুমি মা অসাধু দুর্জনও সুত তোমার।
বহে নিরন্তর অন্তহীন ধার তব করুণাধার॥

+ ২ ৩ + ২ ৩

II ণ্‌া রা সা | দ্‌া দ্‌া | ণ্‌া া I সা সা সা | রা া | রা রা
শ্রী রা ম | কৃ ষ্‌ | ণ 0 | প্রে ম সু | র 0 | ধু নী

সা রসা রা | মজ্ঞা া | মজ্ঞা মা I রা া জ্ঞা | সা া | া সা I
ক রু0 ণা | রূ 0 | পি ণী | মা 0 আ | মা 0 | 0 র

সা রা মজ্ঞা | মজ্ঞা া | মজ্ঞা মা I মা পা পা | পা া | পা পা I
আ সি লে | ধ 0 | রা য় | ধ রি ন | র 0 | কা য়

দ্‌া দ্‌া দ্‌া | ণ্‌া া | সা সা I রা রা জ্ঞা | সা া | া সা II
জু ড়া তে | তা 0 | পি ত | হি য়া স | বা 0 | 0 র

II মা া পা | দা া | ণদা ণা I সা সা সা | সা া | সা সা I
নি 0 ত্য | শু 0 | দ্ধ 0 | চি ন্‌ ম | য় 0 | কা য়

দা রা রা | রা জ্ঞা | সা া I দা দা দা | ণা া | পা পা I
শ্রী রা ম | কৃ ষ্‌ | ণ 0 | অ রু ণি | মা 0 | তা য়

পা জ্ঞা জ্ঞা | জ্ঞা া | জ্ঞা মা I রা রা রা | জ্ঞা া | সা সা I
অ রূ প | উ 0 | থ লে | ও রূ প | আ 0 | ভা য়

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা | মা া | পা পা I রা রা রা | জ্ঞা া | সা সা II
প রা ণ | মা 0 | তা য় | জ গ জ | না 0 | 0 র

\+ ২ ৩ + ২ ৩

II সা । রা মা মা পা পা I দা দা দা ণা ণা পা পা I

নি ০ ত্য ন ন্ দি তা নি খি ল ব ন্ দি তা

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা মা পা । I রা রা রা জ্ঞা । সা । I

শ্রী রা ম কৃ ষ্ ণ ০ আ রা ধি তা ০ ০ ০

ণ্‌া রা সা দ্‌া । ণ্‌া প্‌া I ম্‌া প্‌া দ্‌া রা । সা সা I

গু ণা তী তা ০ তু মি গু ণ ম য়ী ০ দে বী

রা রা রা মজ্ঞা । জ্ঞা মা I রা রা রা জ্ঞা । সা । II

তু মি মা তা ০ পু ন তু মি পি তা ০ ০ ০

/ / / / /

II মা । পা দদা দা দদা ণা I সা সা সা সা সা সা । I

সা ০ ধু স জ্ জ ন জ ন নী তু মি মা ০

/ / / / / /

দা রা রা রা রা সা সা I দা দা দা ণা । পা পা I

অ সা ধু দু র্ জ ন সু ত তো মা ০ ০ র

/ / / / / / / / / / / / /

পা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা I রা রা রা রা জ্ঞা সা সা

ব হে নি র ন্ ত র অ ন্ ত হী ন ধা র

I মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা মা পা । I রা রা রা জ্ঞা । সা সা II II

ত ব অ ন ন ত ০ ক রু ণা ধা ০ । র

সাধনায় শ্রীগুরুতত্ত্বের স্থান

শ্রীকালিদাস মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেহ কেহ বহুগুরু করার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে শিক্ষক বা সাহায্যকারী অনেকে হইতে পারেন, কিন্তু গুরু হন একজনই। দীক্ষাদান আধ্যাত্মিক নবজন্ম-দান। জন্মদাতা পিতা এক-জনই হন, পিতৃব্য দ্বাদশজন থাকিতে পারেন। সতীর পতি একজনই থাকে, ব্যভিচারিণী বহুপতি করিয়া থাকে। ব্যভিচার ভাল হইতে পারে না। পুরোহিত আত্মীয় নহেন, ধর্মকার্যের সহায়ক প্রতিনিধি। এজন্য প্রয়োজনবোধে বা ঘটনাচক্রে তাঁহার পরিবর্তন চলে, কিন্তু গুরুপরিবর্তনের চেষ্টা পিতৃপরিবর্তনের চেষ্টার ন্যায় হাস্যকর অথবা দ্বিচারিণী হওয়ার ন্যায় অশুভ এবং অপকৃষ্ট।

কোন কোন লোককে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি, 'আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন; আর কাহার নিকট উপদেশ লইব?' একথাটি গুরুকে জীবকল্পনা করার কুফল এবং ভ্রমাত্মক। ঈশ্বরই গুরু, এজন্য গুরুর মৃত্যু নাই। যদি উপদেশলাভের জন্য ঐকান্তিক আকুলতা থাকে, তাহা হইলে

গুরুরূপী ঈশ্বর গুরুর দেহত্যাগের পরেও সাধকের প্রয়োজনানুসারে অপর কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মুখ দিয়া আবশ্যকমত উপদেশ দেন। যদি শিষ্যের অন্তর্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেই উপদেশ তাঁহাকেই ঈশ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর স্বপ্নে ও রূপক-সাহায্যেও উপদেশ দেন। শেষোক্ত উপদেশের দৃষ্টান্ত লালাবাবুর জীবনীতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর মানব-দেহধারী গুরুরূপে কেন উপদেশ দেন? একেবারে দিব্যমূর্তিতে আসিলেই ত পারেন। ইহার উত্তর এই যে, তাঁহার দৈবীমূর্তি-দর্শন হইলেই জীব উদ্ধার পাইয়া যায় এবং সাধনার ফল লাভ করে। এরূপ করিলে সাধনার প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু বিনা সাধনায় ঈশ্বরের প্রীতিলাভ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে জীবন-নাট্যের একটি বিশেষ অংশ বাদ পড়িয়া যায়, কর্মসঙ্কোচে ঐশ্বরিক লীলারও সঙ্কোচ হয়। এখানে কথা এই—First deserve, then desire. স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

গুরূপদেশ শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে প্রতিপালন করার চেষ্টা করা উচিত। পাটোয়ারী বুদ্ধি লইয়া ঈশ্বরকৃপা লাভ করা যায় না। ফলাফল হিসাব করিয়া সাধনায় অল্পাধিক মতি ন্যস্ত করিলে সাফল্য-লাভ হইবে না। এই পাটোয়ারী বা বিষয়বুদ্ধিকে common sense view বলা যায়; উহা common বা সাধারণ ব্যাপারেই প্রযোজ্য, ঈশ্বর-প্রীতিলাভ-রূপ অসাধারণ ব্যাপারে প্রযোজ্য নহে। সাধনমার্গে গুরু ও ইষ্টের প্রতি শিশু-সুলভ সরলতা ও বিশ্বাস অপরিহার্য; এখানে তর্ক চলে না। যীশু বলিয়াছেন, "Verily I say unto you, except ye become as little children, ye shall not enter into the kingdom of Heaven" (St. Matthew, 18). সরলমতি সাধকের প্রতি ঈশ্বর অধিক দয়াশীল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত জটিলের উপাখ্যান প্রণিধানযোগ্য। শিশু জটিল তাহার গুরুকল্প মাতার বাক্যে সরল ও অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে প্রকার ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার বহিরঙ্গধর্মাচারী এবং অন্তরে অবিশ্বাসী প্রাকৃত জনের প্রতীক (type of the common man) শিক্ষক পান নাই। ঠাকুর বলিয়াছেন, চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভগবান যীশুও বলিয়াছেন, বিশ্বাসের অসাধ্য কিছু নাই, বিশ্বাসই সাধনের সর্বস্ব। লোক-বিশ্রুত ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান এবং একলব্যের শস্ত্রসাধনা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মহাত্মা তুলসীদাসের চন্দনাদি লইয়া দিনের পর দিন অপেক্ষা—সরল বিশ্বাসের আর একটি দৃষ্টান্ত। গুরুর বাহ্যতঃ অসঙ্গত ও অদ্ভুত আদেশও নির্বিচারে পালিত হইলে তাহা কিরূপ সুফলপ্রসূ হয়, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত উদ্দালক ও আরুণির উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যতঃ অযৌক্তিক হইলেও গুরুর আদেশের শুভ-পরিণামশীলতা আছে। কোন যোগী গুরু তাঁহার এক শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র না দিয়া নাসারন্ধ্রে মন্ত্র দিয়াছিলেন। শিষ্য এইরূপ অদ্ভুত আচরণে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই। সম্মুখদ্বার বন্ধ করিয়া পার্শ্বদ্বার শিষ্যকে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খিড়কিদ্বার বা পার্শ্বদ্বার দিয়া কি পিতৃগৃহে (ইষ্ট-সন্নিধানে) যাওয়া যায় না? গন্তব্যে পৌছান লইয়াই কথা।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, সাধনপ্রণালী বা দীক্ষা-প্রণালীর মধ্যে এত বৈচিত্র্য কেন? পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে আধ্যাত্মিক বিবর্তনে মনুষ্যের বিভিন্ন আধার গড়িয়া উঠে। আধার অর্থে শক্তি ও উপযোগিতা। আধারের সহিত বিশিষ্ট রুচিও জড়িত থাকে। এতদ্ব্যতীত লীলাময় পালনকর্তার রুচিও

বিচিত্র। এসকল কারণে দীক্ষাপ্রণালী, সাধনমার্গ এবং গুরূপদেশও বহুবিধ হয়। সাধনা এই কারণেই ব্যক্তিগত, কোন সর্বজনীন নিয়মের অধীন নহে।

পূর্বে গুরুবাক্য নির্বিচারে পালনীয় বলা হইয়াছে। ইহাতে সমাজতত্ত্বের দিক হইতে আপত্তি হইতে পারে। এই পাপপূর্ণ কলিযুগে অসৎ, অজিতেন্দ্রিয়, প্রবঞ্চক, নীচাশয়, লোভী প্রভৃতি ব্যক্তির অভাব নাই। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কেহ কেহ গুরুগিরি করিলে সমাজে দুর্নীতির দৃষ্টান্ত দেখা দিতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এরূপস্থলে শিষ্যের কর্তব্য কি?

শিষ্য দুই শ্রেণীর আছে: (ক) পাপক্ষয়, ধর্ম, পুণ্য, পার্থিব শক্তিসম্পদ, যোগবিভূতি প্রভৃতি অর্জন, স্বর্গাদি-লাভ—এক কথায় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু লাভের আশায় যাহারা দীক্ষা-গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রয়োজনবাদী, (খ) যাঁহারা ঈশ্বর, আত্মজ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট-বর্গলাভেচ্ছু তাঁহারা অপ্রয়োজনবাদী। এই উৎকৃষ্টবর্গের উপাসকদিগের সাধারণতঃ অসদ্‌গুরু-সংযোগ হয় না, কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ এবং 'জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্ম ভস্মসাৎ করে'—এই নিয়মানুসারে ইঁহার সাধক-অবস্থাতেও কখনই পূর্ণ কর্মফল ভোগ করেন না। এসম্বন্ধে প্রমাণ আছে: (১) শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল্ সেঁধুতো, সেখানে ছুঁচ ফুটবে।" (২) জ্যোতিষিক অভিজ্ঞতায় জানা যায়, মুমুক্ষু বা ঈশ্বরলাভেচ্ছু ব্যক্তি মারকগ্রহের দশাভোগ-কালেও সামান্য সর্দিজ্বর প্রভৃতি ব্যতীত গুরুতর কষ্ট কিছু পান না; একটি অদৃশ্য সাধন-সঞ্জাত কবচকুণ্ডলের শক্তির দ্বারা সর্বদা রক্ষিত হন। এই শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষেই নির্বিচারে গুরুবাক্যপালন বিহিত। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রয়োজন-বাদী সকাম সাধকগণ যদিও 'ঈশ্বরের নাম' করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা নিষ্কামভাবে নহে, প্রেমভরে নহে, পরন্তু স্বার্থের জন্য। ইঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বের সাধক নহেন, পরন্তু অনীশ্বরতত্ত্বের বা অবস্তুর সাধক—এজন্য ইঁহারা কর্মফলের যথেষ্ট অধীন। ভিক্ষুক সারাদিন ঈশ্বরের নাম করিয়া পয়সা ভিক্ষা করে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য ঘোচে কই? সুতরাং অবস্তুর উপাসকদের মধ্যে কাহারও কাহারও দুর্ভাগ্যক্রমে অসদ্‌গুরুর সংযোগ হইতে পারে। সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইঁহাদের পক্ষে অসদ্-গুরুর সন্নিধি পরিত্যাগ করা সমর্থনযোগ্য, কিন্তু ইঁহারা দীক্ষামন্ত্র (বৈরিমন্ত্র না হইলে) ত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং নূতন দীক্ষাদাতা গুরুও করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ—"অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য তুমি গুরু করতে পারো, কিন্তু দীক্ষাগুরু আর করতে নেই।" ফলে ইঁহারা দীক্ষা-দাতা গুরুর সাহচর্য বা সংশ্রব বর্জন করিয়া শুধু স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারেন; তাহা ঐকান্তিকতা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলেই সফল হইতে পারে। গুরু-সন্নিধি এবং গুরূপদেশ ব্যতীতও সাধনায় ফললাভের দৃষ্টান্ত একলব্যের শস্ত্রসাধনা। তবে একলব্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে বিনা দীক্ষায় বা দীক্ষা-মন্ত্র বিসর্জন দিয়া কেহ ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন এরূপ নহে; কারণ শস্ত্রসাধনা ও ঐশ্বরিক সাধনায় কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও বিস্তর আছে, এই দুইটি বিষয় সর্বাংশে সমান নহে। ইষ্টমন্ত্রজপ বিনা নিয়মে এবং গুরূপদেশ ব্যতীতও সিদ্ধ হইতে পারে। তবে যাঁহারা অন্য কোন বিশেষ প্রকারের কাম্য জপ, ধ্যান, ক্রিয়া বা যোগ প্রভৃতি করেন—যাহাতে বিশেষজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক—তাঁহারা উপযুক্ত সাধক বা সিদ্ধের নিকট উপদেশ লইয়া স্বকার্য-সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। তাহাতে কোন বাধা নাই, কারণ, 'আতুরে নিয়মো নাস্তি।'

মহাপুরুষ মহারাজের স্মরণে

[আগামী ১৬ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) পুণ্য জন্মতিথি। সময়োপযোগী স্মরণার্ঘ্যরূপে নিম্নের এই অনুধ্যান, প্রসঙ্গ এবং পত্রদ্বয় প্রকাশ করা হইল।—উঃ সঃ]

(এক)

অনুধ্যান

শ্রীশরদিন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্‌-এ

বহুবৎসর পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে শত শত শিষ্য-ভক্তের দীক্ষা-গুরুরূপে প্রাণে প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করেছেন; রোগ-শয্যায় উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় তিনি সেবকদিগকে বলতেন তাঁকে চতুষ্পার্শ্বে ফিরিয়ে বসাতে, আর দশদিকে কাতরভাবে চেয়ে তাঁকে শোনা যেত প্রার্থনা করতে—"মা, যে যেখানে আছে তাদের কল্যাণ কর, মা!"

* * *

পিতামাতার স্নেহের পুতুল হলেও তাঁর শৈশব কেটেছে ছাড়া-ছাড়া ভাবে। তাঁর বাপ-মা একই বাড়ীতে তাঁরই সঙ্গে স্থানীয় স্কুলের ২৫।২৬ জন ছাত্রকে প্রতিবৎসর লালনপালন করতেন। তারকনাথ আদরযত্নে ছিলেন তাদেরই অন্যতম, তদধিক স্নেহের অংশ তিনি দেখেন নি। ফলতঃ আশৈশব তাঁর পরিবেশ, পরিবেষ্টন ও শিক্ষাধারা তাঁকে ভাবী সন্ন্যাস-জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছিল। বিদেশে চাকরিগ্রহণ, বিবাহ, কলকাতায় চাকরি, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব, ভিতরের অশান্তি, সমাধিলাভের অমোঘ সন্ধান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শনেই তাঁর মুখে স্বতঃস্ফূর্ত সমাধির নানাবিধ বর্ণনাশ্রবণ—এই সবই তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের এক একটি গৌরবময় পৃষ্ঠা।

* * *

তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ৫।৬ বৎসরকাল মেলা-মেশার অবকাশ পেয়েছিলেন। স্বামীজী যখন বরাহনগর, আলমবাজার ও বেলুড়ের ভাড়াটিয়া বাটীতে ক্রমান্বয়ে ঠাকুরের নির্দিষ্ট সঙ্ঘরচনায় ব্রতী হলেন তখন মঠরক্ষণাবেক্ষণে প্রথম কর্ণধার হয়েছিলেন 'তারকদা'। তিনি বহুবার নিঃসম্বল ও ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরশীল হ'য়ে আহিমাচল কুমারিকা পর্যন্ত পরিব্রজ্যা ক'রেছেন, ধ্যাননেত্রে অধোদৃষ্টিতে পথ চলতে চলতে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সামনে দেখেও দেখতে পান নাই, সেজন্য তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রেছেন, শাস্ত্রজ্ঞানের বড়াই না করে তিনি ভাগবত জীবন যাপন করেছেন, স্বপাক একাহারে তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছেন, মঠের মধ্যে খুঁটিনাটি কাজগুলি তরুণ-বৃদ্ধ-ভেদ ভুলে দিনের পর দিন অকাতরে করে গেছেন, রোগ-সেবায় মাতৃস্নেহ-পারাবার ঢেলে দিয়েছেন, অথচ এত গম্ভীর তাঁর মুখশ্রী যে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ার সাহস কারও হত না। তিনি নিজ হাতে নবাগত সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারীদের জন্য পাক করেছেন, কেহ অসুস্থ হ'লে তাঁর বিষ্ঠাময় কাপড় নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন, আবার তাঁদের অবোধ্য উপনিষৎ-গীতার সুকঠিন তত্ত্বগুলির সারাংশ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সুললিত করেছেন। কাশী, বৃন্দাবন, কনখল, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ তাঁর জীবনে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ও তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে কত শত দুরূহ প্রশ্নের হৃদয়-গ্রাহী মীমাংসায় আনন্দ পেয়েছেন।

* * *

মহাপুরুষ মহারাজের বয়সের ও স্বাস্থ্যভঙ্গের

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ধমান মঠ ও মিশনের গুরুভার তাঁর উপর অধিকতর ন্যস্ত হ'লেও তিনি নিজে ছিলেন ঠাকুর ও মার সেই ছোট ছেলেটির মত। তিনি জানতেন—মা ঠাকুরের চেয়েও বড়, কিন্তু কত চাপা! আদ্যাশক্তির অংশস্বরূপা সেই মা'র কৃপা না হলে অস্থিচর্মসার কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা দ্বারা মুক্তি হবে না—একথা তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতেন; আরও বলতেন—মা বিরূপা হ'লে ব্রহ্মা-বিষ্ণুও রক্ষা করতে পারবেন না। সেই ঠাকুর ও মার সেবা ও প্রচার করেছেন মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে ৫ বৎসরের শিশুর মত, অমায়িক ব্যবহারে ও পূর্ণ নিরহঙ্কার ভাবে।

মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন—"বাবা, ঠাকুরের দরবারে আমি কুকুরের মত পড়ে আছি। আমি দীক্ষা দিই না—ঠাকুরকে বলি—তিনিই দেন।" অথচ এই অনাড়ম্বর জীবনের এত প্রভাব ছিল যে, তাঁরই শ্রীমুখের একটি বাণীতে কত শত লোকের সমগ্র প্রাণধারা উল্টে গেছে, স্তূপীকৃত পাপরাশি পশ্চাতে রেখে তাঁরা হয়েছেন অমৃতত্বের অধিকারী। পাপকে মহাপুরুষজী বলতেন পর্বতপ্রমাণ তুলার রাশি—একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিয়ে নিঃশেষ করা যায়—জীবন আবার নূতন ছাঁচে গড়ে ওঠে। ঠাকুরের এই শিশু সন্তানটি পাপ-তুলা-পাহাড় তাঁর কৃপানলে দগ্ধ ক'রে কত জীবনে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব জাগরূক করেছেন।

*   *   *

মহাপুরুষজীর কোষ্ঠীর বিচারফল ছিল—হয় তিনি বড় সন্ন্যাসী হবেন—না হয় রাজা হবেন—তা তিনি দুই-ই হয়েছিলেন। একবার তিনি ধ্যান-ভঙ্গের পর দেখলেন, একটি বৃদ্ধা সজল নেত্রে তাঁর কাছে যেন কিছু চাইছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?" উত্তর হ'ল "মুক্তি।" বজ্রগম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তাই হবে।" কোন রাজা পৃথিবীর ধনরাশি দিয়ে এই মুক্তি দিতে পারে?

তাঁকে দেখে মনে হ'ত তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে ঠাকুরই যেন বিরাজ করছেন! নির্বাক নিস্পন্দভাবে ভক্তপরিবৃত হয়ে খাটের উপর বসে আছেন—সকলেই স্তব্ধ, প্রশ্ন স্তিমিত, বাসনা তিরোভূত—অথবা একটা গম্ভীর অব্যক্ত ভাব সেখানে বয়ে যাচ্ছে—অদ্ভুত! সেই দৃশ্যমান শরীরকে নানা ব্যাধি আশ্রয় করেছিল, রোগের যন্ত্রণা দেখলে চোখে জল আসত; কিন্তু তিনি নিজে সে সব অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে সকলকে আশীর্বাদ করতেন! আত্মা থেকে দেহ একেবারে পৃথক তাঁর এই অনুভূতি তাঁকে না দেখলে ধারণা করা যায় না। পক্ষাঘাতে যখন তাঁর বাক্-রোধ হয়েছিল তখনও তিনি অস্ফুট ভাষায়, দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কৃপা বর্ষণ করতেন।

(দুই)

প্রসঙ্গ

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭। বেলা ৪ টার সময় মঠে পৌঁছুলাম। ঠাকুর দর্শন করে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসেছি। এক ঘর লোক। তিনি ১০ মাস পরে উটকামণ্ড হতে সবে মাত্র বেলুড়মঠে ফিরেছেন।

জনৈক ভদ্রলোক গভীর শোক পেয়ে এসেছেন শান্তি পাবার আশায়। মহাপুরুষজী তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন,—"দেখ, তুমি এটি করবে, যাই হোক্ বাবা, ভগবানকে যেন ভুলো না। শোক দুঃখ আসছে, আসবে—তা বলে তাঁকে যেন ভুলো না। তিনিই এক মাত্র সত্য। দেখ, সংসারের অনিত্যতা আর লোককে বুঝাতে হয় না। সকলেই দিন রাত চোখের উপর তা দেখছে। যে অবস্থায়ই থাক তাঁকে রোজ ডাকবে, প্রার্থনা করবে। এই হচ্ছে সার। নিজের এই শরীরই যখন থাকবে না, তখন কার জন্য

শোক করবে? প্রাণের সহিত তাঁকে ডাকতে হবে, তা না হলে কেবল মালা ঘুরিয়ে নিয়ম রক্ষা করলে চলবে না, খুব ডাকবে একমনে। আহার-নিদ্রা প্রভৃতির জন্য সময় আছে, না করলে চলে না, সেরূপ ভগবানকে সময় করে compulsory (আবশ্যিক) ভাবে ডাকতে হবে, তবে ত শান্তি প্রাণে আসবে। বাবা! তুমি যেন তাঁকে ভুলো না। তাঁকে ভুলে গেলে সবই গোলমাল হয়ে যাবে।"

আমাদের বন্ধু কা-বাবু মহারাজকে প্রণাম করে বসলেন।

কা-বাবু—মহারাজ! মা আমার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।

মহারাজ—তোমার কি ইচ্ছা?

কা-বাবু—আমার বিয়ের ইচ্ছে নেই।

মহারাজ—তা হলে খুব firm (দৃঢ়) থাকবে, কোন মতেই yield (সঙ্কল্পচ্যুতি) করবে না। মা দুঃখিত হবেন বলে তুমি মনে কিছু করো না। মাকে সব বুঝিয়ে বলবে, তিনিও তো সবই সংসারের অবস্থা দেখছেন।

এবার পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ এসে বললেন, "মহারাজ, মঠের কুকুরটি ২।৩ দিন হল পালিয়ে গেছে, অনেক খোঁজ করেও আমরা পেলুম না।"

মহাপুরুষজী—কুকুর প্রভুভক্ত হয়, কিন্তু এই কুকুরটি বড় indifferent (উদাসীন) ছিল: সাধুদের কুকুর কিনা, ও বেটাও সন্ন্যাসী ছিল!"

উপস্থিত ভক্তগণ মহাপুরুষজীর কথায় হাসিয়া উঠিলেন। এবার মহাপুরুষজী বেড়াবার জন্য নীচে নামলেন, বেলা তখন ৬টা বাজে। ফুলের বাগানের দিকে বেড়ালেন। একজন ভক্ত ডাক্তার এসে প্রণাম করে শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। মহাপুরুষজী বললেন, তুমিও যেমন। এ শরীর একদিন যাবেই, তবে কেন এত ব্যস্ত হব? এখন আমার ৭৬ বৎসর চলছে, good old age (বেশ বুড়ো বয়স)। শরীর যায় ত যাবে।

আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করে ঘরে আরতি দর্শন করতে গেলাম।

৫ই মার্চ, ১৯২৭। কথাপ্রসঙ্গে চ-বাবু মহারাজের শরীরের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ—দেখুন চ-বাবু, আমার কোন অসুখ নেই, এই শরীরটারই যত ব্যাধি। তিনি ঠিক আছেন, ঠিক থাকবেন। হোক না শরীরের যা ইচ্ছা, আত্মা ঠিক আছেন। সেখানে সুখ-দুঃখ-ব্যাধি কিছুই নেই। শরীরটা আছে বলেই এসব হচ্ছে ও হবে। সেই চৈতন্যময় ভিতরে আছেন বলেই ত চৈতন্যে আছি। এসব বিচার করলে আর শরীরের ব্যাধির জন্য ভাবতে হয় না। এখন মাত্র তাঁর দিকে চেয়ে আছি ও তাঁর অপূর্ব লীলা দেখছি। আপনি ত বুদ্ধদেবের বিষয় অনেক চর্চা করতেন; দয়া করে আর একদিন আসবেন, আপনার সঙ্গে ঐ সব বিষয় কথা হবে। আহা! বুদ্ধদেবের মত এমন দয়ার মানব আর কে আছেন? তিনি জগৎকে শান্তি দেবার জন্য কি কঠোর সাধনাই করে গেছেন! স্বামীজী তাঁর কথা হলে একেবারে মেতে যেতেন। আমরাও তাঁর কথা শুনে বড় আনন্দ পাই।

পাবনার জনৈক ভক্ত এসে মহারাজকে প্রণাম করলেন।

ভক্ত—আমি কথামৃত পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি, তাঁর কৃপাও পেয়েছি।

মহাপুরুষজী—এই যে অহেতুক কৃপার কথা শাস্ত্রে আছে, অতি সত্য। যখন অবতার আসেন তখনই তার প্রমাণ হয়। আমরা দেখছি, তিনি বিনা কারণে, বিনা হেতুতে কৃপা করে থাকেন। গীতায় তিনি বলেছেন, 'দেখ পার্থ, আমার এই ত্রিলোকে কিছুই পাবার লোভ নেই, কিন্তু তবুও আমি কর্মে লিপ্ত আছি, কেননা আমি কর্ম না করলে এই জীবসকল কেহই কর্ম করবে না। তাই আমি সদা কর্মে লিপ্ত রয়েছি।' দেখুন, অবতার যখন আসেন সব দিক পূর্ণ হয়ে যায়।

ভক্ত—মহারাজ, কেন তিনি কষ্ট করে জন্ম গ্রহণ করেন? তিনি এই শরীর পরিগ্রহ না করেও ত তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করতে পারেন।

মহাপুরুষজী—তিনি শরীর-পরিগ্রহ করে লীলা করেন; মানুষ তাঁকে দেখে, তাঁকে ভালবেসে তাঁর সংসর্গে এসে জীবন তৈরী করে নেয় এবং তাঁর সেবা-বন্দনা করে মুক্ত হয়ে যায়। মানুষের রূপ ধরে আসাতে মানুষ তাঁকে ভালবাসার সুযোগ পায়। তা ভিন্নও মানুষ মানুষের মতই একজনকে তার আদর্শ চায়, তা না হলে কি করে সেই বিরাট ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারে?

ভক্ত—মহারাজ; শ্রীশ্রীঠাকুর যে অবতার এই কথা আপনারা তখন বুঝেছিলেন কি?

মহাপুরুষজী—না, তখন কি আমরা অবতার এ সব বুঝি? তবে এটি সত্য বুঝেছিলুম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসার মত ভালবাসা জীবনে কোথাও পাইনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গেলে মনে হত যেন ঠিক মায়ের কোলে এলুম। বহু দিন পরে ছেলে যেমন বাড়ী যেয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ায় ও আনন্দ পায় ঠিক সেরূপ মনে হত। অবশ্য এটা আমার feelings (ভাব) বলছি। তাঁর এমন ভালবাসা ছিল, আমরা তাঁকে না দেখে থাকতে পারতুম না। সংসারে এইরকম নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিরল। ছোট ছেলেরা এদিক সেদিক খেলা করে, মনে ভয়ও থাকে, কিন্তু যখন মায়ের নিকট আসে তখন নির্ভয়ে মায়ের কোলে থাকে। আমাদেরও তেমনি মনে হত। এই যে আপনারা আসেন, আমাদের ভালবাসেন—এ দেখে আমাদেরও কত আনন্দ হয়।

ঠাকুর তাঁর ভালবাসাই আমাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু দিয়ে রেখেছেন; তাই আপনাদের আমরা এত ভালবাসতে পারছি। আপনারা কত বাধা-বিপদ ঠেলে আমাদের দেখতে আসেন। আপনাদের এখানে এলে আনন্দ হয়, আমাদেরও আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়।

এবার সকলে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। মহারাজ সকলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আপনারা সকলে আনন্দে থাকুন।'

(তিন)

পত্র

(জনৈক চিরকুমার শিক্ষাব্রতীকে লিখিত)

(১)

বেলুড় মঠ
৮।৩।১৯২৪

শ্রীমান—,

* * সেবাশ্রমের সম্প্রতি কার্য্যের বিবরণ শুনিয়া বড়ই আশা হয়। প্রভু দেশে এইরূপ নিষ্কাম সেবার ভাব যুবকবৃন্দের হৃদয়ে খুব জাগাইয়া দিন ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। স্বামিজীর ইহাই প্রাণের কথা ছিল, বঙ্গীয় যুবকদের উপর তাঁর সম্পূর্ণ ভরসা ও আশা—ইহাদের দ্বারাই দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানিবে। আমার শরীর এক প্রকার ভালয় মন্দয় চলিয়া যাইতেছে প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

বেলুড় মঠ
২৯।২।২৮

শ্রীমান—,

* * হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি হউক: তুমি তাঁর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। আমার বৃদ্ধ শরীর প্রায়ই তত ভাল থাকে না;

ঠাকুর যত দিন জগতে এ দেহ রাখেন, ততদিন থাকিবে। আমি দেহাতিরিক্ত আত্মা—জন্মমরণ তাতে কিছুই নাই। প্রভু দয়া করিয়া এ জ্ঞান নিশ্চয় করিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছেন, সেজন্য কোনরূপ অনুশোচনা নাই। প্রার্থনা, তোমরাও এ জ্ঞান তাঁর কৃপায় লাভ কর এবং নিষ্কামভাবে তাঁর কাজ কর। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩)

(জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে লিখিত)

বেলুড় মঠ
২১।১০।২৫

মা—,

* * তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে যাঁর শ্রীচরণে আমি অর্পণ করিয়াছি তিনি ঈশ্বরাবতার, সকলের অন্তরাত্মা—সকলের হৃদয়ের চৈতন্য, পরম কারুণিক অহৈতুকী দয়াসিন্ধু, পতিত-পাবন। যখনই মনে কোনরূপ অশান্তি বোধ করিবে আন্তরিকতার সহিত বালকের ন্যায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। সদা পতিপরায়ণা হইয়া থাকিবে, মেয়েদের জীবনের শোভা পতিব্রতা হওয়া। উপদেশ ইত্যাদি সাধুদের বা কোন সৎপুরুষ বা স্ত্রীর নিকট হইতে লইতে পার, কিন্তু পতি ছাড়া কোন পুরুষের, যিনিই হউন, অঙ্গস্পর্শ কখনই করা উচিত নয়, উহা মহাপাপ। * * আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি তুমি সংসারে কর্ত্তব্যপরায়ণা, পবিত্র, ভগবদ্ভক্ত হইয়া সুখে থাক। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

সমালোচনা

ঋষিদের প্রার্থনা—নব সংস্করণ—অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্-এ, পিএইচ্-ডি প্রণীত; বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১১৪; মূল্য ১৸০ আনা।

এই বইটির প্রথম সংস্করণ ১৩৩৫ সনে বাহির হইয়াছিল। নূতন সংস্করণে 'ঋষিদের সাধনা' নামে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা এবং উপনিষৎসমূহ হইতে প্রার্থনা-সূচক অনেকগুলি সুনির্বাচিত মন্ত্র টীকা এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ (কতকগুলি অনুবাদ কবিতায়) সহ দেওয়া হইয়াছে। চারি বেদের বিভিন্ন শান্তি-পাঠগুলিও এই 'প্রার্থনা'-চয়ের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনার মধ্যে যে শাশ্বত সত্যদৃষ্টি, উদার শান্তি ও তেজোবীর্যের প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা ভারত-সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট এই সম্পদের পরিচয় সুপণ্ডিত গ্রন্থকার অতি যোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'ঋষিদের প্রার্থনা' বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত ও অনুধ্যাত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, পুরাণ-রত্ন-সম্পাদিত। প্রকাশক—মহেশচন্দ্র ভট্টাচায এণ্ড কোং, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড্, কলিকাতা—১; ডবল ক্রাউন অক্টেভো; ৭৪৩ পৃষ্ঠা; মূল্য ৮৲ টাকা।

মূল, অন্বয়ার্থ, বঙ্গানুবাদ ও 'মন্ত্রার্থবোধিনী' টিপ্পনী সংবলিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সুসম্পাদিত এই বৃহৎ সংস্করণটি দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। নানা শাস্ত্রদর্শী সম্পাদক বহুতথ্যপূর্ণ টিপ্পনীর মাধ্যমে চণ্ডীর দার্শনিক এবং অনুষ্ঠানমূলক যাবতীয় বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষৎ এবং পুরাণাদির প্রভৃত উদ্ধৃতিগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আলোকবর্ষী হইয়াছে। কাগজ

এবং ছাপা ভাল। চণ্ডীগ্রন্থ যাঁহারা গভীরভাবে আলোচনা করিতে চান তাঁহাদের নিকট এই সংস্করণটি প্রচুর সহায়ক হইবে।

—স্বামী প্রেমরূপানন্দ

The Soviet Impact on Society: by—D. D. Runes. প্রকাশক—Philosophical Library, New York. পৃঃ ২০২ + ১৩ : মূল্য ৩·৭৫ ডলার।

Mr. Runes দার্শনিক গ্রন্থাদির লেখক ও সম্পাদকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মার্ক্সীয় মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এই পুস্তকে তিনি সেই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকদিগের উদ্দেশে লেখক গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, পুস্তকখানি প্রায় পনর বৎসর পূর্বে সোভিয়েট-নাৎসী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে লিখিত। তখন উপযুক্ত প্রকাশকের অভাবে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে ইহা অপরিবর্তিত আকারেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে লেখকের মত-পরিবর্তনের কোনও কারণ ঘটে নাই।

পুস্তকখানি চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে লেখক কার্ল মার্ক্সের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী, এবং মার্ক্সীয় অর্থনীতি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে কার্ল মার্ক্সের দার্শনিক মতবাদের সহিত তাঁহার নিজ জীবনের বিশেষ সঙ্গতি দেখা যায় না। তাঁহার দর্শন এবং অর্থনীতিও অবাস্তব এবং ভ্রান্ত। দর্শনের ক্ষেত্রে মার্ক্স হেগেলীয় 'সর্বাত্ম-বাদের' উত্তরাধিকারী; প্রভেদ এই যে, হেগেল যে স্থলে 'চৈতন্যকে' চরম সত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মার্ক্স সে স্থলে 'জড়'কে মৌলিক সত্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। উভয় মতই পরিণামে একনায়কত্বের পরিপোষক। হেগেলের মতানুবর্তী হিটলারী একনায়কত্ব এবং মার্ক্সবাদী সোভিয়েট একনায়কত্ব—মূলে সমগোত্রীয়। অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান মজুরী এবং সমান অধিকার-সম্বন্ধে মার্ক্স যাহা লিখিয়াছেন তাহা সোভিয়েট রাশিয়াতে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। লেনিন উহা কার্যকর করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন এবং সেই হইতে শ্রমের পূর্ণ মূল্য এবং শ্রমিকসাধারণের সমান মজুরীর কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া যায়। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে সোভিয়েট সমাজেহ শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রমিক কেবলমাত্র 'শ্রমশক্তিতে' পরিণত হইয়াছে এবং তাহাকে বঞ্চিত করিয়া মালিকশ্রেণী উত্তরোত্তর ফাঁপিয়া উঠিতেছে। অবশ্য সে দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পাওয়ায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠীই রাষ্ট্রের নামে মালিকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লেখক সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের স্তরভেদ, মার্ক্সীয় ভ্রাতৃভাবের বৈশিষ্ট্য, সোভিয়েট সমাজে আইন ও বিচারপদ্ধতি, শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য এবং অসহনীয় অবস্থা, দেশের সাহিত্যিকদের উপর শাসকশ্রেণীর খবরদারি এবং তাহার ফলে প্রকৃত সাহিত্যের অপমৃত্যু প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় লেখক স্বকীয় মতের সমর্থনে যে সকল তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন তাহা সোভিয়েট সংবাদপত্র, কিংবা মার্ক্সবাদী নেতা বা লেখকের উক্তি হইতেই সংগৃহীত। যেরূপ পরিশ্রম সহকারে লেখক নানাতথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। কোনও স্থলে কেবল মাত্র তাঁহার অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রতিটি উক্তি এবং সমালোচনাই বাস্তব ঘটনা কিংবা প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পুস্তকের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে 'বুডাপেষ্টের বিদ্রোহ' 'চীনে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ' 'আমেরিকায় মার্ক্সবাদীদের ক্রিয়াকলাপ' প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একথা বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য পুস্তকখানি মার্ক্সবাদ এবং ষ্টালিন-পরিচালিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা-গ্রন্থ। মার্ক্সীয় সাম্যবাদ এবং ষ্টালিন-তন্ত্রের বিরোধী পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকে নিজ নিজ মতের সমর্থক বহু উপাদেয় তথ্য এবং যুক্তির সন্ধান পাইবেন। স্বভাবতঃই মার্ক্সপন্থী এবং সোভিয়েট ভক্ত পাঠকবৃন্দ পুস্তকখানিকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই তথ্যবহুল গ্রন্থে লেখক সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সকল তথ্য উদ্‌ঘাটন করিয়াছেন তাহার উত্তরে মার্ক্সবাদী পণ্ডিতগণের কি বলিবার আছে নিরপেক্ষ পাঠকগণ সাগ্রহে লক্ষ্য করিবেন।

পুস্তকের ভাষা মনোগ্রাহী ; বিষয়বস্তুর বিন্যাস-কৌশল সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যাঁহারা লেখকের মত ও যুক্তির সহিত একমত হইতে পারিবেন না তাঁহারাও পুস্তকখানি পড়িতে বসিয়া আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া পারিবেন না। পুস্তকখানি প্রায় পনর বৎসর পূর্বে লিখিত ; ইতোমধ্যে বিশ্বের ইতিহাসে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এই পুস্তকের কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমরা কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারি নাই।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

অরবিন্দ-দর্শনের উপাদান—শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী ও শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভারতবাণী প্রকাশনী, ৫৪।৪ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৫৭ ; মূল্য ১।০ আনা।

শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন লেখায় তাঁহার যে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে আলোচ্য পুস্তকে লেখক ও লেখিকা সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্লেষণে অরবিন্দ-দর্শনের উপাদান প্রধানতঃ আমাদের দেশের সনাতন শাস্ত্রসমূহই, তবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও মনন তাহাদের অযৌক্তিক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ অংশগুলি বাদ দিয়া শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই বলিষ্ঠ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের মৌলিকতা কোথায় গ্রন্থ-প্রণেতৃদ্বয় তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক ও আলোচনাদি সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃই আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের প্রতি একটি অসহ আক্রমণ থাকে। বর্তমান গ্রন্থের বিশ্লেষণ-ভঙ্গী অধিকতর সহিষ্ণু। 'অতিমন বা ঋতচিৎ'-সংজ্ঞক শেষ অধ্যায়ে লেখক ও লেখিকা তন্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কয়েকটি শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের বহু-আলোচিত 'অতিমনের অবতরণ' (descent of the supermind)—যাহা অনেকে খুব জটিল ও দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করেন—সহজভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ-সাধনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যসম্বন্ধে তাঁহাদের স্বাধীন অভিমত সুনিশ্চিত ; অবশ্য শ্রীঅরবিন্দমতানুযায়ীরা উহা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত ; 'সুদর্শন' কার্যালয়, ৩, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩ ; পৃষ্ঠা—২৩৫ ; মূল্য ॥০ আনা।

স্বল্পমূল্যের এই ক্ষুদ্র সংস্করণটি নিত্যচণ্ডীপাঠকগণের নিকট সমাদরণীয় হইবে। মূল সংস্কৃত মন্ত্রগুলি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব'-নামক ভূমিকাটি খুব হৃদয়গ্রাহী ও সময়োপযোগী।

হিমাদ্রি (শারদীয়া সংখ্যা)—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য দ্বারা সম্পাদিত। কার্যালয় : ১৬, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ. গোপীনাথ কবিরাজ, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির লিখিত ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য-বিষয়ক সুচিন্তিত রচনা এবং কবিতা পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ছোট গল্পগুলিও ভাল লাগিল।

Batanagar Recreation Club Magazine—আগাগোড়া ইমিটেশন আর্ট কাগজে চমৎকার ছাপা, বহুচিত্রশোভিত, ডবল ক্রাউন অক্টেভো সাইজ।

১০০পৃষ্ঠার এই ষাণ্মাসিক (জানুয়ারী-জুন, ১৯৫৩) পত্রিকাখানি দেখিয়া এবং পড়িয়া বাটানগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালকগণের রুচি ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইংরেজী এবং বাঙলা সুনির্বাচিত রচনাগুলি (কয়েকটি রবার-শিল্প এবং শিল্পকল্যাণমূলক) তৃপ্তি-এবং শিক্ষাপ্রদ। বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক অসিতকুমার হালদার 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং দেশের শিল্পকলা' প্রবন্ধে ভারতশিল্প-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে প্রাসঙ্গিক অবতারণা করিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান। 'A Devotee'-লিখিত 'Swami Vivekananda and his Mission' লেখাটি আগ্রহের সহিত পড়িলাম।

মেদিনীপুর কলেজ পত্রিকা (চতুর্দশ বর্ষ, ১৩৬০)—পরিচালক : অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যোপাধ্যায় ; সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মাল।

প্রধানতঃ শিক্ষা, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজকল্যাণকে অবলম্বন করিয়া মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা এই বার্ষিকীতে স্থান পাইয়াছে। একটি ইংরেজী প্রবন্ধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটুট্যট অব কালচার—এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-সম্পদ্ বিশ্ব-মানবের নিকট উপস্থাপিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সংস্কৃতির মধ্যেও যাহা প্রাণপ্রদ তাহা গ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন। সুতরাং তুলনামূলক সত্যসন্ধ আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন কৃষ্টির প্রতি মানুষের যথার্থ শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করাও এই সংস্কৃতি-ভবনের উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সুদক্ষ এক কর্মিগোষ্ঠী গঠন করিয়া তোলাও প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য।

সংস্কৃতি-ভবন নিয়মিতভাবে পাঠচক্র, আন্তর্জাতিক আলোচনা-সভা, লাইব্রেরী ও পাঠাগার, সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, গ্রন্থ-প্রকাশন প্রভৃতি দ্বারা সুগভীর সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংস্কৃতি ভবন ধর্ম, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও গবেষণা পরিচালন করিবার সুযোগ-দান করিয়া থাকেন। হিন্দি-শিক্ষাদান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শনও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সক্রিয় ও গভীর সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিতে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যম অপরিসীম। সংস্কৃতি-ভবনের মাসিক বুলেটিন

প্রত্যেক কৃষ্টি-অনুরাগী ব্যক্তি সাগ্রহে পাঠ করিবেন সন্দেহ নাই। সংস্কৃতিভবন-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে (Students' Home) কয়েক জন কলেজের ছাত্র ও গবেষক বাস করেন। সংস্কৃতি-ভবন নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলিও কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর :—

ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা পরিচালনের জন্য সংস্কৃতি-ভবন একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের মূলীভূত ঐক্য-প্রদর্শনও এই বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিল্পসংরক্ষণাগার-স্থাপন, ভারতীয় সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-বিষয়ক বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা; আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান, সংস্কৃতি মিশন প্রেরণ, সংস্কৃতি-ভবনের আদর্শবাহী একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ এবং বিদেশাগত বিদ্বদ্‌বর্গের জন্য অতিথিভবন-স্থাপন প্রতিষ্ঠানটির অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সংস্কৃতি-ভবন দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে ২·৩৩ একর ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন। গৃহনির্মাণেরও পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। গৃহ-নির্মাণ-কার্যে আনুমানিক ২,৩০০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। ভারত সরকার ১,০০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জনসাধারণ হইতেও ৫০০,০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখনও ১,৫০০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা দরকার।

১৯৪৯-৫২ বর্ষগুলিতে নিয়মিতভাবে মহাভারত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা, বাল্মীকি-রামায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোচিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ, কর্মে পরিণত বেদান্ত এবং জ্ঞানযোগ পাঠচক্রে আলোচিত হইয়াছে। বর্ষগুলিতে সাপ্তাহিক আলোচনা-সভাগুলি বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল।

পূর্বপাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির বর্তমান অবস্থা—স্বামী বিবেকানন্দ-কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে পূর্বপাকিস্তান) কতকগুলি শাখাকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে মঠ ও মিশনের ১১টি কেন্দ্র রহিয়াছে। দেশবিভাগের ফলে যে বিরাট বিপদের সৃষ্টি হয় তাহার দ্বারা তথাকার অধিবাসীদিগের ন্যায় ঐসকল কেন্দ্রগুলিকেও দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

১৮৯৯ সালের প্রথম ভাগেই ঢাকা-কেন্দ্রটির প্রথম সূচনা হয় এবং ইহার কার্যকারিতা দ্রুত প্রসারিত হইতে থাকে। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে মিশনের কর্মতৎপরতার পরিচয় হইল, বাহিরের ঔষধালয়, ছেলেদের এম্-ই স্কুল, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা, এবং দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য। মঠে পরিচালিত কার্য তালিকার মধ্যে নিয়মিত পূজার্চনা, ভজন, ধর্মমূলক অনুষ্ঠান ও জন্মদিন-উদ্‌যাপন উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে আশ্রমের আরম্ভ হয় ১৯০৮ সালে এবং ১৯২২ সালে উহা মিশনের শাখা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। এখানেও মিশনের দাতব্যচিকিৎসালয়, পাঠাগার, দরিদ্রদিগকে অর্থ-সাহায্য এবং সর্বোপরি একটি ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে।

ঢাকা জেলার বালিয়াটি এবং সোনারগাঁয়েও মিশনের আরও দুটি কেন্দ্র বিদ্যমান। দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি লাইব্রেরী ও পড়িবার ঘর, নিয়মিত ভজন-পূজনের ব্যবস্থা এই উভয় আশ্রমেই চলিতেছে। বালিয়াটিতে মেয়েদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

পাকিস্তানস্থিত মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রগুলি দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং শ্রীহট্ট জেলায় রহিয়াছে। দিনাজপুরে মিশনের একটি দাতব্য ঔষধালয়, একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা

বিদ্যালয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি লাইব্রেরী পরিচালিত হইতেছে। হবিগঞ্জে মিশন সেবাসমিতি ঐ অঞ্চলের মুচি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্দর বৈষয়িক ও ধর্মমূলক শিক্ষা দান করিতেছেন। ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার পরিচালনা এবং দুঃস্থ দরিদ্রদের নগদ অর্থদান বা অন্যপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা এখান হইতে হইয়াছে।

বরিশালস্থিত কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে। ইহার প্রধান কার্য হইতেছে—একটি ছাত্রাবাস, একটি লাইব্রেরী, সাপ্তাহিক ধর্মবিষয়ক আলোচনা এবং দুঃস্থদিগকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা।

বাগেরহাট এবং ময়মনসিং কেন্দ্রও প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করিতেছে।

ফরিদপুর-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালে। এখানে রহিয়াছে মেয়েদের একটি এম্-ই স্কুল, দাতব্যচিকিৎসালয় এবং একটি ছোট পাঠাগার। গরীবদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও এখানে করা হইয়া থাকে।

১৯১৬ সালে স্থাপিত শ্রীহট্টের সেবা সমিতি ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি দাতব্যচিকিৎসালয় চালাইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু দৈনন্দিন পূজার্চনা, ভজন, ধর্মমূলক ক্লাশ, মহাপুরুষদের জন্মদিবস উদ্‌যাপন ও এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে নগদ অর্থদান ও অন্যান্যভাবে সাহায্যের ব্যবস্থাও এখানকার কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

উপরে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এই সকল কেন্দ্রের সেবাকার্য অপরিহার্য এবং বর্তমানে বরং ইহার চাহিদা অত্যন্ত অধিক। এই কেন্দ্রগুলিকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করিতে হইলে উপযুক্ত অর্থ একান্ত আবশ্যক। আমরা সমস্ত দানশীল এবং জনসাধারণের কল্যাণকামী সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যথাসাধ্য আর্থিক আনুকূল্য করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ভ্রাতা ভগিনীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

প্রেরিত সাহায্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে—

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন,
পোঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া

জনশিক্ষা—রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ জনসাধারণের নিকট নিম্নোক্ত আবেদন করিতেছেন :

রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ ১৯৪৯ সাল হইতে একটি জনশিক্ষা বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন। এই বিভাগ একদিকে যেমন গ্রামে ও শিল্পাঞ্চলে সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ঐ কার্য পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। বর্তমানের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন যুবসম্প্রদায় কর্তব্যকে অবহেলা করিয়া নানারকম দাবী-দাওয়াকেই প্রধান করিয়া দেখিবার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত হইতেছে, সেই সময় যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দায়িত্বপূর্ণ সমাজ-সংগঠনের কার্যে অংশগ্রহণ-পূর্বক স্বীয় চরিত্রগঠনের সুযোগ পায় এইরূপ ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন হইয়াছে। উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া জনশিক্ষা-বিভাগ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী স্কুল ও কলেজের ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাতে যে সাড়া পাইয়াছে তাহা খুবই আশাপ্রদ।

বর্তমানে এই বিভাগের পরিচালনায় গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে ও আদিবাসী অঞ্চলে কয়েকটি বয়স্কশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রের কার্য চলিতেছে। অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কথকতা, গল্প, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, ছায়া-ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের জন্য খেলাধুলা ও ড্রিল শিখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং

তাহাদিগকে নানা দ্রষ্টব্যস্থান দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। একটি ভ্রাম্যমাণ জনশিক্ষা-বিভাগ গত কয়েক মাসে বাংলা ও বিহারের বহু গ্রাম, খনি-অঞ্চল, আদিবাসী ও শিল্পাঞ্চলে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র-প্রদর্শন ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছে। ছাত্রসম্প্রদায়ের জন্য নিয়মিত সমাজশিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা ও পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তাহার ভ্রাম্যমাণ বিভাগ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকদিগের প্রস্তুতির উপায় হিসাবে গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলগুলি সাপ্তাহিক পরিদর্শন, পরিষ্কারের ব্যবস্থা, শিল্প ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী ও কর্মশিক্ষা-শিবির-পরিচালন আমাদের কর্মসূচীর নিয়মিত অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমাজসংগঠনের কাযে নিযুক্ত অন্যান্য সঙ্ঘ বা সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য স্বল্পমূল্যে ম্যাজিক লণ্ঠন সরবরাহ ও একটি স্লাইড লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কয়েক জন একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং জনসাধারণ ও সরকারের আংশিক আর্থিক সাহায্যের দ্বারা এই কার্য সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য এই কাজটিকে রূপ দিতে এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশা করি মহানুভব জনসাধারণ সমাজ-শিক্ষার এই আরব্ধ কার্যের জন্য অকুণ্ঠভাবে অর্থ-সাহায্য করিবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠান-গুলিতে দানকৃত অর্থের উপর দাতার কোন আয়কর দিতে হয় না। সকল প্রকার দান নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
(জনশিক্ষা-বিভাগ)
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া

কয়েকটি সেবাকেন্দ্রের কথা—কনখল (হরিদ্বারের উপান্তে) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থাপিত হয় ১৯০০ সালে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজীর চেষ্টায়। সামান্য প্রারম্ভ হইতে গত ৫২ বৎসরে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সমগ্র উত্তর প্রদেশে সকল প্রকার আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা-সমন্বিত একটি বৃহৎ সেবায়তনে পরিণত হইয়াছে। হরিদ্বার ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের অধিবাসী, তথা হরিদ্বারে সমবেত এবং কেদারনাথ বদরীনাথাভিমুখ অগণিত তীর্থযাত্রী ব্যতীত টিহরী, গাড়োয়াল, নেপাল প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলের শত শত ব্যক্তি এই সেবাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগের রোগিসংখ্যা—১৭১৬, বহির্বিভাগে—৬৩,৪৬৯ ; অস্ত্রোপচারসংখ্যা—৪৭২ ; বীক্ষণাগারে রোগ-বীজাণু পরীক্ষা—১৪৯১। ভারতীয় রেড্ ক্রস্ সোসাইটি (দিল্লী)-র বদান্যতায় প্রাপ্ত ১০ পিপা গুঁড়া দুধ, ১ পিপা কড্ লিভার অয়েল এবং ২৫,০০০ মাল্টিভাইটামিন্ ট্যাবলেট্ রুগ্ন প্রসূতি এবং শিশু-দিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। সেবাশ্রমের উদ্যোগে প্রতিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে এই উপলক্ষ্যে ৩০০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইয়াছিল। সেবাশ্রমে একটি অতিথিভবন, লাইব্রেরী এবং নৈশবিদ্যালয়ও আছে। আলোচ্যবর্ষে সাধারণ তহবিলের আয় ব্যয় : জমা—৪৯,৪০৮৷৶ আনা ; খরচ—৫১,২০৮৷৷৶৬ পাই ; ঘাটতি ১৮০০৴৬ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন মাতৃভবনের (৭এ শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা—২৬) দ্বৈবার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫০ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) আমরা পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রসূতিসদন। প্রসূতি এবং নবজাতকের পরিচর্যা ও চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং সেবাব্রত-ধারিণী সেবিকাগণ এখানে রহিয়াছেন। মাতৃভবনে প্রসবের পূর্বে ভাবী জননীগণকে যথাযোগ্য উপদেশ ও সতর্কতারীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। ভদ্র-

পরিবারের মেয়েদের এখান হইতে প্রসূতি-পরিচর্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রাক্-প্রসব-পরিচরিতা নারীগণের সংখ্যা ছিল ৭৭৭৭ (নূতন—২৩৩০, পুরাতন—৫৪৪৭)। প্রসব-সংখ্যা—১৩৫৬ (তন্মধ্যে অবৈতনিক—৭১৪)।

কালিকট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (পোঃ কল্লাই, মালাবার, মাদ্রাজরাজ্য) ১৯৫০-৫১ সালের কার্যবিবরণী এস্থলে প্রদত্ত হইল। আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২,১৮৩ ও ৬৭,৩৪০। সেবাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত 'ষ্টুডেন্টস্ হোম'-এ উক্ত দুই বৎসরে যথাক্রমে ৩৩ এবং ৩৪ জন বিদ্যার্থী থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিল। আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাইব্রেরী এবং পাঠাগারের বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। প্রতি রবিবার আশ্রমে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মালোচনা এবং বিশেষ বিশেষ দিনে উৎসবাদিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বরাহনগর আশ্রমে অনুষ্ঠান—বিগত ২৬শে কার্তিক এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নব-নির্মিত উপাসনা-গৃহের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ আনুষ্ঠানিক দেবতা-প্রতিষ্ঠা নির্বাহ করেন। যথারীতি পূজা-হোমাদির পর দ্বি-প্রহরে সাধুসেবা, অপরাহ্নে 'রামনাম-সংকীর্তন,' সায়াহ্নে আরাত্রিক ও তৎপরে রাত্রে হাওড়া কাসুন্দিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা—১৯৫৪ খ্রীঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) পূর্ণকুম্ভ-মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রসিদ্ধ স্নানগুলির তারিখ—১৪ই জানুয়ারী (মকর সংক্রান্তি), ১৯শে জানুয়ারী (পৌষ পূর্ণিমা), ৩রা ফেব্রুয়ারী (অমাবস্যা) এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী (বসন্ত পঞ্চমী)। এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ) মেলাস্থানে একটি সেবা- ও আশ্রয়-শিবির স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। পীড়িতগণের চিকিৎসা ও সেবাকার্যের জন্য আনুমানিক ২০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ ধর্মানুরাগী জনসাধারণের নিকট সহায়তাপ্রার্থী।

আশ্রয়-শিবিরে থাকিতে ইচ্ছুক বন্ধু ও ভক্তগণ সেবাশ্রমের কর্মসচিব স্বামী ধীরাত্মানন্দের সহিত ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৪র পূর্বে পত্র ব্যবহার করিবেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

(১) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া; ২৫৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ৩৲ টাকা।

সংক্ষেপে এবং সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তদীয় লীলা-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনকথা।

(২) শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী গ্রন্থমালা—বিস্তৃত পরিচিতি পরবর্তী নিবন্ধে (৭০০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের উদ্বোধনে 'কেন তিনি এসেছিলেন' প্রবন্ধের (৫৯৮ পৃঃ) প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'তিপান্ন' স্থলে 'পঞ্চাশ' হইবে। উক্ত ভুলের জন্য লেখক এবং আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

—উঃ সঃ

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর সমারম্ভ

আগামী ১২ই পৌষ, ১৩৬০, রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) শ্রীশ্রীমায়ের একাধিকশততম জন্মতিথিতে তাঁহার শতবর্ষজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হইবে। এই উদ্বোধন-উৎসবের কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেলুড় মঠে—১২ই পৌষ, ১৩৬০, রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩)।

সকাল ৫-১৫ মিঃ হইতে—মঙ্গলারতি, দেবী-সূক্তপাঠ, উষাকীর্তন।

সকাল ৭-৩০ মিঃ হইতে—শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজারম্ভ ও হোম।

সকাল ৯-৩০ ঘটিকায়—কালীকীর্তন।

বেলা ১টায়—প্রসাদ-বিতরণ।

অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায়—জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা (সভাপতি—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী)।

১৩ই, ১৪ই ও ১৮ই পৌষ (সোম, মঙ্গল ও শনিবার) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পাঠ ও আলোচনা (বিষয়, যথাক্রমে—শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতে নারী-চরিত্র)।

১৯শে পৌষ, রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় বেলুড়মঠ হইতে শোভাযাত্রাসহকারে দক্ষিণেশ্বর-গমন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে—(উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা)।

১২ই পৌষ, ১৩৬০ রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর)।

সকাল ৫-১৫ হইতে—মঙ্গলারতি, ভজন, বেদপাঠ।

" ৭টা হইতে—শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজারম্ভ ও হোম।

সন্ধ্যা ৫৷৷৹টায়—আরতি।

" ৬৷৹টায়—কালীকীর্তন।

স্থানাভাব বশতঃ বসিয়া প্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে না।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট হলে—১৫ই পৌষ, বুধবার (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩)।

সাধারণ সভা; বিষয়—শ্রীশ্রীমায়ের জীবন।

জয়রামবাটী এবং অন্যান্য শাখা-মঠে—স্থানীয় কর্মসূচী-অনুসারে বিশেষ পূজা আলোচনাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উপরোক্ত কর্মসূচী শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর শুভ সমারম্ভকে উপলক্ষ্য করিয়া। বেলুড় মঠে ও কলিকাতায় প্রধান উৎসব এবং তদনুষঙ্গী সম্মেলন, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ (খ্রীঃ ১৯৫৪, ডিসেম্বর) মাসে (শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথিতে)। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি-প্রতিষ্ঠার তারিখ ঠিক হইয়াছে ২৫শে চৈত্র, ১৩৬০ (৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪)।

ঐ সময়ে ঐ পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রা ও মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান হইবে। বিস্তারিত জ্ঞাতব্য পরে প্রকাশিত হইবে।

জয়ন্তী-প্রকাশনমালা

(১) শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সংকলিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক বিশদ জীবনী-গ্রন্থ (বহু চিত্রে শোভিত); পৃষ্ঠা ৭২০; মূল্য ৬৲টাকা।

(২) Great Women of India—ভারত-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে মহীয়সী নারীগণের জীবনী ও কীর্তিকাহিনী। বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষীর দ্বারা লিখিত।

উপরোক্ত পুস্তকদ্বয় ১৫ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির দিন প্রকাশিত হইবে।

ইতঃপূর্বে প্রকাশিত—

(৩) শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত, মূল্য—১৲ টাকা।

(৪) A Glimpse of the Holy Mother শ্রীমতী সি কে হাণ্ডু-প্রণীত; মূল্য ৷৷৹ আনা।